১৩২৩ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র সূচী

অঞ্জলি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪০শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৩ [৭ম সংখ্যা

আচার

বেদপন্থীরা আ চা র কে এতদূর আবশ্যক মনে করেন যে, বালকের শিক্ষার আরম্ভ হইতেই তাহাকে প্রধানত আচারই শিক্ষা দিয়া তাহার সহিত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আচারই তাহার প্রধান শিক্ষণীয় থাকে। ব্রহ্ম বা বেদ-গ্রহণের জন্য তাহাকে বরাবর আ চা র ই শিখিতে হয় (ব্রহ্মচর্য্য); যিনি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিও আচার-পরায়ণ, স্বয়ং আ চ-র ণ করিয়া বালককে শিক্ষা দেন, এই জন্যই তিনি আ চা র্য্য। * উপনীত বালককে আচার্য্য পুঁথী পড়াইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথমত শৌচ, আচার অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যো-পাসনা, এই কয়টি শিখাইতে আরম্ভ করেন (মনু, ২-৬৯)। বচন তুলিয়া পুঁথী বাড়া-ইয়া লাভ নাই। বেদপন্থীরা আচারকে এতদূর আবশ্যক মনে করেন কেন, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, সদাচার ধর্ম্মের মূল (মনু, ৪-১৫৬)। ধর্ম্ম কেবল পুঁথীতে পড়িয়া, বা উপদেশকের নিকট শুনিয়া লাভ নাই, তাহাকে অনুষ্ঠান বা অনুভব করিতে হইবে। সদাচার অবলম্বন না করিলে এই অনুষ্ঠান বা অনুভব দুই-একটি মহানুভব ব্যক্তির হইলেও সাধারণ লোকের হয় না, শক্তি বা যোগ্যতাই জন্মে না। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, আচার দ্বারা দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারা যায়; অপর

* "আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে"—অথর্ব্ব, ১১·৭·৭; "আচারং গ্রাহয়তি"—যাস্ক, ১·২·২, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি, স্বয়মাচারতে যস্মাদাচর্য্যস্তেন চোচ্যতে।"—ভামতীধৃত (বেদান্ত-দর্শন, ১·১·৪) পুরাণ।

পক্ষে যাহারা সদাচার পালন করে না,—যাহারা দুরাচার, তাহারা সংসারে নিন্দিত হয়, দুঃখভাগী হয়, ব্যাধিত হয়, এবং অল্পায়ু হয় (মনু, ৪-১৪৬-১৫৭)। যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাত হৃদয়ে বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে উপদিষ্ট সদাচার-বিষয়ক অধ্যায়গুলি পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা সদাচারের ফলসম্বন্ধে উক্ত কথা কয়টির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। না পড়িয়া, না দেখিয়া-শুনিয়া তর্ক করিলে ঐ তার্কিকের সহিত আলোচনা করা বৃথা।

স্মৃতিসংহিতাসমূহে যাহা আচার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, ধর্ম্মসূত্রসমূহে তাহা সাময়াচারিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরুষ-কৃত ব্যবস্থার নাম সময়। সময়-মূলক আচার সময়াচার। যাহা সময়াচারে হয়, তাহা সাময়াচারিক। ইহাতে বুঝা যাইবে শিষ্টগণ † ব্যবস্থা করিয়া যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাই আচার। এই আচারও ধর্ম্মহেতু বলিয়া ধর্ম্ম। আপস্তম্ব বলিয়াছেন (ধর্ম্মসূত্র, ১-২০-৬-৭)—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলে না যে, 'আমরা এই, তোমরা (আমাদিগকে) আচরণ কর!' অথবা দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ, বা পিতৃগণও আসিয়া বলেন না যে, এইটি ধর্ম্ম, বা এইটি অধর্ম্ম।' যাহা করিলে আর্য্যেরা প্রশংসা করেন, তাহা ধর্ম্ম, আর যাহা তাঁহারা নিন্দা করেন, তাহা অধর্ম্ম।" ‡ হিরণ্যকেশী (২-৮-২০-২৮) ও আপস্তম্ব (২-২৯-১৫) নিজ-নিজ ধর্ম্মসূত্রের সর্ব্বশেষে বলিতেছেন, স্ত্রী-লোক ও অন্যান্য সমস্ত বর্ণেরই নিকট হইতে অবশিষ্ট ধর্ম্মসমূহ জানিবে—কেহ-কেহ ইহা বলিয়া থাকেন। §

এই সমস্ত কথার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বিহিত আচারগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) কতকগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক; যেমন, ভোজনের পর, রোগাবস্থায়, বা বহু রাত্রিতে স্নান করিবে না (মনু, ৪-১২৯)। (২) কতক-গুলি আধ্যাত্মিক-উন্নতি-বিষয়ক; যথা, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, শরীরক্লেশ, ও বেদতত্ত্বার্থ চিন্তা করিবে (ঐ, ৯২)। (৩) কতকগুলি (আলস্যাদি) দোষের অপ-নয়ন-বিষয়ক; যেমন, (অনাবশ্যক) লোষ্ট্র ঘর্ষণ করিবে না, তৃণ ছেদন করিবে না, দাঁত দিয়া নখ কাটিবে না (ঐ, ৬৯-৭১)। (৪) কতকগুলি বিপদ্‌নিবারণ-বিষয়ক; যথা, প্রাকারবেষ্টিত গ্রামে দ্বার ভিন্ন অপর স্থান দিয়া প্রবেশ করিবে না (ঐ, ৭১)। (৫) কতকগুলি নানাবিধ-

† "সর্ব্বজনপদেষু একান্তসমাহিতানাম্ আর্য্যাণাং বৃত্তং সম্যগ্‌বিনীতানাং বৃদ্ধানাম্ আত্মবতাম্ অলোলুপানাম্ অদাম্ভিকানাং বৃত্তসাদৃশ্যং ভজেত॥ এবমুভৌ লোকৌ জয়তি॥" আপস্তম্ব, ১·২০·৮; ২·২৯·১৪। গৌতম, ১·২·২৬; তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ১১·৪।

‡ "ন ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চরত আবাং স্ব ইতি। ন দেবগন্ধর্বা ন পিতর ইত্যাচক্ষতেঽয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি॥ ৬॥ যৎ ত্বার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং প্রশংসন্তি, স ধর্ম্মো যদ্ গর্হন্তে সোঽধর্ম্মঃ॥".

§ "স্ত্রীভ্যঃ সর্ব্ববর্ণেভ্যশ্চ ধর্ম্মশেষান্ প্রতীয়াৎ॥"

দোষ-সংক্রমণের নিষেধবিষয়ক ; যেমন, পতিত, চণ্ডাল-প্রভৃতির সহিত বাস করিবে না (ঐ, ৭৯)। (৬) কতকগুলি নীতিবিষয়ক ; যেমন, সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে ; কিন্তু অপ্রিয় সত্য বা প্রিয় অসত্য বলিবে না (ঐ, ১৩৮) ; হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, রূপহীন, দ্রব্যহীন, বা জাতিহীন ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না (ঐ, ১৪১। (৭) কতকগুলি লৌকিক বা সামাজিক অর্থাৎ প্রচলিত রীতি, প্রথা বা তৎকালিক ব্যবহার-বিষয়ক ; যেমন, প্রসাধন পূর্ব্বাহ্নেই করিবে (ঐ, ১৫২) ; অথবা, কাংস্যপাত্রে পা ধুইবে না (ঐ, ৬৫)। ইন্দ্রধনু (রামধনু) উঠিলে কাহাকেও তাহা বলিবে না যে, (এই) ই ন্দ্র ধ নু ; যদি বলিতেই হয় তবে ম ণি-ধ নু বলিবে (বৌধায়ন, ২-৩-৩৩)। এইরূপ আরো ভাগ করিতে পারা যায়।

যাঁহারা আচারের মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের শেষোক্ত লৌকিক বা সামাজিক আচারই প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য আচার-সম্বন্ধে বলিবার বা বিবাদ করিবার তেমন কিছু নাই, কেননা, সে সব স্থানে যুক্তি আছে। কিন্তু সামাজিক আচারে সর্ব্বত্র যুক্তি পাওয়া যায় না। প্রসাধন পূর্ব্বাহ্নেই করিতে হইবে কেন? মধ্যাহ্নেও ত করিতে পারা যায়। কাংস্যপাত্রে পা ধুইবে না কেন? ই ন্দ্র ধ নু বলিবে না কেন? ইহাতে কি হয়? "যে বয়সে ছোট, বা যে বয়স্য হয়, তাহাকে কু শ ল জিজ্ঞাসা করিবে ; ক্ষত্রিয়কে অ না ম য়, বৈশ্যকে অ ন ষ্ট (অর্থাৎ কিছু নষ্ট হয় নাই ত), এবং শূদ্রকে আ রো গ্য জিজ্ঞাসা করিবে (আপস্তম্ব, ১-১৪-২৬-২৯)।"—এরূপ বিশেষ বিধানের তাৎপর্য্য বা যুক্তি দেখা যায় না। এ কেবল ব্যবহার। যে সময়ে এই আচারের কথা লিখিত হইয়াছে, সমাজে তখন এই রীতিই প্রচলিত ছিল। প্রামাণিক ব্যক্তিগণ এইরূপই করিতেন। ইহাই আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতএব ইহার ব্যতিক্রম নিন্দিত হইত, এবং ইহা অতি স্বাভাবিক। শিষ্টেরা যখন এইরূপ আচরণ করিতেন, তখন সেই শি ষ্টা চা র সকলেরই অনুসরণীয় হইয়াছিল। শিষ্টাচারও ধর্ম্ম। তাই সাময়াচারিক-ধর্ম্মসূত্রসমূহে এই সব স্থান পাইয়াছে।

কেবল বেদপন্থী নহে, সমস্ত-পন্থীরই এইরূপ আচার,—একরূপে না হউক, অপর-রূপে,—রহিয়াছে। শয়ন-ভোজন-ভ্রমণ-প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই বিশেষ-বিশেষ আচার আছে, এবং এই সমস্ত আচারের অল্পমাত্রও ব্যতিক্রম অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া মনে হয়।

আচার একটি বিশেষ নিয়ম ভিন্ন কিছুই নহে, এবং নিয়ম স্বভাবতই সঙ্কোচক হইয়া থাকে। রোগী কত কি জিনিস খাইতে চাহে, চিকিৎসক সেখানে নিয়ম করিয়া মুগের যূষ ব্যবস্থা করেন। রোগীর প্রবৃত্তি কত জিনিসে গিয়াছিল, সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এইরূপ করিতে হইবে, এইরূপ নহে—ইহাই আচার। এই আচারও পূর্ব্ববৎ সঙ্কোচ আনয়ন করে। মানুষের প্রবৃত্তি বা গতি উন্মুক্তভাবে ছুটিতে না পারিয়া আচারের বশে সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; কতকটা গণ্ডী আসিয়া পড়ে। মানুষ যতদিন সমাজে রহে, ততদিন তাহার অনুরোধে তাহার

আচারকে অনুসরণ করিতে সে বাধ্য হয়। এবং তাহা করিয়া অজ্ঞাতসারে একটা গণ্ডী বন্ধন করিয়া ফেলে। সে হয়ত মনে করিতে পারে, আচার বিচার কিছুই মানিবে না, এসব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহা হইতে পারে—যদি সে এক-বারে বনে চলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন সে লোকালয়ে থাকে, ততদিন কোনো-না-কোনো সমাজে তাহাকে থাকিতেই হয়। তখন এক সমাজের আচারকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও অন্য সমাজের আচারকে ধরিতে হয়। ফলত যেরূপেই হউক, আচারটা থাকিয়াই যায়, কেবল রূপটা পরিবর্ত্তন করে মাত্র। আচারটা থাকিয়া গেলে তাহার আনুষঙ্গিক গণ্ডীবন্ধনও আসিয়া পড়ে—তাহা যেরূপেই হোক। কেহ কোনো সমাজে থাকে, অথচ তাহার আচার মানে না, ইহা হয় না। যদি না মানে তাহা হইলে, মনু যেরূপ বলিয়াছেন (৪·১৫৭), সে ব্যক্তি নিন্দিত হয়—"দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।" এ কথাটা কেবল বেদপন্থীর সমাজের নহে, দেশ-বিদেশের সব সমাজেরই নিয়ম। লোকপরম্পরায় প্রাচীন-প্রাচীনতর কাল হইতে সমাজে অনেক আচার চলিয়া আসে, এবং খুব শিক্ষিত হইলেও লোকে এই সকল আচার অনুসরণ করিয়া থাকে—যদিও সর্ব্বত্র যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কালের পরিবর্ত্তনে আবার এই সমস্ত আচার পরিবর্ত্তন-প্রাপ্ত হয়, কতকগুলির উপর তেমন আস্থা থাকে না, কতকগুলি লুপ্ত হইয়া যায়, আবার কতকগুলি বা নূতন উদ্ভূত হয়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সামাজিক ব্যক্তি এগুলি মানিয়া চলে।

আচার জিনিসটা বাহ্য। ইহা একটা বন্ধন আনয়ন করে বটে, কিন্তু এ বন্ধন বাহিরের বন্ধন, ইহা ভিতরের বন্ধন নহে। মানুষকে পশু করে ভিতরের বন্ধন; মানুষ পাশবদ্ধ হয় দেহের বন্ধনে নহে, অন্তরের আত্মার বন্ধনে। তাই বাহিরের যত বন্ধনই কাট না কেন, ভিতরের বন্ধন কাটা না যাওয়ায় বাহিরে নূতন নূতন বাঁধন আপনা-আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। একটা বর্ত্তমানের ঘটনায় কথাটা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, এই যে আচার লইয়া তীব্র আলোচনা চলিতেছে, তাহা বেদপন্থীর প্রধানত দুইটি কথা লইয়া; (১) একটা, সকলের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন না করা; (২) আর একটা নির্বিচারে সকল জাতির মধ্যে বিবাহে আদান-প্রদান না করা। দেখা যাইতেছে, দেশ যতই কেন সুসভ্য, অথবা সুসভ্যম্মন্য হউক না, এই আচারকে একবারে বর্জ্জন করিতে পারিতেছে না; বরং দেখা যাইতেছে, যাহাকে আগে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাকেই আবার ফিরিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতেছে। স ভ্য শব্দের প্রচলিত অর্থে মার্কিন মুলুক খুবই সুসভ্য দেশ, কিন্তু সেখানকার অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ম আঁটিয়া ফেলিয়াছে, নিগ্রোদের সহিত শ্বেতাঙ্গদের আর বিবাহ হইবে না। ¶

¶ "The constitution of six of the American States prohibit negro-white, inter-marriages. Twenty-eight of the states have statute-laws forbidding the inter-

কেন ইহারা এরূপ করিল? যেখানে বাধা ছিল না, সেখানে এরূপভাবে তাহারা বাধা আনিল কেন? মোগল-পাঠানে ছোঁয়া-খাওয়া-বিবাহে বাধা ছিল না, কিন্তু তাহাদের দ্বন্দ্ব বাধিয়া ছিল। ফরাসী-ইংরাজ জার্ম্মান-প্রভৃতিরও সেরূপ বাধা নাই, তথাপি তাহাদের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল কেন? তাই দেখা যাইতেছে, আচার ত্যাগ করিলেই যে গণ্ডী ভাঙিয়া যাইবে, মুক্ত হইয়া যাইবে, তাহার আশা নাই। যতদিন ভিতরের বন্ধন, ভিতরের গণ্ডী না যাইতেছে, ততদিন যেরূপেই হউক, তাহা বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইবেই। ভিতরে মুক্ত-উজ্জল হইয়া উঠিলে বাহিরের আচার-আবরণ লণ্ঠনের আলোর কাচের মত মানুষকে আর গণ্ডীর মধ্যে বস্তুত বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; অথচ কার্য্যের জন্য ঐ কাচ আবরণটা আবশ্যক হয়। যদি কাহারো আলোর প্রয়োজন হয়, তাহাকে লণ্ঠনে কাচ-লাগাইতেই হইবে। তেমনি যদি সমাজের প্রয়োজন থাকে তবে আচারও মানিতে হইবে।

আচার থাকিলেই যে ধর্ম্ম উদার হইল না, তাহার কোনো মানে নাই। তাহা হইলে যে বৌদ্ধধর্ম্মকে অতি-উদার বলিয়া প্রশংসা করা হইয়া থকে, তাহাও উদার হইতে পারে না; কেননা তাহা অত্যন্ত আচার-বহুল। বিনয়পিটকখানি কেবল আচারই উপদেশ করিয়াছে। কয়খানি চীবর থাকিবে, কত বড় হইবে, কিরূপভাবে পরিতে হইবে; দাঁতনখানি কত বড় লম্বা হইবে, কতটুকু মোটা হইবে (চুল্ল ·৫·৩১); ছুঁচ রাখিবার জায়গাটা কিসের হইবে, কিসের হইবে না (ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ, প্রায় ·৮৬); বসিবার আসনখানা কত বড় বা কিরূপ হইবে (ঐ, ৮৭); কেমন করিয়া গ্রামে যাইতে হইবে, কেমন করিয়া খাইতে হইবে; এইরূপ বিধানে বিনয়পিটক পরিপূর্ণ। আবার এই সমস্ত বিধানে বৌদ্ধদের কিরূপ নিষ্ঠা তাহা বৈশালীর দ্বিতীয় ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতিই (Second Buddhist Council) প্রকাশ করিতেছে। যেখানে ভোজনের সময় নুন পাওয়া যায় না, সেখানকার জন্য শিং এ করিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারা যায় কি না

marriage of negro and white persons. Twenty of; the states have no such laws; In ten of those latter states bills aimed at the prevention of negro-white inter-marriages were introduced and defeated in 1913....The Florida constitution prohibits inter-marriage between white persons and other possessing even one sixteenth or more negro blood. Many such persons do not physically show their affinity with the negro race....Alabama is the only state which would seem to have attempted to reach all the causes of negro-white amalgamation. Three of these states have in addtion to laws against inter-marriage, laws against cohabitation and against concubinage......The Modern Review, August, p. 208. See also the chapter "Cast in America" in Lajpat Rai's "*The United States of America.*" (dp. 387—399.)

("সিঙ্গিলোণকপ্প")? মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের ছায়া দুই আঙুল সরিয়া গেলে ভোজন করিতে পারা যায় কি না ("দ্বঙ্গুলকপ্প")? এইরূপ আর আটটি বিষয় লইয়া (চুল্ল ১২) বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের সহিত অন্যান্য ভিক্ষুর বিবাদ উপস্থিত হয়। বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণ ঐ সব করিতে চাহিতেছিলেন, আর অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছিলেন। ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতির বিচারে বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের পরাজয় হয়, এবং ঐ দুরাচার সঙ্ঘমধ্যে পরিত্যক্ত হয়। বিচার করা হইয়াছিল স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই আদেশ বা উপদেশ অনুসারে। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, সঞ্চিত খাদ্য খাইবে না (ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ, প্রায় ৩৮) এবং বিকালে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পরে) আহার করিবে না (ঐ, ৩৭)। উল্লিখিত বিবাদের আর একটি বিষয় ছিল, ভিক্ষুরা সোনা-রূপা ধারণ বা গ্রহণ করিতে পারে কি না। বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণ উপোসথের দিবসে কাঁসার থালায় জল দিয়া সঙ্ঘের মধ্যে রাখিয়া উপস্থিত উপাসকগণকে বলিতেন যে, যাহার যাহা ইচ্ছা প্রদান করুন। উপাসকেরা সোনা-রূপা যে যাহা পারিত, সেই থালায় দিত। পরে ভিক্ষুরা তাহা সমান ভাগ করিয়া লইত। একবার কলন্দক-পুত্র যশ বৈশালীতে ছিলেন। ভিক্ষুরা ইঁহাকেও এক ভাগ লইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন যে সোনা-রূপা লওয়া উচিত নহে; বুদ্ধদেব নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপেই বিবাদ আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের সোনা-রূপা লওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন কেন, কলন্দকপুত্র যশ বৈশালীর উপাসকগণকে তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন যে, যে সোনা-রূপা গ্রহণ করে, তাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ কাম্য বিষয়ে আসক্তি জন্মে, এবং তাহা হইলে শ্রমণ আর শ্রমণ থাকে না, অশ্রমণ হইয়া পড়ে। এইরূপ শিং-এ করিয়া একটু নুন লইয়া গিয়া খাইলে কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু একটু-একটু নুন রাখিতে-রাখিতে অন্যান্য খাদ্য বস্তুও সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আপনিই আসিয়া পড়ে। তখন অন্যান্য উপভোগ্য বস্তুও সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই 'অনর্থ। একদিন মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের ছায়া দুই আঙুল সরিয়া যাইবার পর আহার করিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু তাহাতে কোনো দোষ হয় না বলিয়া প্রচার করিলে বুদ্ধদেব যে উদ্দেশ্যে বিকাল-ভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তাহার সুফলতার অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। নিষ্ঠা—দৃঢ়নিষ্ঠা না থাকিলে সিদ্ধি চিরকালই দূরবর্ত্তিনী থাকিয়া যায়।

সমাজের সমস্ত লোকই বিজ্ঞ-বিবেচক-মনস্বী নহে। পণ্ডিত, মূর্খ, গণ্ডমূর্খ, গজমূর্খ, এই সকলকেই লইয়া সমাজ হইয়াছে। সমাজের হিতচিন্তা করিতে হইলে, এই সকলেরই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনো মঙ্গলের জন্য নিয়ম করিলে বা উপদেশ দিলে, এরূপভাবে তাহা করিতে হইবে যেন সকলেই তাহা বুঝে। ভিন্ন-ভিন্ন বালকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মন্দতা লক্ষ্য

করিয়া অধ্যাপককে একই বিষয় সংক্ষেপে বা বিস্তারে, এক বা বহু কথায় বলিতে হয়। একই শ্রেণীতে কোন জড়বুদ্ধি বালককে শিক্ষক মহাশয় যখন এক-একটি কথা তন্ন-তন্ন করিয়া, বহু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে থাকেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক বা কোনো সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সব শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং হয়ত অনাবশ্যকও ভাবিতে পারেন, কিন্তু বহুদর্শী শিক্ষক মহাশয় বুঝিতেছেন, তিনি নিরর্থক কিছুই বলিতেছেন না; একের নিকট নিরর্থক হইলেও অন্যের নিকট তাহা সার্থক—সম্পূর্ণ সার্থক।

শাস্ত্রসমূহ—বেদপন্থীরই হউক, বা বুদ্ধ-জিন-পন্থীরই হউক, অথবা অপর যে কোন পন্থীরই হউক,—এই ভাবেই চলিতেছে, এবং ঠিকই চলিয়াছে। একটা উদাহরণ দিব। মলত্যাগের পর শৌচের বিধি আছে। কিরূপে শৌচ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে গৌতম (১-১-৪৫) ও যাজ্ঞবল্ক্য (১-১৭)-প্রভৃতি কেহ কেহ এই মাত্র বলিয়াছেন যে, জল ও মাটি দিয়া এরূপ ভাবে শৌচ করিবে যেন গন্ধ বা অমেধ্য পদার্থ লিপ্ত না থাকে ("লেপগন্ধাপকর্ষণ," "লেপগন্ধক্ষয়কর")। তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই। যাঁহারা ধীর, তাঁহাদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বলিবারও নাই। কিন্তু ধীরের ধারে-ধারে অনেক অধীরও থাকেন। কেবল ঐটুকু বলিলে তাঁহাদের নিকট কাজ হয় না; তাই মনু (৫১৩৬-১৩৭), বিষ্ণু (৬০-২৫-২৬) প্রভৃতি কেহ-কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, হাত-পা প্রভৃতি কোন্-কোন্ অঙ্গে কতবার মাটি লাগাইতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ভাবে শৌচ করিলে গন্ধ ও লেপ, উভয়েরই ক্ষয় হইবেই হইবে।

যাঁহারা সমাজের কেবলমাত্র কয়েকটি শিক্ষিত-সুশিক্ষিত লোককে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহেন তাঁহারা সংক্ষিপ্ত বাক্যে মূল-তাৎপর্য্যটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কেই টানিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপ-বিস্তার উভয়রূপেই বলিতে হইবে। তাই প্রাতিমোক্ষের শৈক্ষ্য ধর্ম্মগুলির মধ্যে যখন নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নয়নগোচর হয় (৪৯-৫৪) তখন হাস্য বা উপহাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না:—

"জিহ্বা বাহির করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

চপ্-চপ্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সুর্-সুর্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পাত্র চাটিয়া চাটিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ওষ্ঠ চাটিয়া চাটিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

বুদ্ধদেব আনন্দ-সারিপুত্রের ন্যায় বিজ্ঞ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্ত নিয়ম করেন নাই। যে সমস্ত ভিক্ষু নিতান্ত জড়বুদ্ধি, তাহা-দিগকেই তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন। তাই ইহাদের সার্থকতা আছে, এবং সেই

জন্যই ইহা উপহাসের বিষয় নহে। আবার এই বিষয়টিই যত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, তাহা বেদপন্থীর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আবার তাহা সবিস্তরেও বলা হইয়াছে। ||

আমার এক বৌদ্ধ বন্ধু ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষের, পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলি উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন $—"সেই সময়ের লোকগুলি বড়ই অসভ্য ছিল, তাহা না হইলে ঐরূপ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়!" ঠিক জানিনা, তিনি কি ভাবে এইমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি সঙ্ঘের অবস্থা মনে করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে একথা প্রকাশ করিতেন না। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, সঙ্ঘে উপযুক্ত-অনপযুক্ত সকলেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। অশিক্ষিত বা নীচ শ্রেণীর লোকেরা সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ-নিজ অভ্যস্ত আচারই অনুসরণ করিত। নীচ ও অশিক্ষিত এবং উচ্চ ও শিক্ষিত ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্রই এই পার্থক্য দেখা যায়। এবং প্রত্যেক দেশেই এই দুইশ্রেণীর লোক থাকে। ইহাতে সমস্ত লোককেই অসভ্য বলা সঙ্গত হয় না। বুদ্ধদেবও ঐ নিয়ম-গুলি সঙ্ঘের সমস্ত লোকের উদ্দেশ্যে বলেন নাই, যাহারা নিতান্ত জড়বুদ্ধি বা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয় উক্ত হইয়াছিল।

বুদ্ধের পূর্ব্বে বেদপন্থীরা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর দল বা সঙ্ঘ সৃষ্টি করেন নাই। তাই বেদপন্থী সন্ন্যাসীর সহিত সমাজের সম্বন্ধ বড় কম ছিল, সমাজের অপেক্ষা সে খুব কমই রাখিত। সমাজের নিন্দা-প্রশংসায় তাহার কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু বুদ্ধদেব দল বাঁধিয়া ছিলেন। গৃহস্থদের যেমন একটা দল ছিল, ভিক্ষুদেরও তেমনি একটা দল হইল। ক্রমশ ভিক্ষু-দলের সহিত গৃহস্থদলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। গৃহস্থদলের বিনা অপেক্ষায় ভিক্ষুদলের চলিবারই উপায় থাকিল না। বিহার, তদুপযুক্ত আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী ও ভিক্ষা প্রভৃতির জন্য ভিক্ষুদলকে সর্ব্বপ্রকারে উপাসকগণের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাই উপাসকদের নিন্দা-প্রশংসার ভিক্ষু সঙ্ঘের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত। বুদ্ধদেব লোকোক্তিকে —লোকাচারকে মানিতে বাধ্য হইতেন। লোককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্ঘের নানা নিয়ম করিতে হইত, নানা নিয়ম বদলাইতে হইত। বিনয়পিটক আগাগোড়া এই কথাই প্রকাশ করিতেছে। বুদ্ধদেব একদিন ধর্ম্মোপদেশ করিতে-করিতে হাঁচিয়া উঠেন। ভিক্ষুগণ সকলেই "জীবতু ভগবা!" "জীবতু সুগত!" ("ভগবান্ বাঁচিয়া থাকুন!" "সুগত বাঁচিয়া থাকুন!") + —বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায় ধর্ম্মোপদেশের ব্যাঘাত হয়।

|| "বাগ্‌যতস্তৃপ্যন্নলোলুপমানঃ"—গৌতম, ১·৩·৪৭; "নচ মুখশব্দং কুর্য্যাৎ"—আপস্তম্ব, ২·১৯·১০।

$ দ্রষ্টব্য—পরাশরসংহিতা, মাধবাচার্য্য-ভাষ্য (Bombay Sanskrit Series) Vol I. Part I. P. 423. (১·৫৯)

+ কেহ হাঁচিলে নিকটস্থ লোককে "জীব" বলিতে হয়, এবং প্রত্যুত্তররূপে ঐ ব্যক্তিকেও তাহা বলিতে হয়। ঐ সম্বন্ধে আমার "হাঁচির কথা"—নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৪) বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"ভিক্ষুগণ, 'জীব' বলিলে তজ্জন্য কেহ কি বাঁচে না মরে?" "না ভগবন্, কেহ বাঁচেও না মরেও না।" "তাহা হইলে ভিক্ষুগণ কেহ হাঁচিলে 'জীব' বলিও না। যে বলিবে, তাহার দুষ্কৃত হইবে।" ইহার কিয়দ্দিন পরে কোনো-কোনো ভিক্ষু হাঁচিলে গৃহীরা "জীব" বলিত, কিন্তু ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তররূপে আর "জীব" বলিত না। গৃহীরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে অবজ্ঞা ও নিন্দা করিতে লাগিল। ("মনুস্সা উজ্ঝায়ন্তি, খীয়ন্তি, বিপাচেন্তি")। ভগবান্ শুনিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ গৃহীরা মঙ্গল চায়। হাঁচিলে তাহারা যদি তোমাদিগকে 'জীবথ' বলে, তবে তোমরাও তাহাদিগকে 'চিরংজীব' বলিবে। (চুল্ল ৫—৩৩—৩)।

এক সময়ে কোন স্ত্রী প্রসবের পর ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মুখে একখানি কাপড় পাতিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে প্রার্থনা করেন। ভিক্ষুরা খারাপ মনে ভাবিয়া তাহা করিলেন না। স্ত্রীলোকটি ভিক্ষুগণকে অবজ্ঞা ও নিন্দা করিয়া নিজে-নিজে বকিতে লাগিল। ভিক্ষুরা তাহা শুনিতে পাইয়া ভগবান্‌কে নিবেদন করায় ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গল চায়। অতএব তাহারা যদি প্রার্থনা করে, তবে ঐরূপ কাপড়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি।" ঐ ৫ ২১·৪।×

ভিক্ষুণীগণের নিকট প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিবার জন্য বুদ্ধদেব প্রথমে ভিক্ষুগণকেই নির্দ্দিষ্ট করেন। তদনুসারে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীগণের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে চারিদিকের মানুষেরা নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল যে, ঐ ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের উপপত্নী, এবং ইহারা তাহাদের উপপতি। ভগবান্ ইহা শুনিতে পাইয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, ভিক্ষুরা আর ভিক্ষুণীদের প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার দুষ্কৃত হইবে। চুল্ল, ১০·৬·১।

মনুষ্যেরা এইরূপ অবজ্ঞা ও নিন্দা করিতেছে, এবং বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া-শুনিয়া নূতন-নূতন নিয়ম করিতেছেন, বা পূর্ব্বের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেছেন; এইরূপ দৃষ্টান্ত বিনয়ের সর্ব্বত্রই শত-শত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই কথাই প্রকাশ পাইতেছে যে, বুদ্ধদেব লোকাচারকে—ইহা ভালই হউক, মন্দই হউক, অথবা তাহাতে যুক্তি থাকুক আর না-ই থাকুক, একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ইনি এই

× অশোকেরও ইহাই অনুশাসন (শিলালেখ, ৯—Rock Edict, 9)—"লোকে অনেক রকমের মঙ্গল করে; পীড়ার সময়, পুত্রের বিবাহে, কন্যার বিবাহে, সন্তানের জন্মে, প্রবাস-গমনে, এবং এতাদৃশ অপর স্থানে লোক বহু মঙ্গল করে। শিশুর জননীরা ক্ষুদ্র ও নিরর্থক এবং বহুবিধ ও বহু মঙ্গল অনুষ্ঠান করেন। এই মঙ্গল কর্ত্তব্যই, কিন্তু ইহার ফল অল্প ("সে কটবিযচেব খো মংগলে অপফলে তু খো এসে")।

লোকাচারকে মানিয়াই নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। লোকহিতৈষীর এই পথই প্রশস্ত। বুদ্ধদেব কি এই কথাটা মনে করেন নাই যে, আসল তত্ত্বটা পাইলে অসার আচারগুলি আপনা-আপনিই চলিয়া যাইবে, বা থাকিলেও তাহাতে কোন বন্ধন আনিবে না? তিনি কি ইহাই ভাবেন নাই যে, এই সকল আচার থাকিলেও যথার্থ তত্ত্বগ্রহণে বাধা হয় না? যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে তিনি ঐ সব আচার স্বীকার করিয়াই কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন?

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

একটি নূতন আবিষ্কার

(প্রাণিতত্ত্ব)

এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ নীরবে গবেষণা করিয়া যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন আমরা তাহার খবর রাখি না। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক পাঠক, সেই সকল আবিষ্কারের বিবরণ বুঝিতে পারেন না, এ কথা বলা যায় না। পরিভাষার আবরণে ঢাকিয়া আবিষ্কারকগণ সেগুলিকে বিশেষজ্ঞ-সম্প্রদায়ের সম্মুখে এ-প্রকার ভাবে উপস্থিত করেন যে, শিক্ষিত সাধারণ-লোক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। পরিভাষার আতঙ্ক অতি ভয়ানক; বিজ্ঞানের জন্য যদি একটি সাধারণ ভাষা থাকিত, তাহা হইলে কষ্টে তাহা আয়ত্ত করা যাইত —কিন্তু তাহা নাই। কাজেই আবিষ্কারক-গণ নিজেদের দেশীয় ভাষায় পরিভাষার গঠন করেন এবং তাহা বিদেশীর নিকটে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। এই প্রকারে লাটিন্ জর্ম্মান্ ফরাসী ও রসিয়ান্ প্রভৃতি বিচিত্র ভাষার এত পরিভাষা বিজ্ঞানে প্রবেশ করিয়াছে যে, সেগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়া শাস্ত্রালোচনায় অবৈজ্ঞানিক জনের মোটেই প্রবৃত্তি হয় না। কাব্য ও ইতিহাস প্রভৃতির পাঠক-সংখ্যার তুলনায় বোধ হয় এই কারণেই বিজ্ঞানের পাঠক-সংখ্যা কম। বিষয়ের গুরুত্ব ও জটিলতা বিজ্ঞানের আলোচনায় বাধা দিতে পারে না।

প্রাণিতত্ত্বে সম্প্রতি Anaphylaxis নামে একটা বিকট পারিভাষিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য পরিভাষাটি দ্বারা বিষয়টির কথা মোটেই বুঝা যায় না; কিন্তু যে ব্যাপারটিকে anaphylaxis বলা হইয়াছে, তাহা মোটামুটি বুঝা কঠিন নয়। আমরা এই ব্যাপারটিরই একটু পরিচয় দিব।

বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রাণীর জীবন-

ক্রিয়ার কয়েকটি স্থূল কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। পাঠক অবশ্যই জানেন, বসন্ত প্রভৃতি কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধিতে একবার ভুগিলে, সেই সকল পীড়ায় আবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। শারীরবিদ্‌গণ এই ব্যাপারের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পীড়া হইলে কেবল ডাক্তার-মহাশয়ই ঔষধ সেবন করাইয়া আমাদিগকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করেন না; পীড়ার বিষকে নষ্ট করিয়া সুস্থ হইবার জন্য দেহেরও একটা স্বাভাবিক চেষ্টা হয়। বাহির হইতে দেহে পীড়ার বীজ প্রবেশ করিলে, ঐ চেষ্টার ফলে আপনা হইতেই শরীরে বিষঘ্ন (Anti-toxin) পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহার সহিত পীড়ার বিষের ঘোর সংগ্রাম চলে। সংগ্রামে বিষঘ্ন পদার্থ জয়ী হইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে, নচেৎ তাহার মৃত্যু হয়। শারীরবিদ্‌গণ বলেন, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে দেহে যে বিষঘ্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়, রোগী সুস্থ হইলে তাহার জের কিছুকাল দেহে থাকিয়া যায়। ইহাই ঐ সকল ব্যাধির পুনরাক্রমণ হইতে প্রাণীদিগকে কিছুদিনের জন্য রক্ষা করে। এই জন্যই একবার বসন্ত হইলে, আবার শীঘ্র বসন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যখন গো-বীজের টিকা লইয়া বসন্তের আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তখনও প্রকারান্তরে দেহে বিষঘ্ন পদার্থের উৎপাদন করা হইয়া থাকে। গো-বীজ দেহস্থ হইয়া অতি মৃদু-রকমের বসন্তের উৎপত্তি করে; আমরা তাহা বুঝিতে পারি না সত্য, কিন্তু পীড়ার কার্য্য অজ্ঞাতসারে দেহের ভিতরে চলিতে থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুস্থ ও সবল দেহে পীড়ার একটুও লক্ষণ দেখা দিলে, দেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কাজেই গো-বীজ দ্বারা দেহের ভিতরে ভিতরে বসন্তের আভাস দেখা দিলে, দেহে স্বতঃই বিষঘ্ন পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং ইহাই শরীরে থাকিয়া বসন্তের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

শরীর-তত্ত্বের আর-একটি সুপরিচিত ব্যাপারের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষমাত্রেই প্রাণীর অনিষ্ট করে; কিন্তু কতকগুলি বিষের মাত্রা যদি অল্পে অল্পে বাড়াইয়া দেহস্থ করা যায়, তবে তাহাতে দেহের অনিষ্ট হয় না। আফিঙ্‌ ভয়ানক বিষ—অত্যল্প পরিমাণে দেহস্থ হইলেই তাহাতে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অহিফেন-সেবীরা ধীরে ধীরে আফিঙের মাত্রা বাড়াইয়া, তাহা এমন অধিক করিয়া ফেলে যে, তাহাদের প্রতিদিনের সেবনীয় আফিঙে হয়ত দশ জন লোকের মৃত্যু হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ডি কুইন্সি সাহেব ঘোর অহিফেনসেবী ছিলেন। মালয়-দেশের এক আফিঙ-খোরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; লোকটি প্রতিদিন এত আফিঙ্‌ ব্যবহার করিত যে, তাহা দিয়া অন্ততঃ ছয়দল সেনা ও তাহাদের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করা যাইত। এক সময়ে ডি কুইন্সি নিজেই প্রতিদিন আট হাজার ফোটা লডেনম্‌ (Laudanum) ব্যবহার করিতেন। লডেনম্‌ কয়েক ফোঁটামাত্র সুস্থ মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইলেই, মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কেবল অল্পে

অল্পে মাত্রা বাড়াইয়া ডি কুইন্সি ঐ মারাত্মক বিষ হজম করিতেন।

অধিক দিন নয়,—বোধ হয় দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে বিষ-সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই সকলই জানা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রিচেট্ (Charles Richet) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রাণিদেহে বিষের ক্রিয়া-সম্বন্ধে নূতন করিয়া গবেষণা করিতেছিলেন। ইহাতে কতকগুলি বিষে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগুলি সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু কতকগুলিতে উহারি ঠিক্ বিপরীত ধর্ম্ম দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কয়েক জাতীয় বিষ একবার দেহস্থ করাইয়া, পরে তাহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় সেই বিষ প্রয়োগ করিলে, উহার ক্রিয়া এত প্রবলভাবে চলিতে থাকে যে, তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রোগের বিষ বা অপর কোন বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহা বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন করে ও ভবিষ্যতে তাহাই সেই বিষের অপকারিতা নিবারণ করে বলিয়া যে কথাটা আমাদের জানা আছে, তাহা সত্য হইলেও সকল বিষের কার্য্যে খাটে না। এমন বিষ অনেক আছে, যাহা একবার দেহস্থ হইলে, দেহ এ-প্রকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে, তখন সেই বিষ অত্যল্প পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে মহা বিপদের সূচনা করে। ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া আফিঙের ন্যায় বিষকে যেমন সহাইয়া লওয়া যায়, এই সকল বিষে তাহা করা যায় না। অধ্যাপক রিচেট্ সাহেব গত ১৯০২ অব্দে এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকেই Anaphylaxis নাম দিয়াছেন।

দুই-একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইবে। অনেক পুরুভুজ-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর শুঁয়োতে এক-প্রকার বিষ থাকে। রিচেট্ সাহেব এই বিষ সংগ্রহ করিয়া তাহা অল্প পরিমাণে কয়েকটি কুকুরের দেহে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরিমাণে অত্যন্ত অধিক না হইলে এইপ্রকার বিষে কুকুরের ন্যায় বৃহৎ প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না; এই পরীক্ষায় একটিও কুকুরের মৃত্যু হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে রিচেট্ সাহেব আবার সেই বিষই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণে প্রত্যেক কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। এবারে কুকুরগুলি সুস্থ থাকিতে পারে নাই; পূর্ব্বের মাত্রার কুড়ি ভাগের এক ভাগেই সকলের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, এই বিষ বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন করিয়া বা শরীরের সহ্য করিবার শক্তিবৃদ্ধি করিয়া, প্রাণীকে নিরাপদে রাখে না; বরং তাহা শরীরের এমন-কোনো পরিবর্ত্তন করে, যাহাতে সেই বিষেরই কণামাত্র পরে দেহে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

রিচেট্ সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—তাঁহারা ইতর প্রাণীর দেহে নানা পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়া সেগুলির কার্য্য-পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আরো অদ্ভুত। যে সকল বস্তুকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বিষ

বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এই পরীক্ষায় তাহাদেরি অনেকগুলির কার্য্যে বিষের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে।

সুস্থ প্রাণীর রক্তে যে বিষ আছে, তাহা কয়েকবৎসর পূর্ব্বেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের জানা ছিল না। কিন্তু রিচেট্ সাহেব সম্প্রতি তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ঘোড়ার রক্তের স্বচ্ছ তরল অংশ (Serum) কয়েকটি খরগোসের দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে একটি খরগোসও অসুস্থ হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিন পরে ঐ ঘোড়ার রক্তই অল্পমাত্রায় দেহে প্রয়োগ করায় প্রত্যেকটিরই মৃত্যু হইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য্য সুরু করে।

বসন্তের টিকা দিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকা যায়, ইহা ওলাউঠা ও প্লেগের আক্রমণ নিবারণ করে না। সেইপ্রকার ঘোড়ার রক্তে যে সকল খরগোসের দেহ বিকৃত হইয়া থাকে, তাহাদের দেহে অপর বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত প্রবেশ করাইলে অনিষ্ট হয় না, কেবল ঘোড়ার রক্তই অত্যল্প পরিমাণে দেহস্থ হইলে খরগোসের মৃত্যু হয়।

সংসারে নিয়তই নরহত্যা মারপিট্ চলিতেছে। অপরাধীর বস্ত্রে রক্তের চিহ্ন পাইলে তাহা মানুষের রক্ত কিনা নির্ণয় করার প্রায়ই প্রয়োজন হয়। এই কারণে রক্ত-পরীক্ষা আজকাল আইন-আদালতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু রক্ত-চিহ্নের মধ্যে কোন্‌টি মানুষের রক্ত, তাহা রসায়ন-বিদ্‌গণ নানা প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করিতে পারেন, কিন্তু রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা এখন রক্ত-পরীক্ষার যে উপায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর।

মনে করা যাউক, কোনোস্থানে খুন হইয়া গিয়াছে ও সন্দেহসূত্রে একজনকে খুনী বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাহার কাপড়ে যে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু অপরাধী বলিতেছে, তাহার কাপড়ের রক্ত মানুষের নয়—ছাগলের। কাজেই দণ্ড-বিধানের পূর্ব্বে, কাপড়ের রক্ত মানুষের কি ছাগলের নির্ণয় করা প্রয়োজন। রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কৃত প্রথায় এই কাজটি অতি সহজে করা হয়। পরীক্ষাশালায় সকল সময়েই অনেকগুলি গিনি-পিগ্ রাখা হয় এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে ছাগল কুকুর মানুষ ঘোড়া শূকর প্রভৃতি নানা প্রাণীর রক্তে টিকা দেওয়া হয়। কোন্‌টির দেহে কোন্ প্রাণীর রক্ত মিশ্রিত আছে, তাহা পরীক্ষকের জানা থাকে। এখন পরীক্ষার জন্য কোনো রক্ত পাইলেই, তাহা জলে মিশাইয়া প্রত্যেক গিনি-পিগের দেহে প্রবেশ করানো হয়। যদি উহা প্রকৃতই মনুষ্য-রক্ত হয়, তবে যে গিনি-পিগ্‌টিকে পূর্ব্বে মনুষ্য-রক্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে, কেবল সেইটিই অসুস্থ হইয়া পড়ে ও শেষে মরিয়া যায়; ঘোড়া ছাগল কুকুর প্রভৃতির রক্তযুক্ত গিনি-পিগ্ ইহাতে একটুও অসুস্থ হয় না। রক্ত-পরীক্ষার এমন সহজ প্রথা বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে জানিতেন না। বলা বাহুল্য, এই প্রথায় কেবল মানুষের রক্তই

চিনিয়া লওয়া যায় না,—যে-কোনো রক্ত পরীক্ষার জন্য আনিলে, তাহা কোন্ প্রাণীর রক্ত অনায়াসে স্থির করা যায়।

রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কার প্রাণিতত্ত্বের নানা অংশে নূতন আলোকপাত করিতেছে এবং বিষয়টি লইয়া এখনো অনেক পরীক্ষা চলিতেছে। বিষের প্রয়োগে প্রাণীর দেহ কি-প্রকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়; কতক বিষ দেহ কেন সহ্য করিতে পারে এবং কতকগুলি মৃদু বিষে কেন প্রাণীর মৃত্যু ঘটে,—এই সকল জটিল ব্যাপারেরও কারণ ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে সকল বিষয়ের আলোচনা এ-প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমাদের আহার-সম্বন্ধে যে একটি নূতন কথা এই আবিষ্কার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারি পরিচয় প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কতকগুলি প্রাণিজ ও উদ্ভিজ বস্তু আমাদের খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেশ কাল আচার ও ধর্ম্মের বিধান মানিয়া আমরা সেইগুলির মধ্য হইতে খাদ্য মনোনীত করিয়া লই। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়, যে খাদ্যটি আমার উপকারী তাহা আমার বন্ধুর উপকারী নয়। এ প্রকার লোক অনেক আছে, যাহারা ডিম্ব মাংস বা দুগ্ধ আহার করিতে পারে না। রুচির পার্থক্যে যে এ-প্রকার হয়, তাহা নয়। অজ্ঞাতসারে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ডিম্ব ও মাংসাদি আহার করাইলেও, তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাদের পাকাশয়ে ঐ-সকল বস্তু বিষের ন্যায় কার্য্য করে। রিচেট্ সাহেবের আবিষ্কারে, এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একবার বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত দেহস্থ করিয়া গিনি-পিগ্ যেমন সেই রক্ত আর অত্যল্প পরি-পরিমাণেও দেহে ধারণ করিতে পারে না, —সেইপ্রকারে একবার ডিম্ব আহার করিয়া ঐ লোকগুলি তাহার এককণাও আর নিরাপদে আহার করিতে পারে না। প্রথম ডিম্ব-আহারের পর, তাহাদের দেহে এ-প্রকার কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয় যে, দ্বিতীয়বার অত্যল্প পরিমাণ ডিম্ব উদরসাৎ হইলে, দেহে বিষের কার্য্য সুরু হইয়া পড়ে। রক্তের বীজে টিকা লইয়া গিনি-পিগ্ প্রথমে সুস্থ থাকে এবং পরে সেই রক্তেরই অত্যল্প সংস্পর্শে বিষের প্রভাবে মারা যায়। এই ব্যাপারটাও অবিকল সেইরূপ। মাংস আকণ্ঠ আহার করিতে পারে, কিন্তু এক টুক্‌রা মৎস্য খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়ে, এ-প্রকার অদ্ভুত প্রকৃতিরও অনেক লোক দেখা যায়। ইহাকেও Anaphylaxisএর কোঠায় ফেলিতে পারা যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়
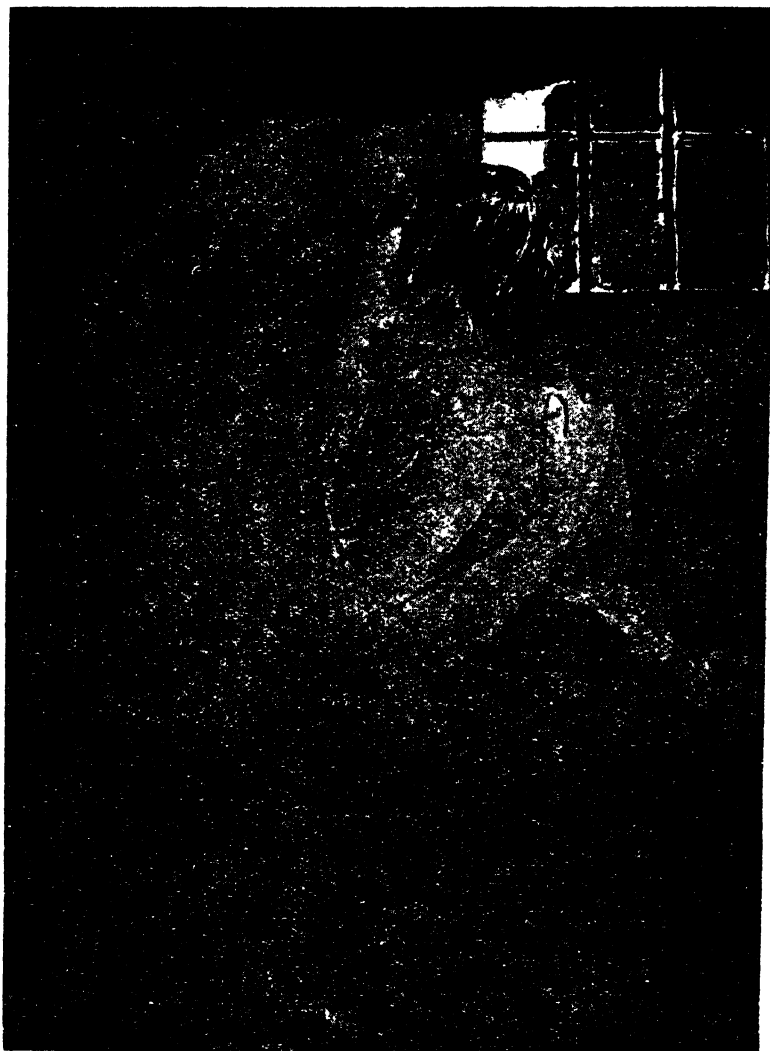
ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা॥

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্র হইতে

স্বেচ্ছাচারী

১

শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজার মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি ওরফে মণিশঙ্কর অধুনা ম্যানেজার সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিল। নিকটেই আন্‌লায় তাহার র‍্যাংকেনের বাড়ির কোটটি ঝুলিতেছিল। মণিশঙ্কর পেণ্টালুন, সার্ট এবং তদুপরি ওয়েষ্ট কোট-সমন্বিত অবস্থায় বসিয়া কাজ করিতেছিল। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, ঘোড়া তৈয়ার।" হুজুর লেখা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "রাইডিং কোট ও জুতি লেয়াও, আউর দেখো, সর্ব্ববাবু আয়েহেঁ কেয়া নেহি।" বেয়ারা ম্যানেজার সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার প্রকাণ্ড জুতা, চাবুক ও কোট সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত একটা ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে আনিয়া ইজি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর, বাবু সাহেব আয়ে হেঁ।"

সর্ব্বানন্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "Oh, Sarba Babu, you are so late, আমায় এখুনি যেতে হচ্ছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঃ, কাল রাত্রে কথা হল খাওয়া-দাওয়ার পর গেলেই বেশ হবে, এর মধ্যেই মত বদলালে?"

মণি বলিল, "সাহেব-সুবোর কাণ্ড কিছুই বোঝবার জো নেই। এই দেখ, এখুনি একটা চিঠি পেলুম যে ম্যাজিষ্ট্রেট না কি স্বয়ং কাকেও কিছু না জানিয়ে আজ বিকেলে চারটের সময় কমবকৎপুরে আসবে। নায়েব লিখছে যে আগে থেকে তৈরী না থাকলে গোলে পড়তে হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হলে আর আমার গিয়ে কি হবে? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি নিজে মিটিয়ে দিতে আসে, তাহলে ত ভালই হবে। তুমি বলছ, প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না, অথচ তারা মিছিমিছি খাজনা বন্ধ করেছে। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত ব্যস্ত হবার ত কোন দরকার নেই।"

মণি কহিল, "Oh silly! তুমি বুঝতে পারছ না যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য কেউ না থাকলে they will make a mess of everything. আমাদের একজনকে উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রজাদের সঙ্গে কতকগুলা rogues যোগ দিয়েছে, আর তারাই চেষ্টা করে প্রজাদের সরকারের কাছ থেকে agricultural loan নিইয়ে-দিয়েছে। সেই জোরেই ত বেটারা লড়ছে, নাহলে কোন্ দিন সব শাসিত হয়ে যেত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাহলে আজ আর আমি যাচ্ছি নে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট এসে মেটাতে

না পারে তা হলে নয় আর একদিন যাওয়া যাবে।”

মণি বলিল, “তা বেশ, আমি তাহলে চল্‌লুম। তুমি বাবুকে আমার কথা জানিয়ে বলো যে আমি সব ঠিক করে দেব।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “কিন্তু সাহেব, কোন রকম under-hand practice চালিয়ো না।”

মণি কহিল, “Oh, everything is fair in love and war.”

সর্ব্বানন্দ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। মণিশঙ্করও মুহূর্ত্তমধ্যে চাবুক-হস্তে বাহির হইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকট যাইতেছিল, এমন সময় কার্ত্তিকের শিশুপুত্র দেবীপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার ভৃত্যের কোল হইতে হাত বাড়াইয়া “জ্যাতা যাব, জ্যাতা যাব” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। জ্যাঠা মহাশয় তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, “দেবু তোর বাবাকে আজ যে টেনে বাইরে আনিস নি?” দেবু সজোরে তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, “বাবা যাব না, বেলাতে যাব।”

—“চল্ তোর বাবাকেও ধরে আনি।”

—“না, বাবা কাঁদবে, আছবে না।”

—“তুমি ডাকলে আসবে, লক্ষ্মী বাবা আমার, চল।”

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহির করিবার কোন উপায় না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সহসা একদিন দেবীপ্রসাদকে কোলে লইয়া কার্ত্তিকের অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, “ও কি, ও কি, ওকে এ ঘরে কেন? সব্বদা, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে এ ঘরে এনো না। আর-সব অত্যাচার সইব, কিন্তু ওকে এ ঘরে আনলে সইতে পারব না।” কার্ত্তিক তাহার গৃহের সকলকেই বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল যেন ঐ ঘরে দেবুকে না প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বাহিরে আনিবার এই এক উপায় খুঁজিয়া পাইয়া আজকাল প্রত্যহই দেবুকে লইয়া সকালে-বৈকালে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। পুত্র তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ কাঁচের eye-preserver চক্ষে দিয়া বসে।

সর্ব্বানন্দ দেবুকে লইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি গবাক্ষাদি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, “সব্বদা, কেমন জব্দ, দেবু কেমন তোমায় বেঁধেছে!”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “দেবু ত' বাঁধেনি ভাই, বেঁধেছ তুমি। আর কেন কার্ত্তিক? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। তুমি যদি একটু মনের জোর কর, তাহলেই তোমার এ মানসিক রোগ, স্বকৃত উপসর্গ ঝরে পড়ে যাবে। দেবু, তোর বাবার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চল্ ত বাবা।”

দেবু বিনাবাক্যব্যয়ে পিতার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিকও কাঁচ-পোকায় ধরা তেলাপোকার মত কাঁপিতে

কাঁপিতে বাহিরে চলিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের অন্য হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, আজ তোমায় নিজের শক্তিতে চলতেই হবে, ছেলেকেও রাস্তার কাঁটা-খোঁচা খানাডোবা থেকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমায় আজ একটুও সাহায্য করব না।" কার্ত্তিক কাতরভাবে বলিল, "পড়ে যাব, সব্বদা, ধর। দেবু, বাবা আমার, একটু আস্তে চল।" সর্ব্বানন্দ স্বয়ং দেবুর হাত ধরিয়া বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক তখন অগত্যা পুত্রের হাত ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং চোখের ঠুলি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দেবু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "জ্যাতা, বাবা কাঁদছে।"

সর্ব্বানন্দ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল, "চোখ চেয়ে ফ্যালো কার্ত্তিক, মোহ কেটে যাক, স্বপ্ন দূর হোক। এমন সুন্দর সকাল, আর তুমি ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকবে?"

কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে কাতরভাবে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বাবা দেবু, তোর হাত দুটো দে, নইলে—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "নইলে কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারে ডুবে মরি যে!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বাঁচতে চাও? আলো চাও?"

কার্ত্তিক কহিল, "বাঁচতে চাইনে? আলোর জন্য আমি যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবে আলোকে ভয় কর কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানিনে সব্বদা। এতদিন প্রাণপণে আঁধারকে চেপেছিলুম কিন্তু যেই অন্ধকার আমার উপর নেমে আসতে আরম্ভ করেছে, অমনি বুঝতে পেরেছি কি অমূল্য বস্তু আমি হারাতে বসেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অন্ধকারের আত্মা, দুর্লভের শক্তি আমায় অভিভূত করে ফেলেছে; এখন যতই তার কাছ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি, ততই সে আমায় চেপে ধরছে। যা কখনও পাওয়া যায় না, যে মূর্খ তাকেই দুঃসাহসিকের মত প্রাণপণে চায়, তারই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা হয়। যা অপ্রাপ্য, তাকেই চাইতুম, তাই সে অপ্রাপ্য নিজে না ধরা দিয়ে তার সঙ্গী চির-অন্ধকারকে আজ প্রেতের মত আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আর উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কি যে অপ্রাপ্য, তা ত বুঝতে পারছিনে। সেই বহুদিন পূর্ব্বে যে অন্ধ-রমণীর অন্ধ নয়নের আঘাতে মূর্খ তুমি অভিভূত হয়েছিলে, সে আজও তোমার জন্য তেমনিভাবে বসে আছে। সে তোমায় বুঝতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আজও সেই অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। কাল ঠাকুরদার চিঠি পেয়েছি যে তোমার এই অবস্থার কথা শুনে সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল। তবে সংসারে অপ্রাপ্য কি? সুখ বল, শান্তি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, ধর্ম্ম বল, সব ত ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। ভগবান সমস্তই সুলভ করে রেখেছেন, কেবল একটু চেষ্টা করে তা নিতে হবে। তবে যদি কেউ ইচ্ছে করে কিছু না

নিতে চায়, ইচ্ছে করে দরিদ্র হয়ে ভিখারী হয়ে থাকতে চায়, তার দেহি-দেহি রব চিরকালই থাকবে। ওঠো কার্ত্তিক, উঠে তুমি সবলে বল, আমি রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান, আমি ভিখারী নই, তাহলেই দেখবে, তোমার কিছুই অপ্রাপ্য নেই, সবই পূর্ণ ভাবে তোমার ভাণ্ডারে বিরাজ করছে। ওঠো ভাই, ওঠো, কথা শোনো।"

কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দর হাত ধরিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নয়, বলছ, কিন্তু এই দেখ, তোমায় এত কাছে পেয়েও কৈ, পাচ্ছি না ত! তোমার-আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা মৃত্যুর মত অন্ধকারের ব্যবধান এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমায় হারিয়ে দিয়ে, তোমায় টেনে এনেছি, তবু তোমায় পাচ্ছি না। যদি কোন দিন সেই অপ্রাপ্যকে এমনি করে টেনে আনতে পারি, সেইদিনই বোধ হয় এই মায়ার ঘোর কেটে যাবে। যেদিন দেখব যে সেই আকাঙ্ক্ষার ধন, না-পাওয়ার-বস্তু আমার দুয়ারে ভিখারী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেইদিন বোধ হয় আবার সুস্থ হব। নইলে আর আমার উপায় নেই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু তুমি যে বিবাহিত! এখন কোন্ সাহসে আবার তাকে তোমার কাছে টেনে আনতে চাইছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "যে রোগী, যে canine appetiteএ ভুগছে, তার খাদ্যাখাদ্য-বিচার থাকে কখনো?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি ঠিক বলছ যে যদি সে তোমায় এসে বলে যে, তোমায় সে চায়, তাহলেই তোমার এ রোগ সেরে যাবে?"

—"ঠিক কি করে বলি? এখন ত' আর আমি আমার অধীন নই; এখন আমায় ভূতে পেয়েছে। তবে এই রোগের কারণ যখন সে-ই, তখন সে আমার কাছে এসে তোমার মত পরাজয় স্বীকার করলে হয়তো আবার আমি সুস্থ হতে পারি।"

—"তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তাকে যেমন করে পারি তোমার পায়ের কাছে এনে ফেলে দেব! কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে অন্ধ বলে তাকে নিয়ে তুমি খেলা করতে পাবে না।"

—"খেলা! যে আমায় এমন করে খেলাচ্ছে, তার সঙ্গে আমি কোন্ সাহসে খেলা করব! তার পক্ষে যা খেলা আমার পক্ষে যে তা মৃত্যুর লীলা!"

—"কথার মার-পেঁচ ছেড়ে সোজা কথায় বল যে তাকে 'যদি তোমার কাছে আনি, তুমি তাকে বিয়ে করবে?"

—"বিয়ে? কি সর্ব্বনাশ! যা একেবারে না-পাওয়ার ধন, তাকে একেবারে ধূলোমাটির মধ্যে টেনে আনব? তা পারব না। বিশেষ শৈলকে আমি অত কষ্ট দেব কি করে? সে যে তাহলে মরে যাবে। না সব্ব দা, শৈলই আমার পথের আলো, শৈলই আমার পাওয়ার ধন, আমি তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সে কষ্ট দি, তাহলে আমায় মরতে হবে। একেই ত আমায় নিয়ে সে আজীবন কষ্ট পাচ্ছে, তার উপর ও কষ্ট তাকে দিতে পারব না।"

—"এটুকু বুদ্ধি ত বেশ আছে! তাহলে তুমি তার স্বামী হয়ে সারাজীবন অন্যের উপর মন ফেলে রেখে বসে আছ কেমন করে? এতে বুঝি তার খুব সুখ হচ্ছে?"

—"তুমি জান না, সব্ব দা, তুমি আমায় কখনও বোঝোনি, আজও বুঝতে পারবে না। আমি কেন সেই অন্ধকে এমন করে প্রাণপণে চাই, জান? সে পাবার বস্তু নয় বলে;—যা পাবার বস্তু, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা' তা' আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছে, আমি শৈলকে পেয়েছি। কিন্তু চিরদিনই আমার অন্তরাত্মা যাকে-না-পাওয়া-যায়, যার অন্ধকারের মধ্যে সমস্তই দিশেহারা পথহারা হয়ে যায়, তাকেই চাচ্ছে, তার দিকেই আমার অন্তরের মানুষটীর ছুটে যাবার প্রচণ্ড চেষ্টা। এই চেষ্টার সঙ্গে শৈলর প্রতি স্নেহ বা কর্ত্তব্যের কখনও বিরোধ ঘটতে পারে না। সংসারে থেকেও যেমন মহাপুরুষেরা সেই চির-অপ্রাপ্য অনন্তশায়ী নারায়ণের দিকে তাঁদের আত্মাকে ফিরিয়ে রাখেন, আমারও যেন কতকটা সেই রকম হয়েছে। তবে তাঁরা যাকে চান, তাতে কেউ দোষ ধরতে পারে না, তাতে কোন দোষ ঘটেও না, তাই সংসার তাঁদের নিয়ে খুসী থাকে, সুখে থাকে। কিন্তু আমার প্রার্থিত বস্তু সংসারের বাইরে সমাজের বাইরে ধর্ম্মের বাইরে এমন কি মানুষেরও বাইরে, তাই সকলের সঙ্গেই আমার বিরোধ চলেছে।"

কার্ত্তিক চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "সব্ব দা, দেবু কৈ? তার আওয়াজ যে অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছিনে!" সর্ব্বানন্দ এতক্ষণ অবাক হইয়া কার্ত্তিকের কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ কার্ত্তিকের কথায় তাহার চৈতন্য হওয়ায় সে চাহিয়া দেখে, দেবু উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে নামিয়া গিয়া একেবারে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়াছে, যেখান হইতে নড়িলেই সে একেবারে গভীর জলে পড়িয়া যাইবে। তখন সে তাড়াতাড়ি কার্ত্তিকের হাত ছাড়িয়া সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া দেবু যেমন ফিরিয়া চাহিবে, অমনি সশব্দে জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। কার্ত্তিক সে শব্দে চীৎকার করিয়া যেমন নামিতে যাইবে অমনি সেও পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত পাইল। কিন্তু সর্ব্বানন্দর সেদিকে চাহিবার অবসর ছিল না; সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িয়া বালককে জল হইতে তুলিল। বালক জল হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কার্ত্তিকের শরীরে নানাস্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার কোলে দাও, সব্বদা, আমার কোলে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কোলে বালককে দিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্র সমস্তই খুলিয়া দিল। দু-এক ঢোক জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে কোথাও কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের ক্রোড় হইতে বালককে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া বলিল, "তুমি আস্তে আস্তে এস, আমি একে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাই।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমার কোলে রাখ ওকে, আমায় নিয়ে যেতে দাও।"

সর্ব্বানন্দ সে কথা শুনিল না। সে বালককে লইয়া দ্রুতগতি অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। কার্ত্তিকও একজন মালির হাত ধরিয়া আপনার কোটরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এদিকে সন্ধ্যার পর ম্যানেজার সাহেব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিল এবং সমস্ত বন্দোবস্তই এমন চমৎকার হইয়াছিল যে সাহেব আর টুঁ শব্দটী না করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজারের অদ্যকার কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ সর্ব্বানন্দ কোন গূঢ় উপায়ে অবগত হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক, এই বেলা সাবধান হও। তোমার এই ম্যানেজার কোন্‌দিন তোমায় বিষম বিপদে ফেলবে। আমার ভয় হচ্চে, কোন দিন তুমি কোন্ খুনী মকদ্দমার আসামী হয়ে না চালান যাও!"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? মণির উপর চটলে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মণি আজ কি করেছে, জান?"

—"না। সে আজ শ্রান্ত, তাই রাতে আর আসবে না। কালই সমস্ত জানতে পারব।"

—"অতক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার নেই, তুমি লোক পাঠিয়ে ওর কাছ থেকে সঠিক সংবাদ আনাও। আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে ভয়ে আমার হাতপা পেটের মধ্যে ঢোকবার মত হয়েছে।"

—"তোমার চাল-কলা-খেকো সাহস, একটুতেই তাই ভয় লাগে। জমিদারী রাখতে গেলে অনেক রকম দুঃসাহসের কাজ করতে হয়। জানই ত, None but the brave deserves the fair।"

—"অথবা তার চাইতে বল, None but the fool-hardy deserves the gaol।"

—"কি হয়েছে, বল না?"

—"কমবকৎপুরের প্রজাদের গোলমাল মিটুতে আজ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এসেছিল। তোমার ম্যানেজার নিজের লোকদের দিয়ে তাঁর পাল্কির ওপর ডাকাতি করায়, তারপর স্বয়ং অন্য লোকজন নিয়ে সেই কৃত্রিম ডাকাতদের তাড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসে বলে যে প্রজারা ঐ পাল্কিতে ম্যানেজার আছে মনে করে তাকে খুন করতে আসে। ম্যানেজার ঘাগি লোক, সে বোধ হয় সব চালাকি বুঝে গিয়েছে। এখন দেখ, তোমার ম্যানেজারের অদৃষ্টে কি হয়!"

সন্ধ্যায় কার্ত্তিকের সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ও একটি রত্ন। কালই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কিন্তু কাল যদি ও জেলে যায়?"

কার্ত্তিক কহিল, "ম্যানেজার হবার লোক জগতে আরও আছে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ?"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ ও গেলে লোকের অভাব হবে না। ওর জন্য কান্নাকাটী করব, এত বড় গাধা আমি নই।"

৮

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের পত্রে ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে শশিভূষণ বলিল, "তুমি যদি কার্ত্তিককে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়, তা হলে তোমার এ সব কাজ চালাবে কে?"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি! তুমি যা করাচ্ছ, তাই আমি করছি; এখন যদি বল যে কার্ত্তিককে ছেড়ে দাও ত আমায় তাই করতে হবে।"

শশি কহিল, "এ-সব না হয় আমার কাজ, কিন্তু সুকুকে শেখাবার ভারটী যে নিয়েছ, সেটা ত' আর আমার কাজ নয়!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সেটা তোমার কাজেরই off-shoot।"

শশি কহিল, "এই এত-বড় একটা কর্ত্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে! এর জন্য কি আর-কেউ দায়ী নয়? আমি যদি না থাকি, তা হলে কি আর-কেউ এ কাজের ভার নেবে না? এই হতভাগাকেই চির-দিন এই কর্ত্তব্যের চাকার তলে পড়ে পেষণ-যন্ত্রনা সহ্য করতে হবে!"

শশি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া শেষে দুঃখিতভাবে বলিল, "তা হলে কি করব, বল! কার্ত্তিককে এখন ত্যাগ করলে সে যে কি করে বসবে, তা কে বলতে পারে?"

শশি কহিল, "সে কি করবে না করবে, তাই কেবল ভাবছ, আমার বিষয় ত কৈ একটি বারও ভেবে দেখছ না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার বিষয় কি আবার ভাবব, ঠাকুরদা? তুমি যে সব চিন্তার বাইরে। তুমি নিজেকে যে চিরদিন পরের করে রেখেছ। তোমার নিজের জন্য যদি নিজেকে এতটুকুও রাখতে, তা হলে তোমার জন্য জগৎ-শুদ্ধ লোক চিন্তা করত। তোমার অস্তিত্বই পরের জন্যে। এই কার্ত্তিকের জন্যই তোমার কত চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা দেখেছি। যারা তোমার কেউ নয়, তারাই তোমার সব; তাইত তোমার দেখাদেখি কত লোক পরার্থপর হয়ে উঠছে। আজ যদি তুমি হঠাৎ নিজের জন্য চিন্তা সুরু কর, তা হলে যে সবই গোলমাল হয়ে যাবে!"

শশিভূষণ পদচারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া বলিল, "কি জানি সর্ব্ব, তোর সেই চিঠিটা পেয়ে পর্য্যন্ত আমার যেন সব ওলট পালট হয়ে যেতে সুরু করেছে। কার্ত্তিকের অবস্থা শুনে পর্য্যন্ত আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এত বড় আত্মপরায়ণতা! আত্মহত্যা করে আপনাকে জাহির করা! এই দৃষ্টান্তের ফল যতই unhealthy হোক এর একটা বিকট সৌন্দর্য্য আছে, এতে মদের তীব্র নেশা আছে, এর অভিভূত করবার ক্ষমতা আছে। নইলে আমার মত লোকই বা কেন আজ ক'দিন নিজের চিন্তায় ব্যস্ত হবে? আমারই বা কেন বারবার মনে হবে যে, কি করলুম আমি! কি পেলুম আমি? নিজেকে ভুলে পরের কথা ভেবে ভেবে কি আমার লাভ হল? আজ ক'দিন কেবলি মনে হচ্ছে যে, আমার অন্তরে বসে আমার ক্ষুধিত অন্তরাত্মাটা কেবলি কাঁদছে। কি যে সে পায় নি,

তা বুঝতে পারছি না, তবু এটা স্পষ্ট অনুভব হচ্চে যে সেই হতভাগা মনটা আমায় আবার ব্যস্ত করতে আরম্ভ করেছে। এখন কি দিয়ে তাকে থামাই? সে যাকে চায় বলে মনে হচ্ছে, তাকে ত আর মাথা-মুড় খুঁড়ে মরলেও ফিরিয়ে আনতে পারব না। এ কথাটা সে জানে, তবুও সে কাঁদবে! এখন এই অবুঝ প্রাণটাকে নিয়ে কি করি! যা অপ্রাপ্য, তারই জন্য এত কান্নাকাটী কেন? যা পেয়েছিস, তাই নিয়ে খুসি থাক্ না বাপু!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঠাকুরদা, ঐ দেখ, তুমিও কার্ত্তিকের মত সুরু করলে। কার্ত্তিকও যে ঐ কথা বলে।"

শশি কহিল, "পাব না জেনেই মানুষ কাঁদে। পাব জানলে হয় ত কাঁদত না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিথ্যে কথা! আকাশ-কুসুমও কেউ চায়! সোনার পাথরের বাটীর জন্য কান্নাকাটী কখনও কারও শুনেছ! মনে মনে মানুষ ঠিক জানে যে যা চাচ্ছি, তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, যা চাচ্ছি তা অপ্রাপ্য নয়, তাই মানুষ প্রার্থিত বস্তুর জন্য আদুরে ছেলের মত আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে, যেন ভগবানের আর কোন কাজ নেই, সেই হত-ভাগাটার আব্দার রাখাই একমাত্র কাজ! ছি শশিদা, তোমার মুখে আজ এই অনার্য্য দুষ্ট কথা শুনে আমার ভারি রাগ হচ্ছে। আমার মনে হয়, যে-মানুষের চঞ্চল প্রকৃতি, যে অস্থির চিত্তের লোক, সে সুখেও অসুখী, দুঃখেও অসুখী। সে যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তখন মন্দ অবস্থা পাবার জন্য সে মিছিমিছি কাঁদতে সুরু করে; সুখ যেন তার সইছে না, এইভাবে কাঁদতে সুরু করে। আর যে বাস্তবিক দুঃখী, তার ত কান্নাকাটির আর সীমা থাকে না। আসল কথা হচ্চে, মনের সাম্যাবস্থা, শান্তভাবটী হারালে মানুষের সব-চাইতে দুরবস্থা হয়। তোমায় আর কি বলব, ঠাকুর্দা, গীতার ভাষায় বলি, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ।"

শশি তাহার দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমিও অর্জ্জুন নই, তুমিও শ্রীভগবান নও; অতএব এই মশা মারতে গীতা-গদাঘাতের প্রয়োজন নেই। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর সুখ-দুঃখে যখন কোন মহাকবির টিকি আন্দোলিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই এবং যখন কোন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমার এই দাড়ির শরাঘাতের ভয়ে তাঁর রাষ্ট্রের জন্য ভীত হয়ে উঠবেন না, তখন তোমার বাক্য-বাণ সংহার কর। মন আমার যতই চঞ্চল হোক, তাতে এই দাড়ির একগাছি চুলও যখন নড়তে দেব না, তখন ভয় কি ভাই? তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যদি বাষ্প জমে, তখন তাকে বের করে দেওয়া উচিত, তাই তোমার কাছে দু'কথা বল্লুম। ওতে রাগ করতে নেই।"

সর্ব্বানন্দ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার দাড়ির শত বর্ষ পরমায়ু হোক; ওর এক এক গাছিতে যেটুকু সদ্বুদ্ধি আছে, তাই যদি অপরে পায়, তা হলেও সে সারা জীবনের জন্য ধন্য হয়ে যায়।"

শশি কহিল, "তোদের আদরেই ত' এটা অযথা বেঁড়ে যাচ্ছে। যাক্! সুকু যে এদিকে তোর জন্য প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হয়েছে।

কি যে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিস, সে ত বাড়িসুদ্ধ লোককে পাগল করে তুলেছে; এমন কি সে দিন দেখি, মা সুদ্ধ চোখ বুজে ওর কাছ থেকে তোর সেই সব ছুঁচের ডগায় হাত বুলোন শিখছেন; মাঝেমাঝে খোঁচাখুঁচিও খাচ্চেন, তবু তাঁর উৎসাহ বেড়েই চলেছে, ভয় হচ্ছে, আমিই বা কোন্ দিন চোখ বুজে ওঁদের সঙ্গে লেগে পড়ি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তবেই বোঝো ঠাকুর্দা, সৎকার্য্যের কি শক্তি! একবার পরের মঙ্গল করব এই সংকল্প করলেই অমনি কোথা থেকে এত আনন্দ এসে সেই সঙ্গে যোগ দেয় যে তখন আর কিছুতেই নিজেকে সামলানো যায় না। তখন মানুষ যতক্ষণ না নিজেকে নিঃশেষে তাতে সঁপে দিতে পারে, ততক্ষণ আর কিছুতেই থামতে পারে না। এই সুকুমারীর কথাটাই ভেবে দেখ। তোমার বা তোমার শাশুড়ীঠাকরুণের কথা ছেড়েই দাও, কারণ তোমরা ত চিরদিনই পরের জন্য আপনাদের সঁপে রেখেছ; কিন্তু এই অন্ধ বালিকা কোথা থেকে এতখানি উৎসাহ এতখানি সদিচ্ছা লাভ করলে?"

শশি কহিল, "কোথা থেকে যে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে তা বলতে পারিনে, তবে কতকটা যে তার বর্ত্তমান গুরুর কাছ থেকে পেয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। সেজন্য আশা করি সুকুর গুরুটী তাঁর প্রিয়শিষ্যাকে অকালে ত্যাগ করবেন না। তার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যেন সে গুরুর হাত থেকে তার সাধনার চরম সার্থকতা লাভ করে।"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিতভাবে বলিল, "সাধনায় সিদ্ধি!"

শশিভূষণ তার দাড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া বলিল, "তবেরে চোরেরা! একটিকে কেড়ে নিলে সেই হতভাগা কার্ত্তিক এসে, আর একটিকে নেবে তুমি? আমি আজই দাড়ি মুড়িয়ে শিব সেজে গিয়ে ওদের বলছি, "বর নেরে পূর্ণ-মনস্কাম তোর"—অর্থাৎ আমায় নেরে! আহা, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। বাজা, ঐ টেবিলটাই বাজা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আহাহা, অমন কাজ করো না। দাড়িওয়ালাদের মুখ থেকে বেদ-উপনিষদ বাইবেল কোরাণ ছাড়া অন্য কিছু বেরুলে আবার এখুনি কোন্ এক দাড়িওয়ালা জীবের সরস মাংসের কথা মনে উদয় হয়ে খিদে জেগে উঠবে।"

শশিভূষণ আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "Three cheers for the happy suggestion. ক্রমাগত Carbohydrates খেয়ে খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে; আয়, নিউ মার্কেট থেকে এক সের মটন্ আনা যাক্।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার অন্ত পাওয়া ভার! এই কান্নাকাটি হচ্ছিল, আবার দশ মিনিট না যেতেই ফূর্ত্তির ধুম লেগে গেল!"

শশি কহিল, "spirit damp করিস নে, আজ ভাল করে রাঁধতে হবে। পেটে কিছু ভাল-মন্দ জিনিষ না পড়াতে এতদিন মরে ছিলুম। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে কেন এত দিন কোন কাজে মন দিতে পারি নি! ওরে বেটা রোঘো, যা, হুগ

সাহেবের বাজার থেকে এখুনি দু সের মটন নিয়ে আয়। এই নে দুটো টাকা, আর যা-যা দরকার, সব গুছিয়ে আনবি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আরে থাম, থাম! একেবারে দমকা খরচ করে ফেলো না। দু'-দু'টো টাকা! করলে কি? ওতে যে তোমার আট দিনের মাছ আর ষোল দিনের আলোর খরচ বন্ধ হয়ে যাবে।"

শশি কহিল, "তোকে আমার গিন্নিপনা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। না খেতে দিয়ে তুই আমার ইহকাল-পরকাল সব খেলি। এবার থেকে তহবিল আমি রাখব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই ত' আমার কাছ থেকে ধার করা সুরু হবে! সে হবে না, দাও তোমার এই ক'দিনের হিসাব, আর তহবিল।"

সর্ব্বানন্দ শশিভূষণের হাত-বাক্স খুলিবার জন্য চাবিগুলি যেখানে সাধারণতঃ থাকিত সেই স্থানে হাত দিল; কিন্তু পাইল না। বিরক্ত হইয়া বলিল, "চাবি গুলো কি করলে?" শশিভূষণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাগবাজারে ফেলে এসেছি।" সর্ব্বানন্দ রাগিয়া বলিল, "তা হলে কি করে খুলব?" শশিভূষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "খোলাই আছে বোধ হয়।"

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইয়া দেখিল, হাত বাক্সের তালা ভাঙ্গা। সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, আর একটা আলমারির কলেরও ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাছাড়া অনেকগুলি নূতন দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। সে শশিভূষণকে বিশেষরূপেই চিনিত। এই সমস্ত দ্রব্য যে বাক্সে বা আলমারিতে আছে, তাহার তালা ভাঙ্গিবার ভয়ে যে এগুলি কেনা হইয়াছে, তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া বলিল, "চাবিগুলো কি কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নেওয়া যায় না?" শশিভূষণ ঘর হইতে পলাইয়া গেল। কারণ চাবিগুলা বাগবাজারের বাড়ীতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে শশিভূষণের খুব বিশ্বাস যে চাবি সেইখানেই আছে।

সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া রঘুনাথকে ডাকিল; কিন্তু রঘুনাথ শশিভূষণের উপযুক্ত ভৃত্য। সে ঐ বাটির নিম্নতলে বাহিরের দিকে যে চাউলাদির দোকান ছিল, তাহাতে সরু চাউল ঘৃত ইত্যাদির বরাত দিয়া একটা লোহ তারের টোকা হস্তে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বানন্দ বিরক্ত হইয়া স্বয়ং সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ঘরটিকে পুনরায় মনুষ্যবাসযোগ্য করিয়া তুলিল।

৯

মণিশঙ্করের অত্যাচারের ফল এতদিনে ফলিতে চলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সমস্ত তদন্ত করিয়া তাহাকে এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সকলকে পিনাল কোডের অনেকগুলি ধারার চার্জ্জে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেওয়াইলেন, এবং জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্রের নাম ব্লাক বুকে তুলিয়া দিয়া তাহাকেও শাসাইলেন, ভবিষ্যতে যদি সে সাবধান না হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে এষ্টেটের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। সর্ব্বানন্দ এ সংবাদ পাইয়া কার্ত্তিককে লিখিয়া পাঠাইল 'যে মণি-

শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়; কারণ কার্ত্তিকের দোষেই সে এই বিপদে পড়িয়াছে। কার্ত্তিক সে পত্রের উত্তরে লিখিল যে একজন ম্যানেজার গেলে অন্য ম্যানেজার পাওয়া এই চাকুরী-লোলুপ বঙ্গদেশে খুবই সহজ, অতএব মণিশঙ্করের জন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ উহারই জন্য যখন কার্ত্তিকের এত দুর্নাম, তখন যাহাতে মণির জেল হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য; উপরন্তু ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধারেরও বিশেষ সম্ভাবনা।

শৈলজা কার্ত্তিকের এই অভিমত শুনিয়া বলিল, "না, তা হবে না। তোমার জন্যই মণিদা যখন এই বিপদে পড়েছে, তখন তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে। তুমি যদি না কর, বাবা বলেছেন, আমার তরফ থেকে তিনি তদ্বির করে তাকে বাঁচাবেন।"

কার্ত্তিক কহিল, "স্বামীকে ছেড়েও যে স্ত্রীর একটা অস্তিত্ব আছে, তুমি যে আমার ছায়ামাত্র নও, এটা তুমি বুঝতে পারছ দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্চে। আমি যদি অন্যায় করি, তুমি সাধ্যমত সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে, এই হচ্চে কাজ। তাহলেই বুঝব যে তুমি মানুষ, তুমি খেলার পুতুল নও।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অমন কথা বলো না। আমি তোমাকে লঙ্ঘন করে কোন কাজ করতে চাইনে, এত বড় দুর্ম্মতি যেন আমার না হয়। আমি যা করতে চাই, সে তোমার ভালর জন্যই। স্বামীকে ছাড়িয়ে কোন কাজ করলে স্ত্রীর পাপ হয়।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভুল, মস্ত ভুল! স্বামীকে ভালবাসা ভক্তি করা ছাড়াও একটা বড় জিনিষ আছে, সেটা হচ্চে নিজের ধর্ম্ম, নিজের মনুষ্যত্ব। সেটা যেখানে নষ্ট হবার ভয় থাকে, সেখানে সমস্ত ত্যাগ করেও মানুষের তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে যিনি স্বামীর স্বামী, তাঁর কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে?

শৈলজা কহিল, "তুমি যদি এত বোঝো, তবে কেন নিজে এমন হয়ে যাচ্ছ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে আর মানুষ নেই! নইলে দেখতে পাচ্ছ না যে যারা আমাকে কত ভয় করত, তারাও এখন আমায় তৃণ জ্ঞান করে। আমি নিজের ইচ্ছেটাকে যতদিন আমার অধীনে রেখেছিলুম, ততদিন কেউ আমার সুমুখে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করত না। এখন আমি সেই ইচ্ছার অধীন হয়ে সেই ইচ্ছার বিচিত্র মায়াজালে বদ্ধ হয়ে গুটি পোকার মত আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। ইচ্ছাটা এখন আর আমার নয়, আমিই আমার ইচ্ছার—আমার মায়ার—আমার মোহের। নাহলে আমার এমন দুটো চোখ থাকতে আমি অন্ধ হয়ে যাই? অন্ধ আমি নই, তা বেশ জানি, তবু দিনের আলো আমার সহ্য হয় না। ইচ্ছে ছিল, যে আর কিছু দেখব না, অন্ধ হয়ে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেব। তোমরা জানতে পারতে না, কিন্তু প্রথম প্রথম আমি atropin দিয়ে চোখের দৃষ্টি কমাতে চেষ্টা করতুম, আরও কত ওষুধ ব্যবহার করতুম তার ঠিক নেই; কিন্তু তখনও আমার

আবিষ্ট সম্পূর্ণ বজায় ছিল, তাই কিছুতেই *এই চোখ দুটো এদের শক্তিকে ছাড়তে* চাইত না। কিন্তু আজ আর কোন ওষুধ ব্যবহার করিনে, এদের শক্তিও বোধ হয় যথেষ্টই আছে, তবু যেই বাইরের আলো লাগে, অমনি কে যেন এদের বন্ধ করে দেয়, শতচেষ্টাতেও আর খুলতে পারি না। আমার একটা আত্মার পাশে কোথা থেকে আর একটা অন্ধকারের প্রেতাত্মা এসে যেন অচল অটল হয়ে বসে আছে। রাত হলেই সেটা যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। তখন আবার নিজের শক্তি ফিরে পাই বটে; কিন্তু সারাদিন একটা বিশ্রী রকম শক্তির অধীন থাকার দরুণই বোধ হয় রাত্রেও আমি ঠিক মানুষের মত হতে পারি না।"

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈল অবাক হইয়া গেল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না যে, এই মানুষটা কোন্ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সমস্ত বুঝিয়া-সুঝিয়াও এমন হইয়া আছে। যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার চরিত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে, সে কেমন করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা শৈল কেমন করিয়া বুঝিবে? শৈল কাঁদিয়া-কাটিয়া দেখিয়াছে, মান-অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন কত রাত্রি কাটাইয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই কার্ত্তিকের দৈনিক জীবন-যাত্রার গতি এক চুলও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। কতদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একাসনে কার্ত্তিকের নিকট বসিয়া কাটা-ইয়াছে, তবু কি করিলে যে সে আবার সুস্থ *হইবে, আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থা সে ফিরিয়া* পাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ ইহা সে স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে কার্ত্তিক স্নেহহীন নহে, কার্ত্তিক তাহার পত্নীর সম্পূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তাহার উপর পুত্র দেবী-প্রসাদের সামান্য কষ্টও সে সহ্য করিতে পারে না। এমনি-পাছে তাহার নিকটে আসিলে দেবীপ্রসাদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, সে জন্য পুত্রকে তাহার নিকট দিনের বেলায় সে আসিতেই দেয় না।

শৈলজা নিরুপায় হইয়া এই পুত্রের সাহায্যেই সময় সময় স্বামীকে তাহার অন্ধকার কোটর হইতে বাহিরে আনিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের হৃদয়ে যে কতখানি অভিমানের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি পাছে অভিমান দেখাইলে স্বামী আরও কি করিয়া বসে, এই ভয়ে সে মান-অভিমান দেখানো ইদানীং একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছে। আজ স্বামীর মুখে তাহার অবস্থার এতটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনিয়া সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও তোমায় ফিরে পাই, তাও আমি করতে পারি। কিন্তু তুমি কি যে চাও, কি হলে যে তোমার ভাল হয়, তাই বুঝতে পারছি না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যেদিন তুমি আমা-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একটা পূরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে, সেই দিন বুঝবে।"

শৈল কহিল, "তুমি আমায় ত্যাগ করলে যদি সুস্থ হও, তবে তাই কর না

কেন? আজ কতদিন থেকে সে কথা ত' বলছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কাকেও ত্যাগ করবার ক্ষমতা যদি আমার থাকত, তাহলে ত' আমি মানুষই থাকতুম। আমি যে এখন বদ্ধ জীব, শক্তি থাকতে শক্তি-হীন! শৈল, তুমি আমায় বুঝতে পারবে না, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? যাও, বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকলে হয়তো তুমিও আমার মত হয়ে যাবে। আমি বলেছি ত' তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে যেদিন তুমি—উঃ, সে কি দিন! যেদিন সেও হারবে, তুমিও হারবে, আমি জিতব—"

শৈল কহিল, "কোন্ দিন? কোন্ দিনের কথা তুমি ভাবছ? বল, তোমার পায়ে পড়ি।"

শৈলজা কার্ত্তিকের হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুভব করিল, কার্ত্তিকের শরীর সঘন কম্পিত হইতেছে। কার্ত্তিক শৈলর পাশে বসিয়া তাহাকে অতিশয় আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে ফেল, ছিঁড়ে ফেল, শৈল, এ বন্ধন। তুমি মুক্ত হয়ে দাঁড়াও, আমিও মুক্ত হয়ে দাঁড়াই। পারবে?" শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শৈলজা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাতে তোমায় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, সুধু অসম্ভব নয়, সে চিন্তাও পাপ। তুমি আমায় ত্যাগ করে সুখী হতে চাও, হও, কিন্তু আমায় তোমার আশায় চিরদিনই বসে থাকতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেখদিকি শৈল, কত বড় অন্যায়! কত বড় অত্যাচার! পুরুষ মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারবে, আর মেয়ে মানুষের বেলাতেই যত নিয়ম, যত বন্ধন, যত পাপের বিভীষিকা! কিন্তু তোমাকে এই আমারই জন্য, এই আমাকে ভালবাস বলেই আমায় ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে দিয়েই আমি তোমাদের জাতের উপর পুরুষমানুষের এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেব। তোমাকেই একদিন পূর্ণ শক্তিতে বলতে হবে যে, তুমি আমায় চাও না!"

শৈল তাড়াতাড়ি কার্ত্তিককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "সেদিন বোধ হয় আমি মরব।"

কার্ত্তিক তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, "না, সেই দিনই তুমি তোমার যথার্থ জীবনকে খুঁজে পাবে, শৈল। সেইদিনই সামনা-সামনি মুখোমুখি হয়ে দুজনে দাঁড়াতে পারব।"

শৈলজা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমায় এক মুহূর্ত্ত না দেখলে আমি থাকতে পারিনে। সেই-আমি তোমায় বলব, তোমায় চাইনে, তুমি চলে যাও? তুমি আমায় যে দিন গলা টিপে মারতে পারবে, সে দিনও ও কথা বলতে পারব কি না সন্দেহ।"

কার্ত্তিক কহিল, "তুমি স্বেচ্ছায় না পার, আমি তোমাকে দিয়ে তাই করাব। আমাকে ভালবাস বলেই তুমি আমায় বলবে যে, আমায় আর চাও না। আমি সেদিনের আশায় আমার জীবনকে ধরে রেখেছি। ভগবান কি দয়া করে এমন দিন দেবেন না?"

শৈল কহিল, "দয়া? তাকে তুমি দয়া

বল ? ছি ছি, যদি তিনি আমায় তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করান, তাহলে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।”

কার্ত্তিক শৈলজার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, “কবে তোমায় বোঝাতে পারব, শৈল ? হায়, জানি না, সে কবে !”

শৈলজা আর থাকিতে পারিল না ; টলিতে টলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাহার কোন কাজ হইল না। ভূতাবিষ্টের ন্যায় সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, সন্ধ্যার পর গৃহ-দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এক পাশে সে পড়িয়া রহিল। সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আজ কাহারও কোন কথা শুনিল না ; গৃহদেবতার মন্দিরে অনাহারেই শয়ন করিয়া রহিল। দেবু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহুবার মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া গেল, দাসদাসীগণ সাধ্য-সাধনা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল ; তবু শৈলজা যেন চেতনা-হীন !

তাই কি হবে ঠাকুর ! আমি কি ইচ্ছা করে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দেব ? এ আজ আমি কি শুনলুম, ঠাকুর ! এ আমায় কেন শোনালে, নারায়ণ ! স্বামী যখন এত জোর করে বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তা হবে। কিন্তু তা হলে কি হবে ? কি নিয়ে আমি থাকব ? আমি যে আর ভাবতেও পারিনে।

শৈলজার মনে হইল, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটা ভয়ানক হাহাকার উঠিতেছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-সংসার উল্কা-বৃষ্টির মত দিকে দিকে ছুটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহার কেবলি মনে হইতেছে যে, যদি স্নেহ মিথ্যা, ভালবাসা মিথ্যা, ভক্তি মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, মায়া মোহের বন্ধনমাত্র, তবে সত্য বস্তু কি ? কি ? সত্য বস্তু কি কেবল সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটি ? না, না, কিছুতেই তা নয়।

শৈলজা প্রাণপণ-বলে মনে মনে বলিল, না, তা নয়। ধর্ম্ম সত্য, বন্ধন সত্য, স্নেহ সত্য, ভক্তি সত্য, ভালবাসা সত্য—সত্য, সত্য, সত্য ! এ সত্যের জগৎ, মিথ্যার নয়। মিথ্যা যা, তাই মোহ, তাই মায়া, তাই মানুষকে সত্য হতে চ্যুত করে, পাগল করে, চিরদিনের পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শৈলজা ভক্তিভরে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া পূজা-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে দেবুকে কোলে লইয়া অশ্রু-প্লাবিত বদনে বারবার তাহাকে চুম্বন করিল ; তারপর কিছু আহার করিয়া একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট চলিয়া গেল।

শিবচন্দ্র পুত্রবধূকে বসিতে বলিয়া প্রথমতঃ পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন দান করিলেন। তারপর বলিলেন, “আজ সমস্ত দিন তোমায় দেখিনি কেন মা ? দেবু বার বার আমায় খবর দিয়েছে যে তুমি আজ তাকে কোলে নাও নি। কি হয়েছে মা ?”

বধূ তখন, কন্যা যেমন স্নেহময় পিতার নিকট তাহার সমস্ত মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত করে, সেইভাবে অসঙ্কোচে সমস্ত বর্ণনা করিয়া

বলিল, "যদি এই হয় ত' কি হবে, বাবা ?"

ন্যায়রত্ন সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, তোমারই জয় হবে। কার্ত্তিক যখন সমস্তই বুঝতে পেরেছে, তখন মেঘ কেটে আসছে। আমি তোমায় বলছি, মা, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার যদি পরাজয় হয়, তাহলে বুঝব, সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, সমস্ত বিশ্ব-রচনাই মিথ্যা।"

শ্বশুরের নিকট অভয় পাইয়া শৈলজা তখনই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্বশুর-গৃহে তাহার যে দৈনিক কর্ম্ম আজ অসম্পন্ন ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরকে আহারাদি করাইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আঁধারে আলো

১

স্বার্থের ধূলি ধূসরিত এই সংসারে,
অজানা দুঃখ তিল তিল করি সংহারে!
তাই নির্জ্জনে কাঁদি প্রাণপণ বেদনে,
মানুষ তাহার অর্থ বুঝিবে কেমনে!
বোঝে বিহঙ্গ বিটপী লতিকা,
বোঝে কোটি তারা গগন-শোভিকা,
বোঝে ফোটা কলি, নদী কুতূহলী
অন্তরে!
মানুষের ব্যথা মানুষ বোঝে না হায় গো—
হীন স্বার্থের পঙ্কিল-ঘোলা সলিলে কেবলি
সন্তরে!

২

ব্যর্থ বেদনে কেন বৃথা হই দণ্ডিত!
ওই শোন্ তুই ওই শোন্ ওরে শঙ্কিত!
পাখীরা পুলকে গেয়ে গেয়ে বলে—ভেব না,
মাথা নেড়ে নেড়ে বিটপী কহিছে—কেঁদনা,
আকাশের তারা হেসে হলো সারা,
ফোটা ফুলগুলি প্রেমে মাতোয়ারা,
নদী কুলুকুল—হাসিয়া আকুল
প্রান্তরে!
মানুষের ব্যথা মানুষ বোঝে না হায় গো—
নাই বা বুঝিল, বোঝে চন্দ্রমা
চিরমনোরমা অম্বরে!

৩

আশা রাখ্ তুই আশা রাখ্ ওরে উন্মনা!
দূর হবে দুখ-দুর্দ্দিন শত লাঞ্ছনা!
সত্য নিয়ত পূজিত হবে এ নিখিলে,
খাঁটি প্রেম সে তো মরে না ডুবালে সলিলে,
চিরজয়ী সে যে জীবনে মরণে,
সবে নত হয় তাহারি চরণে,
সার্থক সে যে আপনার তেজে,
অন্তরে!
মানুষের ব্যথা নাই বা বুঝিল মানুষে—
হেসে গেয়ে চল্, তোর পদতল
কাটিবে না কভু কঙ্করে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বর্ত্তমান বর্ণভেদের তৃতীয় লক্ষণ : মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন।

অচলপ্রতিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক্, বর্ণ-ভেদের মর্য্যাদা-সোপানের মধ্যে ক্রমাগতই কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

*

* *

একদিকে আরোহণের প্রক্রিয়া।

ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠীবিশেষ, উচ্চতর ধাপে আরোহণ করে; এইরূপে, বন্য অসভ্য জাতিদের প্রধানেরা, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গৃহীত হয়; এইরূপে রাজাদের নিকট হইতে গোষ্ঠীবিশেষ ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা বা অভিজাতবর্গের পদমর্য্যাদা লাভ করে।

জাতগুলা নিম্নতর ধাপ হইতে, উচ্চতর ধাপে সমুত্থিত হয়। উহাদের মধ্যে কোন কোন জাত মিথ্যা করিয়া কতকগুলি গুণ-মর্য্যাদা জোর-দখল করিয়া বসে, আবার কোন কোন জাতের গুণমর্য্যাদা রাজা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

আর কতকগুলি জাত, কতকগুলি প্রথার নিয়ম কড়াক্কড়ভাবে পালন করিয়া থাকে, যথা—বিধবা-বিবাহ-নিষেধের নিয়ম, অন্তঃ-পুরে নারীর অবরোধ-নিয়ম, উচ্চতর কুল হইতে জামাতা-নির্ব্বাচন; কয়েক বংশের পরে, কালক্রমে যে সকল গোষ্ঠী এই সকল নিয়ম দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত পালন করে, তাহারাই আবার একই জাতের অন্তর্গত অন্য গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া, একটা নূতন জাত গড়িয়া তুলে ও একটা স্বতন্ত্র নাম ধারণ করে। অনেক সময় উহারা স্বকীয় সামাজিক শ্রেণী বদলাইয়া ফেলে; জাট ও গুর্জ্জরেরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া ঘোষণা করে। তাছাড়া, ধন-ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাত সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

*

* *

অন্যদিকে, অবরোহণ বা অধঃপতনের প্রক্রিয়া। নিঃস্ব হইয়া পড়ায়, বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠী ও বিশেষ-বিশেষ জাত নিম্ন ধাপে নামিয়া পড়ে। এই কারণে উহাদের নারী-দিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখা, কতকগুলি প্রথা পালন করা, কতকগুলি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিম্নশ্রেণীর ভিতর বাধ্য হইয়া কন্যাদান করিতে হয়। আচার ব্যবহার শিথিল হইয়া পড়ে; বিধবার বিবাহ দেওয়া হয়। এইরূপে কোন কোন গোষ্ঠী স্বজাত হইতে বহিষ্কৃত হয়, অথবা কোন কোন জাত পতিত হয়।

এই আরোহণ ও অবরোহণের প্রক্রিয়া এরূপ সুস্পষ্ট যে, Ibbetson, পঞ্জাবের আদম-সুমারের বিবরণীতে এইরূপ লিখিতে পারিয়াছেন :—

"বর্ণভেদপ্রণালীটা যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল, এমন আর কিছুই নহে, উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যেরূপ কঠিন এমন আর কিছুই নহে। কোন-এক-বংশে কোন এক বিশেষ জাতের লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই মাত্র প্রমাণের বলে এইরূপ অনুমানের আশ্রয়

লওয়া হয় যে, বর্ত্তমান বংশের লোকও ঐ একই জাতের অন্তর্ভূর্ত। ইতিমধ্যে এমন অনেক ঘটনা ও অবস্থা হইতে পারে, যে কারণে এই অনুমানটা সত্য নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।"

৪

জাতের খণ্ড বিভাগ।—সংমিশ্রণ, রূপান্তর-গ্রহণ, মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন,—এই সমস্ত ব্যাপার, জাতের ভিতর খণ্ডবিভাগ আনয়ন করিয়াছে।

মধ্যযুগে যে কাজের আরম্ভ হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দী সেই কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। ১৮৮২ অব্দের আদম-সুমারীর পর, হিসাব করিয়া দেখা হয়—তখন ২৮৮৯ জাত বিদ্যমান ছিল; তাছাড়া জাতের আরো অনেক উপবিভাগের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান ছিল না।

৫

অতএব, যে সকল ব্যাপার হইতে হিন্দুসমাজ এইরূপ স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বর্ণভেদপ্রণালী, বর্ব্বর অসভ্যদিগের ভারত-আক্রমণ, সামন্ততন্ত্র, ইসলাম, মধ্যযুগের চাঞ্চল্য, মোগলদিগের কেন্দ্রগত শাসনপ্রণালী, ও দশম শতাব্দীর অরাজকতা,—এই সমস্তই আমরা একে একে আলোচনা করিয়াছি।

এক্ষণে, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব, কি পরিমাণে বর্ণভেদ-প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

*
* *

৫

বৈষয়িক সভ্যতা।

গোলামী প্রথা ও কৃষকের দাসত্ব ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ আইনের দ্বারা রহিত হয়; তাহা হইতেই কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুর্ত নীচু জাতেরা উত্তরোত্তর উচ্চতর ধাপে আরোহণ করে।

যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় ভারতের সমস্ত অধিবাসীরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে;—এইরূপে ক্রমেই স্বাতন্ত্র্য-তন্ত্রের লাঘব হইয়াছে; সকল জাতের লোকই আগ্-বোটে, রেল-পথে, ট্র্যাম্-ওয়ে-গাড়ীতে, রঙ্গশালায় একত্র মেলামেশা করিতেছে।

য়ুরোপের বাজার সস্তা বলিয়া য়ুরোপের মালপত্র সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ঐ সকল জিনিস ছুঁইলেও অশুচি হইতে হয় এইরূপ ধারণা ছিল।

দৃষ্টান্তের বশীভূত হইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই, বিজেতাদিগের রীতি-নীতি,—এমন কি—ব্যসন-গুলিও গ্রহণ করিয়াছে। সরকারী বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, সুরাপানের উত্তরোত্তর কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট সকলেই সহজে যাইতে পারে।

একজন নীচু জাতের লোক, শাসন-বিভাগের কাজে প্রবেশ করিয়া রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের উপর শাসন-ক্ষমতা জারী করে, জজের আসন লাভ করিয়া অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করে। সমস্ত পুলিসের লোক নিম্ন-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হয়। কতকগুলি শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, যে সকল জাত ঐ সকল শ্রমশিল্পের কাজে নিযুক্ত তাহারা ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সকল শিল্পকাজ তাহা-

দিগকে নীচত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছে ঃ—যথা সূতা-কাটার কাজ, কামারের কাজ, এমনকি চর্ম্ম-সংস্কারের কাজ। নূতন নূতন শ্রমশিল্প প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন জাতও গড়িয়া উঠে।

অধিকন্তু, নূতন অর্থ নৈতিক অবস্থা, সমগ্র সমাজের ভিতর দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকেরা, অন্ধ সংস্কারের দরুণ রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে; এবং প্রভুত্ব, ধন-ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-সুখ, কুপ্রথাদিতে আসক্তি, এবং যাহাতে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার উদ্রেক হয় এইরূপ সম্মিলনাদি—এই সমস্ত, উহাদিগকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে। দৈহিক শ্রমের কাজে যাহাদের ঘৃণা নাই, আতঙ্ক নাই, কষ্ট সহিতে যাহাদের ভয় নাই, সেই সকল নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রসন্তানদিগের নিকট, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই, ইংরাজি সভ্যতা হইতে, সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা হইতে, বল সঞ্চয় করিয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, ভারতভূমি শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য-ব্যাপারে বড় বড় দেশের সমকক্ষ হইতে আরম্ভ করিবে। গ্রাম্য অধিবাসীর তুলনায় নগর-অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; এবং কৃষিবটিত যন্ত্রাদির ব্যবহার, গ্রাম্য লোকদিগের মনোভাব পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিবে। জীবন-সংগ্রাম, ধনতৃষ্ণা, আরাম-আয়েষের ভাব, এই সমস্ত—ভারতীয় সমাজের যাহা মৌলিক জিনিস সেই ভোগ-অধিকার-সাম্যবিশিষ্ট জন-সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া দিবে।

*
* *

নৈতিক প্রভাব।

ভারতের সমস্ত অধিবাসী যে এই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখা যায় ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বও কমিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতদিগের মানসম্ভ্রমেরও অধঃপতন হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচীন প্রথাদি স্বীয় আধিপত্য হারাইয়াছে। কিন্তু কেবল হিন্দুরাই, সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, ইংরেজের রীতিনীতি ও মতামত আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থান ও পঞ্জাব, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহী ছিল; পূর্ব্ব-বিজিত মাদ্রাজ ও বাঙ্গলাদেশে এরূপ হয় নাই। এই দুই প্রদেশের লোকেরা গোড়ায় হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন নহে। দুই বিপরীত ধরণের মানসিক গুণ, ঐ দুই প্রদেশের লোকদিগকে উক্ত নূতন রীতিনীতি ও নূতন মতামত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করে। মাদ্রাজীদিগের মধ্যে উদ্যম চেষ্টা, সুবুদ্ধি, গণতন্ত্রিক মনোভাব, খুব-একটা স্বাধীনতার ভাব আছে; কিন্তু সেই স্বাধীনতার ভাব হইতে সাবধানতা ও দূরদৃষ্টি বহিষ্কৃত হয় নাই। আর, বাঙ্গালীদের মধ্যে, চরিত্রের নমনীয়তা, দৈহিক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা, বিপ্লবকারীসুলভ মনোভাব, শব্দঝঙ্কারময়ী বাগ্মিতার দিকে ঝোঁক এবং অতিসূক্ষ্ম কূট যুক্তির প্রতি অনুরাগ।

রাষ্ট্রের শাসনবিভাগে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করা—ইহাই উদ্যমশীল যুবকদিগের একটা বিশেষ প্রলোভনের বিষয় ছিল। যে শ্রেণীরই লোক হৌক না কেন; সকলেই

সকল কাজেরই জন্য প্রার্থী হইতে পারে। যেমন একদিকে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা বৈদেশিকের প্রদত্ত সরকারী কার্য্যের ভার গ্রহণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল তেমনি অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐ সকল কাজের জন্য কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। এইরূপে,—ইতিপূর্ব্বে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, সেই কায়স্থেরা—সরকারী কেরাণীরা—প্রভাবশালী হইয়া উঠায়, লোকে তাহাদিগকে ভয় করিতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারী, লেখক, সংবাদপত্র-পরিচালক, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, বাণিজ্য-কুঠীর কর্ম্মচারী—ইহারা সকলেই প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। আর তাহারা ধর্ম্ম মানিত না, জাতি মানিত না, পারিবারিক গণ্ডী মানিত না। য়ুরোপীয় ধরণে পোষাক পরিয়া, উহারা গোমাংস আহার করিতে লাগিল, সুরাপান করিতে লাগিল, গোঁড়া হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এমন-কি অপমানও করিতে লাগিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী,—এই উৎসাহটাকে থামাইয়া দিল। হিন্দু ও য়ুরোপীয়-দিগের মধ্যে মেলামেশা কঠিন হইয়া পড়িল। ইংরাজকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, নব্য-হিন্দুরা স্বদেশীয়দিগের সহিত মেলামেশা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী হইতে যাহারা বরাবর প্রাচীন অন্ধসংস্কারের সহিত যুঝিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মানসিক প্রকৃতি ভিন্নপ্রকারের ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

কঠোর অধ্যয়নের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া; যুঝাযুঝির দ্বারা দ্রঢ়িষ্ট হইয়া, কেহ কেহ কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল:—১৮৫০ ও ১৮৭০ এই সময়ের মধ্যে যিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন সেই মধুসূদন; বিধবা-বিবাহ-প্রস্তাবকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; ব্রাহ্মণসমাজের দলপতিগণ; আজিকার দিনে, "পজিটিভ্"-সম্প্রদায়ের প্রধান M. Ghose; কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌঁশুলী M. Banerjee; এবং লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-সাহিত্যের অধ্যাপক M. Dutt। যদিও এইসব লোক জাতের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, তথাপি দেশের লোকের রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টি আছে—এমন কি সহানুভূতিও আছে।

আর কতকগুলি লোক আরো উগ্রচণ্ড, তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; তাহারা জন্মগত বিশেষ-অধিকার, বর্ণ-ভেদ প্রথা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে রহিত করিতে চাহে; য়ুরোপীয় সমাজের লৌকিক ও গণতন্ত্রিক গঠনে হিন্দুসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহে। উহাদের পরামর্শ-সভা, সংবাদপত্রে লিখিত উহাদের প্রবন্ধাদি, রক্ষণশীল হিন্দুদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তথাপি ১৫ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া, উহাদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৈরিতায়, স্বদেশীয়দিগের প্রতি বৈরী-ভাবটা কমিয়া আসিল। যখন হইতে উহারা ইংরেজদিগকে বেশী গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতি আক্রমণটা কমিয়া আসিল।

আবার কতকগুলি লোক, আমূল-সংস্কার-তন্ত্রের মধ্যে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের নৈতিক কর্ত্তব্যগুলি লঙ্ঘন করিবার একটা ছুতা পাইল।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্র, ভ্রষ্ট-চরিত্র নব্য-হিন্দুর চিত্রটি বেশ আঁকিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী মামলা-মোকদ্দমায় এক জমিদার-বংশ 'উচ্ছন্ন' যায়; সেই বংশসম্ভূত দেবেন্দ্র দত্ত এক ধনশালিনী রমণীকে বিবাহ করে, কিন্তু ঐ রমণীর মুখশ্রী অপ্রীতিকর ও মেজাজটাও খিট্‌খিটে ছিল। দেবেন্দ্রদত্ত কলিকাতায় গিয়া মূলোচ্ছেদপন্থী যুবকদের দলে আপনাকে বিলাইয়া দিল। প্রথমেই সে সমাজ-সংস্কারের একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিল, তারপর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইল, পাঠশালাদি স্থাপন করিল এবং দরিদ্র বিধবাদের বিবাহ দিবার কাজে ব্যাপৃত হইল। পরে তাহার মত দুর্ব্বলচরিত্রের লোক এই সকল কাজে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সমাজ-সংস্কার অর্থে সে এখন রীতিনীতির শিথিলতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝেনা, সে সুরাপান করে, বালিকাদিগকে কুপথগামিনী করে, শ্রদ্ধার জিনিসকে উপহাস করে। কুসংস্কারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন এক সভ্য তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন; দেবেন্দ্র তাহার বন্ধুর স্ত্রীকে হরণ করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল; বন্ধুর ঐ বিধবা পত্নী তাহার কোন আত্মীয়ার ঘরে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল; আত্মীয়টি তেমন প্রিয়বাদী নহে। ঐ বিধবাকে পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য দেবেন্দ্রদত্ত এক বৈষ্ণবী-গায়িকার ছদ্মবেশ ধারণ করিল, পরে এক সুশ্রী দাসীর মাথা ঘুরাইয়া দিয়া এবং তাহাকে বশ করিয়া ঐ বাড়ীর ভিতরকার সব সন্ধান লইল। দেবেন্দ্রদত্তের এই গুপ্ত-প্রেমলীলার দরুণ, গৃহিণী মারা গেলেন, দাসী উন্মাদগ্রস্ত হইল এবং দেবেন্দ্রদত্ত নিজেও সুরাজাত মস্তিষ্ক-বিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

মিষ্টার ঘোষ ও দত্তের মতো লোক-দিগের সুন্দর-সুন্দর গ্রন্থ, স্বশ্রেণীচ্যুত সংবাদ-পত্রসম্পাদকদিগের লিখিত উগ্রচণ্ড প্রবন্ধাদি, দেবেন্দ্রের মতো লোকের কলুষিত ও পাতকী জীবন—এই তিন চরমসীমায় আমূলসংস্কারের হিন্দু আন্দোলন পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু তাবৎ বিপ্লব-বিপর্য্যয়ের মধ্যেই এইরূপ প্রবণতা আমরা দেখিতে পাই না কি? ফরাসী রাষ্ট্রীয় মহাসভার মহাবাগ্মী হইবার পূর্ব্বে, "মিরাবো" কি সর্ব্বাপেক্ষা নীতিভ্রষ্ট যুগের সর্ব্বাপেক্ষা নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না?

এবং তাঁহার উগ্রচণ্ড কার্য্যকলাপ ব্যতীত, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কল্যাণকর কার্য্য সম্ভব হইত কি না কে বলিতে পারে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রাসরঃ

(বাস্তুঘুঘুরুবাচ)

(স্থাখ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি ।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি ॥
(বস্তু-) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা ।
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা ॥
(ছি ছি) অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন ।
(হাঁহাঁ) গন্ধ চাই ? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন ॥
(স্থাখ) সর্ব্ব-গ্রাহ্য বস্তু-তন্ত্র নাই ইথে ধোঁকা ।
(মরি) ফুল ঢোকাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা ॥
(ওগো) বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ ।
(আর) খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস ॥
(শামা) কোকিল কি পাপিয়ায় কোরো না তারিফ ।
(ওগো) বস্তুতন্ত্র চেনে শুধু মোরগ-স্নাইপ্‌ ॥
(মোর) বস্তু-তন্ত্র বিনা কারো নাই কোনো পন্থা ।
(অহো) বস্তু-হারা তুলিবারে বস্তুতন্ত্র খন্তা ॥
(স্থাখ) পক্ষীকুলে হাড়গিলা বস্তু-পরায়ণ ।
(বস্তু-) তন্ত্রমতে সেই সরস্বতীর বাহন ॥
(বলি) তামাক খাওয়ার অর্থ জানে বল কারা ?
(ওই) বস্তু-তন্ত্র সুখা-খোর বেহারী বেহারা ॥
(কিন্তু) খাবি-খাওনের অর্থ নাহি পাই ভাবি ।
(কারণ) বস্তুতন্ত্রবিদ্‌ আজো খায় নাই খাবি ॥

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজপত্র

(কৈফিয়ৎ)

গত-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত "অলঙ্কারের সূত্রপাত" নামক প্রবন্ধে আমি প্রসঙ্গত এই কথা বলি যে—

"রচনার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষান্তে বর্জ্জন করিয়াছিলেন সে রীতি আমাদের গ্রাহ্য হতে পারে না।"

গত বৈশাখের ভারতী-পত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা-সূত্রে বলেছেন—

"চৌধুরী-মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন যে বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রথম বয়সের লিপি-রীতি পরিহার করিয়াছিলেন, তখন সে রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের লিপিরীতিকে যে বঙ্গ-সাহিত্যে আদর্শ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি।"

উক্ত প্রবন্ধের অপর-এক-স্থলে তিনি বলেছেন যে—

"কিন্তু চৌধুরী-মহাশয় তাঁহার (বঙ্কিম-চন্দ্রের) যে প্রয়োগগুলিকে ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার একটিও ভুল বলিয়া মনে হইল না।"

আমার মূল কথা যাঁর কাছে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয়েছে—আমার সকল কথা তাঁর কাছে গ্রাহ্য না হওয়াটা আক্ষেপের বিষয় নয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ধরতে গিয়ে আমি যে পদে পদে সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি—এ অভিযোগের প্রতিবাদ করাটা আমি আবশ্যক মনে করি-নি; বিশেষত যখন এ অভিযোগ যথার্থ হলে আমার মতেরই সমর্থন করে। সকলেই জানেন যে আমি লেখায় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করবার একান্ত পক্ষপাতী। তার একটি প্রধান কারণ এই যে আমার বিশ্বাস, সংস্কৃত নিয়ে কারবার করায় বাঙ্গালী লেখকদের বিপদ আছে। সে বিপদ যে আমি এড়িয়ে যেতে পারি নি এ ত খুবই সম্ভব, বিশেষতঃ যখন আমার মতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তা এড়াতে পারেন নি।

সে যাই হোক, এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেকে মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ভুল-ধরারূপ অপরাধের জন্য আমার পক্ষে সাহিত্য-সমাজের নিকট হয় মাপ-চাওয়া নয় কৈফিয়ত-দেওয়া কর্ত্তব্য। যথাসাধ্য সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করবার জন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

আমার প্রথম জবাব এই যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের "যে প্রয়োগগুলিকে আমি ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহার একটিও ভুল নয়।"—এ কথা ঠিক নয়;—অন্ততঃ মজুমদার-মহাশয় তার সকলগুলির শুদ্ধতা প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে পারেন নি।

আমার দ্বিতীয় জবাব এই যে, আমি পাঁজি-পুঁথি না দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ধরতে বসিনি। "অভিধানকোষতঃ পদার্থ

নিশ্চয়”—অলঙ্কার-শাস্ত্রের এ বিধি অমান্য করে আমি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার বিচার করিনি। উক্ত ভাষার দোষ ধরাতে যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে ত সে দোষ আমার নয়, অভিধানকোষের।

এই বর্ণনা-পত্র দাখিল করে আমি সওয়াল-জবাব করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১) বঙ্কিমের “প্রগল্‌ভবয়সী” যে আমার মনঃপূত হয়নি তার কারণ প্রগল্‌ভতা বয়সের ধর্ম্ম নয়, চরিত্রের ধর্ম্ম। মজুমদার-মহাশয় কালিদাসের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বয়সের সঙ্গে প্রগল্‌ভতার যোগসাধন করাটা দোষের বিষয় নয়। কালিদাসের যুক্তপদ আমার শিরোধার্য্য—সুতরাং যদি কেউ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করায় আমি কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়েছি তাহলে সে কথার আমি কোনও প্রতিবাদ করব না।

তবে আত্মদোষক্ষালনের জন্য আমি নিবেদন করছি যে অভিধানকোষ হতে পদার্থ নিশ্চয় করেই আমি “প্রগল্‌ভ-বয়সী”তে আপত্তি করি।

মজুমদার-মহাশয় বলেছেন—“প্রগল্‌ভ অর্থ যে mature, developed বা full-grown হইতেই পারে না ইহাই তিনি (আমি) জোর করিয়া বলিয়াছেন। যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়।”

উপরোক্ত ইংরাজি শব্দগুলি যে প্রগল্‌ভ শব্দের “প্রতিবাক্য” হতেই পারে না এমন কথা আমি জোর করে বলিনি,—কেননা সংস্কৃত ভাষার কোন্ কথার অর্থ কি যে না হতে পারে তা আদ্যোপান্ত অমরকোষ যাঁর কণ্ঠস্থ আছে তিনিও বলতে পারেন না, “অন্যে পরে কা কথা”। এক “গো” শব্দের অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যায় ওর ভিতর গরু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সব পাওয়া যায়।

আমার বক্তব্য এই যে প্রগল্‌ভ শব্দের ও-সব অর্থ আমি কোনও অভিধানে দেখতে পাইনে। “যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়”—মজুমদার-মহাশয়ের এ-কথা আমি মেনে নিতে পারছিনে, কেননা তিনি কোনও সংস্কৃত কোষগ্রন্থ থেকে তাঁর উক্তির প্রমাণ উদ্ধার করে দেন নি। সুতরাং যে-সব কোষ-গ্রন্থ আমার আয়ত্তের ভিতর আছে, সেই-সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করে আমি পুনরায় বলছি, প্রগল্‌ভ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ mature, developed বা full-grown নয়।

আমার হাতের গোড়ায় পাঁচখানি কোষ-গ্রন্থ আছে; তার তিনখানি বাংলা, * আর দুখানি ইঙ্গ-সংস্কৃত। আমার শব্দার্থ-জ্ঞান এই পঞ্চকোষ হতেই সংগৃহীত। এর পাঁচ-খানির একখানিতেও প্রগল্‌ভ শব্দের মজুমদার-মহাশয়ের অনুমত অর্থ পাওয়া যায় না। বাংলা অভিধান অবশ্য বাঙ্গালীর নিকট গ্রাহ্য নয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গ-সংস্কৃত অভিধান-দুখানি যে প্রামাণ্য, সে কথা মজুমদার-মহাশয় অস্বীকার করতে পারবেন না, কেননা তিনি ঘুরে-ফিরে ঐ অভিধান-যুগলেরই দোহাই দিয়েছেন। “আপ্তে সঙ্কলিত কোষ-গ্রন্থ” এবং “বটলিং এবং রোট

* শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ অভিধান, শব্দার্থমঞ্জরী।

প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই” হচ্ছে তাঁর হাতের রঙের নওলা ও গোলাম। এ-দুখানি আমার হাতেও আছে এবং এর কোনো-খানিতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত প্রগল্‌ভের পাশে ইংরাজি অক্ষরে লিখিত mature, developed বা full-grown অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আপ্তে পণ্ডিতের কোষগ্রন্থে প্রগল্‌ভ শব্দের বক্ষ্যমান অর্থ ক'টি পাওয়া যায়ঃ—Bold Ready, Resolute, Illustrious, Strong। বটলিং এবং রোটের কোষগ্রন্থ St. Petersburg Dictionary নামে সুপরিচিত। মূলগ্রন্থ আমার কাছে নেই এবং তা থাকলেও কোন সুসার হ'ত না; কেননা সে গ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় লিখিত এবং জর্ম্মান ভাষা আমার অবিদিত। কিন্তু আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ইংরাজি সংস্করণটি আমার কাছে আছে এবং তাতে প্রগল্‌ভ শব্দের মজুমদার-মহাশয়ের উদ্ভাবিত অর্থ নেই। তাতে যা আছে তা এইঃ—প্রগল্‌ভ—Bold Resolute confident।

সুতরাং “যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়” এই কথাটা শুধু জোর করে নয়, গায়ের জোরে বলা হয়েছে।

“প্রগল্‌ভবয়স” এই পদে কালিদাস চরিত্রের ধর্ম্ম বয়সে আরোপ করেছেন, অর্থাৎ ও শব্দ metaphorically ব্যবহার করেছেন—যে হিসেবে আমরা বাংলায় “সমর্থ”কে “সমত্ত” “সজ্ঞান”কে “সেয়ানা” করে তুলেছি। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রগল্‌ভ শব্দের উক্তরূপ metaphorical ব্যবহার চলে, কিন্তু তাতে এ প্রমাণ হয় না যে, ও শব্দের অর্থ mature, developed বা full-grown।

(২) তারপর “মুখাবয়ব” ধরা যাক। এ স্থলে অবয়ব শব্দের প্রয়োগ যে ভুল এমন কথা আমি বলিনি। আমি যা বলেছিলুম তা এইঃ—

“মুখাবয়ব বলায় “অবয়ব” শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয় নি।”

শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ ও অশিষ্ট প্রয়োগ যে এক জিনিষ নয়—যাঁর অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

উক্ত শব্দের ও-ক্ষেত্রে প্রয়োগের শিষ্টতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ—প্রকৃতিবাদ অভিধানে লেখা আছে, “অবয়ব” অর্থ “হস্ত-পদাদি অঙ্গ”। মজুমদার-মহাশয়ের প্রিয় কোষ-গ্রন্থ-দুখানির সঙ্গে এ-বিষয়ে প্রকৃতি-বাদের মতভেদ নেই। আপ্তে পণ্ডিতের মতে “অবয়বের” অর্থ Limb, part; এবং Cappelerএর মতে Limb, member।

সুতরাং features অর্থে Limb শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট কিনা, এ সন্দেহ সহজেই আমার মনে উদয় হয়েছিল।

মজুমদার-মহাশয় আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে কালিদাস উক্ত শব্দ মুখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আমাদের মানতেই হবে যে বঙ্কিম-চন্দ্রের ঐ শব্দের ঐ অর্থে প্রয়োগ শুধু শিষ্ট নয়, বিশিষ্ট।

“অবয়ব” শব্দের উক্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার অপর-একটি আপত্তি ছিল, সে হচ্ছে এইঃ—”

"সংস্কৃত ভাষায় অবয়ব হচ্ছে তাই যা সমুদয় নয়। এ-স্থলে "সমুদয়" অর্থে অবয়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং বিরুদ্ধার্থ দোষ ঘটেছে।"

মজুমদার-মহাশয় আমার এ আপত্তির কোনও খণ্ডন করেন নি, সম্ভবতঃ এই কারণে যে কালিদাসের নজির এখানে খাটে না। লক্ষ্মণ যদি শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন না করে একেবারে তাঁর মুণ্ডপাত করতেন, তাহলে সেই ছিন্নমস্তা শূর্পনখাকে কালিদাস কখনই "মুখাবয়বলূনাং" বল্‌তেন না।

(৩) মজুমদার-মহাশয় আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে "নিশীথ" মানে যে গভীর রাত্রি, সে কথা আমি প্রবন্ধ লেখবার সময় ভুলে গিয়েছিলুম। তা ভুলি আর নাই ভুলি "নিশীথ" মানে যে রাত্রি, দিন নয়—এ-কথা আমার মনে ছিল। নিশীথ শব্দের উক্ত উভয় অর্থই যে, সকল অভিধানে পাওয়া যায় সে-কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে "গভীর রাত্রিই" ঠিক আর অগভীর রাত্রি বেঠিক। কেননা প্রাচীন সংস্কৃতে উক্ত শব্দ পূর্ব্ব-অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, শুধু অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে নিশীথ নিশা-অর্থে "অসাবধানে" ব্যবহার হয়। সংস্কৃত শব্দের কোন্ অর্থ প্রাচীন ও কোন্ অর্থ অর্ব্বাচীন সে-সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল না। কিন্তু তর্কটা ত নিশীথ নিয়ে নয় "নিশীথ-কৌমুদী" নিয়ে। প্রথম রাত্রি এবং শেষরাত্রির চাইতে গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্না যে বেশি করে ফুট্‌তে বাধ্য, এমন কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। জ্যোৎস্না, রাত্তিরের কোন্ ভাগে দেখা দেবে, তা পক্ষ ও তিথির উপর নির্ভর করে। সুতরাং "নিশীথ-কৌমুদী" সম্বন্ধে আমার যা আপত্তি তা প্রাচীন অর্ব্বাচীন উভয় নিশীথ সম্বন্ধে সমান খাটে।

(৪) "কুঞ্চিতালক" যে ভুল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই; কেননা "অলক" মানে যে "কুঞ্চিতকেশ" এ-কথা বলবার জন্য কারও সঙ্কুচিত হবার দরকার নেই। যা সমর্থন করা যায় না তা সমর্থন করতে হ'লে মানুষের পক্ষে সত্যমিথ্যা বিচার করে যুক্তিযুক্ত কথা বলা অসম্ভব, সেইজন্য মজুমদার-মহাশয় "কুঞ্চিতালককে" বজায় রাখবার জন্য যা মনে এসেছে তাই বলেছেন। তাঁর কথা এই :—

"রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৫৪ শ্লোকে দেখিতে পাইবেন যে কেরল রমণীদিগের অলকে চমূরেণু উড়িয়া পড়িতেছে। এখানে মল্লিনাথ অলককে কোঁকড়া চুল অর্থে বুঝেন নাই, এবং অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়, তাহাও সংস্কৃত কোষগ্রন্থে কালিদাসের এই প্রয়োগ এবং প্রয়োগের দৃষ্টান্তে লিখিত হইয়াছে। আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ দেখিতে পারেন। বহু-দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যাইত, কিন্তু প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে কুঞ্চিতালক ললাট-প্রান্তে শিষ্টভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।"

উপরোক্ত বাক্যটি যে নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে বলা হয়েছে, তার প্রথম প্রমাণ মজুমদার-মহাশয়ের ভাষা। এর মধ্যে সব-চাইতে লম্বাচওড়া বাক্যটির কোনও অন্বয় হয় না, তারপর উক্ত বাক্যের অভ্যন্তরস্থ পদগুলি অনবধানতাবশত বিপর্য্যস্তভাবে বিন্যস্ত।

সে যাই হোক "অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়" এ সত্য তিনি আর যেখান থেকেই পান, কালিদাসে পান নি, মল্লিনাথে পান নি, আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থেও পান নি। উক্ত কোষগ্রন্থে দেখ্‌তে পাই "অলকে"র পাশে curl "শিষ্ট-ভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।" নিম্নে রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের ৫৪ শ্লোক মায় টীকা তুলে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, "অলকের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয়" এ-কথা আর যিনিই বলুন কালিদাস বলেন-নি, মল্লিনাথও বলেন-নি :—

"ভয়োৎসৃষ্ট বিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধিকৃতঃ॥"

কালিদাস

"ভয়েতি॥ তেন রঘুনা ভয়েনোৎসৃষ্ট বিভূষাণাং পরিহৃত ভূষণানাং কেরলযোষিতাং কেরলাঙ্গনানামলকেষু চমূরেণুঃ সেনারজশ্চূর্ণস্য কুঙ্কুমাদিরজসঃ প্রতিনিধিকৃতঃ। এতেন যোষিতাং পলায়নং চমূনা' চ তদনুধাবনং ধ্বন্যতে"॥

এ স্থলে কালিদাসের নজির বরং আমার কথারই সমর্থন করে। উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রতি ঈষৎ মনোযোগ করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে কালিদাস উক্ত "চূর্ণ" শব্দটি নিয়ে একটি pun করবার চেষ্টা করেছেন। সে punটি প্রচ্ছন্ন হলেও যাঁরা অলক শব্দের অর্থ জানেন তাঁদের কাছে তা স্পষ্ট। অলক শব্দের অর্থ যে "চূর্ণ কুন্তল" সে বিষয়ে আভিধানিকদের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নেই। আর কালিদাস যে pun করবার লোভ সকল সময়ে সম্বরণ করতে পার্‌তেন না তার প্রমাণ উক্ত সর্গের

"অসহ্য বিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা"

এই শ্লোকে পাওয়া যায়।

তারপর "কুঞ্চিতালক কেশের" পক্ষ নিয়ে তিনি punctuation-এর যে সব কূটতর্ক করেছেন, তা এত সূক্ষ্ম আর এত জটিল যে আমি তার কোনও খেই খুঁজে পাইনি। মোটামুটি এইমাত্র বুঝেছি যে কুঞ্চিতালক এবং কেশের মধ্যে একটি পূর্ণচ্ছেদ দিলেও দুয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। পাঠক যদি মনে মনে ঐ দাঁড়িটি টেনে নেন তাহলেই ঐ "সোজাসোজি চুল"-কে বঙ্গ-সরস্বতীর মাথায় দাঁড় করানো যায়। বস্তুমাত্রকেই শোধন করে নিলে তা যে শুদ্ধ হয় এ কথা সকলেই জানে কিন্তু অপরের লেখার উপর ও-রকম হাত চালানো যে সঙ্গত এ কথা সকলে মানে না, কেন না তাতে উল্টো উৎপত্তি হতে পারে। মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবিত ফুল্‌স্টপের গোঁজামিলন দিলে অভিধান বাঁচে না, মধ্যে থেকে ব্যাকরণ মারা যায়। বঙ্কিমের ঐ একটি বাক্য দুভাগে বিভক্ত করে ফেল্‌লে তাদের আর সমন্বয় হয় না। অপরের রচনার অন্বয় নষ্ট করা যে অন্যায় এ কথা মজুমদার মহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য।

(৫) মজুমদার মহাশয় 'গণ্ড' নিয়ে যে সব বাক্‌বিতণ্ডা করেছেন, তাকে গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মজুমদার মহাশয় বল্‌তে চান যে গণ্ডের সঙ্গে কপোলের সংস্রব থাকলেও ও দুই হচ্ছে মুখের পৃথক পৃথক ভাগ অর্থাৎ কপোল হচ্ছে মুখের একদেশ আর গণ্ড হচ্ছে তার চাইতে বড়

দেশ। তাঁর মতে গণ্ডের অর্থ The whole side of the face including temple। এই কথা নাকি St. Petersburg কোষগ্রন্থে লেখা আছে। আর কপোল হচ্ছে তারই অন্তর্ভূত, কেননা গালের গোলগাল অংশের নামই কপোল, অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বলে "গণ্ডস্য উপরি পিণ্ড"। ধরুন তাই। তা হলেও দেখা যাচ্ছে কপোল গণ্ডের গণ্ডীর ভিতরেই অবস্থিত সুতরাং কপোল গণ্ড হতে পৃথক নয়। এবং "কুঞ্চিতালক কেশ সকল" গণ্ডকে আচ্ছাদন করলে কপোলকেও আচ্ছাদন করতে বাধ্য।

রোট বটলিং-এর মূল জর্ম্মাণ কোষে কি লেখা আছে তা জানিনে কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ইংরাজি সংস্করণে দেখতে পাই কপোল মানেও যা, গণ্ড মানেও তাই।

কপোল = Cheek.

গণ্ড = cheek, side of the face.

এই side of the face এর পূর্ব্বে whole এবং পরে including temples—মজুমদার মহাশয় কোথা থেকে পেয়েছেন জানিনে। তাই সন্দেহ হয় যে ও ল্যাজামুড়ো তিনি নিজেই জুড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন যে—

"Temple শব্দের কোন বাংলা কথা নেই…কাজেই বিশেষ বিশেষ স্থান বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমবাবুকে সংস্কৃত গণ্ড শব্দটিকে কপোল হইতে ভিন্নভাবে প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে।"

"Temple শব্দের যে বাংলা কথা নেই" এ অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয়; তাই বলে "গণ্ডকে" কেন যে Temple-এ প্রমোশন দিতে হবে তা বুঝতে পারছি নে।

গণ্ড শব্দের অনেক রকম অর্থ হতে পারে, গণ্ড-মূর্খের গণ্ড অবশ্য কপোল নয়, সম্ভবতঃ কপাল—কিন্তু মানুষের Temple হতে পারে না। "আপ্তে পণ্ডিতের সঙ্কলিত কোষগ্রন্থে" দেখ্‌তে পাই গণ্ডের অর্থ Cheek, Elephant's temple। বলা বাহুল্য হাতির Templeএর নাম গণ্ড বোলে মানুষের অবশ্য তা নয়। হাতির নাসিকার নাম হস্ত তাই বলে মানুষের নাক্‌কে হস্ত বল্‌লে আমার বিশ্বাস ও শব্দের এবং অঙ্গের প্রতি সমান অত্যাচার করা হয়।

Temple শব্দের "প্রতিবাক্য" বাংলায় না থাক সংস্কৃতে আছে, আর সে হচ্ছে শঙ্খ। আপ্তের কোষ-গ্রন্থের ভিতর খুঁজলেই মজুমদার মহাশয় ও-শব্দের সাক্ষাৎ পাবেন। উক্ত শব্দ যে শুধু অভিধানের অন্তরে লুকিয়ে আছে তা নয়—সংস্কৃত সাহিত্যে ও-শব্দের প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়। বৃহৎ-সংহিতার "প্রতিমা-লক্ষণ" অধ্যায়ে বরাহ-মিহির প্রতিমার মুখের "বিশেষ বিশেষ স্থান-গুলির" শুধু নাম করেন নি, তার মাপজোখও দিয়েছেন। সেই গ্রন্থের সেই অধ্যায়ে দেখ্‌তে পাবেন যে Temple শঙ্খ,—গণ্ড নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমার চোখের সম্বন্ধে বলেছেন যে "তাহাতে কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"—এর জন্য আমার যে আক্ষেপ আশা করি মজুমদার মহাশয় ভবিষ্যতে তা দূর করবার চেষ্টা কর্‌বেন। কারণ গতপ্রবন্ধে এবিষয়ে তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পূজার সময়

বৈশাখ মাসে অনঙ্গর বিবাহ হইয়াছে। বধূ চুনি এক বড় জমিদারের মেয়ে—ক'দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আবার পল্লীগ্রামে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গর এবার পাশের পড়া—পাছে পড়শুনার ব্যাঘাত হয়, এইজন্য মা বৌকে আর আনেন নাই! ইচ্ছা থাকিলেও ছেলের পাশের পূর্ব্বে আনিবার উপায় নাই।

চুনি লেখাপড়া তেমন জানে না। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিবার সময় তাহার বর্ণ-পরিচয় হয়! তবে ফুলশয্যার রাত্রে অনঙ্গর কাতর মিনতিতে গলিয়া চুনি কথা দিয়াছে, এই ক'মাসের মধ্যে দিদির কাছে সে লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিয়া ফেলিবে। দিদি ননী বাল-বিধবা, পিত্রালয়েই থাকে। তাহাকেও অনঙ্গ পাকে-প্রকারে জানাইয়াছে, লেখাপড়া যে না জানে,—তা সে পুরুষ হোক, আর নারীই হোক—তাহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ! এমন কি, তাহার সংস্পর্শে যে আসে, তাহারও জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ননীও ভরসা দিয়াছে—বাড়ীতে ত তেমন কোন কাজ নাই—চুনিকে সে নিজে ভাল করিয়া পড়াইবে—এবং লেখাপড়া শিখাইয়া অচিরে তাহাকে অনঙ্গর যোগ্যা করিয়া দিবে!

চুনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—হোক দুইদিনের আলাপ-পরিচয়—অনঙ্গর দিন কি করিয়া কাটিতেছে, তাহা সে-ই জানে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—উঃ, চারিটা মাস গিয়াছে না যুগ গিয়াছে! বৈশাখ মাসে চুনির সঙ্গে দেখা,—সে যেন আজ স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়! আবার কবে দেখা হইবে, কে জানে!

পূজায় সময় অনঙ্গর শ্বশুর বেহান্‌কে বিস্তর প্রণাম জানাইয়া চিঠি লিখিলেন, বাড়ীতে পূজা, জামাতা বাবাজীকে একবার পাঠাইলে সকলে কৃতার্থ হইবেন; দেশের লোকও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। অন্তত পূজার ঐ কয়টা দিনের জন্যও—অবশ্য বাবাজীর পড়ার যদি কোন ক্ষতি না হয়—বাবাজীকে পাঠাইতে পারিলে তাঁহারা অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার মাতৃদেবীরও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ! অনুমতি পাইলেই তিনি লোক পাঠাইবেন।

অনঙ্গ আহারে বসিয়াছিল। মা আসিয়া শ্বশুরের চিঠি পড়াইয়া বলিলেন, "কি রে, যাবি?"

অনঙ্গ জলের গ্লাস মুখে তুলিয়াছিল; একটা বিষম খাইয়া গ্লাস নামাইল। মা বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, তা দেখ্ বাপু, তোর যদি পড়ার ক্ষতি না হয় বুঝিস্—"

পড়ার ক্ষতি! পড়া! পড়া! জীবনটা যেন শুধু নোট মুখস্থ করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল! পরীক্ষায় পাশ হইলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইবে! আর কোন কাজ নাই! মনটাকে আনন্দ-রস দিবার কোনই প্রয়োজন নাই! শুধু কলেজের কেতাবগুলা ষ্টীম-

রোলারের মত মনটাকে অহোরাত্র পিষিয়া বিদ্যাটাকে হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিলেই দুর্লভ নরজন্ম সার্থক হইবে—আর কি!

অনঙ্গ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "কোথায় নামতে হয়, কি রাস্তা—"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোকে ত আর তত্ত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি না, বাপ্—তাদের লোক এসে নিয়ে যাবে।"

"কবে যেতে হবে?"

"ষষ্ঠীর দিন না হয় যাস্—তাই লিখে দেব।"

"কিন্তু বিজয়ার প্রথম প্রণাম আমি তোমার পায়েই করতে চাই, মা—সকলের আগে তোমায় প্রণাম করা চাই।"

ছেলের কথা শুনিয়া মার মনটা ভিজিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "তা কতক্ষণেরই বা পথ! নবমীর দিন রাত্রের গাড়ীতে বেরুলে বিজয়ার দিন দুপুরবেলায় এখানে এসে পৌছুতে পারবি'খন।"

অনঙ্গর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এতখানি ভক্তি দেখাইয়া এটুকু সে বিলক্ষণ আশা করিয়াছিল, যে, মাও স্নেহ-বাৎসল্য দেখাইবেন, এবং ছুটিটা শ্বশুর বাড়ীতেই কাটাইয়া আসিতে বলিবেন। আহা, তাহাদেরও কি সাধ যায় না, নূতন জামাইটিকে লইয়া দুই দিন আমোদ-আহ্লাদ করে! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তখন সে ভাবিল, যাক্, কতদিন, কতদিন পরে চুনির সঙ্গে দেখা হইবে ত! সেই কবে বৈশাখের এক স্নিগ্ধ উষায় দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—চুনি যখন গাড়ীতে ওঠে, অনঙ্গ তখন নিজের ঘরে বিছানায় পড়িয়াছিল। আসন্ন বিরহ-বেদনায় বুক তাহার ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মম গৃহ! বিদায়ের পূর্ব্বে চুনির সঙ্গে দেখা করানোটাও কেহ উচিত বলিয়া মনে করে নাই! তারপর চিঠি-পত্র লিখিয়া সেই সদ্য পরিচয়-টুকুকে জাগাইয়া রাখিবারও কোন উপায় ছিল না! কে জানে, আবার নূতন করিয়া পরিচয় ঝালাইতে হইবে কি না! এখানে তাহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও চুনির কথা ভুলিতে পারে না—বই খুলিয়া সে বসে মাত্র, কিন্তু মন তাহার রঙীন্ ফানুসে চড়িয়া সেই অজানা পল্লীর কোন্ গৃহ-কোণে অহরহ এক বালিকার পিছনে উতলা হাওয়ার মতই ঘুরিয়া মরে! চুনিও কি সেখানে বসিয়া তাহার কথা এমন করিয়া ভাবে!

সপ্তমীর দিন বেলা বারোটার সময় অনঙ্গ শ্বশুরবাড়ী পৌছিল। অভ্যর্থনার ধূম দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্রামের পর স্নানাহার সারিয়া লইতেই দিদিশাশুড়ী কহিলেন, "একটু গড়িয়ে নাও, ভাই—রাত্রে গাড়ীতে ঘুম হয়নি ত।" এক সুমধুর সম্ভাবনায় অনঙ্গর প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক সম্মতি জানাইয়া দিদিশাশুড়ীর অনুসরণ করিল।

দক্ষিণের এক বড় ঘরে মেঝের উপর গদি-পাতা পাটি-বিছানো বিছানা ছিল। দিদিশাশুড়ীর ইঙ্গিতে অনঙ্গ আসিয়া বিছানায় বসিল। দিদিশাশুড়ী তাহাকে শুইতে বলিয়া সঙ্গিনী বালিকার দলকে তর্জ্জনের সুরে আদেশ দিলেন, "তোরা সব চলে আয়, দিকিন্—ও একটু ঘুমুক।"

এক-জনের আসার আশায় এপাশ ওপাশ

গড়াইয়া অনঙ্গর শেষে বিরক্তি ধরিল—সে কিন্তু আসিল না। অনঙ্গর মনটা ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল--এ কি রকম ব্যবহার! সে কি তোমাদের এখানে দুইখানা লুচি খাইতে আসিয়াছে, না, তোমাদের জমিদারী-পূজার সমারোহ দেখাইয়া তোমরা তাহার তাক্ লাগাইয়া দিতে চাও! সে ত কোনটারই ধার ধারে না। সে আসিয়াছে শুধু মিলনের ব্যগ্র প্রত্যাশা লইয়া—বিরহের গ্লানি মুছিতে! সে কথাটা কেহই কি খেয়াল করিবে না? অনঙ্গ ভাবিল, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সঙ্গে দেখা হইলে ইহার একটা বুঝা-পড়া করিয়া লইবে। শ্বশুরের পুত্র-দুইটি নেহাৎ নাবালক—তাহারা তাহাদের এই নূতন ভগ্নীপতিটির কাছে ঘেঁষ দিতে যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ করিল। দূর হইতে অনেকখানি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই তাহারা তাহাদের কৌতূহল পূরণ করিরা লইল। অনঙ্গ ভাবিল, তাহাদের একবার কাছে পাইলেও নয় চুনির কথাটা সে পাড়িয়া দেখে!

প্রকাণ্ড বাড়ী লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে, নানা চেহারার বিচিত্র নর-নারী তাহাকে দেখিয়া কৌতূহল মিটাইয়া লইতেছে, কিন্তু হায়, কোথায় তাহার সেই আপনার জনটি—চির-বাঞ্ছিতা প্রিয়া! তাহার চিত্তে কি একবিন্দুও কৌতূহল নাই! চুনি কি তাহাকে ভুলিয়া গেল? কথাটা মনে হইতেই এক গূঢ় বেদনায় প্রাণটা তাহার ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় শুভ্রবসনা এক কিশোরী আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "অনঙ্গ—"

অনঙ্গ ফিরিয়া দেখে, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা ননীবালা। ননী বাল-বিধবা; সুন্দর মুখে সংযমের শান্ত মাধুর্য্য, ঠোঁটের কোণে সরল হাসির দীপ্তি! সমস্ত অবয়বে লজ্জার এক কমনীয় লালিত্য ফুটিয়া রহিয়াছে। ননীর হাতে শ্বেতপাথরের ছোট একখানি রেকাবিতে জলখাবার। ননী দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বিন্দু—আসন নিয়ে এলি?"

এক প্রৌঢ়া দাসী আসিয়া আসন পাতিয়া দিল; ননী জলখাবারের রেকাবি নামাইয়া কহিল, "নাও ভাই, বসো।"

শ্বশুরবাড়ীর হৃদয়-হীন আচরণে অনঙ্গর একটু পূর্ব্বেই ভারী রাগ ধরিয়াছিল। কিন্তু এ মূর্ত্তির এই স্নেহময় সরল কণ্ঠস্বরে সে রাগ মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। সে কথার প্রতিবাদ করাও নিষ্ঠুরতা। অনঙ্গ আসনে বসিল।

ননী কহিল, "ওবেলায় পুজোর কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি, ভাই। কিছু মনে করো না। চুনিকে এত বোঝালুম, ঠাকুমা কত টানাটানি করলে, তা মেয়ে একেবারে লজ্জায় ঘাড় গুঁজে পড়ে রৈল। এত লোকজনের মাঝে—ছেলেমানুষ কি না—লজ্জায় আসতে পারলে না। এই গোলমাল—! তা তুমি ত দু-চার দিন আছ!"

অনঙ্গ ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল, না, কালই তাহাকে যাইতে হইবে—কাল নেহাৎ না ঘটে ত নবমীর দিনে যাওয়া চাইই। বাড়ীতে বিস্তর কাজ—দুই দিনের জন্যও যে-এই আসিতে হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি বারোটার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল।

জমিদার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান লোকে লোকারণ্য। শ্বশুর নব-জামাতাকে লইয়া আসরে বসিলেন; অনঙ্গ প্রমাদ গণিল। গেলরে, আজ রাত্রেও বুঝি চুনির সঙ্গে দেখার আশা একেবারেই ঘুচিয়া গেল! রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এ কি অসহ্য বেয়াদবি! হাতে পাইয়া এমনভাবে অপমান করা! হও না, তোমরা জমিদার—হোক্ না কেন, লক্ষ টাকা তোমাদের আয়—দেশের লোক আর সরকারের কাছে থাকুক তোমাদের খাতির! অনঙ্গও জামাই! তাহারও একটা প্রাপ্য খাতির আছে! সে ত আর পাড়াগাঁয়ের অজভূত নয় যে যাত্রার সং দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিবে! সে কি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তোমাদের এই পল্লীগ্রামের মজলিসে বসিয়া ঐ লক্ষীছাড়া তামাসা দেখিবার জন্য?

অথচ এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোন ইঙ্গিত করাও ভাল দেখায় না—আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। অনঙ্গ ভাবিল, একটা ফিকির করা যাক্! সে সেই আসরে বসিয়াই নিদ্রার ভাণ করিল। ঔষধ ধরিল। শ্বশুর কহিলেন, "তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়গে—" তখনই ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রচার হইল। ভৃত্য জামাইবাবুকে উপরকার ঘরে আনিয়া খাটের উপর শয্যা দেখাইয়া দিল।

রাত্রেও আশার সেই নিষ্ঠুর ছল-অভিনয়। ঘরের বাহিরে কাহারও নূপুরে সরমের মৃদু রাগিণী বাজিয়া উঠিল না—কাহারও চরণ-শব্দ পাওয়া গেল না! অনঙ্গর বুকটা অসহ্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। শুইয়া শুইয়া রাগে সে ফুলিতেছিল। প্রতিশোধ লইবার দারুণ বাসনা মনের মধ্যে বিষম ঝড় তুলিয়া দিল। তীব্র জ্বালায় অস্থি-পঞ্জরগুলা তাহার জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল। তাহার পর এই অকরুণ দেশের অকরুণ আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

—সহসা তাহার মনে হইল, পায়ের তলায় কে যেন আসিয়া বসিয়াছে! কার এ কোমল স্পর্শ! চুনির! অনঙ্গ চোখ খুলিল না। পায়ের কাছে নির্ব্বাক মূর্ত্তি নির্ব্বাক-ভাবেই বসিয়া রহিল। থাক্ বসিয়া—অনঙ্গ কখনই চুনির পানে চাহিয়া দেখিবে না, কোন কথা কহিবে না! রাত্রিটা কোন মতে পোহাইলে হয়,—সকলের প্রাণে প্রতিশোধের এমন মুষল হানিয়া সে প্রস্থান করিবে! কাহারও সহিত কথা কহিবে না—এখানে জলস্পর্শও করিবে না—দুই-চারিটা কথা যদি কহিতেই হয় ত তাহাতে এমন ঝাঁজ সে মিশাইয়া দিবে যে, সকলে বুঝিবে, হাঁ, এও একটা মানুষ! ইহারও খাতির করা চাই! জমিদারের জামাই বলিয়া সে যে অনাদর সহিয়াও পোষা কুকুরটির মত নিরীহ আবদারে লেজ নাড়িবে, তেমন পাত্র সে নহে!

ঐ যে পদতলাসীনা উঠিয়া দাঁড়াইল। অনঙ্গ চোখ চাহিল না। চুনি আসিয়া তাহার বুকের উপর মুখ রাখিল, কহিল, "আমায় মাপ কর লক্ষ্মীটি, লোকের ভিড়ে আমি আসতে পারিনি—পাছে সকলে ঠাট্টা করে—" অনঙ্গ তবু কোন কথা কহিল না। সে বড় বেদনা পাইয়াছে—এত বড় অপরাধ, এত সহজে তাহা ক্ষমা করা চলে না। চুনি বুকে মাথা রাখিয়াই কহিল, "কথা

করে না?” রাগে অনঙ্গর সমস্ত মনটা তখনও জ্বলিতেছিল। চুনিকে সজোরে সে ঠেলিয়া বুক হইতে সরাইয়া দিল। একটা শব্দ হইল। অনঙ্গর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সভয়ে সে উঠিয়া বসিয়া দেখে, কোথায় চুনি! কোথায় কে! এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে পাশ-বালিশটাকেই চুনি কল্পনা করিয়া ঠেলা দিয়া একেবারে খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে! বাহিরে জুড়ির দল তখন চীৎকার স্বরে গান ধরিয়াছে,

“ও রাই বসে আছ নিদ্রে ছেড়ে যারই আসার আশায়—
ওলো, যামিনী সে পোহায় সুখে চন্দ্রাবলীর বাসায়!”

পরদিন সকালে উঠিয়া অনঙ্গ জানাইল, আজ তাহাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। না গেলে বিস্তর ক্ষতি হইবে! যাওয়া চাইই!

শ্যালিকা ননীবালা আসিয়া বুঝাইল, শ্বশুর বুঝাইলেন, দিদি-শাশুড়ীও বিস্তর কথা পাড়িলেন, কিন্তু অনঙ্গর সঙ্কল্প অটল, অচল। অগত্যা সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বেলা তিনটায় ট্রেন। বারোটার সময় আহার শেষ হইলে ননীবালা চুনিকে অনঙ্গর ঘরে টানিয়া আনিল এবং একটা পুঁটুলির মতই ঘরের কোণে ধুপ্ করিয়া নিক্ষেপ করিয়া, বাহির হইতে চট্‌পট্ দ্বারে শিকল টানিয়া দিল।

অনঙ্গ কোন কথা না কহিয়া খাটের উপর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমন-ভাবে কাটিয়া গেলে সে এক-নিশ্বাসে কহিল, “আমি চললুম চুনি, তোমার হাড়ে বাতাস লাগবে, এবার। আর কখনো তোমার পথে বিঘ্ন হয়ে এসে দাঁড়াব না। তুমি এখানে পরম সুখে নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকতে পার। ভেবো, তোমার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা মরেছে, তোমার আপদ দূর হয়েছে—আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলুম! তোমার ছুটি—চিরদিনের জন্য ছুটি!”

এত বড়-বড় কথার খোঁচা যাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইল, সে খোঁচা কিন্তু তাহার গায়ে বিঁধিলও না। কাপড়ের আবরণে কুণ্ডলী পাকাইয়াই সে বসিয়া রহিল। অনঙ্গ ভারী ব্যথিত হইল। আহা, এমন কথাগুলা যে-কোন উপন্যাসে বা কবিতায় গুঁজিয়া দিলে কত খানি করুণ রস উথলাইয়া তুলিতে পারিত, পাঠকের শ্বাসরোধ হইত, চোখ ছল-ছল করিত,—আর সেগুলা কি না এই মূর্খ অজ্ঞ বালিকার বাক্‌হীনতার কঠিন অঙ্গে ঠেকিয়া একেবারে ব্যর্থ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল! হা রে অদৃষ্ট, এ কথায় পাষাণী প্রিয়া একটুও চঞ্চল হইল না! এ দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

অনঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া চুনির মুখের কাপড় টানিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, “চুনি—”

চুনি চমকিয়া তাহার আয়ত নয়নের এমন একটি নির্ব্বাক্ সজল দৃষ্টি অনঙ্গর মুখের উপর স্থাপিত করিল, যে, তাহাতে অনঙ্গর সর্ব্বশরীর ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। সে চোখের ভাষা বড় করুণ, বড় তীব্র! সকল মৌনতাকে নিমেষে সে মুখর করিয়া তুলিল। অনঙ্গ চুনির হাত ধরিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। বড় সুন্দর মুখখানি—নিদ্রা-হীনতার সুস্পষ্ট ম্লানিমা সে সৌন্দর্য্যে বেশ মধুর একটি লালিত্যের ছায়াপাত করিয়াছে। অনঙ্গর সংযম টুটিল। সে সেই

মুখখানি অজস্র. চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তাহার পর অনেক কথা সে কহিয়া গেল—এ কয়মাস তাহার অদর্শনে কি অসহ্য যন্ত্রণাই না সে ভোগ করিয়াছে; পূজার নিমন্ত্রণে কতখানি আশা বুকে লইয়া যে এখানে আসিয়াছিল! সে পূজা দেখিতে আসে নাই,যাত্রা শুনিতে আসে নাই, ভোজ খাইতে আসে নাই। সে আসিয়াছিল, তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব চুনির এই সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্য,তাহার সহিত দুইটা প্রাণের কথা কহিবার জন্য!

চুনি মাথা নীচু করিয়া সব কথা শুনিল—তারপর ম্লান চোখে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। যে জন্য তাহাকে এ ঘরে পাঠানো হইয়াছে, সেটা কোনমতে বলিয়া ফেলিলেই সে দায়-মুক্ত হয়—সেটুকু বলিবার জন্যই সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বেশীক্ষণ এ ঘরে থাকিলে গঙ্গাজলের কাছে প্রকাণ্ড কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এক-বাড়ী লোকের তীব্র বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মতই দাঁড়াইতে হইবে,—টিটকারীও বড় অল্প সহিতে হইবে না! সে বড় গলা করিয়া সঙ্গিনীদের বলিয়াছিল, "আমার অমন বরকে দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে না!" তাই স্বামীর বক্তৃতা থামিলে প্রথম অবসরে সেই কথাটাই সে পাড়িয়া বসিল। অদর্শন, বিরহ-যন্ত্রণা, এগুলা সে কিছুই বুঝিত না—মা ও ঠাকুমার শেখানো বুলিই আওড়াইয়া গেল। চুনি কহিল, "আজ ত তোমার থাকবার কথা ছিল। সকলেই বলছে, থাকো না!"

"থাকা হয় না, চুনি।"

"মা বলছিল,ঠাকুমা বলছিল, দিদি বলছিল—আজ তুমি মনে করলেই থাকতে পারতে!"

"পারতুম, চুনি,কিন্তু এখন আর পারা যায় না। কাল রাত্রে তুমি যদি একটিবার আসতে, তাহলে আজ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতুম।"

"তবে যে বলেছ, তোমার কি কাজ আছে, সেখানে?" চুনির মুখে হঠাৎ কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অনঙ্গ বলিল, "সে কাজ এ ক'দিন পরেও হতে পারত।"

"তবে বুঝি কাজের কথাটা মিছে করে বলেছ?" চুনির ঠোঁটে হাসিটুকু এবার আরও স্পষ্ট হইয়াই ফুটিল।

অনঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,"তাই বটে! তোমার উপর অভিমান করেই বলেছি। কি জন্যে থাকব এখানে? কেনই বা থাকবো? তোমার সঙ্গে দু'দিন মোটে দেখাই হল না।...কাল এলে না কেন রাত্রে? যাত্রা শুনছিলে, বুঝি?"

"হাঁ।"

অনঙ্গ আবার একটা খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "যাত্রা কেমন শুনলে?"

সুস্পষ্ট সহজ স্বরে উত্তর মিলিল, "বেশ। তুমি উঠে গেলে কেন? বাবার কাছে বসেছিলে, আমি চিকের আড়াল থেকে দেখছিলুম! তোমার বুঝি ভাল লাগছিল না?"

অনঙ্গ কহিল, "না।" পরক্ষণে একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, "তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে? সেই ত কবে দেখেচ!"

চুনি হাসিয়া বলিল, "বা রে, তা বুঝি মানুষ চিনতে পারে না? তার উপর তোমার সে ফটোগ্রাফখানা মা যে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরেই টাঙ্গিয়ে রেখেছে।"

"সে ফটোগ্রাফ তুমি রোজ দেখ! লজ্জা করে না? কেউ যদি ধরে ফেলে?"

"সে ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাই ত আর লোক থাকে না।"

এ কথায় অনঙ্গ আনন্দ পাইল। তবে চুনি পাষাণী নয়—তার হৃদয় আছে!

বাহির হইতে এমন সময় ননী কহিল, "তোমার গাড়ী তৈরি, অনঙ্গ।"

চুনি খাট হইতে একেবারে ঝাঁপাইয়া দূরে সরিয়া গেল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তাহলে আসি। মাকে তা হলে বলব কি যে, আজ তোমায় যেতেই হবে?"

এ কথার কোন উত্তর অনঙ্গ আর দিতে পারিল না। তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। নিজের হঠকারিতায় নিজের উপর রাগও যে না ধরিয়াছিল, এমন নয়। নিজেই ত সে অধৈর্য্যের ঝোঁকে নিজের সুখটুকুকে পায়ে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! তাহার কলিকাতায় ফিরিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? কিছু না! তবে? শুধু রাগের মাথায় একটা কথার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বৈ নয়। কিন্তু সেই কথাটুকুর জন্যই যে কোনমতে আর থাকিয়া যাওয়া যায় না! লোকে কি ভাবিবে? প্রকৃত কারণটা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—সকলে উপহাসের হাসি হাসিবে! ওদিকে আবার গাড়ী অবধি প্রস্তুত! নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। ব্যস্তবাগীশ হওয়ার এই ফল! ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ধৈর্য্যহারা, আর-একটু যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতিস্!

ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "নেহাৎ ভাই চললে! আমাদের বড় কষ্ট রইল কিন্তু! ভাল করে দুটো কথা-পর্য্যন্ত কইতে পেলুম না! কি করব বল,—তোমার কাজের ক্ষতি হবে বলছ,—কাজেই আমরাও আর জেদ করতে পারি না। মা বড় দুঃখ করছিলেন!"

অনঙ্গ ভাবিল, না হয়, সে কাজের কথা বলিয়াই ফেলিয়াছে—তাহাতেই কি-এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল! তোমরা কি একটু জেদ করিতেও জানো না? আর-একবার সকলে মিলিয়া একটু জেদ করিলেই যে থাকিয়া যাই! ওগো, কর, একবার তোমরা একটু জেদের-অনুরোধ কর।

কিন্তু হায়, সে অনুরোধ, সে জেদ কেহ করিল না। দিদিশাশুড়ী শুধু বলিলেন, "বড়দিনের ছুটিতে আবার এসো, দাদা—এ আমোদ-আহ্লাদ কিছুই হল না।"

শাশুড়ী পল্লীগ্রামের মেয়ে, জমিদারী-বাড়ীর পুরাতন প্রথা ঠেলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না—অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেচারা অনঙ্গকে যাইতে হইল। যাইবার সময় দিদিশাশুড়ীর দিকে চাহিয়া, বাহিরে ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া সচেষ্ট একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেও, ভিতরটা তাহার ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল।

গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। পথের দুইধারে বাগানের সারি—বাগানের গাছ-পালা, শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীর এই শ্যামল শ্রী, সমস্তই অনঙ্গর চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এখনও যে আশা মোটেই নাই, এমন

নয়! ট্রেনখানা যদি কোন-গতিকে ফেল করা যায়! আহা, তেমন ভাগ্য—ঐ যে রেল-লাইন দেখা যায়—সিগনাল কৈ পড়িয়া নাই ত! অনঙ্গ ঘড়ি খুলিয়া দেখে, ট্রেনের সময় উৎরাইয়া গিয়াছে! তাহার আঁধার চিত্তের মধ্যে আশার একটু ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল।

ষ্টেশনে গিয়া সে শুনিল, টাইম্ হইয়া গিয়াছে বটে, তবে ট্রেণ এখনো আসে নাই—ট্রেণ লেট্! শ্বশুরের যে কর্ম্মচারীটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। ট্রেণ ফেল হলে আজ আমায় কম বকুনি খেতে হত! বাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন, ট্রেণ ধরিয়ে দেওয়া চাইই, নাহলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।" কর্ম্মচারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল, এবং বিড়ি কিনিবার উদ্দেশ্যে চুরুট-ওয়ালার সন্ধানে সরিয়া পড়িল। অনঙ্গ অত্যন্ত হতাশভাবে প্লাট-ফর্ম্মের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল; মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোক-বিন্দুতে পরিণত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রেত-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে! এমন সময় ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং রেলের কুলি হাঁকিল, "কলকাত্তা-যানে-ওয়ালা গাড়ী ছোড়া—টিকেট্-টিকেট্—"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সিগার-সঙ্গীত

"দাঁতে চাপিয়া চুরুট-চোঙা—
আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া।"

(১)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার!
ভাবি শুধু কেন তুমি হ'লে না bigger?—
তা' হ'লে একটিবার জ্বালি' দেশালাই
বেলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।
তোমার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
লীলায়িত নীলে নীলে হ'তাম নিলীন,
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন।

(২)

সে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈপ্সিত! সুন্দর!
ক্লিয়োপেট্রা-প্রেতিনীর ছায়া-কলেবর
নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
ধোঁয়ায় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মদির তুমি; ওগো অপরূপ!
ও eager চুমা পেলে হব আমি চুপ;—
মুখ হ'য়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁ ঝিঁ—বিশ্ব থম্ থম্।

(৩)

হে সিগার! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া Looping the loop!
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া।
গুপো সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট আত্মীয়;
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাভানার মেয়ে।

(৪)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম-শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা!—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণরেখা অতীব সহজে!
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই।
সিগার! ফিনিক্স-পাখী! মরিয়া-অমর!
তব ছাই মোর কাব্যে হের থরেথর।

(৫)

হে সিগার! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তন্দ্রার আরতি;
তোমারি ধোঁয়ায় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর পারে আহা রয়েছে নোবেল্!
ও বেল পাকিলে, বল, কিবা আসে যায়?
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায়।

(৬)

হে সিগার! ফুস্ফুসের হে Grave-digger!
তোমারে আরাধ্য ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেশী!
সংহত আপনা-মাঝে বালখিল্য-বেশী!
দিগ্বসনা দিগঙ্গনাগণের নগ্নতা
হরিছ হরির মত!—একি কম কথা?—
ধোঁয়ায় দ্রৌপদী শাড়ী বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া!

(৭)

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগম্বর,
কল্কে-বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর;
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হুঁকা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি নিজে আল্‌বোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা,
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোয়ান্,
কল্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান্!

(৮)

হে সিগার! সেবি হে তোমারে দিনযামি,
তোমার বিরহে কভু বাঁচিব না আমি;
চেয়ে চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদ্গার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার!
Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোঁয়ায়।
যতদিন যমে ফাঁক না করে দু' ঠোঁট
ঠোঁটে ও চুরোটে মোর রবে এক-জোট।

(৯)

হে সিগার! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরাম-কেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধূম
বাসুকীর মত ফণা বিস্তারিছে তব;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমার প্রসাদে হৈনু, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা! হেন লয় মনে!
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি ভুঁড়ি ফুঁড়ি' ওঠে পদ্মযোনি।

(১০)

হে সিগার! প্রেমাগার! সে সখা সিগার!
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায়; হে অনন্তরূপ!
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ্
এ দাস তোমার প্রভো! ভোঁতা হয় নিব্—
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে টিপ্ টিপ্!
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি
স্বরগের স্বপনের ধোঁয়া-ধাপ সিঁড়ি!

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

সমালোচনার কথা

(পাঠকের পত্র)

সম্পাদক মহাশয়,

বাঙ্গলা-দেশে সমালোচনার হাওয়া আজ কাল খুব জোরে বইছে দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ সৃষ্টি কর্‌বার কিছু থাকে ততক্ষণ সমালোচনার অবসর ততটা হয় না; সৃষ্টির কাজ ফুরিয়ে এলেই সমালোচনার পালা আরম্ভ হয়। তার মানে, সৃষ্টি করা কাজটি একটু কঠিন। তাতে এমন-কিছু চাই যা ঘসে-মেজে হয় না; যা বিধাতা মগজের ভিতর না দিলে চেষ্টা করে' পাবার উপায় নাই। স্বয়ং বিধাতা সৃষ্টি করেছেন; তাঁর সে কাজটা সকলে অনুকরণ করতে পারে না কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের তর্ক তুলে ও বিজ্ঞানের মাটীর প্রদীপ ধরে তাকে পরখ কর্‌বার চেষ্টা করতে ছাড়ে না।

বোধ হয় সেইজন্যই বাঙ্গলা দেশে দেখ্‌ছি যে-সব লেখক সাহিত্যের আখড়ায় মাত্র 'সারেগামা' সাধতে সুরু করেছেন, অথবা পাঠশালার পুঁথির মুখস্থ বুলি কপ্‌চানো যাঁর এখনো শেষ হয় নি তাঁরাই সব-চাইতে পাকা সমালোচক হবার কসরৎ করচেন। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র কথায় এ-দলের মধ্যে যার সব-চাইতে কম বয়স, সেই সকলের চেয়ে জ্যাঠা, বোধ হয় এর কারণ এই যে সমালোচনা জিনিষটাকে এঁরা খুব সহজ বলে জানেন। কতকগুলি অভদ্র-রকম গালি ও কবির্‌ দলের অশ্লীল রকম 'চাপান' দেওয়াটাকেই এঁরা সমালোচনার সার মনে করেছেন। অবশ্য গালাগালি দেওয়াটা খুব সহজ কাজ, এ বিষয়ে কারো মত-ভেদ নাই। স্বয়ং বিধাতাকে পর্য্যন্ত যখন লোকে গাল দিয়ে ভূত-ছাড়া করেছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ ছার!

এই সব বালখিল্য লেখকদের কলমের খোঁচায় বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশেষ-কিছু অনিষ্ট হবে কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে কেউ অনাদর কর্‌তে শিখ্‌বে, সে-ভয় আমার বিন্দুমাত্র নাই। আমার কেবল যা কিছু ভয় হচ্ছে, এই সব অকালপক্ক লেখকদের নিজেদের জন্যই। হঠাৎ-প্রসিদ্ধ হবার যে অদ্ভুত উপায় তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাতে আর কারো কিছু না হোক্‌, তাঁরা নিজেদের যে মাথা খাচ্ছেন তা বোধ হয় বুঝতেও পার্‌ছেন না। 'পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম' নবীনদের পক্ষে বিশেষ করে গুরুতর দোষ। এতে তাদের ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হয়। জগতের যাঁরা শ্রদ্ধা-ভাজন তাঁদের অশ্রদ্ধা দেখানো, মাননীয়দের অমান্য করা কি সমালোচনার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন? যদি কোন বিষয় কারো কাছে সত্যবিরোধী বা ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়, তা কি ভদ্র ভাষায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা যায় না? যাঁরা সাহিত্যগুরু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁদের কাছে অগ্রসর হতে হয়, নইলে অদৃষ্টে যা জোটে তার নাম অষ্টরম্ভা! যাঁরা

পৃথিবীতে সমালোচনায় 'ঝানু' বলে বিখ্যাত তাঁরা ত সকলেই বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রবলভাবে সমালোচনা কর্‌বার সময়েও যথেষ্ট সংযম, ধীরতা ও শীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মিল সাহেব সার উইলিয়ম হ্যামিল্‌টনের মতবাদকে খণ্ড খণ্ড করে কাট্‌তে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সেই অপ্রিয়কর কার্য্যে একটিবারও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না; মাননীয়ের প্রতি যে মান, তা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেই আপনার মত স্থাপন করবার চেষ্টা আগাগোড়া করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকারেরা প্রতি পক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোথাও পূজনীয়দের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেনি। ফল কথা শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধার এই অভাব এক প্রকার হৃদ্রোগ বিশেষ। যাঁদের এই রোগে ধরেছে, তাঁদের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে যথার্থ ই ভাবনা হয়।

আমরা আজকাল ধর্ম্মে সমদর্শিতা নিয়ে খুব কোলাহল সুরু করেছি ও সেজন্য অনেক অনুষ্ঠানেও হাত দিয়েছি। কিন্তু সাহিত্যেও যে 'সমদর্শিতা'র একটা স্থান আছে তা আমরা অনেকেই ভুলে' গেছি। সবাই যে এক-মতের হবে এমন কথা নয়। তাই বলে ভিন্নমতাবলম্বীকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিতে হবে? না রচনা-বিশেষের অবান্তর অংশ গ্রহণ করে মক্ষিকা-বৃত্তির পরিচয় দিতে হবে? সমগ্রের দৃষ্টি না থাকলে ব্যাপারটা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়ই হয়ে ওঠে। অপরের মতকে উদার ভাবে সহ্য কর্‌বার শক্তি যাদের নাই, সাহিত্যের আনন্দ-দরবারে যোগ দেবার কোন অধিকার তাদের আছে বলে আমার মনে হয় না। নিজেদের মতকে প্রমাণ কর্‌বার জন্য এই সব ভুঁইফোড় লেখকেরা এমনই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে অন্যের মতকে সমগ্রভাবে দেখ্‌বার শক্তিও তাঁদের থাকে না। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের একজন নায়ক (সন্দীপ) সীতাদেবীর উপর কটাক্ষ ক'রে কথা বলেছে। তাতেই কোন ধুরন্ধর সমালোচক সিদ্ধান্ত ক'রে বসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সীতাদেবীকে গালমন্দ দিয়েছেন। বাহবা যুক্তি! এই যুক্তি নিয়ে বোধ হয় কেবল বাঙ্গলা দেশেই সমালোচনা চলতে পারে। রামায়ণের রাবণ যদি সীতাদেবীকে গালাগালি দেয়, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু তাই ব'লে বুড়া বাল্মীকিও আপন মানসদুহিতার নিন্দাদোষে দোষী হয়েছেন, এ যদি কেউ সিদ্ধান্ত করে বসেন, তবে তাঁর বিচার-শক্তি কতকটা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মতই যে সূক্ষ্ম, তাতে আর সন্দেহ নাই। সময় সময় আমার মনে হয় যে বঙ্কিমের সেই গজপতিই তাঁর 'খুঙ্গী পুঁথি' নিয়ে বাঙ্গলার সমালোচক-অবতারে দেখা দিয়েছেন।

সূর্য্য জগতের প্রাণ—তিনি সকলকে প্রকাশ করেন। তাঁর আগমনে সকলে আনন্দিত হয়। কিন্তু এমন-এক জাতীয় জীব আছে যারা সেই সূর্য্যেরই আলো সহ্য করতে পারে না; আনন্দের

পরিবর্ত্তে তাদের হৃদয়ে বিষাদেরই আবির্ভাব হয়। সকল দেশেই এবং সকল সময়েই তেম্‌নি এমন-একদল লোক থাকে, যারা প্রতিভার আলো সহ্য কর্‌তে পারে না। সে আলোয় তাদের হৃদয় শতদলের মত বিকশিত না হয়ে কুঁকড়ে যায়। কুকুরেরা যেমন চাঁদ দেখে একরকম অজ্ঞাত ভয়ে চীৎকার করতে থাকে, মানুষ-সমাজে এই সব লোকেরা তেম্‌নি প্রতিভার আলোতে ভয়ে দিশেহারা হয়ে নানারূপ আবোল তাবোল বক্‌তে থাকে। ধর্‌তে গেলে এরা করুণারই পাত্র। যে সনাতন ঈর্ষাবৃত্তি মানুষ-হৃদয়ে পশুত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান থেকে, তাকে নানা দুঃখের আবর্ত্তে পাক খাওয়াচ্ছে, সে-ই এদের হৃদয়ে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে এদের প্রতিভার শত্রু করে তোলে। দাস-জাতির মধ্যে এই ঈর্ষাটা বেশী-পরিমাণে বাড়্‌তে দেখা যায়। তাই দাসজাতির মধ্যে প্রতিভার আবির্ভাব হ'লে, তারা তাকে বুঝতে পারে না, গালাগালি দেয়। কিন্তু নিজের ঘরের যে ধনে তারা ইচ্ছা করেই বঞ্চিত হয়, বিশ্বমানব তার দ্বারা লাভবান হয়ে ওঠে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

উড়িষ্যা।

ডাকাত !

ক

পাশের বাড়ীতে বিয়ে; কিন্তু গয়না সব স্যাক্‌রার বাড়ীতে—গয়না নহিলে মেয়েদের নেমন্তন্ন রাখা হইবে না। গয়না-গুলো রং করিতে দেওয়া হইয়াছে—হুকুম পাইলাম, সেগুলো যেমন-করিয়া হোক্ আজকেই ফিরাইয়া আনা চাই-ই-চাই!

স্যাক্‌রার দোকানে হাজির হইয়া গয়না-গুলো চাহিলাম। সে হাতযোড় করিয়া বলিল, "বসুন বাবু, অ্যাদ্দূর থেকে এলেন, একটু তামুক ইচ্ছে করুন।"

আমি হচ্ছি স্যাক্‌রার একজন মস্ত খদ্দের। বুঝিলাম, সে আমাকে কিঞ্চিৎ আপ্যায়িত না-করিয়া অমনি-অমনি ছাড়িবে না। অতএব, বসিলাম।

স্যাক্‌রার দোকানগুলিকে অনায়াসে সরকারি বৈঠকখানা বলিতে পারা যায়। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এখানে সকালে-বিকালে পাড়ার যত সত্যমিথ্যা গুজব, নিন্দা, কুৎসা ও ঘোঁট পাকাইয়া উঠিতে থাকে।

তামাকের মিঠে-কড়া ধোঁয়ায় বেড়ে মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় একটা আধ্‌বুড়ো লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দোকানে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে শুনেছ!"

স্যাক্‌রা বলিল, "কি?"

নেশার আরামে তখন আমার চোখদুটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ধূম্রকুণ্ডলীর ফাঁক দিয়া সেই অবস্থায় দেখিলাম, আগন্তুকের মুখ-চোখ গল্প বলিবার আগ্রহে ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। খবরটা নিশ্চয়

যে-সে খবর নয়—শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

"মুখুয্যেদের বাড়ীতে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে যে!"

—"কখন্ মশাই, কখন্?"

—"এইমাত্র। পাড়ায় থাকো—পাড়ার কোন খবর রাখ না—কি-রকম লোক হে!"

—"এঁজ্ঞে, একটা গোলমাল শুন্‌ছিলুম বটে। কিন্তু নিজের দোকান ফেলে ত আর পরের বাড়ীর ডাকাতি দেখতে যেতে পারি না মশয়, আমার দোকান দেখে কে?"

—"হুঃ, দোকান দেখা! চোখে-কানে এরা দেখতে-শুনতে দিচ্ছেনা হে বাপু—এরা সেই হাওয়া-গাড়ীর বাবু-ডাকাত, হাতে এদের ইয়া ইয়া পিস্তল! লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে! এই ছাখনা, মুখুয্যেদের জমিদারী থেকে আজ অনেক টাকা এসেছিল, এরা ঠিক সে সন্ধান পেয়ে দেউড়ীতে এসে হাজির! পিস্তলের একটি আওয়াজ শুনেই যত সব পাঁড়ে-দোবে-চোবের দল রাধা-কিষণকে টিকির মধ্যে লুকিয়ে ভোঁ-দৌড়, ডাকাতদের চেহারা দেখেই মুখুয্যে-মশাই ভিরমি খেয়ে চিৎপটাং, ডাকাত-বাবুরা সোজা এসে বুক ফুলিয়ে সোজাই চলে গেল, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল জমিদারীর সমস্ত টাকার তোড়া, মেয়েদের সমস্ত গয়না!"

—"অ্যাঁ—বলেন কি, বলেন কি! তারপর?"

—"তারপর—কাল শুনো সব। খবরটা টাট্‌কা থাক্‌তে-থাক্‌তে সবাইকে আগে শুনিয়ে আসি"—লোকটা যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, তেমনি হঠাৎ অন্তর্হিত হইল।

এতক্ষণে আমার স্তিমিত নেত্র আশ্চর্য্য-রূপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্যাক্‌রা আমার পানে ফিরিয়া সভয়ে বলিল, "মশয়, শুনলেন!"

"হুঁ।"—বলিয়া হুঁকায় একটি সুখ-টান্ মারিতে গিয়া দেখিলাম, বহুক্ষণ চুম্বন-অভাবে অভিমানিনী হুকাসুন্দরীর প্রেম-বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। হুকাটি স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলাম, "তাইত, এখন উপায়?"

স্যাক্‌রা দোকানে কুলুপ লাগাইতে-লাগাইতে বলিল, "আমি ত মশয়, বাসায় চল্লুম।"

—"তাত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমি কি করব? সঙ্গে এতগুলো গয়না, যেতেও হবে অনেকটা!"

—"আসি মশয়, নমস্কার!"—আমার কথার কোন জবাব না দিয়া, স্যাক্‌রার পো ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে চট্‌পট্ চম্পট দিল।

খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। শীতের রাত্রি। কুয়াশা আর অন্ধকারে চারি-দিক ঝাপ্‌সা।

খ

গয়নাগুলো পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া উঠিলাম। এদিকে ওদিকে চাহিয়া লোকজন বড় নজরে ঠেকিল না—ডাকাতের ভয়ে যে যার বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজায় খিল আঁটিয়াছে।

বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে-কাঁপিতে প্রাণটি হস্তগত করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। আমার বাড়ী শ্যামবাজার, এখান থেকে

দেড় মাইলেরও বেশী। প্রত্যেক গলি-ঘুঁজির মুখ দিয়া যাই, আর বুকটা দুদ্দুড়্ করিয়া উঠে! মনে হয়, ঐ অন্ধকারে, আনাচে-কানাচে নিশ্চয়ই কোন-একটা বদ্‌খত্ চেহারা পিস্তল বাগাইয়া লুকাইয়া আছে—দিল বুঝি মাথার খুলি উড়াইয়া! সেই লোকটার কথা মনে হইল, 'এরা লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে!'—ও বাবা, আমার কাছে গয়না আছে এরা কি সেটা টের পাইয়াছে? তা আর পায় নাই—যার যা কাজ! এ-সব খবর না রাখিলে কি এদের ব্যবসা চলে? চারিদিকেই এদের চর ঘুরিতেছে—তাদের চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নয়। যে লোকটা ডাকাতির খবর দিয়া গেল সেই যে চর নয় তাই-বা কে বলিতে পারে! তারপর হঠাৎ মনে পড়িল, স্যাক্‌রার কাছ থেকে গয়নাগুলো লইয়া আমি যখন কাপড়ে বাঁধিতেছিলাম, তখন রাস্তা দিয়া একটা চোয়াড়ে চেহারার লোক কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে চাহিতে-চাহিতে গিয়াছিল। নিশ্চয় সে ডাকাতের চর! এতক্ষণ সে তার দলকে কি আর খবর দেয়-নি যে, আমার কাছে একরাশ গয়না আছে!

রাস্তায় মাঝে-মাঝে লোকজন চলিতেছে, তাদের সকলকেই ডাকাত বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল। দু পা যাই—আর চমকিয়া উঠি। হঠাৎ দেখি, একখানা মোটরগাড়ী দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে-করিতে আমার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। গাড়ীতে অনেকগুলো লোক! যতক্ষণ-না গাড়ীখানা আমাকে পার হইয়া চলিয়া গেল, ততক্ষণ আমি একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া গা ঢাকা দিয়া দুরু-দুরু প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বড় রাস্তায় আসিয়া প্রাণটা তবু কতকটা ধাতস্থ হইল। এখানে এত ভিড়, পুলিসের এমন কড়া পাহারা,—ডাকাতের দল এ-রকম জায়গায় নিশ্চয়ই কারুর গলা টিপিয়া ধরিতে পারিবে না!

শ্যামবাজারের দিকে যতই আগাইতেছি, রাস্তার ভিড় ততই পাতলা হইয়া আসিতেছে—আর আমার ভয় ততই চরমে উঠিতেছে। তবে, ভরসা এই যে, আর মিনিটদশেক মা-কালীর ইচ্ছায় ভালয়-ভালয় কাটিয়া গেলেই বাড়ী পৌঁছিতে পারিব।

হঠাৎ আমাদের পড়্‌শী রামবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি ঝোড়ো কাকের মত কোত্থেকে হে?"

—"স্যাক্‌রার বাড়ীতে গিয়েছিলুম রাম-দা।"

—"কেন?"

চুপিচুপি বলিলাম, "গয়না আনতে।"

—"দিন-কাল ভাল নয়—খুব সাবধান।"

—বলিয়া, তিনি যেদিকে যাইতেছিলেন, সেইদিকেই চলিয়া গেলেন।

খানিক আগাইয়া একবার পিছনে ফিরিলাম। কিছু তফাতে আর-একজন লোক! একটু তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিলাম।

গ

রাত্রিকালে শ্যামবাজারের রাস্তায় একেই লোকজন কম চলে, তাহাতে এখন আবার শীতকাল। চারিদিক নিসাড়। আমার পায়ের জুতা ঠুকিয়া 'ফুটপাথে' বেজায় খট্‌খট্ শব্দ

হইতেছিল। কিন্তু, সেইসঙ্গে, পিছনে আর-একজনেরও পায়ের শব্দ পাইতে লাগিলাম। আবার ফিরিয়া দেখি, সেই লোকটা তখনও আমার পিছনে-পিছনে আসিতেছে। গ্যাসের আলোয় যতটা বোঝা গেল,—লোকটা খুব ঢেঙ্গা, মোটাসোটা, ষণ্ডা, একরকম গুণ্ডা বলিলেই হয়। তার হাতেও একগাছা ছড়ি,—না, তাকে শীর্ণ সংস্করণের বংশযষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত– কেননা, সে-রকম লাঠি হাতে থাকিলে কোঁচানো কোঁচা ঝোলানো এবং অভাগার মাথা ফাটানো—এই দ্বিবিধ কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

এ ডাকাত-টাকাত নয় ত—আমার পিছু নেয় নাই ত? পরখ করিবার জন্য একটা পানওয়ালার দোকানের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। অকারণে এক পয়সার পান কিনিলাম। পিছনের লোকটাও রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া পড়িল। পান কিনিয়া আমি অগ্রসর হইলাম, সেও অমনি চলিতে সুরু করিল। আমি একটা গলির ভিতর ঢুকিলাম, সেও সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকিল।

না—কোন সন্দেহ নাই, এ আমারই পাছু লইয়াছে। মনে হইল, স্যাকরার দোকানে আমার দিকে যে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া গিয়াছিল, এ নিশ্চয় সেই লোক না-হইয়া আর যায় না! আমার বাড়ী দেখিয়া গিয়া দলের লোককে খবর দিবে, তারপর সকলে মিলিয়া আমার বাড়ী লুঠিয়া টাকা ও গয়না সব লইয়া যাইবে।

আমার বুক টিপ্‌-টিপ্ করিতে লাগিল;—এখন উপায়? ইহাকে কিছুতেই আমার বাড়ী দেখানো হইবে না। সেখানে গিয়া যদি গুলি-টুলি চালায়, তাহা হইলে এক-সঙ্গে ধনে-প্রাণে মজিব এবং মরিব।

চলিতে-চলিতে হঠাৎ ডানদিকের একটা সরু গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর অপথ-বিপথ-কুপথ এমন-কি আঁস্তাকুড় মাড়াইয়াও, অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে, হোঁচট খাইতে-খাইতে, মাথা ঠুকিতে-ঠুকিতে যেখানে গিয়া নাক ঘষিয়া গেল, সেখানে আমার মাথার চাইতেও উঁচু এক পাঁচিল! সেখানে আলোও নাই—পথও নাই। তাইত, কি করি? কোনদিকেই যে সুরাহা নাই! যেদিকেই তাকাই, চোখে খালি সর্‌ষে ফুল দেখি! খানিক ভাবিয়া স্থির করিলাম, যা থাকে কপালে—পাঁচিল ত টপ্‌কাই, ওপারে হয়ত রাস্তা আছে। নহিলে, যে পথে আসিয়াছি সে পথে আবার যদি ফিরি—নাঃ, ফেরার কথা ভাবিবামাত্র বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! আমি তার চোখে ধূলা দিবার ফিকিরে আছি দেখিয়া ডাকাত নিশ্চয়ই বেজায় খাপ্পা হইয়া আছে। বিঘোরে প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে পাঁচিল-টপ্‌কানো ঢের ভাল অথচ সহজ।

দিলাম এক লাফ! তারপর—ওপাশে নামিতে-না-নামিতে, যুগপৎ হৃদয় এবং শ্রবণভেদী চীৎকারে আকাশ এবং পৃথিবী কম্পিত—প্রকম্পিত করিয়া ও আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল—"ওরে বাবারে—চোর, চোর, খুন করলে—খুন!"

সেই অহেতুক, অন্যায় ও অভদ্র চীৎকার আমাকে একেবারে পাথরের মত অচল করিয়া দিল বটে, কিন্তু, অচল হইলেও চলিতে হইবে,—কি করি? ঐ যে দুম্‌দাম করিয়া জানলা-দরজা খুলিয়া গেল না? ও

বাবা, ওরা কারা—কেউ লাঠি-হাতে, কেউ আলো-হাতে, কেউ বঁটি-হাতে—এ যে জ্বলন্ত উনুন ছাড়িয়া ফুটন্ত তেলে আসিয়া পড়িলাম! আমার সংবর্দ্ধনার জন্যই কি এই বিপুল আয়োজন? না মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন, এরূপ সশস্ত্র অভ্যর্থনায় আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই, অতএব—

—দিলাম আর-এক লাফ,—যে পথে আসিয়াছি সেই পথে ফিরিতে!

কিন্তু লোকগুলো বিষম চালাক এবং চট্‌পটে। আমি নিরাপদ-ব্যবধানে যাইতে-না-যাইতেই তাদের একজন খপ্ করিয়া আমার একখানা পা যত-জোরে-পারে ধরিয়া ফেলিল।

আমি কিন্তু ততোধিক চালাক! ইঁদুরের মত জাঁতিকলে পড়িয়াই আমার মাথা খুলিয়া গেল! কৃত্রিম যন্ত্রণায় কাত্‌রাইয়া উঠিলাম—"ছাড় বন্ধু, ছাড়, পা ছাড় হে! পায়ে ফোড়া—উঃ, উঃ!"

ফোড়ায় হাত পড়িলেই হাত সরাইয়া লইতে হয়—এ হচ্ছে সংস্কার! যে আমার পা ধরিয়াছিল, তাহার বজ্রমুষ্টি চকিতে আল্‌গা হইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমিও—সর্পমুখচ্যুত ভেকের মত—ঝুপ্ করিয়া অন্ধকারে খসিয়া পড়িলাম।

যে আমাকে এমন বাগাইয়া পাক্‌ড়াও করিয়াছিল, আমাকে ছাড়িয়া দিয়াই হতাশ-ভাবে পাঁচিলের ওপাশ হইতে সে বলিয়া উঠিল,—"ঐ যাঃ!"—অর্থাৎ, তার মনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সাধুর পায়ে ফোড়া হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয় আর চোরের পায়ে যত বড়ই ফোড়া হোক্ না কেন, সে পা আরও জোরে চাপিয়া ধরা কর্ত্তব্য!

পা-উঁচু এবং মাথা-নীচু করিয়া অন্ধকারে যে কোথায় ঠিক্‌রাইয়া পড়িলাম—ভগবান জানেন, কিন্তু আমার মনে হইল যেন, ধড়ের উপর হইতে আমার মাথাটির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে! পড়িয়াই উঠিলাম—কেননা, মাথা থাক্ আর যাক্—পা যখন আছে, তখন এ-সময়ে বন্-বন্ বেগে সেই পদযুগল ব্যবহার করা ছাড়া মুক্তিলাভের 'নান্যঃ পন্থা'! এবার ধরিলে আর কিছুতেই বাঁচিব না—আগে প্রহার, পরে কারাগার! আমার এ ডাকাতের গল্প শুনিবে কে?

উঠিলাম এবং—বলাবাহুল্য—ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মতই ছুটিলাম, এখানে-সেখানে দুচারবার ধাক্কা খাইয়াও ছুটিলাম, ইটে লাগিয়া দুবার হোঁচট ও একবার ডিগবাজী খাইয়াও ছুটিলাম, কাছা খুলিয়া ও একপাটি জুতা হারাইয়াও ছুটিলাম,—একেবারে গলির মোড়ে গিয়া থামিলাম—কারণ, থামিতে হইল।

—গলির মুখ জুড়িয়া দাড়াইয়া আছে সেই বিপুলবপু—ডাকাত!

আমাকে দেখিয়াই সে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"এই যে—পেয়েছি!"

আমি একদম থ! দুর্গানাম জপিতে-জপিতে ভাবিলাম, কার খপ্পরে পড়া উচিত? যে আমার ঠ্যাং ধরিয়াছিল, তার হাতে,—না, উপস্থিত যে আমার সুমুখে মূর্ত্তিমান, তার হাতে? একদিকে দমাদ্দম্ বেদম প্রহার ও অন্ধকার কারাগার—আর-একদিকে মুহূর্ত্তে সংহার—ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর—শ্রেয় কি? চালাক মন বলিল, পুনর্ব্বার

মধ্যপথের যাত্রী হও—শ্রেয় হচ্ছে, পলায়ন (পার যদি)।

কোনরকম পূর্ব্বাভাস না দিয়া আচম্‌কা ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিলাম—"কে তুমি?" তেমন জোরে জীবনে আর-কখনো চেঁচাই নাই।

ডাকাত বিনামেঘে এমন বেয়াড়া বজ্রনাদের আশা একেবারেই করে নাই—সে চম্‌কাইল, ভড়কাইল, পিছনে হঠিল। সেই ফাঁকে পাশ কাটাইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রাণপণ পলায়ন!

আমার প্রাণ পলায়নের দিকে নিবিষ্ট থাকিলেও, কাণ ছিল ঠিক ডাকাতের দিকেই। দ্রুত পদশব্দে বুঝিলাম, সেও ছুটিতেছে। ভাগ্য-লক্ষ্মী বুঝি এইবার আমার পক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মোড় ফিরিতেই দেখি, সামনে মস্ত এক গাছ। পণ্ডিত-কথিত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের অভ্যাস এখনও ভুলি নাই; সুতরাং একটুও ইতস্তত না করিয়া চট্‌পট্‌ গাছের উপরে উঠিয়া গেলাম।

ও-রাস্তায় বহু কণ্ঠে বিচিত্র ধ্বনি উঠিল, "ধর্‌ বেটাকে!" "মার্‌, মার্‌!" "পুলিশ, পুলিশ!" কিছুক্ষণ এমনি হট্টগোল চলিল। তারপর সব চুপচাপ।

প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর মনে পড়িল, যারা আমার চরণ ধারণ করিয়াছিল, চোর ধরিবার আশা নিশ্চয়ই তারা ত্যাগ করে নাই। আমাকে না পাইয়া, ধাবমান ডাকাতকে দেখিয়া, চোর-সন্দেহে নিশ্চয়ই তারা সে গোঁয়ারটাকেই পাক্‌ড়াও করিয়াছে! গাছের টঙ্গে বসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তেত্রিশ কোটিকে গড়্‌ করিতে লাগিলাম। তারপর নামিলাম।

হে মা কালী, এ যাত্রা প্রাণে-প্রাণে ভারি বাঁচাইয়া দিয়াছ; আমি অকৃতজ্ঞ নই মা, কালিঘাটে কাল তোমার নামে এবং আমার পয়সায় জোড়া পাঁঠা পড়িবে।

ঘ

পাশের বাড়ীতে মেয়েদের নেমন্তন্নে যাইতে একটু রাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তারা নেমন্তন্নে গিয়াছিল এবং গয়না পরিয়াই। গয়না আনিতে এত দেরি হইল বলিয়া গিন্নীর নথ প্রথমটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার ইতিহাস শুনিয়া—মুখনাড়া ত দূরের কথা—অচিরে তাঁকে নথনাড়াও বন্ধ করিতে হইল। তিনি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে মেয়েলি অভিধান হইতে এমন-কতকগুলো সুনির্ব্বাচিত শক্ত শক্ত বিশেষণ ডাকাতদের সপ্তগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগ করিলেন, যাহা শুনিলে যে-কোন ভদ্র দস্যু কাণে হাত দিয়া লজ্জায় এবং অপমানে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হইত! সেইরাত্রেই গৃহিণীর মুখে আমার অপূর্ব্ব বিপদ এবং অপূর্ব্বতর উদ্ধারলাভের কাহিনী পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত হইয়া পাড়াময় রটিয়া গেল।

পরদিন সকালে বসিয়া-বসিয়া গত রাত্রির ব্যাপারখানা ভাবিতেছি, এমন সময় বাহিরে আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। গলাটা অচেনা।

নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু সদর দরজায় গিয়া যে ডাকিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া ও মাথা ঘুরিয়া গেল। এ যে সেই,—ডাকাত! এখানে কেন? প্রতিশোধ নিতে?

ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে পায়ে-পায়ে বাড়ীর ভিতরদিকে পিছাইতে লাগিলাম।

ডাকাত হাত তুলিয়া আদেশ দিল, "দাড়ান!"

হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আমার পিঠ্‌টা আগে দেখুন"—বলিয়া সে জামা তুলিয়া গম্ভীরবদনে আপনার পৃষ্ঠদেশ আমাকে দেখাইল। সমস্ত পিঠটা যুড়িয়া লম্বা, গোল নানা আকৃতির কালশিরা পড়িয়াছে, কত ঘা লাঠি, জুতা ও ঘুষি খাইলে মানুষের পিঠের দশা অমনধারা সাংঘাতিক হইতে পারে, সেটা অনুমান করা অসাধ্য।

ডাকাত চোখ পাকাইয়া বলিল, "আমার এ দশা কার জন্যে, বলুন দেখি?"

কিছু বলিলাম না—আমার কাঁপুনি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

ডাকাত আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আপনার জন্যে—বুঝেছেন, আপনার জন্যে।"

আমি বোবা বনিয়া ঘাড় হেঁট করিলাম।

ডাকাত বলিল, "পাড়ায় যা রটিয়েছেন, তা আমি শুনেছি। তাই শুনেই বুঝে নিয়েছি, আপনি কে!—জানেন মশাই, কাল আমায় গারদে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল? জানেন মশাই, কতকষ্টে আমি খালাস পেয়েছি? জানেন মশাই, হাজতে কত বড় বড় মশা আছে? জানেন মশাই, কাল সারারাত সজাগ থেকে হাজার হাজার মশার সঙ্গে আমায় একা লড়্‌তে হয়েছে?"—ডাকাত ক্রমে আমার কাছে আসিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া উর্চ্চ-স্বরে বলিল, "আর জানেন কি—আমি কে?"

মনে-মনে বলিলাম, "বলা বাহুল্য।"

ডাকাত বলিল, "একজন গোবেচারী বর-যাত্রী। আপনার পাশের বাড়ীতে নেমন্তন্নে আসছিলুম। থাকি দূর পাড়াগাঁয়ে। ট্রেণ ফেল্‌ করাতে ঠিক সময়ে বরযাত্রীর দলে মিশ্‌তে পারি-নি। কনের বাড়ী চিনি না—পথের লোককে জিজ্ঞেস করে-করে আসছিলুম। একটি বুড়ো ভদ্রলোক আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'ওঁর বাড়ী কনের বাড়ীর পাশে - ওঁর পিছু-পিছু যান।' (ভদ্রলোকটিকে রাম-দাদা বলিয়া আন্দাজ করিলাম) তাই আসছিলুম মশায়ের পেছনে-পেছনে।"

নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—যা, শুনিতেছি, এ কি সত্য? বেকুব বনিয়া বাধো-বাধো গলায় বলিলাম, "আপনি—আপনি কি ডা—!"

হো-হো করিয়া হাসিয়া সে বলিল, "আমি কেন—আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেউ ডাকাত হয়নি। আপনি ভেবেছিলেন আমি ডাকাত। যারা আমায় হাজতে পাঠিয়েছিল, তারা ভেবেছিল আমি চোর কি খুনে। কিন্তু কেউ ভাবলে না যে, আমি নিরীহ বরযাত্রী-মাত্র। আজ সকালে যখন বিয়েবাড়ীতে এসে হাজির হলুম, তখন মশায়ের 'অপূর্ব্ব উদ্ধারলাভে'র গল্প শুনে নিজের দুঃখে কাঁদব কি, হাস্‌তে-হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়! অ্যাঁ! এ যে একেবারে আস্ত উপন্যাস!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছন্নছাড়া

(১০)

মে-মাসে সিল্‌ভ্যাঁ আমার ভেড়ার দলে একটা ছাগী জুটিয়ে দিলে। তাদের বিয়ের দশ-বছর পরে একটি খোকা হয়েছে, তাকে দুধ-দেবার জন্যে সে এইটি কিনেছিল। দলের মধ্যে সে ছিল সব-চেয়ে দুষ্টু;—তাকে সাম্‌লাতে আমি একেবারে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যেতুম। তারই দুষ্টুমিতে আমার ভেড়ার পাল ভরা যব-ক্ষেতের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ত। ক্ষেতের দুরবস্থা দেখে চাষা আমায় বকত; বলত, নিশ্চয় আমি কোথাও বসে ঘুমুচ্ছিলুম আর সেই সুযোগে ভেড়াগুলো ক্ষেতে সেঁধিয়ে সব তচ্‌-নচ্‌ করেছে। রোজ আমায় পাইন-বনের ধার দিয়া যেতে হত; ছাগলটা তিন লাফে তার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ত, আমি তাকে খুঁজতে যেতুম, আর এদিকে ভেড়াগুলো ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

প্রথম দিন, সে নিজের থেকেই ফিরে আসবে এই আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম; গলার স্বর যতদুর পারি মিষ্টি করে তাকে কত ডাকলুম; কিন্তু কোনো ফল হল না। শেষে নিজে গিয়েই ধরে আনা স্থির করলুম। কিন্তু বাচ্ছা বাচ্ছা পাইনগুলো এত ঘন যে কোথা-দিয়ে তার সন্ধানে যাবো খুঁজে পেলুম না; অথচ তাকে ছেড়ে যেতেও পারলুম না। যেখান-থেকে সে অদৃশ্য হয়েছে সেই জায়গাটা আমার মনে-মনে ঠিক ছিল, আমি সেই দিকে যেতে লাগলুম—কাঁটাগুলো মুখে এসে লাগবে বলে মুখের সাম্‌নে হাত আড়াল দিলুম। ঠিক সেইসময় আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকে দেখা গেল। তার একটা শিং ধরবার জন্যে যেমন হাত বাড়িয়েছি সে অমনি ডালপালা ঠেলে পিছু হঠে গেল—তারই একটা ঝাপ্‌টা আমার মুখে এসে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে পাকড়াও করে তাকে ফিরিয়ে আনলুম। আবার তার পরদিন ঠিক তাই—এম্‌নিধারা রোজ চলতে লাগল। আমি তখন ভেড়াদের যবের কাছ থেকে খানিক-দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে তবে তার খোঁজে ছুটে যেতুম। তার গায়ের রং ছিল সাদা। প্রথম-দিন তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে সে ঠিক যেন মাদ্‌লিনের মতন। ওদের দুজনের চোখ ঠিক এক-রকমের - সেই ফাঁক-ফাঁক! পাইন বন থেকে তাকে টেনে বার করবার সময় সে আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকত; আমার মনে হত মাদ্‌লিন নিশ্চয় ছাগল হয়ে এসেছে। তাকে আমি বলতুম, আর এমন দুষ্টুমি কোরো না!—কেন আমায় এত দুঃখ দাও! আমার ঠিক বোধ হত সে আমার সব কথা বুঝচে! বন থেকে হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি করে বেরুবার সময় আমার মাথার চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, আমি সেগুলোকে সাম্‌নের দিকে এনে ফেলবার জন্যে মাথা নাড়তে থাকতুম, তাই দেখে ছাগলটা ভয়ে ভ্যা-ভ্যা করতে-করতে লাফিয়ে উঠত। সে শিং নীচু করে

আমার দিকে এগিয়ে আসত আর আমি আমার চুল উল্টে-ফেলে তার মুখের সামনে নাড়তে থাকতুম। আমার চুল খুব লম্বা ছিল —মাটি অবধি লুটিয়ে পড়ত। তাই দেখে সে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ছুটত। যতবার সে পাইন বনের মধ্যে যেত, ততবার আমি এমনি-করে চুল নেড়ে ভয় দেখিয়ে প্রতিশোধ নিতুম। একদিন সকালে যখন আমি ছাগলটাকে নিয়ে এমনিতর করচি, হঠাৎ সিল্‌ভ্যাঁ সেখানে এসে পড়ল। হো-হো করে তার হাসি—হাসির পর হাসি! আমি যে লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাবো খুঁজে পেলুম না। আমি তাড়াতাড়ি আমার চুলের গোছা পিছন-দিকে উল্টে ফেল্লুম—ছাগলটা তখন আমার কাছে আস্তে আস্তে ফিরে এল; ঘাড়টা এগিয়ে দিয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল, আর কোমরটা এমনি মজার-রকম করে বাঁকাতে লাগল যে দেখে হাসি পায়। চাষা আর হাসি থামাতে পারে না—হাসিতে সে একেবারে ভুমড়ে পড়েছিল, বুক চেপে ধরে হো-হো শব্দে তার হাসি। আমি তখন তার চেহারার মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছিলুম সে তার ভুরু, দাড়ি আর তার সেই টুপিটা। তার সেই হাসির শব্দে আমার চোখ ফেটে যেন কান্না আসতে লাগল। তারপর হাসি যখন থামল সে আমায় জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি! আমি ছাগলটার দুষ্টুমির কথা সব বল্লুম। সে তাকে আঙুল দেখিয়ে শাসাতে-শাসাতে আবার হাসতে লাগল। মার্ত্তিন্ পরের দিন তাকে মাঠে নিয়ে গেল, কিন্তু তার পর-দিন বল্লে যে চাকরি ছাড়তে হয় তাও রাজি কিন্তু অমন ছাগল সে নিতে পারবে না—ছাগল ত নয় যেন দস্যি!

বুড়ি বিবিশ্ বলত ছাগলদের না মারলে-ধরলে সায়েস্তা হয় না। আমার মনে আছে আমি একবার মাত্র আমার ছাগলটিকে মেরেছিলুম। উঃ তার বুকের পাঁজরের ভিতর থেকে যে গুম্‌গুম্ শব্দ উঠল! আমি আর তার গায়ে হাত তুলতে পারতুম না। সে গোলাবাড়ির মধ্যে ছাড়া থাকত, নিজের খুসি-মতো দৌড়ধাপ করে বেড়াত; তার পর একদিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার যে কি হল, কোথায় সে গেল, আমরা কোনো খোঁজ পেলুম না।

সেণ্টজন-ভোজের দিন এগিয়ে আসছিল। আমার এখানকার আসার দিনটা নিয়ে একটা সাম্বৎসরিক উৎসব করবার জন্যে ইউজেন বল্লে আমায় গাঁয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে। এই উপলক্ষ্যে চাষার স্ত্রী তার ছেলেবেলাকার একটা হল্‌দে পোষাক আমায় উপহার দিলে। গ্রামের নাম স্যাঁৎ মঁতাঞ্; তার একটি মাত্র রাস্তা; তারই শেষে একটা গির্জ্জে। মার্ত্তিন্ আমায় সঙ্গে করে উপাসনায় নিয়ে গেল—যখন গিয়ে পৌছলুম তখন কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সে একটা বেঞ্চির উপরে আমায় ঠেলে বসিয়ে দিলে, এবং নিজে আমার সাম্‌নের বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল। আমার পিছনে দুজন মেয়ে বসে অনবরত কাল্‌কের বাজার-করার কথা বকে যাচ্ছিল এবং দরজার কাছের লোকগুলো বেশ মন-খুলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা কইছিল। পাদ্রীমশায় যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তাদের কথা বন্ধ হল। আমি ভাবলুম এইবার তিনি

উপদেশ আরম্ভ করবেন, কিন্তু তিনি কেবল কতকগুলো বিয়ে-হবার সংবাদ ঘোষণা করলেন। যেমন তিনি এক-একটা নাম উল্লেখ করছিলেন অমনি মেয়েরা ডাইনে বাঁয়ে ঝুঁকে পড়ে হেসে উঠছিল। প্রার্থনা করবার কথা আমার একটিবারও মনে হয়নি। আমি মার্ত্তিনের দিকে চাইলুম—সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। কালো কোঁকড়া চুলের গোছা তার সেই নক্সা-করা টুপির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তার কাঁধ চওড়া, তার গায়ের সাদা জামা কোমরের কাছে একটা কালো ফিঁতে-দিয়ে বাঁধা। সবসুদ্ধ নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে তার মধ্যে ভারি-একটি পরিচ্ছন্নতা ও নবীনতা ফুটে উঠেছে। অথচ গুরুমা বলেছিলেন যে যারা ভেড়া চরায় তাদের মতন নোংরা আর নেই। মার্ত্তিনের কথা আমার মনে হতে লাগল। তার সেই ছোট ডোরা-কাটা ঘাগরায় তাকে কেমন সুন্দর দেখায়! তার পায়ের মোজাটি সর্ব্বদা টান করে আঁটা, চামড়া-মোড়া কাঠের জুতো-জোড়াটি পরিষ্কার, —কালি মাখিয়ে সেটিকে সে সর্ব্বদা চক্‌চকে করে রাখে। কাজে তার অমনোযোগ ছিল না, ভেড়ার পালটিকে সে খুব যত্নে রাখত; চাবার স্ত্রী প্রায়ই বলত যে সে তার পালের প্রত্যেক ভেড়াটির ধাত জানে। যখন আমরা গির্জ্জে থেকে বেরিয়ে এলুম সে আমায় একলা ফেলে একটি বুড়ির কাছে দৌড়ে গেল, ভারি-একটি আদরের সঙ্গে তাকে চুমু খেলে। তারপর সে যে কোথায় গেল দেখতে পেলুম না। আমি একলাটি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম—কি করি! খানিক দূরে দেখলুম একটা হোটেল, —সেখান থেকে গলার আওয়াজ আসছিল, ডিস ও প্লেটের খট্‌খট্ শব্দও শুনতে পাচ্ছিলুম। দলে দলে লোক তার মধ্যে প্রবেশ করছিল; দেখতে-দেখতে বাইরে আর কেউ রইল না। মার্ত্তিন্ এসে আমায় নিয়ে যাবে তার অপেক্ষায় আমি গির্জ্জেয় ফিরে যাচ্ছিলুম, এমন সময় ইউজেনের সঙ্গে আমার দেখা। সে আমার হাত ধরে হাসতে হাসতে বল্লে—"ভাগ্যিস্ তোমার পোষাকের রং এমন হলদে, নইলে হয় ত তোমায় চিন্‌তেই পারতুম না।" সে আমার দিকে এমনি করে চাইতে লাগল যেন আমাকে নিয়ে একটা কৌতুক করছে এবং মনে হল যেন কিসের জন্যে তার ভারি একটা আমোদ হচ্ছে। সে আমাকে স্কুলমাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল; বল্লে, একে খেতে দাও, আর স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একে বেড়িয়ে নিয়ে এস। স্কুলমাষ্টারের পোষাক সহুরে লোকের মতন; ইউজেন একটা নীল রঙের ঢিলে জামা পরেছিল। তার সঙ্গে মাষ্টারের এত ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। খাবার আসার অপেক্ষায় আমি যখন বসে আছি সেইসময় মাষ্টারমশায় এসে আমাকে একখানা রূপকথার বই দিলেন। বেড়াবার সময় হয়ে-এলে আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছিলনা, মনে হচ্ছিল বইখানা বেশ একলা বসে শেষ করি!

সবুজ ঘাসের উপর রৌদ্র ও ধুলোর মধ্যে ছেলেমেয়েরা নেচে বেড়াচ্ছিল। আমার মনে হতে লাগল তাদের নাচ ভারি এলো মেলো, আর চীৎকার বড় বিকট।

আমার মন ভারি অবসন্ন হয়ে আসছিল। সন্ধ্যাবেলা গাড়ি করে যখন গোলাবাড়িতে ফিরলুম, আবার সেই নির্জ্জনতার মধ্যে এসে যেন আমার প্রাণ আশ্বস্ত হল,—আবার সেই মেঠো গন্ধ পেয়ে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

(১১)

এর কয়েকদিন পরে একদিন বন থেকে ফিরে আসছি এমন সময় একটা ভেড়া বেড়ার ধারে চরতে-চরতে হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠল। কি হল দেখবার জন্যে আমি ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি তার নাকটা রক্তে ভেসে গেছে। আমার মনে হল বোধ হয় একটা খুব বড়গোছের কাঁটা ফুটিয়ে এইরকম রক্ত বার করেছে, সেই জন্যে শুধু ধুয়ে-মুছে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত রইলুম। পরদিন সকালবেলা তার চেহারা দেখে আমি শিউরে উঠলুম—তার সমস্ত মাথাটা ফুলে উঠে তার ধড়টা যত-বড়, তত-বড় হয়েছে। সেই দেখে আমার এমনি ভয় হল যে আমি চীৎকার করে চেঁচিয়ে উঠলুম। মার্ত্তিন ছুটে এল—সেও দেখে চেঁচিয়ে উঠল; একে একে সবাই এল। আমি তাদের কাছে কাল্কের ঘটনা খুলে বল্লুম। চাষা বল্লে, নিশ্চয় ওকে বিষাক্ত বিছে কামড়েছে; এখন ওর ভালো করে যত্ন-নেওয়া দরকার—যে পর্য্যন্ত না ফুলো একেবারে কমে যায় সে পর্য্যন্ত গোয়াল থেকে বার করা নয়। আমার মনে হচ্ছিল বটে, বেচারার সেবা করতে পেলে আমি আর-কিছু চাইনা, কিন্তু যখন তার কাছটিতে আমি একলা থাকতুম, ভয়ে আমার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করত। তার সেই ছোট্ট দেহের উপর প্রকাণ্ড সেই মাথাটা দেখে ভয়ে পাগলের মতন হয়ে পড়তুম। সেই বড়-বড় ড্যাব্-ডেবে চোখ, সেই বিকট মুখ, সেই লম্বা খাড়া কান এমন-একটা দৈত্যের মতন চেহারার সৃষ্টি করত যা সহজে কল্পনাতেও আনা যায় না। বেচারা গোয়ালের মধ্যিখানটিতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকত;—সেখান থেকে নড়ত না, পাছে দেয়ালের গায়ে একটু লেগে যায়। আমি তার কাছে যাবার চেষ্টা করতুম—মনকে বোঝাতুম ও ত একটা ভেড়া বৈ ত নয়—কিন্তু তবুও কাছে এগতে পারতুম না। আবার কিন্তু যেই সে আমার দিকে চাইত আমার বড় মায়া করতে থাকত। এক একসময় আমার মনে হত তার সেই বিকট মুখখানা নেড়ে-নেড়ে সে যেন আমায় তিরস্কার করছে। তারপর আমার মাথার ভিতরেও সেইরকম নড়া দেখতুম। আমার মনে হত বুঝি পাগল হয়ে যাব। আমি দেখলুম তাকে না-খেতে দিয়ে মেরে ফেলা আমার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাই আমি রাখালটাকে সব কথা খুলে বল্লুম। সে বল্লে, যতদিন না ফুলো কমে যায় সে তাকে খেতে দেবে। কিন্তু সে আমায় ঠাট্টা করতে লাগল;—একটা রুগ্ন ভেড়া দেখে ভয়-পাবার যে কি আছে, আশ্চর্য্য!

অল্পদিন পরেই কিন্তু তার এই উপকারের একটা প্রতিদান আমি দিতে পেরেছিলুম। তাতে আমার মনটা ভারি খুসী হয়ে উঠেছিল। একদিন সকালবেলা গোয়াল থেকে ষাঁড়টাকে ছেড়ে দেবার সময় সে পা-পিছলে তার সাম্নে পড়ে গেল। ষাঁড়টা তার গায়ের

কাছে নাক নিয়ে গিয়ে শুঁকতে লাগল। ষাঁড়টা ছিল জোয়ান, এবং একটু বুনো-রকমের; এই গোলাবাড়িতেই সে প্রতি-পালিত হয়েছিল। রাখালটা তাকে ডরাত। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ষাঁড়টা যে তাকে তার পায়ের সামনে পড়ে থাকতে দেখেছে এ আর সে ভুলচে না। আমার ইচ্ছা হতে লাগল তাকে বুঝিয়ে দিই যে এতে ভয়ের কিছু নেই; কিন্তু কি বল্লে যে তার ভয় ভাঙবে তা ঠিক করতে পারলুম না। আমি সেই দিন হঠাৎ দেখে অবাক হলুম যে সে কতটা বুড়ো হয়ে পড়েছে! তার মাথার টুপিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল—সেই সব-প্রথম আমি লক্ষ্য করলুম যে তার মাথার চুল সব পেকে গেছে। সমস্ত দিন আমি তারই কথা ভাবতে লাগলুম। তার-পর-দিন সকালে যখন গোরু-গুলোকে এক-এক-করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আমি সেই-সময় গোয়ালের মধ্যে গেলুম। রাখাল ষাঁড়টার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল—ষাঁড়টা তার বাঁধনের শিক্‌লিটা যেন টেনে ছিড়ে ফেল্‌বে এমনি করছিল। আমি তার কাছে গিয়ে,পিঠে তার হাত বুলিয়ে শিকলটা খুলে দিলুম; রাখালটা এক-পাশে সরে দাঁড়াল; সে ঝড়ের মতো বেগে গোয়াল থেকে বেরিয়ে গেল—যেন ক্ষেপে গেছে! রাখাল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থেকে তার পিছন-পিছন দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে গেল। সেই ফুলো ভেড়াটার কাছে যেতে আমার যতটা ভয় হত, ষাঁড়টার কাছে তেমন হতনা। রোজ সকালে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে গোয়ালে গিয়ে তাকে খুলে দিতুম। কিন্তু ইউজেন্ দেখতে পেয়ে-ছিল। একদিন সকালে সে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সেই ছোট-ছোট চোখ আমার চোখের উপর রেখে বল্লে—"তুমি কেন রোজ ষাঁড় খুলে দাও?" আমার ভয় হতে লাগল। সত্যি কথা বল্লে রাখালটা হয়ত বকুনি খাবে, তাই আমি কি উত্তর দেব ভাবতে লাগলুম। আমি এমনিধারা কথা বলতে লাগলুম যাতে বোঝায় আমি খুলিনি! ইউজেন অমনি জিব-দিয়ে টক্-করে একটা শব্দ করে বলে উঠল—"অাঁ! তুমি মিছে কথা বল!" আমি তখন সব-কথা তাকে খুলে বল্লুম। পরের শনিবার ষাঁড়টাকে তারা বিক্রি করে ফেল্লে।

(১২)

আমি লক্ষ্য করতুম সবাইয়ের প্রতি ইউজেনের সমান স্নেহ। যখনই লোকজনদের নিয়ে চাষার কোনো গোল বাধত, সে অমনি তার ভাইকে ডেকে আনত;—সে এসে সব হেঙ্গাম মিটিয়ে দিত। সিল্‌ভাঁ যে-সব কাজ করত ইউজেনের কাজও তাই ছিল—কেবল সে বাজারে যেতে চাইত না। সে বলত যে সামান্য একটু খুদ-কুঁড়ো বিক্রি-করবার ফিকিরও সে জানে না। সে আস্তে আস্তে চলত—একটু দুলে-দুলে, যেন তার বলদদের চলার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে। প্রায় প্রতি রবিবার সে সাঁৎ মঁতাঞ্ যেত। কেবল আকাশ পরিস্কার না থাকলে ঘরে বসে বই পড়ত। আমি আশা করে থাকতুম হয়ত কোনো দিন সে বই ফেলে উঠে যাবে; কিন্তু তার ভুল কখনো হত না; সে প্রত্যেক বার বইখানি হাতে-করে নিজের ঘরে নিয়ে যেত। আমার এই দুঃখটাই তখন সব-চেয়ে

বেশি বোধ হত যে সেখানে কোথাও পড়বার কিছু খুঁজে পেতুম না। যেখানে যেটুকু ছাপা কাগজ দেখতুম, কুড়িয়ে নিতুম। চাষার স্ত্রী বলত যে আমি একজন পাকা কৃপণ হয়ে উঠচি। এক রবিবারে আমি সাহসে বুক বেঁধে ইউজেনের কাছ থেকে একখানা বই চাইলুম। সে একখানা গানের বই আমায় দিলে। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা আমি সেই বইখানা মাঠে নিয়ে যেতুম; যে-গানগুলো আমার সব-চেয়ে ভালো লাগত সেখানে বসে-বসে তাতে সুর বসাতুম। শেষে তা একঘেয়ে হয়ে উঠল। তার পর একদিন পলিনের সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতে করতে কতকগুলো পাঁজি পেয়ে গেলুম। পলিন বল্লে, সেগুলোকে উপরকার খুব্‌রীতে তুলে রেখে আসতে। আমি যেন নিয়ে যেতে ভুলে গেছি এমনি ভান করলুম; তার পর লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়বার জন্যে সেগুলোকে এক-এককরে সরিয়ে ফেল্লুম। কত মজার মজার কথা তাতে ছিল। সেবার সমস্ত শীতকালটা যে কোথা দিয়ে গেল বুঝতেই পারলুম না।

তারপর যখন সেগুলোকে খুবরী-ঘরে নিয়ে গেলুম, তখন সমস্ত ঘরটা খুঁজতে লাগলুম যদি দু-একখানা পড়বার কিছু পাই। যা একখানা বই পেলুম তার মলাট নেই। কোণগুলো তার গুড়িয়ে গেছে;—যেন বইখানা কারুর পকেটে-পকেটে অনেক দিন ধরে ঘুরেছে। প্রথম-দুখানা পাতা তার ছিল না, তিনের পাতাটা এত নোংরা যে ছাপার হরফ পড়া যায় না। আমি একটু ভালো করে দেখবার জন্যে জানলার কাছে ধরলুম; দেখলুম বইখানার নাম—"টেলিমেকসের গল্প।" আমি এখানটা-ওখানটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলুম, যেটুকু পড়লুম তাই এত ভালো লাগল যে তৎক্ষণাৎ বইখানা পকেটে পুরে ফেল্লুম।

কিন্তু খুবরী-ঘরটা থেকে যখন নেমে আসছি হঠাৎ মনে হল হয় ত ইউজেন বইখানা ওখানে রেখেছিল, আবার কোনো সময় নিতে আসবে। তাই যেখান-থেকে এনেছিলুম সেই কালো বরগাটার উপরে বইখানা ফের রেখে এলুম। তার পর যখনই একটু ফাঁক পেতুম সেখানে গিয়ে দেখতুম বইখানা তখনো আছে কি-না এবং যতটা পারি সেই অবসরে পড়ে নিতুম।

(১৩)

ঠিক সেই সময় আর-একটা ভেড়ার অসুখ হল। পেট তার একেবারে পড়ে গেল—যেন অনেকদিন কিছু খায় নি। আমি চাষার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ভেড়াটার কি করতে হবে? সে তখন একটা মুরগী ছাড়াচ্ছিল; আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"পেট কি 'দম্‌সম্‌' হয়েছে?" কথাটার মানে কি, প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। তার পর আমার মনে হল হয়-ত অসুখ হলেই 'দমসম' হওয়া বলে। তাই আমি বল্লুম—"হাঁ!" কথাটাকে আরো ভালো করে পরিস্কার করবার জন্যে বল্লুম—"হাঁ, পেট একেবারে দড়ি হয়ে গেছে!" পলিন শুনে হাসতে লাগল। ইউজেনকে ডেকে বল্লে—"ইউজেন শুনেছ? মারি ক্লেয়ারের একটা ভেড়ার পেট দমসম হয়ে একেবারে চেপ্টে গেছে।" শুনে সে হাসতে লাগল। বল্লে, ভেড়ার কাজ আমি এখনো কিছুই শিখিনি।

তার পর সে বুঝিয়ে দিলে যে 'দমসম' মানে পেট ফুলে ওঠা।

দুদিন পরে পলিন আমায় বল্লে যে তার নিজের ও তার স্বামীর ধারণা যে আমার দ্বারা ভেড়ার কাজ কস্মিনকালে ভালো-রকম হবে না; এইবার তারা আমায় দাসীর কাজ করতে দেবে। কারণ বুড়ি বিবিশ্ আর পারে না, পলিনও ছেলে নিয়ে কাজ-কর্ম্ম সব দেখবার সময় পায় না। যেমন তাদের মুখে এই কথা শুনলুম অমনি আমার মনে হল যে এইবার তাহলে আমার ঘন-ঘন সেই খুবরী-ঘরটায় যাওয়ার সুবিধে হবে; আমি আনন্দে পলিনকে চুমু খেলুম, তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলুম। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শিল্প-প্রসঙ্গে

পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য ভাস্কর আবিষ্কার করিবেন না,—করিবে জন-সাধারণ। যে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনি শিল্পসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার রহস্য যতটুকু পারি—আমিই তবে ব্যক্ত করিব। ভুল বুঝিয়া থাকিলে আপনি তাহা সুধ্রাইয়া দিবেন।

আমার ত মনে হয়, দেহের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া প্রাণের যে অস্থিরতা,—মানবতার সেই দিক্‌টা ফুটাইবার জন্য আপনি সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। আপনার গড়া সকল মূর্ত্তিতেই দেখি ঘৃণ্য অস্থি-মাংসের পেষণচক্রে নিষ্পেষিত হইয়াও, তাহাদের আত্মা সর্ব্বদাই আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

আপনার গঠিত সেণ্টজন, ক্যালের নাগরিকগণ ও ভাবনা প্রভৃতি প্রস্তরমূর্ত্তিতে এ সত্যটি যেন জল্-জল্ করিতেছে। আপনি ব্যালযাকের যে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাতে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি কল্পনার বিরাটতায় উদ্‌ভ্রান্ত ব্যালযাকের প্রতিভা আপন দীনদেহকে সুধুই যে অবহেলা করিতেছে,—তাহা নহে; পরন্তু নিজের কাজে তাহাকে গোলামের মত লাগাইয়া রাখাইয়াছে। আচার্য্য, আমার কথা কি যথার্থ?"

চিন্তিত ভাবে শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে-করিতে রোঁদা কহিলেন, "তোমার কথার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করিব-না।"

—"আপনার গড়া আ-বক্ষ মূর্ত্তিগুলিতে ঐহিকতার শৃঙ্খলে বন্দী প্রাণের অধীরতা বোধহয় আরও-বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির প্রায় সকলকেই দেখিলে সেই কবি-বাণী স্মরণ হয়:—

'উড়িবার আগে পাখী যেমন যে ডালে বসে, সেই ডাল নোয়াইয়া দেয়, তাহার

ব্যালয্যাক

যান বাস্তবে তাহার সমগ্র পরিচয় দিতে পারেন না।

আপনি যত কামিনী মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাহাদের মধ্যে লাক্সেমবার্গের শিল্পশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিটি সব-চেয়ে মনোহর। স্বপ্ন-লোকের অপরিমেয় গভীরতায় ঝাঁপ দিয়া, সে মূর্ত্তির মাথা যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, সে যেন চঞ্চল ও দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে।

আপনার আ-বক্ষ মূর্ত্তি-গুলি, ওলন্দাজদের ওস্তাদ-শিল্পী রেমব্রাণ্ডের চিত্রের কথা মনে করাইয়া দেয়; কারণ তাঁহার চিত্রলিখিত পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় যে অনন্তের ধ্যানে তন্ময়, এটি বুঝাইয়া দিবার জন্য, তিনি উপর হইতে আকাশের জ্যোতিঃধারা বর্ষণ করিয়া তাহাদের ললাট উদ্ভাষিত করিয়া তুলিয়াছেন।”

রোঁদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—“রেমব্রাণ্ডের সঙ্গে আমার তুলনা,—মহতের একি অপমান! রেমব্রাণ্ড – শিল্পজগতের সেই বিরাটপুরুষ—আমি, আর তিনি! ভেবে দেখ, বন্ধু! এস, রেমব্রাণ্ডের সামনে আমরা ভক্তিভরে মাথা নত করি,—তাঁর পাশে

আত্মাও তেমনি দেহের উপরে আঘাত করিয়াছে।’

আপনি যত লেখকের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথা হেঁট্-করা,—চিন্তার ভারেই যেন তাহা নুইয়া পড়িয়াছে। আপনার হাতের শিল্পীদের মূর্ত্তিতে দেখি, তাহারা প্রকৃতির পানে যেন স্পষ্ট চাহিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যেন সে দীপ্তি নাই—কারণ ভাবের স্বপ্নে তাঁহারা যাহা দেখেন কিম্বা যতদূর উধাও হইয়া

কামিনা-মূর্ত্তি

যেন আমরা আর-কারুকে বসাইতে না যাই!

সেই অসীম সত্য ও স্বাধীনতার রাজ্যের দিকে—হয়ত সে কল্পিত রাজ্য,—যাইবার জন্য আত্মার যে আবেগ, যে আকুলতা, আমার কার্য্যে যে তাহারই ছাপ্ পড়িয়াছে—তোমার এ-কথা যথার্থ। হ্যা, সেখানকার রহস্য আমাকে বাস্তবিকই বিচল করিয়া তুলে।"—মুহূর্ত্তকাল থামিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"শিল্প যে ধর্ম্মের আর-এক শাখা, এ-বিষয়ে তোমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ত?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিঞ্চিৎ দ্বেষের সহিতই রোঁদা যেন বলিলেন, "যাহারা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী, এ শাস্ত্র কিন্তু তাহাদিগকে প্রথমে এই উপদেশই দেয়:—'কেমন-করিয়া একটি দেহ, একটি হাত বা একটি পা গড়িতে হয়,

সকলের আগে তাহাই শিখিতে হইবে!'—শিল্পধর্ম্মের প্রথম দীক্ষা হয় এই মন্ত্রেই!"

* *
*

রোঁদা তাঁহার শিল্পশালায় একটি মর্ম্মর-মেজের সামনে বসিয়া আছেন, এমন সময় চাকর আসিয়া জানাইল, আনাতোল ফ্রান্স আসিয়াছেন। রোঁদার শিল্পশালায় অনেক প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল। সেইগুলি দেখিতেই তিনি এই বিখ্যাত সাহিত্যরথীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

এই ওস্তাদ-শিল্পী ও সাহিত্যরথীর আকৃতিতে কি বিচিত্র বৈপরীত্য! আনাতোল ফ্রান্সের আকার দীর্ঘ ও একহারা; তাঁহার মুখও লম্বা ও সরু; কালো চোখদুটি বসা-বসা; হাতদুটি কৃশ ও কোমল; তাঁহার অঙ্গভঙ্গি জীবন্ত ও তদীয় ব্যঙ্গপ্রবণ স্বভাবের পরিচয় দেয়।—রোঁদা খর্ব্বাকার; বিশালস্কন্ধ, মুখ চওড়া; চোখদুটি সর্ব্বদাই প্রায় আধ-মোদা—যেন তন্দ্রালস। যখন তিনি পূর্ণ-দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁর নির্ম্মল-নীল তারাদুটি দেখা যায়। তাঁহার মুখের শ্মশ্রুমালা দেখিলে, মাইকেল এঞ্জিলোর গড়া সাধুদের মুখ মনে পড়িয়া যায়। তাঁহার গতিবিধি ধীর-শান্ত, ভাবভঙ্গি বিশেষত্বপূর্ণ; ক্ষুদ্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট বৃহৎ করতল কোমল ও নমনশীল।

একজন যেন সকৌতুক বিশ্লেষণী-শক্তির শরীরী মূর্ত্তি, আর-একজন যেন প্রবল আবেগ ও দৃঢ়তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।

রোঁদা তাঁহার সম্ভ্রান্ত অতিথিকে শিল্প-শালা দেখাইতে লাগিলেন।

একজায়গায় গ্রীকভাস্করগঠিত একটি শিল্পকার্য্য ছিল। সেটি সমাধি-শিলার উপর ক্ষোদিত। এক যুবতী কামিনী বসিয়া আছে। একটি পুরুষ তাহার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া; পিছনে, যুবতীর কাঁধের উপরে হেলিয়া একজন পরিচারিকা।

*Thais*এর গ্রন্থকার প্রশংসার উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন,—"গ্রীক্‌রা জীবনকে কি ভালবাসিত! দেখুন! এই সমাধিশিলায় ক্ষোদা ছবিটিতেও এমন-কিছুই নাই, যাতে মরণকে স্মরণ হয়। সমাধিসুপ্তা মৃতা রমণী এখানে জীবনের মধ্যে জাগিয়া আছে—এমন-কি সংসার-স্রোত হইতেও দূরে সরিয়া যায় নাই। কেবল,—সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং দাঁড়াইবার শক্তি নাই বলিয়া বসিয়া আছে,—এইমাত্র।

সেকালকার সমাধির স্মৃতিস্তম্ভে যে-সকল মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইত, তাহাদের সবগুলিতেই এই লক্ষণ থাকিত;—তাহাদের দেহ হইত দুর্ব্বল—হয় তাহারা লাঠির উপরে, নয় দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইত—কিংবা উপবিষ্ট অবস্থায় থাকিত।

"এ-ছাড়া আর-এক বিশেষত্বও আছে। সমাধিস্তম্ভের শিলাচিত্রে মৃতের আশেপাশে যে-সকল জীবন্ত মানুষের মূর্ত্তি দেখি, তাহারা মরণাহতের প্রতি স্নেহকোমল নেত্রে চাহিয়া আছে। কিন্তু মৃতের দৃষ্টি দূর-দূরান্তরে প্রসারিত; চারিদিক হইতে যাহাদের প্রিয়-দৃষ্টি মৃতদের পানে তাকাইয়া আছে, মৃতেরা তাহাদের দিক থেকে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তবু, আপনজনের স্নেহচ্ছায়ার মধ্যেই এ-সব গতপ্রাণের মূর্ত্তি, রোগতাপিত প্রিয়-জনের মতই বাস করিতেছে। এবং এই অর্দ্ধ-অস্তিত্বে ও অর্দ্ধ-নাস্তিত্বেই মর্ম্মস্পর্শী

শোক-ভাবের যথার্থ প্রকাশ ;—প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন,—'মৃতের হৃদয়ে আলোকের প্রেরণা'।"

রোঁদা প্রাচীন শিল্পের নমুনা যোগাড় করিয়াছেন অনেক। বিশেষ করিয়া হার্কিউল্সের একটি দুর্লভ মূর্ত্তি পাইয়া আপনাকে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিতেন। এই মূর্ত্তির ছিপ্‌ছিপে গড়নে বীর্য্যের বিকাশ দেখিয়া আমাদের প্রাণ প্রশংসায় পূরিয়া উঠিল। Farnese Herculesএর যে বিখ্যাত ও বিরাট মূর্ত্তি আছে, এ মূর্ত্তিটি দেখিতে ঠিক তাহার বিপরীত। অপূর্ব্ব ইহার মোহন-শ্রী! এই অদ্ধদেবতার যৌবন-গর্ব্বিত দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি হাল্‌কা ছিপ্‌ছিপে হওয়াতেই মানাইয়াছে চমৎকার।

রোঁদা কহিলেন, "পিত্তলক্ষুরবিশিষ্ট আর্কেদীয় মৃগকে দ্রুতগতিতে যিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইহাই সেই বীরের যোগ্য প্রতিমূর্ত্তি। লিসিপ্পাসের গুরুভার দেহ বলবান হইলেও এতটা শক্তির পরিচয় দিতে পারিত না। শক্তি, সর্ব্বদাই মোহনশ্রী'র সঙ্গী। আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্যে যেমন বীর্য্যের বিকাশ, এমন আর কোথায়? এই হার্কিউল্সে তাহার প্রমাণ দেখি। অঙ্গসৌষ্ঠব সুসঙ্গত হওয়াতেই এই বীরের দেহে বলবীর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে অধিকতর।"

আনাতোল ফ্রাঁস একটি হস্তপদমস্তক-হীন দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "Praxtelesএর গড়া Cnidian Venusএর অল্প-বিস্তর নকল করিয়া সেকালে যে-সব অগুন্তি দেবীমূর্ত্তি গঠিত হইত, এটিও তারই একটি। Venus of the Capitol এবং Venus di Medici প্রভৃতিও প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটির আদর্শেই গঠিত।

গ্রীকদের মধ্যে দেখা যায় অনেক নিপুণ ভাস্করও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদ-শিল্পীর অনুকরণে আপনাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন; তাঁহারা মূল ভাবের বড় বেশী ব্যতিক্রম ঘটাইতেন না,—তাঁহাদের নিজস্বের ছাপ্ থাকিত, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটির গঠন-কৌশলে। ধর্ম্মানুরাগিতার উৎসাহেই বোধ হয়, এ-সব অনুকারী ও ভক্ত শিল্পী কোন-একটি প্রতিমার প্রতি এতটা আসক্ত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহারা আর-কিছুতেই কিছু অদল-বদল করিতে পারিতেন না! ধর্ম্ম-জন্যই স্বর্গীয় মূর্ত্তিগুলির আদর্শ অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত থাকিত। তাই আমরা এত ভেনাসের মূর্ত্তি দেখি। এ-মূর্ত্তিগুলি যে পবিত্র, এ-কথা কিন্তু আমাদের স্মরণ থাকে না।"

পল বলিয়া উঠিলেন, "গ্রীকদের ধর্ম্ম কি সদয়! সে তার পূজারীদের রূপপিপাসী নয়ন রঞ্জন করিতে কত তিলোত্তমার মূর্ত্তিই আবিষ্কার করিয়াছে!"

আনাতোল ফ্রাঁস বলিলেন, "হাঁ, এমন-সব ভেনাসের মূর্ত্তি যখন দান করিয়াছে, গ্রীকদের ধর্ম্ম তখন সুন্দর নিশ্চয়ই। কিন্তু তা-বলিয়া তাকে দয়ালু ভাবিও না; এ অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী। এই জীবন্তবৎ প্রতীয়মান প্রতিমাগুলির সামনে অনেক সৎ আত্মা দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছে। ওলিম্পাসের নামেই এথেন্সবাসীরা সক্রেতিসকে বিষগুল্মের রস-ভরা পেয়ালা আগাইয়া দিয়াছিল।

বুঝিতেছ ত, এই প্রাচীন দেবতারা আমাদের প্রতি আজ দয়ালু বটে, কিন্তু তার কারণ এই, যে, আজ তাহারা পতিত; আজ আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে তেমন শক্তি তাহাদের নাই!"

* *
*

পলকে সঙ্গে করিয়া রোঁদা একদিন Louvre-এর বিখ্যাত কলাভবনে উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মাঝে গিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র রোঁদা খুসি হইয়া উঠিলেন, যেন তিনি পুরানো বন্ধুদের সংশ্রবে আসিয়াছেন!

রোঁদা বলিলেন, "আমার বয়স যখন পনেরো বছরও নয়—তখন কতবারই যে এখানে আসিয়াছি! প্রথমে পটুয়া হইতে আমার ভারি সাধ ছিল। রঙের নেশায় প্রাণ আমার ভোর হইয়া গিয়াছিল; টিসিয়ান ও রেমব্রাণ্ডকে চোখ-ভরিয়া দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি উপর-তালায় উঠিতাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট, তখন আমার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, আঁকিবার সরঞ্জাম পয়সা খরচ করিয়া কিনি। কাজেই আমাকে দায়ে-পড়িয়া নীচের তালায় প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ-গৃহে কাজ করিতে আসিতে হইত! কেননা, সম্বলের মধ্যে আমার ছিল সুধু কাগজ আর পেন্সিল, ভাস্কর্য্যের নকল করিতে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে আসিয়া কাজ করিতে-করিতে ভাস্কর্য্যের প্রেমে আমি এমনি মজিয়া গেলাম যে, আর কোন-কিছুর ভাবনা আমার মাথায় ঢুকিতে পাইত না!"

একটি মস্তক ও অঙ্গহীন মূর্ত্তির সুমুখে গিয়া রোঁদা বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর! দেখ দেখ, এ মূর্ত্তিটির মাথা নাই, তবু কি মনে হইতেছে না যে, বসন্তের মাধুরী ও আলোর ঝরণা দেখিয়া এ-যেন পুলক-হাস্যে উছলিয়া উঠিয়াছে? চোখ আর ঠোঁট থাকিলেও এমন হাস্য-তরলতার ভাবাভাস বুঝি এর-চেয়ে ভাল-করিয়া ফুটিতে পারিত না!"

"ভেনাস অফ্ মিলো"র মূর্ত্তি দেখিয়া রোঁদা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, এ অপূর্ব্বের চেয়েও অপূর্ব্বকে! এখানেও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির মতই ছন্দতাললয় ঠিক্‌ঠাক বজায় আছে; উপরন্তু, এ-মূর্ত্তিটিতে একটা চিন্তা-ধারাও পাওয়া যায়। ক্রীশ্চান ভাস্কর্য্যের দস্তুরমত দেবীর দেহখানি সামনের দিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। তবু কিন্তু এখানে অস্থিরতা বা যন্ত্রণা-কাতরতার কোনই আভাস নাই। প্রাচীন যুগে দৈব-প্রেরণায় যত শিল্পকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই ভাবাভিরাম মূর্ত্তিটি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এ ইন্দ্রিয়াসক্তির মূর্ত্তি, কিন্তু যথেচ্ছা-চারিতা এখানে সীমাবদ্ধ; এ জীবনানন্দের মূর্ত্তি— সুরে সুসঙ্গত, কারণে সংযমিত।

এ-ধরণের কারুকার্য্য দেখিলে আমি বড়ই বিভোর হইয়া পড়ি;—যে-দেশে এদের সৃষ্টি, সে-দেশের আব্‌হাওয়া আমার মনের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই সেই তরুণ গ্রীকদের, যাহাদের দীর্ঘ-কেশে ভায়োলেট ফুলের মালা, সেই তরুণীর দলকে, যাহাদের পরোনে বাতাসে ভাসন্ত ওড়না; তাহারা যেন দেব-পূজা করিতে চলিয়াছে সেই-সব মন্দিরে—

বিজয়-লক্ষ্মী

যে-সব মন্দিরের সারি বিচিত্র, মহিমময়,—যাহাদের মর্ম্মর-শিলা যেন স্বচ্ছ ও জীবনের মত উত্তপ্ত! আমি কল্পনা করি, দার্শনিকেরা যেন নগরের উপকণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন—মুখে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের প্রসঙ্গ; নিকটেই হয়ত কোন পবিত্র বেদী—কোন দেবতার মর্ত্ত্যলীলার স্মৃতিতে যাহা সমুজ্জ্বল। আইভি-লতার অন্তরালে, লরেল ও মেদির ঝোঁপের আড়ালে-আড়ালে লুকানো পাখীর দল মন-মজানো কলতান তুলিয়াছে; এবং এই বিলাসমধুর ও শান্তিসুপ্ত ভূমির উপরে ঐ যে প্রশান্ত নীলাম্বর মুকুটের মত স্থির হইয়া আছে, তাহারই ছায়ায়-ছায়ায় নাচিয়া-নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছে নটিনী তটিনী।"

The Victory of Samothrace নামে মূর্ত্তিটির কাছে গিয়া রোঁদা কহিলেন:—"প্রাচীন মূর্ত্তির মর্ম্মরপাথর, প্রমুক্ত আলোকের অপেক্ষা রাখে। আমাদের শিল্পশালার মধ্যে গভীর ছায়া তাহাদের কান্তিহরণ করে।

এই বিজয়লক্ষ্মীই গ্রীক্‌দের স্বাধীনতার মূর্ত্তি। কিন্তু এ মূর্ত্তি ও আমাদের স্বাধীনতার মূর্ত্তির মধ্যে কি প্রভেদ! গ্রীক্‌দের এই স্বাধীনতা-দেবী কাপড়-চোপড় গুটাইয়া বেড়া ডিঙ্গাইতে প্রস্তুত নন; পরোনে তাঁর মোটা কাপড় নয়—মিহি পট্টবস্ত্র; তাঁহার অপূর্ব্ব-শ্রী তনুখানি গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের উপযোগী নহে, অঙ্গভঙ্গি বলব্যঞ্জক হইলেও সুসঙ্গত।

আসল কথা, এটি সর্ব্বদেশমান্য স্বাধীনতার মূর্ত্তি নহে—এ হচ্ছে বিদ্বানের মানসী মূর্ত্তি। দার্শনিকের ধ্যানধারণায় ইনি বিকসিত হন; কিন্তু পরাজিত যে, ক্রীতদাস যে,—তাঁহারই নামে শৃঙ্খলাবদ্ধ যে, এ মূর্ত্তির জন্য সে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিতে অক্ষম।

'হেলেনিক' আদর্শের এটি একটি মস্ত খুঁৎ। গ্রীক্-পরিকল্পনায় শ্রী'র যে মূর্ত্তি ফুটিয়াছে, তাহার নিকটে কেবল শিক্ষিতের প্রাণ সাড়া দেয়;—এ মূর্ত্তি দীনকে ঘৃণা করে, পতিতের জন্য ইহার হৃদয়ে এককণাও স্নেহ-করুণা সঞ্চিত নাই, এ জানেনা যে,

ছোট-বড় সকল চিত্তেই স্বর্গ-জ্যোতির আভাস আছে।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই আর্ট যতটা সমুজ্জ্বল হইতে পারে, ততটা আর কোথাও নহে। * * *

পৃথিবীর সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতি আছে, —একমাত্র আর্ট ছাড়া। গ্রীকভাস্কর ফিডিয়াসকে আর-কোন আর্টিষ্ট অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না; জগতের সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর সেইসময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—যখন একটি মন্দিরের চাতালেই মানব-কল্পিত নিখিল স্বপ্ন পুষ্পিত হইতে পারিত। সেই সুদূর অতীতের মহাভাস্কর সুদূর ভবিষ্যতেও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া থাকিবেন।"

একটি বন্দী-মূর্ত্তি

মাইকেল এঞ্জিলোর গঠিত "বন্দী"র মূর্ত্তিগুলির সামনে গিয়া রোঁদা বলিলেন, "গোথিক্ ভাস্করদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জিলোই সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার ভিতরেই আত্মার আছাড়ি-পিছাড়ি, যন্ত্রণার ছট্‌ফটানি, জীবনে বিতৃষ্ণা, পার্থিব পদার্থের দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই হইতেছে তাঁহার দৈব-প্রেরণার উপকরণ।

এই 'বন্দী' মূর্ত্তিগুলির দাসত্ব, নৈতিক দাসত্ব। প্রত্যেক বন্দীই এখানে মানবাত্মার প্রতিরূপ-স্বরূপ,—অসীম স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আত্মা পার্থিবতার নিগড় টুটিয়া ফেলিতে পারে। ডানদিকের ঐ বন্দীমূর্ত্তির পানে তাকাও। ওর মুখখানি বীথোভেনের মুখের মত নয় কি? সঙ্গীতাচার্য্যদের মধ্যে যিনি সকলবাড়া দুঃখী, মাইকেল এঞ্জিলোর ভাস্কর্য্যে তাঁহারই মুখের পূর্ব্বাভাস দেখি!
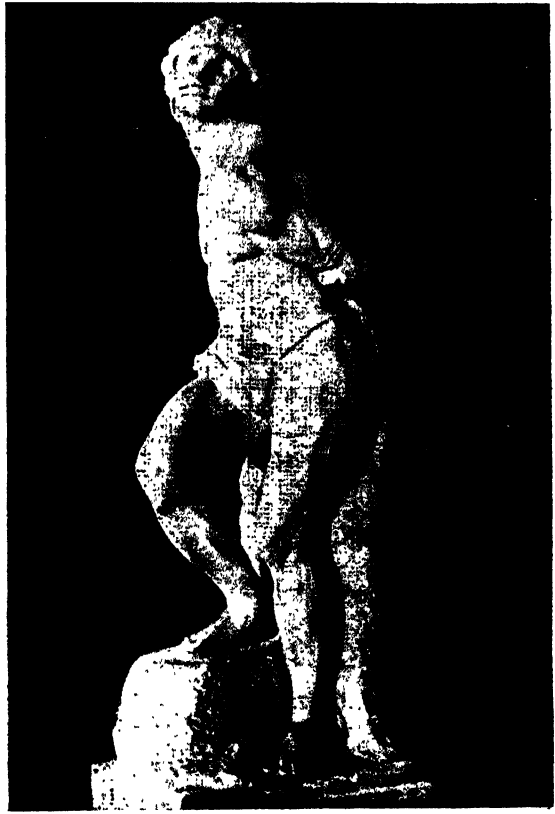
বিথোভেন জন্ম-দুঃখী,—তাঁহার সমস্ত জীবনেই বিষাদের ছায়া পাওয়া যায়। তাঁহার একটি অতি সুন্দর সনেটে তিনি বলিয়াছেনঃ—'আরো-দীর্ঘ জীবন ও আরো-বেশী সুখের জন্য কেন আমাদের এত আশা-আকাঙ্ক্ষা? পার্থিব আনন্দ আমাদের যতটা সুখী করে, তার চেয়ে ক্ষতি করে অধিক।'—

অন্য কবিতায়ঃ—'জন্মে যে যত-শীঘ্র মর্‌তে পারে, তার ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন!'

মাইকেল এঞ্জিলো বৃদ্ধবয়সে আপন হাতে-গড়া অনেক প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আর্টে আর তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন না। তিনি চাহিতেন অনন্তকে। তিনি লিখিয়াছেন:—ক্রুশবদ্ধ হইয়া যে স্বর্গীয় প্রেম, আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছেন,—কি চিত্র আর কি ভাস্কর্য্য—কিছুই চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরাইতে পারে না।—আবার, সেই বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়-বাদী—যিনি Imitation of Jesus Christ লিখিয়াছেন, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেন।ঃ—'সকল-সেরা জ্ঞান হচ্ছে তাই, যাতে করে পৃথিবীতে বীতরাগ হয়ে স্বর্গরাজ্যে পৌছোতে পারা যায়। সেই আনন্দ—যা অশেষ, তার দিকে এগিয়ে না গিয়ে, যা চলচঞ্চল, তাকেই আঁক্‌ড়ে থাক্‌লে মিছে দেমাক্ দেখানো হয়।"

মৃত খৃষ্ট

রোঁদা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর, তিনি তাঁর চিন্তার কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার মনে পড়ে, ফ্লোরেন্সে গিয়ে মাইকেল এঞ্জিলোর গঠিত *Pieta* নামে ভাস্কর্য্য-কার্য্যটি একদিন আমি ভাবাবেগে বিভোর হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। এই বিখ্যাত শিল্প-নিদর্শনটি সাধারণত ছায়াসুপ্ত থাকে; কিন্তু রূপার দীপদানের একটি বাতির আলোয় সেদিন তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। একটি পরম-সুন্দর শিশু-গায়ক, তারই মাথা-সমান উঁচু এই দীপদানটির কাছে আসিয়া আলো নিবাইয়া দিল। আমার চোখের সুমুখ

থেকে সেই আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য-কার্য্য অন্ধকারে পুঁছিয়া গেল। এবং আমার বোধ হইল যেন, এই শিশুটি সেই মৃত্যুরই শক্তিরূপী— জীবনকে যে অবসানে লইয়া যায়।····· সেই অমূল্য স্মৃতি-চিত্রটি আজ-পর্য্যন্ত আমার প্রাণের পরতে পরতে আঁকা আছে।"

একটু থামিয়া, রোঁদা আবার বলিলেন :— "আমার নিজের কথা যদি ধরি, তবে বলিতে পারি, ভাস্কর্য্যের দুটি প্রধান মতি-গতির মধ্যে—ফিডিয়াস ও মাইকেল এঞ্জিলোর দ্বারা অভিব্যক্ত দুই বিপরীতমুখী ভাবধারার মধ্যে সারাজীবন আমার চিত্ত দোলায়মান হইয়াছে।

প্রথমে আমি ফিডিয়াস প্রভৃতির হস্ত-গঠিত প্রাচীন শিল্পেরই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। কিন্তু, ইতালীতে গিয়া ফ্লোরেন্সের প্রখ্যাত ওস্তাদ-শিল্পীর প্রতিভার মহিমায় আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমার কার্য্যে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছিল।

তারপরে—বিশেষ করিয়া শেষ কয় বছরে—আমি আবার প্রাচীন শিল্পের রাজত্বেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

মাইকেল এঞ্জিলোর প্রিয় বিষয়গুলিতে একটা অনলঙ্কৃত গৌরব আছে বটে ; কিন্তু তাঁহার মত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। পার্থিব কর্ম্মশীলতা অসম্পূর্ণ হইলেও, এখনো শ্রেয়ঃ এবং সুন্দর। জীবনের মধ্যে যতটুকু পাওনার প্রয়াস আছে, কেবল ততটুকুর জন্যই, এস, জীবনকে আমরা ভাল বাসি!······প্রশান্ত এবং যথার্থ ভাবে যাহাতে আমার সতর্ক দৃষ্টি দৃশ্যমানা প্রকৃতির উপরে গিয়া পড়িতে পারে, সেজন্য সর্ব্বদাই আমি অশ্রান্ত চেষ্টা করি।—বিশ্বব্যাপী এই বিরাট রহস্যের সম্মুখে সংসারীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ত সর্ব্বদাই আমাদিগকে আকুল করিয়া রাখিবেই ; কিন্তু তাহার মধ্যেই আমাদিগকে শান্তিপ্রয়াসী হইতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চিন্তা-তরঙ্গিনী

মাসকাবারী

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তখন এক-কথা বলিয়াছেন, এখন আর-এক-কথা বলিতেছেন এই ধুয়ায় হুজুগওয়ালারা হুজুগ তুলিয়াছে। যেন ইহা তাঁহার একটা মস্ত অপরাধ। ইহার জন্যই তাঁহার সমস্ত রচনা যেন ব্যর্থ।

জীবন যেখানে আছে, পরিবর্ত্তন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। মোট-কথা, এই পরিবর্ত্তন দিয়াই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যার জীবন নাই, কেবল সে-ই চিরদিন তার অচল ঠাট বজায় রাখিয়া অটল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। মানুষের জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাকে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে হয়;—মনের কথা ছাড়িয়া দিই, এক দেহেরই কত অদল-বদল। কিন্তু মাটির পুতুল চিরদিন যে-কে-সেই।

দেহের দিক দিয়া না হইতে পারে কিন্তু মনের দিক দিয়া এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা মাটির পুতুলেরই মতন। এঁদের কোথাও নড়চড় নাই। এঁরা অনেকটা সেই-ধরণের ভদ্রলোক যাঁহারা নিজের বয়স, কখনো ভাঁড়ান না;—একবার যা বলেন, পঁচিশ-বছর বাদে তা আর উল্টাইয়া লন না। কেহ ভুল দেখাইয়া দিলে, উত্তরে বলেন—"ভদ্রলোকের এককথা!"

রবীন্দ্রনাথ এ তন্ত্রের মানুষ নহেন।

মানুষ জীবনের পথে প্রতিপদে নব-নব আনন্দ, নব-নব বেদনা, নূতন তথ্য, নূতন তত্ত্ব লাভ করে, তারই প্রতিঘাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষ আজ যে-কথা স্বীকার করিয়াছে, আবশ্যক হইলে, কাল তাহা অস্বীকার করিতে দ্বিধা করেনা, সেই জন্যই বিজ্ঞান বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মতপরিবর্ত্তনের বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও এই স্বভাবের নিয়ম কাজ করিতেছে।

মত-পরিবর্ত্তনের পক্ষে বহু মনীষীর বহু কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নিজের অনেক কথা উল্টাইয়া লইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গের কৈফিয়তে লিখিয়াছেন—"* * * আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? * * বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখনো মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈব-জ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। * *"

এমার্সন বলিয়াছেন,—"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little states-

men and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict everything you said to day.—"Ah, so you shall be sure to be misunderstood."—Is it so bad then to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise sprit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.

* *
*

রসালো ফল কাঁচা-অবস্থায় সবুজ থাকে, পরে হলদে হয়, শেষে টকটকে লাল হইয়া উঠে। ফলটার কথার ঠিক নাই বলিয়া তার উপর যদি গাল পাড়, তুমি নিজেই ঠকিবে। যারা রসিক তারা খোলাটা দেখিবে না, অন্তরের রসের দিকেই তাদের লোভ।

ফলের মধ্যে এই যে রঙের বদল, যদি কেবলমাত্র ফলের দিকেই দৃষ্টি রাখো তাহা হইলে ইহা অসঙ্গতি বলিয়া চোখে ঠেকিবে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিলে এ অসঙ্গতি টিঁকিবেনা। এই অসঙ্গতিকে ছাড়াইয়া একটা বড় সঙ্গতির খেলা চলিতেছে। সেই বড় সঙ্গতি যেখানে ছিন্ন, আসল অসঙ্গতি সেইখানে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাকে সমগ্রভাবে না দেখিয়া খণ্ডভাবে দেখিলে অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু তেমন করিয়া বিচার করিলে ঠিক বিচার হয় না বলিতেই হইবে। তাঁর সমগ্র রচনার সঙ্গে খণ্ডকে মিলাইয়া দেখা চাই, এবং খণ্ড যেখানে সমগ্রতার মধ্যে সার্থক হইয়াছে, সেইখানটি ধরিয়া বিচার করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের এখনকার অনেক কথা পূর্ব্বেকার কথার বিরোধী বটে কিন্তু সে বিরোধ হঠাৎ আবির্ভূত হয় নাই, পূর্ব্ব হইতেই পর জন্মলাভ করিয়াছে; কিম্বা পূর্ব্বের পরিণতি পরের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়াছে। এই রহস্যটি ধরিবার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আবশ্যক। নইলে সব খাপছাড়া ঠেকিবে। একটা জিনিষ যখন বদলাইতে থাকে তখন তার বদলের প্রক্রিয়ার সব অবস্থাগুলা খুঁটিয়া আমাদের চোখে না পড়িতে পারে, কিন্তু বদলটা যে একেবারে হঠাৎ হয় না তাহা ঠিক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার পরিণতি ধারাবাহিক ভাবে ঘটিয়া আসিয়াছে; গতির মুখে যখন যেটা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে সেইটার প্রতি তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তার পর সেটাকে যখন ছাড়াইয়া গেছেন, কিম্বা সেইটাই যখন তাঁহাকে তার পরের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তখন তাঁহার মধ্য হইতে পূর্ব্বেকার যাহা ঝরিবার

তাহা ঝরিয়া গিয়াছে, যাহা থাকিবার তাহা থাকিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে এ সবগুলিরই একটা স্থান আছে—কারণ সেগুলি ত ভুয়ো জিনিষ নহে—সেগুলি কবির মনের তখনকার সেই বিশেষ-অবস্থার বিশেষ কথা। সেইজন্য সে সব কথারই একটা সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ যে এই নানা বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তার ছাপ তাঁর রচনার মধ্যেই আছে। তাঁর এক-এক যুগের রচনা এক-একটা স্বাধীন বিশেষত্ব লইয়া জীবন্ত হইয়া আছে।

দুই কিম্বা ততোধিক বিরোধী শক্তিকে একই রঙ্গ-ভূমির মধ্যে আনিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা জগতের সাহিত্যে ও দুর্লভ "গোরা" "ঘরে-বাইরে" প্রভৃতি বই যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই একথা জানেন। বিপক্ষকে সহজে হারাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শোলার পুতুলরূপে তৈরি করেন না ;—দুই পক্ষের মধ্যে কে যে বেশী বলবান তাহা নির্ণয় করা শক্ত। সেইজন্য যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনার আসল রূপটি ধরিতে না পারিয়া কতকগুলো অবান্তর কথা লইয়া হৈ-হৈ করেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। সেইজন্য কোনো জিনিষ তাঁহার চোখে উপর-উপর এড়াইয়া যায় না ;—সব জিনিষের সবটা দেখা তাঁহার প্রকৃতির ধর্ম্ম। সেই জন্য ভালো-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্ট, ন্যায়-অন্যায়, এ-সবেরই চেহারা তাঁহার রচনায় সমান তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে। সে ক্ষেত্রে ভালোর দিকটা বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল মন্দের দিকটা ধরেন, কিম্বা মন্দকে অতিক্রম করিয়া যেখানে ভালো প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিতে পান না, কিম্বা যাঁহাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায়, তাঁহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেবল অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—তাঁহার দৃষ্টি অতি-দূর-ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসরিত। সাধারণের পক্ষে সেই অতিদূরের চেহারা দেখা সম্ভব নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সকলের বোধগম্য হয় না। এইজন্য দেখা যায় ঘরে-বাইরের নিখিলেশের কথা লইয়া কেহ বড় উচ্চবাচ্য করিল না, যত গণ্ডগোল বাধিল সন্দীপকে লইয়া। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, নিখিলের চরিত্র আয়ত্ত করিতে এখনো দেরী আছে।

* *
*

এ ত গেল সোজাসুজি কথা। কতকগুলো বাঁকা কথাও আছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পে, নাটকে উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের একজনের মুখের কথার সঙ্গে আর-একজনের মুখের কথার নিশ্চয় মিল নাই। কিন্তু এইরূপ উক্তি পাশাপাশি রাখিয়া অনেক জায়গায় বলা হয় রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে একবার এই বলিয়াছেন, আর-একবার তার উল্টা বলিয়াছেন। ইহা খুবই অদ্ভুত ঠেকে সন্দেহ নাই, এবং সাধারণ পাঠকের অজ্ঞতার উপরে সেই অদ্ভুতত্ব নিশ্চয় কাজ করে। কিন্তু যাঁহারা এই কৌশল খেলেন, তাঁহাদের কি আমরা সাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী সমালোচক বলিয়া স্বীকার

করিয়া লইব? হইতে পারে এই অপরাধ তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, বুদ্ধিহীনতাই তাহার কারণ। তাহা হইলে অবশ্য তাঁহারা ক্ষমার্হ। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্তি কি?

ইহা ছাড়া আর-একটি জিনিষ দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনো চরিত্রের মুখের কথা লইয়া তাহা তাঁহার নিজের উক্তি বলিয়া প্রচার করা হয়। "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের সন্দীপ তার ডায়ারীতে একস্থানে সীতাদেবীর সতীত্বের জোর লইয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। সে যে-তন্ত্রের লোক, তাহাতে তার পক্ষে এ কাজ করা খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। তার চরিত্রের আগাগোড়া দেখিলে ইহা মোটেই বিসদৃশ ঠেকে না। বরং ইহাতে তাহার মনের ভিতরটা ভালো করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে যে কেমন মানুষ তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু সন্দীপ যে-কথা নিজের ডায়ারীতে লিখিয়াছে, সেই-কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে? তাই বলিয়াই ত চারিদিকে ঢাক-পেটানো হইতেছে। জঘন্য চরিত্রের জঘন্যতা ফুটাইবার জন্য সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে এমন অনেক কথা স্থান পাইয়াছে যাহা শুনিতে ভয়ঙ্কর। কিন্তু সেই সব কথার জন্য কি গ্রন্থকার দায়ী? তা যদি হয় তাহা হইলে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস সেক্সপিয়র হইতে আধুনিক যুগের লেখকরা কেহই ত নিস্তার পান না। ইয়াগোর কথা ইয়াগোরই, সন্দীপের কথা সন্দীপেরই;—তার জন্য কবি দায়ী নহেন। এরূপভাবে দায়ী হইতে হইতে সংসারে আর নাটক নভেল লেখা চলিত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাঁহারা এই সব গুজব রটনা করিয়া আসর গুলজার করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা যে এই সহজ কথাগুলা জানেন না, বা বোঝেন না, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের সমালোচনা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য আর-কিছু। তাঁহাদের ঐ সব খেলো কথা লইয়া আমাদের আলোচনা করিবার কোনো দরকার ছিল না যদি বাংলায় সাময়িক কাগজের পাঠক যত আছে, সৎ-সাহিত্যের সমঝদার পাঠকও তত থাকিত। অনেকে এই সব ফাল্‌তো কথায় কান দিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, পরকে রসের বিচার সম্বন্ধে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা থাকা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

* * *

সমালোচনা

সুদখোর ও সওদাগর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসারদা কুমার দত্ত ১৭ নং ব্রীজ রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্ম রচিত 'উপন্যাস';—সেক্স-পীয়রের প্রসিদ্ধ নাটক Merchant of Venice এর Bond story অবলম্বনে রচিত। বৈদেশিক নাম ও ভাব বর্জ্জন করিয়া দেশী নামে ও যথাসম্ভব দেশী ভাবে আখ্যায়িকাটি বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল—কথ্য ভাষায় রচনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ভাষার প্রবাহ আছে, গল্পটিতে প্রাণ আছ; রসও খাঁটি দাঁড়াইয়াছে—কোথাও 'জলো' হইয়া যায় নাই। 'মার্চ্চেণ্ট অফ্ ভেনিস' গ্রন্থখানি দেশীয় ছাঁচে গড়িয়া তোলা কঠিন ব্যাপার, লেখক যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। গল্পটিতে প্রথম হইতেই লেখক এমন কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহা শেষ করিতেই হইবে। এই অত্যন্ত-পরিচিত গল্পটিকে এতখানি সরস ও কৌতূহলো-দ্দীপক করিয়া তোলা দক্ষতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে তন্মধ্যে এক খানি বহু-বর্ণে রঞ্জিত। ছবিগুলি চলনসই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ—প্রভৃতি সৌষ্ঠব দিব্য রমণীয়; সে-হিসাবে এই আক্রার দিনে মূল্য বেশই সুলভ হইয়াছে।

চামুণ্ডার শিক্ষা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসারদাকুমার দত্ত, ১৭ নং ব্রীজ রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানিও উক্ত লেখকের রচিত ছেলেমেয়েদের উপন্যাস—সেক্‌স্পীয়রের Taming of the Shrew অবলম্বনে রচিত। এখানিও লেখক দেশী ছাঁচে রচনা করিয়াছেন। রচনা সুন্দর হইয়াছে। ভাষায় ভাবে প্রাণ আছে, রস আছে—চরিত্রগুলিও স্বকীয় বিশেষত্বে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়াছে। লেখকের হাতটিও মিঠা। ছেলেমেয়েরা এই বই দুইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবে—তৃপ্ত হইবে। এখানিতেও অনেকগুলি ছবি আছে, তন্মধ্যে একখানি বহুবর্ণে রঞ্জিত। ছেলেমেয়েদের জন্ম রচিত হইলেও দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে। এ বহির ছাপাও অপরখানির অনুরূপ,—পরিষ্কার, মনোজ্ঞ।

সৌধ-রহস্য। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেবভবন চুঁচুড়া। কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ একখানি বিদেশী গ্রন্থের 'মর্ম্মানুবাদ'। লেখিকা 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন, তিনি মূল গ্রন্থের লাইন ধরিয়া অনুবাদ করেন নাই। 'প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলি বজায় রাখিয়া নিজের ভাবেই' লিখিয়াছেন; কিছু-কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়াছেন। এই অনুবাদ উপন্যাসখানি ১৩২০ সালের 'ভারতী'তে ধারা-বাহিকভাবে বাহির হইয়াছে—সুতরাং এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা আমাদের পক্ষে শোভন হয় না; তবে এ-গ্রন্থে রচনাটি আমূল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এখানি 'ডিটেক্টিভের গল্প' নয়—বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের অপূর্ব্ব ধারণাই ইহার ভিত্তি। রচনাটি আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। অনুবাদের ভাষাটি চমৎকার—সহজ, সরল কোথাও বিদেশীয়ানার গন্ধ নাই। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকের কাছে এ গ্রন্থের আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

অন্তর্যামী। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইউ, রায় এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবিতা-গুলি ভগবদুদ্দেশ্যে রচিত। বাঁধাই ও ছাপা বেশ নয়নাভিরাম।

মালা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইউ, রায় এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানিও কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। "সব কবিতাগুলিই সাগর সঙ্গীতের অনেক আগে লেখা। দু-একটী মালঞ্চেরও আগে।" কবিতাগুলির নাম,—প্রেম ও প্রদীপ, মরমের সুখ, সে কি শুধু ভালবাসা, প্রেম-প্রতীক্ষায়, স্বর্গের স্বপন, উপহার, শূন্য প্রাণ, সাঁঝের ছায়ায়, প্রেম, প্রেম সত্য, টান, দান, রাগ, অন্তিমে, প্রাণের স্বপ্ন, স্বপ্ন, মহাশূন্য, মোছ আঁখি, বিদায়, আমার মন, চুম্বন, কামনা, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তুমি, তুমি ও আমি, আপনার মাঝে, নিবেদন, প্রার্থনা, গান এবং নীরবতা। এ বইখানিরও ছাপা-বাঁধাই সুন্দর, নয়নাভিরাম, 'অন্তর্যামী'র অনুরূপ।

শতদল। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬নং বেচারাম দেউড়ী,—জগৎ আর্ট প্রেস, ঢাকা। প্রিণ্টার, শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, ঢাকা। মূল্য দশ আনা। এখানিও কবিতাগ্রন্থ—কতকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সুকবিগণের রচিত বিস্তর কবিতার ভাব ও ভাষার ছাপ পড়িয়াছে। 'নিবেদনে' ভাবমুগ্ধ বন্ধু 'শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক' ছোট-একটি সার্টিফিকেট আঁটিয়া দিয়াছেন—কিন্তু বহিখানির মধ্যে সব-চেয়ে উপভোগ্য, উৎসর্গ-কবিতাটি! লেখক গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে 'প্রীতি-উপহার' দিতে বসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

"হে চাতক, জানি আমি তুমি কোন্ আশে
ঊর্দ্ধমুখে চাহি আছ,
শুষ্ককণ্ঠে গাহিতেছ
কি গান—কাহার লাগি—আশার উল্লাসে।"

বেচারা রবীন্দ্রনাথ! 'চাতক' বলিয়া তাঁহার 'কণ্ঠ শুষ্ক' করাইয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই—'বঁধু' বলিয়া গায়ে পড়িয়া শেষে বলিতেছেন,

"বুক-ভাঙ্গা মূক ব্যথা তোমার উদ্দেশে;
দিলাম জুড়াও, তুমি স্নেহের পরশে।"

কবিতা লিখিতে বসিয়া অনেক লেখককে উদ্দাম-ভাবে মনের রাশ ছাড়িয়া দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই লেখকের উদ্দামতা সকলকে টেক্কা দিয়াছে।

উৎস। রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদাশরথি পতি বিদ্যা-বিনোদ, কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। কলিকাতা, কুন্তলিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই গ্রন্থের মুখ-বন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন এক প্রস্তুতি' আঁটিয়া দিয়াছেন। সেই 'প্রস্তুতি' একটুখানি হইলেও তাহাতে মজা আছে বিস্তর। প্রথমেই 'প্রস্তুতি-লেখক' মহাশয় বলিয়াছেন, "যাঁহারা আমাকে জানেন, আমার বিদ্যাবুদ্ধির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, এই পুস্তকের সম্বন্ধে সামান্য একটী কথা বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই।" অথচ সাত-আট লাইন পরে তিনিই সার্টিফিকেট দিতেছেন, "শ্রীযুক্ত প্রহরাজ মহোদয়ের চিন্তাশীলতা, মহানুভবতা এবং ধর্ম্মপ্রাণতা এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তাঁহার লেখনী হইতে শাস্ত্রের কথাই নিঃসৃত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক প্রবন্ধ তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে" ইত্যাদি। প্রস্তুতি-লেখকের প্রথম উক্তি মানিতে গেলে দ্বিতীয় উক্তির অর্থ থাকে না! যাহা নিজে বোঝেন না তাহার সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়াও শুধু এই দেশেরই নির্লজ্জ প্রথা! যাহা হৌক, এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে—'প্রস্তুতি'-পাঠে জানিলাম, "গ্রন্থকার মহোদয় সভা-সমিতিতে যে সকল অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন-তাহারই অল্প কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।" প্রবন্ধগুলির বিষয়,—অভিষেকোৎসব, ভূস্বামিগণের ভবিতব্যতা, কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? ঈতি, অপূর্ব্ব অতিথি-সৎকার, ভাষানুবাদ, মানব-জীবনে সুখের স্থান, মেদিনীপুরের

ভাষা এবং ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য, 'শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়' ছাপ আঁটিয়া দিলেও প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার কোন চিহ্ন আমরা দেখিলাম না। লেখক নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই; চিন্তা করিয়া বলিবার সে শক্তি তাঁহার আছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন বিষয়কে গভীর-ভাবে না দেখিয়া মামুলি যে সকল মত সাধারণ লোকে নিত্য চক্ষু মুদিয়া ব্যক্ত করে, লেখক তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন; প্রভেদ শুধু এই, তাঁহার ভাষা গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে। লেখায় যুক্তি নাই —সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই লেখক ভাবে গদ্গদ হইয়া পড়িয়াছেন—বিচার-শক্তির একান্তই অভাব—তাহার উপর অবান্তর কথারও অন্ত নাই! যুক্তি-তর্কে ভাষায়-ভাবে প্রবন্ধগুলি এমন যে সেগুলিকে রচনা-শিক্ষার্থী বালকের প্রথম চেষ্টার অপরিণত ফল বলিয়াই মনে হয়! এরূপ রচনারও প্রস্তুতি লিখিতে লোকের অভাব হয় না—হায়রে দেশ!

ভবানী-ভাবনা। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র সেন-গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি, এ, ভবানীপুর, বীরভূম। কলিকাতা, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে লেখকের গৃহ-বিগ্রহের মাহাত্ম্য-কথা ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের একবার কঠিন পীড়া হয়—সেই পীড়ার সময় সহসা কে যেন কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিল * * মা ভবানী কহিলেন, "* * তোর গৃহে আমার যে বিগ্রহ আছে * * সেই বিগ্রহ কেন ভবানীপুরে আসিল, তার যাবতীয় বিবরণ তুই বর্ণনা কর্।" ইহাই এ গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস। সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

পারিবারিক প্রবন্ধ। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড অফিস হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। অষ্টম সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। আশা করি, বাঙ্গালীর কাছে এ গ্রন্থের নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। বাল্য-বিবাহ, দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম্ম, জ্ঞাতিত্ব, অতিথি-সেবা, পরিচ্ছন্নতা, চাকর-প্রতিপালন প্রভৃতি গৃহস্থের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন, যুক্তি, প্রভৃতি অনুধাবনযোগ্য। স্বজাতি ও স্বদেশানুরাগ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মণির ন্যায় ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এ গ্রন্থের একখানি শোভন সংস্করণ ছিল না—ইহাই ছিল আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানির আকার ডবল-ক্রাউনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ছাপা-কাগজ সুন্দর হইয়াছে এবং নীল রঙের দেশী রেশমী কাপড়ে বাঁধাই টুকুও বেশ পরিপাটী।

কর্ম্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প। —শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রণীত। চেরি প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। সুরেন্দ্রবাবু যে একজন পাকা গল্প-লেখক তাহা নূতন করিয়া বলিবার দরকার করেনা। তাঁহার এই বিচিত্র রসের গল্পগুলি আমাদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার লেখায় যে নিজস্ব একটি বিশেষত্ব আছে, সে পরিচয় প্রতি গল্পেই পাওয়া গিয়াছে। যে গল্পটি লইয়া গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে, সেইটিই একটু ভারীরকমের, আড়ষ্ট হইয়া আছে। 'দীক্ষা' 'গোলাপজাম', 'দীর্ঘনিশ্বাস' প্রভৃতি গল্পগুলিতে করুণ ও হাস্যরস গঙ্গা-যমুনার মতই চমৎকার মিশ খাইয়াছে। প্লট মামুলি নয়, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। 'মুস্কিল আসানে' হাস্যরস চমৎকার ফুটিয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা,২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
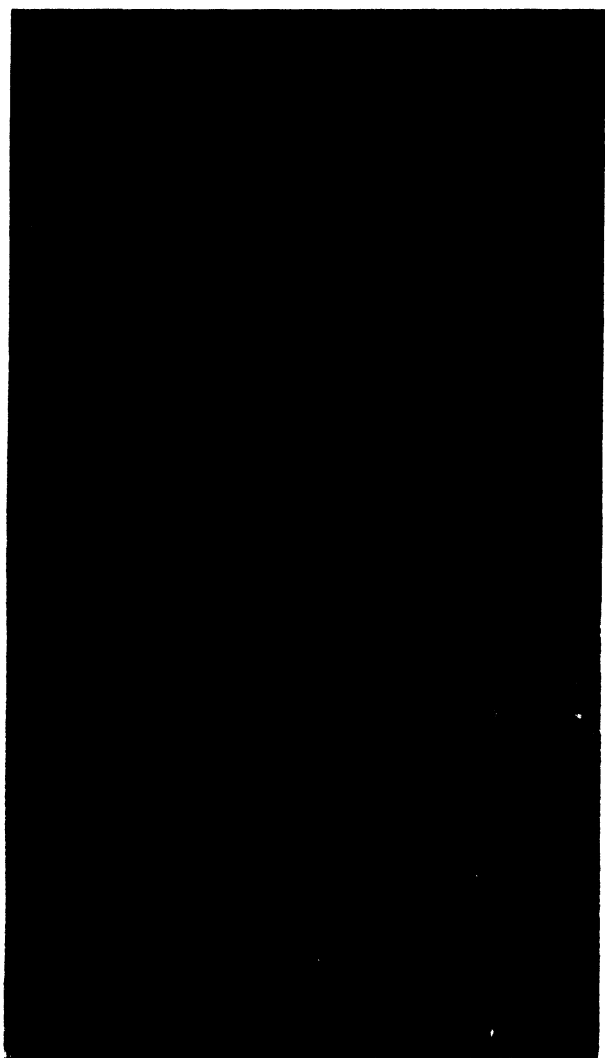
চরণাশ্রয়ে

চরণাশ্রয়ে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কি

৪০শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ [৮ম সংখ্যা

স্বেচ্ছাচারী

১০

আজ মঙ্গলময়। আজ এমন একটা দিন যে-দিন ঘরমুখো বাঙ্গালীর 'ঘর-ছাড়া' প্রাণগুলি গৃহের দিকে ফিরিবার জন্য ছটফট করে। যাহারা ছুটিতে পায় তাহারা ছোটে, যাহারা পায় না তাহারা অতি-কষ্টেই আপনাদের সংযত রাখে। আজ এমন একটা দিন যেদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে মেশামেশি, জানাজানি, কানাকানি, আসা-আসির একটা সাড়া পড়িয়া যায়। আজ যেন বাঙ্গালীর জীবনে মায়ের প্রবল আহ্বান জাগিয়া উঠিয়া পথে ঘাটে, বাসে-প্রবাসে, কাজে-অকাজে, যে যেখানে আছে, সকলকে মনে পাড়াইয়া দেয় যে, আজ ফিরিবার দিন, আজ মায়ের কোল ছাড়া, মার কাছ ছাড়া অন্য কোথাও তাহাদের যথার্থ স্থান নাই। মা যেন হঠাৎ এক শারদ প্রভাতের নির্ম্মল আকাশের তলে শ্যামল বসনে শিশির-মুক্তাবলী-হারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নক্ষত্রলোক কৈলাস হইতে নামিয়া আসিয়া দাঁড়ান! অমনি চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া যায়, 'ওরে, মা আসিয়াছেন রে, মা আসিয়াছেন।' আর সকল শত্রুতা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল হানাহানি টানাটানি থামিয়া গিয়া সমস্ত বঙ্গ সংসার হইতে মায়ের পূজার আয়োজনের জন্য স্নেহ, প্রেম, ভক্তির কোলাহল উত্থিত হয়!

আজ এমন একটা দিন, যেদিন সকলকেই মনে করিতে হইবে যে সে, এই বিশ্ব পরিবারের একান্নভুক্ত, সকলের আপনার জন। যাঁহারা বহুপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন, "অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং সহ" আজ স্মরণ করিতে হইবে যে এই প্রকাণ্ড জগৎ একটি মহা আলয়—প্রকাণ্ড একান্ন-ভুক্ত সংসার। ইহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বহু কোটী অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি

এবং এক একটী ক্ষুদ্রতম অংশকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলিয়া মনে ভাবিয়াছি। কিন্তু আজিকার এই শিশির-স্নাত শেফালির গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গের হৃদয় একটী মাত্র গন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বঙ্গ দেশের শস্য-ক্ষেত্র আজ একই শোভায় একই গন্ধে সর্ব্ব দিক ভরিয়া ফেলিয়া একই জননীর আগমন জানাইয়া দিতেছে। আজ একই জননীর উৎসুক স্তন হইতে ক্ষীরধারা পান করিতে হইবে; তাই আজ এত তাড়াতাড়ি, এত হুড়াহুড়ি! আজ তাই ভাগাভাগির আঁটাআঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের প্রাঙ্গণে অনন্ত আকাশের চন্দ্রাতপ-তলে সর্ব্বলোক-মন্দিরে বিশ্ব-মাতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত করিতে হইবে। মায়ের জন্য বিশ্ব-হৃদয় সিংহাসন আজ গঙ্গা জলে বিল্ব-দলে পূজিতে হইবে।

আজ মা স্বয়ং ডাকিতেছেন! কে বসিয়া থাকিবে? কে এমন মাতৃহারা সর্ব্বস্ব হারা দিক্‌ভ্রান্ত পথিক আছে যে আজ মাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে? মাগো, তোমার গভীর উদাত্ত স্বরে ডাক, "কে আছিস, ওরে মাতৃহারা স্নেহহারা গৃহহারা কে আছিস, ছুটে আয়! আজ আমি এসেছি, ওরে, আর ভয় নাই।" বল মা সেই বেদময়ী সমবেতকারিণী ঐক্য-সাধিনী বাণী, যাহা কোন্ সুদূর অতীতে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তীরে প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া কত যুগের কত যুগান্তের মধ্য দিয়া আজও আমাদের কর্ণে এক হইবার মহামন্ত্ররূপে ধ্বনিত হইতেছে। বল সেই কথা, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং"—'মিলিত হও, এক কথা বল, তোমাদের চিত্তও এক হউক!' মনে বাক্যে কার্য্যে এক হও, মিলিত হও, এক মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাকে স্বীকার কর। যাক্, সেই বাণী দিকে দিকে ছুটিয়া যাক। সমস্ত জগতের হৃদয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হউক—সকলে জাগিয়া উঠিয়া বলুক, "আমরা এক মায়ের ছেলে, আমরা পর নহি, আমরা নিতান্তই আপনার জন,—আমরা এক মায়ের এক মহা-আলয়ে একই স্তন্য-দুগ্ধে লালিত পালিত জীবিত রহিয়াছি। আমরা বহু তবু একের, আমরা বিচিত্র তবু একের, আমরা বিচ্ছিন্ন তবু একের সত্তায় সত্তাবান, একই কোলে আশ্রিত!'

শশিভূষণ তাহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে। অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ছুটি পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দ আজ সকালে জাগিয়া ভাবিল, সে কোথায় যাইবে? তাহার যাইবার মত স্থান কোথায়? মন তাহার যাই-যাই করিতেছে, অথচ যাইবার মত, আজিকার মত দিনে আশ্রয় পাইবার মত স্থান তাহার নাই! সর্ব্বানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শয্যার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। এমন সময় রঘুনাথ আসিয়া তাহার শয্যার উপর কয়েক খানি পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছোট বাবু, আজ কি রান্না হবে,—বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন।" সর্ব্বানন্দ উঠিয়া বসিয়া একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ আমি এখানে খাব না, বাগবাজারে যাব, তোমরা যা হয় রেঁধে নাও গে।" রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, "আজ আমারও নেমন্তন্ন আছে, বামুন ঠাকুরও কালীঘাটে যাবেন।"

সর্ব্বানন্দ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া

রঘুনাথ চলিয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ পত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ কার্ত্তিক লিখিয়াছে যে আজ তিন দিন হইতে দেবুর সর্দ্দি কাশী হইয়া প্রবল জ্বর দেখা দিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে যে উহার ভয়ানক নিউমোনিয়া হইয়াছে। কি যে হইবে, কে জানে!

সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সার্ট গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; এবং পোষ্ট অফিসে গিয়া জরুরি টেলিগ্রামে দেবুর বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইল; এবং কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যাইবে কি না তাহাও টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইতে লিখিল।

পোষ্ট অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বানন্দ রঘুকে বলিল, "আমি এখনি বাগবাজারে যাচ্ছি, তুমি তোমার নেমন্তন্ন সারতে বারোটার পর যাবে। আমার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে যেমন করে পার তা নিয়ে রাখবে, আমি বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরব।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে সর্ব্বানন্দ মনে মনে বলিল, আগমনীর বাঁশী বাজিতে না বাজিতে এ কি বাঁশী বাজাইয়া তুলিলি মা? আমি কোথায় যাইব, কোথায় যাইব, ইহাই ভাবিতেছিলাম বলিয়া কি এইভাবে আমায় ডাকিতে হয়? দেবুকে যদি বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে কার্ত্তিকের সুস্থ হওয়ার যে আর কোন আশাই থাকিবে না!

সর্ব্বানন্দ ব্যস্তভাবে রান্না ঘরের দিকে যাইবামাত্র সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে এত তাড়া সর্ব্ব-দা? বেলা দশটা না বাজিতেই খাবার তাগিদ করছ! মার আর সুকুর হুকুমে তোমার জন্য আজ যে কত রকম আহার্য্যের ব্যবস্থা হচ্ছে, তার আর ঠিক নেই। তোমার যদি অন্য কোন কাজ থাকে ত আজ আর তা হচ্ছে না, সেটা জেনে রেখো।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা হবে না সরোজ, আমি গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছি। ফিরে এলে যা হয় তাই চাট্টি বেড়ে দিয়ো। আমায় আবার বারোটার আগেই বাসায় পৌঁছুতে হবে।"

সরোজ কহিল, "ব্যাপার কি? বাসায় আজ কিসের আয়োজন করেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কোন আয়োজন নেই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

সরোজ কহিল, "তা হবে না, সর্ব্ব-দা; আজ তোমায় ভাল করে না খাইয়ে আমরা ছাড়তে পারব না। আমাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করো না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সরোজ, আমার বড্ড দরকার; আজ আমায় মাপ কর, ভাই। আজ কিছুতেই দেরী করতে পারব না।"

ইতিমধ্যে সুকুমারী আসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ, তা কেমন করে হবে? কাল আপনি নিজে যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে গেলেন, মস্ত একটা খাবারের ফর্দ্দ দিয়ে গেলেন, আর আজ আপনার মত ঘুরে গেল! এ হতেই পারে না, আমি মাকে বলে দিচ্ছি।"

সর্ব্বানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও সুকু, শোনো, শোনো।" আর শোনো! সুকুমারী চিন্ময়ীর নিকট চলিয়া গেল। সরোজ একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সর্ব্ব দাদা, আমায় বলবে না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তোমাদের মিছিমিছি ব্যস্ত করে কি হবে?"

সরোজ কহিল, "না বললে আরও বেশী ব্যস্ত হব, তা কি বুঝতে পারছ না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, হয় তো আজই তিনটের ট্রেনে আমায় ডাক্তার সঙ্গে করে শিবরামপুর যেতে হবে। আজ চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করেছি, দেখি, সে এখন কি লেখে!"

সরোজ কহিল, "টেলিগ্রামের কি উত্তর আসবে, আমরা তা কি করে জানতে পারব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ঐ দেখ, ঐ ভয়ে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম না।"

সরোজ কহিল, "এই খবর তুমি আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমাকেই আমার বিশেষ ভয়। যাক্, ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ে ত কোন লাভ নেই।"

আজ প্রভাতে উঠিয়া সরোজ মনের মধ্যে যতখানি উৎসাহ অনুভব করিয়াছিল, এক নিমেষে সে সমস্তই চলিয়া গেল। দেবু যে কার্ত্তিকের পক্ষে কতখানি, তাহা সে বহুবার সর্ব্বানন্দর মুখে শুনিয়াছে, সেই দেবীপ্রসাদের এমন অসুখ! না জানি, কার্ত্তিক তাহার অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি করিতেছে! যে দেবী-প্রসাদের জন্য সরোজও এই দূর হইতে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, না জানি, সেই পুত্রের জন্য কার্ত্তিকের অন্ধকার কারাগারের প্রাচীর আরও কত-না কঠিনতর, দুর্ভেদ্য-তর হইয়া উঠিয়াছে! সরোজের মুখ উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় বারবার বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ তাহার মানসিক অবস্থা অনুভব করিয়া বলিল, "সরোজ, ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ভগবানের ইচ্ছার উপর কারও হাত নেই। তিনি যা চাইবেন, তা হবেই। তাড়াতাড়ি আমায় যা হয় একটা ভাতে-ভাত দিয়ে বিদেয় করে দিয়ো। আমি স্নান করে আসি।"

সর্ব্বানন্দ স্নান করিতে চলিয়া গেল। আর সরোজ সেই রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়াই ভাবিতে লাগিল। সুকুমারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে সরোদি? তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন?" সরোজ কোন উত্তর দিল না। ভিতর হইতে রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিলেন, "সরোজ দি, তাহলে ভাতে ভাত চড়িয়ে দি?"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে?"

রাঁধুনি বলিলেন, "সর্ব্ববাবু বলে গেলেন যে ওঁকে এখুনি যেতে হবে, দেবু না কে, তার ভারী অসুখ করেছে। তাই শুনে সরোজ দি ভয়ে অমনি কাঁটা হয়ে বসে পড়েছে।"

সুকুমারী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি হয়েছে? কার অসুখ করেছে?"

সরোজ এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বামুন দি, তুমি ভাতে ভাত চড়িয়ে দাও। এস সুকু, আমরা উপরে যাই। দেবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে সর্ব্বদাদাকে আজই যেতে হবে।"

সুকুমারী এবার সমস্তই বুঝিল। তাহারও মনে আজ অনেকখানি আনন্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেও রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সর্ব্বানন্দর জন্য বহু আয়োজন

করিতেছিল। কিন্তু হায়, সমস্তই বৃথা হইল! সর্ব্বানন্দকে আজ সে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

সর্ব্বানন্দ আহারাদি সারিয়া গমনোদ্যত হইলে, সরোজ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সর্ব্ব দা, আমি কি কোন দরকারে লাগতে পারি না?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আর এ বিষয়ে কি করতে পার?"

সরোজ কহিল, "দয়া করে ভেবে দেখ সর্ব্ব-দা, হয়তো আমার দ্বারাও কোন কাজ হতে পারে।"

সর্ব্বানন্দ তাহার কাতরতা দেখিয়া মনে মনে কি একটা কথা চিন্তা করিয়া বলিল, "হয়তো এ বিষয়ে তুমি অনেকখানি সাহায্যই করতে পারতে, কিন্তু আমি তা নিতে পারছি না।"

সরোজ কহিল, "কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কেন—তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

সরোজ কহিল, "আমি বুঝতে চাইনে, আর বুঝবও না, সর্ব্ব-দা—"

সর্ব্বানন্দ বাধা দিয়া বলিল, "ছি সরোজ, ছেলেমানুষী করো না। মা কি মনে করবেন? শশি ঠাকুরদা কি মনে করবে? দশজনে কি ভাববে? তোমার সেখানে যাওয়া হতেই পারে না। তবে—"

সরোজ কহিল, "কি তবে? বল, কি বলছিলে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "জানিনে, হয় তো যদি তোমাকে ছাড়া আর কোন উপায় না পাই, তখন ভগবান হয়তো আমাকে তোমার কাছেও সাহায্য নিতে বাধ্য করতে পারেন। তখন তোমার কাছে আসব, আজ তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

সরোজ কহিল, "তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমি আর থাকতে পারছি না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে আমি এ মরণের দিকেই এগিয়ে চলেছি। তুমি কি একটুও দয়া করবে না? এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যের দিক থেকে সাধারণের মতামতের দিক থেকে ফিরে মানুষের অন্তরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাও,—সহানুভূতি নিয়ে কাতর প্রাণীদের প্রাণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, সর্ব্ব-দা, তা হলেই তোমার মনে দয়া হবে।"

সুকুমারী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে সরোজের হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "সরো দি, তুমি ত এমন অবুঝ ছিলে না! ছি, এ-সব কথা কেন বলছ? যাও, আপনার কাজে যাও। আর দাঁড়িয়ো না।"

সরোজ কহিল, "না, না, দাঁড়াও। একটা কথা শোনো, যাবার আগে, কি টেলিগ্রাম আসে, সেটা বলে যেও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি নিজে আসতে পারব না, সরোজ, কেন না বড্ড দেরী পড়ে যাবে, তাহলে। তবে বলে যাচ্ছি, রোজ চিঠি দেব, মাকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। আর আজ টেলিগ্রামে কি খবর আসে, রঘু এসে বলে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সুকুমারী সরোজকে বলিল, "ছি সরো দি, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?"

সরোজ কহিল, "তুই কি জানবি সুকু, ঐ দেবু যে তাঁর কতখানি, তা যে তুই কিছুই

জানিস নে। দেবু যদি না বাঁচে, তা হলে কি যে হবে, তা মনে করতে আমার সমস্ত দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! আজ মহালয়ার দিনে এ কি কথা শুনলুম, সুকু! আজকের আগমনীর বাঁশীতে আমি যেন বিজয়ার বিদায়ের কাতর কান্না শুনতে পাচ্ছি! মা মঙ্গলময়ী, মঙ্গল কর মা।"

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্দেশে জগৎ-জননীর পদে প্রণাম করিল।

১১

শিবরামপুরের জমিদার-গৃহে প্রতি বৎসর যেরূপ ধূমধামে পূজা হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা অধিকতর আয়োজন হইয়াছে। সমস্ত হিতৈষী ব্যক্তির, সমস্ত আমলা-ফয়লার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া জমিদার বাবু এ বৎসর পূজার উপচার বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। নৃত্য-গীতের জন্য দুই দল যাত্রা, চার দল কবি, ছয় দল বাই এমন কি একদল থিয়েটার পার্টীকে আনাইয়া স্থানে স্থানে আসর করিয়া বোধনের দিন হইতে আমোদ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ স্বেচ্ছায়, কেহ-বা অনিচ্ছায় এই সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক কাহারও কথা শুনিতেছে না। আজ কয় দিন হইতে তাহার সম্মুখে লোকের তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার ঘর হইতে কেবল আজ্ঞাই প্রচারিত হইতেছে, সেখানে উপদেশ বা মন্ত্রণা দিবার জন্য কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। সর্ব্বানন্দ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইয়াছে, তবু কার্ত্তিক অচল, অটল।

দেবু যখন রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, তখন বহির্ব্বাটীতে ও অন্তঃপুরে, সর্ব্বত্রই একটা বিরাট কোলাহল। সর্ব্বোপরি চারিটী যে তোরণ রচিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতে ক্রমাগত আগমনীর বাঁশী বাজিতেছে। শৈলজাও যেন এ কয়দিনে পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, তাহার পুত্রকে লইয়া এই বীভৎস কোলাহল হইতে সে দূরে পলাইয়া যায়। কিন্তু স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সর্ব্বানন্দ কাতর হইয়া সপ্তমীর প্রভাতে কার্ত্তিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "পুত্র-হত্যা করবার যদি ইচ্ছা না থাকে, তা হলে এখনই এ-সব থামিয়ে দাও। দেবু কাল সারারাত ঘুমোতে পারে নি।"

কার্ত্তিক কহিল, "দেবু ঘুমোতে পারে নি,—তাতে শিবরামপুরের জমিদারের কি এসে যায়? তার মস্ত নাম-ডাক, ভারী সম্ভ্রম, সে-সব রাখতে হবে ত! আমার ছেলে মরছে, সে কথা সে শুনবে কেন?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি কার্ত্তিক, তুমি একটু স্থির হও।"

কার্ত্তিক কহিল,"আমার চাইতে স্থির কে? আমার যেটুকু প্রাণ ছিল, তাও মা দুর্গা এসে কেড়ে নিচ্ছেন। তাই ত' ভাল করে তাঁর পূজার বন্দোবস্ত করেছি। মা এসেছেন, লোকে পাঁঠা-মহিষ বলি দিচ্ছে। আমি শিব-রামপুরের জমিদার, আমার ত একটা বড় রকম কিছু করার দরকার, আমি আমার ছেলে বলি দেব। পারবে কেউ আমার সঙ্গে?"

সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইল। কার্ত্তিক একটা

বিকট হাস্যে তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক উড়াইয়া দিয়া বলিল, "চারি দিক থেকে অন্ধকার পাথরের পাঁচিলের মত ঘিরে আসছে। আসুক, কিন্তু আমিও দেখে নেব। ডুবে মরি ত' এমন করে ডুবব, যাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে কাকে বেঁধে রেখেছিলে, কাকে ডুবিয়ে মারলে। বুনো সিংহকে শেকল দিয়ে বাঁধলে সমস্ত ঘরখানাকে ভেঙ্গে-চুরে সে সেই ঘর চাপা পড়ে' তবে ত মরবে! এখন এ হয়েছে কি!"

কার্ত্তিক বদ্ধ জন্তুর মত একটা সুগভীর শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া অতি করুণস্বরে ডাকিল, "দেবু, বাবা আমার—" এবং পরক্ষণে সর্ব্বানন্দর নিকটে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "বেরোও এ ঘর থেকে, এ ঘরে আমি একা থাকব—অন্ধকারের মধ্যে আমি একা—একা।" সর্ব্বানন্দ জোর করিয়া কার্ত্তিককে নিকটস্থ বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল। বাহিরের আলো কার্ত্তিকের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই দুই হাতে সে মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া বালিশে মুখ লুকাইল। সর্ব্বানন্দ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কার্ত্তিক, বল, তুমি কি চাও?"

কার্ত্তিক কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আলো, আলো—অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আলো দাও। আলোকে অবজ্ঞা করেছিলুম, অপমান করেছিলুম, সেই পাপে সে আমার সামনে থেকে আজ তার ক্ষীণ রশ্মিটুকু'ও সরিয়ে নিচ্চে। দাও, আলো দাও, আলো, সর্ব্ব-দা, আলো দিয়ে আমায় বাঁচাও।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোখ চেয়ে ফেলো, কার্ত্তিক, চেয়ে দেখ, আকাশ-ভরা আলো এসে তোমার দরজায় দাঁড়িয়েছে। তুমি তাকে ডেকে নাও।"

কার্ত্তিক উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। কি ভীষণ উন্মাদের ন্যায় দৃষ্টি! সর্ব্বানন্দ অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি দেখছ কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক পুনরায় বালিশে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দেখছিলুম,—তোমার কথা সত্য কি না, অন্ধকার আমার কাছে হেরে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কি না! সে না গেলে ত আর আলো আমার কাছে আসতে পারবে না!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এমন অবস্থাতেও তুমি পাগলামি ছাড়বে না? আলো-অন্ধকার, ছাই-পাঁশ, সেই সব অর্থহীন প্রলাপ বকবে? যাক ছাই, তোমার যা ইচ্ছে যায়, তুমি তাই কর, কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটা ত কোন দোষ করে নি, ওর উপর এ অত্যাচার কেন? ওকে বাঁচতে দাও। এই সব গোল-মাল থামিয়ে দিয়ে নমো-নমো করে কোনমতে মায়ের পূজা সারো।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার কষ্ট হচ্চে, কি শৈলর কষ্ট হচ্চে, কি দেবুর কষ্ট হচ্চে, এ কথা আর সবাই শুনবে কেন? আমরা যদি কেউ মরি, তাতে ত কারও কিছু আসবে-যাবে না। তবে কেন তাদের প্রাপ্য আমোদে বাধা দেব? যদি তারা শোনে যে দেবু মরেছে, তাহলে তারা মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলবে, 'মা, জমিদারের ছেলেটিকে নিয়েছ, তা বেশ করেছ, তুমি

যা ভাল বুঝেছ করেছ, কিন্তু দেখো মা, আমার ছেলেটিকে নিয়ো না। আমার ছেলেটিকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ, এর জন্য এই নাও আমার নৈবিদ্দি, এই নাও আমাদের প্রণাম।' তাদের মধ্যে যদি কারো আমার মত অবস্থা হত ত আমিও যে রকম কথা ভাব্‌তুম, যে রকম কাজ কর্‌তুম, তারাও তাই কর্‌ছে, কেন না, তারাও মানুষ। তুমি মানুষকে এখনও চেন নি, সব্ব-দা।"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি-একটা কথা চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "তা হলে আমি দেবুকে এখান থেকে সরিয়ে টোলে খুড়ো মশায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখছি। আর আমি কিছুতেই তোমার কথা শুনব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি! তুমি আমার কাছ থেকে দেবুকে কেড়ে নিয়ে যাবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি যদি রাক্ষসের মত তাকে মারবার বন্দোবস্ত কর, তাহলে সাধ্য-মত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে বৈ কি!" কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিয়া অন্তঃপুরাভি-মুখে ছুটিল, কিন্তু দুই-চারি পা যাইতে না যাইতেই ধরাশায়ী হইল। সর্ব্বানন্দ তাহাকে আরও দুই-একজন লোকের সাহায্যে তাহার কোটরে আনিয়া শয়ন করাইল। কার্ত্তিক তখন সংজ্ঞা-হীন।

সর্ব্বানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে পারিল না, তখন ব্যস্ত হইয়া সে ডাক্তারের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগে প্রায় দুই ঘণ্টার উদ্যোগে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্ব্বানন্দর আদেশে পূজা স্থানের সমস্ত শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক জাগিয়াই বলিল, "এ কি, নবৎ বাজছে না কেন?" ডাক্তার তৎক্ষণাৎ কার্ত্তিকের আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে না জানাইয়া দেবী প্রসাদকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া টোলে লইয়া গেল। শৈলজা শিবচন্দ্রের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হিতে বিপরীত হবে না ত?"

শিবচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কোন ভয় নেই মা, আমার কাছে সে কিছুই করতে পারবে না। তবে আমার ভয় এই, এখানে যদি দেবুর ব্যাধির আরও বৃদ্ধি হয়, তা হলে কি করব?"

শৈলজা কহিল, "এই ত ওর আপনার ঘর, এ ঘরে যদি ও ভাল না-হয়, তা হলে আর কোথাও আশা নেই।"

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক যখন তাহার পুত্রের ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে ঘর শূন্য, তখন সে সর্ব্বানন্দকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেবুকে এ ঘর থেকে নিয়ে গেছ! ভাল করনি সর্ব্ব-দা। এর ফল ক্রমেই টের পাবে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তা পাই, পাব, তাই বলে তোমার মত বাপের তত্ত্বা-বধানে ছেলেকে রাখতে পারি নে!"

কার্ত্তিক কহিল, "শৈলকে একবার পাঠিয়ে দেবে?"

সর্ব্বানন্দ "দিচ্ছি" বলিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক পুত্রের ত্যক্ত শয্যার উপর পড়িয়া অতি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে অথচ মৃদুস্বরে ডাকিল,

"দেবু, ফিরে আয় বাবা!" কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই; কিন্তু যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সে দেখিল, শৈলজা তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। কার্ত্তিক হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল, সত্যই কি দেবু আমায় ছেড়ে গেল?" শৈলজা এই অপ্রত্যাশিত ভয়ানক প্রশ্নে ভীত হইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিল, "ষাট্, ও কি কথা বলছ তুমি? তুমি চল, তোমায় আমি নিতে এসেছি,—দেবু ডাকছে।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "ডাকছে—কিন্তু আমি যাব না! কেমন প্রতিশোধ নিচ্ছি শৈল? আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, দেবুও চলে যাচ্ছে,—কেমন, আমায় বেঁধে রাখবে? আমার যেটুকু আলো ছিল, তাও আমি নষ্ট করছি, যদি চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে ফেলব; তবু দেবুকে আর দেখতে যাব না। এইখানেই পড়ে থাকব, আমায় কেউ তোমরা আর এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। হয় এইখানে আমারও শেষ হবে, না হয়, অন্ধকার কারাগার থেকে একেবারে পূর্ণ আলোর মধ্যে আমি মুক্তি পাব!"

একজন দাসী আসিয়া, সংবাদ দিল, দেবু মাতার জন্য ক্রন্দন করিতেছে; শৈলজা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, কাতরভাবে বলিল, "আমায় যে শাস্তি হয় দিও, কিন্তু চল, একবার ছেলেটার কাছে চল।"

কার্ত্তিক তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও তুমি, আমি যাব না।"

শৈলজা উপায়ান্তর না দেখিয়া চলিয়া গেল। কার্ত্তিক সে রাত্রে কিছু আহার করিল না। মায়ের প্রসাদ লইয়া অনেক রাত্রে স্বয়ং শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আহার্য্য হইতে যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাবা, আমায় দয়া করুন, এই ঘরে আমায় থাকতে দিন।"

"তোমার সুমতি হোক" বলিয়া শিবচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী গেল, মহা অষ্টমীও চলিয়া গেল, কিন্তু দেবীপ্রসাদের ব্যাধি না কমিয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে যে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি নবমীর দিন সর্ব্বানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "আশা ত মোটেই দেখছি না। এক অক্সিজেন inhale করানো ছাড়া এখন আর ওষুধও কিছু নেই।" সর্ব্বানন্দ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই বলে আপনি এখন কোথাও যাবেন না।"

ডাক্তারটি ভদ্র; তিনি বলিলেন, "না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। তবে আপনাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখলুম।"

সর্ব্বানন্দ টেলিগ্রাম করিয়া আর একজন ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিল বটে কিন্তু প্রকৃতই যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, সেই কার্ত্তিককে কিছুতেই তাহার পুত্রের নিকট আনিতে পারিল না। শৈলজা বুদ্ধিমতী। সেও তাহার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল; তথাপি পাছে কি করিতে কি হয়, এই জন্যই

শুধু স্বামীকে ব্যস্ত করে নাই। কিন্তু তাহার স্বামীর অমতে পুত্রকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া শেষে যে তাহাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, এই দুঃখেই তাহার প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সপ্তমীর রাত্রে স্বামী যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে যে তাহাই ঘটিতে চলিল! ইহা দেখিয়া সে অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে হয়তো কার্ত্তিকের কাছে থাকিলে দেবুকে এমনভাবে হারাইতে হইত না। হায়, হায়, এখানে আসিয়া সে এ কি করিল! এই দেবুকে যদি ফিরাইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি করিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে গিয়া আবার কোন্ মুখে দাঁড়াইবে?

আজ বিজয়ার সন্ধ্যা। বর্দ্ধিষ্ণু শিবরামপুরের বহু গৃহ হইতে আজ বহু দুর্গা-প্রতিমা বাহির হইয়া গ্রামের রথতলায় সমবেত হইয়াছে। বহু ঢাক-ঢোলের শব্দে সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রথতলায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছে। জমিদারের আজ্ঞায় কোন অনুষ্ঠানেই ত্রুটি হয় নাই। আনন্দময়ীর আগমন ও অবস্থান যেরূপ সাড়ম্বরে হইয়াছিল, তাঁহার বিজয়াও তেমনি আলোকে গন্ধে শব্দে বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ করিবার বা পরের দুঃখের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আজ কাহারও নাই।

জমিদার মহাশয় তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন হইতে স্বীয় প্রতিমার বিজয়া প্রোসেশনের আলো দেখিতে ছিলেন। পাশে কেবল তাঁহার একজন ভৃত্য। সে-ই মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া গিয়া অনুষ্ঠানের ত্রুটি সংশোধন করিতেছিল। অবশেষে বহু আলোক জনতা ও নানাবিধ বাদ্যের শব্দ সঙ্গে লইয়া মা যখন চলিয়া গেলেন, তখন কার্ত্তিক সহসা দুই হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ আর পারিনে, ফিরে আয়, একেবারে সব আলো নিয়ে যাস্‌নে! ওরে দেবু, ফিরে আয়।"

ভৃত্য তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে সে পড়িয়া যাইত। কিন্তু সে যখন কার্ত্তিককে ধরিল, তখন কার্ত্তিক প্রায় সংজ্ঞাহীন। ভৃত্য তাহাকে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল।

কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেবীপ্রসাদেরও জগৎ-সংসার হইতে বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ ছুটিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিল, "যদি একবার দেখতে চাও ত এখনই এস।"

কার্ত্তিক তখন বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "আমি ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, আবার কেন ডাকতে এসেছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ওরে রাক্ষস, তোর নিজের ছেলে যে!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধকারের ছেলে কখন আলো হয়? তুমি ভুল করছ সর্ব্ব-দা, আমার আবার ছেলে কোথায়? কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ!"

সর্ব্বানন্দ তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া কার্ত্তিককে কোনমতে টানিয়া আনিয়া তাহার পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড় করাইয়া দিল।

কার্ত্তিকের সে সময়ের সে মূর্ত্তি বর্ণনার অতীত! শৈলজা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো তোমারই দেবু, তুমি ফিরিয়ে আনো। তোমারই ছেলে,—ওগো শোনো, একবার শোনো!" কার্ত্তিক কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে গেছিস রাক্ষসি! সত্য সত্যই নিয়েছিস! একটুও আমার জন্য রাখলিনে? ওঃ, আলো,—আলো একটু আলো—"

শৈলজা কার্ত্তিকের পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা

জমিই লক্ষ্মী, এই প্রবাদ-বচনটি আমাদের দেশে সুপরিচিত। জমিই মাতার ন্যায় আমাদের লালন-পালন করিয়া থাকে। জমি হইতে আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়, আর সেই খাদ্য খাইয়া আমরা জীবন ধারণ করি। জমি হইতে তুলা উৎপন্ন হয়, সেই তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র বয়ন পূর্ব্বক আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ করি। জমি হইতে উৎপন্ন খড় ইত্যাদি খাইয়া গাভী আমাদিগকে দুগ্ধ দেয়, সেই দুগ্ধ আমাদের একটি অতি-প্রয়োজনীয় পদার্থ; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় মধ্য-যুগে ইউরোপের Physiocrat গণ এবং আমাদের কৃষকগণ, জমিকেই সমস্ত সম্পত্তির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

জমি আমাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের আধার হইলেও, আমরা labourকে (পরিশ্রম) একেবারে ত্যাগ করিতে পারি না। Labour ব্যতীত জমি কর্ষিত হইবে না। জমি কর্ষিত না হইলে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এখনকার মত সভ্য অবস্থায়, পর্য্যাপ্ত ফসল সংগ্রহ করিতে গেলে, জমির যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে labourএরও তেমনি প্রয়োজন।

এখনকার যুগে অনেকেই কৃষিবিদ্যাকে একটা science (বিজ্ঞান) বলিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে manufacture জাতিমাত্রেরই অবলম্বনীয়। Manufactureএর সৃষ্টি না হইলে, জুতা প্রস্তুত হইত না, এবং তাহা হইলে শ্রীচরণের শোভার ব্যাঘাত ঘটিত; নানাপ্রকার পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত না হইলে, সৌখীন-প্রকৃতির মানবগণকে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, ইত্যাদি। তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া অনেক অর্থবিদ্ পণ্ডিতও বলেন যে, manufacture না থাকিলে, জগতের ব্যবসায়-বাণিজ্য এত বিস্তারিতভাবে চলিত না। ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তারিতভাবে না চলিলে, জগতের বিভিন্ন দেশবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারিত না। সুতরাং manufacture বিহনে জগতে এত বিস্তারিতভাবে সভ্যতার বিকাশ ঘটিত কি না সন্দেহ!

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি একান্ত সারহীন নয়।

জগতে সভ্যতার বিকাশের জন্য manufactureএর যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কোন্ অচিন্তনীয় কালে মানব যখন বন-জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদি পশুর সহিত উলঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিত, তখন manufacture-এর কোন প্রয়োজন ছিল না। মৃগয়ালব্ধ আমমাংস এবং স্বচ্ছন্দ বন-জাত ফলমূলই তাহার রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিত; পশুচর্ম্ম লজ্জা-নিবারণ করিত। তাহার পর একটু সভ্য হইয়া মানব যখন কৃষি-কার্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন হইতে মানব স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারী হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কৃষি-বিদ্যা অসভ্য মানবকে পশুর অবস্থা হইতে ফিরাইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রদান করিয়াছে। সমাজের সেই প্রথম স্তরে manufacture দেখা দিলেও উহার বিস্তার ঘটে নাই। তাহার পর মানব ক্রমশঃ pasture stage ছাড়াইয়া যখন agriculture stageএ উঠিল, তখন manufacture আসিয়া সমাজে স্পষ্টভাবে দেখা দিল। তখন হইতে চর্ম্মের পরিবর্ত্তে, মানব তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বয়ন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিল; গৃহস্থালীর জন্য হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদিও প্রস্তুত করিতে লাগিল; পুত্রকন্যাগণের জন্য নানা-প্রকার মাটীর খেলনা প্রস্তুত করিতেও শিখিল।

কিন্তু manufacfure কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে,— যে সমস্ত manufacturing জিনিষ আমরা দেখিতে পাই, সে সমুদয় কি কি দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়াছে? Manufacture এর উন্নতি agriculture এর উন্নতির সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ। তুলা ভাল হইলে কাপড়ও ভাল হয়; আবার তুলা খারাপ হইলে কাপড়ও খারাপ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বয়ন-শিল্পের উন্নতি বা অবনতি তুলার চাষের উপর নির্ভর করিতেছে। এইরূপে সমুদয় manufacturing artই কৃষির উপর নির্ভর করে।

বিশেষজ্ঞগণ তবে বলিতে পারেন যে, mining art ত agricultureএর উপর নির্ভর করে না। Mining art না থাকিলে আজ কি মানব বিবিধ কার্য্যে এত উন্নতি করিতে পারিত? খনিজ পদার্থ না থাকিলে কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ জন্মানোও কঠিন হইত। খনিজ পদার্থ আছে বলিয়া আজ জাহাজাদি নির্ম্মিত হইতে পারিয়াছে, কল-কারখানা সম্ভবপর হইয়াছে। স্বর্ণ, রূপা ইত্যাদি বহুমূল্য পদার্থগুলি medium of exchange রূপে জগতে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। লৌহের উপকারিতা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। Locke সত্যই বলিয়াছেন যে, "লৌহের আবিষ্কারক সমুদয় শিল্প-শাস্ত্রের পিতা।"

খনিজ পদার্থের ন্যায় Animal products: মানবগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। আদিম অবস্থায় মানবগণ প্রাণী-জগৎ হইতে খাদ্য এবং বস্ত্র দুইই আহরণ করিত। এখন সভ্য হইয়াও খাদ্য এবং বস্ত্র-বয়নের উপাদানের জন্য মানবকে প্রাণী-জগতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইউরোপের সমুদয় জাতিই মাংসাশী। মাংস না হইলে

তাহাদের ভোজন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আবার বস্ত্র-বয়নের জন্য, পশম রেশম ও চামড়া, জগতের সমুদয় সভ্য জাতিরই প্রয়োজন। সেই জন্যই প্রাণী জগৎ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বাণিজ্য পণ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়।

আমরা প্রাণী-জগৎ এবং বাণিজ্য পদার্থের উপর নির্ভর করি বলিয়া, কৃষি-কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা লোপ পাইতে পারে না। কৃষি না থাকিলে কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারিত না। তাহা হইলে চমরী, ভেড়া ইত্যাদি পশুগণ হইতে পশম সংগ্রহ কি করিয়া হইত! কৃষি-উৎপন্ন খাদ্য না পাইলে গরু-বাছুর জীবন ধারণ করিতে পারিত না, তাহা হইলে দুগ্ধ পাওয়া কি সম্ভবপর হইত! আবার মানবগণ এবং জীবগণ যদি খাদ্যাভাবে প্রাণধারণ করিতেই অক্ষম হইত, তাহা হইলে খনিজ পদার্থ সকল কোন্ কার্য্যে লাগিত? সুতরাং আমরা যেরূপেই দেখি না কেন, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৃষিই আমাদের জীবন-ধারণের একমাত্র মূল সহায়, সভ্যতার অন্যতম যষ্টি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্য।

ভিন্ন ভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিশেষত্ব আছে। ফুল আমাদের দেবতা-পূজার প্রধান উপকরণ, সৌখীন-লোকদের ভোগের জিনিষ। তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত হয়, সেই সুতা হইতে আমাদের কাপড় হয়। বাঁশ ঝাড় হইলে বাঁশ কাটিয়া একদিকে যেমন লাঠি, বর্শা ইত্যাদি লোক-সংহারকারী অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অপর দিকে সেইরূপ গৃহাদি-নির্ম্মাণকালে নানা-রূপে সাহায্য প্রদান করে। গম, ধান, বজ্‌রা ইত্যাদি শস্যগুলি খাইয়া আমরা জীবন-ধারণ করি। আলু, এরোরুট, চেসনট ইত্যাদিও আমাদের বিশেষ খাদ্যরূপে ব্যব-হৃত হয়। দুর্ভিক্ষে পূর্ব্বোক্ত ফসলগুলি না জন্মাইলে আলু, এরোরুট, চেসনট ইত্যাদি খাইয়াও জীবনধারণ করিতে পারা যায়। গরিব আইরিশগণ ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি গোধূম চোখে দেখিতে পাইত না, তাহারা আলু খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। শর্করা হইতে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। Resin-এর সহিত spirit মিশ্রিত করিয়া বার্নিশ তৈয়ারি হয়। উদ্ভিদজাত ঘৃত ও তৈলেও আমাদের অভাব দূর হয়। নারিকেল, সরিষা, তিল, বাদাম, আঙুর ইত্যাদি হইতে নানাপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। অল্‌মোরা, চীন, এবং কানারায় ঘৃত-বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত বৃক্ষ হইতে বিস্তর ঘৃত সংগৃহীত হয়। তত্রত্য অধি-বাসীগণ উদ্ভিদ-জাত নীল ইত্যাদি হইতে নানাপ্রকার রং তৈয়ারী করে। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে কতকগুলি গাছের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি হইতে acid উৎপন্ন হয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-জাত দ্রব্য দ্বারা আমাদের যে শুধু জীবিকা-নির্ব্বাহই হয় তাহা নহে; কৃষি-জাত দ্রব্য হইতে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য এমন কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যেগুলি না হইলে আমাদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আবার কৃষি-জাত অনেক দ্রব্য দ্বারা প্রাণী-জগৎ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের

অভাবও দূর হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য একই দেশে জন্মায় না। এক এক প্রকার দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাটী ও বিভিন্ন জল-বায়ুর প্রয়োজন। আমাদের বাঙ্গালার মাটীতে লবণের অংশ যথেষ্ট থাকায় এখানে নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ বেশ পর্য্যাপ্ত জন্মায়। ভারতের উত্তরে মাটীতে লবণের অল্পতা হেতু, উক্ত অংশে অবস্থিত প্রদেশগুলিতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মায় না। আপেল, আঙুর শীত-প্রধান দেশেই উৎপন্ন হয়, এইজন্য উক্ত ফসলগুলি আমাদের বাঙ্গালা দেশে দুষ্প্রাপ্য। একই দেশে সকল প্রকার ফসল না জন্মাইলেও সকল প্রকার ফসল পাইতে সকলেরই আগ্রহ হয়, এই জন্যই manufactured articlesএর ন্যায়, কৃষি-জাত দ্রব্যগুলিও বাণিজ্য-পণ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

গম :—* রুশিয়া ৯ কোটী, ভারতবর্ষ ৪ কোটী ৮০ লক্ষ, কানাডা ৩ কোটী ৪০ লক্ষ, হঙ্গেরী ২ কোটী ৩০ লক্ষ, ইটালী ২১ কোটী, আরজেন্টাইন্ ২১ কোটী। ইক্ষুরসজাত শর্করা :—ভারতবর্ষ ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন, কিউবা ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন, যাভা ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার, আমেরিকা ৩ লক্ষ ২৪ হাজার। বীট হইতে উৎপন্ন শর্করা :—রুশিয়া ২১ লক্ষ টন, জর্ম্মানি ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার, অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরী ১ লক্ষ ৫৪ হাজার, আমেরিকা ৫ লক্ষ ৪১ হাজার, ফ্রান্স ৫ লক্ষ ১৫ হাজার, হল্যাণ্ড ২ লক্ষ ৫১ হাজার, বেলজিয়ম ২ লক্ষ ৪০ হাজার। চাল :—ভারতবর্ষ ৪ হাজার কোটী ৪৫ লক্ষ মণ, চীন আড়াই হাজার কোটী ২৪ লক্ষ মণ, জাপান ৫০০ কোটী ২৫ লক্ষ মণ। মদ (wine)—ফ্রান্স ১০০ কোটী গ্যালন, ইটালী ৯৫ কোটী গ্যালন, স্পেন ৩৭ কোটী গ্যালন, অলজেরিয়া ২০ কোটী গ্যালন×, রুশিয়া ১০ কোটী গ্যালন্স। চা :—ভারতবর্ষ ২৭ কোটী পাউণ্ড, চীন ২১ কোটী পাউণ্ড †, সিংহল ১৯ কোটী পাউণ্ড, জাপান ৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। তামাক :—আমেরিকা ১১১ কোটী ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড, ভারতবর্ষ ৪৫ কোটী পাউণ্ড, রুশিয়া ২০ কোটী পাউণ্ড, অষ্ট্রীয়া-হঙ্গেরী ১৮ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, জাপান ৯ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, হলাণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিজ্ ১২ কোটী ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড। তুলা :—আমেরিকা ১১১ কোটী ৩৪ লক্ষ বেল (bale)‡ ভারতবর্ষ ৩৪ লক্ষ ৪২ হাজার বেল, রুশিয়া ২০ লক্ষ বেল, মিশর ১৫ লক্ষ।

কৃষি-জাত দ্রব্য বাণিজ্য-পণ্যরূপে বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ফল-মূল ইত্যাদি সাধারণতঃ ভোজ্য রূপেই এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হয়। ধান, গম ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যরূপে বিভিন্ন দেশে নীত হইলেও, স্থান-বিশেষে উহা রূপান্তরিত হইয়া যায়। কতকগুলি পদার্থ Raw-material হিসাবে এক দেশ

* অঙ্কগুলি grs হিসাবে। ×আলজেরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ।
† শুধু রপ্তানি হয়। ‡ ১ বেল=৫০০ পাউণ্ড।

হইতে অন্য দেশে নীত হয়। কতকগুলি সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই দেশ-বিদেশে নীত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কৃষিকার্য্য মানবের উন্নতির মূল হইলেও, এখন এই সভ্যতার দিনে জগতে উন্নতিশীল জাতিদের সহিত ঐক্য রাখিতে গেলে কৃষিকার্য্য শ্রেষ্ঠ, না, manufacture শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় কঠিন। ইউরোপীয় সভ্যতায় মুগ্ধ অনেকেই হয়ত বলিবেন, ইউরোপের সভ্যতা যখন manufactureএর উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন manufactureই, উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তাহা কি সত্য? ব্যবসায়ের তুলনায় আমেরিকা ইউরোপের সমকক্ষ। কিন্তু আমেরিকাকে এখনও আমরা agricultural country বলিব। জর্ম্মানি, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপের দেশগুলি এখন কৃষি-কার্য্যের দিকে যথেষ্ট নজর দিতেছে। Manufacture এর উপাসক ইংলণ্ডও এখন শস্য-উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড অন্যান্য বৎসরের দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন করিয়াছে। আর এক কথা, বিশ্বব্যাপী Blockade হইলে, দেশে যদি পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ত ক্ষমতা সত্ত্বেও হার মানিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই কথা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং যে দেশে দেশ-ভরা নদী এবং সীমানায় সীমানায় অনন্ত সমুদ্র লাফাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যাহার পর্ব্বতরাজি হইতে বৎসরে বৎসরে ভরা-ভাদ্রের ভীষণ বন্যা ছুটিয়া বাহির হয়, সে দেশ যে কৃষি-প্রধান দেশ এবং সে দেশের অধিবাসীদের কৃষিই যে বিধাতার নির্দ্দিষ্ট জীবিকা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ড শিল্প-প্রধান দেশ, আমাদের আসমুদ্র হিমাচল পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষও কৃষি-প্রধান দেশ! ইংলণ্ডের আমদানি দ্রব্যের শতকরা ৯৮।০ অংশ কাঁচা মাল বা Raw material আর আমাদের শতকরা ৯৫।৯৬ ভাগ পাকা মাল বা manufactured articles.

ইহার জন্য দুঃখ করিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। কৃষি কার্য্য আমাদের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট জীবিকা বলিয়াই যে আমরা তাঁহার ত্যাজ্য-পুত্র, তাহাও নয়। কৃষির উপরই শিল্প-চাতুর্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত। কৃষির উন্নতি-অবনতির সহিত উহাদের ভাগ্য-সূত্র গভীররূপে সংলগ্ন। সুতরাং কৃষি ছাড়া বা কৃষিকে অবহেলা করিয়া উহাদের অগ্রসর হওয়া কঠিন। বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে। এক একখানা জাহাজ হাজার টন মাল বোঝাই লইতে পারে। সে কালে যখন জাহাজ ছোট ছিল, তাহাদের মাল বোঝাই লইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, তখন নানাপ্রকার শিল্প এবং বহুমূল্য ধাতু দ্রব্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্যেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য রূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। দেশ কৃষি-প্রধান হইলে তাহার isolation হয়, এ ধুয়া এখন আর টিঁকিতে পারে না। ইংলণ্ডকে

কাপড় বুনিবার তুলা লইবার জন্য আমাদের এই ভারতবর্ষে আসিতেই হইবে। জর্ম্মানিকে পাট লইবার জন্য এখানে আসিতে হইবে। ইউরোপের সমস্ত জাতিকেই মদ লইবার জন্য ফ্রান্স বা ইটালীতে যাইতে হইবেই। চিনি লইতে গেলে জাভা বা ভারতবর্ষকে বাদ দিলে চলিবে না। সেকাল ও একালে ইহাই প্রভেদ। সেকালে প্রত্যেক দেশ self-sufficient ছিল। বাহিরের পণ্য না আসিলে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। সভ্যতার বিকাশের সহিত division of labour বা শ্রম-বিভাগ যেমন সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম হইতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মানব-জাতিও ক্রমশ self-sufficiency হারাইয়া ফেলিতেছে, কাজেই আমাদের দেশ যদি কৃষি-প্রধান হয় এবং কৃষিই যদি আমাদের জীবিকা হয়, তাহাতে আমরা সভ্যতায় অন্য-জাতির পশ্চাতে পড়িয়া রহিব এরূপ ভয় করিবার কারণ নাই। Steam navigation-এ এক দেশ হইতে অন্য-দেশের দূরতা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃহৎ অর্ণবপোতগুলি এক একটা জগৎ বিশেষ; তাহাদের মাল ধারণ করিবার ক্ষমতা অসীম!

তবে এইটুকুও বলিবার আছে যে, আমরা কৃষি-প্রধান দেশে থাকি এবং কৃষিই আমাদের জীবিকা বলিয়া দুইটা হেলে গরু এবং একখানা লাঙ্গল কিনিয়া ক্ষেতে দৌড়িলেই যে আমাদের দুঃখ দূর হইবে, তাহাও নয়; আমি তাহা করিতে বলিতেছি না। আবার ইহাও কেহ মনে ভাবিবেন না যে, আমাদের মত গরীব দেশে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড বা আমেরিকার ন্যায় scientific agriculture করিবার উপদেশ দিতেছি। উক্ত দেশগুলির ন্যায় extensive agriculture এখানে একেবারে অসম্ভব। প্রথমতঃ আমাদের ঐরূপ চাষ করিবার জমির অভাব। বাঙ্গালার জমিদারগণ বিস্তৃত ভূভাগ-সমূহের অধিপতি হইলেও উহা নানা প্রভাবে বিলি-বন্দোবস্ত থাকায়, বিলি জমিগুলি সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে যেমন এক পক্ষে কষ্টসাধ্য সেইরূপ অন্য পক্ষে ধর্ম্মত অন্যায়। গরীব প্রজা যে জমিতে পুরুষানুক্রমে কায করিয়া জমি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এখন হঠাৎ খেয়ালের মাথায় তাহার হাত হইতে সে জমি কাড়িয়া লওয়াও মহাপাপ। বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে Permenent settlement নাই, সেখানকার প্রজাদের জমির পরিমাণ খুব কম। সমস্ত কৃষককে রক্ষা করিবার জন্য সরকার একজনকে পাঁচ প্রকারের বেশী জমি দেন না। দ্বিতীয় অভাব, অর্থ। খেয়ালের মাথায়, দেশের কায করিবার জন্য হয়ত দুই-একজন ঝোঁকে পড়িয়া দুই-চারি হাজার টাকা বা চারি লাখ টাকা বাহির করিতে পারেন, স্বীকার করি; কিন্তু কোন কায করিতে গেলেই প্রথমে নানা প্রকার experiment-এর প্রয়োজন। Experiment করিতে গেলেই নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা তাহা করিতে স্বীকার করিবেন না, জানি। তাঁহারা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি চাহিয়া বসেন।

এই সমস্ত কারণেই আমাদের কৃষির দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা manufacture

করিতে পারিতেছি বলিয়াই যে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িতেছি তাহা নয়। আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি তাহার প্রধান কারণ, আমরা কৃষি-জীবি হইয়াও আমাদের ব্যবসায় আমরা ভালরূপে চালাইতে পারিতেছি না। সমস্ত নৈসর্গিক সুবিধা সত্বেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিতেছি। চাষাকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করি, চাষ করাকে ছোটলোকের কাজ বলিয়া মনে করি। খান-কয়েক ইংরাজী বইয়ের পাতা উল্টাইয়া আমাদের মেজাজ সাহেবি হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া বহুব্যয়-সাপেক্ষ সহর-বাসী হই; পল্লী-বাসীদের ঘৃণার চক্ষে দেখি; দেশ পল্লীগ্রামে হইলে ভদ্রসমাজে উহার নাম করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি। পল্লী-সমাজস্থিত কোন কুটুম্ব আসিলে, চাকরের ঘরে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করি। তাই বলিতেছিলাম, দোষ আমাদের,—আর-কাহারও নয়। সেই পুরাকালে ভেরী নিনাদ করিতে করিতে আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর আর্য্য শব্দের অর্থ "চাষা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য আমরা এদেশবাসী অনেকে ভট্ট-মহাশয়ের উপর খড়্গহস্ত। আমি কিন্তু ঐ অর্থ, সত্য না হইলেও, গ্রহণ করিতে রাজী। যখন সমস্ত জগৎ সূচিভেদ্য গাঢ় অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জগতের সমুদয় লোকই যখন আম-মাংসাশী, উলঙ্গ, সেই অচিন্তনীয় কালেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্য হইয়া ক্ষেত্র-কর্ষণ পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই; ইহা আমাদের গৌরবের কথা, সম্মানের কথা, বিশেষ পৌরুষের কথা। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাচীন সাহিত্যেও ত এমন অনেক কথা পাই যাহা সামান্য গৃহস্থের কোন-না কোন কার্য্যভার মাত্র নির্দ্দেশ করে। যে দোহন করে, সে-ই দুহিতা। সেই পবিত্র দিনে হিন্দুর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীরূপা গাভীগণ বিরাজ করিত। অনূঢ়া কন্যাগণের উপর গাভী-দোহন-ভার দেওয়া হইত; তাই তাঁহারা দুহিতা নামে অভিহিতা হইতেন। ক্রমশ এই দুহিতা কথা চলিত অর্থে কন্যারূপে ব্যবহৃত হইয়া রাজার কন্যাকেও বুঝাইয়া থাকে। কোন রাজকন্যাকে রাজ-দুহিতা বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধা হইয়াছেন, এমন কথা ত শুনা যায় না।

এইরূপে ইউরোপে অবিবাহিতা কন্যাগণের উপর বস্ত্র-বয়ন-ভার ছিল বলিয়া তাহারা spinsters নামে অভিহিত হইত। সুতরাং আর্য্য শব্দের অর্থ ভট্ট মোক্ষমূলর-নির্দ্দিষ্ট "চাষা"ই যদি হয়, তবে তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হইব কেন?

সুতরাং কৃষি-কার্য্য যে শিল্প বা ব্যবসায়-বাণিজ্য অপেক্ষা হীন নয়, বরং ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্পই কৃষির মুখাপেক্ষী, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আর ইহাও দেখা গেল যে, কৃষি-বিদ্যা হইতে যে isolation আসে, এরূপ আশঙ্কা করিবারও কোন বিশেষ কারণ নাই। কৃষি-ব্যবসায় হীন নয়, ভালরূপে চালাইতে পারিলে উহাও অন্যান্য ব্যবসায়ের সমান লাভজনক দাঁড়াইতে পারে। ভারতবর্ষ

যে কৃষিপ্রধান দেশ তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন আমাদের দেশোপযোগী কৃষি-চর্চ্চাই আমাদের উন্নতির উপায়। আমেরিকার কৃষি বা জর্ম্মানির কৃষি-শিল্প এখানে চলিবে না। এখানকার উপযোগী করিয়া, আমাদের সামর্থ্যে কুলায় এমন-ভাবে কৃষিকার্য্য চালানোই আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্

(Anti-toxin)

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে কয়টি কন্যা জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে bacteriology (ব্যাকটেরিয়োলজী) বা বীজাণুবিদ্যা সকলের ছোট। বয়স দেখিতে গেলে ইনি ৩০।৩৫ বৎসরের বেশী বড় হইবেন না। কিন্তু এই অল্প বয়সেই ইনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ইহাঁর হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন ভগিনীগণের পক্ষে বিস্মিত ও মুগ্ধ নেত্রে ইহাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই! বীজাণুবিদ্যা বা bacteriology-র শেষ কীর্ত্তি anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) এর আবিষ্কার। চিকিৎসা জগতে বর্ত্তমান সময়ে এত বড় আবিষ্কার বুঝি আর দ্বিতীয়টি হয় নাই। সেদিন যখন মহামতি পাস্তর (pasteur) সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রমাণ করিলেন যে পচন ব্যাপারটা (putrefaction) কতকগুলি উদ্ভিদাণুর কায ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেদিন কে মনে করিয়াছিল—পাস্তরের এই আবিষ্কারের উপরই বীজাণুবিদ্যার (bacteriology) প্রস্তর প্রোথিত হইল! এই ঘটনার পর তিনি যখন আরও প্রমাণ করিলেন যে পশুদের কতকগুলি রোগের মূল কারণ এক-এক প্রকার বীজাণু ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন এই বীজাণুদের বিষয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কয়েক বৎসরের উদ্যোগে পণ্ডিতগণ এই বীজাণুদের পৃথক করিতে পারিলেন এবং তাহাদের চাষ-আবাদ (culture) করিতেও সমর্থ হইলেন। ইহার পর বীজাণুদের জীবন-যাত্রার ধরণ-ধারণ, বংশ-বিস্তারের রকম-সকম এবং তাহাদের বিশেষত্ব প্রভৃতি বুঝিতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণুদের সহিত এত খানি পরিচয় হওয়ার পর স্পষ্ট দেখা গেল, মানুষের যে-সব সংক্রামক রোগ হয়, তাহাদের কতকগুলির এক-এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যাক্‌টেরিয়া বা বীজাণু আছে। ইহার পর প্রমাণ হইল যে, রোগের কারণ ঠিক এই বীজাণু নয়—বীজাণুদের শরীর হইতে যে এক প্রকার বিষ (toxin) নির্গত হয়,

জীবদেহে তাহাই রোগোৎপত্তির কারণ। এই বিষকে বীজাণুবাদীরা (bacteriologists) টক্‌সিন্ (toxin) নাম দিয়াছেন।

ইহার পর bacteriologist (বীজাণুবিদ্) দের সকল চেষ্টা "Immunity—" বা রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির আলোচনায় নিযুক্ত হয়। Immunity বিষয়টা অত্যন্ত জটিল এবং একান্ত দুজ্ঞের্য়। Bacteriologistদের চেষ্টায় ও উদ্যমে immunity-র কতক রহস্য প্রকাশ হইতে পারিয়াছে। বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যাহার একবার হয়, জীবনে আর দ্বিতীয়বার প্রায় তাহার সে রোগ হইতে দেখা যায় না, হইলেও খুব মৃদু আকারেই হইতে দেখা যায়। ইহা অবশ্য খুব প্রাচীনকাল হইতেই লোকে জানে ত, কিন্তু ইহা হইতে যে একটা কাজের বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, সে কথা ইহার পূর্ব্বে কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বীজাণুবাদীরাই সর্ব্বপ্রথমে এ সত্যটি কাযে লাগাইবার চেষ্টা করিলেন। তাহারা স্থির করিলেন, কৃত্রিম উপায়ে কোন ব্যক্তির শরীরে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি (immunity) জন্মাইয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে বিবিধ পরীক্ষা এবং তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শরীরের মধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, যাহা toxin (টক্‌সিন্) এর বিরোধী, সুধু বিরোধী নয়, টক্‌সিন্‌কে বিনাশ করিতে পারে। এই জন্য তাঁহারা এই সকল পদার্থকে anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) নাম দিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, toxin (টক্‌সিন্) হইতে ব্যাকটেরিয়াদের ছাঁকিয়া বাদ দিয়া যদি সেই toxin কাহারও শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতেও শরীরের মধ্যে য়্যাণ্টি-টক্‌সিনের উদ্ভব হয়। সুতরাং য়্যাণ্টি-টক্‌সিনের উৎপত্তির জন্য যে ব্যাকটেরিয়া বা বীজাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইতেই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। ব্যাকটেরিয়া কর্ত্তৃক উৎপন্ন toxin (বিষ) প্রবেশ করাইলেই চলিতে পারে। রোগ-বীজাণুকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো অনেক সময় নিরাপদ নয়,—কেন না, দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহারা অনবরত সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে থাকে, তখন আর ইহাদের উপর আমাদের কোন হাত থাকে না। কিন্তু toxinএর (টক্‌সিন্) বেলায় ঠিক সে কথা বলা যায় না। অন্যান্য বিষের মত ইহার মাপ করা চলে—ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ইহার মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে কোন জীব দেহে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ anti-toxin (য়্যাণ্টি-টক্‌সিন্) এরও উদ্ভব হয়। এই সামান্য পরিমাণ toxin প্রবেশ করায় কতকগুলি দোষ দেখা দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা এত মৃদু যে কখনও মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় না। ইহার পর উক্ত জীব-দেহে যদি অধিক মাত্রায় toxin প্রবেশ করানো হয়, তাহাতেও সে জীবের কোন ক্ষতি হয় না—কেন না, পূর্ব্বে যে toxin প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য জীবটির দেহে যে anti-toxin উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই য়্যাণ্টি-

টক্‌সিনের দরুণ কতকটা toxin নষ্ট হইল।

য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin)এর ইতিহাসে ইহাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় আবিষ্কার মনে করিতে হইবে। কেননা ইহা হইতে জানা গেল, একটি প্রাণীর শরীরে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া যদি ক্রমশঃ toxinএর মাত্রা বাড়ানো যায়, তাহাতে প্রাণীটির কোনই অনিষ্ট ঘটে না, সে অবাধে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। সহ্য করিতে পারে তাহার কারণ এই যে, যেমন একদিকে toxinএর মাত্রা বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে রক্তের মধ্যে anti-toxin এর মাত্রাও বাড়িয়া যায়। এইরূপ কয়েকবার করায় জন্তুটির রক্তে anti-toxin এর পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, তখন আসল রোগটির আক্রমণেও তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। এতখানি জ্ঞান জন্মাইবার পর পণ্ডিতদের মনে কল্পনার উদয় হইল যে, কোন-একটা বৃহত্তর পশুর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণ য়্যান্টি-টক্‌সিন্ উৎপন্ন করিয়া, সেই রক্তের কতকটা যদি কোন ক্ষুদ্রতর পশুর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র পশুটির পক্ষে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতদের এই অনুমান সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

এতদিন পর্য্যন্ত কেবল পশুদের উপরই পরীক্ষা চলিতেছিল। এখন হইতে মানুষের উপরও পরীক্ষা করিবার মত অবস্থা উপস্থিত হইল। কোন পশুর রক্তে anti-toxin উৎপন্ন করিয়া, সেই পশুর রক্ত হইতে serum (সেরাম্) প্রস্তুত করিয়া লইয়া মানুষের শরীরে প্রয়োগ করিলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, ইহা বোধ করি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) নামক রোগে এই serum যে কি আশ্চর্য্য ফল দেয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই রোগে প্রথম মাত্রা anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম্) প্রয়োগে কতটা কি ফল হইবে, তাহা যে অঙ্ক কষিয়া বলা না যায় এমনও নয়। ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) রোগে anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম) প্রয়োগে যতটা ফল হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য সংক্রামক রোগে আজ পর্য্যন্ত তেমন ফল পাইতে দেখা যায় নাই। শরীরের মধ্যে toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিলে, কি প্রণালীতে anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্)এর উদ্ভব হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না—বিষয়টা এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নাই—ইহার ব্যাপার অনেকটা আন্দাজী। এ বিষয়ে মতভেদও যথেষ্ট আছে; তা যতই মতভেদ থাক্ ব্যাক্‌টেরিয়া বা রোগ-বীজাণু প্রবেশ না করাইয়া সুধু টক্‌সিন্ (toxin) প্রবেশ করাইয়াও যে anti-toxin উৎপন্ন হইতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মত-বিরোধ নাই। Anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) থাকে রক্তের সেরামের (serum) মধ্যে। সেরাম (serum)এর যে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি আছে, এ কথা প্রাচীন কালেও লোকের অবিদিত ছিল না। 'রোগ-বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া, সকলেরই যে রোগ উৎপন্ন করিতে

পারে না, তাহার কারণ রক্ত বা সেরামের (serum) মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) মজুত্ থাকে বলিয়া।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগের anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) ঘোড়ার রক্ত হইতে সংগ্রহ করা হয়। কি করিয়া সংগ্রহ হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। একটা খুব সুস্থ বলিষ্ঠ ঘোড়া বাছিয়া লইতে হয়; তাহার ত্বকের এক স্থানে কতকটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ toxin (টক্‌সিন্) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ঘোড়াটার একটু জ্বর হয়, এবং তাহার চামড়ার যে স্থানটিকে বিদ্ধ করা হয়, সেখানে একটু প্রদাহ হয়, ইহার বেশী আর বড় একটা কিছু হইতে দেখা যায় না। ইহার কয়েক দিন পরে, আরও একটু বেশী মাত্রায় toxin (টক্‌সিন্) প্রয়োগ করা হয়—এইরূপে ক্রমশ টক্‌সিন্ (toxin) এর মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। ঘোড়াটার রক্তের মধ্যে anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) এর উদ্ভব হয় এবং টক্‌সিনের মাত্রা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin) এর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শেষে এক সময় ইহার পরিমাণ এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাহার অধিক anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) সৃষ্টি করা ঘোড়াটার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন ঘোড়াটার একটা শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া লইয়া, তাহা হইতে serum (সেরাম্) পৃথক করিলেই anti-toxin serum (য়্যান্টি-টক্‌সিন্ সেরাম) প্রস্তুত হইল। এই serum-(সেরাম)-কে কাঁচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিতে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এক একটি শিশিতে এতখানি সেরাম থাকে, যাহা একবার প্রয়োগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

য়্যান্টি-টক্‌সিনের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনে এককালে খুবই কুসংস্কার ছিল—এখনও যে তাহা নাই, এমন নয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কুসংস্কারটি ক্রমশ লোকের মন হইতে দূর হইয়া যাইতেছে। Anti-toxin (য়্যান্টি-টক্‌সিন্) এর প্রয়োগে কতকগুলা উপসর্গ যে না ঘটিতে পারে, এমন নয়। কিন্তু তাহার জন্য ভয় করিবার কোন কারণ নাই। য়্যান্টি-টকসিন্-প্রয়োগের দ্বিতীয় সপ্তাহে কাহারও কাহারও গায়ে এক প্রকার লাল লাল দাগ বাহির হইতে দেখা যায়। কাহারও বেলায় বা অন্যবিধ উপসর্গও দেখা দেয়। এ সকল তত মারাত্মক ব্যাপার নয়—ইহার জন্য ভীত হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

ডিপ্‌থেরিয়া (diphtheria) রোগে য়্যান্টি-টক্‌সিন্ যে অমোঘ ঔষধ, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দ্বারা ফল পাইতে হইলে রোগ সন্দেহ হইবামাত্রই য়্যান্টি-টক্‌সিন্ (anti-toxin) প্রয়োগ করা আবশ্যক—এ বিষয়ে যতই বিলম্ব ঘটিবে, ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ততই সুদূরবর্ত্তী হইবে। পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, রোগের প্রথম দিন প্রয়োগ করিতে পারিলে, শতকরা ৪·৭ জনের মৃত্যু সম্ভব; আর রোগের পঞ্চম দিনে প্রয়োগ করিলে শতকরা ৩৫·৩ জনের মৃত্যু হইতে দেখা যায়। অতএব ডিপথেরিয়া রোগ সন্দেহ হইবা মাত্রই anti-toxin প্রয়োগ করা আবশ্যক; এ বিষয়ে কাল

বিলম্ব করিলে শেষে মনস্তাপ পাইতে হয়।

ডিপথেরিয়া রোগের য়্যান্টি-টক্‌সিন্ যে কেবল এই রোগের ঔষধ, তাহা নহে—ইহার প্রতিষেধকও বটে। যদি কেহ ডিপথেরিয়া রোগীর সংস্পর্শে আসে, তাহার পক্ষে প্রতিষেধক-হিসাবে এই য়্যান্টি-টক্‌সিন্ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগের টীকা দিলে যেমন অনেক দিন বসন্ত রোগ হওয়ার ভয় থাকে না, ডিপ্‌থেরিয়া য়্যান্টি-টক্‌সিনের বেলায় কিন্তু সে কথা বলা যায় না। ইহার শক্তি বড় জোর দুই-তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, তাহার বেশী নয়।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগে যেমন ডিপ্‌থেরিয়া য়্যান্টি-টক্‌সিন্ ব্যবহৃত হয়, তেমনি অন্যান্য সংক্রামক রোগেও ভিন্ন ভিন্ন য়্যান্টি-টক্‌সিনের ব্যবহার হইয়া থাকে! দুঃখের বিষয়, ডিপ্‌-থেরিয়া-য়্যান্‌টি-টক্‌সিনের মত ইহাদের ফল তেমন অব্যর্থ ও ধ্রুব বলিতে পারিবার মত সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

অন্তঃপুর*

পাত্র-পাত্রী

বাগানে—

বৃদ্ধ
অপরিচিত
মার্থা } বৃদ্ধের নাতনী
মেরি }
জনৈক কৃষক
লোকের দল

বাড়ীর মধ্যে—

পিতা }
মাতা } সকলে
দুইটি বালিকা } নির্ব্বাক
একটি শিশু }

[উইলো গাছে পরিপূর্ণ একটি পুরাতন বাগান, বাগানের পিছনে একখানি বাড়ী—বাড়ীর একতলার একটি ঘরে তিনটি শার্সির মধ্য দিয়া আলো দেখা যাইতেছে, তন্মধ্যে পরিবারস্থ সকলে সমবেত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে বসিয়া আছে—পিতা চিমনির পার্শ্বে এককোণে বসিয়া আছেন, মাতা টেবিলের উপর এক হাত রাখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—শ্বেত-পরিচ্ছদ-পরিহিত দুইটি বালিকা সীবনে ব্যস্ত, ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদের মুখে ও চোখে এক স্বপ্ন-জড়ানো হাসির ভাব—একটি শিশু নিদ্রিত, মাতার বাম হস্তের উপর শিরটি ন্যস্ত—যখনই কেহ তাহাদের মধ্যে স্থান ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ নড়িতেছে,

* বেলজিয়মের কবি Maurice Maeterlinck রচিত Interior এর বঙ্গানুবাদ। দুর্ঘটনা ঘটা ও যাহারা দুঃস্থ, তাহাদের সংবাদ দেওয়া,—এই দুই অবস্থার মধ্যে যে সময়টুকু, তাহা কি করুণ ও শোকাবহ, এই নাটকে তাহাই প্রতিপাদ্য।

অমনি তাহাদের গতি দেখিয়া মনে হয় বেশ গম্ভীর, ধীর ; এবং আলোটুকুও দূরত্ব ও শার্সির স্বচ্ছ কাঁচের জন্য স্থূল জগতের নহে বলিয়া মনে হইতেছে।

বৃদ্ধ ও অপরিচিত ব্যক্তিটি সন্তর্পণে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।]

বৃদ্ধ। এধারটা হল বাড়ীর পেছন দিক। ওরা এদিকে কখনো আসে না—দরজাগুলো সবই ওদিকে ; সবগুলিই বন্ধ, খড়খড়িগুলোও বন্ধ রয়েছে—কিন্তু এধারে কোন খড়খড়ি নেই বলে আমি আলো দেখতে পেয়েছি—ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে এখনো ওরা বসে আছে, কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এখানে এসেছি, তা ওরা জানতে পারেনি—মেয়েদুটি কিম্বা ওদের মা যদি বাইরে আসতেন তাহলে আমরা কি করতুম ?

অপরিচিত। আমরা কি করবো ?

বৃদ্ধ। বাড়ীর সকলেই ঘরে আছে কি না প্রথমে দেখতে চাই। চিমনির ধারে এক-কোণে বাপ ঐ বসে, দেখতে পাচ্ছ—তিনি চুপ করেই বসে আছেন, কিছু করছেন না, হাতদুটো হাঁটুর উপর—মা টেবিলের উপর হাত রেখে হেলান দিয়ে রয়েছেন···

অপরিচিত। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন না ?

বৃদ্ধ। না, বিশেষ কোন দিকে চেয়ে নেই তবে তাঁর দৃষ্টি খুব স্থির—আমাদের তিনি দেখতে পাবেন না। আমরা বড় বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি কি না, যাক্, আর কাছে যেও না। ওই যে সেই মরা মেয়েটির ছোট বোন দুটি—ওরা বসে কি বুনছে, ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে—কোণের ঘড়িতে ন'টা বেজেছে······ওরা কেউ কোন অমঙ্গলের কথা ভাবছেও না, কারো মুখে কথাটি নেই—

অপরিচিত। একটু ইসারা করি, বাপের নজর পড়বে। তিনি এদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন—জানালায় একটা ধাক্কা দি ? সকলে শোনবার আগে একজন অন্তত শুনুক······

বৃদ্ধ। কি যে করবো তা আমি জানি না···কিন্তু আমাদের খুব হুঁসিয়ার হওয়া আগে দরকার। বাপ বুড়ো, অসুখে ভুগছেন, মায়েরও অবস্থা তাই, আর বোনেরা খুবই ছোট···এরা সবাই তাকে ভালবাসত, কাউকে যেন আর তেমনটি বাসবে না। এ রকম সুখের সংসার আমি আর দেখি নি।···না, না ! জানলার কাছে যেও না, তাহলে ভারি খারাপ হবে। ব্যাপারটা যেন কিছু নয় এমনিভাবেই আমাদের বলা ভালো। আর আমরাও যে দুঃখিত এ রকম ভাব দেখাবো না, কারণ তাহলে ওরা একেবারে মুষড়ে পড়বে—আর কি যে করবে তা ভেবেই পাবে না······চল, আমরা বাগানের ওধারে যাই—দরজায় ধাক্কা দিয়ে যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবে ঘরে ঢুকিগে। আমি প্রথমে যাবো আর আমাকে দেখে ওরা কিছু আশ্চর্য্যও হবে না, কেননা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় ফুলটা-ফলটা নিয়ে এখানে এসে গল্পস্বল্প করে ঘণ্টাখানেক আমি কাটিয়ে যাই—

অপরিচিত। আমার যাবার কি দরকার ? তুমি একলাই যাও ; যতক্ষণ না ডাকে ততক্ষণ

না হয় তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো আমাকে ওরা কখনো দেখে নি—আমি একজন বাজে লোক, অচেনা······

বৃদ্ধ। না, না,আমার একলা যাওয়াও ঠিক নয়। একজনের মুখে দুর্ঘটনার খবর শুনলে সেটা বিশেষ করেই মনে লাগে, আসবার সময় এই কথাটাই ভাবছিলুম···যদি একলা যাই, তাহলে প্রথমে আমাকেই কথা কইতে হবে আর অল্প কথায় ব্যাপারটাও ওরা জানতে পারবে—আমার বলবার কিছু থাকবে না। আর আসল কথা কি জানো, কোন দুঃসংবাদ দেবার পরই যে স্তব্ধ অবসরটুকু আসে সেটুকুকে আমি বড় ভয় করি। তখন বুকখানা যেন ভেঙ্গে যায়—যদি আমরা দুজনে যাই, তাহলে আমি ঘুরিয়ে কথাটা পাড়বো; ধর না যেমন, আমি বলবো'খন "তারা তাকে দেখলে···সে জলের উপরে ভাসছিল···দুটি হাত জোড় করে···"

অপরিচিত। হাত দুটো তার মুঠো করা ছিল না; দুপাশে ভাস্‌ছিল—

বৃদ্ধ। দেখছ ত, আমরা নিজেরাই তর্ক আরম্ভ করেছি, আসল দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বর্ণনার ভেতর ঢাকা পড়ে গেল! যদি আমি একলা গিয়ে ব্যাপারখানা বলি তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি যে প্রথম কথাতেই একটা ভয়ানক গোল বেধে যাবে, আর কি-যে ঘটবে তা ভগবানই জানেন—অথচ যদি আমরা ওদের কাছে গিয়ে একজনের পর একজনে কথা কই তাহলে ওরা আমাদের কথা ধীর হয়ে শুনবে আর আসল ব্যাপারটাতেও মন দেবে না—মাও যে সেখানে থাকবে, সে কথাটি ভুলো না,···তার জীবন ত একটা সুতোয়-বাঁধা ঝুলছে—কিন্তু এক কাজ করতে হবে, বাজে কথায় প্রথমে দুঃখটাকে অনেকখানি চাপা দিতে হবে। সকলে এক সঙ্গে মিলে যে যার আপনার মত কথা বল্লে সকলের চেয়ে ভালো হবে; তাহলে বেশ আপনা-হতে দুঃখেরও অনেকটা উপশম হতে পারে -আলো কি বাতাসের মত বিনা চেষ্টায়, বিনা-গোলমালে দুঃখটা ছড়িয়ে পড়বে······

অপরিচিত। তোমার কাপড়-চোপড় ভিজে আর টস্‌টস্‌ করে জল ঝরছে—

বৃদ্ধ। না, না, আমার জামার তলাটা কেবল জলে একটু ভিজে গেছে—তোমার খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে? কাদায় তোমার জামা ভরে গিয়েছে—ভয়ানক অন্ধকার বলে পথে এটা আমার চোখে পড়েনি—

অপরিচিত। কোমর-ভোর জলে নেমে-ছিলুম—

বৃদ্ধ। আমার আসবার অনেক আগেই তাকে পেয়েছিলে?

অপরিচিত। না, বেশী নয়, একটু আগে—আমি গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিলুম; তখন বেলা গেছে, নদীর চারিধারে অন্ধকার ছেয়ে এসেছে। জলের দিকে চেয়ে চেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় জলের কোলের কাছে যে গাছগুলো, তারই ধারে কি রকম হঠাৎ নজর পড়ল যেন কি একটা অদ্ভুত জিনিষ ওখানে রয়েছে, তখন কাছে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! চুলগুলো তার মুখের চারধারে গোল হয়ে রয়েছে, আর স্রোতে একবার এদিকে একবার ওদিকে ভাসছে······

[ঘরের ভিতর বালিকা দুইটি জানালার দিকে মুখ ফিরাইল]

বৃদ্ধ। দেখছ, বোনছুটির চুলগুলি কাঁধের উপর কাঁপছে—

অপরিচিত। আমাদের দিকে তারা এম্নি মাথা নাড়লে, বোধ হয় আমি জোরে কথা বলছি তা, [বালিকা ছুইটি পূর্ব্বের মত আবার সেই ভাবে বসিল]—না, আবার মাথা ফিরিয়ে নিয়েছে······হাঁ, কোমর-ভোর জলে নেমে গিয়ে কোন রকমে তার হাত ধরে পাড়ের কাছে টেনে নিয়ে এলুম—দেখতে সে ঠিক তার ঐ বোনেদের মতই সুন্দর ছিল······

বৃদ্ধ। না, সে আরও-বেশী সুন্দর ছিল, ···আমার আর সে সাহস নেই কেন, বুঝতে পাচ্ছি না······

অপরিচিত। সাহস কি বলছো? মানুষে যা করে বা করতে পারে, তা সবই আমরা করেছি। এক ঘণ্টার বেশী হল সে চলে গেছে—

বৃদ্ধ। আহা, আজ সকালে সে বেঁচে ছিল! গিরাজ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পথে আমার সঙ্গে দেখা—সে বল্লে যে, আমি চলে যাচ্ছি—যে নদীতে তাকে পেয়েছ তারই ওপারে তার ঠাকুমাকে সে দেখতে যাচ্ছিল—আর যে দেখা হবে না, সে তা জানত না ত, আমায় কি-যেন সে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হয়, সাহস হল না, তাই আর কি আমার কাছ থেকে হঠাৎ তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখন সে সব কথা ভাবছি, তখন কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করি নি—লোকে চুপ্ করতে চাইলে কিম্বা তাকে কেউ বুঝতে পারবে না এই ভয় হলে, যেমন ভাবে হাসে, সেও সেই রকম ভাবে হেসেছিল ···তার চোখে পরদা পড়ে গেল, আমার দিকে আর চাইলেও না······

অপরিচিত। কতকগুলো চাষা বল্লে সমস্ত বিকেলটায় তাকে পাড়ের ধারে তারা ঘুরে বেড়াতে দেখেছে—তারা ভেবেছিল, বুঝি, ফুলের সন্ধানে ঘুরছে। এটা যে সম্ভব হবে, তার মৃত্যু······

বৃদ্ধ। কেউই তা ভাবতে পারে নি······ লোকে কি জানতে পারে!—অনেক লোক আছে যারা কথা কইতে কুণ্ঠিত হয়; বোধ হয় সেও সেই রকমের ছিল এবং একটা ছাড়া মরবার নানা কারণ থাকতে পারে—তুমি ঘরের ভিতর সব দেখতে পাচ্ছো বটে, কিন্তু মনের ভিতর দেখতে পাও না ত —সবাই ঐ রকম আর কি-বাজে কথা ছাড়া কিছুই কয় না! কোথাও কোন গোলমাল আছে কি না স্বপ্নেও তা কেউ ভাবে না, পরশু দিন সে ওখানে ছিল, ঠিক তার বোনেদের মত অমনি আলোয় বসেছিল ......কিন্তু আর তুমি তাদের সে রকমটি দেখতে পাবে না—, যদি এই কাণ্ডটা না ঘটত···আমার বোধ হয় তাকে সেই প্রথমবার দেখেছি··· আমাদের বোঝবার আগে আমাদের রোজকার জীবনে এতখানি বৈচিত্র্য ঘটবে—কে তা বুঝতে পারে! কি অদ্ভুত তার জীবন—মন কি শিশুর মত সরল, গম্ভীর...হয়তো কি বলতে এসেছিল, কিম্বা কিছু করতে এসেছিল তা করতও—কিন্তু হায়, সব শেষ হয়ে গেছে.........

অপরিচিত। দেখ, ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ওদের মুখে কেমন হাসির রেখা—

বৃদ্ধ। ওরা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়···ওরা নিশ্চিন্ত আছে, জানে, সেখানে সে নির্ব্বিঘ্নে আছে—কিছুই ঘটেনি!

অপরিচিত। ওরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে হাসছে—কিন্তু দেখ, বাপ ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাচ্ছেন ....

বৃদ্ধ। মায়ের কোলে যে ছেলেটি ঘুমোচ্ছে তারই দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন......

অপরিচিত। ছেলেটির ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে মা মাথা তুলতে সাহস কচ্ছেন না ......

বৃদ্ধ। আর ত ওরা বুনছে না···এবার সব মরার মত নিস্তব্ধ......

অপরিচিত। শিল্কের সাদা পরদা ফেলে দিয়েছে······

বৃদ্ধ। ছোট ছেলেটির দিকে দেখছে···

অপরিচিত। ওদের দিকে যে অপরে তাকিয়ে আছে, তা জানেও না······

বৃদ্ধ। ভাবতেও পারছে না, যে ওদের আবার অপরে দেখছে!

অপরিচিত। এবার আমাদের দিকে ফিরছে·· ···

বৃদ্ধ। তবু কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না...

অপরিচিত। ওদের খুব খুসী বোধ হচ্ছে, তবু যেন কি হয়েছে......কী যে তা বলতে পারি না......

বৃদ্ধ। ওরা ভাবছে, ওরা বিপদের বাইরে রয়েছে—বিপদ ওদের কিছু করতে পারবে না—দরজাগুলো সব বন্ধ আর জানালায় সব লোহার গরাদ আঁটা—বাড়ীটা যদিও পুরানো তবু মেরামত করে শক্ত করা আছে; আর তিনটে ওক্ কাঠের দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে......এমন কি আগে যে সব বিষয়ে সাবধান হবার কথা তা সব দেখে-শুনেই ওরা সাবধান হয়েছে·· ···

অপরিচিত। আগেই হোক আর পরেই হোক আমাদের বলে ফেলা উচিত...হঠাৎ কেউ এসে বলে ফেলে কোন গোল বাধিয়ে দিতে পারে ত! মাঠে সেই মরা মেয়েটিকে যেখানে রেখে এলুম, সেখানে অনেক চাষার ভিড় হয়েছে—হঠাৎ যদি তাদের ভিতর কেউ এসে দরজায় ধাক্কা—

বৃদ্ধ। মার্থা আর মেরি তাকে চৌকি দিচ্ছে···চাষারা সব গাছের ডাল কেটে একটি খাটিয়ার মত করেছে—আমার বড় নাতনিকে বলে এসেছি যেই তারা সেখান থেকে বেরুবে অম্নি যেন আগে এসে আমাদের খবর দেয়—যতক্ষণ সে না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্—তাকেই আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব......আর এরকমভাবে ওদের পানে তাকিয়ে থাকা যায় না, আমি ভাবছি, দরজায় ধাকা দিয়ে ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে খুব কম কথায় বলা যাক্···এখানে ত অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছি—

[মেরির প্রবেশ]

মেরি। দাদা, ওরা আসছে·· ···

বৃদ্ধ। ও, তুমি! কোথায় ওরা?

মেরি। ওরা ঐ ঢালু জায়গাটার নীচে—

বৃদ্ধ। ওরা খুব আস্তে আস্তে চুপ্‌চাপ্ করে আসছে ত!

মেরি। খুব চাপা গলায় ওদের প্রার্থনা করতে বলে এসেছি······মার্থা ওদের সঙ্গে আছে—

বৃদ্ধ। লোক কি অনেকজন?

মেরি। গ্রামের প্রায় সকলেই সেই সঙ্গে

আসছে—ওরা সব আলো আনছিল, আমি নিবিয়ে দিতে বলে এসেছি—

বৃদ্ধ। কোন্ পথ দিয়ে আসছে ?

মেরি। গলি-পথ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে আসছে—

বৃদ্ধ। সময় হয়েছে······

মেরি। দাদা, এদের তুমি সব বলেছ ?

বৃদ্ধ। কিছু বলিনি দিদি, তা তুই বুঝতেই পাচ্ছিস্ ত—ঐ যে এখনো আলোয় বসে রয়েছে—মেরি, দেখ্, জীবনটা যে কি তা একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখ্······

মেরি। ওঃ, মনে হচ্ছে যেন ওরা কত শান্তিতে রয়েছে—আমার মনে হচ্ছে যেন ওদের আমি এ স্বপ্নের ঘোরে দেখছি—

অপরিচিত। ঐদিকে দেখ, মেয়ে দুটি এবার নড়ছে—

বৃদ্ধ। ঐ যে, এবার ওরা উঠছে…

অপরিচিত। বোধ হয় জানলার দিকে আসবে—

(ঠিক সেই সময়ে একজন প্রথম জানালায় এবং অপরটি তৃতীয় জানালায় আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইল]

বৃদ্ধ। মাঝখানের জান্‌লায় কেউ এল না—

মেরি। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে আছে, ওরা শুনছে······

বৃদ্ধ। বড়টি কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে হাসছে—

অপরিচিত। ছোটটির মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, যেন ও ভয় পেয়েছে—

বৃদ্ধ। সাবধান, কেউ যেন শুনতে না পায়—

[অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ—মেরি তাহার ঠাকুরদার খুব নিকটে গিয়া তাহাকে চুম্বন করিল]

মেরি। দাদা… ..

বৃদ্ধ। মেরি, কাঁদিস্ নে, আমাদেরও একদিন সময় আসবে—

[সব নিস্তব্ধ)

অপরিচিত। কতক্ষণ ধরে ওরা দেখছে…

বৃদ্ধ। বেচারা ! কি অন্ধকার রাত—হাজার বছর ধরে দেখলেও কিছু দেখতে পাবে না ! ওরা এই দিকে চেয়ে আছে কিন্তু ঠিক উল্টো দিক্ থেকেই বিপদটা এসে পড়বে !

অপরিচিত। হাঁ, এইদিকেই ওরা চেয়ে আছে। মাঠের পথ দিয়ে যেন কিছু আসছে, কি, তা বুঝতে পাচ্ছি না—

মেরি। ও, হয়েছে, সেই ভিড়টা আসছে—অনেকদূরে বলে ওদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—

অপরিচিত। আঁকাবাঁকা পথ সব ঘুরে আসছে—চাঁদের আলোয় ঐ যে ওদের দেখা যাচ্ছে।

মেরি। ও, ওরা কত লোক ! যখন আমি চলে এলুম তখনও সহরের আশপাশ থেকে লোক আস্‌ছিল—অনেক ঘুরে সব আসছে ·····

বৃদ্ধ। তারা যে এসে পৌঁছুবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—আমিও ওদের দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে—ওরা মাঠ পার হচ্ছে—সব এত ছোট দেখাচ্ছে যে গাছপালা থেকে ওদের তফাৎ করা যায় না—দেখে মনে হয় যেন ছেলেরা চাঁদের আলোয় খেলা করছে—যদি ঐ মেয়ে দুটি দেখে, তাহলে

তারা কিছুই বুঝতে পারবে না—যে বিপদটা ঘণ্টা দুই ধরে উঁকি মারছিল এবার সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে তা ওরা যতই অনিশ্চিত থাক্! আর চেপে রাখা যায় না! যারা আনছে তাদের চেপে রাখবার সে শক্তিও নেই... ..এতক্ষণ এটা চাপা ছিল কিন্তু আর থাকে না—এর শেষ কোথায় জানা আছে বলে এবার সেই পথ ধরছে—এ চল্‌তে চল্‌তে কোথাও থামে না আর এর লক্ষ্য কেবল একদিকেই......এতে শক্তির দরকার......ওদেরও প্রাণে বেজেছে কিন্তু তবুও সব আসছে......ওদের মনটা দয়ায় ভরা...ঐ সব এগিয়ে আসছে......

মেরি। দাদা, বড়টি আর হাসছে না—

অপরিচিত। ওরা জানলা থেকে চলে যাচ্ছে......

মেরি। মাকে চুমু খাচ্ছে.....

অপরিচিত। ছেলেটিকে না জাগিয়ে বড়টি তার কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোচ্ছে—

মেরি। দেখ, বাপের ইচ্ছে যে ওরা তাঁকে চুমু খায়—

অপরিচিত। এখন সব নিস্তব্ধ......

মেরি। আবার ওরা মায়ের কাছে ফিরে এসেছে—

অপরিচিত। বাপ ঘড়ির সেই পেণ্ডুলামের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন—

মেরি। কি করছে ওরা তা নিজেরা জানেও না, তবে দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রার্থনা কচ্ছে...

অপরিচিত। এক-মনে নিজেদের মনের কথা শুনছে বোধ হয়!

[সব নিস্তব্ধ]

মেরি। দাদা, থাক্, আজ আর কিছু বলো না!

বৃদ্ধ। দেখ্, তুইও সাহস হারাচ্ছিস্—আমি জানি, ওদের দিকে তোর চাওয়া উচিত নয়। আজ প্রায় তিরেশি বছর হল, এতদিন পরে জীবনের বাস্তবতা প্রথম বুঝতে পারছি—ওদের এত অদ্ভুত আর গভীর বোধ হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না। বাড়ীতে আমরা যেমন থাকি, ঠিক সেই রকম ওরা একটা আলো জ্বালিয়ে বসে বসে রাত কাটাচ্ছে কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে যেন আর একটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমি ওদের দেখছি! কারণ আমার অল্প ব্যাপারই জানা আছে যা ওদের মোটেই জানা নেই, মেরি, তাই নয় কি? তোদের এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন, বল্ দেখি! হয়তো কিছু হয়েছে, সেটা আমরা কথায় প্রকাশ করতে পারছি না বটে, কিন্তু কেমন কান্না আসছে। জীবনে এত দুঃখ ঘটতে পারে কিম্বা লোকের মনে এত ভয় জাগতে পারে তা আমি জানতুম না। এমন কি যদি কিছু না ঘটত তাহলেও এরকমভাবে বসে আছে দেখলেই আমার ভয় হত—জগতের উপর ওদের বেশীরকম বিশ্বাস আছে—কেবল কতকগুলো কাঁচের আড়ালে শত্রুর কাছ থেকে দূরে বসে আছে আর ভাবছে যখন দরজা বন্ধ, তখন কোন বিপদই ঘটতে পারে না কিন্তু যা কিছু ঘটে তা যে সব মনের ভিতর ঘটে—আর জগৎটার ঘরের দরজার কাছেই তার শেষ নয়। ওরা জীবন-সম্বন্ধে এতই নিরাপদ যে স্বপ্নেও ভাবছে না, এ সম্বন্ধে

ওদের চেয়ে অপরে বেশী জানে কি, ঐ দরজা, থেকে দু'পা দূরে দাঁড়িয়ে, আমি এই বুড়ো মানুষ ওদের সারা জীবনের সুখটুকুকে ধরে রেখেছি!—ঠিক যেমন লোকে চোট্ খাওয়া পাখীকে হাতের মধ্যে পুরে রাখে! হাত খুল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না—

মেরি। দাদা, তোমার কি একটুও দয়া হচ্ছে না……

বৃদ্ধ। মেরি, এদের আমি দয়া করছি কিন্তু আমাদের ত কেউ করে না—

মেরি। দাদা, তাহলে কাল দিনের বেলা তখন বলো—দিনের আলোয় বিপদ আমাদের অভিভূত করতে পারে না—

বৃদ্ধ। মেরি, তুই ঠিক বলেছিস্, রাতে এ-সব না বলাই ভাল। কারণ দুঃখের পক্ষে দিনের আলোই ভালো—কিন্তু কাল আমাদের বলবে কি? বিপদ আপদ লোকের হিংসে বাড়িয়ে দেয়—যাদের ঘটেছে, তারা অপরের আগে জানতে চায়—অচেনা লোকের মুখে তারা খবর পেতে চায় না—কিছু থেকে ওদের যেন বঞ্চিত করেছি, আমার এমনি মনে হচ্ছে।

অপরিচিত। আরও অনেক দেরী হয়ে গেছে—প্রার্থনার গুনগুন শব্দটা আমি যেন শুনতে পাচ্ছি—

মেরি। ঐ যে ওরা ওখানে, ঝোপ্‌ঝাপ্ সব পার হয়ে এগিয়ে আসছে—

[মার্থার প্রবেশ]

মার্থা। আমি এসেছি, ওদের নিয়ে এসেছি……রাস্তায় সকলকে দাঁড়াতে বলেছি……

[বালকদের চীৎকার শ্রুত হইল]

ওই, ছেলেরা এখনো চেঁচাচ্ছে—ওদের আমি আসতে বারণ করলুম কিন্তু দেখতে চায় বলে সব এল! আর তাদের মায়েরা আমার কথা ত শুনবেই না—যাই, আমি বারণ করিগে,—না, চীৎকার থেমেছে। সবই তো ঠিক? ওর হাতে যে ছোট আংটিটি পাওয়া গেছে, তা আমি এনেছি আর ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু এনেছি—নিজে জিরিয়ে নেবার জন্য তাকে খাটিয়ার উপর রেখেছি · তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত ঘুমোচ্ছে! চুলগুলো নিয়ে আমাকে ভারী কষ্ট পেতে হয়েছে, কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না—সকলেই ফুল যোগাড় কল্লে কিন্তু ঐ মার্গারিট্ ফুল ছাড়া আর কোন রকম ফুল পাওয়া গেল না। তুমি এখানে কি করছো? ওদের কাছে যাও নি? (জানালা দিয়া ঘরের ভিতর দেখিয়া) ওরা ত কাঁদছে না—ওরা,—তুমি কিছু বলোনি, বুঝি?

বৃদ্ধ। মার্থা, মার্থা, তোর প্রাণের আবেগ বড় বেশী, তুই বুঝতে পারবি না ……

মার্থা। কেন পারব না? [কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর তিরস্কার-গম্ভীর স্বরে] দাদা, এ তোমার উচিত হয়নি……

বৃদ্ধ। মার্থা, তুই বুঝিস্ না…

মার্থা। আমি গিয়ে ওদের সব বলবো।

বৃদ্ধ। মার্থা, এখানে থাকো, একবারটি দেখে নাও—

মার্থা। ও, আমার দয়া হচ্ছে! আর দেরী করা ঠিক নয়…

বৃদ্ধ। কেন?

মার্থা। তা আমি জানি না, আর সে সম্ভবও নয়—

বৃদ্ধ। মার্থা, এদিকে এসো···

মার্থা। দেখ, ওরা কত ধীর, শান্ত—

বৃদ্ধ। মার্থা, এদিকে এসো···

মার্থা। (ফিরিয়া) দাদা, তুমি কোথায় —মনটা আমার এতই খারাপ যে তোমাকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না—কি করবো নিজেই বুঝতে পারছি না···

বৃদ্ধ। যতক্ষণ না ওরা সব টের পাচ্ছে, ততক্ষণ আর ওদিকে চেয়ে দেখো না···

মার্থা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো···

বৃদ্ধ। না, মার্থা, এখানে থাকো, বাড়ীর দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঐ পুরোণো পাথরের বেঞ্চে তোমার দিদির কাছে বসে থাকো, আর ওদিকে চেয়ো না—তুমি বড় ছোট, এ তুমি কখনো ভুলতে পারবে না। মৃত্যুকে চোখের উপর দেখলে মানুষের মুখের ভাব কি রকম হয়ে যায় তা তুমি জানো না। হয়তো ওরা কেঁদে উঠতে পারে, উঠবেই, কিন্তু ওদিকে দেখো না; কিম্বা হয়তো ওখানে কোন সাড়া-শব্দ থাকবে না, তা হলেও ওদিকে ফিরে দেখো না—দুঃখ যে কিভাবে প্রকাশ পাবে তা কেউ আগে জানতে পারে না—সাধারণতঃ প্রাণ থেকে কতকগুলো দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ে আর বেশী-কিছু ঘটে না, সেগুলো আমি নিজে যখন শুনবো তখন যে কি করবো তা নিজেই জানি না —সে রকম নিশ্বাস সব সময় আসে না। ···আমার যাবার আগে তোরা দু'জনে আমায় চুমু দে—

[প্রার্থনার গুণগুণ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল—জনতার কতকগুলি লোক বেগে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; মৃদু পদশব্দ ও কথাবার্ত্তার গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইল]

অপরিচিত। (জনতাকে) সব ঐখানে থাকো, জানলার কাছে যেও না—সে কই?

চাষা। কে? কার কথা বল্‌ছ?

অপরিচিত। বাকী সব লোক—যারা বয়ে আনছে।

চাষা। সদরের দিকে যে পথ, তারা ঐ পথের দিকে গেছে—

[বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন—মার্থা ও মেরি জানালার দিকে পিছন করিয়া সেই বেঞ্চের উপর বসিল, জনতার মধ্যে সামান্য গুণগুণ শব্দ শ্রুত হইল]

অপরিচিত। চুপ! কথা কয়ো না—

[বড় মেয়েটি ঘরের মধ্যে দরজার নিকটে গিয়া দরজা খিল দিয়া বন্ধ করিতেছে]

মার্থা। ওই যে দরজা খুলছে।

অপরিচিত। না, ভাল করে বন্ধ করছে—

[সব নিস্তব্ধ]

মার্থা। দাদা ত ভিতরে যান নি!

অপরিচিত। না, আবার মায়ের কাছে গিয়ে বসছে—কেউ আর নড়ছে না, ছেলেটা এখনো ঘুমোচ্ছে—

[সব নিস্তব্ধ]

মার্থা। মেরি, ছোট বোনটি আমার, তোর হাতদুখানি একবার দে—

মেরি। মার্থা—

[পরস্পরে আলিঙ্গন ও চুম্বন]

অপরিচিত। উনি নিশ্চয়ই গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন—সকলেই এক সঙ্গে ঐ মাথা তুলেছে—পরস্পরের দিকে চাইছে—

মার্থা। ওঃ মেরি, ছোট বোনটি আমার, আর না কেঁদে আমি থাকতে পাচ্ছি না!

[মেরির কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল]

অপরিচিত। নিশ্চয়! আবার দোরে ধাক্কা দিয়েছেন……বাপ ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন… ঐ যে, এবার উঠছেন……

মার্থা। মেরি, আমিও ভিতরে যাই—ওদের একলা ছাড়া হবে না—

মেরি। দিদি, দিদি—

[তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল]

অপরিচিত। বাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এবার খিল খুলছে—কি সন্তর্পণে খুলছে—চোখে কি উদ্বেগ—এখান থেকে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

মার্থা। ও, তুমি দেখো না……

অপরিচিত। কি?

মার্থা। ঐ এসেছে……

অপরিচিত। একটুখানি দোর কেবল খুলেছেন—মাঠ আর ফোয়ারার একটা কোণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না—দরজায় হাত দিচ্ছেন, এক পা পেছিয়ে গেলেন—বোধ হয়, বললেন—ওঃ, তুমি! হাত তুলে আবার দরজা সাবধানে বন্ধ করে দিলেন—তোমার ঠাকুরদা এবার ঘরে ঢুকেছেন……ঐ…

[জনতা জানালার নিকটে আসিল—মার্থা ও মেরি প্রথমে একটু ও পরে একেবারে স্থান ত্যাগ করিয়া গলা-জড়াজড়ি করিয়া জানালার দিকে দলের অনুসরণ করিল—বৃদ্ধকে দলের মধ্যে অগ্রসর হইতে দেখা গেল—ছোট বালিকা দুইটি উঠিল, মাতাও সেই সঙ্গে উঠিলেন এবং যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সেই চেয়ারে সাবধানে ছোট ছেলেটিকে এরূপভাবে শায়িত করিলেন যে বাহির হইতে তাহাকে নিদ্রিত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—শিশুর মাথাটি সম্মুখের দিকে অল্প নত হইয়া রহিয়াছে—মাতা বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সরাইয়া লইলেন—আগন্তুকের উপরের জামাটি খুলিবার জন্য বালিকার মধ্যে একজন চেষ্টা করিল এবং অপরজন তাহার জন্য একটি চেয়ার অগ্রসর করাইয়া দিল কিন্তু বৃদ্ধ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অস্বীকার প্রকাশ করিলে—পিতা আশ্চর্য্য হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল]

অপরিচিত। বলতে সাহস কচ্ছেন না ……আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন—

[জনতার মধ্যে গোলমাল]

অপরিচিত। চুপ!

[জানালার নিকট সকলকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন—ছোট বালিকাটি ক্রমাগত চেয়ার অগ্রসর করিয়া দেওয়াতে তিনি অবশেষে তাহাতে বসিলেন এবং পুনঃপুন কপালে হাত ঘষিতে লাগিলেন]

অপরিচিত। এবার বসেছেন……

[ঘরের ভিতর সকলে বসিল—পিতাকে দেখিয়া মনে হইল খুব তাড়াতাড়ি তিনি কথা কহিতেছেন—শেষকালে বৃদ্ধ কথা কহিল এবং তাহার গলার স্বর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—পিতা তাহাকে থামাইয়া দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃই সকলে ভয়ে শক্ত হইয়া পড়িল—মাতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন]

মার্থা। ও, এবার মা নিশ্চয় সব শুনেছেন।

[মাতা ঘাড় ফিরাইয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকিলেন—জনতার মধ্যে আবার শব্দ শ্রুত হইল—সকলে হাত দিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল—যাহাতে দেখিতে পায় তাহার জন্য বালকেরা চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহাদের মায়েরা ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিল]

অপরিচিত। চুপ! এখনো উনি বলেন নি……

[মাতা আগ্রহের সহিত বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিতেছে, দেখা গেল—তিনি আরও কত কথা বলিলেন; তারপর হঠাৎ সকলেই উঠিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে দেখা গেল—তারপর তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন]

অপরিচিত। ওদের বলেছেন, বলেছেন, সবাইকে একসঙ্গে বলেছেন—

[জনতার মধ্যে স্বর। বলেছেন, বলেছেন —বলা হয়েছে—]

অপরিচিত। কিছু শুনতে পাচ্ছি না ··

[বৃদ্ধ উঠিল এবং না ফিরিয়া তাহার পশ্চাৎদিকের দরজার দিকে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সঙ্কেত করিল--পিতা-মাতা এবং বালিকা দুইটি সকলে বেগে দরজার দিকে অগ্রসর হইল—পিতা অতি কষ্টে দরজা খুলিলেন—মাতা যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারেন, তাহার জন্য বৃদ্ধ চেষ্টা করিতে লাগিল]

[জনতার মধ্যে স্বর। বাইরে আসছে, ঐ সব বাইরে আসছে—]

[বাগানের মধ্যে নানারূপ গোলমাল উঠিল—সকলেই বাড়ীর অন্যদিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; কেবল সেই অপরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহাকেও দেখা গেল না—তিনি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—পাট-করা দরজা খুলিয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিল—দূরে চাঁদের আলোয় কেবল ফোয়ারা, মাঠ এবং নক্ষত্র-খচিত আকাশ দৃষ্ট হইল। ঘরের মধ্যে শিশুটি একলা বেশ শান্তিতে সেই চেয়ারে নিদ্রা যাইতেছে--আর সব নিস্তব্ধ]

অপরিচিত। ছেলেটি এখনো জাগে নি!

[তিনিও বাহিরে চলিয়া আসিলেন]

সমাপ্ত

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গলাদেশে শিশুমৃত্যু

শিশুমৃত্যু ও জাতীয় জীবন

অত্যধিক শিশুমৃত্যু জাতীয় জীবনের পক্ষে ঘোরতর আশঙ্কার কারণ। যখন দেখা যায়, কোন জাতির মধ্যে বহুদিন ধরিয়া শিশুমৃত্যুর হার খুব প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তখনই জানিতে হইবে যে লক্ষণটা খুব ভাল নহে। আর যদি ঐ মৃত্যুর হার ক্রমাগতই বাড়িয়া চলে, তবে জাতির অস্তিত্বের পক্ষেই সন্দিহান হইয়া উঠিতে হয়। ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা যায়, ক্রমবিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার তাহার মধ্যে একটি। ট্যাসমানিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডের মেওয়ারী ও স্যাণ্ডউইচের প্রাচীন অধিবাসী প্রভৃতি ধ্বংসোন্মুখ জাতিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে একদিকে যেমন স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার অত্যধিক শিশুমৃত্যু ঘটিতে থাকে। এই দুইটি লক্ষণ একযোগে সকল ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে নাও দেখা দিতে পারে। কোন জাতির মধ্যে, কেবল শিশু-

মৃত্যুর হার যদি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে, তবে তাহা যথেষ্ট ভয়ের কারণ মনে করিতে হইবে।

বঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার

বাঙ্গলাদেশে বহুদিন হইতে শিশুমৃত্যুর হার খুব প্রবলভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বলিতে গেলে বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই এইরূপ হইতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমরা সুবিধার জন্য এখানে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পরের হিসাবই আলোচনা করিব। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার ছিল ২০.৯;—অর্থাৎ যত শিশু জন্মিয়াছিল, তাহাদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন করিয়া মরিয়াছিল। ঐ বৎসরেই পূর্ব্ববঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ১৮, উত্তরবঙ্গে ২১, ও পশ্চিমবঙ্গে ২২। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২১.২৩; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২০.৯৫ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২২.১৪ দেখা গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিশুমৃত্যুর হার না কমিয়া বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। যদিও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার কিঞ্চিৎ কম (২১.৮৯) দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ঐ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থলেই শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৫ এর উপর রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন পল্লীগ্রামে শতকরা ২৬ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

আবার বাঙ্গলার রাজধানী, ভারতের প্রধান সহর কলিকাতা নগরের শিশুমৃত্যুর হার আরও ভীতিজনক। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৩০ জন, অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পর প্রতি ৩ জন শিশুতে ১ জন করিয়া মরিয়াছিল। ১৯১১—১৫ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরের ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর হার এইরূপ দেখা যায়—

১৯১১	শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা	২৫১.৬
১৯১২	....	২৫৯.৬
১৯১৩	....	২৭৪.৮
১৯১৪	.. ..	২৮২.৭
১৯১৫	....	২৮৭.৬

সুতরাং এই কয় বৎসরে কলিকাতাতেও শিশুমৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর এই কয় বৎসরে (১৯১১—১৯১৫) কলিকাতার জন্মের হারও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জন্মের হার ছিল ২১.৭ (হাজারকরা), আর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮.৫ (হাজারকরা)। প্রধান সহর কলিকাতা ছাড়িয়া বাঙ্গলার অন্যান্য সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া হৃদয় বিষণ্ণ হইয়া উঠে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার কয়েকটি সহরের শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেখানো গেল।

বীরভূমি	শতকরা	৩০.৭৭
নদীয়া	" "	৩০.৩৬
পাবনা	" "	২৮.২৮
মুর্শিদাবাদ	" "	২৭.৮৫
দিনাজপুর	" "	২৫.০৭

জলপাইগুড়ি	শতকরা	২৪
যশোহর	,, ,,	১৯·৯৬

বাঙ্গলাদেশের ও তাহার সহরগুলির শিশুমৃত্যুর হার বাস্তবিকই কিরূপ অস্বাভাবিক ও আশঙ্কাজনক, তাহা বিদেশের কয়েকটি সহরের শিশুমৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

শিশুমৃত্যুর হার (১৯১০)

ভিয়েনা	শতকরা	১৭
বার্লিন	,, ,,	১৫·৫
গ্লাসগো	,, ,,	১৪
নিউইয়র্ক	,, ,,	১২·৫
পারিস	,, ,,	১২
লণ্ডন	,, ,,	১০·৩৩
ষ্টকহলম্	,, ,,	৮·৭৫

এই তুলনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রাণবন্ত সজীব জাতি সকলের তুলনায় আমাদের শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ ভয়ানক। এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার যে বাঙ্গলার সাধারণ মৃত্যুর হারও বাড়াইয়া তুলিতেছে, তাহা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে।

বাঙ্গলার সাধারণ মৃত্যুর হার

১৯১২	হাজারকরা	২৯·৭৭
১৯১৩	,, ,,	২৯·৯
১৯১৪	,, ,,	৩১·৫
১৯১৫	,, ,,	৩২·৮৩

দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলাদেশে বৎসরের পর বৎসর মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে একটা প্রবল দুর্লক্ষণ তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙ্গলার এই মৃত্যুর হার যার পর নাই বেশী। বাঙ্গলার সাধারণ জন্মহারের তুলনায় সাধারণ মৃত্যুহার কিরূপ তাহা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে—

বঙ্গে জন্মমৃত্যুর হার

(হাজারকরা)

	জন্ম	মৃত্যু
১৯১২	৩৫·৩০	২৯·৭৭
১৯১৩	৩৩·৭৮	২৯·৯
১৯১৪	৩৩·৮৬	৩১·৫
১৯১৫	৩১·৮০	৩২·৮৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একদিকে যেমন জন্মের হার ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে মোট জন্মসংখ্যা হইতে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৪৬,৯৩৯ বেশী! আমাদের জাতীয় জীবনের মূল কিরূপ দ্রুত ক্ষয় হইতেছে, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফলে বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কিরূপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি (১)। ১৯১৪ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার, বিদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনাতেও যার পর নাই কম। এইরূপ ভাবে চলিলে কিছুদিনের মধ্যেই যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ—"নারায়ণ" —মাঘ, ১৩২২।

শিশুমৃত্যুর গোড়ার কথা

অত্যধিক হারে ক্রমবিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর গোড়ার কথা জাতীয়জীবনে শক্তিহীনতা। প্রত্যেক জীবদেহের একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আছে, যাহার বলে সে প্রতিকূল বাহ্য অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জীবদেহের ক্ষয়কারী শক্তিকে নিবারণ করিয়া উন্নতির দিকে সে অগ্রসর হয়। এই আভ্যন্তরীণ শক্তিকেই জীবদেহের জীবনী-শক্তি বলা যায়। এই জীবনীশক্তির ক্ষয় হইলে জীবদেহের আত্মরক্ষার শক্তির হ্রাস হয়; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে তখন সে অকৃতকার্য্য হইতে থাকে; নানা রোগ ও প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করিবার শক্তি তাহার হ্রাস হইয়া যায় ও এই-রূপে ক্রমেই সে মৃত্যুর দিকে যাইতে থাকে। জীবদেহের ন্যায় জাতিরও জীবনী-শক্তি আছে বলা যায়। কোন জাতির এই জীবনীশক্তি যখন হ্রাস হইয়া যায়, তখন আর সে বাহ্যশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে পারে না; বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে তাহাকে পদে পদে হটিতে হয় ও দ্রুতগতিতে তাহার ধ্বংসের দিকে যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস হইলে নানাপ্রকারে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, জাতীয় আয়ু পরিমাণের হ্রাস, অত্যধিক সাধারণ মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হারই, সে সকলের মধ্যে প্রধান। জীবনীশক্তিহীন জাতির মধ্যে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অতি ক্ষীণপ্রাণ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। বাহ্যশক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা তাহাদের অতি অল্পই থাকে। কাজেই জন্মগ্রহণের পর বেশীদিন তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না; ধরাপৃষ্ঠ হইতে শীঘ্রই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ সকল সমাজেই ১-৫ এই বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার সাধারণ মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। কেননা, যাহারা অযোগ্য, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোর নিয়মে এই বয়সের মধ্যেই তাহারা শীঘ্র শীঘ্র অপসৃত হয়। কিন্তু জীবনীশক্তিহীন জাতির মধ্যে এই বয়সের শিশুমৃত্যুর হার আরও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কোন জাতির মধ্যে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখা গেলে, তাহার ভবিষ্যৎ বড় আশাজনক নহে বলিতে হইবে। এই হিসাবে বাঙ্গলাদেশের অত্যধিক শিশুমৃত্যু বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পক্ষে বড়ই আশঙ্কার কথা। ইহা কেবলমাত্র সাময়িক ব্যাপার নহে। একেবারে জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা।

বিশেষ কারণ

কিন্তু সাধারণভাবে শিশুমৃত্যুর এই গোড়ার কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকা যায় না। কি কি বিশেষকারণে বাঙ্গালীর এই জীবনীশক্তিহীনতা বর্দ্ধিত হইতেছে, কি কি কারণে এত অধিক ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে ও শীঘ্র শীঘ্র জীব-

লীলা শেষ করিতেছে, তাহা একটু বিশেষ-রূপে ভাবিয়া দেখা উচিত।

দেশব্যাপী দারিদ্র্য

সেই কথা বলিতে গেলে প্রথমেই আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। এই দারিদ্র্য যে কিরূপ ভীষণভাবে বাঙ্গালী জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিরূপে তাহার শিরায় উপশিরায় বিষাক্ত জীবাণুর ন্যায় বাসা বাঁধিয়াছে, তাহার অস্থিমজ্জা চুষিয়া খাইতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব। যেদিকেই চাই দারিদ্র্যের এই কঙ্কালসার চেহারা চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে; বাঙ্গলার জাতীয়জীবনের শ্মশানে অনাহারের প্রেতনৃত্য ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। যে দেশের অধিকাংশ লোক নিত্য একবেলাও খাইতে পায় কিনা সন্দেহ, যে দেশে দুর্ভিক্ষ বৎসরের পর বৎসর লাগিয়াই আছে, যে দেশের মর্ম্মস্থান হইতে 'ম্যয় ভুঁখা হুঁ' শব্দ চিরন্তন কাতরতার ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার দারিদ্র্যের কথা না বলাই ভাল। এই সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যই যে বংশের পর বংশ বাঙ্গলাদেশের পিতামাতার জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া দিতেছে ও দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ শিশুর জন্ম ঘটাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনাহারক্লিষ্ট পিতার বীজ স্বভাবতঃই শক্তিহীন। তারপর অনাহারক্লিষ্টা দুর্ব্বল মাতার জঠরে যে শিশু বর্দ্ধিত হয়, তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইবে ও জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরেই সে যে মরিয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? খাদ্যাভাবে জীবন্মৃতা এরূপ মাতার শিশু গর্ভ হইতেই নানা স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে; প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শক্তি তাহার সহজেই হ্রাস হইয়া পড়ে ও ভূলোকের আলোকদর্শন তাহার ভাগ্যে আর বেশীদিন ঘটে না।

ম্যালেরিয়া

বাঙ্গালীর জীবনীশক্তিহীনতার আর এক কারণ ম্যালেরিয়া। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই ম্যালেরিয়া অক্টোপাসের ন্যায় বাঙ্গলাদেশকে জুড়িয়া ফেলিয়াছে; এখন ইহা বাঙ্গালীর বুকের উপর বসিয়া তাহার কণ্ঠ-রোধ করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যায় যে গড়ে প্রতিবৎসরে এক ম্যালেরিয়াতেই বাঙ্গলাদেশে ১০ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ মরিয়া থাকে। যাহারা এই রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাদেরও জীবন্মৃত অবস্থা। এই ভীষণ রোগের ফলে তাহাদের সমস্ত দৈহিক যন্ত্রই বিকৃত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বংশের পর বংশ তাহাদের জীবনীশক্তি ইহাদ্বারা অত্যধিকরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানেরা আবার কিরূপ জীবনীশক্তিহীন হইয়া জন্মায়, তাহা অনুমানই করা যায়। কঠিন রোগগ্রস্ত পিতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বীজও দুষ্ট ও বিকৃত হইয়া উঠে; রুগ্না মাতার জঠরস্থ সন্তান অনেক স্থলে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আর বংশানুক্রমে এই রোগ-প্রবণতা ও জীবনীশক্তিহীনতা

দ্রুততর বেগে বাড়িয়াই চলে। এই পঞ্চাশ বৎসরের ম্যালেরিয়ার ফলে বাঙ্গালীর যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভাবিতেও ভয় হয় যে আর পঞ্চাশ বৎসরে ইহার ফল কিরূপ ভীষণ দাঁড়াইবে। এখনই আমরা জ্যামিতির সরলরেখায় দাঁড়াইয়াছি, বোধ হয় আর পঞ্চাশবৎসরে জ্যামিতির বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইব। ম্যালেরিয়ার ফলে জীবনী-শক্তিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয়জীবনে অবসাদ ও নৈতিক অধঃপতনও হইতেছে, ইহাও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাল্যবিবাহ

বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তিহীনতার আর একটা গুরুতর কারণ বাল্যবিবাহ। যতদূর জানা যায়, এখনকার আকারে প্রচলিত বাল্যবিবাহ বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বে ছিল না। ৪০০।৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান রাজার আমলে এইরূপ বাল্যবিবাহ-বিধি বিশেষ করিয়া প্রচলিত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কুপ্রথা বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে ও তাহার ফলে আমরা পঙ্গু, বামন, ক্ষীণকায়, উদ্ভিদের জাতিতে দাঁড়াইয়াছি। দুই এক দিনে একটি কুপ্রথা জাতীয়জীবনে তাহার অনিষ্টকর শক্তির পরিচয় না দিতে পারে; কিন্তু ক্রমাগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া থাকিলে, শেষে সে আত্মপ্রকাশ করিবেই।

অপুষ্টদেহ বালক-পিতার বীর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে তেজবিশিষ্ট হয় না, তাহার রস, রক্ত, মজ্জা কিছুই পরিপুষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহার পক্ষে ক্ষীণপ্রাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বাল্যপিতৃত্ব অপেক্ষা বাল্য-মাতৃত্বই আরও বেশী অনিষ্টের কারণ। কারণ, মাতার সঙ্গেই সন্তানের জীবনের বেশী সম্বন্ধ। প্রাণসূচনা হইতে মাতারই দেহের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হয়, তাঁহারই রসরক্তের দ্বারা উহার দেহের পুষ্টি হয়। এই মাতা যদি অপরিণতবয়স্কা ও অপুষ্টদেহা হয়, তবে কুক্ষিস্থ সন্তান যে যথেষ্ট জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদগণ একমত। পাশ্চাত্য মতাবলম্বী সকল শারীরতত্ত্ববিদ এক-বাক্যে বলিয়াছেন, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে মাতার শরীর পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তৎপূর্ব্বে তাহাদের সন্তান হইলে জীবনীশক্তিহীন হইবারই কথা। প্রাচ্য শারীরতত্ত্ববিদগণেরও এই মত। সুশ্রুত স্পষ্ট বলিতেছেন—

উন ষোড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ।
যথাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥

(সুশ্রুত সংহিতা—শারীর-স্থানম্)

ষোড়শ বর্ষের কম বয়সের পত্নীতে পঁচিশ বৎসরের কম বয়সের পিতা যদি গর্ভ উৎপাদন করে, তবে সেই শিশু গর্ভেই বিপদাপন্ন হয়। এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু তবুও আমাদের দেশে কোন কোন গতানুগতিক ব্যক্তি বলেন যে ঋতুকালই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক যৌবনসূচনা করে। আর যখন যৌবন সূচনা হয় তখনই রমণীর গর্ভধারণের

স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সময়। এ দেশের স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ঋতুকাল গড়ে ১৩ বৎসর বয়স। অতএব ঐ সময়েই তাহাদের পক্ষে গর্ভধারণের স্বাভাবিক কাল। ইঁহারা যে এই অদ্ভুত মত কোথায় পাইলেন, জানি না। বোধ হয় শারীর-বিদ্যার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না রাখিয়াই ইঁহারা এ বিষয়ে রক্ষণশীলতার রিহার্সাল দিতে লাগিয়া যান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী য়িহুদী নারীদের ঋতুকালের বয়স গড়ে ৯-১১ বৎসর। জিজ্ঞাসা করি ঐ বয়স কি তাহাদের সন্তান প্রসবেরও উপযুক্ত সময়? অধিক তর্কের প্রয়োজন নাই। অপুষ্টদেহা অপরিণত-বয়স্কা মাতার গর্ভের সন্তান যে জীবনীশক্তিহীন হইবে, তাহা এত বেশী সোজা কথা যে কাহারও বুঝিতে গোলমাল হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাঙ্গলা দেশে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই ইহার প্রচলন বেশী। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে কিরূপ হারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তাহা নিম্নের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে।

(১৯১১)

বাল্যবিবাহ

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
৫—১০	শতকরা—১২·৫	৯
১০—১৫	,, ৬৭	৫৬

সুতরাং বাঙ্গলা দেশের এই শিশুমাতাদের শিশুরা যে জন্মিয়াই ইহলীলা সংবরণ করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

এই বাল্যমাতৃত্বের দোষে যে শিশু-মৃত্যুরই আধিক্য হয়, তাহা নহে, প্রসূতিদেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদের শরীর ভগ্ন ও চির-রুগ্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গলাদেশের অন্তঃপুর খুঁজিলেই ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। প্রধানতঃ এই বাল্যমাতৃত্বের ফলেই কিছুদিন হইল কলিকাতাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর মৃত্যুর হার প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পুরুষের মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৩·৫, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর হার হাজারকরা ৩৮·৫। আর এই সকল স্ত্রীলোকদের মধ্যে ক্ষয়রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধারণতঃ সকল স্থানেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের মৃত্যুর হারই বেশী হয়। কিন্তু কলিকাতাতে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া ও বাল্যবিবাহ এই তিন রাক্ষস একযোগে বাঙ্গালীর রক্ত শোষণ করিতেছে; সুতরাং বাঙ্গালী যে ক্রমেই জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িবে ও তাহার শিশুরা যে অত্যধিক পরিমাণে মরিতে থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

আনুষঙ্গিক কারণ

আবার এই বিশেষ কারণগুলির সঙ্গে কতকগুলি আনুষঙ্গিক কারণ জুটিয়া শিশু-মৃত্যুর হার বেশী করিয়া তুলিয়াছে। এই আনুষঙ্গিক কারণগুলি প্রধানতঃ শিশুর জন্মগ্রহণের পর কার্য্য করিয়া থাকে। একে ত বাঙ্গলার শিশুরা ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া জন্মায়। তার উপরে জন্মগ্রহণের পরেও

যদি তাহারা অনুকূল অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত না হয় তবে ত তাঁহাদের স্তিমিতজ্যোতি জীবনদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবার কথা। জন্মগ্রহণের পর যে সকল প্রতিকূল অবস্থা বাঙ্গালী শিশুর জীবনের বিরুদ্ধে কার্য্য করে তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আমরা তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির কথা এখানে বলিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গলার সূতিকাগৃহ

শিশু যেরূপ গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ও ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুকাল ধরিয়া বর্দ্ধিত হয় তাহা তাহার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এককথায় সূতিকা-গৃহের অবস্থার সঙ্গে শিশুর জীবন-মরণ অনেক পরিমাণে জড়িত। আবার প্রসূতির স্বাস্থ্যও সূতিকা-গৃহের অবস্থার উপর নির্ভর করে। অস্বাস্থ্যকর সূতিকা-গৃহে থাকিয়া যদি প্রসূতির স্বাস্থ্যভগ্ন হয়, তবে তাহার স্তনে পুষ্ট শিশুর অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠে। অনেক বাতাস-হীন, সঙ্কীর্ণ, স্যাঁৎসেঁতে, দুর্গন্ধময়, নিরানন্দ সূতিকাগৃহ শিশুর ও প্রসূতির জীবনের পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। আর বলিতে কষ্ট হয় যে, বাঙ্গলার সূতিকা-গৃহের অবস্থা অবিকল ঐরূপ। শুনিতে পাই হিন্দুর কাছে সদ্যোজাত শিশু দেবতা ও প্রসূতি গণেশ-জননীরূপে কল্পিত হন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি যে আমাদের জন্মাশৌচের শুদ্ধযুক্তির প্রভাবে সূতিকাগৃহ দেবমন্দির না হইয়া মলাগারের চেয়েও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা পল্লীজীবনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। আর পল্লীগ্রামের যেখানেই গিয়াছি, সূতিকাগৃহের অবস্থা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বাড়ীর প্রাঙ্গণের এক কোণে (যেখানে 'ছুঁৎমার্গ' ধর্ম্মনষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই) তালপাতা বা চাটাই দিয়া ঘেরা যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ে প্রসবের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় তাহাই আমাদের সূতিকাগৃহ। ইহার 'মেজ' অবশ্য মাটীর সঙ্গে-সমান। রৌদ্র হোক, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তাহার মধ্যে হাঁটু-সমান জল উঠুক বা বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হোক, সেই অপূর্ব্ব সূতিকা-গৃহেই বঙ্গের প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুকে বাস করিতে হয়। সাধারণতঃ নীচজাতীয় রমণীরাই সেখানে তাহাদের একমাত্র সঙ্গিনী। বাড়ীর পুণ্যবতী গৃহিনীরা পুণ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় পারত পক্ষে সেদিক মাড়ান না। আমি জানি যে কোন এক শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবা, শ্রাবণের জলধারার মধ্যে, এইরূপ সূতিকা-গৃহে তাঁহার বালিকা কন্যা একাকিনী কষ্ট পাইলেও, তিনি 'সুকৃতি' নাশের আশঙ্কায়, কিছুতেই সে দিক দিয়া যান নাই। তাঁহারই বা অপরাধ কি? হয়ত কন্যা-স্নেহের স্বাভাবিক আকর্ষণে সেখানে গেলে আমাদের সমাজের 'ট্রষ্টিগণ' তখনই তাঁহার পরকালের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেন ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন।

পল্লীর কথা যেরূপ বলিলাম, সহরের অবস্থাও তার চেয়ে কোন অংশে ভাল নহে। সেই আলোক-বাতাসহীন, অস্বাস্থ্যকর,

বিষময় পর্ব্বতগুহা এখানেও সূতিকাগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর, সাক্ষাৎ রোগের ক্ষেত্রস্বরূপ জঘন্যগৃহে বাস করিয়া প্রসূতিরা যে নানারূপ কঠোর রোগে আক্রান্ত হইবে ও শিশুরাও শীঘ্র শীঘ্র ভবলীলা সংবরণ করিবে তাহা বোধ হয় আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। প্রসবের পর প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশু উভয়েরই দেহ অতি দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত থাকে। তাহার উপর যদি এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে পড়িতে হয়, তবে তাহাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? বরং ইহা সত্ত্বেও যে বৎসর বৎসর কতকগুলি শিশু বাঙ্গলাদেশে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

খাদ্যের অভাব

যেমন সূতিকাগৃহের কুব্যবস্থা, তেমনই প্রসূতি ও শিশুর উপযুক্ত খাদ্যাভাবও—শিশুমৃত্যুর আর-একটা আনুষঙ্গিক কারণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সদ্যপ্রসবের পর প্রসূতির দেহ দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত থাকে। এই সময়ে তাহার শরীরের যাহাতে পুষ্টি হয়, এমন খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে প্রসূতির শরীর পূর্ব্বের বল ফিরিয়া পায় না। আবার সন্তানও এরূপ অপুষ্টদেহা, দুর্ব্বল মাতার স্তন্যে পালিত হইয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য দেশব্যাপী দারিদ্র্যের সঙ্গে খাদ্যাভাবের কারণ অনেক পরিমাণে জড়িত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকেরই দুবেলা অন্ন জুটে না, সে অবস্থায় প্রসূতির যে উপযুক্ত খাদ্য মিলিবে, সে সম্ভাবনা কোথায়? তবে স্বাস্থ্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাও এর জন্য কিয়ৎ-পরিমাণে দায়ী। যেখানে তেমন খাদ্যাভাবের কারণ নাই, সেখানে অজ্ঞতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার দরুনও প্রসূতির ভালরূপ পুষ্টির ব্যবস্থা হয় না। আবার বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবেও শিশুর পুষ্টির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। আজকাল নানাকারণে একদিকে যেমন গবাদি পশুর হ্রাস হইতেছে, অন্য দিকে তেমনই বিশুদ্ধ দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ মিলে না বলিলেই হয়। যদিও মিলে তবে তাহা এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্লভ। পল্লীগ্রামের অবস্থাও আজকাল প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। মাতৃদুগ্ধের পরে গোদুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাবে বাঙ্গালী শিশুর পুষ্টির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়, সন্দেহ নাই। কতকটা-বা বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে, কতকটা-বা 'ফ্যাসানের' বশবর্ত্তী হইয়া, আজকাল অনেকে শিশুদিগকে বিদেশে প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম 'ফুড' খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেগুলি শিশুর পক্ষে সুপথ্য কিনা, সন্দেহ আছে। বরং অনেক সুচিকিৎসক বলেন, যে ঐ সকল কৃত্রিম খাদ্য শিশুদের পক্ষে অনেক সময় অনিষ্টকরই হয়।

পরিচর্য্যার অভাব

প্রসূতি ও শিশুর উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবও শিশুমৃত্যুর পক্ষে অনেক সহায়তা করে। আজকাল সভ্যদেশসমূহে ধাত্রী-

বিস্তার কত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা সেই 'সেকেলে দাই'দের উপরই নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। সভ্যতার সংঘর্ষ, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাকারণে মানবজাতির মধ্যে অনেক নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে। প্রসূতি ও শিশুদের সম্বন্ধেও অনেক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ধাত্রীবিদ্যার ফলে সভ্যদেশসমূহে ঐ সকল রোগ নিরাকরণের উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু আমরা সেই অনাদিকালের 'সনাতন' প্রথা আঁকড়াইয়া বসিয়া আছি এবং পরম-নিশ্চিন্তভাবে প্রসূতি ও শিশুদিগকে মরিতে দিতেছি। প্রসবের পর প্রসূতির রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নানা রোগের সম্ভাবনা হয়। অজ্ঞতার ফলে আমাদের দেশে অনেক সময় প্রসূতিদিগকে ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায় না। ব্যাধি-পীড়িতা মাতার শিশুও নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে অবশ্য সুশিক্ষিতা ধাত্রী আছে। কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম; তাহাদিগকে অর্থ দিয়া ডাকিতে পারে এরূপ সামর্থ্যও অতি অল্প লোকেরই আছে। শিশুপালনে অনভিজ্ঞতাও শিশুর জীবনীশক্তি হ্রাসের আর একটা কারণ। বাঙ্গলাদেশের বালিকা মাতারা শিশুপালনে স্বভাবতঃই অনভিজ্ঞ ও অক্ষম। আবার আধুনিক কালের প্রবীণারাও নানা-কারণে সে বিদ্যাটা ভুলিয়া যাইতেছেন।

প্রতিকারের উপায়

কি কি কারণে বাঙ্গলাদেশে এইরূপ অত্যধিক শিশুমৃত্যু হইতেছে, তাহা আমরা একপ্রকার বুঝিলাম। কিন্তু কেবল বুঝিয়া কি হইবে? যদি তাহার কোন প্রতিকারের উপায় না করা যায়, তবে সকলই বৃথা। দেশব্যাপী দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বৃহত্তর সমস্যা। ও-গুলি জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা; জাতীয় জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু ঐগুলি ছাড়িয়া দিলেও শিশুমৃত্যুর অন্য কারণগুলির নিরাকরণের চেষ্টা আমরা করিতে পারি এবং তাহার ফলেও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমানো যাইতে পারে।

বাল্যমাতৃত্ব নিবারণ

বাল্যবিবাহ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঘোরতর শত্রু তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বাল্যবিবাহের কুপ্রথা যাহাতে আমাদের সমাজ হইতে লুপ্ত হয়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু উহা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা নির্ম্মূল করা তেমন সহজ নহে। সেজন্য বহুদিনের সাধনার ও বহুকর্ম্মীর চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু আপাততঃ আমরা বাল্যবিবাহের যে প্রধান কুফল—বাল্যমাতৃত্ব, তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে পারি। বর্ত্তমান যুগের বালক-বালিকাদের জন্য আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, যাহাতে তাহাদের মনে ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের ভাব মুদ্রিত হইয়া যায়, জীবনের দায়িত্ববোধ জন্মে;—যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন

ও প্রসব করাই মানবজীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া ভ্রম না হয়। আর বাল্য-বিবাহ হইলেই যে বাল্যমাতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী, এমন কথাও নয়। বিহার, উড়িষ্যা, ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অনেক স্থলেও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু সেখানে বিবাহের পরই মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠানো হয় না। মেয়ের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়ে পিতৃগৃহেই থাকে, পরে 'যোগ্যা' হইলেই 'দ্বিরাগমন' হয়। আমরা একটু চেষ্টা করিয়া এ প্রথাও আমাদের মধ্যে চালাইতে পারি। বাঙ্গলার পিতামাতারাও চেষ্টা করিলে বাল্যবিবাহের অনেক কুফল নিবারণ করিতে পারেন। বালকপুত্র ও বালিকা পুত্রবধূ যাহাতে অতি তরুণ বয়সেই দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইতে পারে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে সে সম্বন্ধে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। আত্মসুখ ও বিলাসই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকেরই জাতি ও সমাজের প্রতি মহত্তর কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের জন্য আত্মসুখ ও ব্যক্তিগত বাসনা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দেওয়াতেই উন্নততর মনুষ্যত্ব।

সূতিকাগৃহের সংস্কার

আমাদের সূতিকাগৃহের যাহাতে সংস্কার হয়, তাহা আমরা অনায়াসেই করিতে পারি। বাড়ীর যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দরগৃহ, তাহা সূতিকাগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষয়ে 'ছুঁৎমার্গ' অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলে, প্রসূতির জন্য পূর্ব্ব হইতে উত্তমগৃহ প্রস্তুত করা উচিত। সেই গৃহে যাহাতে আলো ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার মেজ যাহাতে উচ্চ ও শুষ্ক হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে শিশু, দেবতা। দেবতার মন্দির কি লোকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে তৈরী করে? আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও ত এ বিষয়ে বেশ সুব্যবস্থা আছে। চরক বলিতেছেন—

"সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থি শর্করা কপালে দেশে প্রশস্ত রূপরসগন্ধায়াং প্রাগ্-দ্বারমুদগদ্বারং বা। তদ্বসনা লেপনাচ্ছাদনা পিধান সম্পদুপেতং বাস্তুবিদ্যাৎ।......হৃদয় যোগাগ্নি সলিলোদূখল বর্চ্চঃ স্থান স্নানভূমি—মহানস মৃতুসুখঞ্চ। (চরকসংহিতা শারীরস্থানম্)

অর্থাৎ অস্থি, শর্করা ও কপালশূন্য স্থানে, প্রশস্ত রূপ, রস ও গন্ধ বিশিষ্ট ভূমিতে পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। * * * বস্ত্র, আলেপন, আচ্ছাদন ও আবরণ পদার্থ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। অগ্নি, জল ও উদূখল সেই গৃহে রাখিতে হইবে। সেখানে ঋতুসুখকর ভাবে মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান ও উনুন বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিবে।

নিরানন্দ গৃহও প্রসূতির পক্ষে অনিষ্ট-কর। কি প্রকারে প্রসূতির রক্ষা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে হইবে, তাহাও চরক বলিতেছেন।—

"স্ত্রিয়শ্চৈনাং যথোক্তগুণাঃ সুহৃদশ্চানুবাদ্যুর্দশাহং দ্বাদশাহং বা সু পরত-প্রদান মঙ্গলাশীঃ স্তুতিগীতবাদিন অন্নপান বিশদমনুরক্ত প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং চ তদ্বেশ্ম কার্য্যং। (চরকসংহিতা...শারীরস্থানম্)

অর্থাৎ দশ বা বারদিন পর্য্যন্ত যথোক্ত গুণ-সম্পন্ন স্ত্রীগণ এবং সুহৃদগণ তাহাদের রক্ষার্থ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন। অবিরত দান, মঙ্গলাচরণ, আশীর্ব্বাদ, স্তুতি, গীত ও বাদ্য করিবেন। সূতিকা-গৃহে নির্দ্দোষ অন্নপান এবং হৃষ্ট ও অনুরক্ত জনের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা বৃদ্ধ চরকের এই সকল ব্যবস্থা অনুসরণ করিলেও ত অনেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যবস্থা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব হইয়া পড়িতেছে। সহরের ত কথাই নাই, পল্লীতেও সেই অভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় দেশের শিক্ষিত লোকদের হাতে। তাঁহারা যদি শুধু গোয়ালাদের উপর ভার না দিয়া নিজেরা গোপালন ব্যবসা আরম্ভ করেন ও দেশের নানা স্থানে দুগ্ধশালা খুলিতে থাকেন তবেই ইহার প্রতিকার হয়। দেশের এই অর্থসমস্যার দিনে, শিক্ষিত লোকদের এই এক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। বৃথা গর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি এই পথ অবলম্বন করেন, তবে নিজেদেরও অর্থাগম হয়, দেশেরও উপকার হয়। আমেরিকা দেশের মিউনিসিপালিটীর লোকেরা নানা স্থানে বিশুদ্ধ দুগ্ধের দোকান খুলিয়া স্বল্পমূল্যে দরিদ্রদের জন্য বিক্রয় করে। আমাদের মিউনিসিপালিটী, বিশেষতঃ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বিশেষ করিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে পারে। 'জলো দুধে পুষ্ট দেহ' কলিকাতার শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটীর ইহা করা উচিত; কেন না স্বাস্থ্যরক্ষার নানা ব্যবস্থা সত্বেও কলিকাতাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শিশু-মৃত্যুর হার দেখা যাইতেছে।

ধাত্রীর ব্যবস্থা

দেশে যাহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের যেরূপ লোকসংখ্যা, সেই তুলনায় সুশিক্ষিতা ধাত্রী নাই বলিলেই হয়। এমন কি কলিকাতা সহরেও লোকসংখ্যার অনুপাতে ধাত্রী-সংখ্যা অতি কম। আবার আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যেরূপ গরীব, তাহাতে এই ধাত্রীদের ডাকিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। ইহার একমাত্র উপায় অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী দ্বারা ধাত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করা। গরীব লোকে যাহাতে বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে এই সকল ধাত্রীর সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বসন্তের টীকা যেমন নানাস্থানে লোকে বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে পাইতেছে, ধাত্রীর সাহায্যও সেইরূপভাবে লোকের পাওয়া উচিত। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। দেশে আজ-কাল শিক্ষিতা নারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া নানা স্থানে শিশু ও প্রসূতি-সেবা-সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন। দরিদ্র, অশিক্ষিতা

ভগিনীদের যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় ও শিশুদের জীবনরক্ষা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া শিক্ষিতা নারীদেরই করা উচিত। গত দামোদরের বন্যার সময় দেশের ছেলেরা প্রাণ দিয়া দেশের সেবা করিয়াছিল। সভা করিয়া তাহার জন্য বাহবা দিলেই, দেশের ও সমাজের শিক্ষিত রমণীদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। তাঁহারাও নিজেদের চেষ্টায় দেশের ও সমাজের জন্য কিছু করুন। আধুনিক শিক্ষিত রমণীদের সম্বন্ধে রক্ষণশীলদলের এই এক প্রধান অনুযোগ, যে তাঁহারা না পারেন এ দেশের রমণীদের মত 'গৃহধর্ম্ম' করিতে, না পারেন পাশ্চাত্য রমণীদের মত দেশের ও সমাজের সেবা করিতে। এই ত এতবড় একটা সেবার ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত রমণীরা দেশের শিশু ও প্রসূতিদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের কলঙ্কমোচন করুন। তাহা হইলেই তাঁহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে।

শিশু-পালন বিষয়ে শিক্ষাপ্রচার

আর একটি কার্য্য মিউনিসিপালিটী, গবর্ণমেণ্ট, এবং শিক্ষিত নারীরা, সকলেই করিতে পারেন। সেটী হইতেছে আধুনিক উন্নততর প্রণালীতে শিশু-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রচার। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটী পুস্তক লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারেন। যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য মৌখিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। শিক্ষিত মহিলারাও এ বিষয়ে পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বা বাড়ী বাড়ী গিয়া উপদেশ দিয়া অনেক কাজ করিতে পারেন। ভারত-স্ত্রী-মণ্ডল, অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন— এ বিষয়েও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মহিলা-শিল্প-বিদ্যালয়ের ন্যায়—শিশু-পালন-বিদ্যালয় খুলিয়াও তাঁহারা এ বিষয়ে কুমারী ও বধূদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অন্যান্য সভ্যদেশের মেয়েরা এই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

মানব-জীবনের মূল্য-বোধ

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরকার দেশের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের মূল্যবোধ। মানুষই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে জাতির লোক-সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহার জগতে দাঁড়ানো কঠিন হইয়া উঠে। শিশুরাই ভবিষ্যতের আশা। তাহাদের মৃত্যু যে জাতীয় জীবনের পক্ষে মহাঅমঙ্গলকর, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। সভ্যদেশসমূহে এইরূপই হয়। পাশ্চাত্য দেশে শিশুমৃত্যুর আধিক্য দেখা দিলেই লোকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠে তাহার কারণ অনুসন্ধান করে ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। সুফলও হাতে হাতে দেখা যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশসমূহে শিশু-মৃত্যু হ্রাস করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ—লোকসংখ্যার অধিকাংশই আদিম অসভ্য জাতিতে পূর্ণ। কিন্তু সেখানেও শিশুমৃত্যু কমাইবার জন্য নানা উদ্যোগ-আয়োজন হইয়া থাকে এবং ইহাতে আশ্চর্য্য সুফলও

পাওয়া গিয়াছে। ১৯০২-১৯১২ এই দশবৎসরে সেখানকার শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৮·৩ হইতে শতকরা ৫·১তে দাঁড়াইয়াছে। ঐ সকল দেশে গবর্ণমেণ্টই যে কেবল চেষ্টা করেন তাহা নহে। সাধারণেরও এ-বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্যবোধ আছে। মিউনিসিপালিটী, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি সর্ব্বদাই এ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নানা সমিতি ও সঙ্ঘও আছে। দেশের শিক্ষিত মহিলারাও নিঃস্বার্থভাবে এ সম্বন্ধে অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। শুধু তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত অনেক সমিতি ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের Women's League Service, Imperial Health Association এবং নিউজিল্যাণ্ডের New Zealand Society for the Health of Woman & Children প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল দেশের দৃষ্টান্তে আমরাও দেশের ভয়াবহ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে পারি। কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর ভার দিলেই চলিবে না। আমাদের নিজেদেরই এ বিষয়ে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, ও লোক্যাল বোর্ড সমূহেরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে খুব সতর্কভাবে শিশুমৃত্যুর হিসাব রাখিতে হইবে ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বায়ত্বশাসনের জন্য শুধু বক্তৃতা করিলে চলিবে না। কার্য্যতঃ স্বায়ত্বশাসনের উপায় করিতে হইবে। নিজেদের জীবনমৃত্যু-সমস্যার সমাধানের উপায়ই যদি না করিতে পারি, তবে বড় বড় ব্যাপারে বাগাড়ম্বর করিয়া কি হইবে! দেশের শিক্ষিত নরনারীরা নানারূপ বাজে সভাসমিতি করিয়া শক্তিক্ষয় না করিয়া এই আত্মরক্ষার কার্য্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করুন। এ বিষয়ে সভাসমিতি করুন—শিক্ষাপ্রচার করুন। সহর ও গ্রামের মধ্যে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্র গড়িয়া তুলুন। আপনাকে আপনিই বাঁচাইতে হইবে। যে শক্তি দেশের মধ্যে গুপ্ত আছে তাহা জাগ্রৎ করিয়া তুলিতে হইবে। শক্তিমানেরাই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকে; আর অলস, পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বলেরা শীঘ্রই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা

নব্য-হিন্দু

আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে এক-দলের একটা যে প্রবণতা ছিল সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে নব্য-হিন্দু মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া একটু ধীরভাবে সমাজের উন্নতিসাধনে অভিলাষী হইলেন।

তাঁহাদের মনস্তত্ত্বটা অনুশীলন করিলে সমস্ত বিষয়টার আলোচনার পক্ষে সুবিধা

হইবে। য়ুরোপে ধর্ম্মসংক্রান্ত সংশয়ই তীব্রতর নৈতিক বিভ্রাট উদ্দীপিত করে; ধর্ম্মে অবিশ্বাসই লামনে, জুফ্রোয়া ও রেনার গ্রন্থ-পৃষ্ঠাকে অনুপ্রাণিত করে। অপর কোন রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা এতাদৃশ বিভ্রাট উৎপাদন করে নাই। চিরপ্রথা অনুসরণ করা যে-দেশের মূলভাব, যেখানে ধর্ম্মের বাঁধাবাঁধি মতগুলা অবাধে চলিয়া আসিতেছে সেই ভারতবর্ষে এইরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মের মত বিশ্বাসকেও সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিয়া গুরুতর বিভ্রাট আনয়ন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি।

বোম্বাই-হাইকোর্টের জজ তেলং-এর মৃত্যুতে, তাঁহার স্বনামধন্য রাণাডে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

"আপনাদের মধ্যে অনেকেই একটি সমগ্র ও পূর্ণাবয়ব সভ্যতা-সম্পদের অধিকারী —আপনাদের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন হইবে যে আপনারা পরস্পর-বিরোধী যুগল-জীবন যাপন করিতেছেন,—আপনারা দুই সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া, দুই প্রকার বিশ্বাস, জীবন ও আচরণের দুই প্রকার আদর্শ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা ভাবেন এরূপ বিভক্ত জীবন যাপন করিবার কোন উপলক্ষ্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন অতীতকাল, যাহাকে পুনরানয়ন করা যায় না—সেই অতীতকাল এখনো জীবন্ত বর্ত্তমানরূপেই রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, কালের প্রবাহ কোন পরিবর্ত্তনই আনয়ন করে নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ সমস্ত জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-যাপন ও জীবনের কাজ করিয়াছিলেন তাঁহারা এখনও সেইরূপভাবে জীবন-যাপন ও জীবনের কাজ করিতে পারিবেন। আবার এমন লোকও আমাদের মধ্যে আছেন যাহারা ভাবেন যে, অতীত মৃত ও ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; অতীতের সহিত আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতেরই আমরা অনুগত ভক্ত। এই দুই চরম সীমার মাঝামাঝি আমরা যে কয়েকটি লোক আছি—আমরা অতীতকে ভক্তি করি, কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্য বিধাতা আমাদিগকে যে নূতন অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন, আমরা ক্রমশঃ অতীতকে সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে চাহি। আমরা অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিব, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ত্তমানকেও হাতছাড়া করিব না। এইজন্য শত্রু মিত্র উভয়ই অনেক সময় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমাদের পরলোকগত বন্ধু একজন। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি যদি অকপটভাবে বর্ত্তমানকে একেবারে অস্বীকার করিয়া অতীতের মধ্যেই থাকিতে পারিতেন; যদি বিভক্ত জীবনের কষ্টভোগ তাঁহাকে না করিতে হইত, অথবা অকপটভাবে ও সরল বিশ্বাসে অতীতকে অস্বীকার করিয়া বর্ত্তমানকে লইয়াই থাকিতেন তাহা হইলে তিনি আরো কিছু দিন বাঁচিতে পারিতেন; তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত না, তিনি নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেন।

তিলং ও তাঁহার বন্ধুগণের কি প্রকার বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, আমাদের য়ুরোপীয় বন্ধুগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন না।”

নিজের সংশয়-সঙ্কোচকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত, নব্য-হিন্দুরা হিন্দুসভ্যতার মূল-প্রকৃতি বজায় রাখিয়া সেই সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রেরণা অনুসারে সমাজ সংস্কার করিতে সচেষ্ট হইলেন।

রাণাডের লেখা হইতে এইখানে আর একটা স্থান উদ্ধৃত করিব।

“নিশ্চিতরূপে উন্নতিসাধন করিতে হইলে ধীরে ধীরে উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। দুঃসাহসিকেরা শত বৎসরের কাজ দশ বৎসরে সম্পন্ন করিতে চাহে। এই প্রলোভনকে দমন করা উচিত। এই সম্বন্ধে উদ্‌বর্ত্তনবাদ হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা আর কিছুই নাই।

উদ্‌বর্ত্তনবাদ (Evolution) কি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় না যে, অভিবৃদ্ধি গঠনগত ও জৈবিক, এবং সমগ্র দেহযন্ত্রের সমস্ত অংশের উপরেই উহার ক্রিয়া প্রকটিত হয়? এবং কতকগুলি অংশের ক্ষতি করিয়া অপর কতকগুলি অংশের বৃদ্ধি করা তাহার কাজ নহে? অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিতে আমরা পারি না—ছিন্ন করা উচিতও নহে। কেননা, অতীতের সহিত অতীত গৌরবের আমরা উত্তরাধিকারী; উহার জন্য আমরা গর্ব্ব করিতে পারি, উহা হইতে আমাদের লজ্জা পাইবার কিছুই নাই।” (১)

*

* *

নব্য হিন্দুরা সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি রক্ষণশীল যথা “ধর্ম্মমণ্ডল”; আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর যথা;—“Poona Reform

(১) মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে ২০ জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (Fellow ১৮৬৫) Elphinstone College এর অধ্যাপক। ১৮৬৬, মেজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হন। জানুয়ারী ১৯০১ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যা বুদ্ধি ও জনহিতকর কার্য্যে একজন সর্ব্বপ্রধান প্রভাবান্বিত হিন্দু।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের প্রাদেশিক পরামর্শ-সভা চাহিতেছে, হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সমুদ্রযাত্রায় জাতের লোকেরা যেন বাধা না দেয়। অন্যান্য পরামর্শ-সভাও এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে।

মিষ্টার বোস্ কতকগুলি কৌতুকাবহ হিসাবের অঙ্ক দিয়াছেন:—দার্জিলিঙ্গের স্বাস্থ্যনিবাসে ১৮৮৮-৮৯ অব্দে ১১৪ জন হিন্দু হিন্দুরীতি অনুসারে এবং ১৮১ জন য়ুরোপীয়রীতি অনুসারে আহার করিয়াছে; ১৮৮৯-৯০ অব্দে অঙ্কের সংখ্যা ১৬৩ ও ২২০ হইয়াছিল। ১৮৯০-৯১তে ১৩৫ ও ১৮৬ হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে দার্জিলিংএর স্বাস্থ্যনিবাসে গোঁড়া হিন্দু খুব কমই যায়।

সভাসমিতির মধ্যে “কায়স্থ পরামর্শ সভা” ও “ওয়ালটরকৃৎ রাজপুত্র হিতকরী সভা” উল্লেখযোগ্য। তাহারা বিবাহের ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছে। এবং ৬ মাসের আয়ের অধিক পুত্রের বিবাহে এবং একবৎসরের আয়ের অধিক কন্যার বিবাহে খরচ করিবে না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে। বরেলীর কংগ্রেস ১৮৯১ (Bose 1-68)

Association"। "National Social Conference" ভারতের কোন-না কোন নগরে সভা আহ্বান করিয়া থাকে। এই সভাসমিতির কার্য্যপন্থা বিভিন্ন; সভার সাময়িক অধিবেশন, পুস্তক, সংবাদপত্র, পুস্তিকাদির প্রচার, বাড়ী-বাড়ী গিয়া লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ; উহারা সভ্যদিগকে প্রতিজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই সকল বিষয়ে তাহাদের প্রধান চেষ্টা যথাঃ—বিধবা-বিবাহে সম্মতিদান; বাল্য-বিবাহ না দেওয়া; বিবাহ ও শ্রদ্ধাদি উপলক্ষে অতিব্যয়সাপেক্ষ অনুষ্ঠান না করা; পারিবারিক উৎসবাদিতে বাই-নাচ না দেওয়া।

যে সকল বিষয় খুব গুরুতর তৎসম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকেরা বড় একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অনুবর্ত্তিগণের সংখ্যা খুবই কম।

কিন্তু জাতসংক্রান্ত নিয়মের কঠোরতা অনেকটা কমিয়াছে। কেবল কতকগুলি উচ্চতম জাতের মধ্যেই এখনো মদ্য-মাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ; এমন-কি বড় বড় সহরে গোমাংস আহারও চলে। এবং যাহারা সমুদ্র-যাত্রা করে (একটা মহাপাতক) তাহারা সহজেই ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

অনেকটা অনিশ্চিত হইলেও, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ৬ লক্ষ যুবক মধ্য-শিক্ষা অথবা উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; তাহার ফলে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু য়ুরোপীয় ধরণে শিক্ষিত হইয়া উঠে। সরকারী ছোট পদস্থ কর্ম্মচারী, সাধারণ কর্ম্মচারী, পুলিসের লোকে, সেপাই, দোকান ও ব্যাঙ্কের কেরাণী, কারখানার শ্রমজীবী, যে-কেহ ইংরেজী ও দেশী খবরের কাগজ পড়ে,—ইহাদের সকলেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার কিয়ৎপরিমাণে চলিয়া যায়। তাহারাও আবার জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জাতের খণ্ডবিভাগের ন্যায়, য়ুরোপের নৈতিক মতবাদ ও য়ুরোপের ভৌতিক উন্নতির চেষ্টাও সুদৃঢ় প্রাচীন সমাজগঠনকে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার বেদনা

আমার বেদনা আর ধরিল না বুকে,
সে যে ছেয়ে গেল দূর আকাশের মুখে,
তীব্র দাব দাহে
পাণ্ডুর করিয়া দিল ঘন নীলিমায়,
রৌদ্রের প্রবাহে
অরণ্যের সঙ্গোপন স্নিগ্ধ তন্দ্রিমায়
দগ্ধ করি, জ্বালাইল পলাশ, শিমূল,
স্ফুলিঙ্গের গুচ্ছে-বাঁধা অশোকের ফুল!

আমার এ ফেটে-পড়া ক্রন্দনের স্বরে,
নির্ঝরে, উৎসের মুখে, নদীর অন্তরে
উঠিছে গুমরি
তরঙ্গের আন্দোলনে অনন্ত বিলাপ,
উঠিছে মর্ম্মরি
তরুপত্রে ছন্দোহীন মর্ম্মের প্রলাপ;
প্রান্তরের নিরন্তর অশান্ত নিশ্বাস,
হায়, হায়, হাহাকারে ভরিছে আকাশ!

মৌন আমি, বহুদিন বিনিদ্র নয়ন,
প্রত্যেক নিমেষে খসি পড়িছে স্বপন,
আশা মাধুকরী
যা কিছু অঞ্চলে মোর এত দিন ধরি
দিয়েছিল ভরি,
আনমনা আকর্ষণে পড়ে গেছে ঝরি!
শূন্য পড়ে আছে মোর সকল অন্তর
ব্যথায় ভরিয়া গেছে বিশ্ব চরাচর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তরুতীর্থ

(১)

নদীর ওপারে নগর ও তীর্থক্ষেত্র। অনেক যাত্রী সেখানে যায়। দেখিবার ও পুণ্যসঞ্চয় করিবার কত কী সেখানে আছে! কিন্তু নদীর এপারে বনের মধ্যে এই যে পুরানো আম গাছটি—এখানে দেশের ও বিদেশের এত পথিক, এত তীর্থযাত্রী, সকলেই একবার করিয়া আসে কেন? এ কি তীর্থস্থান? কোন্ দেবতার অধিষ্ঠান এখানে?

আমাদের সঙ্গী বা সহযাত্রীরা কেহই এ-কথার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। কেহ বলিল, 'এই তরুতলে জল দিলে সর্ব্বদুঃখ দূর হয়,' কেহ বলিল, 'মনস্তাপ যায়,' কেহ বলিল, 'দীর্ঘজীবী হয়,' ইত্যাদি। আর স্থানীয় পাণ্ডা-মহাশয় শিব-দুর্গার কথা-মিশ্রিত যে দীর্ঘ ইতিহাস আবৃত্তি করিলেন, তাহা নূতন হইলেও শুনিয়া হাসি থামানো গেল না।

ফিরিবার সময় আমি নদী-তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম; দেখিলাম নৌকায় পার হইবার জন্য এক বৃদ্ধ আমাদের সাথী হইয়াছেন। পূর্ব্বে যখন আমি জনে-জনে বৃক্ষটির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তখন এই প্রাচীন আমার প্রতি চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার কৌতূহল আবার জাগিল; কাছে গিয়া বলিলাম, "মহাশয়, অনেকেই অনেক কথা বলিল, আপনি এ গাছটির সম্বন্ধে নূতন কিছু জানেন কি?"

—"নূতন নয়, তবে আমিও একটা কাহিনী জানি বটে—কিন্তু আর সময় কৈ?"

সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল না, নৌকা তখন যাত্রী লইয়া পরপারে—আমি বলিলাম, "বড় গল্প না কি?"

"গল্প নয়--ঘটনা সত্য। আচ্ছা, যতটুকু হয় বলিতেছি।" বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, নদীর ধারে সবুজ ঘাসের উঁচু জমির উপর বসিয়া আমি শুনিতে লাগিলাম।

"এই নদীর ধারে পূর্ব্বে এমনি বন ছিল বটে, কিন্তু এখানটি এমন বিজন ছিল না। বনের মধ্যে এই গাছটির আশেপাশে কয়েকখানি কুটীর তাহাদের সুখ-দুঃখ দিয়া

ঘেরিয়া একখানি ক্ষুদ্র পল্লী রচনা করিয়াছিল। উপার্জ্জনের সুবিধা নাই, ভূমি উর্ব্বরা নয়, তবু এখানে মানুষ ছিল। সম্মুখে নগরের উজ্জ্বল প্রলোভন ছিল বটে, কিন্তু এই ভগ্ন কুটীর আর নির্জ্জন নদীতীরটির মায়া তাহারা কাটাইতে পারে নাই। পিতা-মাতার চরণধূলিপূত সোনার মাটি ত্যাগ করিয়া যাওয়া তো সহজ নয়! বনের কাঠ কাটিয়া, নদীতে মাছ ধরিয়া, ফল বেচিয়া দুঃখে-কষ্টেই কোনরকমে সকলের দিনগুজরাণ হইত।

তাহাদেরই মধ্যে ছিল দুইটি রাজপুত পরিবার। কাঠুরিয়াদের সঙ্গে তাহারাও কাঠ কাটিত, ফল বেচিত, কিন্তু উচ্চবংশের উদার প্রকৃতিতে গ্রামখানির যেন প্রাণ ছিল তাহারাই। সুশ্রী-সবল আকৃতিতে, শিষ্ট ব্যবহারে, বন্যদের চক্ষে তাহারা পূজার দেবতা ছিল।

ইঁহাদেরই এক পরিবারের বালক শঙ্কর, আর অন্য-গৃহের বালিকা কৃষ্ণা। বনের মধ্যে দুটি বনফুলের মত তাহারা ফুটিয়া ছিল। শিশুকাল হইতে আর-কেহ তাহাদের :সঙ্গী ছিল না, এক-বৃন্তের ফুলদুটির মত তাহারা পরস্পরে এক-হইয়া আপনাদের মিলন-খেলার নিত্যনবীন মাধুর্য্যে সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। আকারে তাহাদের বিভিন্নতা ছিল বটে কিন্তু অন্তরের প্রাণ ছিল যেন এক! হাসি-কান্নায়, খেলা-ধূলায়, আহার-নিদ্রায় কোথাও তাহাদের অমিলন ঘটিত না। যেন একতারে বাঁধা ক্রমোচ্চ গ্রামের দুটি একই সুর। নির্জ্জন পল্লী, নির্জ্জন নদীতীর—তাহার মাঝের এই যে দুটি ক্ষুদ্র হৃদয়, ইহারা পিতামাতা ও আপনাদের ছাড়া জগতের আর-কিছুই জানিত না।

(২)

তাহাদের বয়স যেমন বাড়িতেছিল, বনবাসী এই দুই ক্ষত্রিয়-পরিবারের লোকসংখ্যাও তেমনি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণা ও শঙ্করের বিবাহ স্থির—কিন্তু সে মিলন দেখিবার জন্য শঙ্করের ঘরে কেহ রহিল না, আর কৃষ্ণার বৃদ্ধা রুগ্না মাতার জীবন-দীপটি নিবিলে তাহার গৃহও শূন্য হয়! বালক-বালিকা—না আর তাহারা বালক বালিকা নয়—কৃষ্ণার বয়স ত্রয়োদশ আর শঙ্কর বিংশবর্ষের বলিষ্ঠ যুবক; তাহারা দুটিতে মিলিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সংসারের চিত্রখানি—ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের আলোক-ছায়ায় আঁকিয়া তুলিতে লাগিল।

গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে নিঃশেষপ্রায় হইতেছিল। বৃদ্ধের দল দেহত্যাগ করিবার পরই তাহাদের বংশধরেরা জীবিকার তাড়নায় বন ছাড়িয়া নগরে চলিয়া গিয়াছে। পল্লী প্রায় শূন্য; কুটীর পড়িয়া মৃত্তিকার স্তূপ তুলিয়াছে। শঙ্কর ভাবিত, কৃষ্ণাকে বিবাহ করিয়া সেও নগরে বাস করিতে যাইবে, চিরদারিদ্র্যের কষ্ট আর সহ্য হয় না,—অন্নাভাবে শীর্ণা বালিকাকে ত সুখী করা চাই।

কিন্তু এ আনন্দ-কল্পনায় ম্লান ছায়া ফেলিত কৃষ্ণাই। সে কিছুতেই বনপল্লী ছাড়িতে চাহিত না। এই নদীতট, এই চঞ্চল জলধারা—এমন-কি এই ছোট-খাটো তরুলতাগুলির‌ও উপর তাহার অপরিসীম মমতা। সে যাইবে "না;" কিছুতেই

আর-কোথাও যাইবে না! সে সুখ চায় না, ঐশ্বর্য্য চায় না—শঙ্কর থাকিলে একাই এ বনে থাকিবে। সে লোকসঙ্গ ভালবাসে না, এই জনহীন বন তাহার বড় প্রিয় —বড় মনোরম!

মুখে কৃষ্ণা যাহাই বলুক, শঙ্কর জানিত, এই বনের মধ্যে সবচেয়ে দুশ্ছেদ্য আকর্ষণের বাহু মেলিয়াছে একটি ছোট আমগাছ! আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা দুটিতে মিলিয়া সেই গাছটি রোপণ করিয়াছিল,—তাহার পর যেমন তাহাতে অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, সেই অবধি কৃষ্ণা তাহার হৃদয়ের স্নেহধারা ঢালিয়া তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছে। তাহার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া শঙ্করও সে ক্ষুদ্র শ্যামল তরুটির প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণা জানিত, সে গাছ শঙ্করের—আর শঙ্কর ভাবিত, তাহা তাহার প্রাণাধিক কৃষ্ণার। তাই দুটি হৃদয়ের ভালবাসার অমিয় স্পর্শে সেই ক্ষুদ্র রসাল তরুটি–পিতা-মাতার একমাত্র দুলালের ন্যায় পালিত হইতেছিল।"

(৩)

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্ত কেমন আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল। একবার চোখ তুলিয়া সেই কাণ্ডপত্রহীন বৃহৎ বৃক্ষটির প্রতি চাহিলাম;—প্রেমিকযুগলের স্নেহপালিত এই সেই তরু!. ঔৎসুক্যের সঙ্গেই বলিলাম—"তারপর!"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "তারপর?—তারপরই অনর্থ আসিল। কৃষ্ণা সেদিন কার্য্য-শেষে নদীর তীরে বসিয়াছিল; শঙ্কর বাড়ী ছিল না, তাহারই জন্য আহার্য্য সাজাইয়া সে পথের পানে চাহিয়া অধীর ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কেবলই ভাবিতেছিল, শঙ্কর এখনো ফিরিল না কেন?

অদূরে নদীর উচ্চ পাড়ে তাহার সেই আমগাছ। রৌদ্রে তাহার কোমল পাতাগুলি নুইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণা এক-একবার তাহার প্রতিও চাহিয়া দেখিতেছিল; মধ্যাহ্নে ত জল দেওয়া যায় না,—আহা! কিন্তু শঙ্কর কোথা গেল? সে তো জানে, বেশীক্ষণ তাহাকে না দেখিলে কৃষ্ণা ভয় পায়;—এ বনে সে ছাড়া তাহাদের আর কে আছে? কেন সে আসে না! কোথায় গেল?—বালিকা ক্রমেই অবসন্ন হইতেছিল, তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাটিতে আঁচল বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

"শঙ্কর—শঙ্কর!" হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণা ডাকিল—"শঙ্কর আসিলে?"

কিন্তু শঙ্কর ত নয়, ইহারা কে? সে সভয়ে দেখিল, চার-পাঁচজন অশ্বারোহী অদূরে নদী পার হইতেছে। তাহাদের মধ্যে দুজন একেবারে তাহার সম্মুখে! কে ইহারা? বেশ-ভূষা অসাধারণ উজ্জ্বল। তাহাদের বাহন অশ্বগুলিও দরিদ্রা বালিকার চক্ষে বড় সুন্দর, বড় প্রকাণ্ড দেখাইতেছিল। সে ক্ষণকাল স্তব্ধ—ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পিছাইয়া গেল,—চারিদিকে চাহিয়া কাহাকে খুঁজিল।

অপরিচিত, কিন্তু স্নিগ্ধকোমলস্বরে কে প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি? এখানে একা বসিয়া কেন? এই বনেই কি তোমার বাড়ী?"

সে মুখ তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিল; সজ্জিত সুন্দর তরুণ যুবা, দেখিলে ভয় হয় না। ক্ষত্রিয়-কন্যা একবার ইতস্তত করিয়া

উত্তর করিল, "হাঁ!" তারপর তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎপদ হইয়া কুটীরের দিকে চলিয়া গেল।

তাহার মা তখন নিদ্রিত ছিল; সে অর্গল রুদ্ধ করিয়া ছিদ্রপথে দেখিল কেহ তাহার পশ্চাতে আসিতেছে কিনা। কিন্তু না, তাহারা কেহ এদিকে আসিল না; হাসিতে হাসিতে কুটীরের পানে চাহিতে চাহিতে তাহারা নদী পার হইতেছিল। রৌদ্রে তাহাদের শিরোভূষণ জ্বলিতেছে! তাহাদের কোষবদ্ধ তরবারি অসাধারণ দীর্ঘ ও স্বর্ণমণ্ডিত; অশ্বের প্রতি পদক্ষেপে একটা ঝিন্-ঝিন্ শব্দ উঠিতেছিল।

এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণার কেমন ভয় করিতে লাগিল। শঙ্কর আসিলে রোদনরুদ্ধস্বরে বলিল, "কেন তুমি আমায় ফেলিয়া যাও? আমার বড় ভয় করে যে!"

শঙ্করের সবল বাহুর ছায়া পাইয়া তাহার ভয় নিমেষে দূর হইয়া গেল; সে তখন নবাগতদের কাহিনী বলিতে লাগিল।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাহারা এদিকেও আসিয়াছিল! এদিকে তাহাদের প্রয়োজন কি? তাহারা রাজকুমার অচলাদিত্যের দল। কিন্তু এ পল্লীর পথে কেন?"

কথাটা লইয়া কৃষ্ণা আরও দুই চারি-বার কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু অন্যমনস্ক শঙ্কর তাহাতে যোগ দিল না।

(৪)

তৃতীয় দিন প্রাতে শঙ্কর আবার বাহির হইয়া গেল। যেখানে বনের সমতল ভূমিতে তাহার শষ্যক্ষেত্র ও একটি ক্ষুদ্র ফলোদ্যান, প্রভাতে প্রায় সেইখানেই সে থাকিত। ফিরিতে কতদিন বিলম্বও হইত।

আজও সে দ্বিপ্রহরের পর ফিরিল। নদীর ধারে-ধারে পথ, শঙ্কর সাশ্চর্য্যে দেখিল, সেই পথে অসংখ্য অশ্ব ও মানুষের পদচিহ্ন। ব্যাপার কি? অচলাদিত্যের দল আবার মৃগয়ায় আসিয়াছিল নাকি? বারবার এখান দিয়া তাহাদের যাতায়াত আরম্ভ হইল কেন?

গৃহদ্বারে আসিয়া তাহার প্রাণে চমক্ আসিল। এ কি? কৃষ্ণা কোথায়?—তাহার মা কৈ? কুটীর শূন্য! রাজসৈন্য দেখিয়া তাহারা কোথাও লুকাইয়াছে বোধ হয়? শঙ্কর তাহাদিগকে খুঁজিতে গিয়া কাঠুরিয়া-রমণীদের নিকট সকল কথাই শুনিল।

রাজপুরোহিত ও সেনাপতি আসিয়া কৃষ্ণা ও তাহার মাতাকে নগরে লইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা অচিরে রাজবধূ হইবে!

যুবক স্তব্ধ হইয়া গেল। কথাটা বিশ্বাস হয় না যে!—এতখানি সর্ব্বনাশের কথা হঠাৎ বিশ্বাস হয় কি করিয়া? কিন্তু তবু তাহা সত্য;—ঐ যে দীন কুটীর দৈন্যের অর্গল ফেলিয়া, তাহার অন্ধকার দৃষ্টি সবটা মেলিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে!—তবে সত্য, সব সত্য!

সে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বালুকার উপর সেই সব পদচিহ্ন; তাহারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গভীর ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া বসিয়া গেল। মাথার মধ্যে অশ্বের পদধ্বনি আঘাত দিয়া দিয়া বাজিতে লাগিল।

উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্য;—বাতাসে অগ্নিবৃষ্টি!

আজ সে গৃহহীন, সর্ব্বস্বহীন—পথের কাঙাল! সে একবার নিজের দীর্ঘব্যাপী ভবিষ্যতের প্রতি চাহিল; কে আছে তার? কেউ নাই! কি করিতে পারে সে? কিছু না! শুধু এই বাহুদুটি ত তাহার সম্বল! কিন্তু এই বিশাল দেশের নরপতি বিপুলাদিত্যের অধীনে এমন শত শত বলিষ্ঠ বাহু! প্রাণ দিলেও কি আর কৃষ্ণাকে উদ্ধার করিতে পারিবে?

আর, কৃষ্ণা! সে চলিয়া গেল? দ্বিরুক্তি না করিয়া শঙ্করের অপেক্ষাটুকু না রাখিয়াই সে চলিয়া গেল? না যাইবেই-বা কেন? এই চিরদারিদ্র্যের জ্বালা এড়াইয়া রাজবধূ হইবে,—তাহারপর এই মহাদেশের মহারাণী! এ সম্মানের, এ সুখের প্রলোভন এড়াইতে পারে ক-জন?

নদীর জলে মৃদুবীচিবিক্ষেপ তপ্ত রৌদ্রে অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। সে পরপারের দীর্ঘ পথরেখার প্রতি চাহিয়া বসিয়া ছিল—তাহার মনে হইতে লাগিল সে পথেও যেন আগুন ধরিয়াছে। পাষাণী না হইলে কৃষ্ণা কেমন করিয়া ঐ আগুনের পথে অম্লানবদনে চলিয়া গেল?—সে পাষাণী, পাষাণী!

শঙ্কর আপনার হাতের দীর্ঘ যষ্টি নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তৃষ্ণার্ত্ত শুষ্ক ওষ্ঠ দাঁতের চাপে কাটিয়া নীল হইয়া গিয়াছে, চক্ষে আর বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নাই, সে উঠিয়া আবার গ্রামে চলিল।

নারীদলে সেদিন মহানন্দ, তাহাদের গ্রামলক্ষ্মী কৃষ্ণা আজ রাজরাণী হইতে চলিয়াছে। তাহারই গুঞ্জন-গান শঙ্করের কানে আসিয়া লাগিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

(৫)

কয়েক বৎসর কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে সেই জনবিরল গ্রামখানি একেবারে মনুষ্য-সম্পর্কশূন্য হইয়া গিয়াছে। পল্লী-কুটীর ভগ্ন, প্রাঙ্গণে কাঁটাগাছ! পথে বন, তাহাতে আর মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না। সব চূর্ণবিচূর্ণ, অবহেলায় লাঞ্ছিত—হতশ্রী।

কিন্তু তাহারই মধ্যে শঙ্কর ও কৃষ্ণার সেই কিশোর সহকার,—সেই গ্রামের মাঝখানটিতে, নদীজলে ছায়া ছড়াইয়া নব-যৌবনে আচ্ছন্ন প্রচুর শ্যামলপত্রপল্লবে সজ্জিত দেহে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

তখন অচিরাগত বসন্তের সরসস্পর্শে বনশ্রী উজ্জ্বল, লতান্দোলনে পুষ্পগুচ্ছ লীলাচঞ্চল। কৃষ্ণার যত্নপালিত রসাল নব-মুকুলের বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত। তাহার মধুর মদির গন্ধে মৃত পল্লীখানিও যেন নব-জাগরণের অলস চক্ষু মেলিয়া মৃদুহাস্যের চেষ্টা করিতেছে। সেই মৃত্যু-রাজ্যের অমর সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেদিন এক মৃত-প্রায় মানব আসিয়া বসিল।

সে শঙ্কর। বহু-দিন নিরুদ্দেশের পর আজ সে দেশে ফিরিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল যে তাহার ভগ্ন শরীরে আর বেশিদিন প্রাণ-দেবতার অধিষ্ঠান থাকিবে না, তাই একবার জন্মভূমির সহিত শেষ-সাক্ষাৎ করিতে বা তাঁহারই কোলে অন্তিমশয়ন বিছাইতে, সে আসিয়াছে।

গাছতলাটিতে পড়িয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে উপরদিকে চাহিল। গাছে নূতন পাতা

নূতন ফুল ও ভবিষ্যতের ফল-সম্ভাবনার প্রচুর আভাস! তাহার রক্তপল্লব বাতাসে নাচিতেছে, মুকুলগুচ্ছে গন্ধ বুঝি ধরে না! ক্ষণকাল শঙ্কর মুগ্ধ হইল। প্রাণাধিক প্রিয় তরুটির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু কৃষ্ণা তো এসকল কিছুই দেখিল না! এ তরুর কথা হয় তো তাহার স্মরণও নাই। কেনই বা থাকিবে? এ যে শঙ্করের রোপিত বৃক্ষ! বাল্যক্রীড়ার ক্রীড়নক এই সামান্য তরুটি, ইহার কথা মহিষী কৃষ্ণার স্মরণ থাকার সম্ভাবনা কোথায়? ভুল ভুল, সব মিথ্যা! এ বৃক্ষ মিথ্যা, গ্রাম মিথ্যা, এ জন্মভূমি, বাল্যস্মৃতি—সব মিথ্যা!

হতভাগ্য রুগ্ন চীৎকার-শব্দে কাঁদিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ দিয়া ধ্বনি বাহির হইল না। যাতনায় চক্ষু রক্তবর্ণ, তবু এক ফোঁটা অশ্রু গলিয়া তাহার বেদনা হ্রাস করিয়া দিল না।

অবশভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর সহসা লাফাইয়া উঠিল। অনতিদূরে তাহাদের সেই কুটীরগুলি। সে দীর্ঘপদক্ষেপে সেইদিকে চলিল। কৃষ্ণাদের কুটীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্বসিয়া, মাটি জলে গলিতেছে। কিন্তু তাহার ঘরখানা জীর্ণ তৃণাচ্ছাদন মাথায় লইয়া এখনও বাঁচিয়া!

কেন? সে এখনও মাথা তুলিয়া আছে কেন? শঙ্কর খানিকক্ষণ সেই দৃশ্য চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া—একটা ভাঙ্গা বাঁশ তুলিয়া লইয়া ঘরে আসিল। চাল জীর্ণ, তাহার বংশ-পঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে; হাতের বাঁশের আঘাতে শঙ্কর তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল।

বাঁশ ভাঙ্গিয়া, খড় ছড়াইয়া, আঘাতে আঘাতে দেয়াল ফেলিয়া সে সব চূর্ণ করিয়া দিল। এই কুটীরটার মতই যদি কেহ তার এই ভগ্নদেহটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিত, তাহা হইলে সে একটুও বাধা দিত না, আঃ, সেই তো তাহার সুখ!

ঘর-ভাঙ্গা শেষ হইলে সে টলিতে টলিতে নদীতীরে বালির উপর আসিয়া পড়িল। জলপান করিতে সাধ নাই তবু থাকিতে পারিল না, নদীর স্বচ্ছশীতল জল দুই হাত ভরিয়া যত পারিল, পান করিল।

শীতল শান্তি! শরীরে আবার শক্তি আসিতেছে। হঠাৎ সেই পুষ্পভূষিত তরুটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। হুঁ! সে-ই ইহার মধ্যে হর্ষপ্রফুল্ল, সে-ই যেন তাহার দুঃখে হাসি-পরিহাস ছড়াইতেছে! স্থির হও, একটু অপেক্ষা কর রে নিষ্ঠুর বৃক্ষ, মৃত্যুর পূর্ব্বে শঙ্কর তোমাকেও শেষ করিয়া যাইবে! সন্ধ্যা সমাগত, একখানি কুঠারের খোঁজে সে নদীপারে চলিল।

রাত্রে ফিরিয়া আরও ক্লান্তিবোধ হইতেছে, প্রভাতে উঠিয়া অগ্রে বৃক্ষটি ধ্বংস করিতে হইবে! নহিলে হয়ত আর শক্তি থাকিবে না!

সে নদীতীরে দূর্ব্বাদলের উপর পড়িয়া আকুল হইয়া ভাবিতেছিল—কখন্ অজ্ঞাতসারে চোখে ঘুম আসিয়া পড়িল জানিতে পারিল না।

নিদ্রার ঘোরে সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল যেন সেই আম্রবৃক্ষ হইতে এক পরমসুন্দরী বালিকা বাহির হইয়া তাহার নিকট আসিতেছে। তাহার

দীর্ঘ নীল চক্ষু জলে ভরা, রক্তওষ্ঠ কাঁপিতেছে, সে যেন ভয়ে বিবশা,—ব্যথিত মুখখানি তুলিয়া বালিকা তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল। শঙ্কর প্রশ্ন করিল,—"তুমি কে? কাঁদিতেছ কেন?"

বালিকা বলিল,—"আমি তোমার প্রাণ—"

"আমার প্রাণ? তুমি ঐ গাছটির ভিতর হইতে আসিলে না?'

উত্তর হইল, "হাঁ, আমি ইহার মধ্যে বাস করি—কিন্তু তুমি তাহাকে কাটিতে চাও কেন?"

স্বপ্নেও শঙ্কর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তীব্র স্বরে বলিল, "কেন কাটিব না?"

"তাহা হইলে যে আমি মরিব,—তুমি মরিবে! এ কাজ করিয়ো না গো!"

"নিশ্চয় করিব! গাছ মরিলে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তাহার অপেক্ষা আর সুখ কি?"

বালিকা আর বাধা দিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। শঙ্কর বলিল, "তুমি আমার প্রাণ? দূর হও—দূর হও আমার সম্মুখ হইতে, নতুবা খুন করিব তোমায় আমি।"

স্বপ্ন মিলাইয়া আসিতেছিল, অর্দ্ধস্ফুট চৈতন্যের মধ্যেও শঙ্কর শুনিল, মধুর-তীব্র স্বরে কে বলিতেছে,—"ও গাছ কাটিও না, —আমায় মারিয়ো না! ও গাছ কাটিয়ো না—কাটিয়ো না—কাটিয়ো না।"

তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই নদীতীর, স্বল্পজলে খরস্রোত তর-তর-বেগে বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপর কালো আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নক্ষত্র জ্বলিতেছে। সে এ কী স্বপ্ন দেখিল?

"স্বপ্ন? হউক স্বপ্ন; ঐ বৃক্ষ কাটিতেই হইবে!" বলিতে বলিতে তাহার শীর্ণগণ্ড চক্ষুজলে ভাসিয়া গেল। সত্যই ত, একদিন তাহারা ঐ তরুর শিশু-প্রাণটিকে নিজের প্রাণের ন্যায়ই ভালবাসিত! বিছানা ছাড়িয়া আগে সেই বৃক্ষতলে জল দিবার জন্য ছুটিয়া আসিত! সে যে কত কথা, স্নেহস্নিগ্ধ প্রাণের কত সাধের ইতিহাস সে সব। পরে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের ব্যথাময় দিন-রাত্রিগুলার মধ্যে সে এক নিমেষের জন্যও সেই প্রাণাধিক তরুকে ভুলিয়া ছিল কি?

তাহার সুখের জীবনের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন, কৃষ্ণার হাতের যত্নের ধন এই গাছটি তাহার প্রাণতুল্য বৈ কি? শঙ্কর তাহার অশ্রুসিক্ত স্নেহার্দ্র চক্ষু তুলিয়া আদরে ব্যগ্রভাবে গাছটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল। নদীজলে উষালোক ছলকিতেছিল। দূরে কোথায় ভোরের পাখী শিস্ দিতেছে। বহুদূরে নগরশীর্ষে, মন্দির-চূড়ায় নবোদিত আলোক-রশ্মির স্বর্ণসম্পাত। দেখিয়া আবার শঙ্করের হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ঐ সুবর্ণ-শক্তিই তাহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে যে! —আঃ, তুচ্ছ বনের এ সামান্য বৃক্ষ, এ বাঁচিলে বা মরিলে—কিছুতেই ও স্বর্ণবর্ণের কোন ম্লানিমা ঘটিবে না! তবে কেন? —তাহার মরাই মঙ্গল, সে মরুক্।

(৬)

ভূমিশয্যা ত্যাগ করিতে গিয়া সে বুঝিল, তাহার শরীরে আর শক্তি নাই, পা চলিতে

চায় না, সর্ব্বাঙ্গ অবশ ; ক্ষুধাতৃষ্ণায় দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। পানাহারে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই—ঐ তরু ও এই দেহটির নাশই এখন তাহার জীবনের শেষ কাজ ও চরম সাধ।

মৃদুপদে সে গাছটির নিকট আসিল। কোমল রৌদ্রে তরুর সর্ব্বাঙ্গে চঞ্চল চাক্‌চিক্য, তলায় মুকুল ঝরিতেছে, কুলহারা বাতাসে গন্ধের বিস্তার। শঙ্করের চিত্তও যেন মুহূর্ত্তকাল প্রীতিরসে ভরিয়া উঠিল, সতৃষ্ণ নয়নে সে গাছটির দিকে তাকাইয়া রহিল। আহা, এই সুন্দর সুকোমল তরুর অঙ্গে কেমন করিয়া সে অস্ত্রক্ষেপ করিবে?

ভাবিতে তাহার নয়নে জল আসিল। একদিন তাহার নিজের জীবনও এমনি পুষ্পিত শ্যামল তরুর ন্যায় প্রাণ-প্রচুরতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কোথায় সেদিন?……কেন গেল? নির্ম্মম হস্তে কঠোর কুঠারে কে তাহাকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছে? কে কাটিল? বিধাতা,—কিন্তু কে সেই বিধাতা? স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা? যিনি একদিন সুখের ছবি দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিইতো স্বহস্তে সে চিত্রে কালি ঢালিয়া দিয়াছেন?

তবে শঙ্করের অপরাধ কি? স্বহস্তে রোপিত এই সুন্দর তরু, সেও স্বহস্তেই কাটিবে না কেন? স্বপ্নের বালিকা ঠিক বলিয়াছে, এ তরু তাহার প্রাণতুল্যই বটে, ইহার মৃত্যুপর্ব্ব শেষ হইলেই শঙ্করের জীবনের কর্ম্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাকে মারিতেই হইবে,—এ মরুক! তাহার জীবন যেমন ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া শুকাইয়া মরিতেছে, তেমনি নষ্ট ভ্রষ্টশ্রী হইয়া এও মরুক।

অসম্বৃত চিত্তে সে কুঠার খুঁজিতে লাগিল; কৈ তাহা! আঃ, সেটা বুঝি নদীতীরেই পড়িয়া আছে! থাক্, আনিতে যাইবার বিলম্ব শঙ্কর সহ্য করিতে পারিল না! দ্রুতচরণে গাছে উঠিয়া—সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার পুষ্পিত পল্লবরাশি ছিঁড়িতে লাগিল।

অনাহার-শীর্ণ বাহুতে এত বল! বৃক্ষতলে শাখা-পত্ররাশি স্তূপীকৃত হইতে লাগিল।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত; প্রভাত হইতে সে এতক্ষণ এই কার্য্যই করিয়া গিয়াছে নাকি?—আঃ, আর যে শরীরে এতটুকুও বল নাই, কি করিয়া নদীতীরে যাইবে! তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে যে!

শরীরকে টানিয়া কোনমতে সে তীরে আসিয়া পড়িল। তটে কোমল-শ্যাম শৈবালদল, তাহাতে পদস্পর্শ হইতেই যেন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। জলপানের অপেক্ষা না করিয়া সে তথায় শুইয়া পড়িল। থাক্ তৃষ্ণা, মরিতেই যখন হইবে, তখন তৃষ্ণার জ্বালা নিবাইয়া তাহাকে অবসর দেওয়া কেন? আসুক মৃত্যু!

বসন্ত-সায়াহ্নের মধুর বায়ু তাহার দগ্ধ দেহে স্পর্শ দিয়া ফিরিতেছিল। কোমল আলোক-দীপ্ত জলধারা যেন সহস্রবীচি-নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। পূর্ব্বাকাশে জলভারগম্ভীর শ্যামসুন্দর শীতল মেঘ; তটের বৃহৎ বটবৃক্ষ তাহার বিশাল ছায়া প্রসারিত করিয়া শঙ্করের পাশে দণ্ডায়মান। চারিদিকই জুড়িয়া যেন সহানুভূতির বিপুল আয়োজন;—প্রকৃতির

স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় তাহার মৃতপ্রায় দুঃখী সন্তানকে কোলে তুলিয়া স্নেহাঞ্চল দিয়া ঢাকিতে উদ্যত।

অজ্ঞাতসারে কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ দুইদিন তাহার আহার নাই, জলপান করিতে আসিয়াও তাহা ঘটিল না। বন্য কুক্কুর-শৃগাল তাহার পাশে আসিয়া দেখিল সে মৃত কিনা! মৃদু নিঃশ্বাস ব্যতীত সে অসাড় দেহে জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সুষুপ্তির ঘনঘোর কাটাইয়া আবার তাহার স্বপ্ন দেখা দিল। সেই স্বপ্ন! আবার সেই বালিকা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ যেন শঙ্করের চক্ষু মেলিবার শক্তি নাই,—তবু দেখিল, বালিকার শরীরে সেদিন প্রচুর আঘাত, যন্ত্রণায় তাহার মুখ-চক্ষু বিবর্ণ,—ব্যথাকাতর। সে দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "তুমি কি আমাকে সত্যই হত্যা করিবে?"

শঙ্কর বলিল—"কেন, এখনও তোমার সন্দেহ আছে না কি?"

"কিন্তু আমি কে তাহা শুনিয়াছ ত? আমি যদি মরি—"

"তাহা হইলে আমিও মরিব—এই ত কথা? কিন্তু আমি যে তাই চাই!—তুমি যাও—"

"যাইতেছি, কিন্তু একটা কথা। আমি তোমারই বটে, কিন্তু একদিন কৃষ্ণাও কি আমার পরে তাহার অন্তর হইতে স্নেহের ধারা সিঞ্চন করে নাই?"

স্বপ্নের ঘোরেই সবেগে শঙ্কর বলিল, "করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? অনর্থক কৃষ্ণার দোহাই দিও না, সে তোমার কেউ নয়—যাও—"

"কিন্তু শঙ্কর"—

"আবার কিন্তু?"—বলিয়া শঙ্কর কুঠার তুলিল।

উত্থিত বাহু আসিয়া শৈবালে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় বালিকা?

সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কুঠারখানি দূরে পড়িয়া আছে। তাহার শরীরে আবার বল আসিল নাকি! গাছ কাটিবার উৎসাহে সে জলে নামিয়া পেট ভরিয়া জল খাইল। তাহার পর কুঠার-হাতে ধীরে ধীরে গাছের দিকে উঠিতে লাগিল। জল খাইয়া যে সামান্য শক্তিটুকু ফিরিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই কার্য্যটি শেষ করিয়া লইতে হইবে—নয় ত পরে আর আশা নাই!

(৭)

গাছে কুঠার পড়িতে লাগিল, দুর্ব্বল বাহুর বলে বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার বিদ্ধ হয় না, হাতও বুঝি উঠে না! এমন সময় সহসা কার্য্যে বাধা আসিল। নদী পার হইয়া ও কারা আসে? রাজসৈন্য কি? হাঁ, তাহাই বটে। ঐ যে উচ্চ অশ্বে রাজসেনাপতি, হস্তীপৃষ্ঠে ও কে—রাজপুরোহিত নয়?—

পশ্চাতে ও কি? দোলা! রৌপ্যদণ্ড, স্বর্ণচূড়, মুক্তাঝালর ইত্যাদিতে সজ্জিত রাজরাণীর শিবিকাই ত! শঙ্কর জানিত,—বিপুলাদিত্যের মৃত্যুর পর অচলাদিত্যই এখন রাজা। তবে কি কৃষ্ণা কোথাও চলিয়াছে?

শঙ্করের নিঃশেষপ্রায় শক্তিটুকু ঝড়ের

প্রদীপের মত যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল; সে ঝোপের মধ্যে অসাড়ভাবে শুইয়া পড়িল। দৃষ্টি বাধিয়া যাইতেছে তবু প্রাণপণে চোখ মেলিয়া থাকিল। শোভাযাত্রা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়,—হঠাৎ দেখা গেল যেন কি গোল বাধিয়াছে। হস্তীর আরোহীর সহিত কাহার কি কথা হইতেছিল, সেনাপতির অশ্ব স্থির, তাঁহারও সহিত কাহার বাক্যালাপ হইল। অবশেষে সেই গমনোন্মুখ যাত্রীদল সকলেই দাঁড়াইল।

দোলার পশ্চাতে অগণ্য ব্রাহ্মণের হাতে ফুল-ফল-নৈবেদ্য-সম্ভার। শঙ্কর বুঝিল, এই রাজমহিলা বনপ্রান্তে নর্ম্মদাতীরের শিবালয়ে চলিয়াছেন। বাল্যকালে সে কতবার এই পথ দিয়া এমনি পূজাযাত্রা দেখিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ইহারা এখানে দাঁড়াইল কেন?

শুধু দাঁড়ান নয়, দেখিতে দেখিতে দোলা আসিয়া তাহাদের সেই বৃক্ষতলে নামিল ও অনতিবিলম্বে তাহার আবরণ সরাইয়া সূর্য্যালোকঝলসিত উজ্জল বস্ত্রমণ্ডিত কে এক মহিয়সী মহিলা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বৃক্ষ হতশ্রী; তাহার সরস পত্র-পুষ্প মাটিতে পড়িয়া শুকাইতেছে! বৃক্ষকাণ্ডে অস্ত্রচিহ্ন।

একি,—একি, কৃষ্ণা না কি! হাঁ, সেই তো বটে! সেই মুখ, সেই চুল, সেই—সেই সব। রাজসংসারে সুখসম্পদে তাহার সৌন্দর্য্য কি বাড়িয়াছে? কৈ, না!

ক্ষণকাল শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঠিক্ সেই কিশোরী কৃষ্ণা, তেমনি লঘু তনু আকৃতিটি, সে যেন তাহারই বাল্যসখী, আর সেও যেন সেই অচিরাগত সুখের আশায় প্রলুব্ধ, মুগ্ধহৃদয় প্রফুল্ল শঙ্কর!

—"দাঁড়াও, দাঁড়াও কৃষ্ণা!"

তাহার মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, কিন্তু কৃষ্ণা দাঁড়াইল। সে গাছটির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, মুখে বিস্ময় ও বেদনার গভীর কালিমা ক্রমেই স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। পায়ের তলায় কয়েকটা মুকুল চাপা গিয়াছিল, ব্যথিত ভাবে তুলিয়া লইয়া সে তাহাদের ওষ্ঠের উপর ধরিল।

"আমার গাছ কে কাটিল গো!"—করুণ আর্ত্তনাদ! কৃষ্ণা দুইহাতে সেই বৃক্ষকাণ্ড জড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল! দাসী পুরনারীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহার বাহুপাশ হইতে সে তরু ছাড়াইতে পারে না। সামান্য বৃক্ষের জন্য রাজমহিষী কাঁদিয়া আকুল, কেহ আশ্চর্য্য, কেহবা সমবেদনায় কাতর।

শঙ্করের রক্তহীন বক্ষ একবার সবলে স্পন্দিত হইয়া আবার নিঃস্পন্দ হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণাকে শিবিকায় লইয়া গেল। তাহার শেষকথা—ক্রন্দনের সুর, করুণ গানের মত শঙ্করের হৃৎতন্ত্রীতে বাজিতেছিল;—"আমার গাছকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আমার গাছ,—ওগো আমার গাছ!"

যেমন আসিয়াছিল, তেমনি সমারোহে তাহারা চলিয়া গেল। বন আবার নির্জ্জন। দূরে কোথায় করুণস্বরে সুকণ্ঠ পাখী গান ধরিয়াছে। কম্পিত স্খলিত পদে শঙ্কর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার গাছ! কৃষ্ণা নিজে বলিয়াছে, তাহার গাছ! সে কাঁদিয়া বলিয়া গেল, 'এ গাছ আমার'। শঙ্কর দাঁড়াইতে পারিল না, দুই হাতে সেই ক্ষতবিক্ষত বৃক্ষকে জড়াইয়া তাহার গায়ে মাথা রাখিল।

পা চলে না, বসিয়া উঠিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় সে বনের সুখাদ্য ফলের সন্ধানে চলিল। এতক্ষণ আহারের যেন কোনো প্রয়োজন ছিলনা, আবার নূতন করিয়া সে প্রয়োজন জাগিয়া উঠিল। আহার-শেষে নদীর জল পান করিয়া বটের ছায়ায় শুইতেই, সে তন্দ্রাবিষ্ট হইল।

আবার, সেই স্বপ্ন! গাছ হইতে সেই কিশোরী বাহির হইয়াছে, কিন্তু আজ সে একা নয়, তাহার সঙ্গে কৃষ্ণা স্বয়ং। উজ্জল বস্ত্রাবৃতা রাণী নয়,—পূর্ব্বের সেই দীনবেশা কৃষ্ণা। বালিকা ও কৃষ্ণা তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত বিস্ময়ে কৃষ্ণা বলিল, "শঙ্কর, তুমি? তুমিই আমার গাছ কাটিয়াছ?"

স্পন্দিত রবে ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, "তোমার গাছ? না কৃষ্ণা, ও যে আমার ব্যর্থ প্রাণ—"

"তোমার প্রাণ! তা বটে! শঙ্কর, ও কি তোমার একলারই জিনিষ! আমি কি ওর—"

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্নের মিথ্যা মোহের মধ্যেও কৃষ্ণার স্বর যে অবিকল তাহার কণ্ঠস্বরের মতই মিষ্ট করুণ ধ্বনিতে শব্দিত হইল।

তাহার দেহে তখন যেন প্রচুর শক্তি ফিরিয়াছে। সে তালপাতার জলাধার বাঁধিয়া নদীজল বহিয়া বৃক্ষতলে চলিল। দয়াময় সূর্য্যদেব! বাঁচাও, এ তরুটিকে বাঁচাও, সমস্ত বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেও যদি এ বাঁচে, শঙ্কর এখনি তাহা দিতেছে!

* * *

বর্ষা শেষ। সতেজপ্রাণ তরুণ বৃক্ষে আবার নবীন পল্লব দেখা গিয়াছে। তাহার তলায় ক্ষুদ্র কুটীর। তাহার মধ্যে বৃক্ষের তদ্গতচিত্ত সেবক দিবারাত্রব্যাপী যত্ন ঢালিয়া তরুপূজায় নিযুক্ত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যে এইখানেই বাস করিয়া গিয়াছে।

ইহাই এ তরুর ইতিহাস। ভক্তের মৃত্যুর পর দেশবাসীরা সে বৃক্ষকে কামনা-তরু বলিয়াই জানে, ক্রমে সেই কাহিনীই ইহাকে তীর্থের মাহাত্ম্য দিয়াছে।"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন। অস্তগত সূর্য্যের শেষরশ্মি তাঁহার আর্দ্র নেত্রপল্লবে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, আমার আবেগমুগ্ধ হৃদয়ও সজল প্রীতিতে বৃক্ষটি ও তাহার সেবকের উদ্দেশে প্রণত হইল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

সাহিত্য-সম্বন্ধে দু-একটি কথা

"সবুজপত্র"-প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের লেখা লইয়া আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যেন একটা দলাদলি জমিয়া উঠিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে অস্পষ্ট ভাবে ছিল এখন যেন তাহা দিনে দিনে স্ফুটতর হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী কোনদিনই আমাদের মামুলি চালের গতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই; তাঁহার ভাব ও ভাষা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আনিয়াছে, অভিনব শ্রী-সম্পদে সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে। এ-কথা পূর্ব্বে ইংরাজি-পড়া নব্যসম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন এবং রক্ষণশীল বৃদ্ধের দল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্বীকার করিয়া বলিতেন, "আগাগোড়া ছেলেমানুষী—সব নষ্ট করলে।"

নব্য এবং বৃদ্ধদের মতভেদের কারণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। অভ্যাস জিনিষটা মানুষকে এমন বাবু করিয়া তুলে যে তাহার অন্যথা হইলে মানুষের মন রাগের আগুনে জ্বলিয়া উঠে। মানুষের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন কোন পরিবর্ত্তনই আর সহ্য হয় না।

"বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্যম্" ইহা আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেও বৃদ্ধদের অকারণ হাহাকারের প্রতি সকল সময়ে কর্ণপাত করাকে যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না।

বাংলা দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আমাদের ভাবরাজ্যে সমূহ পরিবর্ত্তন উত্তরোত্তর ঘটিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে অন্যতম, বৈদেশিকতার মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আমাদের দেশের একটা সময় গিয়াছে যখন মনে হইত, যাহা-কিছু য়ুরোপ হইতে আসিয়াছে, তাহাই পরম উপাদেয়। সেই সময় নব্যবাঙ্গালীকে গরুর হাড় মুখে করিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া বাহাদুরী করিতে আমরা দেখিয়াছি। তখন ইহাকে সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই মনে করা হইত। কাজে কাজেই বৃদ্ধের দল, যা-কিছু বিদেশ হইতে আমদানি হইত তাহাকেই সন্দেহ এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

তাই একদিন বিদ্যাসাগর যাহা করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে সমাজ এত বাধা দিয়াছিল; যখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য এবং ভাষার উপরে য়ুরোপীয় আদর্শকে আমদানি করিলেন, তখন দেশে একটা বিপ্লবের মত ব্যাপার ঘটিবার মত হইয়াছিল। মাইকেল আমাদের হাতে কম নির্য্যাতন সহ্য করেন নাই। মাইকেলের মৃত্যুপ্রসঙ্গে মনে হয়, আজ আমাদের দেশে ক্রীশ্চানের সহিত আচার-ব্যবহারটা কত গা-সহা হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কিছুদিন আগে আমাদের দেশের কি অবস্থা ছিল!

মানুষের মন যখন জ্ঞানলাভের আকাঙ্খায় আগ্রহান্বিত থাকে তখন সে নূতনকে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনকে আহ্বান করিতে থাকে; কিন্তু হঠাৎ যে

মুহূর্ত্তে মানুষের মন নিজেকে পরম বিজ্ঞ ঠাওরাইয়া লয় তখন হইতে সে বিশ্ব-সংসারের একটানা গতির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়—তখন সে স্থিতি চায়, প্রভুত্ব চায়—তখনই সে একেবারে রক্ষণশীল হইয়া উঠে।

এ সকল কথা আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতার কথা, ইহার জন্য প্রমাণ-প্রকরণের দরকার নাই।

প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল তাহার কারণটা আমরা এইরূপে কিছু-কিছু নির্ণয় করিতে পারি —প্রবীনের স্থিতিশীলতা, নবীনের উদ্দামতা, মানুষের ক্ষমতাপ্রীতি এবং অহঙ্কার।

এ-সকল বিরোধ জগতে চিরদিন থাকিবে —ইহাদের জন্ম মানুষের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা হইতে। যেদিন মানুষের এই দুর্ব্বলতা থাকিবে না সেদিন এই জগৎ-সংসারও থাকিবে না। আইন-আদালত মামলা-মোকদ্দমা সব শেষ হইয়া সংসার স্বর্গ হইবে। অবশ্য আপাততঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাহার সম্ভাবনা বহুদূরগত।

তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে এই বিরোধের ভিতর কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না—তাই ইহার বিষয় এতদিন আলোচনারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ আজকাল যে একটা বিরোধ এবং দলাদলি খাড়া হইয়া উঠিতেছে তাহা কি, কেনই-বা আজ হঠাৎ মাথা তুলিল, তাহার বিষয় জানা দরকার হইয়াছে। যদি তাহার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তাহাকে দূর করা যাইতে পারে কিনা বিবেচনা করা উচিত।

আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতভেদ স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া-গুড়িতে মোটেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ছাত্ররূপে কিছুদিন কলিকাতায় ছিলাম। তখনো বঙ্গবিচ্ছেদ হয় নাই কিন্তু ছাত্র-সম্প্রদায়ের মনে তখন স্বদেশীর আগুন ধোঁয়াইতে ছিল। তখন আমরা সাড়ে চার আনা দিয়া চটের মত গেঞ্জি কিনিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সেই গেঞ্জি গায়ে দিয়া দেশকে যে উদ্ধার করিতেছি এমন একটা গর্ব্বও অনুভব করিতাম। আমাদের ভিতর যে দল ছিল না এমন নয়। একদল ছাত্র, (বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন) ব্যালব্রিগন গেঞ্জিই ব্যবহার করিত—আর তর্ক করিয়া বলিত, শিল্পজিনিষটার ভিতর স্বদেশী-বিদেশী নাই। বেশী পয়সা দিয়া মোটা, মন্দ জিনিষ খরিদ করিলে জগতের শিল্প-জিনিষটার যে সমূহ ক্ষতি করা হয়, তাহার কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী-সমাজ" ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কলিকাতার ছাত্র-সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রদাতা রবীন্দ্রনাথই ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি ছাত্রগণকে যে নব-জীবনে উদ্বোধিত করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "মরা গাঙ্গে" "ওদের বাঁধন যতই" ইত্যাদি সঙ্গীত তখনকার দিনে কোন্ ছাত্র জানিত না?

স্বদেশী আন্দোলন যেদিন তালপাতার আগুনের মত বাংলা দেশে দাউ-দাউ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেদিনের কথা সকলেরই মনে আছে—সে যজ্ঞের হোতার আসন রবীন্দ্রনাথ আর গ্রহণ করিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতার দল রবীন্দ্রনাথের বহু অগ্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

যখন স্বদেশী আন্দোলন এমন একটা ভাবগ্রহণ করিল যাহা দেশের শাসন-কর্ত্তারা পছন্দ করিলেন না; যখন স্বদেশীর দেশকে বিস্মৃত হইয়া দেশের লোক, বিদ্বেষের কথাই বেশী করিয়া মনে করিতে লাগিল—তখন রবীন্দ্রনাথকে এই আন্দোলন হইতে আমরা সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। এই-খানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত নব্য সম্প্রদায়ের ঐক্যের সূত্র যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সেই সময়ে তাঁহাকে লোকে কাপুরুষ বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশের এক সম্প্রদায় এই সময়ে তাঁহাকে বস্তু-তন্ত্রহীন কল্পনার দাস, কেবল-মাত্র কবি বলিয়াও তিরস্কার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের লোকের মনে যে উন্মত্ততা আসিয়াছিল তাহাকে কটাক্ষ করিয়া কবি যে সে সময়ে দু-এককথা বলেন নাই—তাহাও নহে। সে সময়ে সেগুলিকে লোকে আত্মরক্ষার উপায় মনে করিয়া ঘৃণা করিত।

স্বদেশী আন্দোলনের কথা যে বলিতেছি, তাহার একটু বিশেষ কারণ আছে। বাঙ্গালীজাতির যদি কোনদিন ইতিহাস লিখা হয় তবে ঐতিহাসিক নিশ্চয় লক্ষ্য করিবেন যে এই জাতির জীবনের ধারায় এই যুগে একটা সমূহ পরিবর্ত্তন হয়।

স্বদেশীর সময় মনে হইল যাহা-কিছু বিদেশ হইতে আসিতেছে তাহাই আমাদের পক্ষে বিষ এবং যাহা-কিছু আমাদের দেশের, তাহা অমৃত—তাহা গ্রহণ করিতে বিবেচনা-বুদ্ধির কোন দরকার নাই।

জাতির শৈশবে বিবেচনা-বুদ্ধির ব্যবহার বেশী না হইবারই কথা। জাতির জীবন যে মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি হইতে বিভিন্ন নিয়মে চলে—এমন মনে হয় না।

শিশুর যেমন মাত্রা-বোধ নাই—হয় তাহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়—নয়ত উপদেশের দ্বারা দেখিয়া শিখিতে হয়, আমাদের জাতির অবস্থাও এখন কতকটা সেইরূপ। আমাদের এখন অনুভূতিটাই সব-চেয়ে বেশী তীব্র। যেদিন সকালে আমাদের দৈনিক-পত্রগুলি বলে যে দেশ ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন গেল—সেদিন আমাদের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; মনের সম্মুখে কঙ্কালসার স্ফীতোদর ম্যালেরিয়াকে দেখিতে পাই! আবার যেদিন কাগজে বলে যে দেশে আর অন্ন নাই—বিদেশী বণিক সব রপ্তানী করিয়া আমাদিগকে নিরন্ন করিল—সেদিন কাল খাইবার সংস্থান আর নাই বলিয়া আমরা কাঁদিতে বসিয়া যাই! যখন নেতারা বলিলেন যে যা-কিছু বিদেশী তাহা বর্জ্জন কর—তখন আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারের উপর আমরা প্লাকার্ড মারিয়া দিলাম "গোলামখানা",—ঘরে গিয়া তর্ক জুড়িলাম যে বিলাতি কুমড়ার তরকারি পরিত্যাগ করিব।

মাত্রার হিসাব বড় কঠিন হিসাব; ইহাতে ভুল হয় না এমন অল্প লোকই

আছে। অহং প্রবৃত্তির মুখে রাশ দিয়া তাহাকে সব সময়ে সংযত রাখিতে পারা সহজ কাজ নয়। ইহা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা এবং বিবেচনার উপর নির্ভর করে। দেশের অধিকাংশ লোকই নিজের জ্ঞান বুদ্ধি খরচ করিয়া চলিতে পারে না—কাহারো বুদ্ধির অভাব ঘটে, কাহারো-বা উদ্যোগের অভাব হয়। তাই সমাজের মধ্যে নিয়মাদি প্রবর্ত্তন করিতে হয়—তাই পথ-প্রদর্শকের দরকার হয়।

কবি সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া নেতৃত্বের পদ গ্রহণ না করিলেও ভাব-রাজ্যের উপর কিছু-কিছু অধিকার রাখেন। আমাদের দেশের জনসাধারণের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ যোগ নাই বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয়। দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত জনসাধারণের যোগ আছেই আছে। সে যোগ প্রত্যক্ষ। এমনি করিয়া কবির ভাব এবং চিন্তা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু এ-কাজ একদিনে হয় না। তাহা অল্পসময়ের মধ্যে করিতে গেলে সমাজের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়া পড়ে।

দেশের লোক যখন বিদেশী সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ, তখন কবি তাহাদের কানে কানে মন্ত্র দিয়াছেন—তোমারও দেশ ছিল—তার সভ্যতাও ছিল, সে কথা ভুলিলে চলিবে না! তাহার পর দেশে যখন স্রোত ফিরিল কবি তখন দেশের লোকের কানে অন্য মন্ত্র গুঞ্জন করিয়াছেন—তোমার দেশের যাহা আছে তাহাকে অমন সহজভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। তাহার কি আছে কি নাই বিচার করিয়া বিবেচনা করিয়া লও। ঘরের জিনিষ বাইরের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইতে তোমাদের আপত্তি কি?

বৎসর-দুই আগে—কবি যখন য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন—তখন আমরা সদলবলে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেদিন তিনি যে কথাগুলি আমাদের বলিয়াছিলেন—এই দুই বৎসর ধরিয়া সবুজপত্রের পৃষ্ঠা অবলম্বন করিয়া তাহাই বলিয়া আসিয়াছেন। যে কথা নীতিকথা বলিয়া আমরা শুনিতে চাই নাই—সেই কথা গল্পের আকারে "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। গল্পের আবরণ খসিয়া পড়াতে আমরা বুঝিয়াছি এ সেই কবির নীতিকথাই—তাই আমরা একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছি। আমরা বলিতেছি এমন করিয়া বাহিরের বিষ ঘরের মধ্যে আনিয়া ছড়াইয়া দিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।

যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম যে কবি যাহা বলেন তাহা দেশের লোকের অন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না—তাহা হইলে আমাদের এত মাথা-ব্যথার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনার ফাঁকা আকাশে ডানা মেলিয়া যত পারেন উড়ুন, তিনি তাঁর নিভৃত কক্ষের শূন্যতার মধ্যে যত পারেন বকুন -তাহাতে দেশের কি যায়-আসে? দেশের রাজা-রাজড়ার অধ্যাপক-প্রফেসারদের মাথায় এমন টনক নড়িল কেন? এ-কথার উত্তর তাঁহারাই ভাল করিয়া দিবেন,—যাঁহারা বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের কাঠ নহেন—তিনি অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে দেশের হৃদয়তন্ত্রীর সহিত নিজেকে বিচ্ছিন্ন

করিয়া—কষ্টকল্পনার অশ্বডিম্ব প্রসব করিতেছেন।

আমরা এখন এই কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিব না—আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরিয়া লইতেছি যে কবির সহিত দেশের জীবনী-শক্তির এবং হৃদ্-স্পন্দনের একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

যখন আমাদের লোলুপ দৃষ্টি য়ুরোপের উপর পড়িয়াছিল, তখন কবি আমাদের নিকট দেশের গৌরব গায়িতেছিলেন। তাহার পর যখন আমাদের একান্ত আগ্রহ দেশের উপর পড়িল, এবং যখন কবি জানিলেন যে তাহা সহজে টলিবার নয়; যখন কবি অনুভব করিলেন যে তাহাতে ঈর্ষা-বিদ্বেষের গন্ধ আছে, তখন দেশের গৌরব-গান পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশের যাহাকিছু সবই অবাধে গ্রহণ না করিয়া বিচার-বিবেচনার সহিত গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। এখানেই যত গোল বাধিয়াছে।

কবি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে বিদেশের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারগুলি একবার স্বচক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। য়ুরোপ কেন যে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণটা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন, বিদেশের কয়েকটা জিনিষ আমাদের দেশের মধ্যে আনা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আমাদের দেশ নিয়ম-নিগড়ে এমন শৃঙ্খলিত যে দুনিয়ার গতির সহিত এক হইয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। দেশের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুনগুলিকে আগাগোড়া বুঝিতে হইবে—যেগুলি মর্ম্মে ধরিয়া অচল-প্রায় হইয়াছে তাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

দেশের সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার একেবারে যে ঘটিতেছে না, তাহাও নহে; অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সেগুলি যে আপন হইতে বদলাইয়াছে তাহাও অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কি আপত্তি থাকিতে পারে? আমাদের সমাজের দোষ-গুণ যদি আমরা না দেখি, তাহা হইলে বাহির হইতে কে আসিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিবে?

সামাজিক সংস্কারের ভিতর দুইটি জিনিষের উপর কবির কড়া নজর পড়িয়াছে; প্রথম জাতিভেদ এবং দ্বিতীয় স্ত্রী-পরাধীনতা ও অবরোধ। এই দুইটির বিষয়ই আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের সমাজ এমন সকল অযথা এবং ফজুল নিয়ম সকলের দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ যে, সে-গুলিকে শিথিল না করিতে পারিলে জাতির জড়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

কবি যদি এই কথা বুঝিয়া জাতিভেদ ও স্ত্রীপরাধীনতার বিরুদ্ধে—সমাজের কল্যাণের জন্যই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত দেশের শিক্ষিত সাধারণের বিরোধ না হইবার কথা।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে শিক্ষিত সাধারণ কবির এই কটাক্ষ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহার উপর কয়েকটি দোষ চাপাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। পাকে-প্রকারে কবির বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ যে তিনি হিন্দু নন, তিনি ব্রাহ্ম,

অতএব তিনি নিজ ধর্ম্মের উন্নতির কথা মনে করিয়াই হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহেন। বিধর্ম্মী হইয়া হিন্দু সমাজের সংস্কারে হাত দিতে যাওয়া তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে।

এই অভিযোগের উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কবিকে আমরা যেন একটু খাট করিয়া দেখিতেছি। তাঁহার "গোরা"য় তিনি যে উদার মতের পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি কোন ধর্ম্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহেন। তিনি মানুষকে বিশ্বমানবের বৃহত্তর যোগ হইতে ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আনিতে চাহেন না। যে ধর্ম্ম মানুষকে বিশ্বমানবের উদার ধাপ হইতে টানিয়া ক্ষুদ্রতার পঙ্কে ফেলিতে চাহে তাহাকে তিনি ধর্ম্মই বলিতে নারাজ।

ধর্ম্ম মানুষের জন্য—নীতির নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়মগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে সাহায্য করে ততক্ষণ সেগুলির সহিত মানব-সন্তানের কোন বিরোধই উপস্থিত হয় না; কিন্তু মানুষ যখন কেবলমাত্র তাহার ভার বহন করিতে থাকে তখন সেগুলিকে বর্জ্জন করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ইহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে একান্ত বিরল নয়।

বৈদিক ধর্ম্ম যখন অবসাদগ্রস্ত হইল তখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসাদে শঙ্করাচার্য্যের হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। আমাদের দেশের চৈতন্য মহাপ্রভু, রামমোহন রায় এবং পরমহংস-দেবের আবির্ভাবও যথাসময়ে হইয়া গেছে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তিনি অবতীর্ণ হন—এমন কথাই গীতায় উক্ত হইয়াছে।

য়ুরোপের ইতিহাসে ধর্ম্মের উত্থান-পতনের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও এই একই কথা। যখন গ্লানি উপস্থিত হয় তখন সংস্কার করিতে হয়।

আমাদের দেশের ধর্ম্ম এবং সমাজের মধ্যে যে গ্লানি আসিয়াছে—তাহার সংস্কার আবশ্যক—সে কথায় আমাদের রাগ করাটা অবিবেচনার কাজই হইবে।

রাম জন্মিবার পূর্ব্বে কবি রামায়ণ গান করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশের অন্তরের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হইয়া ব্যথা দেয়, কবি তাহাকে প্রকাশ করেন। আমাদের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা হয়ত এমনি করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে কবির বাণীরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দুসমাজের কয়েকটা অঙ্গ একেবারে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে-গুলির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি যে পড়ে নাই তাহাও নহে। সমাজ ঠিক যেন কিসের প্রতীক্ষাতেই আছে, যেন কি চাহে তাহা লাভ না করিলে তাহার আর কল্যাণ নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমাদের সমাজে নীচ-জাতি ও স্ত্রী-জাতি যে ব্যবহারটা সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহা আর অধিকদিন সহ্য করিতে তাহারা রাজি নয়।

এখন ব্রাহ্মণ আর আমাদের নেতা নন। এখন ধনীই সমাজের নেতা। ধনীর যথেচ্ছাচার সমাজ নতমস্তকে সহ্য করিতেছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিদ্যার গৌরব

নাই, কুলের গৌরব নাই—চরিত্রের গৌরব নাই—আছে কেবল ধনের গৌরব।

এদিকে সমাজের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতীত আমাদের সংসার বেশ চলিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই জীবন-সংগ্রাম কঠিন হইতে এমন কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে স্ত্রীলোককে বাদ দিয়া সংসার-চালানো দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। স্বামীর পার্শ্বে যখন স্ত্রীকে দাঁড়াইতেই হইবে তখন তাহাকে দাঁড়াইতে দিবার মত উপযুক্ত করিয়া লইতে আমাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে? তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আজ সে আমাদের গলগ্রহ হইয়াছে। আমরা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি যে তাহাদের ভার বহন করিবার সাধ্য আর আমাদের নাই—তখন যাহাতে আমরা নারীগণের সহায়তা লাভ করিতে পারি, তাহার পথ এখন হইতে নির্ণয় করা আমাদের একান্ত উচিত হইয়া পড়িয়াছে।

সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় কবি এই কথা-গুলিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার জেঠা-মহাশয় যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম,—হিন্দু সে ধর্ম্মের অধিকারী নয় এমন কথা ত তিনি কোথাও বলেন নাই। নীচজাতির নীচত্ব না মানিয়া তাহাদের সহিত আহার-বিহার রবীন্দ্র-নাথের গল্পের নায়কই যে শুধু করিয়াছেন তাহা নহে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের ইতিহাসে এ-সব কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লিখা আছে—তাহা কেবলমাত্র কবির মানসসম্ভূত অলীক কল্পনা নহে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজ কখনই মনে করেন না যে, আমাদের পতিত জাতির উদ্ধারের কোন উপায় নাই। যে নীচে আছে তাহাকে উপরের পথে উঠিতে না দিবার যে চেষ্টা তাহা স্বার্থপ্রণোদিত, তাই তাহা দেশের কল্যাণের জন্য নহে—তাহাতে আমাদের জাতির সমূহ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অবহিত হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায়, যিনি সমাজের কাণে এই সকল উপদেশ দিতেছেন তিনি সমাজের শত্রু নহেন—তিদি সমাজের মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে আপনাকে এমন গভীর ভাবে নিহিত করিয়াছেন যে, লোক-নিন্দা এবং স্তুতি-প্রশংসা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। কবি যখন বাণীর কাব্য-কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে আপনাকে টানিয়া আনেন তখন তাঁহাকে বহুতর নিন্দাস্তুতির ব্যূহভেদ করিয়া চলিতে হয়—একথা তিনি যে জানেন না—তাহাও নহে। আমার এই প্রবন্ধ তাঁহাকে নিন্দা-বাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও নহে—তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যও নহে। যাহা কবি আমাদিগকে দিতেছেন আমরা যেন তাহা অবিচারে অস্বীকার না করি, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণও যেন আমরা না করি।

সবুজপত্রের "স্ত্রীর পত্র" লইয়া যে বাক্য এবং মসি-যুদ্ধ হইয়া গেছে তাহাও বোধ হয় আপনারা জানেন। সমাজের মধ্যে স্ত্রীর অধিকার লইয়া সমস্ত জগৎময় একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। দেখা

যাইতেছে যে সমাজের নিয়মাদি পুরুষের সৃষ্টি, তাহাতে নারীকে পুরুষের চেয়ে খাট করা হইয়াছে। স্ত্রী এবং পুরুষের প্রভেদ আছে; এই প্রভেদ এক জিনিষের তারতম্যের নহে ইহা বস্তুগত পার্থক্যের ফল; তাই হঠাৎ একটিকে বড় করা এবং অপরটিকে ছোট করার ভিতর ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ের পরিমাণ আছে বেশী। মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চ স্তরে উঠিতেছে দৃষ্টি তাহার ততই উদার হইতেছে। নারীর অধিকারের বিষয় চিন্তা করা সমাজের কল্যাণের জন্যই। স্ত্রী এবং পুরুষের সাহচর্য্যে সকল সমাজ চলিতেছে। যদি এই সাহচর্য্যের সম্বন্ধটা আরো সুন্দর করিতে পারা যায়—যাহাতে নারীত্ব অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সমাজকে শক্তিমান্ করিতে পারে—সে বিষয়ের আন্দোলনে আমাদের খড়্গহস্ত হইবার কি আছে!

তর্ক উঠিতে পারে যে আমাদের সমাজে নারীকে কোনদিন অবহেলা করা হয় নাই। গৃহের মধ্যে নারীই অধিষ্ঠাত্রী, সেখানে পুরুষ কোনদিন কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় নাই। বহু অভিজ্ঞতার ফলে নারীকে অবরোধের মধ্যে রাখাই সমীচীন মনে হইয়াছে। হঠাৎ আজ য়ুরোপের অনুকরণে আমাদের দেশের এই স্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে উলট-পালট করিতে যাওয়া গণ্ডমূর্খতা হইবে।

এ কথার মধ্যে যে কোন সত্য নাই এমন মনে হয় না। যে সকল আচার-ব্যবহার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সমাজ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে এককথায় বদল করিতে যাওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নহে, সত্য বটে; কিন্তু সেইগুলির বিষয় বিচার করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—সে-গুলিকে অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালে সেগুলি সমাজকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছে তাহার কথাও মনে করিতে হইবে। আমাদের সমাজ যে উন্নতিশীল নহে তাহা বোধহয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এ অবনতির কারণ কি? তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্ত দোষের হইবে বলিয়াত মনে হয় না। কবি যদি আমাদের মধ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া তুলিতে চাহেন ত তাঁহাকে আমাদের সমাজের হিতৈষীই মনে করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-বিষয়ে যে সকল কথা সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শেষ কথা কবি বলেন নাই। তিনি ঐ বিষয়টিকে এমন ভাবে তুলিয়াছেন যে তাহা এখনো সমস্যার আকারেই আছে; তার শেষ সীমাংসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আলোচনার আবশ্যক তাহাই যেন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের সমাজ ধরিয়া লইয়াছে যে স্ত্রীলোক স্বভাবতই দুর্ব্বল, তাই তাহাকে সংসারের লোভ-পাপ হইতে দূরে রাখিলে সমাজের কল্যাণ হয়। কবি বলিতেছেন যে, যে দুর্ব্বলতা তোমরা স্ত্রী-চরিত্রের উপর আরোপ করিয়া আজ তাহাকে অবরোধের মধ্যে রাখিয়াছ সেটা কি তোমাদেরই সৃষ্টি নয়? স্ত্রীলোক যদি পুরুষের মত প্রকৃতির উদার আকাশ এবং বাতাসের মধ্যে, সংসারের দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের মধ্যে, জীবনযাপন করিতে পায়,

তাহা হইলে তাহার সেই দুর্ব্বলতাটুকু ঘুচিয়া যাইতে পারে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসও এই কথাই বলিয়া থাকে। আমাদের সমাজে এতবড় একটা অভাব থাকিয়া যায় কেন? কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যে জাতি বড় হইয়া উঠিতে চায়, তাহার ভিতর এতবড় একটা গলদ থাকিলে চলিবে কেন? ইহা চিন্তা করিবার বিষয়—ইহা লইয়া দেশময় হৈ-হৈ করিয়া একটা কোঁদল পাকাইলে লাভ কি?

অবশ্য কবি এমন কথা বলেন নাই যে, হে সমগ্র বঙ্গদেশের লোক, তোমাদের সমক্ষে যে বিমলার চরিত্রটি ধরিলাম, তাহা তোমাদের স্ত্রী-কন্যাগণের আদর্শরূপে; অতঃপর বঙ্গনারী এই ছাঁচেই তৈরী হইবে; অন্যরূপ হইতে আমি দিব না।

"ঘরেবাইরে"র বিমলা-চরিত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা করিবার অবসর এখানে নাই; কয়েকটি স্থূল কথার অবতারণা মাত্র করিতেছি।

বিমলা ঠিক আমাদের দেশের আধুনিক মহিলা। স্বামীর কড়া শাসনের দুর্ভাগ্য তাহার ঘটে নাই; তাই তাহার মানসিক বৃত্তিগুলিও একেবারে মরিয়া যায় নাই। সামাজিক নিয়মে সেগুলি নিদ্রিত ছিল মাত্র। হঠাৎ একদিন সন্দীপের রংমশালের দীপ্তিতে সেগুলি চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথম জাগরণে তাহার নিদ্রার প্রমত্ততার, স্বপ্নের জড়িমার ঘোর কাটে নাই। জাগার আনন্দতেই সে দিশেহারা হইয়া পড়িল। পথ এবং বিপথের প্রভেদ তাহার মনের মধ্যে প্রথম উত্তেজনায় কোন স্থানই পাইল না। কিন্তু উত্তেজনা যাহা বাহির হইতে আসে তাহা ক্ষণস্থায়ী—তাই বিমলা অবশেষে যাহা সাঁচ্চা পথ তাহাই দেখিতে পাইল।

নিখিলেশের ভালবাসা বর্ণহীন সূর্য্যের কিরণের মত। যে অনভিজ্ঞ সে জানেনা যে, তাহাতে সকল বর্ণই আছে। সেটুকু জানিতে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, বিমলার তাহা নাই। সন্দীপ কিন্তু বর্ণহীন নয়—তাহার প্রেম মদির রক্তের মত লাল—তাহার আস্বাদ লঙ্কার মত ঝাল। এই লাল রং এবং ঝাল আস্বাদ শিশুকে আকর্ষণ করে; কিন্তু ইহার মোহ ঘুচিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

বিমলাকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহাকে ঠিক দেখা হয় না—তাহাকে সমগ্র করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে নারীত্বের স্ফুরণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত নয়; তাহার আকাঙ্খার শেষ পরিণতি মাতৃত্বে। "ঘরে বাইরে"র মধ্যে ইহার ইঙ্গিত কবি দিয়াছেন।

নিখিলেশের মধ্যে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি বিশুদ্ধতা পাইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। নিখিলেশ যেন বরফের পাহাড়। সন্দীপ যেন ক্ষারময় প্রবৃত্তির তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র। বিমলা উভয়ের মধ্যে লীলাময়ী নির্ঝরিণী!

নিখিলেশ কোন জিনিষ বিনা ওজনে দানও করেনা, গ্রহণও করে না। সন্দীপ যাহা পায় নিঃশেষে গ্রহণ করে, যাহা দেয় নিঃশেষে দান করিয়া ফকির হইয়া বসে। নিখিলেশ সাত্বিক—সন্দীপ তামসিক। "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশের শেষ আছে, সন্দীপেরও শেষ আছে; কিন্তু বিমলার শেষ নাই।

কবি তাহার ভিতর অনেক সমস্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মীমাংসা করেন নাই; তাই বিমলা-চরিত্র অসমাপ্ত।

আমাদের কিন্তু গোল বাধিয়াছে এই বিমলাকে লইয়া। কবি নিজেও বিমলাকে আগাগোড়া বুঝাইয়া দেন নাই এবং নিখিলেশ ও সন্দীপকে দিয়াও দিতে পারেন নাই। শেষ-পর্য্যন্ত বিমলা সন্দীপের নিকট প্রহেলিকার মতই আছে। এ-কথাও আমরা বলিতে পারি না যে নিখিলেশ বিমলাকে আগাগোড়া বুঝিয়াছে। বিমলার আত্মকথার মধ্যে সে যেটুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহার অন্তরালে যে কথার আভাস আছে তাহা—বিমলাকে বুঝিতে হইলে,—ত্যাগ করিলে চলিবে না। মানুষের সব ব্যথার কথাই যে অশ্রু ও রোদনে প্রকাশ পায় তাহা কে বলিতে পারে? কবির ভাষায় বলিতে গেলে Some are too deep for tears.

বিমলার ভিতর যে সামাজিক সমস্যা নিহিত আছে তাহার সমাধান হট্টগোলে হইবে না। অরসিকের চীৎকারেও তাহা চাপা পড়িবার নহে। জগতের নারীর হৃদয়-কোরক উদ্ভেদ করিয়া যে বেদনা বিশ্বের বিচার-দ্বারে আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাকে অবহেলায় পুরুষের কল্যাণ নাই—কিঞ্চিৎ পরুষ পৌরুষ থাকিলেও থাকিতে পারে।

নিখিলেশ-চরিত্রের ভিতর আদর্শের ইঙ্গিত আছে। সমস্ত জীবন দিয়া নিখিলেশ যে ধ্রুব সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছে তাহার উদ্দেশ একটি জীবনে সমগ্র পাওয়া যায় না। জন্মজন্মান্তের কঠোর সংযমের উদ্দীপনার আলোকে তাহাকে পাওয়া যায়; তাহাকে আয়ত্ত করা সুকঠিন। নিখিলেশ পাশা-পাশি দুইটা জিনিষকে বুঝিতে চাহিয়াছে। প্রথম বিমলা; দ্বিতীয় দেশ। বিমলাকে তেমন করিয়া বুঝা হয় নাই; কিন্তু দেশকে নিখিলেশ তার প্রকৃত স্বরূপে দেখিয়াছে।

"ঘরে-বাইরে"র দেশের কথাগুলি বড় মূল্যবান। ইহাতে আমাদের স্বদেশী-আন্দোলন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া খপ্‌ করিয়া কেন নিবিয়া গেল তাহার কারণটি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে কবি যেন একটা মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

দেশের উপর মাতৃত্ব আরোপ করিয়া কেমন সহজে একটা হুলস্থুল করা যায় তাহা আমরা জানি। সে বেশীদিনের কথা নয়, যখন বঙ্গদেশ এই দেশভক্তি এবং মাতৃভক্তির নেশায় মাতাল হইয়াছিল। কবি অল্পকথায় এই আন্দোলনের বিফলতার কারণ দেখাইয়াছেন। দেশকে জানিতে হইলে তাহার প্রথম উপায় তাহার সেবক হওয়া—সেবা না করিয়া ভক্ত হইয়া বসিলে গোড়ায় গলদ হয়।

নিখিলেশ সেবার বৃহৎ গণ্ডী উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; কিন্তু সন্দীপ সেবার ধার না ধারিয়া একেবারে ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। যদি কেহ বস্তুতন্ত্রহীন থাকে ত সে সন্দীপ। সন্দীপের মত দেশভক্তের অভাব—অন্য কোন দেশে থাকিলেও আমাদের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিতে যে নাই—তাহার সাক্ষ্য কি আপনারা দিবেন না?

প্রতিভাবান কবি যে কথা বলিয়াছেন

তাহা উপেক্ষা করিবার নহে। দল-বাঁধিয়া ঘোট করিলে তাহাতে দেশের ক্ষতি। তিনি যাহা দিয়াছেন যদি তাহা সত্য না হয় তবে অধীর হইবার কোন দরকার নাই। মিথ্যা চিরদিনই তাহার ব্যর্থতা লইয়া যথাসময়ে বিদায়গ্রহণ করে। "ঘরে-বাইরে" যদি কল্পনার আকাশ-কুসুম হয় তাহাহইলে দেশের মাটির বাস্তব-সত্যকে কিছুতেই ক্ষুন্ন করিতে পারিবে না। তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য এতবড় আড়ম্বর করিয়া আমরা শক্তিক্ষয় করিতেছি কেন?

যদি "ঘরে-বাইরে"র মধ্যে কবি কিছু সারবান পদার্থ দিয়া থাকেন—যদি তাঁহা আমাদের রক্ষণশীল বিশ্রামপ্রিয় প্রাণে আঘাত দিয়া থাকে ত তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন ডাক্তার মুখরোচক ঔষধ দেন না। কবিকে অনেক সময় সমাজের ডাক্তারি করিতে হয় সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন?

সবুজপত্রের মধ্যে কবি যে লিখন পাঠাইয়াছেন তাহা দিয়াই আমরা তাঁহাকে পরখ করিতে পারি। বেশীদূরে যাইতে হয় না।

অবশেষে নিবেদন, "ঘরেবাইরে" না পড়িয়া যাঁহারা তাঁহার নিন্দা করিতেছেন—তাঁহাদিগকে আমরা ক্ষমা করিতেছি। অর্দ্ধাংশ পাঠ করিয়া যাঁহারা তর্ক জুড়িয়াছেন—তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ পড়িতে বলি। যাঁহারা মাসে মাসে পড়িয়া একটা ধোঁয়ার মত আবছায়া ধারণা করিয়া কোমর বাঁধিয়াছেন তাহাদিগকে অনুরোধ করি, একবার সমগ্র ভাবে পাঠ করিতে।

সহানুভূতির সহিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমরা অনেক শিখিতে পারিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ছন্নছাড়া

(১৪)

এখন-থেকে আমি দাসীর কাজ পেলুম। আমাকে মুরগি ও খরগোস জবাই করতে হত। কিন্তু সে আমার এত খারাপ লাগত যে কি বলব! পলিন বুঝতেই পারত না যে কেন আমার এই বিতৃষ্ণা। সে বলত আমি ঠিক ইউজেনের মতন;—কারণ শূয়োর কাটা হচ্ছে দেখলেই সে পালাত। যাই হোক, এই বলে বুক বাঁধলুম যে একটা মুরগি জবাই করবই—সকলকে দেখাব যে আমি পিছপাও নই। মুরগিটাকে আমি গোলা-ঘরে নিয়ে গেলুম। আমার হাতের মধ্যে সেটা ঝট্‌পট্ করতে লাগল, আর আশপাশের খড়গুলো রাঙা হয়ে উঠল। তারপর সে একেবারে স্থির। আমি সেটাকে রেখে দিলুম, —বিবিশ্ এসে তার পালক ছাড়াবে। কিন্তু বিবিশ্ ঘরের মধ্যে ঢুকেই খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল। দেখি-না মুরগিটা তখন দিব্যি মাটি ছেড়ে উঠে একেবারে ধানের ঝুড়ির মধ্যিখানে গিয়ে বসেচে। ভারি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সে টপ্-টপ্ টপ্-টপ্ করে খেয়ে যাচ্ছিল;—যেন আমার হাতে

তার যা জখম হয়েছে সেটা সে যত শীঘ্র পারে আরাম করে নিতে চায়। বিবিশ্‌ তাকে ধরে ফেল্লে এবং তার ছুরির ফলাটা যখন তার গলা পেঁচিয়ে চলে গেল তখন খড়গুলো আগের চেয়ে ঢের বেশি রাঙা হয়ে উঠল।

তুপুরবেলা ঘুমুতে না গিয়ে আমি বই পড়বার জন্যে সেই খুব্‌রি-ঘরটায় উঠে যেতুম। বইয়ের যেখানটা হোক খুলতুম এবং একই জায়গা যতবারই পড়ি না, একটা নূতনত্ব পেতুমই পেতুম। আমার এই বইখানিকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতুম। আমার কাছে সেখানি ছিল যেন একজন যুবা কয়েদীর মতন, যাকে রোজ লুকিয়ে আমি দেখতে আসি। আমার মনে হত তার গায়ে যেন রাজপুত্রের সাজ;—সেই কালো বরগার উপরে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে সে অপেক্ষা করে রয়েচে। একদিন সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে ভারি চমৎকার বেড়ানো হয়েছিল। বইখানা মুড়ে আমি কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। পাইন গাছগুলোর গায়ের সবুজের জেল্লা তখন বেশ কমে এসেছে। আকাশে সাদা মেঘের পুঞ্জ ঠেলে সূর্য্য চলেছেন;—মেঘের রাশ একবার টোল খেয়ে গিয়ে আবার ফুলে উঠছে—তুলো বা পালকের বস্তায় একটা ভারি জিনিষ গুঁজে দিলে যেমন হয়।

জানিনা কেমন করে হ'ল—হঠাৎ দেখি আমি উড়ে চলেছি—টেলিমেকসের সঙ্গে। সে আমার হাত ধরেছে; আমাদের মাথা ঠেকছে আকাশের যে নীল তাঁর গায়ে! টেলিমেকস কোনো কথা বলেনি, কিন্তু আমি বুঝলুম আমরা সূর্য্যের মধ্যে যাবার জন্যে উড়ে চলেছি। নীচে থেকে বুড়ি বিবিশ্‌ আমায় ডাকতে লাগল। অনেক দূর থেকে শব্দ আসছিল কিন্তু আমি তার গলার স্বর ঠিক বুঝতে পারছিলুম। আমার মনে হতে লাগল এত চেঁচাতে হচ্চে বলে সে ভারি রেগে উঠছে। কিন্তু সে-কথা আমি গ্রাহ্যই করলুম না। আমার চোখে আর-কিছু পড়ছিল না—কেবল দেখছিলুম, সূর্য্যের চারদিকে ঝক্‌ঝকে সাদা পালক থাক-থাক সাজানো;—তারা সবাই ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে আমাদের যাবার পথ করে দিচ্ছিল। হঠাৎ আমার হাতের উপর একটা থাব্‌ড়া লাগতেই আমি একেবারে হুস্‌ করে সেই খুবরী-ঘরটার মধ্যে এসে পড়লুম। বুড়ি বিবিশ্‌ জানলা থেকে আমায় টানতে লাগল, বলতে লাগল—"হয়েছে কি তোর! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরচি যে! কিছু না হ'ক বিশ বার চেঁচিয়েছি—খাবার খাবি, নেমে আয়!" কয়েকদিন পরে দেখি সেই বইখানি আমার একেবারে অন্তর্দ্ধান করেছে। কিন্তু যাক্‌! সেখানি তখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিল—যাকে আমি দিনরাত বুকের মধ্যে রেখে বেড়িয়েছি, যাকে কখনো ভুলতে পারব না।

(১৫)

ক্রিষ্টমাসের তুদিন আগে মাষ্টার সিল্‌ভ্যাঁ একটা শূয়োর কাটবার জন্যে সব ঠিক করতে লাগল। তুটো বড়-বড় ছুরি সান দেওয়া হল; টাট্‌কা খড় দিয়ে একটা বিছানার মতন তৈরি করা হলে সিল্‌ভ্যাঁ শূয়োরটাকে আনতে বল্লে। শূয়োরটা এমন

কাতরাতে লাগল যে আমার মনে হল সে নিশ্চয় টের পেয়েছে যে তার কপালে কি আছে। সিল্‌ভ্যাঁ তার পা-চারটে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে, তারপর মাটিতে পোঁতা একটা খোঁটার সঙ্গে তাকে বাঁধতে-বাঁধতে স্ত্রীকে বলতে লাগল—"ছুরি ত্নখানা লুকিয়ে ফেল পলিন! যেন দেখতে না পায়।" পলিন আমার হাতে একটা খোরা দিলে রক্ত ধরবার জন্যে; বল্লে, খুব সাবধানে ধরতে হবে, যেন এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে না পড়ে। শূয়োরটার কাছে চাষা এগিয়ে গেল—সে তখন মাটিতে চিৎ হয়ে পড়েছিল। একটা পায়ের হাঁটু মাটিতে গেড়ে সে তার সাম্‌নে গিয়ে বসল, এবং তার টুঁটিটা এক হাতে ধরে, আর-একটা হাত লুকিয়ে পিছন দিকে এগিয়ে দিলে—পলিন বড় ছুরিখানা সেই হাতে তুলে দিলে। সিল্‌ভ্যাঁ শূয়োরটার গলায় যেখানে আঙুল দিয়ে টিপ করে রেখেছিল, ছুরির ডগাটা সেই জায়গায় বসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে দিতে লাগল। ছোট ছেলেরা যেমন করে কাঁদে ঠিক তেমনি করে শূয়োরটা কেঁদে উঠল। ক্ষত স্থান থেকে এক-ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে একটা সরল রেখার মতন গড়িয়ে পড়ল;—ছুরি থেকে ছিট্‌কে ত্নফোঁটা রক্ত চাষার হাতের উপর এসে লাগল। ছুরিখানার বাঁট পর্য্যন্ত সমস্ত ফলাটা যখন ভিতরে চলে গেল তখন চাষা তার সমস্ত দেহের ভার তার উপর খানিক ক্ষণের জন্যে চাপিয়ে রাখলে; তার পর যেমন ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তেমনি ধীরে ধীরে ছুরিখানা বার করে আনলে। রক্তে রাঙা টক্‌-টক্‌ করছে সেই ছুরিখানা দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল—সমস্ত জিবখানা শুকিয়ে গেল। হাতের আঙুলগুলো একেবারে অবশ হয়ে খোরাখানা একদিকে কাৎ হয়ে পড়ল। সিল্‌ভ্যাঁ তা দেখতে পেলে। আমার মুখের দিকে একটা দৃষ্টি হেনে তার স্ত্রীকে বল্লে—"নাও, নাও, ওর হাত থেকে খোরাখানা তুলে নাও।" মুখ দিয়ে আমার কথা বার হলনা, কিন্তু আমি জোর দিয়ে ঘাড়-নেড়ে জানালুম—"না!" চাষার সেই দৃষ্টিতে আমার মনের সব দুর্ব্বলতা কেটে গিয়েছিল; আমি খোরাখানা খুব শক্ত করে ধরলুম – তার উপরে রক্তের স্রোত এসে পড়তে লাগল। যখন শূয়োরটা একেবারে স্থির হয়ে গেছে, তখন ইউজেন এসে দাঁড়াল। আমার হাতে রক্তের খোরা দেখে সে চমকে উঠল! আমি তখনো খুব সাবধানে খোরাখানা ধরে আছি—রক্তের শেষ-বিন্দুগুলি চোখের জলের মতন একটির পর একটি করে গড়িয়ে এসে পড়ছে। সে বল্লে—"তুমি সমস্তক্ষণ ঐ খোরাখানা ধরে ছিলে না কি!" চাষা উত্তর দিয়ে বল্লে—"হাঁ! ও তোমার মতন অমন প্যান্‌পেনে নয়!" ইউজেন বল্লে—"কথাটা ঠিক! সত্যি, আমি ঐ জানোয়ার জবাই করা সইতে পারি না।" সিল্‌ভ্যাঁ বলে উঠল—"যেমন তোমার বুদ্ধি! জানোয়ারগুলো হয়েছে কি করতে? কাঠ যেমন আমাদের আগুন দেবার জন্যে হয়েছে, জানোয়ারগুলোও তেমনি আমাদের পেট পোরাবার জন্যে!" ইউজেন তার মুখ ফিরিয়ে নিলে—যেন তার অন্তরের দুর্ব্বলতার জন্যে সে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার কাঁধ

দুটো ছিল পাতলা কিন্তু ঘাড়টা গোলগাল, পুরন্ত—মার্ত্তিনের মতন। সিল্‌ভ্যাঁ বলত সে দেখতে ঠিক তাদের মায়ের মতন—যেন তাঁর জীবন্ত ছবি!

ইউজেনকে আমি কখনো রাগতে দেখিনি। সে সমস্ত দিন আপনার মনে গুণ-গুণ সুরে গান গাইত। সন্ধ্যাবেলা একটা ষাঁড়ের পিঠে, পাশ-ফিরে বসে, সে মাঠ থেকে ফিরে আসত—এবং প্রায় প্রতিদিনই সে একই গান গাইত। গানটা ছিল একটা সেপাইয়ের কাহিনী নিয়ে তৈরি। যে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল, যখন শুনলে সে আর-একজনকে বিয়ে করেছে তখন সে যুদ্ধে চলে গেল। সেই গানের যেখানটা আভোগ ইউজেন সেইখানটা অনবরত গেয়ে যেত! তার শেষটা ছিল এই রকম:—

(যখন) ছর্‌রা ছুটে লাগবে,—আমার
জীবন যাবে চলে,
(সাধের) জীবন যাবে চলে।
জেনো আমি মলাম,—তুমি
পরের হলে বলে॥

পলিন ইউজেনের প্রতি বেশ একটা সম্ভ্রম রেখে চলত। সে অবাক হত আমি কেমন করে তার সঙ্গে এমন স্বাধীনভাবে মিশি। প্রথম যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বাইরের বেঞ্চিতে ঠিক তার পাশে বসি, পলিন ইসারা করে আমায় ভিতরে ডেকেছিল। কিন্তু ইউজেন তখনই আমায় ফিরে ডেকে বল্লে—"এস, এখানে বসে বুনো. পেঁচার ডাক শুনবে এস!" যখন সবাই শুতে যেত আমরা দুজনে প্রায়ই সেই বেঞ্চিটিতে চুপ করে বসে থাকতুম। পেঁচাটা দরজার পাশে একটা এল্‌ম্‌ গাছের খুব কাছে এসে বসত; আমাদের মনে হত সে যেন রাত্রের বিদায়-সম্ভাষণ আমাদের শোনাচ্ছে। তার পর সে উড়ে যেত; তার বড় বড় ডানা দুটো আমাদের মাথার উপর দিয়ে নিঃশব্দে বহে যেত। কখনো-কখনো পাহাড়ের ধার থেকে মানুষের গলার গানের সুর ভেসে আসত। শুনতে শুনতে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে থাকত। রাত্রের ভিতর থেকে ভরাট গলার সেই সুর এসে কোলেৎকে আমার মনে পড়িয়ে দিত। গান থামলেই ইউজেন উঠে দাঁড়াত—আমি চুপ করে বসে থাকতুম—আবার সেই গানের সুরটি এসে কখন্‌ কানে লাগবে! কিন্তু ইউজেন বলে উঠত—"উঠে এস—গান ত শেষ হয়ে গেল!"

(১৬)

শীত এসে পড়তে আমরা আর বাইরের সেই বেঞ্চিতে বসতে পারতুম না বলে আমাদের মধ্যে যেন কি-একটা গোপন বোঝা-পড়া হয়ে গেল। যখনই সে কাউকে নিয়ে মজা-ঠাট্টা করত, তার সেই ক্ষুদে ক্ষুদে অদ্ভুত চোখ-দুটি আমার দৃষ্টি খুঁজে বেড়াত এবং যখনই সে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করত, আমি তা অনুমোদন করচি কি না যেন তাই জানবার জন্যে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাত। আমার বোধ হত সে যেন আমার আজন্মপরিচিত; এবং আমার অন্তরের একেবারে ভিতরে তাকে আমার বড় ভাইটির মতন দেখতুম। সে সর্ব্বদাই পলিনকে জিজ্ঞাসা করত যে সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট কি না। পলিন উত্তরে বলত একই কথা বার-বার বলে লাভ

কি ? পলিন একটা বিষয়ে আমার ভারি খুঁত ধরত; সে বলত আমার কাজের একটা ছিরি নেই;—যখন যেমন মর্জ্জি তেমনি করে চলি। মারি এমেকে আমি ভুলি নি; কিন্তু তার জন্যে আগের মতন সেই মনের উদ্বেগ আর নেই। এখানে আমার কোনো দুঃখ ছিল না।

(১৭)

জুন মাস পড়তেই, যেমন প্রতি-বছর হয়, এ বছরও ভেড়ার লোম কাটতে লোক এসে হাজির হল। তারা একটা দুঃসংবাদ দিলে; বল্লে, এবার দেশময় কি হয়েছে, লোম ছাঁটা হতেই সব ভেড়া রোগে পড়ছে—এবং তাতে মরচে অনেক। মাষ্টার সিল্‌ভ্যাঁ তাই শুনে খুব সাবধান হল, কিন্তু যথাসাধ্য করেও কিছু হলনা,—বিস্তর ভেড়াকে রোগে ধরলে। একজন ডাক্তার বল্লে যদি নদীতে স্নান করানো হয় তাহলে অনেক ভেড়া বাঁচতে পারে। সিল্‌ভ্যাঁ এক-কোমর জলে নেমে একটি-একটি-করে ভেড়া নিয়ে ডুব দেওয়াতে লাগল। গরমে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল; কপাল থেকে ঘাম ঝরে বড়-বড় ফোঁটায় নদীতে পড়তে লাগল। সেই রাত্রে শুতে যাবার সময় তার একটু জ্বর হল—এবং পরের দিন ফুস্‌ফুসের প্রদাহে তার মৃত্যু হল। পলিন যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে তার কপালে এত-বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেচে। ইউজেন চোখে একটা আতঙ্কের অন্ধকার নিয়ে গোয়ালঘর এবং বাড়িময় কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

(১৮)

চায়া মারা যাবার ঠিক পরেই জমীদার আমাদের খোঁজ নিতে হাজির হল। শুকনো কাঠির মতন লোকটি—একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যদি-বা একটু স্থির হয়ে দাঁড়ায় ত সেটুকু সময়ও পা নাচাতে থাকে। দাড়িগোঁফ তার পরিষ্কার করে কামানো। নাম তার তিরাঁদ। সে একেবারে শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হল;—আমি সেখানে পলিনের কাছে বসেছিলুম। কাঁধ দুটো উঁচু করে তুলে সমস্ত ঘরময় সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পর খোকার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—"ওটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও; গিন্নীর সঙ্গে আমার কথা আছে।" আমি উঠে উঠোনে চলে গেলুম—এবং থেকে-থেকে এক একবার জানলার কাছ-দিয়ে ঘুরে যেতে লাগলুম। দেখলুম, পলিন তার চৌকি ছেড়ে ওঠেনি। হাত-দুটো তার হাঁটুর উপরে পড়ে আছে; মাথাটা সাম্‌নের দিকে সে খুব ঝুঁকিয়ে দিয়েছে—যেন কি-একটা শক্ত জিনিষ বোঝবার চেষ্টা করচে। তিরাঁদ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই কথা বলে যাচ্ছিল। এবং ঘরের একধার থেকে আর-একধার পর্য্যন্ত অনবরত পায়চারি করছিল—টালির মেঝে থেকে তার পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ উঠে তার ভাঙা গলার আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। যেমন ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করেছিল তেমনি বেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করে পলিনকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ও কি বলে গেল ?" সে আমার হাত থেকে খোকাকে কোলে তুলে নিলে এবং কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, তিরাঁদ বলে গেল আমাদের কাছ থেকে গোলাবাড়িটা

কেড়ে নিয়ে তার ছেলেকে দেবে ;—তার ছেলে সম্প্রতি বিয়ে করেছে।

সেই সপ্তাহের শেষে তিরঁাদ তার ছেলে, বৌ নিয়ে ফের এল। প্রথমে তারা বার-বাড়িগুলো সব দেখলে, তারপরে ভিতরে প্রবেশ করবার সময় আমার সাম্‌নে এক-মিনিট দাঁড়িয়ে বল্লে যে তার বৌমা আমাকে দাসী রাখবে ঠিক করেচে। পলিন এ-কথা শুনতে পেয়ে আমার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। কিন্তু ঠিক সেই সময় ইউজেন হাতে করে একগাদা কাগজপত্র এনে ফেল্‌তে সবাই টেবিলের চারদিকে বসে পড়ল। সবাই যখন সেই সব কাগজ পড়তে ব্যস্ত আমি তিরঁাদের বৌমাকে একবার দেখে নিলুম। শ্যামলা রঙের প্রকাণ্ড মেয়ে মানুষ,—বড় বড় চোখ—সর্ব্বদাই একটা বিরক্তির ভাব মাখানো। স্বামীর সঙ্গে সে গোলাবাড়ি থেকে চলে গেল—আমার দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। যখন তাদের গাড়িখানা গাছের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পলিন ইউজেনকে ডেকে তিরঁাদ আমায় যা বলেছে তাই শুনিয়ে দিলে। ইউজেনের চেহারা দেখে বোধ হল সে ভারি রেগে উঠেছে; কথার স্বর তার সম্পূর্ণ বদলে গেল। সে বলতে লাগল, আমি যেন ঐ লোকগুলোর একটা আসবাবের মধ্যে গণ্য—যেমন ওদের খুসি তেমনি আমার বিলি হবে! পলিন আমার জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগল; ইউজেন সেই সময় বল্লে যে ঐ তিরঁাদের কথাতেই সিল্‌ভ্যাঁ আমাকে এখানকার কাজে ভর্ত্তি করে নেয়। সে-সময় আমায় রুগ্ন দেখে আমার জন্যে সিল্‌ভ্যাঁর যে ভাবনার অন্ত ছিল না, সে-কথা সে পলিনের মনে পড়িয়ে দিতে লাগল; তার পর, তারা যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারচে না বলে একটা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমরা তিনজনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলুম। পলিনের দুঃখকাতর দৃষ্টির একটা স্পর্শ আমার মাথার উপরে আমি অনুভব করছিলুম; ইউজেনের কণ্ঠস্বর গম্ভীর একটি স্তোত্র-গাওয়ার মতন আমার কানে এসে লাগছিল। গ্রীষ্মের শেষেই পলিন চলে যাবে ঠিক হল।

বাড়িতে যত সব ছেঁড়াখোড়া কাপড়-চোপড় ছিল আমি তাই নিয়ে পড়লুম,—রোজ সমস্ত দিন বসে সেই সব সেলাই করতে লাগলুম—একটিও ছেঁড়া কাপড় যেন পলিনকে না নিয়ে যেতে হয়। বন্ জিস্তিনের কাছ থেকে যেমন শিখেছিলুম রিপুকর্ম্মের ছুঁচ নিয়ে প্রাণপণে তেমনি সেলাই করতে লাগলুম। এবং প্রত্যেক কাপড়ের টুকরো যতদূর পারি পরিস্কার করে পাট করে রাখতে লাগলুম।

সন্ধ্যাবেলা দেখলুম ইউজেন দরজার পাশে সেই বেঞ্চিটিতে গিয়ে বসেছে। খোঁয়াড়ের ছাদের উপর তখন জ্যোৎস্না যেন ঢেলে দিয়েছে। গোবরগাদার ঠিক উপরে একটুকরো সাদা মেঘ ভাসছিল—দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি জরীর ঢাকা! চারিদিক নিস্তব্ধ—কোথা থেকেও কোনো শব্দ আসছিল না; পলিন তার খোকাকে দোল্‌নায় শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল, তার থেকে কেবল একটা কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ শব্দ উঠছিল।

শস্য যখন সব ঘরে তোলা হল, ইউজেন যাত্রার আয়োজন করতে আরম্ভ করলে। রাখালটা গোরুর পাল নিয়ে চলে গেল, বুড়ি বিবিশ্ পাখী-পাখালিগুলোকে তাদের আস্তানা থেকে বার করে গোরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ি একেবারে শূন্য; রইল কেবল দুটি সাদা ষাঁড়। ইউজেন নিজে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—আর-কারুর কাছে দিয়ে তার বিশ্বাস নেই। পলিন ও খোকা যে গাড়িতে যাবে তারই পিছনে সে দুটোকে বেঁধে দেওয়া হল। খোকা একটা খড়-ভরা চুবড়ির মধ্যে অগাধে নিদ্রা যাচ্ছিল, ইউজেন তাকে না জাগিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িতে তুলে দিলে। পলিন তার গায়ে একখানা শাল চাপা দিয়ে, বাড়ির দিকে একবার ক্রসের চিহ্ন করলে, তার পর ঘোড়ার লাগামটা হাতে তুলে নিলে। গাড়ি চেস্‌নাট-গাছের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

আমি সঙ্গ নিলুম—বড়-রাস্তা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে। ষাঁড় দুটোর পিছনে, ইউজেন ও মার্ত্তিনের মাঝখানে থেকে আমি চলতে লাগলুম। থেকে-থেকে ষাঁড় দুটোর পিঠে ইউজেন একএকবার আদরের থাবড়া দিচ্ছিল। অনেকটা রাস্তা যখন এগিয়ে গেছি, পলিন দেখলে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সে ঘোড়া থামিয়ে নিলে। আমি গাড়ির পাদানে উঠে তাকে একটি চুমু দিয়ে বিদায় নিলুম। সে করুণ স্বরে বল্লে—"ভগবান তোমার ভালো করুন—তুমি লক্ষ্মীটি হয়ে থেকো, বুঝলে।" তার পর তার গলার স্বর কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। সে বলতে লাগল—"আজ যদি আমার স্বামী বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কখনো এমন করে তোমায় ত্যাগ করতেন না।" মার্ত্তিন হাসি-মাখা মুখে আমাকে চুমু দিলে; বল্লে—"আবার আমাদের দেখা হবে।" ইউজেন তার মাথার টুপি তুলে খানিকক্ষণ আমার হাত ধরে রইল, ধীরে ধীরে বল্লে—"বিদায় বন্ধু বিদায়!—তোমায় কখনো ভুলত পারব না!"

আমি কিছু দূর ফিরে গিয়ে আবার তাদের দেখবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালুম। তখন অনেকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে—কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছিল ইউজেন ও মার্ত্তিন হাত-ধরাধরি করে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আর্টের উপকারিতা

রোঁদা ও তাঁহার দুইজন শিষ্যের সঙ্গে পল এক হোটেলে গিয়া ঢুকিলেন। শিষ্য দুইজনের নাম Bourdelle ও Despiau। শিল্পজগতে এঁরা আপনাদের নাম বেশ জাহির করিয়া তুলিয়াছেন।

Bourdelle-এর দিকে একথালা খাবার

আগাইয়া দিয়া, তাঁহাকে চটাইবার মতলবে Despiau বলিলেন, "খাও হে, খাও! কিন্তু তোমাকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়;—কেননা, তুমি হচ্ছ আর্টিষ্ট—কারুর কোন কাজে আস না!"

Bourdelle উত্তর দিলেন, "নিজের পাতেও তুমি যখন খাবারের ভাগ কিছু কম নাও নাই, তখন আমি তোমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলাম।" বেশ খুসী হইয়া তিনি কথাগুলি আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু বিষাদের একটা ক্ষণিক ভাবে ক্রমেই তাঁহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে ভাব গোপন না করিয়াই তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করিব না। সত্য বটে, আমরা—শিল্পীরা একেবারে অপদার্থ। আমার বাবার দিন-গুজরাণ হইত পাথর কাটিয়া। তাঁহাকে স্মরণ করিলেই কিন্তু মনে হয় সমাজে তাঁহার মত কারিকরেরও দরকার আছে; কারণ, তিনি তবু ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর মালমসলা যোগাইতেন; কিন্তু আমি– আমরা সমাজের কোন্ কাজে লাগিতে পারি? আমরা হচ্ছি বাজীকর, প্রতারক, স্বপ্নদর্শী,—হাটে দাঁড়াইয়া আমরা পাঁচজনকে একটু হাসাইতেছি, একটু মজা দেখাইতেছি—এইমাত্র! আমাদের চেষ্টা কাহারও চিত্ত স্পর্শ করে না—খুব কম লোকেই তা বুঝিবার শক্তি রাখে। বলিতে পারি না, যথার্থই আমরা সকলের দয়াপাত্র হইবার উপযুক্ত কিনা! কেননা, আমরা থাকি আর না থাকি, তবে পৃথিবী আপনপথে যেমন চলিতেছে ঠিক তেমনিই চলিবে—তাহার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।"

* * *

রোঁদা স্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন, "Bourdelle যা বলিলেন, সে যে তাঁর যথার্থ প্রাণের কথা, আমি তা মনে করি না। আমার নিজের মত, এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার বিশ্বাস, মনুষ্য-সমাজের মধ্যে কলাবিদই সকলের চেয়ে উপকারী।"

Bourdelle হাসিয়া কহিলেন, "স্বকর্ম্ম-প্রীতিতে আপনি অন্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।"

—"একেবারেই নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াই আমি আমার মতগঠন করিয়াছি। আচ্ছা, তবে শোন।

সবপ্রথমে একটি কথা আছে। তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আধুনিক সমাজে একমাত্র কলাবিদেরাই কাজ করিয়া আমোদ পান?"

Bourdelle উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়! কার্য্যই আমাদের আনন্দ……আমাদের জীবন……কিন্তু তাতে এ বুঝায় না ত যে……"

—"চুপ, আগে শোন। আমি দেখিয়াছি, একালে অন্য-অন্য কাজের কাজীরা আপনাদের কাজে আর আমোদ পান না। তাঁরা কাজ করেন, দায়ে ঠেকিয়া। কাজ যেন তাঁদের বোঝা, সে বোঝা কোনমতে ঘাড় থেকে নামাইতে পারিলেই তাঁরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বর্ত্তাইয়া যান। একালের রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহাদের সেকালের সমকর্ম্মীদের মত দেশের কাজ করিয়া আর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন না—তাঁহাদের অভিপ্রায় স্বধু স্বার্থসিদ্ধি।—

সমাজের আগা-গোড়া এখন এই দোষে দুষ্ট। ব্যবসায়ীরা সততা ভুলিয়াছেন,—তাঁরা নকলকে আসল বলিয়া চালাইয়া দু-পয়সা বেশী রোজগার করিতে চান। কারিকরেরা, মনিবের প্রতি অসন্তুষ্ট, তারা খালি ফাঁকি দিবার ফিকিরে থাকে। যেদিকেই তাকাই, সেইদিকেই দেখি, কাজ যেন-একটা বিষম বালাই, একটা ঘৃণিত দাসত্ব হইয়া উঠিয়াছে—কাজ যেন আর জীবনের হেতু, সুখ-সোয়াস্তির মূল নহে। কিন্তু সেকালের ধারা ছিল স্বতন্ত্র।

কার্য্যকে কেবল জীবিকারূপে না দেখিয়া, কার্য্যকে আমরা যদি কার্য্যরূপেই গ্রহণ করিতে পারি, তাহাহইলে সমাজের কতটা মঙ্গল!—কিন্তু, এরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তন যদি সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যমাত্রকেই শিল্পীর পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতে হইবে—কিংবা, শিল্পী হইতে হইবে। কেননা, আমার মতে, 'আর্টিষ্ট' কথাটির প্রশস্ত অর্থ হচ্ছে এই:—**কাজে যিনি সুখী।** সুতরাং, সকল ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীকেই আর্টিষ্ট হইতে হইবে। তাহাহইলে যে নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা দেখিব, তাহা যেমন নিখুঁত, তেমনি সুন্দর।

দেখ, আর্টিষ্টের আদর্শ কি মহান, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে পৃথিবীর কি উপকার!"

* * *

পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার যে মতপ্রতিষ্ঠা করিবার চমৎকার শক্তি আছে, আমরা তা স্বীকার করি; কিন্তু আর্টিষ্টের উপকারিতা দেখাইয়া কিছু লাভ আছে কি? অবশ্য, কলাবিদের কর্ম্মানুরক্তি একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করিতে পারে। তবু, তাঁহাদের কাজ মূলত অকেজো নয় কি? আর, অকেজো বলিয়াই ত শিল্পকর্ম্মের মূল্য বেশী!"

—"তোমার কথার মানে কি?"

—"আমি বলিতেছি, আর্ট যে আমাদের নিত্যকার দরকারে লাগে না—অর্থাৎ, যে-সবের জন্য আমরা অশন-বসন-ভবন পাই, যে-সবের জন্য আমরা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করি, আর্ট যে সে-সবের মধ্যে গণ্য নয়—এ অতি সুখের কথা। আর্ট আমাদিগকে কর্ম্মজীবনের কঠোর দাসত্ব হইতে মুক্ত করে এবং আমাদের সম্মুখে এক মায়াসম্ভব ধ্যান ও স্বপ্নরাজ্যের সিংহদ্বার খুলিয়া দেয়।"

—"আসল কথা কি-জান বন্ধু? কি যে দরকারী আর কি যে নয়, তা নিয়া প্রায়ই আমরা ভুল করি। সত্য বটে, যাহা-কিছু আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে সাহায্য করে, তাহাই আমরা দরকারী বলি। কিন্তু, তা-ছাড়া হীরা-জহরতও বিশেষ-কোন কাজে না লাগিলেও আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়—অধিকন্তু, এগুলি শুধু অকেজো নহে—কদর্য্যও বটে।

কি-জান; আমার মতে **যাহা-কিছু সুখকর, তাহাই কার্য্যকরী।** আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে ধ্যান ও স্বপ্নের ছবি আমাদিগকে যতটা খুসী করিতে পারে, দুনিয়ার আর-কিছুই ততটা পারে কি? না, তা পারে না। এখন আমরা এই সত্যটি ভুলিতে বসিয়াছি।

প্রতিদৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকে যে অপূর্ব্ব বিচিত্রতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যিনি তাহা যথার্থ ভাবে উপভোগ করিতে পারেন; চতুর্দ্দিকে সবল-শোভন যৌবনের যে শক্তি-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা দেখিয়া যাঁহার হৃদয় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া যায়; জীবন্তযন্ত্রবৎ ঐ-সব আশ্চর্য্য জীবজন্তুর নমনশীল দেহের গতিভঙ্গি, তাহাদের মাংসপেশীর মোহনলীলা যিনি দেখিতে পারেন, দেখিতে জানেন; শৈল-শিখরে, গিরি-উপত্যকায়—শ্যামল বসন্ত যেখানে সুগন্ধের তরঙ্গে, মধুপের গুঞ্জরণে, বিহঙ্গের প্রেম-সঙ্গীতে পুষ্পোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে যিনি আনন্দকে মূর্ত্তিমান দেখেন; নদ-নদীর বুকে রূপালী লহরীমালা ছুটাছুটি-খেলা খেলিতে-খেলিতে যখন কৌতুক-হাস্যে মুখর হইয়া পড়ে, তখন যাঁহার অন্তর নন্দিত হইয়া উঠে—এ পৃথিবীতে তিনি নরদেবতা। এ মরজগতে তাঁর চেয়ে কে বেশী ভাগ্যবান?

আর্ট, আমাদিগকে এই সুখের শিক্ষা দেয়। অতএব, আর্ট যে অপরিহার্য্য, আর্ট যে উপকারী, এ-কথা কে অস্বীকার করিবে? এ যে শুধু মানস-আনন্দ, তা নয়;—ততোধিক আরো-কিছু।

আর্ট আমাদিগকে জীবনের অর্থ বুঝাইয়া দেয়, অদৃষ্টসম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞানদান করে, এবং ধ্রুবপন্থা নির্দ্দেশ করে।

কলাবিদেরা, চিত্রে-ভাস্কর্য্যে আমাদের জাতীয় আত্মার প্রতিধ্বনি জাগ্রৎ করেন। তাঁহাদের কেহ দেখান নিয়ম, কেহ দেখান শক্তি, কেহ দেখান সৌন্দর্য্য, কেহ দেখান কৌতুক-সরসতা, কেহ দেখান বীরত্ব-গরিমা; —উপরন্তু, সকলেই দেখান জীবন ও স্বাধীন গতির মহান আনন্দ।

স্বদেশবাসীর প্রাণে-প্রাণে কলাবিদেরা জাতীয় বিশেষত্বজ্ঞাপক গুণগুলিকে সজীব করিয়া রাখেন।

আমাদের কালে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, সেই Puvis de Chavannesকে স্মরণ কর। যাহার জন্য আমরা সকলে আকুল হইয়া আছি, তিনি কি সেই চিরকাম্য শান্তির প্রসাদে আমাদের তপ্ত চিত্তকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলেন নাই? তাঁহার অঙ্কিত নিসর্গ-পটগুলিতে,—যেখানে প্রকৃতি-মাতা, প্রেমিক, সরল, মহান মানবতাকে যেন বুকের উপর টানিয়া লইয়াছেন—আমরা কি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করি না? এই অতুলনীয় প্রতিভা সমস্ত রসের বিকাশসাধন করিয়াছে—মহৎ ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ, দুর্ব্বলে দয়া, কর্ম্মে অনুরাগ, এ-সমস্তই তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের যুগ এই প্রতিভার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। Chavannes-এর অঙ্কিত "ভিক্টর হুগোর সম্মান" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনাকে যেন মহৎ কার্য্যসাধনে উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

ললিতকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি খুব অল্প লোকেই উপভোগ করিতে পারে। সেগুলিকে মুক্তজনতার মধ্যে আনিয়া রাখিলেও দু-চারজনের বেশী সমঝদার মিলিবে না। কিন্তু, তাহাতে যে-সকল সৎ ভাব মূর্ত্তিমন্ত হয় পরিণামে তাহারা আবাল-বৃদ্ধবনিতার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলে। প্রতিভাবানদের পরে নিম্নশ্রেণীর অনেক

শক্তিমান লোক থাকেন, ওস্তাদদের ভাব ও কল্পনাকে তাঁহারা সরল ও জনপ্রিয় করিয়া আনেন। লেখকের উপরে শিল্পীর প্রভাব পড়ে, শিল্পীর উপরে লেখকের প্রভাব পড়ে; প্রত্যেক যুগের সকল মানুষের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান চলে—সাময়িক-পত্রলেখক, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও শিল্পী প্রভৃতি সকলেই, সমকালের মহাপ্রতিভাবানদের দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যের বীজ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। এ-যেন এক আধ্যাত্মিক স্রোতের বিপুল ধারা—প্রপাতের সহস্রধারার মত প্রথমে নানামুখে বহিয়া, পরিণামে তাহা এক হইয়া যে বিশাল নদের সৃষ্টি করে—তাহাতে এক-এক যুগের সমগ্র মানসচ্ছবির অখণ্ড প্রতিচ্ছায়া পড়ে।

কেহ-কেহ বলেন, শিল্পীরা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক ভাব ও কল্পনাকেই আকারদান করেন। ইহা ভ্রম। তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা ভেদ করে। তাঁহারা স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক। Chardin ও Grewze রাজতন্ত্রের মধ্যে জীবন কাটাইয়াও ভবিষ্য প্রজাতন্ত্রের আভাস দিয়াছিলেন। Courbet ও Millet, Second Empireএর সময়ে জনসাধারণের যে দুঃখদারিদ্র্য ও মহত্ব দেখাইয়াছিলেন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। Poussin ও Watteau প্রভৃতি চিত্রকরের কার্য্যেও ভবিষ্যতের এমনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আমি এ-কথা বলিতে চাই না যে, ঐ-সকল শিল্পী এ-সব স্রোতঃধারা নিয়মিত ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার বক্তব্য, যে-জন্য তাহা আকার পাইয়াছিল, তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে সে-পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। লেখক, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিকের সঙ্গে শিল্পীও এখানে যোগ দিয়াছেন,—ইঁহাদের একীকৃত চেষ্টার ফলেই ভবিষ্যতের যুগধর্ম্ম বিকসিত হইয়াছিল।

শিল্পীরা যে নূতন ভাব ও নূতন মতি-গতির সৃষ্টি করেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে। তাঁহারা প্রায়ই জনসাধারণের সহিত সহজে পরিচিত হইবার সুযোগ পান না। এজন্য তাঁহাদের অনেককেই জীবনভোর চেষ্টা করিতে হইয়াছে। যাঁহার যত-বেশী প্রতিভা তিনি তত-বেশী দিন দুর্ব্বোধ হইয়া থাকিয়াছেন। Corot, Courbet, Millet ও Puvis de Chavannes প্রভৃতি প্রতিভাধর কলাবিদ যখন যশের মুকুট পাইয়াছিলেন —তখন তাঁহাদের জীবনের সন্ধ্যাকাল।

বন্ধুগণ, কলাবিদের উপকারিতা-সম্বন্ধে ইহাই আমার বক্তব্য।"

* *
*

রোঁদার চমৎকার যুক্তি শুনিয়া সকলের সমস্ত সন্দেহভঞ্জন হইল।

খানিকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না, একাগ্রভাবে রোঁদার কথাগুলি মনে-মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

ওস্তাদ-শিল্পীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলিবার সময়ে বিনয়ী রোঁদা আপন শক্তি-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই; সে অসম্পূর্ণতাটুকু পূরাইয়া লইবার জন্য পল বলিলেন, "আচার্য্য, বিদ্যমান যুগের উপরে আপনার প্রতিভা

চ্যুত কমল

ভুজবন্দিনী বিদ্যাধরী

হুগোর প্রতি সম্মান (শাভান-অঙ্কিত)

তরুণী জননী

যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় তাহার কাজ চলিতে থাকিবে।

অন্তঃপ্রকৃতির সত্যকে এমন গভীরভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক জীবনের ক্রমবিকাশলাভের পক্ষে আপনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের মানস-ভাব, স্নেহমমতা, কল্পনা-জল্পনা ও আবেগ-উত্তেজনার মূল্য যে কতটা বেশী করিয়া জানি, আপনি তাহা দেখাইয়াছেন। প্রেমের মাদকতা, বিচিত্র কল্পনা, উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা, ধ্যানের ঐকান্তিকতা, আশার চঞ্চলতা—এ-সমস্তকেই আপনি মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিবেকের গূঢ় মর্ম্মদেশটি তন্ন-তন্ন ভাবে পরখ করিয়া, তাহার বিশালতর রূপটি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা যে যুগের লোক, এ-যুগে আমাদের কাছে আপন ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতি ছাড়া বহুমূল্য আর কিছুই যে নাই, এ সত্যও আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনি আরও দেখিয়াছেন যে, আমাদের প্রত্যেকেই —কি চিন্তাশীল, কি কর্ম্মশীল, কি জননী, কি কন্যা আর কি প্রেমিক — আপন-আপন আত্মাকেই বিশ্বের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ, আমাদের এই স্বভাবসম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অচেতন ছিলাম; কিন্তু আপনার সূক্ষ্মদৃষ্টি আমাদের নিকটে তাহাও প্রকাশ করিয়াছে।

চিত্রকর শাভান (Chavannes)

ভিক্টর হুগো তাঁহার কাব্যে সংসারের লুকানো সুখ-দুঃখের যে-সব উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে কোথাও দেখি খোকার দোলনা দোলাইয়া মা ঘুম-পাড়ানিয়া গান ধরিয়াছেন, কোথাও

দেখি পুত্রের সমাধির উপরে পিতা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, কোথাও দেখি প্রেমিক আপন সুখস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া আছে। আপনিও পাথরের উপরে মানবাত্মার সুগভীর, সুগোপন ভাবাবেগ পরতে-পরতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাচীন সমাজের উপর দিয়া ব্যক্তিত্বের যে খরস্রোত প্রবহমান, ক্রমে-ক্রমে তাহা যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহা-শিল্পী ও মহা-চিন্তাশীলগণ, মানবকে এই শিক্ষাই দেন যে, সে-যেন আত্মমধ্যেই আত্মসীমা নির্দ্দেশ করিতে এবং কেবল আপন বিবেকই সম্বল করিয়া জীবন-পথে চলিতে সক্ষম হয়। যে-সকল অত্যাচার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে কণ্টক হয়, যে সামাজিক ভেদ-জ্ঞানে সবলের কাছে দুর্ব্বল, ধনীর কাছে দরিদ্র, পুরুষের কাছে রমণী দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়,—ভবিষ্যতে মানবতা যখন আপন চরমে গিয়া পৌঁছিবে, তখন সে অত্যাচার, সে ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আশ্চর্য্য! অকপট শিল্পমন্ত্রে এই নব-জাগরণের বাণী ফুটাইবার জন্য আপনি সাধনা করিয়া আসিয়াছেন।"

ঈষৎ হাস্যের সহিত রোঁদা উত্তর দিলেন, "বর্ত্তমান চিন্তা-রাজ্যের ধুরন্ধরগণের সঙ্গে আমাকে এতটা উচ্চাসন দিবার কারণ হচ্ছে আমার সঙ্গে তোমার একান্ত বন্ধুত্ব! তবে, এটা সত্য বটে যে, এ বিশ্বে মানব বা যাহা-কিছু আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে আসে, তাহাদিগকে যথার্থ আকার দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি।"

পার্থিবতায় বন্দী

একটু থামিয়াই রোঁদা আবার বলিলেন, "কলাবিদের উপকারিতা বুঝাইতে গিয়া আমি যদি কিছু জেদ জাহির করিয়া থাকি, তবে তাহা অকারণ নয়, জানিও; কেননা এ সম্বন্ধে স্থিরভাবে চিন্তা না করিলে আমাদের মনে পড়িবে না যে, এ পৃথিবীর সহানুভূতি যথার্থই আমাদের প্রাপ্য। একালে স্বার্থ-চিন্তা প্রত্যেককেই গ্রাস করিয়াছে; আমি দেখিতে

চাই, এই স্বার্থান্ধ সমাজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইঞ্জিনীয়ার বা ব্যবসাদারকে উচ্চাসন দিলে যতটুকু উপকার, কলাবিদের প্রতি সম্মান দেখাইলেও তাহার ঠিক ততটুকুই উপকার!"

সমাপ্ত

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী

সাহিত্যে অশ্লীলতা

অশ্লীলতা জিনিষটা ভালো নয় এ কথা ঠিক কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের একদল লোক যেখানে-সেখানে কুরুচি দেখচেন। আসল অশ্লীলতা বলে কাকে, তা যে তাঁরা তলিয়ে দেখচেন এমন মনে হয় না। এঁরা যা অশ্লীল বলচেন তা মানতে হলে বিশ্বসাহিত্যকে চণ্ডালের হাত দিয়ে পোড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাহলে (মোপাসা, ব্যালয্যাক্ ও জোলা ত দাগী—তাঁদের কথা নেই বা তুল্‌লুম) সেক্‌সপিয়ার, কালিদাস, বাইরণ, ইব্‌সেন, ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, জয়দেব, ফ্লবেয়ার, জ্যুদারমান, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণার্ড স, দোদে, গটিয়ের, ম্যাক্সিম গোর্কি, গিরিশ ঘোষ ও দীনবন্ধু প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সাহিত্য-ধুরন্ধরেরা নরকের অন্ধকারে যেতে বাধ্য; এমন-কি রামায়ণ ও মহাভারতেরও সুগতি হয় না। জগতে এমন সাহিত্য দুর্ল্লভ, কোমর বেঁধে বসলে, যা থেকে কুরুচি বার করা না যায়। কিন্তু সেগুলি যে কুরুচি বলেই মানুষ আদর করে এসেছে তা ত নয়। সেখানে মানুষ কুরুচিকে ছাড়িয়েও এমন-কিছু পেয়েছে যাকে সে অমূল্য সম্পদ বলে মেনে নিয়েছে। মানুষের দেহে কদর্য্যতা বড় কম নেই, কিন্তু সেই কদর্য্যতাকেও অতিক্রম করে এমন একটা সৌন্দর্য্য আছে যার জন্যে মানুষকে মানুষ বরদাস্ত করতে পারে। মানুষের দেহকে খুঁটিয়ে দেখলে তার কুশ্রীর অন্ত থাকে না; কিন্তু তার সমগ্র রূপের মধ্যে একটি শ্রী-ছাঁদ আছে। এই সমগ্রতার শ্রী নিয়েই তার বিচার হয়। যেখানে সমগ্রতা থেকে কেবলই কদর্য্য রূপ ফুটে ওঠে, সেখানে অবশ্য তাকে কদর্য্য বলতেই হবে। সাহিত্যেও তাই। তুমি যদি তার সমগ্র রূপ না দেখে তার খণ্ড রূপের মধ্যে কদর্য্যতা খুঁটে বার করে বল, এ কদর্য্য, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, তোমার দেখবার শক্তি নেই বলেই তুমি কেবল কদর্য্যকে দেখচ। এই সমগ্রের দিকে দৃষ্টি না থাকার দরুন অনেক সময় আমরা গোড়ায় গলদ করে বসি। অশ্লীলতা সাহিত্যে স্থান পাবে না—এ ঠিক, কিন্তু কোন্‌টা বাস্তবিক অশ্লীল আগে সেটা জানা চাই। অশ্লীলতার কয়েকটা সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সেই জন্যে তার একটু আদল দেখলেই আমরা আঁৎকে উঠি, অথচ সেই অশ্লীলতার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তা ভেবে দেখি না।

কিন্তু এই তাৎপর্য্য দিয়েই আসল

অশ্লীলতাকে ধরা যায়। নইলে জগতে কিছুই অশ্লীল নয় এ বলে খুব তর্ক করা চলে। জিনিষ তখনই সত্য অশ্লীল যখন অশ্লীলতায় তার পর্য্যবসান। যে সাহিত্য অশ্লীলতার মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েও অশ্লীলতাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাকে কখনই অশ্লীল বলতে পারি না। অনেকে বলবেন, সাহিত্যে অশ্লীলতার আমোল একেবারে না-দেওয়াই উচিত। কিন্তু তথাকথিত অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য যে গড়ে উঠতে পারচে না এটাও স্পষ্ট দেখচি। কারণ, যাকে অশ্লীলতা বলা হচ্ছে তা মানুষের জীবনের সঙ্গে এমন আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে, মানুষ আঁকতে গেলেই তার আনুষঙ্গিক কদর্য্যতা এসে পড়ে—নইলে মানুষ আঁকাই দুষ্কর। মানুষের সব দোষ বাদ দিয়ে কেবল তার গুণ নিয়ে যদি মানুষ আঁকো তবে বলতেই হবে—সে আর যাই হোক মানুষ নয়। মানুষের মধ্যে এই অশ্লীলতা আছে বলে তার সর্ব্বস্বই যে অশ্লীলতায় ভরা, তাও নয়, সেই জন্যে এই অশ্লীলতাকে বর্জ্জন করে নয়—এই অশ্লীলতাকে রেখেও সাহিত্য শ্রী-সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, তার সমগ্র রূপের ভিতর থেকে জ্যোতির আভা ফুটে বেরিয়েছে। যাঁরা সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন তাঁদের মনের সামনে ঐ সমগ্র রূপের দিব্য জ্যোতি জাজ্বল্যমান হয়ে থাকে বলে তাঁদের মন খণ্ড রূপের অশ্লীলতায় বাধে না—তাঁরা নির্ভীক হৃদয়ে সমগ্রতার স্ফূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হয়ে যান।

আর তাছাড়া মানুষের ভিতরকার এই কদর্য্যতাকে বাইরে আনবার কি কোনো দরকার নেই ?

আধুনিক জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জুদারমানের "The song of songs' নামে উপন্যাসখানির প্রকাশ বন্ধ করবার জন্যে বিলাতে যখন আন্দোলন উঠেছিল, বার্নার্ড স তখন বলেছিলেন—

"It (জুদারমানের নভেল) is full of vivid character-sketches which not only amuse us as we read but give us a whole social atmosphere to reflect on. If the reflections are bitter and even terrifying, serve us right ; it is not Sudermann's business to keep us in a fool's paradise. The suppression of this book would not only be a deliberate protection of vice—which is always best served by turning off the light—but the reduction of every English adult to the condition of a child under tutelage. But even if the book were as false and mischievous as any of the romances which make the same theme agreeable and seductive I should object to its suppression all the same. No harm that the worst book could possibly do even if people could be forced to read it against their wills could be as great as the intellect-

ual suffocation of the whole nation which a censorship effects."

*
* *

সমালোচনা ও সপেনহয়র

আজকাল দেখা যাচ্ছে বাঙ্গলাসাহিত্যে যে-সে যা-খুসী-তাই সমালোচনা লিখতে বসেছেন। আমাদের সাহিত্যে যাঁরা বিরাট শক্তিশালী তাঁদের প্রতিভাকেও যা-তা বলে খর্ব্ব করতে এইসকল সমালোচকের হাত এতটুকু কাঁপে না। ঐরকম প্রতিভার সামনে মাথা যেখানে আপনি নীচু হয়ে আসে, সেখানে দেখি মূর্খতায় অসমসাহসিক সমালোচক বুক-ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দেখে এই কথা মনে হয় যে যেখানকার মাটি মাড়াতে 'এঞ্জেল'রা ইতস্তত করেন সেখানে 'ফুল্'এর দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। এ ব্যাপার যে সুধু আমাদের দেশেই ঘটেছে তা নয়—সব-দেশেই এমনতর লোক আছে। কিন্তু সে-সব দেশে এতদিনের সাহিত্য-সমালোচনায়, সমালোচনার একটা standard দাঁড়িয়ে গেছে—যার নীচে তা আর নামে না। কিন্তু আমাদের এখানে প্রায়ই কোন standardকেই মানা হয় না। সমালোচনার যা গোড়ার কথা তা যে অনেকের জানা নেই, তা তাঁদের লেখা থেকেই বুঝতে দেরী লাগে না। সকলকে বিচার করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে—সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে চায় না; কিন্তু এই বিচারের সময় কতকগুলো জিনিষকে মান্‌তে হয় যা না-মানলে বিচার করাই হয় না। সেই জন্যে বিচারের একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। সে রীতিকে ছেঁটে দিলে তোমার বিচার মান্‌তে কেউ বাধ্য নয়। তুমি যদি বিচার করতে চাও তোমার বিচার-রীতি জানা দরকার। নয়ত যা-খুসী বলে কেবল গাল পাড়লে এবং চীৎকার করলে তোমার বুদ্ধির বিকারের পরিচয় পাওয়া যাবে—বিচারের নয়। এইরূপ যা-তা সমালোচনার অস্ত্র নিয়ে তুমি যদি সাহিত্যকে কেবল আঘাত দিতে চাও, দাও, কিন্তু শত্রুকেও অস্ত্রাঘাত করবার সময় সভ্য-সমাজে যে অস্ত্রব্যবহারের আদব-কায়দা প্রচলিত আছে, সভ্যতার অভিমান বজায় রাখতে হলে তোমাকেও তা মানতে হবে।

সমালোচনা-সম্বন্ধে অনেক মহাপুরুষের অনেক কথা আছে। হয়ত আমাদের সাহিত্যে কিছু কাজে লাগতে পারে এই মনে করে সপেনহয়রের উক্তি কিছু তুলে দিলুম:—

"সমালোচক যখন-কোন প্রতিভায় রস-উপভোগ করবেন, তখন প্রতিভাবানের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোন কার্য্য অথবা কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ দেখে তাঁহাকে যেন নির্ব্বাসন দিতে অগ্রসর না হন। সমালোচক, প্রতিভাবানের কেবল সেই গুণ-গুলি দেখবেন, যেগুলিতে তিনি অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করেছেন। কেননা, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত বিচার-বুদ্ধির মানস-ক্ষেত্রেও, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে দুর্ব্বলতা ও একগুঁয়েমি জড়ানো থাকে; এমন-কি মহা-প্রতিভাধরের একান্ত উদার চিত্তও সম্পূর্ণরূপে এবং সকল সময়ে ঐ দোষ হতে মুক্ত থাকতে পারে না। কাজেই, যার তুলনা মেলে না, এমন প্রতিভার ভিতরেও বিষম বিষম গলদ দেখা যায়।

প্রতিভাবানের হৃদয় যখন প্রশান্ত থাকে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি চিন্তালোকের উত্তুঙ্গ-স্থানে আরোহণ করতে পারেন; যাহারা সাধারণ শক্তির অধিকারী,—ঐ বিপুল উচ্চতা তাহাদের পক্ষে বামনের কাছে চাঁদের মতন। এই যে উচ্চতা, এতেই প্রতিভার পরিচয় এবং এই উচ্চতার পরিমাণই হচ্ছে প্রতিভার মাপকাঠি।

সমশ্রেণীর দুইজন প্রতিভাশালীকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করাও অত্যন্ত বিপদ-জনক;—যেমন কবির সঙ্গে কবির, গায়কের সঙ্গে গায়কের, দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের এবং শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর। কেননা, এ-রকম তুলনা-মূলক বিচারে অবিচারের আশঙ্কাই পদে-পদে। * * * *

প্রতিযুগেই, আদিকালের ভাল লেখা-গুলিকে খুবই সম্মানের চোখে দেখা হয়—অথচ সমসাময়িক প্রতিভাবানেরা একেবারেই আমোল পান না—লোকে তাঁদের ভুল বোঝে; তাই তাঁদের প্রাপ্য যে আদর,—তা দেওয়া হয় রোথো লিখিয়েদের রদ্দী লেখাকে। সাধারণে যে সমসাময়িক যুগে আসলকে চিন্‌তে পারে না, এ-থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, বহুপ্রশংসিত; গতযুগের প্রতিভাবানদেরও যথার্থ গুণ তারা উপলব্ধি করতে অক্ষম; কেননা, ভাল লোকে ভাল বলেছেন বলেই তারা অতীতকালের প্রতিভাধরদের প্রতি সম্মান দেখায়।

অন্ধ যেমন সূর্য্যালোক দেখতে পায় না, কালা যেমন গান শুনতে পায় না, আর্ট ও বিজ্ঞান বুঝে-উঠাও তেমনি যে-সে মনের সাধ্য নয়। সাধারণ মনের সামনে শ্রেষ্ঠশিল্প হচ্ছে তালাবদ্ধ দেরাজের গুপ্তরহস্যের মত। ঘরের অন্ধকার-কোণ থেকে টেনে এনে যখন কোন চিত্রপট প্রমুক্ত আলোকে ধরা যায়, তখন তার শ্রী কতটা আলাদা হয়ে পড়ে! তেমনি, যার যতটা রসগ্রাহিতার শক্তি, তার মন-পটে ঠিক সেই অনুপাতেই শ্রেষ্ঠশিল্প আপনার ছাপ্‌ দেগে দিতে পারে।”

* *
*

অস্কার ওয়াইল্ডের বচন

আমাদের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ডের রচনার পরিচয় নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাঁর সব সংবাদ সবাই হয়ত না জানতে পারেন—বিশেষত তাঁর যে বচনগুলি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে তার বিশেষ মূল্য আছে বলে আমাদের মনে হয়। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা গেল। তাঁর উক্তিগুলি আমাদের চিন্তারাজ্যের কিছু খোরাক জোগাবার দাবী রাখে; কারণ সে-গুলি অনেক সাধারণ-প্রচলিত মতের উপর ঘা মেরেছে, এবং অনেক আবছায়ায় ঢাকা জিনিষের উপর আলোও ফেলেছে।

অস্কার ওয়াইল্ড, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সন্দর্ভ-লেখক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলাতে তাঁহার জন্ম। J. M. Whistler, "Art for art's sake" নামে যে মন্ত্ররচনা করেন, অস্কার ওয়াইল্ড সেই মন্ত্রে দীক্ষিত।

ওয়াইল্ডের ব্যক্তিগত জীবন বিশুদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রতিভার প্রখর প্রভায় সমুজ্জ্বল। তাঁর ভাষায় কাব্যের যে মোহন অনুরণন পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যে এখনও তা দুর্লভ।

এমন দিন গেছে, অস্কার ওয়াইল্ড সাহিত্যে নিন্দিত ও সমাজে ঘৃণিত হয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। প্রবাসে, পরের কোলে দোসরহারা হয়ে অকালে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

এখনো ষোলবছর ভর্‌তি হয়নি—অস্কার ওয়াইল্ডের দুঃখের জীবনের অবসান হয়েছে। কিন্তু এরি মধ্যে যে ইংরেজ-সমাজ ওয়াইল্ডকে মনে-প্রাণে ত্যাগ করেছিল, আজ সেই ইংরেজ-সমাজই আবার তাঁকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে! জীবন যে প্রতিভাকে চেনাতে পারে-নি, মরণ তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

অস্কার ওয়াইল্ডের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া এতটুকু জায়গায় সম্ভব নয়; আমরা এখানে তাঁর গুটিকয় বচন তুলে দিলুম—তা থেকে তাকে কিছু-কিছু চেনা যেতে পারে :—

যে-সব বই পৃথিবীর নিজের লজ্জার কথা প্রকাশ করে দেয়, সে-সব বইকে পৃথিবী দুর্নীতিমূলক বলে ঘোষণা করে।

আর্টের উপরে জ্ঞানাভিমানী প্রাচীনেরা যে মতপ্রকাশ করে, তার মূল্য এককড়াও নয়।

সাহিত্যের যথার্থ উপভোগ স্বভাবের উপর নির্ভর করে—শিক্ষার উপর নয়।

বৃদ্ধেরা সমস্ত বিশ্বাস করে : মধ্যবয়সীরা সমস্তেই সন্দেহ করে : যুবকেরা সবজান্তা!

সুরুচির সূচিবায়ু তখনই সাংঘাতিক ও অপমানকর হয়ে ওঠে, ললিতকলা নিয়ে যখন তা অনধিকার চর্চ্চা করতে বসে।

যখন কারুকে বেসুরো গান শুনতে হয়, তখন তার উচিত,—গল্পগুজবে সে গানের আওয়াজ ডুবিয়ে দেওয়া!

সৎপুত্র দুর্লভ; সৎ ঔপন্যাসিক দুর্লভতর। পৃথিবী জনপ্রিয়তার মুকুট পরিয়ে দেয়, কুশ্রী আর্টের মাথায়।

আর্ট হচ্ছে একমাত্র জিনিষ, মৃত্যু যাকে মলিন করতে অক্ষম।

একটা আইনজারি করা উচিত যে, কোন সাধারণ খবরের কাগজ আর্টের উপরে যেন কলম না চালাতে পারে।

যে ইতিহাস পড়েছে, সে জানে যে, অবাধ্যতা হচ্ছে মানুষের আসল ধর্ম্ম। অবাধ্যতার মধ্য দিয়েই যত-কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে;—অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহিতার মধ্য দিয়েই!

আর্টকে ভালবাস' আর্টেরই জন্য; তাহলে তোমার যা-কিছু দরকার, সব মিলে যাবে।

ব্যক্তিত্ব জিনিষটা রহস্যময়;—সকল সময়ে কোন মানুষকে তার কার্য্যের দ্বারা বিচার করা চলে না।

গদ্যরচনার মধ্যে তানলয়মধুর সঙ্গীত ও কলানিপুণতাকেই সর্ব্বদা বড় করে দেখতে হবে—বিশুদ্ধতার মান এখানে খাট।

বাসন্তী সন্ধ্যায় কবির চেয়ে প্রাণের দোসর আর কেউ নেই,—যে কবির কণ্ঠ হচ্ছে কিন্নরের মত এবং যাঁর একেবারেই বলবার-কিছু নেই।

নীতির ভিত্তি হচ্ছে সমাজভীতি; ধর্ম্মের গোপনকথা হচ্ছে ঈশ্বরভীতি—এই দুই ভয়ের দ্বারাই আমরা শাসিত।

দশজনের মতে যে উপন্যাস কুরুচিপূর্ণ, আসলে শিল্পক্ষেত্রে তা হচ্ছে সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত।

শিল্পের রাজ্য ও নীতির রাজ্য—এ দুই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরস্পর থেকে বিভিন্ন ও পৃথক।

সমাজ দুর্জ্জনের জন্ম দেয়; এবং শিক্ষা এক দুর্জ্জনকে অন্য দুর্জ্জনের চেয়ে চতুর করে তোলে।

পরীক্ষাক্ষেত্রে মূর্খের প্রশ্নে পণ্ডিত হন নিরুত্তর!

সংবাদপত্র, শিশুশিক্ষা ও বিশ্বকোষের পড়ুয়া ছাড়া ইংলণ্ডে সাহিত্যরসজ্ঞ জনসাধারণ নেই।

কোন কলা-কর্ম্মই মতপ্রকাশ করে না। মত জাহির করে তারা, যারা কালোয়াৎ নয়।

একালে যত খুনখারাপি হয়, তা পাপের জন্যে নয়—শূন্য-উদর তার জনক।

পুরুষ বিয়ে করে—কেননা, তারা শ্রান্ত; নারী বিয়ে করে কেননা, তারা কৌতূহলী; —দুজনেই নিরাশ হয়।

কলা-কার্য্য দর্শককেই শাসন করে। কলা, দর্শকের দ্বারা শাসিত হবার জিনিষ নয়।

বড় হওয়ার মানে, দুর্ব্বোধ হওয়া।

জীবন, বিকিকিনির জিনিষ নয়। এ হচ্ছে ধর্ম্মবিধি। এর আদর্শ, প্রেম। এর বিশুদ্ধতা, আত্মত্যাগে।

স্বাধীন সমালোচনা একটা অজানা ব্যাপার।

কুচরিত্র লোক,—আর্টের দিক থেকে দেখতে গেলে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তারা বর্ণ, বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতা প্রকাশ করে; তারা কল্পনাকে উত্তেজিত করে।

কলাবিদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টি করা—ঘটনা-বিবৃতি নয়।

আমার লেখা যদি দু-চারটি রসিকের ভাল লাগে, তাতেই আমি খুসী; ভাল না লাগলেও আমার খেদ নেই। আর, গাছ-তলার পড়ুয়ার কথাই যদি ধর, তবে তাদের মাঝে জনপ্রিয় হতে আমার কোন সাধ নেই। কেননা, সেটা খুবই সোজা।

বন্ধুর দুঃখকষ্টে যে-কোন লোক সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু, বন্ধুর সাফল্যে সহানুভূতি প্রকাশ করতে হলে, খুব একটা মহৎপ্রাণের আবশ্যক।

রাগের আবেগে ভাল কাব্য লেখা যায়; —কিন্তু, মাথা-গরম হলে ভাল সমালোচনা লেখা চলে না।

কলাবিদ আপন প্রকৃতি-বহির্ভূত কোন আদর্শকে স্বীকার করেন না।

তখনি ধর্ম্মের মৃত্যু, যখনি তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞান হচ্ছে বহু বহু মৃত ধর্ম্মের ইতিহাস।

'ইংরেজী আর্ট,'—এ উক্তি নিরর্থক। আর্ট হচ্ছে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান—তার মধ্যে জাতীয়তা থাকতে পারে না।

যে-সব লোককে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করি না, তাদের মুস্কিলে ফেলবার ফিকিরেই সুনীতির জন্যে প্রাণ আমাদের ককিয়ে উঠে।

যে-কোন ছবি ভাব-বিভোর প্রাণে আঁকা হয়—তা চিত্রকরেরই প্রতিমূর্ত্তি;—যার ছবি আঁকা হচ্ছে তার প্রতিমূর্ত্তি নয়।

বিশ্বে এমন-কিছুই নেই, আর্ট যা অভিব্যক্ত করতে অক্ষম।

আর্টমাত্রই একেবারে অকেজো। সাহিত্যে এমন কোন পুস্তক নেই, যাকে সুনীতিপূত

বা দুর্নীতিদুষ্ট বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বই সুলিখিত কি কুলিখিত—সেইটেই খালি দেখা দরকার।

যদি কোন জাতিকে আমরা আর্টের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাই, তবে তার স্থাপত্য আর সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

যিনি মহাকবি, তিনি সব-চেয়ে অকবি; কিন্তু ক্ষুদে কবির দল লোকের মনে একেবারে চটক লাগিয়ে দেয়।

সাধারণ ধন-দৌলত মানুষের ভাঁড়ার থেকে চুরি যেতে পারে। আসল রতন চুরি যায় না।

রমণী, ভালবাসবার জন্যে—বোঝবার জন্যে নয়!

অদ্যাবধি পৃথিবী যত অশ্রুমোচন করেছে, তার চেয়ে তার ঐ হাস্য—ঐ ভয়ানক হাস্য, ঢের-বেশী দুঃখময়।

সমালোচনা

গৃহশ্রী।

সতী, বেহুলা, জড়ভরতাদি প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সংপ্রতি "গৃহশ্রী" নামক আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দীনেশবাবুর পত্রে যখন প্রথম এই সংবাদ পাইলাম, তখন মনে করিলাম, তিনি হয়ত কোনো পুরাণ ঘাঁটিয়া মঞ্জুশ্রীর ন্যায় এক গৃহশ্রীর আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাকরণে ভুল অথচ সুমিষ্ট ভাষায় সেই নায়িকার চরিতকথা বর্ণন করিয়াছেন,। কিন্তু পুস্তকখানি যখন হস্তগত হইল তখন দেখিলাম ইহা ৩৫৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিশাল গ্রন্থ; মূল্য ১॥০ টাকা—ইহার মলাটের উপরে 'গৃহশ্রী' নামের নীচেই কালো চওড়া—চুড়ীপাড়ওয়ালা শাড়ী-পরা চুড়ী হাতে একটি বিষাদিনী সুন্দরী রমণীর ছবি। ৩৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা, আর এই বিষাদিনীর ছবি দেখিয়া কে মনে করিবে ইহা একখানি উপন্যাস নহে! তখন মনে করিলাম, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উৎসবক্ষেত্রে উপন্যাসরসপিপাসু চাতক, চাতকিনীগণের তৃষ্ণা দূর করিয়া দীনেশবাবু বুঝি পুণ্যসঞ্চয় করিলেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মলাট উল্টাইতেই আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। টাইটেল্ পেজে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণের পরিশিষ্ট সহ।" তবে কি ইহা একখানা চিকিৎসা-গ্রন্থ? অথবা আজকাল উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকাদিগকে কোনো বিশেষ রোগগ্রস্ত মনে করিয়া গ্রন্থকার কৃপাপরবশ হইয়া গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেই রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থা-পত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছেন? কিন্তু আমার এই সংশয় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূচীপত্র দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার কি। গল্প, আখ্যায়িকা, উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকাগণ এই সূচী দেখিয়া নিশ্চয়ই দীনেশবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিবেন না। কোথায় অমৃতময় কাব্য-রসের পরিবেশন—আর কোথায় "স্ত্রীশিক্ষা", "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" ইত্যাদি নিরেট অকপট গুরুমহাশয়গিরি!

এই পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"একজন একটি গল্প বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পাড়ার এক দিক হইতে তাঁহারা ক্রমাগত এক ব্যক্তির প্রাণপণ চেষ্টা শুনিতে পাইলেন; সে ব্যক্তি খুব চীৎকার করিয়া কেবলই বলিতেছে—'টান্ দে—বাঁকা কর—টানিয়া ওঠা' এই অবিরত চীৎকারে কৌতূহল বৃদ্ধি

পাওয়াতে এবং ভীত হইয়া পাড়ার লোকেরা সেই বাড়ীতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং "মহাশয়, কি হইয়াছে" বলিয়া বহুকণ্ঠে একবারে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চীৎকারকারী ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, কিছু নয়—ছেলেটাকে 'ক' লেখাচ্ছি।"

কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিবেন, দীনেশ বাবুও এই ৩৫৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকে বহু চীৎকার করিয়া আমাদের মেয়েদিগকে 'ক' লেখা শিখাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কতকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা:—

"যিনি রান্না করিবেন, তাঁহার এটা দেখা উচিত, যে সকল বস্ত্র শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে কিনা; ছোট ছোট সকলের কে কোথায় কি অবস্থায় আছে; যাঁহারা যে সময়ে খাইয়া থাকেন তাঁহারা খাইয়াছেন কি না; রুগ্ন ব্যক্তির খাদ্য যথাসময়ে প্রদত্ত হইয়াছে কি না, ইত্যাদি।"

"মশারির উপরে কোন জিনিষ রাখা একেবারেই উচিত নহে।"

"শীতান্তে লেপ-তোষক উঠাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।"

"পরিবেশনকালে কে কতটা খাইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেওয়া উচিত।"

"অন্ধ-আতুরের প্রতি দয়া রাখা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।"

দীনেশবাবু কি তবে এই সকল Truism শিক্ষা দেওয়ার জন্য এতবড় একখানা বই লিখিয়াছেন?

যিনি মনোযোগের সহিত এই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনি দেখিতে পাইবেন, ইহাতে কেবল সংসারানভিজ্ঞা বালিকাগণের নহে, আমাদের মত বুড়া-লোকেরও শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই বাক্যটি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিলেও ইহার উপযোগিতা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে সমান। গৃহের সুখ-শান্তি একমাত্র গৃহিণীর উপরই নির্ভর করে! আমাদের সমাজের এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে আমাদের গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে, অথচ নূতন আদর্শও আমরা একটা-কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অন্য-দিকে যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে ঘর বাঁধিতেছেন, তাঁহারাও অনেক বিষয়ে ভুল করিতেছেন কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিলে তাঁহারা উপযুক্ত গৃহিণী হইতে পারেন, ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি কঠিন সমস্যা। দীনেশবাবু এ সম্বন্ধে বলেন, "স্ত্রীলোক পুরুষের মত উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন কি না, সেই দুরূহ প্রশ্নের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখনও আমাদের সমাজে যে অবস্থা আছে. তাহাতে গৃহস্থালি-শিক্ষাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা। সমাজ যদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাব ধারণ করে, তবে কেহ বা আজন্মকুমারী থাকিবেন, কেহ বা রাজনীতিক্ষেত্রে বা বিষয় কর্ম্ম বিভাগে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইবেন; যদি সত্যসত্যই এরূপ অবস্থান্তর ঘটে তখন কি ভাল হইবে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা চিন্তা করিবেন, এখনও সেরূপ চিন্তা করার সময় উপস্থিত হয় নাই। গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্ত্তমানে সামাজিক অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে।"

কিন্তু তাই বলিয়া গ্রন্থকার নারীগণের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহেন। তিনি বলেন—"স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার কেহ ন্যায়তঃ বিরোধী হইতে পারেন না। এই হিন্দুসমাজে বহুসংখ্যক রমণী পূর্ব্বকালে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। * * * * কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক জীবনরক্ষার জন্য যে শিক্ষা না হইলে সংসারে নানা অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আমরা মাত্র সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই লিখিয়া যাইব। যাঁহারা সঙ্গীতে মীরাবাই, শাস্ত্রালোচনায় গার্গী, গুণপনায় অরুন্ধতী ও কবিত্বে আনন্দময়ী হইবেন, আমরা তাঁহাদের পথে কাঁটার বেড়ার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু আমরা আটপৌরে গৃহস্থালীর জন্য যে শিক্ষার দরকার, তাহাই লইয়া এই পুস্তক লিখিতেছি, এটি পুনঃ পুনঃ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।"

কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা রমণীর পক্ষেও যে "আট-পৌরে" গৃহস্থালী অর্থাৎ ঘরকন্না শিক্ষা করা দরকার ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বঙ্কিম বাবুর প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হইয়াও স্বহস্তে বাসন মাজিয়াছেন। আমি আর একটি বি, এ পাশ করা দেবীচৌধুরাণীর স্বহস্তে লাড়ু প্রস্তুত করার কথাও শুনিয়াছি। উচ্চশিক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্বাধীনভাবে হোটেলে বাস করিয়া আফিসে চাকুরী করিবেন, এরূপ দৃশ্য যেন কখনও এ দেশে দেখিতে না হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি সমবেদনার বিকাশক্ষেত্র একমাত্র গৃহ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। আর আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারই একসময়ে সেই হৃদয়ের শিক্ষার স্থল ছিল। এ কথা সকলেই জানেন। দীনেশবাবুও বলেন, "বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায় যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও উদার ভাবের চর্চ্চা করিতে হয়,—তাহাতে মানুষ উন্নত হয় এবং ভগবানের বেশী সম্মুখীন হয়।" গীতায় আছে, "যিনি নিজের মত সকলকে সমভাবে সুখে ও দুঃখে দেখিতে পারেন তিনিই পরম যোগী।" আবার বিষ্ণুপুরাণে আছে "বিষ্ণুর আরাধনা কি? না, সকলকে সমান ভাবে দেখা।" সুতরাং একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া যিনি আলস্য দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া প্রীতি ও ত্যাগ শিক্ষা করেন তিনি যে কেবল ইহকালে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহা নহে, তিনি পরকালেও ভগবানের জন্য নিজের আত্মাকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ঘোর স্বার্থপরতা ও দ্বেষ হিংসা বিলাসিতার যুগে সেই ত্যাগ ও প্রীতির ভাব দিন দিনই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। যেখানে সেই ত্যাগ ও প্রীতির অসদ্ভাব হইয়াছে, সেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠনের চেষ্টা বৃথা। দীনেশবাবুও বলেন, "যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্ম্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ যৌথ পরিবার গড়িবার বিফল প্রয়াস না পান।"

পূর্ব্বকালে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিয়া আমাদের গৃহিণীগণ কিরূপ শিক্ষা লাভ করিতেন, দীনেশবাবু তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহা আগাগোড়া উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গৃহিণীগণের শিক্ষা কোন্ প্রণালীতে হওয়া উচিত। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীরা ছিলেন তাঁহারা উলের টুপী বুনিতে জানিতেন না, বা ফাষ্ট বুক হইতে দু'ছত্র ইংরেজী পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সকলকে ভালবাসিতেন; তাঁহারা ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, গালি দিয়া বিদায় করিতেন না; বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও উপদেশে সেই ব্যথা ঘুচাইতে চেষ্টা করিতেন; খাইবার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কাহার কি অসুখ করিয়াছে, এবং কে কোন্ জিনিষ খাইতে ভালবাসে, তাহা হয়ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে গৃহিণী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতেন। শ্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁহারা খাটাইতেন না; যে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তাড়া দিতেন না; যে একটু শান্তির জন্য গৃহে ফিরিত তাহাকে দ্বিগুণ অশান্তির মধ্যে ফেলিতেন না। তাঁহারা সরল কথায় দোষ দেখাইতে দ্বিধা করিতেন না, যে অন্যায় করিয়াছে তাহার উপযুক্ত শাসন করিতেন, কিন্তু অন্যায়রূপ শাসন করিতেন না—যে শাসনে বিগড়িয়া যায় সে শাসন করিতেন না; এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটি হয় সেরূপ আদর করিতেন না। ভাঁড়ার ঘরের তাঁহারা লক্ষ্মী ছিলেন, রান্নাঘরের তাঁহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশনকালে তাঁহারা দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহারা নিজের সুখ খুঁজিতেন না। এবং নিজের দুঃখকে যতটা সরাইয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা রাখিতেন, এবং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মত মনে করার দরুণ সকলকে আপন করিতে পারিতেন। আমি কি খাইব, কি পরিব এবং সেবার বাড়ীর

গহনার ফর্দ্দ কিরূপ হইবে, বাজারে নূতন ধরণের কোন্ বহুমূল্য শাড়ী আসিয়াছে, স্বামীর কাছে দিনরাত্রি তাহারই বায়না ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকলে সুখী হইলেই তাঁহারা সুখী হইতেন। সকলের সেবায় প্রাণপণে নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই সেবায় সকলে সন্তুষ্ট হইলে তিনি তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার মনে করিতেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসা লইয়া তাঁহারা বেশী আড়ম্বর করিতেন না, সেই প্রেম একান্ত-ভাবে গুপ্ত থাকিত, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব প্রেম ধরা যাইত. নিজের ছেলেদের নিদারুণ শোক উপেক্ষা করিয়া—বিবাহের সময় যেরূপ নববস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় তিনি স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেইরূপ—নূতন বস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় তিনি স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নিশয্যা আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাঁহারা পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মের কঠোরতা অবলম্বন করিয়া এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন তাহার তুলনায় এখনকার নবেল-পড়ার উৎপন্ন মনের সাময়িক উত্তেজনাগুলি একান্ত খেলো মনে হয়। তাঁহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রান্না ও পরিবেশনাদি করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলার পর খাইতে বসিতেন, এমন সময়ে অতিথি আসিল—আর নিজের ভাতের থালাটি ধরিয়া তাহাকে দিয়া হাসিমুখে উপবাস করিয়া রহিলেন, হয়ত তাহা বাড়ীর কেহই জানিবে না। কিন্তু যিনি লোকের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা, উহা নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

"কেহ হয়ত বলিবেন যে, এ সকল স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচারের কথা, ইহাতে প্রসংসার কথা কি আছে? পুরুষেরা যে একান্ত স্বার্থপর ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্যবাধকতা নাই. এবং প্রেমের জন্য কষ্টস্বীকার করা হয়, সেখানে সে কষ্ট তপস্যা; তাহাতে জীবন উন্নত হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা অসহনীয় হয় না, কারণ তাহা স্নেহ-মমতার কষ্ট। স্নেহের জন্য মা কি না করিয়া থাকেন? তাহাতে কি তিনি কষ্টবোধ করেন। বরং তাহা সুখের, সেই সেবাতেই আমাদের জীবন সফল হয় এবং উহা আনন্দময়ের কাছে লইয়া যায়। যিনি বৃহৎ সংসারের মাতৃরূপিণী, তিনি মাতার মত স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকেন।"

প্রাচীনা গৃহিণীর এই চিত্র অতিরঞ্জিত নহে এ বিষয়ে হয়ত অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন। আমার কথা এই, নবীনাগৃহিনীগণ উলের টুপী বুনুন কিম্বা কবিতা লিখুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রাচীনাদের স্নেহমমতা উদারতা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করুন। তাঁহারা ভাল শাড়ী কি মূল্যবান্ গহনা পরুন আপত্তি নাই, কিন্তু নিত্য-নূতন ফ্যাসান বা সখের খাতিরে অভাবগ্রস্ত-সংসারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি যেন না করেন।

দীনেশবাবু হিন্দুর হৃদয় লইয়া এই প্রাণহীন হিন্দুসমাজের অশেষ সম্মান-কামনায় তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছেন। আশা করি হিন্দুগৃহস্থ-মাত্রেই তাঁহার পুস্তকপাঠে উপকারলাভ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, স্যান পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

কলহ

প্রাচীন চিত্র হইতে

৪০শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৩ [৯ম সংখ্যা

বৌদ্ধধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসধর্ম্মের পরিণাম

বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষুণীর প্রথম সৃষ্টি কিরূপে হয়, চুল্লবগ্‌গে (১০) তাহা সবিশেষ উক্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি:—একদা ভগবান্‌ বুদ্ধ কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে মহাপ্রজাবতী * গৌতমী স্ত্রীজাতিকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু বুদ্ধদেব দৃঢ়ভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। গৌতমী দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্ধদেব ইহার পর বৈশালীতে উপস্থিত হইলে, গৌতমী একদিন কেশ ছেদন করিয়া ও কাষায় বসন ধারণ করিয়া † বহুসংখ্যক শাক্যবংশীয় স্ত্রীলোকের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। বেড়াইতে-বেড়াইতে তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল, ও শরীর ধূলিতে আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেব যে স্থানে ছিলেন, তিনি তাহারই দ্বারদেশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আনন্দ তাঁহাকে তদবস্থায়

---

* পালি মহাপজাপতী। বুদ্ধদেবের প্রসবের পর মায়াদেবী পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভগিনী ও সপত্নী গৌতমীই স্তন্যদানাদি দ্বারা বুদ্ধদেবকে নিজের পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করেন। এই জন্যই তাঁহাকে ম হা প্র জা ব তী বলা হয়; কারণ বুদ্ধদেব সাধারণ প্রজা বা সন্তান নহেন, তিনি ম হা সন্তান, মহাসন্তানকে লাভ করায় তিনি ম হা প্র জা ব তী। তুল:—ম হা ভি নি ষ্ক্র ম ণ, ম হা প রি নি র্ব্বা ণ। বুদ্ধদেব ম হা ন্‌ বলিয়া তাঁহার অভিনিষ্ক্রমণ ম হা ভি নি ষ্ক্র ম ণ। তাঁহার পরিনির্ব্বাণ ম হা প রি নি র্ব্বা ণ। প্র জা ব তী হইতে বাঙ্গলায় পো য়া তী (প্রসূতি) হইয়াছে। যোগেশ বাবু বলেন, ইহা পু ত্র ব তী হইয়াছে।

† লক্ষণীয়—প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বেই গৌতমী প্রব্রজ্যার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন।

দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, ভগবান্ স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুজ্ঞা করিতেছেন না। আনন্দ নিজেই ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া তাঁহাকে সেইখানে থাকিতে বলিলেন, এবং বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যাগ্রহণে অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সেই সঙ্গে গৌতমীর অবস্থাও বর্ণনা করিলেন। বুদ্ধদেব এবারও পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু আনন্দ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি আবার বলিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মবিনয়ে উপদিষ্ট স্ত্রীজাতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া স্রোত-আপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্হত্বফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে কি না। বুদ্ধদেবকে বলিতে হইল যে, তাহা পারে। আনন্দ তখন, গৌতমী তাঁহাকে স্তন্যদানাদি করিয়া কিরূপ লালন-পালন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। এবার তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে না পারায় তাহাতে সম্মতি দিলেন, কিন্তু আটটি বিশেষ নিয়মের ("অট্‌ঠ গরু ধম্মে") বিধান করিলেন। (১০. ১. ৪)। উক্ত নিয়মগুলির একটি এই :— যদি কোন ভিক্ষুণীর উপসম্পদা গ্রহণের পর শত বর্ষও হয় ("বস্‌সসতুপসম্পন্না"), তথাপি তাহাকে সেই দিনেই উপসম্পদাপ্রাপ্ত ("তদহুপসম্পন্ন") ভিক্ষুকে অভিবাদন করিতে হইবে, তাহার প্রত্যুত্থান করিতে হইবে, তাহার নিকট অঞ্জলি বন্ধন করিতে হইবে, এবং অন্যান্য উপযুক্ত কার্য্য ("সামীচিকম্ম"), (যথা হাতে চীবর তুলিয়া দেওয়া, পা ধোয়ান, ইত্যাদি) করিতে হইবে। এই ধর্ম্ম যাবজ্জীবন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। স্ত্রীজাতির উপর বুদ্ধদেবের যে, দ্বেষ ছিল তাহা নহে; কিন্তু তিনি তাহাদের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, ভিক্ষুধর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষে যত দূরত্ব থাকে, ততই ভাল। তাই এতাদৃশ নিয়ম করিয়া, মনে হয়, তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর মধ্যে একটা বড় রকম ব্যবধান রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল স্ত্রীলোকের বস্তুত ধর্ম্মপিপাসা নাই, বা যাহাদের অভিমান বিনষ্ট হয় নাই, তাহারা এইরূপ নিয়ম অনুসরণ করিতে সম্মতই হইবে না, * এবং তাহা হইলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সঙ্ঘে কম হইবে। ইহাই হয় ত তাদৃশ নিয়মের অন্যতম কারণ হইতে পারে।

কিন্তু তিনি যে নিয়মই করুন না, তিনি সুস্পষ্টরূপেই ভাবিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যার অনুমতি দেওয়া ভাল হয় নাই, ইহাতে মহান্ অধর্ম্মের সূত্রপাত করা

* বস্তুতও তাহাই হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যা বিহিত হইলে গৌতমী একদিন পুনর্ব্বার আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা বুদ্ধদেবের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি যেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের মধ্যে যথাবুদ্ধভাবে অভিবাদনাদির অনুজ্ঞা করেন, অর্থাৎ ভিক্ষুই হউক বা ভিক্ষুণীই হউক, ছোট ব্যক্তি বড় ব্যক্তির অভিবাদনাদি করিবে। বুদ্ধদেব অনুমোদন করা দূরে থাকুক, আরো দৃঢ়ভাবে নিষেধ করিলেন (চুল্ল ১০. ৩)।

হইয়াছে। সেই জন্যই তিনি আনন্দকে বলিয়াছেন (চুল্ল, ১০,১০,৬)—আনন্দ, স্ত্রীজাতি যদি (এই) তথাগত-প্রবেদিত ধর্ম্ম-বিনয়ে আগার হইত অনাগারিকা অর্থাৎ গৃহত্যাগরূপ প্রব্রজ্যা লাভ না করিত, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল থাকিত, সদ্ধর্ম্ম সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত থাকিত; কিন্তু হে আনন্দ, যে হেতু স্ত্রীজাতি…প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াছে, তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্য আর দীর্ঘকাল থাকিবে না; আনন্দ, সদ্ধর্ম্ম পাঁচই শত বৎসর থাকিবে। হে আনন্দ, যে সকল গৃহে স্ত্রীলোকই বেশী, এবং পুরুষ অল্প, সেই সমস্ত গৃহকে চোর ও সন্ধিচ্ছেদকেরা যেমন সহজেই ধ্বংস করিতে পারে, এইরূপই হে আনন্দ, যে ধর্ম্ম-বিনয়ে স্ত্রীলোকেরা…প্রব্রজ্যা লাভ করে, ব্রহ্মচর্য্য তাহাতে দীর্ঘকাল থাকে না। (আবার) যেমন আনন্দ, সম্পন্ন শালিধান্যক্ষেত্রে শ্বেতাস্থিকা (blight or meldew) রোগ আসিয়া পড়িলে সেই ক্ষেত্র আর দীর্ঘকাল থাকে না; …এইরূপ যে ধর্ম্ম-বিনয়ে স্ত্রীলোকেরা…প্রব্রজ্যা লাভ করে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল থাকে না। হে আনন্দ, তড়াগের জল যাহাতে পার অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যায় এই জন্য মানুষে যেমন পূর্ব্বেই আল বা বাঁধ বাঁধিয়া দেয়, আমিও সেইরূপ আনন্দ, (স্ত্রীলোকদের এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ) যাহাতে (মর্য্যাদা) উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া না যায় ("অনতিক্কমনায়") তজ্জন্য পূর্ব্বেই (ঐ) আটটি গুরুধর্ম্ম (স্ত্রীলোকগণকে) যাবজ্জীবন পালন করিতে হইবে বলিয়া বিধান করিয়াছি।"

স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষুণী হইবার অনুমতি লাভ করিল, এবং ক্রমশ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠিত হইয়া উঠিল। এদিকে বুদ্ধদেব ইহার যে অনর্থ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাও শনৈঃ-শনৈঃ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। তিনি প্রথম হইতেই যে, আদিকল্যাণ মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ করিয়া আসিতেছিলেন, ধীরে-ধীরে তাহা সঙ্ঘমধ্যে কলুষিত হইতে লাগিল। পাতিমোক্‌খ, সুত্ত-বিভঙ্গ ও চুল্লবগ্‌গে এই দুর্নীতির প্রচুর উদাহরণ রহিয়াছে। এক-একটি নিয়মের উৎপত্তি-বিবরণে উদাহরণ দিবার জন্য বিভঙ্গে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের সবগুলি সত্য বলিয়া ধরা না গেলেও কতকগুলি নিয়মই বুঝাইয়া দেয় যে, তাদৃশ কোনো ঘটনা হইয়াছিল, অন্যথা ঐ নিয়মগুলি হইত না। অনেক সময় ভাবী অনর্থের আশঙ্কা করিয়াও নিয়ম করা হয়। কিন্তু ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ-প্রভৃতিতে এরূপ নিয়ম রহিয়াছে, যাহা কোনো নিয়মকর্ত্তা পূর্ব্বে ভাবিতেই পারেন না। এরূপ স্থলে বলিতেই হয় যে, নিশ্চয়ই তাদৃশ কোনো ঘটনা হইয়া থাকিবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষের পাচিত্তিয়ের ২—৫ নিয়ম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ঘটনা দেখিয়াই এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত সুত্তবিভঙ্গ-প্রভৃতির বর্ণিত সমস্ত ঘটনা একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এবং তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, বুদ্ধদেবের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য অল্পদিনের মধ্যে সঙ্ঘে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই ভিক্ষুণী গর্ভিণী

হইতেছেন (ভিক্ষুণীপ্রা. সুত্তবি. পারা. ১—২); পায়খানায় (বচ্চকুটি=বর্চঃকুটী) গিয়া গর্ভপাত করিতেছেন (চুল্ল. ১০. ২৭. ৩), আর বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদের পায়খানায় মলত্যাগ নিষেধ করিতেছেন (ঐ, ৪)। ভিক্ষুণী প্রোষিতভর্ত্তৃকা বধূর গর্ভপাতে সাহায্য করিয়া স্বয়ং স্বকীয় ভিক্ষাপাত্রে ঐ ভ্রূণ বহন করিতেছেন (ঐ, ১০. ১৩)। কোনো গর্ভিণী প্রব্রজ্যা লইয়া সঙ্ঘে ঢুকিয়া প্রসব করিতেছেন, এবং অন্য ভিক্ষুণীর সহিত জাত সন্তানের লালন-পালন করিতেছেন (ঐ, ১০. ২৫)। যেখানে-সেখানে (অরণ্যে ও অতীর্থে অর্থাৎ যে ঘাটে সাধারণত কেহ স্নান করে না) ধূর্ত্তেরা ভিক্ষুণীগণকে দূষিত করিতেছে (ঐ, ১০. ২৩ ২৭. ৪; ভিক্ষুণীপ্রা. সঙ্ঘা,৩)। ভিক্ষুণী অর্থের লোভে পলায়িত ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে উপসম্পদা দিতেছেন (ভিক্ষুণীপ্রা, সঙ্ঘা, ২—সুত্তবি,); বেশ্যাদের সহিত বীভৎসরূপে জল-ক্রীড়া করিতেছেন, অনৈসর্গিক ভাবে কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন, (ভিক্ষুণীপ্রা, পাচি, ২—৫, ২১, ঐ সুত্তবি,); কোথাও বা সুতা কাটিতেছেন (ভিক্ষুণীপ্রা, পাচি, ৪৩); গৃহস্থের বাড়ীতে ভাত রাঁধা, কাপড় ধোয়া প্রভৃতি কাজ করিতেছেন (ঐ, পাচি, ৪৪); এক বাড়ীর কোন স্ত্রীলোকের জিনিস তাহার কথামত বহিয়া লইয়া অন্য বাড়ীতে দিয়া আসিতেছেন (ঐ পাচি, ৮৬,—সুত্তবি); কোথাও বা নানারূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে-ছেন, গন্ধবর্ণক ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন (ঐ, পাচি, ৮৮—৮৯)। আবার কোথাও ভিক্ষুণী কাঁচা ধান নিজেই চাহিয়া আনিয়া কুটিতেছেন, ভাজিতেছেন, বা পাক করিতেছেন, অথবা আর কাহারো দ্বারা ঐ সব কাজ করাইতেছেন; আবার কোনও স্থানে ভিক্ষু খাইতে বসিলে নিজে পাখার বাতাস দিয়া বা আবশ্যক জল দিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন (ঐ, পাচি, ৬); অথবা গৃহস্থ বাড়ীতে পাকের সময়ে গিয়া 'অমুক ভিক্ষুর জন্য অমুক জিনিস পাক কর'—এইরূপে বিশেষ কোনো ভিক্ষুর জন্য পাক করাইতেছেন (ভিক্ষুপ্রা, পাচি, ২৯)। কোথাও তাঁহারা অভ্যঙ্গ করিতেছেন, তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, পানগৃহ স্থাপন করিতেছেন, সূনা (পশুবধ-স্থান) স্থাপন করিয়াছেন, দোকান বসাই-তেছেন, মহাজনী কারবার করিতেছেন, বা দাস-দাসী চাকর-চাকরাণী রাখিতেছেন (চুল্ল, ১০· ১০· ৪)। এইরূপ আরো নানা দুর্নীতিতে কেবল ভিক্ষুণীরাই নহে, ভিক্ষুগণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে। * ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের পরস্পর সংসর্গ যতদূর কম হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহা চেষ্টা করিয়া-ছিলেন (দ্রঃ—ভিক্ষুপ্রা, পাচি, ২১—৩০), কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

সঙ্ঘের সুপরিচালনার জন্য, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে সদ্বৃত্ত করিবার জন্য বুদ্ধদেব এত অধিক নিয়ম করিয়াছেন, এক-একটি বিহিত নিয়মের পর তাহা দেখিয়া-শুনিয়া উল্টাইয়া বদলাইয়া আবার এত বিধান করিয়াছেন যে, তাহা বলিবার নহে; কিন্তু তথাপি

* চুল্ল. ১০.৯।

তাহার ইচ্ছা-মত কাজ হয় নাই। ভিক্ষুণীর সৃষ্টিতে তাঁহার সমীহিত ফললাভে বহু বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। কালের ধর্ম্মে বা মানুষের স্বভাবে স্খলন হইয়াই থাকে। কিন্তু ভিক্ষুণী-দের সৃষ্টিতে ঐ স্খলনটা যে, অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব সেইজন্যই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলেই তাঁহার সদ্ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের থাকিত, কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করায় আর পাঁচ শত বৎসরের বেশী থাকিবে না।

ভিক্ষুণীদের উল্লিখিত দুর্নীতি কালক্রমে ধীরে-ধীরে কিরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও জানা যায়। নায়ক-নায়িকার অবৈধ বা লজ্জাবহ সংযোগের জন্য দূতীর প্রয়োজন হয়, দূতীই কৌশলে তাহাদের তাদৃশ সংযোগ ঘটাইয়া দিয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিক্ষুণীরা ঐ দৌত্যকার্য্যে .প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। * কেবল যে, শাক্য-ভিক্ষুণীদের মধ্যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য মতেরও সন্ন্যাসিনীদের ঐ দশা। শাক্যভিক্ষুণীদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা মালতীমাধবে স্পষ্ট দেখা যায়। "সৌ গ ত জ র ৎ প্র ব্রা জি কা" (মালতী-মাধব Bombay Sanskrit Series, ১ম অঙ্ক, ৯ পৃ), কামন্দকী এবং তাঁহার "অ ন্তে-বা সি নী" অবলোকিতা, ও "প্রি য় স খী" বু দ্ধ র ক্ষি তা (ঐ, ৩৫ পৃ), ইঁহারা সকলেই নিজ-নিজ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ চৌর্য্যবিবাহ-সংঘটনে (ঐ ১৭ পৃ,) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মালতী-মাধবের আখ্যানবস্তু কল্পিত; কিন্তু কবি যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা অলীক নহে; ঐরূপ ঘটিতেছিল বলিয়াই তিনি তাদৃশ কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় বুদ্ধদেব যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, কাজেও তাহা সেইরূপ হইয়াছিল। স্ত্রীজাতি যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা মঙ্গলের জন্য হয় না, বৌদ্ধধর্ম্মের ভিক্ষুণীদল তাহা দেখাইয়া দিয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* "দূত্যঃ সখী-নটী...প্র ব্র জি তা" সাহিত্যদর্পণ, ৩. ১৫৭। "সখী-ভি ক্ষু কী-ক্ষ প ণি কা-তা প সী-ভবনেষু সুখোপায়ঃ—বাৎস্যায়ন ঃ-কামসূত্র (কাশী.), ৫. ৪. ৪২ (২৭৪পৃ.); ভি ক্ষু কী-শ্র ম ণা-ক্ষ প ণা-মূলকারিকাভির্ সংসৃজ্যেত।" ঐ, ৪, ১, ৯। কামসূত্রের এই দুই স্থলে ভিক্ষুকী-শব্দের অর্থ সাধারণ ভিক্ষাজীবিনী ধরিলেও শ্র ম ণা, ক্ষ প ণা-প্রভৃতি শব্দে সন্ন্যাসিনীকেই বুঝাইতেছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, পুরাকালে ভিক্ষু-ভিক্ষুকী শব্দ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকেই বুঝাইত, পরে সাধারণ ভিক্ষাজীবীকেও বুঝাইতেছে।

বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে

বৈশাখের ভারতীতে কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, কার্ত্তিকের ভারতীতে শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। পাঠকেরা যদি প্রবন্ধ-দুইটি একসঙ্গে পড়েন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। আমার প্রবন্ধে কয়েকখানি শব্দকোষের যে উল্লেখ ছিল, তাহারও সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতেছি; এবং ইহাই এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা। আমার মনে হইতেছে যে কোষগ্রন্থগুলিতে হয়ত-বা সংস্করণের প্রভেদ আছে; নহিলে সকল অর্থেই যিনি চক্ষুষ্মান, তাঁহার চোখে আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা পড়িল না কেন? এখন কোন 'বীক্ষণে'ই আমার কাজ চলে না; ধাতু গিয়াছে, উপসর্গের বালাইও গিয়াছে, তাই 'অনু' প্রভৃতি কিছু জুড়িয়াই ফল নাই। আমার লেখক ঠিক যেরূপ দেখিতেছেন সেইরূপই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করাইব।

অলক শব্দে যে কেবল কেশমাত্রও বুঝায় তাহা ঐ শব্দের অর্থে আপ্তের শব্দকোষে আছে। ১৮৯০ সনের ছাপা আপ্তের বড় কোষগ্রন্থখানির ১৭১ পৃষ্ঠায় অলক শব্দের অর্থে প্রথম ছত্রেই একসঙ্গে এই তিনটি অর্থই আছে, যথা—A curl, Lock of hair, এবং Hair in general। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সোজাসুজি 'চুল' অর্থের প্রয়োগের দৃষ্টান্তে কালিদাস প্রভৃতি লেখকের বচন উদ্ধৃত আছে।

নিশীথ শব্দের গভীর রাত্রি ছাড়া অর্থই ছিল না। অর্ব্বাচীন প্রয়োগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গলা প্রকৃতিবাদ অভিধানে (১২৯৫ বঙ্গাব্দের সংস্করণ) এইরূপ আছে:— নি=নিয়ত, শী=শয়ন করা+থ; সং, পুং; অর্দ্ধরাত্র। চৌধুরীমহাশয়ের উল্লিখিত Carl Cappellarএর কোষগ্রন্থেও (২৭৯ পৃষ্ঠা) সর্ব্বপ্রথমেই Midnight অর্থ দেওয়া আছে। আপ্তের গ্রন্থের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু যে কুমারসম্ভব প্রভৃতি দেখিয়া অনেক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অনেক দৃষ্টান্ত হইতেই জানা যায়; বিষবৃক্ষে এ দৃষ্টান্ত অত্যধিক পাওয়া যায়।

প্রগল্‌ভ শব্দটি যে কালিদাসের দৃষ্টান্ত ধরিলে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে ভুল প্রয়োগে বসে নাই, তাহা একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। কালিদাসের ঐ প্রয়োগটিতে মৌলিক অর্থ আছে অথবা রূপকের অর্থ আছে, তাহার বিচার না করিলেও চলে; তবুও শব্দতত্ত্বের জন্য একটু বিচার করিব। যে সকল শব্দের বৈদিক উৎপত্তি পাওয়া যায় তাহাদের অর্থ ধরা সহজ; কিন্তু এ শব্দটির ঐ প্রকার মূল আছে কিনা সন্দেহ। অথর্ব্ব বেদের কেবল একটি স্থানে 'গলুন্ত' শব্দ পাওয়া যায়; Whitney ব্যতীত সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই ভারতের প্রাচীনকালের টীকার অর্থ ধরিয়া, ঐ শব্দের 'গল্‌'-কে Swelling দিয়া বুঝাইয়াছেন; অর্থাৎ উহা হইতে ফুলিয়া উঠা, ফাঁপিয়া উঠা, বাড়িয়া উঠা

প্রভৃতি অর্থই সূচিত হয়। কেহ কেহ এই গল্ হইতে প্রগল্‌ভের উৎপত্তি কল্পনা করেন; কিন্তু আমার নিজের কাছে ঐ ব্যুৎপত্তি সুসঙ্গত মনে হয় নাই। যদি ঐ ব্যুৎপত্তি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে প্রগল্‌ভের মৌলিক অর্থে বাড়িয়া-উঠার ভাবই থাকিবার কথা। সাহিত্যদর্পণের ১০১ সূত্রে প্রগল্‌ভার যে সংজ্ঞা আছে তাহাতেও বয়সের দিকের কথাই প্রধানভাবে সূচিত হইয়াছে। মুগ্ধা, মধ্যমা ও প্রগল্‌ভা প্রধানভাবে বয়সের দিক হইতেই বিচারিত হইয়াছে; নায়িকার দৃষ্টান্তের এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রগল্‌ভার সংজ্ঞায় আছে—

"স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরত কোবিদা,
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভাক্রান্ত নায়কা।"

যে কারণে তরুণী একটু bold, তাহা ধ্বনিত হইতেছে; কাজেই shy নহে এবং bold, এ ভাবটিকেই পরবর্ত্তী করা স্বাভাবিক। যাহা হউক এ বিচারের সহিত বঙ্কিমবাবুর প্রয়োগের কোন সম্বন্ধ নাই। চৌধুরী-মহাশয় আপ্তের কোষগ্রন্থে mature এবং developed অর্থ খুঁজিয়া পান নাই; কিন্তু আমার হাতে যেখানি আছে তাহাতে ঐ অর্থ স্পষ্ট লিখিত আছে। আপ্তের কোষ-গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় প্রগল্‌ভ শব্দের অর্থে সপ্তম এবং অষ্টম ছত্রে এইরূপ আছে:—"mature (asage) Ku (অর্থাৎ কুমার-সম্ভব) I. 51; matured, developed, full-grown." অন্যান্য কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই আছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

(২)

বিজয়বাবুর জবাবের কোনও জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করিনে। কেননা অতঃপর, "অলক" এবং "প্রগল্‌ভ" এই দুটি কথার অর্থ অনর্থের উপরই আমাদের পরস্পরের মতভেদ গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

"নিশীথ"—শব্দের অর্থ যে মধ্যরাত্রি এবং রাত্রি দুই হয়, এ-কথা তিনিও মানেন আমিও জানি। সুতরাং এ-স্থলে আমাদের মতের অমিলটা যে কোথায় তা আমি ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

সংস্কৃত শব্দের কোন্ অর্থ প্রাচীন এবং কোন্ অর্থ অর্ব্বাচীন তা যে আমি জানিনে, সে-কথা আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি। সংস্কৃত ভাষা এবং বৈদিক ভাষার ভেদাভেদ নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এক গায়ত্রী-মন্ত্র ব্যতীত বৈদিক-সাহিত্যের বাদবাকী সকল অংশ আমার অধিকারের বহির্ভূত, সুতরাং তর্কের খাতিরেও আমি এ-বিষয়ে অনধিকারচর্চ্চা করতে রাজি নই।

সংস্কৃত শব্দের অর্ব্বাচীন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থ নিয়েই আমাদের কারবার। প্রাচীন অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ অর্থ নিয়ে বঙ্গসাহিত্যে কারও কারবার করা আমার মতে অসঙ্গত, কেননা আলঙ্কারিক মতে, অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অপ্রসিদ্ধার্থে কোনও শব্দ ব্যবহার করা দোষ বলেই গণ্য।

মজুমদার-মহাশয় বলেছেন যে আপ্তে পণ্ডিতের অভিধানে লেখা আছে, "অলকের" অর্থ "সোজাসুজি চুল" হয়—প্রগল্‌ভের অর্থ বয়স্ক হয়।

আপ্তে পণ্ডিতের যে কোষগ্রন্থখানি আমার কাছে আছে, তাতে ও অর্থ নেই।

এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে, উক্ত গ্রন্থের তাঁর হাতে আছে এক সংস্করণ, আমার হাতে আছে আর-এক। আমার হাতে যেখানি আছে, সেখানি ছোট; এবং মজুমদার-মহাশয়ের কাছে যেখানি আছে, সেখানি যে বড়,—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা আমার বইখানিতে পাঁচ-সাতশ পাতা নেই।

কিন্তু একই গ্রন্থের ছোট-বড় সংস্করণে এ প্রভেদ থাকবার কারণ কি? তা কি এই নয় যে, সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পূর্ব্বোক্ত শব্দ দুটির প্রসিদ্ধ অর্থই দেওয়া হয়েছে, এবং বৃহৎ সংস্করণে প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত উপরি দু একটি অর্থ, দেওয়া হয়েছে?

তাহলে আমার কথাই বজায় রইল। কেননা একথা আমি ভুলেও বলিনি যে, ও-দুটি শব্দের ও-দুটি অর্থ হতেই পারে না, বরং এ-কথা আমি অতি স্পষ্ট করেই বলেছি যে, সংস্কৃত কোন্ কথার কি অর্থ না হতে পারে, তা অমরসিংহও জানেন না। সংস্কৃত-অভিধান নিয়ে যাঁদের নাড়া চাড়া করা অভ্যাস আছে, তাঁরাই জানেন যে তার পাতায়-পাতায় চিরপরিচিত শব্দের অপরিচিত অর্থ পাওয়া যায়।

তারপর, প্রগল্‌ভ শব্দের যে বয়স-সম্বন্ধে আলঙ্কারিক প্রয়োগ হতে পারে, এ-কথা আমি "একরকম করে" নয়, পুরোপুরিই স্বীকার করেছি। কালিদাস যে কুমারের সেই শ্লোকে উক্ত শব্দ figuratively ব্যবহার করেছিলেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রগল্‌ভতা—বয়সের নয়, চরিত্রের ধর্ম্ম বলেই কালিদাস ও-স্থলে ও-শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস উক্ত শ্লোকে নারদের মুখ দিয়ে এই কথা বলিয়েছেন যে, "যে-বয়সে স্ত্রীলোকের প্রগল্‌ভা হবার সম্ভাবনা, পার্ব্বতীর সেই বয়স হয়েছে, অতএব গিরিরাজের পক্ষে এতদিন মেয়েকে অনূঢ়া রাখা উচিত হয়নি"। হিমালয় যাতে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে আর কালবিলম্ব না করেন, সেই উদ্দেশ্যেই নারদ তাঁকে মেয়ের প্রগল্‌ভা হবার সম্ভাবনা আছে বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। নচেৎ প্রগল্‌ভা বল্‌লে যদি কোনও স্ত্রীলোকের বয়সের হিসেব পাওয়া যায়, তাহলে বানভট্ট পত্রলেখাকে "অষ্টাদশ-বর্ষদেশীয়া" বলে ঠিক তার পরেই "কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা" বল্‌তেন না। এবং কাদম্বরী-কার এ-স্থলে যে পুনরুক্তি দোষ করে বসেন্‌নি, তার প্রমাণ তিনি বলেছেন যে, রাজ-অন্তঃপুরে বাস করার দরুনই পত্রলেখা প্রগল্‌ভা হয়েছিল। বলা বাহুল্য মানুষের বয়েস কাল-বশেই বাড়ে, কে কোথায় থাকে তাতে একদিনেরও কম-বেশ হয় না। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

যমের হাতে

(খেয়াল)

(১)

(আমাদের দেখা)

অনেক দিনের পর বিনোদের সঙ্গে দেখা হ'ল। বিনোদ এখন সন্ন্যাসী। প্রথমে তাকে চিন্‌তে পারি নাই। কিন্তু স্থানটা রমণীয়, বেলাটা সন্ধ্যা, এবং নির্জ্জনতার গুণে স্মৃতিগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে পড়েছিল, তাই হঠাৎ মনে হ'ল যে লোকটা আমাদের সেকালের বিনোদের মতো দেখ্‌তে। একবার গা শিউরে উঠেছিল, কিন্তু আমি ভূতের তত্ত্ব বিশ্বাস করলেও ভূতের শারীরিক অস্তিত্ব বিশ্বাস করি নে। তাই একবার সামান্য রকম একটু ভয় পেলেও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লুম।

সন্ন্যাসী গাছতলায় বসেছিল। আমি নিকটে গিয়ে বল্লুম, 'ভাই মাফ্ ক'রো, যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে বোধ হয় তুমি আমার বাল্যসখা বিনোদ'।

বিনোদ একটু ইতস্ততঃ করে শেষে স্বীকার করে ফেল্লে। 'কিন্তু আমি ত মরেছি ব'লেই তোমরা জান, তবে আর পুরাণো চিত্র উদ্দীপ্ত করবার দরকার কি ?'

আমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বল্লুম, "সকলেরি একটা না একটা সাধ আজন্ম থেকে যায়। আমরা সাধ যে পুরাণো বন্ধুদের আর একটিবার দেখি, বুকে জড়িয়ে ধরি, বিজয়াদশমীর দিনের মতো তাদের আলিঙ্গন করি। কিন্তু কাহাকেও দেখতে পাইনে। যাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তারা ঘরে লুকিয়ে থাকে। খিড়্‌কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে ক্লাবে চলে যায়। পুরাণো কথা তুল্‌লে হাই তুলতে আরম্ভ করে, এবং কথা পাড়্‌বার পূর্ব্বেই বলে 'আমার অবস্থা আজকাল বড় খারাপ'। এই রকম ক্রমাগত দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে মধুপুরে হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছি। আজ তোমাকে দেখে আমার ছেলেবেলার আনন্দ উছ্‌লে পড়েছে। যদি আপত্তি না থাকে তবে একবার বুকে জড়িয়ে ধরি।'

কিন্তু আমার হাত অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী আমাকে বুকে নিয়েছিল। কি শীতল শান্তিময় বুক তার! তার শীর্ণ পাঁজর গুলি আমার কাছে তুলোর চেয়ে নরম বোধ হতে লাগ্‌ল। তার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা দেবলোকের পরিমল বেরুচ্ছিল। তার দেহের ভস্মরাশি আমার দেহে এসে নূতন প্রাণের সঞ্চার কল্ল'।

আমি বল্লুম, 'বিনোদ! যদি এত ভাল বাস তবে মাঝে মাঝে দেখা দেওনা কেন' ?

বিনোদ উত্তর দিল, 'সেই জন্যই এসেছি'।

আমি বল্লুম, 'তবে এইখানে দুজনে বসি। তোমার জীবনের খানিক্‌টা আমাকে বল,

আমার জীবনের খানিকটা তোমাকে বল্‌ব। না হয় রাত্রি হয়ে যাবে। আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই শালবনে বেড়াই। এক রকম পাখী এই গাছের মধ্যে থাকে, তারা মাঝে মাঝে বলে 'এস—এস'। আমি তাদের খুজে বেড়াই। অনেক সময় পথের মধ্যে ভালুক্ দেখতে পাই, তারা আমাকে দেখে বিরক্ত হয়। যখন সন্ধ্যা খুব ঘোর হয়, তখন এই জঙ্গলের মধ্যে একটা খুব সঙ্কীর্ণ সাদা রাস্তা দেখতে পাই, তাই ধ'রে বাড়ী গিয়ে পৌছাই'।

বিনোদ আমার হাত ধরে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। 'যদি আমার জীবনের খানিকটা শুন্‌তে চাও, তবে আমার মরণের কথাটা শোন। মরণের কথাই জগতের মধ্যে সেরা কথা। বিশেষতঃ আমি মরণকে লয়ে এমন বিপদে পড়েছিলুম যে শেষটা মরণ আমাকে ছেড়ে পালাল, আর আমি হতাশ হয়ে সংসার ছেড়ে দিলুম।"

আমার বড় কৌতূহল জন্মালো। একটা বড় পাথরের উপর দুজনে সুখাসনে ব'সে বিনোদকে আমি বল্লুম, 'তবে তোমার গল্পটা বল'।

বিনোদ তার কমণ্ডলুটা ঘাসের উপর রেখে, গেরুয়ার আলখেল্লার পকেট হতে একখানা তালপাতার লেখন বের করল। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'এখানা কি?'

বিনোদ। যমের সার্টিফিকেট্।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে তালপাতাটুকু চ'খের সাম্‌নে সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভ আলোতে ধল্লুম। তাতে সুন্দর অক্ষরে গোটাকতক কথা লেখা ছিল।

"এই লোকটা এত হতভাগা যে উহার পক্ষে বেঁচে থাকাই ভালো। যেদিন ও সুখের মুখ দেখ্‌বে, সেইদিন আমি ওকে নিয়ে যাব। এখন ছেড়ে দিলুম।"—মরণ।

আমি অবাক হয়ে বিনোদের দিকে চেয়ে রইলুম। 'বিনোদ, তোমার জীবনের দুঃখ এখনো শেষ হয়নি? বিনোদ খুব হেসে বল্লে, 'না'।

(২)

(বিনোদের গল্প)

তোমার বোধ হয় ৩০নং——ষ্ট্রীট মনে পড়ে? আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকেই প্রতীচ্যের বাড়ী। আমি তখন———স্বামীর কাছে মন্ত্র নিয়েছি মাত্র। প্রতীচ্য সিগারেট্ ফুঁক্‌তে আরম্ভ করেছে। সে এম এ পড়বার মত্‌লবে দর্শন-শাস্ত্রের বই কতকগুলো কিনে ফেলেছিল। কিন্তু বাকিগুলো না কিনে, একটা হারমোনিয়ম, সেতার, এস্রাজ্, আর গোটাকতক কাব্য সংগ্রহ করে তার ঘরখানি মনের মতো সাজিয়ে ফেল্ল। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে সেই কাণ্ড-কারখানা দেখছিলুম। জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'প্রতী! তোমার মত্‌লব কি'?

প্রতীচ্য বল্ল, 'আমাদের দিশি জিনিসগুলোকে বিলিতির উদার দিকে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি।'

আমি আরো এগিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'কি রকম?'

প্রতীচ্য বল্ল, 'তুমি কি এটা কখনো ভেবে দেখ নাই যে আমাদের গান, বাজনা, কাব্য, এমন-কি হৃদয়টুকু, সব সঙ্কীর্ণ? যেন ঘরের

মধ্যে লুকিয়ে একটা রাসলীলা কিংবা শিবপূজা হ'চ্ছে। এর অর্থ কি? তুমি বল্‌বে হয়ত যে জগন্নাথের রথযাত্রা আর কুম্ভের মেলা খুব জমকালো জিনিস। কিন্তু তাই কি প্রত্যহ হয়? মাঝে মাঝে কতকগুলো লোককে নিয়ে হরিসংকীর্ত্তন করে' লাভ কি? আমার মতে যে জিনিসগুলি মানুষের হৃদয় উন্নত করে সেগুলির বিস্তীর্ণ প্রচার হওয়া চাই। একটা গান কল্লে একটা কবিতা আওড়ালে, এমন-কি একজনকে ভাল বাসলেও, দেশের সকলে ফেঁসে পড়বে। তাকেই বলে উদার নীতি। আমাদের শাস্ত্রে সমষ্টির উন্নতি, যতদূর সম্ভব সকলের চেয়ে বেশী লোকের সুখ, এ রকম ভাবটা মোটেই নাই। বিলেতে 'মে-পোল' খাড়া হলে একটা সুন্দরীই রাণী হয়ে তার নীচে বসে, আর সমগ্র সমবেত লোক তাকেই সে সময়টুকু ভালবাসে ও পূজা করে। সেই রকম পূর্ব্বকালে তাদের দেশে টুর্ণামেণ্ট হত, আর যত যোদ্ধা নিজের বীরপনা দেখাবার পর সকলের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ তারি গৌরব রাণীর হাতে সমর্পিত হত। তুমি বোধ হয় স্বীকার কর যে পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও স্বয়ম্বর হত। তবে উঠে গেল কেন? এগুলো পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আমি গান বাজনা কবিতা দিয়ে, এমন-কি যদি 'নাটক' লিখ্‌তে হয় তাও লিখে, সেই অবস্থা আবার দেশে নিয়ে আসব'।—এই কথা বলে প্রতীচ্য নিজের মুখখানা আড়চ'খে আর্সিতে দু'-তিনবার দেখল।

আমি বল্লুম, 'প্রতী! তবে তোমার মত এই যে, সুন্দরীগুলো সুন্দরকে খুজে বের করবে। তারা হবে রাজা ও রাণী, আর বাকি লোকগুলো তাদের পূজো কর্‌বে?'

প্রতীচ্য। নিশ্চয়। তা না হ'লে তুমি কি মনে কর যে ভগবান অনুপযুক্ত লোকের বংশে ও আলয়ে কখনো অবতীর্ণ হবেন? যারা বীর ও সুন্দর, যাদের আজানুলম্বিত বাহু, লোচন কমলের মতো, তাদেরই ঘরে ভগবানের অবতার হওয়া নিশ্চয়। বাকি লোক কেবল ট্যাক্স্ দেবে। তবে আমি এমন কথা বল্‌তে চাইনে যে বীরপূজার মধ্যে সঙ্কীর্ণভাব আনা উচিত। মৌমাছির চাকের মধ্যে সকলেই বীর, সকলেই সকলকে ভালবাসে, সকলেই মধু সংগ্রহ করে, সকলেই হুল ফুটিয়ে দেয়, অথচ তাদের গান একই রকম গুঞ্জন, তাদের মধুসংগ্রহের একই রকম রীতি, আর পূর্ণিমার সময় হলে নিজের নিজের পুঁজিপাটা নিয়ে সকলেই উড়ে যায়।

আমি বল্লুম, 'তখন ভগবানের প্রতিনিধি রাজা রাণী থাকে কোথায়?'

প্রতীচ্য ভেবে ব'ল্লে, 'বোধ হয় মনের দুঃখে মরে যায়, কিংবা বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। সেটুকু দেখ্‌তে আমরা বাধ্য নই। কেবল রাজারাণীর লীলাটুকু, তাদের বাছনিটুকু, ও তারই 'সাইকলজি'টুকু দেখে নিলেই যথেষ্ট। লেখাপড়ার উদ্দেশ্যই তাই।'

আমি বল্লুম, 'প্রণালীটা কি রকম'?

প্রতীচ্য ব'ল্ল, 'শরীরকে শরীরের সঙ্গে মেশালেই যে আত্মা আত্মার সঙ্গে মেশে এ-কথা জড়বাদীদের মতো আমি স্বীকার কর্ত্তে চাইনে। অথচ আমি পুনর্জ্জন্ম মানিনে।

আমার মতে মনের গতি, অন্ততঃ অনেক-গুলো লোকের, যখন মিশে একরকম হয়ে যাবে, তখন আত্মাগুলোও বহু হতে ক্রমে এক হয়ে দাঁড়াবে'।

আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'পুরুষের মনের সঙ্গে স্ত্রীলোকের, আর স্ত্রীলোকের মনের সঙ্গে পুরুষের মন মিশ্‌বে তখন? না পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, আর স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীলোকের'?

প্রতীচ্য। পুরুষ, পুরুষের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে স্ত্রীলোক বাধা দেয়। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে কিন্তু পুরুষ বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটু রহস্য আছে, তা মানি। বোধ হয় পুরুষের ধারণা যে স্ত্রীলোকেরা মিশ্‌তে পারে না, কিন্তু সেটা ভুল।

(৩)

তার কিছুদিন পরেই পূরবী তার বাপের বাড়ী হতে ফিরে এল। প্রায় পাঁচ বৎসর আগে আমাদের বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু আমার যে একটা স্ত্রী আছে এমন ভাবটা এখন যেমন ফুটে উঠ্‌ল, আগে তা হয় নাই। জ্ঞান এমনি জিনিস যে প্রেমটাকে কাবু করে রাখে। শক্তি ত একই। প্রেম তাকে নিয়ে রূপযৌবন লাবণ্যের দিকে ছুট্‌লে, জ্ঞান তাদের গলা টিপে আমার মাথার এককোণে বদ্ধ করে রাখ্‌ত। পূরবীর সৌন্দর্য্য যতই দেখতুম, ততই ভয় হত। অনেক বেতররকমের কৃপণ লোক সংসারে আছে যে টাকাটা সুদে খাটাতেও ভয় করে, কেবল মাটীর নিচে পুঁতে রাখে। আমারও ভাবটা সেই রকম দাঁড়িয়ে গেল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'ত যে পূরবীর সৌন্দর্য্য, তার মধুর কথা, তার সরম, মান-অভিমানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করি, খরচ ক'রে ফেলি। কিন্তু প্রাণে তা সইত না। মনে কত্তুম সেগুলি পূর্ণিমার দিনে বুকে করে পরলোকে উড়ে পালাব। কিন্তু বোধ হয় আমার একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়ে ছিল। প্রথম ভুল যে সেগুলি আমার। দ্বিতীয় ভুল যে সেগুলি আমার জন্য বসে থাক্‌বে। সেগুলি যে কালের বশে বিশ্বের সঙ্গে ক্রমে মিশ্‌তে থাকে, এবং সেই সুযোগে নিজে তার সঙ্গে মিশে ভোগদখলে আন্‌তে না পার্‌লে যে শেষে ঠক্‌তে হয়, তা বুঝতে পারি নাই। মাঝে মাঝে যখন পূরবী চঞ্চলার মতো চারিদিকে চাইত তখন প্রতীচ্যের কথাগুলি মনে পড়্‌ত। মনে হ'ত যেন পূরবী বীর ও সুন্দর খুজে বেড়াচ্ছে। সে যে বিভূতিগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে তা রাখবার জন্য জায়গা পাচ্ছেনা। সেগুলি দিয়ে কাহাকে পূজো কর্‌বে ঠিক পাচ্ছেনা। সেগুলি কাহার বেদীর সাম্‌নে নৈবেদ্য দিলে সেই দেবতা নিজে কিছু আত্মসাৎ করে, আরও দশজনকে বিলিয়ে দেবে তা বুঝতে পাচ্ছে না। যেটুকু নিয়ে সংসারের দশদিন, ছেলেপুলের মেলা, জগৎ-তন্ত্রের খেলা, সেইটুকু সে বুকের মধ্যে লুকিয়ে আমার দিকে সন্দিগ্ধচ'খে চেয়ে দেখ্‌ত। আমি বুঝতুম তার নিকট মানুষের মনের জিনিস সবই আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী একটু যদি থাকে সেইটুকুই আমি চাই। পূরবীর মধ্যে আমার ধর্ম্মটুকু

আছে কিনা সেটুকু তল্লাস করবার উপায় কি ?

আমি ছাতে বসে তাই ভাবছি। প্রতীচ্য তার ঘরে তার স্ত্রী কমলাকে নিয়ে ইমন কল্যাণ শেখাচ্ছে। কমলা একটা রোগা-পটকা কটাচক্ষু কটাচুল ধব্‌ধবে্ সাদা মেয়ে হলেও তার গলা খুব মিষ্টি। প্রতীচ্যের নজর বোধ হয় সেই মিষ্টিটুকুর উপর। কেননা, কমলা অনেক দূরে জানলার উপর বসে স্বামীর কায়দাটুকু নকল কচ্ছিল। তার ইচ্ছে কোনরকমে রাগিণীটুকু শিখে নেয়! আমি দেখ্‌তে পেয়ে মনে মনে হাস্‌লুম। হায়! হায়! প্রতীচ্যের জীবন-তন্ত্র এইটুকু। যতদিন মিষ্টিগলা থাক্‌বে প্রতীচ্য শেখাবে। যতদিন স্বামীর বিদ্যাটুকু না পাবে, প্রতীচ্যের বৌ শিখ্‌বে। এরি নাম কি মনের সঙ্গে মন মেশা? এ ত কেবল শব্দের সঙ্গে শব্দমেশা, এক তন্ত্রের সঙ্গে আর এক তন্ত্র মেশা। মানুষ মানুষের কাছে গেল কৈ ?

আমার পিছনে পূরবী এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস শুনে আমি চম্‌কে ফিরে দেখলুম। আমি অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'পূরবী, তোর গান ভাল লাগে'।

বোধ হয় তার মনের কথা একটা খুজে বের করেছি বলেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্ল, 'হাঁ। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। তুমি পাছে কিছু মনে কর বলে আমি 'ডলসেচিনা'টা, লুকিয়ে রেখেছি'।

আমি সাহ্লাদে বল্লুম, 'তুমি একটা গাও'।

পূরবী তৎক্ষণাৎ তার ডলসেচিনা-টা এনে এমন আশ্চর্য্যভাবে ইমনকল্যাণ গাইতে আরম্ভ কল্ল যে আমি অবাক হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। একবার ভাবলুম এমন জিনিস পৃথিবীতে প্রচার করাই ভুল। দশজনে মিলে নষ্ট করে ফেল্‌বে। আবার ভাবলুম, ওরা একবার শুনুক্, একবার জানুক। আমি কি নিজে পট্টবস্ত্র পরে অধিকারীর মতো নিজের যাত্রা নিজেই শুনব? কিন্তু আমাকে কষ্ট কর্ত্তে হল না। কমলা তাদের ছাত হতে এক লাফ দিয়ে আমাদের ছাতে এসে বল্ল, 'বিনোদবাবু, তোমার বৌ এসেছে তা কি আমাদের বল্‌তে নেই। বনের পাখীটি বনের মধ্যে রেখে একলা একলা এই অপূর্ব্ব গান শুনছ? আমরা কি কেউ না? কি নিষ্ঠুর কনসার্ভেটিভ্ তুমি!' এই বলে সে পূরবীকে আমার হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে, তাদের বাড়ী গেল। আমি নিষ্ঠুর না কমলা নিষ্ঠুরা? বোধ হ'ল যেন পূরবীকে আত্মসাৎ ক'রবে। আমার বুক হ'তে কেড়ে নেবে, আর প্রতীচ্যকেও জব্দ করবে। আমি কি ঠিক তাই ভাবছিলুম? কে জানে!

(৪)

কমলা তাকে প্রতীচ্যের কাছে নিয়ে গেল। প্রতীচ্যের মোহ উদ্দীপ্ত কর্‌বার জন্যই বোধ হয় নিয়ে গেল। কমলাকে দেখে প্রতীচ্যের মোহ হয় নাই তা কমলা বুঝেছিল। একবার, সেই মোহটা কি-রকম, এবং তার ব্যথাটা কি রকম, সেইটুকু শিক্ষা দিতেই কমলা পূরবীকে নিয়ে গিয়েছিল। কিসে হরিণ ও হরিণী জালে

পড়ে তা কমলা জান্‌ত। ব্যাধ কেমন করে জাল পাতে তা প্রতীচ্য ও পূরবী কেহই জানত্‌ না। প্রতীচ্য পূরবীর গান শুনে স্তম্ভিত হ'ল। হার্ম্মোনিয়ম ছেড়ে এস্রাজ ধর্‌ল। কখনো কখনো সেতারটা নিয়ে টুং টাং করে বাজাতে লাগ্‌ল। কমলার মিষ্টি গলা প্রতীচ্যের ভাল লাগত বটে, কিন্তু পূরবীর মিষ্টি গলা ও গানের প্রতিভার সঙ্গে তার রক্তকণা ও নিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রতীচ্যকে পাগল করে তুলে ছিল। তাই সে গান শুনে স্থির থাকত না। কখন্‌ দেখ্‌তে পাবে তারি জন্য ছাতের উপর একঘণ্টার মধ্যে তিনচারবার আসত। সে ভাবটুকু ঢাক্‌লেও আমি বুঝতে পাত্তুম। সে রাত্তিরে ঘুমত কিনা সন্দেহ। খাবার দিকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়্‌ল। একদিন কমলা নিজে কতকগুলো সন্দেশ তৈরি করে বলেছিল, 'পূরবী আজ তোমার জন্য সন্দেশ তৈরি করে পাঠিয়েছে।' প্রতীচ্য তাই শুনে তাচ্ছিল্যভাবে সব খেয়ে ফেল্ল।

আর পূরবী? সে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ত আর আমি মনে মনে হাস্‌তুম। সব রাগরাগিণী সব রাগরাগিণীর সঙ্গে মেশে না। ভৈরবী ইমনের সঙ্গে মেশেনা। মল্লার রামকেলীর সঙ্গে মেশে না। জগতে নিশ্চয় একটা বিধান আছে, নিয়ম আছে। তবে যাহার সঙ্গে যে মেশেনা তারা একত্র হয় কেন? বোধ হয় শিক্ষার জন্য, কিংবা ইহার মধ্যে আরও কোন প্রচ্ছন্ন তন্ত্র আছে। পূরবী যেটুকু খুজে বেড়াচ্ছিল সেটুকু প্রতীচ্যের মধ্যে দেখ্‌তে গেল। সে যেটুকু দিতে চায়, ভবের হাটে প্রতীচ্য সেইটুকু নেবার জন্য পাগল। ভারতের রত্ন যদি ভারতের সন্ন্যাসী পায় ঠেলে ফেলে, তবে নিশ্চয় ভারতমাতা দত্তক পুত্র নেবেন, এটা প্রাকৃতিক বিধান। মাই হউক, ছেলেই হউক, স্ত্রীই হউক, ব্যবহারিক ভাবে ভবের হাটে তারা ভাবের কেনাবেচা করতে আসে। তুমি সব ভাব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে নিজের বিশ্বকল্পনা নিয়ে মত্ত থাক্‌লে, তারা ভাবের বোঝা ক'তদিন মাথায় করে হাটে ঘুরে বেড়াবে!

(বিনোদ হেসে বল্লে), 'তোমরা যাকে বল 'ভালবাসা'। নাটকে যাকে বলে 'প্রেম'। চাষাভুসো যাকে বলে 'পিরিতি'। বিজ্ঞান যাকে বলে 'প্রাকৃতিক পছন্দ'। ভূতত্ত্ব যাকে বলে 'রাসায়নিক সংমিশ্রণ'। উপন্যাস যাকে বলে 'প্রণয়'। সেই রকম বেদছাড়া, উপনিষৎ-ছাড়া, বৈষ্ণবী তন্ত্রছাড়া, উদার, ভিতরে-বাহিরে মেশানো একটা ভাব পূরবী ও প্রতীচ্যকে দখল করে বসেছিল তা আমার বুঝতে বাকি রইল না। হয়ত ত্রেতায় রামচন্দ্র এবং দ্বাপরে অর্জ্জুন বর্ণশঙ্করত্বের ভয়ে সেটার প্রতিরোধ করবার তর্ক তুলতেন, কিন্তু তিন যুগ ভাসিয়ে দিয়ে যখন শেষযুগে সেটা মোহিনীমূর্ত্তি ধরে নব-সমুদ্র মন্থনের পর বেরিয়েছে, তখন তার অভিনয়টুকু রঙ্গস্থলে একবার দেখা নিতান্ত দরকার। তাই, আমি সেটাতে বাধা দিলুম না।

আর কমলা? সে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বারান্দায় বসে থাকৃত। তাকে দেখে মনে হত যেন 'সফ্রাজেট্‌'দের রাণী। যদি কখনো কান্না পেত তখন সে চ'খের জল রাগের ভরে মুছে ফেল্‌ত। আমি একদিন তাই দেখে অচকিতে

হেসে ফেল্লুম। কমলা তার কটা চুল কাঁচি দিয়ে কাট্‌ছিল।

আমি ধীরে ধীরে তার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'জটা পড়ে গিয়েছে না কি?'

সে আমার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বল্ল, 'কেন? তাদের পরশুকার চুম্বনের মধুর প্রতিধ্বনিটা শুন্‌তে পাও নাই'?

আমি উদাস ভাবে বল্লুম, 'কমলা, তখন আমি প্রভাত-বায়ুর নস্য নিচ্ছিলুম। রূপযৌবনের সৌগন্ধি দিয়ে দাঁত মাজ্‌ছিলুম। তোমার দশাটা কি বলত?'

কমলা। আমি প্রেমসোনামুখীর জোলাপ অনেকদিন আগে নিইছি।

আমি তার তিক্ত বেয়াড়া কথায় খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লুম।

সে হেসে বল্ল, 'ঐ দেখ, তোমার মধ্যে মানুষের অমানুষী ভাবটুকু এখনো আছে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি জুটতে পারে, কিন্তু তোমরা যাকে প্রেম বল তা জুট্‌তে পারে না'।

আমি হেসে বল্লুম, 'হাজার হোক তুমি প্রতীচ্যের স্ত্রী। চিরকাল তারি থাক্‌বে। ভয় কেবল পূরবীকে নিয়ে।'

কমলা হেসে বল্ল, 'শৈবলিনী কখন ফষ্টরকে ভাল বাস্‌বে না, গোরাকেও না, নিখিলেশকেও না—সে জ্বলে-পুড়ে মরবে, সেও কবুল। যদি সে প্রেমকে অন্যরকম করে দেখে, যদি ভস্ম মেখে ভক্তি শেখে, তবে হয়ত তার চন্দ্রশেখর বেঁচে উঠবে। তোমার মরণই ভাল'।

(৫)

অনেক করে বুকের বেদনা লুকিয়ে রেখে, পূরবীর চাঞ্চল্য ও প্রতীচ্যের দুর্দ্দম্য পিপাসা প্রতিদিন দেখতে লাগ্‌লুম। কিন্তু আমি না দিলেও, কমলা সেই লীলাটুকুর মধ্যে এমন স্থান অধিকার করে বসেছিল যে ইতিহাসটা কোন্‌দিকে গড়াবে তার কূল-কিনারা পাওয়া গেল না। একদিন মনে কল্লুম পূরবীকে জিজ্ঞসা করি 'তুমি কি প্রতীকে ভালবাস?' পূর্ণিমায় শৈত্য রাত্রি। শুভ্র কুসুম-রাশির মতো পূরবী আমার শয্যা আলো করে ঘুমুচ্ছিল। আমি পশমের গাদার মধ্যে মুড়ি দিয়ে আত্মপরের দর্শনশাস্ত্র ভাবছিলুম। পূরবীর এলোথেলো সৌন্দর্য্য দেখে মনটা কেমন করে উঠ্‌ল। সে সৌন্দর্য্য কলমে কিংবা তুলিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু না-জানি কেন হৃদয় এত কঠিন হয়ে গেল যে সহস্র বৎসর যেন তার মধ্যে প্রেমের অভিনয় হয় নি। আমার জগতে তখন 'আমি' ছাড়া আমার আর কেহই ছিল না। বাপ নাই, মা নাই, তিন কুলে কেউ নাই, এমন যে হতভাগা আমি—আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? একবার মনে হ'ল পূরবীকে জাগাই। হয়ত বলে দেখি, 'পূরবী, আমি অসম্পূর্ণ হলেও তোমাকে ভাল বাসি। তুমি প্রতীচ্যের কোন্ গুণ দেখে ভুলে গেলে? আমি নাচ-গান শিখ্‌ব, হ্যাট-কোট পর্‌ব, তোমাকে গান শেখাব, দুজনে একত্রে বসে করি কট্‌লট্ খাব, দেশ-বিদেশে জাহাজে করে বেড়াব।' কিন্তু তখনিই নিজের দৌর্ব্বল্য দেখে নিজে চম্‌কে উঠলুম। আমি না হিন্দু? স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা? হিন্দু মনে হতেই বুদ্ধদেবকে মনে পড়ল, চৈতন্যকেও মনে

পড়ল, আবার বেদান্ত-উপনিষৎ মনে পড়্‌ল, মন্ত্র মনে পড়ল। মার কাছে এক ভিক্ষা সাজে; ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে প্রেমের বৈরাগী সাজাটাও ত ধর্ম্মের একটা অঙ্গ শুনেছি, কিন্তু আমি যে-রকমভাবে কাতর হয়েছি সেটা যেন নিজের গৌরবের জন্য মায়াকান্না। যেন কুকুরের মতো—

আমি ঘর হতে বেরিয়ে সেকালের ভাঙ্গা বারান্দার দিকে অগ্রসর হলুম। কেমন দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা হ'ল ঘর হতে বেরিয়ে যাই। ঘরের মধ্যে কুকুর ও বেড়াল কেঁদে উঠল। চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল দেখ্‌তে লাগলুম। কিন্তু একটা খেয়াল বদ্ধমূল হয়ে গেলে, এবং মায়ার বন্ধন প্রথম হতেই শিথিল থাক্‌লে মানুষ পাখীর মতো উড়তে থাকে।

আমি কি করে, কোথায়, কোন্ দিক্ দিয়ে, হাজারিবাগের জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছিলুম তা মনে পড়্‌ছে না। একটা অতিথিশালায় বসে আছি। একখানা যদি গাড়ী পাই তবে নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে বিন্ধ্যাচলের দিকে কিংবা নর্ম্মদার তটে গিয়ে পড়ি। এমন সময় দেখি যে একখানা গরুর গাড়ী করে একজন লোক এসে উপস্থিত। তার মূর্ত্তি এমন কট্‌মটে যে আমার বিলক্ষণ আতঙ্ক হল। যেন সে আমাকেই খুঁজ্‌ছিল। সে গাড়ী হতে নেমেই আমাকে জিজ্ঞাসা কল্ল, 'মশায়ের কি করা হয়?'

আমি। ছোট ছোট গল্প লিখি।

আগন্তুক একখানা খাতা বের করে দেখতে লাগল।

'ঠিক! আপনার নাম বিনোদবাবু?'

আমি সত্রাসে বল্লুম, 'বোধ হয়'।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে অতিথিশালার লোকটিও সে সময় অন্তর্দ্ধান! বোধ হয় তাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র পূর্ব্ব হতে পাকানো ছিল।

আগন্তুক। আমার সঙ্গে আপনার যে কথা সেটা বড় 'ডেলিকেট্'। অর্থাৎ, আপনাকে আমি টিপে মেরে ফেল্‌ব।

আমি। আপনার এমন বিকট সাধের উদ্দেশ্য কি?

আগন্তুক। আপনার সময় হয়ে এয়েছে।

'আমি একটা নূতন মাসিকপত্র বের কর্‌ব মনে কচ্ছি এমন সময় একি বিড়ম্বনা! পুরাণো সম্পাদকদের মারুন না। 'সাহিত্য-সম্পাদক, 'ভারতী'র সম্পাদক, এবং আরও প্রবীণ এবং নবীন সম্পাদকবৃন্দ দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে, তাদের না মেরে আমার মতো হতভাগা লোকটাকে মেরে নরক গুল্‌জার কর্ব্বার দরকার কি?

আগন্তুক আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বল্ল, 'সময় এলে সকলকেই মর্ত্তে হবে। খাতায় এবং মৃত্যুপঞ্জিকায় আজ্‌কে তোমার নাম লেখা আছে। জানা থাকে যেন আমি নিজেই যম, আমার অসংখ্য অনুচর অন্যান্য লোকদের আয়ু শেষ কর্ত্তে গেছে'।

আমি নিঃসহায়! কিন্তু দারুণ ভয় হতেই একটু সাহস জন্মে গেল। বিশ্বের বজ্রসমষ্টি মাথায় পড়্‌লেও আমাকে তখন কাবু কর্ত্তে পারত না।

তাই আমি আবার বল্লুম, 'লোকে হয়ত ব্যারাম হয়ে মরে, কিংবা অনাহারে শোক দুঃখে ক্রমশঃ মরে। গলা টিপে যমরাজ নিজে

এসে মারে এমনধারা গৌরবময় বিধান আমার জন্য কেন হয়? আপনি গলা ছাড়ুন, মরবার আগে একটু তর্ক কর্ত্তে দিন। তর্কে পরাস্ত না হ'লে বাঙ্গালী কখনো মরবে না, এটা নিশ্চয় জানবেন। যদি জোর করে নিয়ে যান তবে স্বর্গেই হোক কিংবা নরকেই হোক, এমন তর্ক কর্‌বো, এমন সব কথা প্রচার করে দেব, এবং এমন উপন্যাস ও নাটক লিখব যে দেশগুলো সমূহ খেপে উঠ্‌বে'।

যমরাজ একটু মুখ বিকৃত কল্লেন। আমি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'আপনার কি বাতের ব্যায়রাম আছে?'

যম খুসী হয়ে বল্ল, 'খানিকটা বটে। মানুষ মেরে এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, যে সম্প্রতি পক্ষাঘাতের ভয়ে একফোটা 'রস্‌টকস্‌' (ছয় ডাইলুশন) দুবেলা করে খাই। মাঝে মাঝে আমার আর্ত্তনাদ শুনে গাড়ীর গরুদুটি রাস্তার মাঝে থাম্‌ছিল। আমারও বৃদ্ধাবস্থা হয়ে এসেছে'।

আমি মনে মনে ভাবলুম, 'এইত করুণ রস উদ্রেকের সময়।'

(৬)

তাই আমি অনেক চেষ্টায় কল্পনা করে কাঁদতে লাগ্‌লুম। যম বল্লেন, 'ছি। কেঁদনা বাবা! বাঙ্গালী মেয়েমানুষের জাত হলেও, গৌরব রাখ্‌বার জন্য জলটা বাদ দিতে হবে। তোমার নল-দময়ন্তীর গল্প মনে পড়ে না?'

আমি বল্লুম, 'জানি বৈকি। কিন্তু দময়ন্তীও ত নলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। আমার স্ত্রী সদর রাস্তা পর্য্যন্ত ত এগুলো না'।

যমরাজ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাইতে বুঝতে পাল্লুম যে একালের উদার নাটক-নবেল সে মোটেই পড়ে নাই।

যমরাজ। তাই নাকি? কারণ কি?

আমি। সে আর একজনকে পছন্দ করেছে,—বল্‌তে লজ্জা কি তাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে। আমার মতো হতভাগা জগতে নাই।

কথাটা যমের মনে লেগে গেল। তিনি কি ভাবতে লাগ্‌লেন।

আমি বল্লুম, 'ধর্ম্মরাজ, তুমি ত যুধিষ্ঠিরকেও দেখেছ, দ্বৈতবনে শ্রীকৃষ্ণকেও দেখেছ, সত্যবানকেও দেখেছ। শ্রেষ্ঠ কবিগণ তোমার সৌন্দর্য্যই দেখে। সেই সৌন্দর্য্যটুকু আমাকেও একবার দেখাও না কেন?

যম। সে কেবল আমার ভয়ে তারা আমার সৌন্দর্য্যই দেখে। আমার নাচ-গান আসলে খুব ভয়ঙ্কর, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়েছি। আমি হ'লে এমনধারা স্ত্রীর গলা টিপে মেরে ফেলতুম, কিংবা ভয়ানক একটা শাপ দিতুম।

আমি বল্লুম, 'তাহলে পুলিশে ধরবে এবং কাগজে বেরিয়ে পড়বে। আজকাল ও-রকম কিছু করবার যো নাই। যার যে রকম খুসী সে সেই রকম পথে যাবে, মত প্রচার করবে, বই লিখবে। তা নিয়ে তর্ক কর্ত্তে পারেন, সং সাজাতে পারেন, অভিনয় কর্ত্তে পারেন, কিন্তু গায়ে হাত দেবার যো নাই'।

যমরাজ বেজায় চটে বল্লেন, 'অত্যন্ত কদর্য্য প্রথা। আমার এ-সব শুনে ইচ্ছে হ'চ্ছে যে এ যাত্রা তোমাকে ছেড়ে দিই'।

আমি তাঁর পা জড়িয়ে বল্লুম, ‘তাহলে সকলেরি মঙ্গল।’

যমরাজ হেসে বল্লেন, ‘দেখ! প্রাণের মায়াটা কত বড় মায়া। তুমি এত মনের ব্যথা পেয়েও বাঁচতে চাচ্ছ। কিন্তু একটা শক্ত কথা আছে। বিধির বিধানে কাহাকেও অব্যাহতি দিতে গেলে একটা সর্ত্ত পূরণ করা চাই। হয়ত সতীর স্বামীর জীবন ভিক্ষা করে নিতে হবে, নচেৎ স্বামী স্ত্রীর আত্মা পরস্পরের সঙ্গে বদলাবদ্‌লি হওয়া দরকার। তুমি বাড়ী ফিরে প্রথমটার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা দেখ’।

আমি বল্লুম, ‘অসম্ভব। একেত ‘সতীর’ অর্থই ঠিক বুঝি না, আর যদি নিজের ভরণপোষণের ভয়ে কেউ আমার জীবন ভিক্ষা করে তবে তার চেয়ে সরাই ভাল’।

যমরাজ বোধ হয় আরও খুসি হলেন। ‘আচ্ছা, তবে তোমাদের আত্মা বদলাবদ্‌লি কল্লে কি হয়। সে আমারিই হাতে’।

আমি বল্লুম, ‘আরও বুঝিয়ে বলুন’।

যমরাজ। কথাটা সোজা। তোমার দেহের মধ্যে তোমার স্ত্রীর আত্মা, মনের সঙ্গে চলে আস্‌বে, আর তোমার আত্মা, মনের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর দেহে ঢুকে পড়বে। যদি এ রকমটা করে দিই তবে তোমার স্ত্রীর ভাব সম্পূর্ণ দেখতে পাবে, আর তোমার মতো হয়ে পড়বে।

আমি বল্লুম, ‘এমন কি হওয়া সম্ভব? বিজ্ঞান বলে দেহের গঠন নিয়েই ভাব। মস্তিষ্ক নিয়ে মন। সমস্ত কাঠাম না বদলালে ‘মানুষ’ কি কখনো বদলায়?

যম। বিজ্ঞানের মুখে ছাই। মানুষের মন ও মতামত অহরহঃ বদলাচ্ছে। কখনও সম্পূর্ণ বদ্‌লে যায়। শরীরটুকু পশুর মতো তাহা বহন করে কখনো বদলায় না। প্রথমে একটা ঘোর আন্দোলন হয় বটে, কিন্তু আমরা নূতন মনটুকু আত্মার সঙ্গে এমন করে গুছিয়ে দিই যে মানুষ পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলে যায়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে। নিতান্ত সইতে না পার্‌লে আত্মহত্যা করে। আবার তাকে নূতন দেহে ভর্ত্তি করে দিই।

(৭)

কথাটা মন্দ বোধ হ’ল না। আমার মনের ভাব দেখে, যম আমাকে বল্লেন, ‘কাছে এস।’ আমি মরণের বুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম।

মরণ জিনিষটা তোমরা যত ভয়ঙ্কর মনে কর তার কিছুই না। অনেকটা নেশার মত। বিশেষতঃ আত্মা বদলানোর কৌতূহলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়াতে আমি যেন ঘুমিয়ে পড়লুম। তার পরে বোধ হল একটা স্বপ্ন। স্বপ্নে প্রতীচ্যকে দেখতে লাগলুম। কমলাকে দেখলুম। পূরবীকে দেখলুম। যেন কমলা পূরবীকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। পূরবী অনাথিনী, একাকিনী। সে বড় কাতর ভাবে বল্‌ছে, ‘কমলা, আমার সর্ব্বস্ব নে, গহনা নে, ঘরবাড়ী নে, কিন্তু একবার মরণের সময় স্বামী কোথায় বলে দে। তার সঙ্গে একবার জন্মের মতো দেখা করিয়ে দে। আমি হিন্দুর মেয়ে, জন্ম-সন্ন্যাসিনী, মা হবার সাধে পুতুল গড়িয়ে স্বামীপূজা করি। মা হবার সাধেই দেবদেবতার অর্চ্চনা করি। তোদের নিষ্ঠুর

তন্ত্রে মা নেই, তোরা তার তত্ত্ব বুঝিস্‌নে। তোদের তন্ত্রে স্বামীর উপাসনা করে সন্তানের সুখ কি করে' দেখে তা লেখা নেই। কমলা, সব নে, কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করাস্‌নে। তাহ'লে সব ছারখার হয়ে যাবে। বিশ্ব থাকবে না।"

কিন্তু কমলা তার উত্তর দিল কৈ? সে তখন পাগলিনী। উন্মাদিনীর মতো হাস্‌ছে। সে তার কল্পনার সন্তানগুলিকে একে একে নষ্ট কর্‌ছে, ভেঙ্গে-চুরে ফেল্‌ছে। সে বলছে, 'বেশ করেছি। স্বামী আবার কি? সন্তান আবার কি? গুলি-বারুদের মধ্যে উড়িয়ে দেব, গ্রেসিয়ারের মধ্যে ডুবিয়ে দেব'।

তার পর কমলা অট্টহাসি হেসে প্রতীচ্যের দিকে দৌড়াল। প্রতী পূর্ব্বকালের মতো ইজিচেয়ারে বসে নবেল পড়ছিল আর সিগারেট্‌ ফুঁকছিল। সে কেবল বল্ল, 'ও ডিয়ার, ও ডিয়ার'! সে কমলাকে একটা বড় বিছানার চাদর দিয়ে বেঁধে ফেল্ল ও বিরক্ত হয়ে বল্ল, 'ডেমিট্‌'।

আমার মাথায় ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিতে লাগল। যেখানে পূরবী গড়াগড়ি যাচ্ছিল সেখানে ছুটে গিয়ে আর্ত্তস্বরে ডাক্‌লুম, 'জীবনসর্ব্বস্ব! আমি এসেছি'।:

কিন্তু তখন পূরবীর চখ 'কাঁচের মতো দেখাচ্ছিল। আমি করুণস্বরে কেঁদে উঠলুম। সেই সময় যমরাজ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে বল্লেন, 'তুমি একটা মহা ভুল করছ।' তুমি যার জন্য কাঁদ্‌ছ, সে 'বিনোদ', আর তুমিই 'পূরবী'। 'বিনোদ' পূরবী হয়ে পরলোকে চলে গেছে। যথার্থ ঘটনাটা তুমি দেখতে পেয়েছ বটে, কিন্তু পূরবী হয়ে তুমি তোমাকেই ভালবাস্‌ছ। তুমি প্রতীচ্যকে কখনও ভাল বাস নাই। তুমি সতী। তুমি চিরকালই বিনোদের থাক্‌বে, বিনোদই তোমার 'জন্মের জন্মের, জীবন ও মরণের স্বামী।' যতদিন তুমি পূরবী সাজো নাই ততদিন তা বুঝতে পার নাই। তোমার স্মৃতিগুলো এখন দ্বিধা হয়ে গেছে।'

আমি উন্মাদের মতো মরণকে বল্লুম, 'আমার সঙ্গে ছলনা করনা। আমার জীবনদেবতা বিনোদ কোথায় বলে দেও। কমলা! একবার বলে দেও। কমলা! তুমিই আমার যম!'

যম হেসে বল্ল, 'তোমার মধ্যেই তোমার বিনোদ। আবার আর একদিকে তোমারই মধ্যে তোমার জীবনের প্রিয়সখি। অদল বদল না হলে, দুটো আত্মা একাধারে না থাক্‌লে বিবাহ কি? স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কোথায়? তোমরা গল্প লেখবার সময় সেটা ভুলে গিয়ে পুরুষের ভাবের উপর বসে পড়, আর স্ত্রীলোকেরা তাদের ভাবের উপর বসে। তোমরা বল একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ, কিন্তু রাধাকে, কৃষ্ণকে পুরুষ মনে কর। মরণের পর স্ত্রী-পুরুষের ভাব ঘুচে গেলে সেই ভুলটুকু থাকে না। তোমরা দর্শনের কথা পাড়, কিন্তু স্থূলদেহ হতে একইঞ্চি উর্দ্ধে উঠ না। মাঠ-ঘাট নদনদী আকাশ জুড়ে তোমাদের কল্পনার দৌড়। নিজের বাইরে একটা অসীম কল্পনা করে' বল যে বিশ্বের সঙ্গে মিশছ, কিন্তু বিশ্বটা যে প্রেমের কাছে কত ক্ষুদ্র একটা কণার মতো, সেটুকু প্রথমে অর্থ বুঝতে পার্‌লে

খানিকটা বোঝা যায়। বিনোদ! আগে ছোটকেই একবার ভালবাস, বড় সেই টানে চলে আস্‌বে। একটা কলঙ্কিত জিনিসকেও হৃদয়ে তুলে নিতে পার্‌লে বিশ্ব শুদ্ধ সেই বোকাটার সঙ্গে হাল্‌কা হয়ে উঠে পড়বে। বিনোদ, ভিতরে যা আছে বাহিরে তা নাই।"

আমার মন কিন্তু মান্‌ল না। আমি ক্রমাগত বলতে লাগলুম, 'মরণ, আমার বিনোদকে এনে দেও, আমার পূরবীকে এনে দেও! দুজনকেই দেও। রক্তমাংসে গড়ে দেও'।

যমরাজ বল্ল, 'তুমি এখন সম্পূর্ণ দুঃখী, তোমার আত্মা দুটো ছবিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় চক্ষুতে এসে পড়েছে। তুমি এখন চলে যাও।"

(৮)

(আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন)

বিনোদ এই বলে আমার বুকে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন সন্ধ্যা খুব-ঘনহয়ে বন ছেয়ে ফেল্‌ল। আবার গাছের উপরে সেই অজানা পাখীগুলি গম্ভীরস্বরে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, 'এস—এস'। আবার গহনবনের মধ্যে পূর্ব্বেকার শুভ্র সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি আমাদের পথ দেখাবার জন্য ফুটে উঠ্‌ল। যে গিয়েছিল তাকে আবার বুকের মধ্যে পেলে কত আনন্দ হয়! সখা!

আমি সেই আনন্দে অধীর হয়ে আঁধারের দিকে তাকাতে লাগলুম। এ সংসারে মরণ কোথায়? সবই জীবন। আমার পদতলে শুকনো গলিত পত্রগুলি কেঁপে উঠল, দূরে পাহাড়ের মাথাগুলো অন্ধকার ভেদ করে গর্ব্বিত বাণীতে বল্‌ছিল, 'ঠিক! এ সংসারে মরণ কোথায়? যখন দুটো একত্র হয় তখন মরণ নাই। একটা আর-একটাকে বাঁচিয়ে রাখে। যখন একটা ভয় পায়, তখন অন্যটা বলে আমি শিয়রে বসে আছি, তোমার ভয় কি? যখন অন্যটাও ভয় পায়, তখন আর একটা কোথা হ'তে এসে বলে, ওরে পান্থ, তোর যেটা গিয়েছে, সেটা আমার কাছে।'

আমার ক্ষুদ্র দীন জীবন আজ যেন ঐশ্বর্য্যময় হয়ে উঠ্‌ল। আমি বিনোদের জটাগুলি একে একে ছাড়িয়ে দিতে লাগ্‌লুম।

মা অন্যদিন আমাকে খুঁজতে আসেন না। আজ বোধ হয় তিনি একটু ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ আমার পেছনে একটা প্রতিধ্বনি হ'ল, 'হরিদাস, তুই এখনো এখানে বসে কি কচ্ছিস্? আজকার ট্রেনে আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি লোক এয়েছে। আহা! সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে? যার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে?'

আমি। পড়ে।

মা। তার ভাই তাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে এসেছে। মেয়েটির চেহারা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। এমন রূপ, তাতে কালি পড়েছে, চখে বোধ হয় দেখ্‌তে পায়না, চুলগুলোর কিছু নাই, মরণাপন্ন অবস্থা।

আমি বল্লুম, 'মা! শেষ অবস্থারও ওষুধ আছে। এই যে সন্ন্যাসীটি এখানে ঘুমুচ্ছেন ইনি আশ্চর্য্য ঔষধ জানেন'।

বিনোদ তখন জেগেছে। মা তাকে দেখে বল্লেন, 'বাবা! আমি হরিদাসের মা! আমার চেয়ে সুখী কেউ নাই। কিন্তু আজ জীবনে একটা দুঃখ পেয়েছি'।

সন্ন্যাসী বিনোদ তাঁর দিকে চেয়ে বল্ল, 'মা, যদি আমাকে দিয়ে তোমার দুঃখ যায়, তবে আমি প্রস্তুত।'

মা বল্লেন, 'বাবা, মরণের ওষুধ নাই তা ত জানি, অথচ মরবার আগে ঠিক ওষুধ পড়্‌লে অনেকে বাঁচে তাও দেখেছি। আমাদের বাড়ীতে একটি মেয়ে হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছে, সকলে বলে যে দৈব ওষুধ ছাড়া সে বাঁচবে না। যদি তুমি একবার দেখ'।

বিনোদ। তার স্বামী আছে?

মা। বোধ হয় বিধবা, আমি কিছু ঠিক জানিনে।

বিনোদ বল্ল, 'চলুন'।

•

আমি সেই শুভ্র সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরে বিনোদকে ধীরে ধীরে নিয়ে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হলুম। তখন আমাদের বাড়ীতে সান্ধ্যশঙ্খ বেজে উঠ্‌ছিল। মা সন্ন্যাসীকে নিয়ে পূজোর ঘরে বসিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর পূজো সাঙ্গ হ'লে মা পূরবীর হাত ধরে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে এলেন। মা বল্লেন, 'প্রণাম কর'।

সেই জীর্ণা শীর্ণাটির প্রণাম কর্‌বারও শক্তি ছিলনা বোধ হয়। স্বামীহারা হ'লে কার সে শক্তি থাকে? সে প্রণাম কর্‌তে গিয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

বিনোদ তাকে দেখেই বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল। পাছে কোন গোলমাল হয় তাই আমি বিনোদের কাণে কাণে বল্লুম, 'এখনও বেঁচে আছে, একবার কোলে নেও, আমরা যাই।'

তারপর কি হয়েছিল, জানিনে।

কিন্তু ভোরের বায়ু বইতে না বইতে দেখ্‌তে পেলুম যে একটা আনন্দময়ী কঙ্কালসার কুলবধূ ঘোমটা দিয়ে তুলসী-তলায় নমস্কার কর্‌ছে। জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম কর্‌ছে। গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করেছে। ছেলেপুলেদের জাগিয়ে তুলেছে। সেবায় তার মন। বিশ্বের ঐশ্বর্য্য তার নিকট ছার। সে কেবল জীর্ণবাসের মধ্যে একটু অবগুণ্ঠন চায়। বায়ু তার দিকে নির্ম্মল হয়ে দৌড়ে আসে, অগ্নি তার কাছে শীতল হয়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করে, পৃথিবী তার স্পর্শে উর্ব্বরা হয়, জল তার নিকট ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যেও স্বচ্ছ থাকে। আকাশ অসীমত্ব ছেড়ে তার চতুস্পার্শ্বে সসীম হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে ঘরের মধ্যেই থাকে। মন্দিরের মধ্যেই থাকে। হতভাগ্য! যদি মরণের হাত এড়াতে চাও, তাহাকে বাহির করে দিওনা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মানসিক

ধূসর মেঘের আঁচলঘেরা ঢেউ-খেলানো রূপালি আলো, আমায় কি বলবে, কি বলতে চাও ?—"আঁধার গিয়ে আলো আবার আসবে !" আলো ত চাইনে আমি, আমি চাই নিবিড় নীরব অন্ধকার। তারি মধ্যে আমার স্মৃতির অসংখ্য তারা ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে, উজ্জ্বল হ'তে থাকবে, অজস্র অকথিত বাণী, বীণার সঙ্গীতে আমার সমস্ত মৌন মনকে পরিপূর্ণ করে তুলবে। তাদেরি সঙ্গে আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যাবে। আমি আমার চিন্ময়ের সঙ্গ-সুখে সদানন্দে থাকব।

* *
*

যে আলো-কে আমি এত ভালবাস্‌তাম, আজ কেন প্রাণ আর তাকে চাইছে না ? উজ্জ্বল আলো চোখকে যেমন পীড়া দেয়, আমার মনকেও কেন তেমনি ব্যথা দিচ্ছে ? আলোর মধ্যে একটি তাড়না আছে—সে বলে, চল ; সে বলে, উঠ ; সে বলে, খোঁজ ; সে বলে, পথ দেখ। কিন্তু আজ আমার মন আর পথ চলতে চায় না, আবিষ্কার করতে পারবে না, আর নূতন-কিছু দেখতে চায় না। ওগো, এস দৃষ্টিহরা, শান্তি-আবাহন-করা, ঘুমপাড়ানো নিবিড়, গভীর, অতল অন্ধকার ! আমায় একেবারে তোমার মধ্যে বিলুপ্ত করে দাও, একেবারে তোমার সঙ্গে লীন করে নাও। চোখের দৃষ্টি যেমন আজ আমার মনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, মনের দৃষ্টিও আমার লোপ হয়ে যাক্। শান্তি এস, আমার নিদ্রার আঁচলে ঘিরে অন্ধকারের নিঃশব্দ ঘরে নিয়ে চল। স্বপ্নও দেখতে চাইনে আমি। অন্তর বাহিরের নিবিড় সমাধি হোক আমার। কোনও শব্দ, কোনও স্পর্শ, কোনও গন্ধ, কোনও আলোক আমার যেন আর নাগাল না পায়।

* *
*

প্রথম গর্ভসঞ্চার মায়ের মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দবহন করে আনে, তার কাছে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে, যে নূতন আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তারপরে জীবনে আর কখনো তেমনটি হয় না। আর প্রথম সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ হয়, আর কখনো সে স্নেহ অন্য সন্তানের প্রতি হয় না ; সে যদি বাঁচে, বেঁচে যদি বা অযোগ্যই হয়, তবুও সে যা পায় আর কারো ভাগ্যে তা ঘটে না। স্ত্রীলোক, জীবনে শুধু একটিবার এম্নি করেই তার মনোভব কোন মানুষকে ভালবাসে, সে ভালবাসা তার পক্ষে নবজন্মলাভ, কিম্বা তার অতীত অস্তিত্বের মৃত্যু। নারী যখন প্রথম মা হয়, তখন সেও এম্নি আবার জন্মায়, তার পুরাতনের মৃত্যু হয়ে যায়। তার সব স্বার্থ চলে যায়, স্নেহের স্তন্য সুধায় তার সমস্ত জীবন অমর হয়ে ওঠে।

* *
*

দুঃখের যে সার্থকতা আছে সেত প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করছি। দুঃখের আগুনে পরখ করে না নিলে কিছুই খাঁটি হয় না। তাইতো উমা হৈমবতী বসন্তের অপর্য্যাপ্ত পুষ্প-সম্পদের মধ্যে নবযৌবনের পূর্ণ সুখোৎসবের দিনে মহেশ্বরের প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ভালবাসার মত এমন ভাল জিনিষও অনেক দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে, অনেক চোখের জলে ধুয়ে নিলে তবেই পবিত্র হয়, তবেই তার অমর প্রাণটুকু আমাদের নয়ন-মনের সম্মুখে সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। সুখের হাল্কা হাওয়ায় সাধের তরণী যখন বেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন ভালবাসা যে কোথায় থাকে, তার বড় সন্ধান হয় না। তখন আলো আর গান, জলের দোলা, আর ঢেউএর ডাকাডাকি, নদীর স্রোত তার অবিরাম প্রবল গতি আর নৌকা বাইবার আনন্দ, এই সমস্তই মনটাকে অধিকার করে, অভিভূত করে রাখে। কিন্তু যখন আকাশে মেঘ উঠে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিবিয়ে দেয়, ঝড়ের দাপটে, স্রোতের আক্রোশে, ছোট তরি খানি ডুবে মরতে চায়, যখন আলো যায়, হাসি যায়, গান আর থাকে না, ঢেউএর মৃদু হিল্লোল দূর হয়ে, বিপুল তরঙ্গ উদ্ধত-রোষে কেবলি গর্জ্জে ওঠে, তখনি ভালবাসা কর্ণধার হয়ে বসে, তখনি আমরা তার সত্যিকার মূর্ত্তি দেখতে পাই। অবিচল, প্রবল, দৃঢ়, নিতান্ত নির্ভীক, দেবতার মত অনিমেষ দৃষ্টি, তাঁরি মত অমর।

এই ভালবাসার সঙ্গে যার একবার মুখোমুখি প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, তার একটা মস্ত লাভ হয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। এ ভালবাসাকে যে জেনেছে, সে বিশ্বের মাতৃহৃদয়কে দেখতে পেয়েছে—যে মাতৃস্নেহ সন্তানের কল্যাণের জন্যে কোন দুঃখকে বরণ কর্ত্তেই পরাঙ্মুখ নয়, মৃত্যু যার কাছে মুক্তির মত আনন্দময়, সে অমৃত মূর্ত্তি যে একবার চকিতের মতও দেখে, তার জীবন ধন্য হয়ে যায়। সেই মুহূর্ত্তেই এই জ্ঞান লাভ হয় যে দেবতা মানবে ভিন্ন ভেদ নাই। আত্মা, পরমাত্মা একই!

* *
*

মানুষের মনের এই যে অবিরাম চেষ্টা—গতি নিয়মিত করতে, উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করবার জন্যে, এর কি কোন অর্থ নাই? নিশ্চয়ই আছে, যেটা হেঁটে চলবার পথ, সেখানে যদি একজন অনবরত দৌড়েই চলে, তাহ'লে অপর দশজনের অসুবিধাত হয়ই, তাছাড়া নিজেরও প্রাণসংশয় ঘটে।

পৃথিবীর সৌন্দর্য্যই নিয়মের পরিণাম, এই যে অক্ষৌহিনী গ্রহনক্ষত্র আকাশ-পথে, অন্তবিহীন গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, এর কারোই ক্ষমতা নাই যে তার অধিকারের বাহিরে সূচ্যগ্র ভূমিও অতিক্রম করে যায়। আর সেই শক্তিহীনতাই সমস্ত গতি, উন্নতি ও সৌন্দর্য্যের ভিত্তি। গ্রীকরা মনে করতেন, গ্রহনক্ষত্র সঙ্গীতের তালে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাদের একটি বাঁধা রাগিণী আলাপ করতে হয়। রাগিণী-আলাপের সময় সুগায়ক মূর্চ্ছনার আবেগ এমনি ভাবে সংযত করেন, যাতে করে তাঁর সমে পৌঁছবার

কোন ব্যাঘাত ঘটে না। জীবন-রাগিণী আলাপের সময়, সে আমাদের ভাগ্যে, আশাবরী, ললিত, ভৈরবী, কামোদ, কল্যাণ, কি পূরবী, যাই হোক না কেন; গমক-গিটকিরির যতই কৌশল প্রকাশ করি, ভুললে চলবে না যে সমে আমাদের পৌঁছতেই হবে, তা না হলেই সব মাটি।

* *
*

আমরা যখন যাত্রা করলাম, তখন সূর্য্যাস্তের সময়; পশ্চিম আকাশে রঙমহালের সব দরজা-জানলা খুলে গিয়েছিল, সেদিকে কতরকম রংএর খেলাই দেখা যাচ্ছিল। সেই সপ্তবর্ণ বৈচিত্র্যের লীলার ছায়া আবার চঞ্চল জলের উপরে পড়ে, কেমন মিলে-মিশে একপ্রবাহ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, বয়ে চলছিল। নদীর পাড় হতে দিগন্ত পর্য্যন্ত যতদূর দেখা যায়, কি চমৎকার সবুজ, চিরতাপিত ব্যাকুল আমার দুটি চক্ষের উপর স্নিগ্ধ অমৃত-প্রলেপ দিলে; দৃষ্টি আমার শীতল হল, জুড়িয়ে গেলগো সকল জ্বালা! পৃথিবী এমন সুন্দর,—এই সুন্দরের রহস্য কিন্তু সামঞ্জস্য! এই যে যোজনপরিমাণ দেশ আচ্ছন্ন করে শ্যামলবর্ণ দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে অনেক সবুজ আছে, কিন্তু কেউ কাউকে পীড়ন করছে না, অসবর্ণতার প্রবল অত্যাচার কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিরোধ নাই; তাই এমন রমণীয় হয়ে উঠেছে। দিগ্বলয়ের কাছাকাছি যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যাচ্ছে, তার বর্ণ ধূসর গাঢ় নীলের মত; তারপর যত নিকটবর্ত্তী গাছপালা সেগুলি হাল্কা হরিত, তার মধ্য হতে ধূসরের আর নীলের প্রভাব লীন হয়ে গেছে। তার কোলে যে সবুজ দুলছে সেটি দূর্ব্বাশ্যাম, তার পায়ের কাছে আবার যে সবুজ শুয়ে আছে সেটি পীত-হরিত, শুক বক্ষের মত; সব-শেষ সোণার বরণ পাকা ধানের সোণালিসবুজ, তাতে সবুজের চেয়ে সোণার আভাই অধিক। নীচু পাড়ের সঙ্গে জলের ব্যবধান বড় বেশী নয়। ঘোলা জলের উপরেই এই কনকবর্ণ সূর্য্যাস্তের সোণার কিরণে যেন জ্বলে উঠল।

* *
*

কাল সন্ধ্যায় এইখানকার একটি বঙ্গীয় খৃষ্টানের ভাই মারা গিয়েছে—তাকেই এনে এদের গোরস্থানে কবর দিলে। আমাদের মৃতদেহের সংকার করতে বহু সময় লাগে। এদের দেখলাম আধঘণ্টাও লাগল না। এ কিন্তু ভাল নয়, আমাদের প্রথাই ভাল। যে গেছে, তুচ্ছ দেহটা ফেলে গেছে, তার অগ্নিসংকার করে, মাটীর শরীরটা নিরাকার করে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দেওয়া, এইত ভাল, এইত মুক্তি। বোধহয় মানুষ যখন আদিম অসভ্য অবস্থায় ছিল, যখন তারা প্রত্যক্ষের বাহিরে আর কিছুই উপলব্ধি করতে পারত না, তখনই এই সমাহিত করবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। যে মরে গেছে তাকে ভালবাসি, তাকে ভুলতে পারিনে, তাকে দেখতে না পেলেও সে যে নাই কোথাও নাই; এ ধারণা বড় কষ্টকর। তাই তাকে কোথাও এক জায়গায় রাখি, সেখানে এসে কাঁদি, সেখানে সমাদর করে

ফুল সাজিয়ে দি'। মন কতকটা সান্ত্বনা মানে। এর পর পুড়িয়ে সেই ছাই কোন আধারে করে রেখে, তারি উপর মন্দির, স্তূপ কত-কি সুন্দর স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশে মানুষের মন যখন এ বন্ধনের উর্দ্ধে উঠে গেল, যখন তাদের মন অতীন্দ্রিয়ের ধারণা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হল, তখনি অগ্নিসংকার করে ভস্মটুকু গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া, মানবের চরম মুক্তির বিধান হল। যে গিয়েছে সে প্রত্যক্ষ না হয়েও, জলে-স্থলে, প্রত্যেক পবন-নিশ্বাসে, সূর্য্যকিরণে, অন্তরে-অন্তরীক্ষে সমভাবে বিগুমান, এই কথা আমাদের সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হল। সে আর ধরবার, ছোঁবার, বাহিরের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার বস্তু নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত; তবে সে অন্তরের ধন, একেবারে প্রাণের মত সন্নিকট, নিত্য ও চিরন্তন। অবিনশ্বর, জন্মমৃত্যুরহিত, সে দেহ নয় সে আত্মা, তোমার আত্মার সঙ্গে অভিন্ন।

* *
*

চারিদিকেই রহস্য, অস্পষ্টতা, অন্ধকার;—নিমেষের আবরণেই অশেষ ঢাকা পড়ে যায়। এই মনে হয় সব বুঝেছি, আবার দেখতে পাই কিছুই ধরা পড়েনি! জীবনে যদি সব রহস্য মুক্ত হয়ে যায়, সব আবছায়া সাফ হয়, কোথাও কোন পর্দ্দা, কি আড়াল না থাকে, তবে কি মনশ্চক্ষু সে উগ্র আলোক সহ্য করতে পারে? জীবন কি বহনীয় হয়? থাকুক অনিশ্চিত, থাকুক আলো-ছায়ার সম্মিলন, জীবনের পথ অনন্ত, এ সমতলে চলা নয়, এ শৈল-আরোহণ, প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণে যে ধর্ম্মপুত্র আছেন তাঁরি মহা-প্রস্থান, সম্মুখ-যাত্রা, অন্ধকার-যবনিকা সরে যাবেই, স্বর্গের দীপ্তি চন্দ্রালোকের মত করুণা করেই আসবে, অশোভনতার স্থান লুপ্ত হয়ে যাবে, সুন্দর করেই সব প্রকাশ হবে।

* *
*

স্বপ্ন আছে বলেই সাধনা নিরর্থক নয়,—মন দিয়ে যা জানি কাজ দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলতে চাই, তাইতো মনের মধ্যে কেবলি স্বপ্নের অবসর আবশ্যক। এ স্বপ্ন জড়তা নয়,—চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, আনন্দের প্রেরণা, যাত্রা-পথের উৎসাহ। এ না পেলে যে কাজের উৎসাহ থাকে না। আমি অন্তরে-বাহিরে তোমায় দেখতে চাই—সম্পূর্ণ ছবিখানির মত, বর্ণে রেখায় ভাবে আলো ছায়ায় সম্পূর্ণ—ছায়াচিত্রের মত নয়। আমি তোমার কথা সুন্দর রাগিণীর মত শুনতে উৎসুক—মূর্চ্ছনায়, সুরে, তালে লয়ে একেবারে সর্ব্বাঙ্গপরিপুষ্ট। স্বপ্ন আর কর্ম্ম, ধ্যান এবং সাধনা, এইত হর-গৌরী, হরিহর, আর রাধা-শ্যামের সম্মিলন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বেচ্ছাচারী

১২

ক্ষণজন্মা পুরুষ মণিশঙ্কর অনেক কষ্টে ফৌজদারী আইনের কবল হইতে মুক্তি-লাভ করিলেও শিবরামপুর এষ্টেটের ম্যানেজারি চাকরিটি তাহাকে খোয়াইতে হইল। চাকরি খোয়াইয়া উক্ত গ্রামেই সে মহা-আড়ম্বরে জ্যোতিষিক মতে আয়ুর্ব্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিল। 'জ্যোতিষিক মতে'—এই কথা কয়টী সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে রোগীর রোগ ও ভোগের কাল জানাইয়া কতদিন ধরিয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে হইবে এবং আন্দাজ কত টাকা তাহাকে ব্যয় করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইত; উপরন্তু রোগী বাঁচিবে কি না, এবং মরিলেও অন্তত পরজন্মে সে রোগমুক্ত হইবে কি না তাহাও সে সঠিক জানিতে পারিত!

অল্প দিনের মধ্যেই তাহার চিকিৎসার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করার নানা কারণের মধ্যে কেহ কেহ বলিত যে প্রাণী-বিজ্ঞানে ও শারীর বিজ্ঞানে তাহার অপূর্ব্ব অধিকারই অন্যতম। সেই কথার পোষকতায় কেহ কেহ না কি ইহাও বলিয়াছেন যে মণিশঙ্কর প্রাণীগণের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে—যথা অশ্বকে সে না কি মাংসাশী জীবের মধ্যে, না হয়, অন্তত অণ্ডজ জীবের মধ্যে ফেলিতে চায়, কারণ তাহার ঘোড়াটী অনেকবারই তাহাকে দংশন করিয়াছে এবং অশ্বের ডিম্ব প্রসব সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ-বচন প্রচলিত আছে। অর্থাৎ যাহা রটে তাহার কিছু ত বটে—এই শ্রুতি কখনও মিথ্যা হইতে পারে না! অতএব কোন কোন অশ্ব নিশ্চয়ই অণ্ডজ জীব।

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে তাহা আছে কি না বুঝা যায় না! সে প্রমাণ করিয়াছে যে জীবে উপর-কার চোয়াল নাড়িয়া আহার করে; দেহে যত নাড়ী আছে সমস্তই উদরের বত্রিশ হস্ত পরিমিত নাড়ী হইতে উদ্ভূত এবং প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই মূর্ত্তিমান রোগযন্ত্র, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয় যন্ত্রকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

সে তাহার প্রচণ্ড গবেষণার বলে বিশেষভাবেই ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে ইংরাজেরা আমাদের দেশের জন-সাধারণকে চিরকাল দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার জন্যই দেশে কুইনাইন নামক বিষের আমদানি ও প্রচার করিতেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বর আর কিছুই নহে, সে ঐ বিষেরই কার্য্য। এই মতের পোষকতায় সে আরও বলে যে আমাদের দেশে অতীত যুগে বহুপ্রকারের জ্বর ছিল বটে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ নিদান চরক সুশ্রুত পাঁচন-সংগ্রহ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই; অতএব ইহা যে কুইনাইনেরই আমদানি হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত আরও একটি অপূর্ব্ব ব্যবসায় সে তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যা

বা অন্য কোন গুণের দরুণ প্রবল-ভাবে চালাইতেছিল। সে আর কিছুই নয়, পুলিশের গোয়েন্দাগিরি। আজ কাল সন্ধ্যার পর হয় সে দারোগার আটচালায় না হয় তাহার ডিস্‌পেনসারিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার পর কয়েকজন গুপ্তচরের সহিত বসিয়া জল্পনা-কল্পনায় ব্যাপৃত থাকিত। সে চিকিৎসা-ব্যপদেশে বহু গৃহের গুহ্য কথা জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছিল।

মণিশঙ্করের মাতা মনোরমা দেবীও ইতিমধ্যে তাঁহার সংসারটী বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার হাতেও বেশ দুই পয়সা জমাইয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া শেষ বয়সে ৺কাশীবাস করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে এখন মধ্যে মধ্যে উদয় হইতেছে। পুত্রকে পূর্ণরূপে সংসারী করিয়া তিনি একদিন তাঁহার কাশী-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতৃভক্ত পুত্র বলিল, "সে কি হয় মা, এর মধ্যেই কাশী যেতে দেব কেন? আমি মনে মনে যে ফন্দী আঁটছি তাতে যে তুমি না হলে চলবেই না।"

মাতা কহিলেন, "কি ফন্দী?"

পুত্র কহিল, "তুমি ত জান যে কালিকা বাবুর দৌহিত্রকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে কার্ত্তিক এখন পাগলের ভাণ করে পড়ে আছে।"

মাতা কহিলেন, "কি ভয়ানক! সে কি কথা বলিস্ রে?"

পুত্র কহিল, "এই কথা এবং তাই প্রমাণ করতে হবে।"

মাতা কহিলেন, "অমন কাজ করো না, বাবা। ওদের অন্নে আমাদের দেহ, ওদের অপকার করবার চেষ্টা করলে—"

পুত্র কহিল, "দোষীকে শাস্তি না দিলে সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, কিছুই টেঁকবে না। বিশেষতঃ আমি কালিকাবাবুর বংশের ত কারও কিছু করতে চাচ্ছি না। কার্ত্তিকের সঙ্গে আমার আজন্মের বিবাদ, তাকে জব্দ করতেই হবে। ফৌজদারীতে যখন আমি ওরই জন্য পড়ি তখন ওই আমায় জেলে দেবার চেষ্টা করেছিল।"

মাতা কহিলেন, "কিন্তু ওর স্ত্রী, ওর বাপ, ওর বন্ধু তোমায় বাঁচিয়েছেন। না মণি, আর ও সব নয়। এখন যা করছ, তাই কর। আর ওদের দিকে নজর দিয়ো না, তাহলে যা আছে তাও যাবে। আমি এ বিষয়ে তোমায় কোন সাহায্য করব না, এমন কি যদি জানতে পারি তুমি ঐ চেষ্টা করছ, তাহলে সব কথা প্রকাশ করে দেব, না হয় এখান থেকে চলে যাব।"

মণিশঙ্কর তাহার মাকে চিনিত। তিনি যদি কোন বিষয়ে অমত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করা মণির সাধ্যাতীত। মণি অগত্যা নিরুপায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

১৩

আঘাতের প্রতিঘাতই প্রকৃতির নিয়ম। যত জোরে আঘাত দিবে, ঠিক তত জোরেই সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করিবে। কার্ত্তিকের অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ, সংসারের উপর স্বজনের উপর সর্ব্বোপরি নিজের উপর বলপ্রয়োগ, সমস্তই

ফিরিয়া আসিয়া একসঙ্গে তাহাকেই আঘাত করিল। সে মনে করিয়াছিল যে, বল-প্রয়োগে সে প্রমাণ করিয়া দিবে, স্নেহ কিছুই নয়, ধর্ম্ম কিছুই নয়, সমাজ-বন্ধন কিছুই নয়, বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারিতাই একমাত্র সত্য। তাহাকে যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুখী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহাও অধীনতা, ইহাতেও তাহার আত্মার অপমান করা হইয়াছে। সে জোর করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে জগতের সমস্তই নিয়মের অধীন বটে কিন্তু মানুষের আত্মাই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। আত্মার একমাত্র সুখ আপনার স্বাধীনতাকে অনুভব করা। সমস্ত উৎসর্গ করিয়া সে প্রমাণ করিতে চায় যে পূর্ণ-স্বাধীনতাই মানবাত্মার স্বসত্তানুভব, তাহাই তাহার একমাত্র সত্য অভিব্যক্তি! সে কিছুতেই বুঝিবে না যে মানুষের জীবনও জগৎব্যাপী মহা নিয়ম-চক্রের উপর অধিষ্ঠিত। সে বলপ্রয়োগে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু এই জগৎ-ছাড়া, স্বভাব-ছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকেই যেমন আঘাত করিল এমন আর কাহাকেও নয়। জোর করিয়া অন্ধ হইতে গিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল! নিজের অসীম স্নেহের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া সে কাহার কি ক্ষতি করিল! এই পরম-স্নেহময়ী শৈলজার উন্মুখ ভালবাসাকে সবলে পদ-দলিত করিয়া সে কাহার অনিষ্ট করিল! সমস্ত সংসারকে সে একটা কাল্পনিক স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার জন্য নষ্ট করিতে গিয়া কাহাকে বেশী আঘাত দিল! সংসার ত সেই আপন নিয়মেই চলিতেছে; সেই ত প্রভাত তেমনি প্রতিদিন আসিতেছে, সেই ত প্রতি সন্ধ্যায় কর্ম্মক্লান্ত মানব আপন নীড়ে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই ত সমস্ত জগৎ একই নিয়মে সুখে-দুঃখে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে। লোকসান ত আর কাহারও হইল না! কৈ, কেহ ত বুঝিতে চাহিল না যে এই অনন্ত বন্ধনের মধ্যে এই সমাজ, সংসার, স্নেহ, কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে সুখ নাই—সুখ আছে, কেবল স্বেচ্ছার স্বাধীনতায়, সুখ আছে কেবল বন্ধন-হীন ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনায়, সুখ আছে কেবল পাখীর মত অনন্ত আকাশে আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দুই পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া বেড়ানোয়?

দেবুর মৃত্যুর পর সাত-আট দিন কার্ত্তিকের কোন প্রকার সংজ্ঞা ছিল না। সে যেন কিছুদিনের জন্য একেবারে অতল অন্ধকারে তাহার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তারপর অনেক সেবা-শুশ্রূষায় যখন সে ক্রমশ সুস্থ হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে সমস্ত পূর্ব্ব স্মৃতিই সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অবসন্ন মন যখন ক্রমশ তাহার লুপ্ত শক্তিটুকু আবার ফিরিয়া পাইতেছিল, দেহ যখন তাহার হারানো স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিতেছিল, তখন একদিন শৈলজা তাহার পুত্রশোক, তাহার দিবারাত্রি-পরিশ্রমের উত্তেজনা, তাহার বহু রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, সর্ব্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বংসহা শক্তিকে দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া কার্ত্তিকের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "বল,

তুমি কি হলে সুস্থ হবে?" কার্ত্তিক তখন অতি ক্লান্তভাবে অথচ স্নেহ-সকাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আর কেন শৈল? আর ও কথা নয়।"

শৈল কহিল, "না, তা হবে না। আমি বলছি যে আজ আমি সব পারব। আমি এত দিন যা সহ্য করেছি, তাতে যদি কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকি, কিছু শক্তি পেয়ে থাকি ত, সেই জোরে বলছি যে আজ আমি সমস্তই পারব।"

কার্ত্তিক উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; আজ কত বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড চেষ্টার শ্রান্তি তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া নিজের উপর যে অত্যাচার সে করিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার দেহ-মন সমস্তই অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। তাই শৈলজা যখন তাহার চোখের উপর উজ্জ্বল চক্ষু রাখিয়া বলিল যে সে সমস্তই পারিবে, তখন কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে বলিল, "আমি যে আর পারব না, শৈল। আমার সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। আমি যা চাইতুম, তাকে চাইবার মত শক্তি আর আমার কৈ?"

শৈল কহিল, "তুমি কি চাইতে?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি চাইতুম, মুক্তি—"

শৈল কহিল, "তোমায় আমি তাই দিলুম। আমিই তোমার একমাত্র বন্ধন—অন্য যে বন্ধন ছিল ভগবান তা কেটে দিয়েছেন। এখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, তুমি মুক্ত।"

কার্ত্তিক একদৃষ্টে শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই শৈল? যে একদিন এই ব্যাপারের উল্লেখমাত্রেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত দিন অনাহারে অনিদ্রায় দেব-মন্দিরে পড়িয়াছিল! কত বড় আঘাতে যে এই স্নেহময়ী নারী আজ এই কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া কার্ত্তিক শিহরিয়া উঠিল। ভীতভাবে শৈলজার হাত ধরিয়া সে বলিল, "শৈল তুমি আমায় ত্যাগ করবে?"

শৈল কহিল, "ত্যাগ করবার সম্বন্ধ তোমায় আমায় নয়, কিন্তু তুমি মুক্ত—তোমায় আমি আর চাই না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি যে এখন তোমায় চাই।"

শৈল কহিল, "ভয় নেই! এই অসুস্থ অবস্থায় তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না—আমি কোন দিনই কোথাও যাব না। কিন্তু যে মুক্তি তুমি চেয়েছ, আজ তোমায় তা আমি দিচ্ছি। সুস্থ হয়ে তুমি যা চাও, যাকে চাও, তার কাছে অনায়াসে তুমি যেতে পার। আমিও বুঝেছি, ভালবাসা বল, আর যাই বল, সবই বন্ধন। যখন বন্ধনে সুখ নেই, সুখ আছে কেবল স্বেচ্ছাচারিতায়—তখন তোমার সুখের পথে দাঁড়িয়ে কেবল যে তোমাকেই আমি হত্যা করছি, তা নয়, নিজেরও হয়ত মস্ত অপকার করছি। তোমাকে আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ করেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, ছায়াকে বেঁধে রাখা যা, তোমাকে বাঁধবার চেষ্টা করাও তাই। তাই বলছি—"

কার্ত্তিক উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "শৈল, আমার শক্তি, বল, তেজ—সব গিয়েছে, হয় ত আমার চোখও গিয়েছে, কিন্তু এখন সেই স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি করব?"

শৈল কহিল, "তা ভাববার অধিকার আর আমার কৈ? দস্যুবৃত্তি করে তুমি আমার সে অধিকার কেড়ে নিয়েছ।"

কার্ত্তিক কহিল, "যদি আবার দিই?"

শৈল কহিল, "আমি নেব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন?"

শৈল কহিল, "যা দিতে পারা যায়, তা কেড়েও নেওয়া যায়। আজ তুমি যা দিচ্ছ, কাল তা কেড়ে নিতে পার। অগ্নি সাক্ষী করে ধর্ম্ম সাক্ষী করে যে বন্ধন তুমি স্বীকার করেছিলে, তাই যখন নাগপাশ বলে চির দিন মনে করে এসেছ, তখন এই দুর্ব্বলতার সময় যা দেবে, তার জোর কতটুকু? আমি বেশ বুঝেছি, আর তোমায় বেঁধে রাখলে তুমিও নষ্ট হবে, আমিও চিরদিন দুঃখ পাব। তার চেয়ে ভগবান যেটুকু-যা আমারই জন্য মেপে রেখেছেন, সেইটুকু পাবার জন্যই আজ থেকে আমায় তৈরি হতে হবে। তুমি মনে করছ, আমি অভিমান করে এ-সব কথা বলছি? না। অভিমান আর কার উপর করব? তুমি মান-অভিমানের বাইরে গিয়েছ। এখন তোমায় বেঁধে রাখলে নিশ্চয়ই অন্যায় করা হবে, কারণ বাঁধন যদি এক পক্ষে হয়, তা হলে সেটা দাসত্ব। তুমি যখন আমার বাঁধ নি, তখন আমিই বা আমার বন্ধন রাখব কেন? আমার দিক থেকে তোমাকেও আজ আমি মুক্তি দিলুম।"

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল; ক্ষণপরে বলিল, "ঠিক হয়েছে। এই আমার উপযুক্ত। শৈল, তুমি যদি আমার মত জীবকে ভালবাসতে, তাহলে নিজেরই অপমান করতে। আজ যে সে অপমানের বোঝা আমার মাথায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছ, এর জন্য আমি সুখী। না, এত সুখের যোগ্য আমি নই। আমার জন্য যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বসে থাকবে, সংসারের এ ভয়ানক অত্যাচার। ঠিক হয়েছে—শৈল, এতদিনে তোমার আসল মানুষটার জয় হয়েছে। সে আমার মত মানুষের পায়ে চিরদিন ফুল বেল পাতা ঢেলে পূজো করবার মত এত হীন নয়! সে—"

শৈল কহিল, "সে যে কিসের উপযুক্ত, সে যে কি, তা আর কেন ভাবছ? সে যা, তাই। এখন তোমার নিজের কথা চিন্তা করে দেখবার সময় এসেছে।"

কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "আর এখন তা ভাবতে পারছি না। এই এত বড় একটা ভয়ানক সৌভাগ্য, এই এতদিন-কার প্রার্থিত বস্তু পেয়ে প্রাণটা যে কি করবে, তা এখনও ভেবে দেখতে পারেনি। ভেবে দেখবার ক্ষমতাই নেই—বোধ হচ্ছে যেন মনের পক্ষাঘাত হয়েছে, নইলে এমন ভয়ঙ্কর সুখের আঘাতে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন? যাও তুমি, আর মিছে বসে থেকো না।"

শৈলজা ধীর পদে চলিয়া গেল। কার্ত্তিক ক্ষণকাল জড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।

এই স্বাধীনতা? এই মুক্তি? ইহাকেই পাইবার জন্য সে না করিয়াছে কি! মাতৃ-হত্যা, পিতৃহত্যা, এমন কি যাহার জন্য সমস্তই, সেই আপনাকে পর্য্যন্ত সে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায় আনন্দ? কোথায় মুক্ত পথে অবাধ সঞ্চালনের বিরাট

সুখ? যাহার জন্য করতলগত স্বর্গকে সে ত্যাগ করিল, সেই মহাবস্তু কৈ? বুকের মধ্যে কৈ তাহার অনুভূতি? মুক্তি, মুক্তি—মুক্তিই ত বটে!

কার্ত্তিক ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কি মনে করিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া একহাতে চোখ ঢাকিয়া অপর হস্তে জানালাটা খুলিয়া দিল। অমনি বহুদিনের বিরহের পর আলোকের সহিত মিলনের হাসিতে সেই কক্ষের সমস্ত বস্তু হাসিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইল—কিন্তু অনেক দিনের অনভ্যস্ত চোখে আলো সহ্য হইল না। কার্ত্তিক পুনরায় চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিল, "না, তা হবে না—এ মুক্তি সইতেই হবে। আলো যখন ফিরে পেয়েছি, তখন সইতেই হবে।"

কিন্তু আলো কিছুতেই সহিল না। অন্ধকার নির্ম্মমভাবে তাহার অন্তরে-বাহিরে আঁটিয়া বসিয়াছে! ইহার হাত হইতে বুঝি মুক্তি নাই! কার্ত্তিক চক্ষু মুদিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

হায় আলো! হায় সর্ব্বলোকচক্ষু! তুমি ত্যাগ করিলে! অন্ধকারের দৈত্যের হাতে আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে! তাই হোক, আমিও অন্ধকারের হাতেই আপনাকে সঁপিয়া দিব।

কার্ত্তিক হঠাৎ কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "শৈল—"

শৈলজা পাশের ঘর হইতে আসিয়া বলিল, "কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "সমস্ত দরজাগুলো খুলে দিতে পার?"

শৈলজা দ্বারগুলা খুলিয়া দিলে কার্ত্তিক আবার বলিল, "আমার গায়ে আলো লাগছে?"

শৈল কহিল, "লাগছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "খুব লাগছে?"

শৈল কহিল, "জানলা দিয়ে যতটা আসছে, ততটা লাগছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "কিন্তু আমি আরও আলো চাই।"

শৈল কহিল, "তুমি যে এতদিন অন্ধকার, অন্ধকার করে কাঁদতে,—আজ এত আলো চাইছ কেন?"

কার্ত্তিক কহিল, "চিরকালের জন্য বিদায় নিতে হবে যে—তাই শেষ দেখা-শোনা করে নিচ্ছি।"

শৈল কহিল, "সে কি! তুমি—"

কার্ত্তিক কহিল, "ভয় নেই, আমি মরতে যাচ্ছি নে। মরবার জন্যই কি এত বড় একটা লঙ্কাকাণ্ড কেউ করে? মরব কেন? মরণের উপরে যা, তাই যে আমি পেয়েছি, আমি অমর হয়ে গিয়েছি। ভয় নেই, শৈল আমার মরণ নেই। আমি মলে এই এত বড় ভয়ঙ্কর সুখটা, মুক্তির সুখটা হজম করবে কে? তুমি যাও—নিজের কাজ করগে যাও,—আমি এখন একা—একা থাকব।"

শৈল আবার চলিয়া গেল।

* * *

প্রভাতে উঠিয়া শৈলজা কার্ত্তিকের ঘরে গিয়া দেখিল, সমস্ত জানালা দরজা খোলা, কার্ত্তিক ঘরে নাই। বিস্মিত হইয়া শয্যার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, একখানা

কাগজ পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেখানা সে খুলিয়া দেখিল, কার্ত্তিকের চিঠি।

কার্ত্তিক লিখিয়াছে,—

"শৈল,

আমি চলিলাম। যখন মুক্তি পাইয়াছি, তখন তাহার পূর্ণ স্বাদ আমায় পাইতেই হইবে। দিনে বাহির হইতে পারি নাই, কারণ আলোতেই আমার ভয়। রাত্রির অন্ধকারই আমার আলো—তাই রাত্রে বাহির হইতেছি।

সিন্দুক দেরাজ ইত্যাদির চাবি আমার মাথার শিয়রেই রহিল। সমস্ত ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া যাইতেছি। যখন আমি মুক্ত, তখন তোমার কোন জিনিসই লওয়া উচিত নয় মনে করিয়া আমার কাছে যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছি। রাত্রে বাবার নিকট হইতে চুরি করিয়া একখানা কাপড় ও গায়ের কাপড় আনিয়া ছিলাম। তাহাই গায়ে দিয়া বাহির হইতেছি। যদিও জানি যে এ সমস্ত লইয়া গেলে তুমি কিছুই বলিতে না, তথাপি তোমার কিছুই লইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কাজ করিলাম। তুমি কখনও আমার নিকট হইতে কিছুই পাও নাই, আমিই বরং তোমার নিকট হইতে অযাচিতভাবে অজস্র পাইয়াছি। তোমার এ বিষয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু আমার সে সুবিধা ছিল না। সেই সুবিধার জন্য বাবার জিনিস চুরি করিলাম—আমার ন্যায়-অন্যায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে এটা তত দোষের বলিয়া বোধ হইল না।

তুমি যাহা বলিয়াছ, তা'হা যদি সত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তুমি দুঃখ করিবে না। আমি দুঃখ-কষ্টের উপযুক্ত নই, এ কথাটা মনে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়ো।

কোথায় যাইব জানিতে চাহিয়ো না—কারণ আমিই তাহা ঠিক জানি না—এই আলোক-ভীত চোখ দুইটা আমায় কোথায় লইয়া যাইবে, তাহার ঠিক কি!

আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও—ভগবান যেন তোমায় শান্তি দেন। আমি যাহাই হই, এই কথাটুকু বিশ্বাস করিয়ো যে আমি তোমার চির-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমার জীবনের শনিগ্রহ ছিলাম—গ্রহ কাটিয়া গেল, এখন তুমি নির্ভয়ে নিজের জীবন নিজে গড়িয়া তুলিও। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী কার্ত্তিক।"

চিঠি পড়িয়া শৈলজা কাঠের মত হইয়া গেল। প্রভাতের মৃদু আলো তাহার চোখে অত্যন্ত তীব্র ঠেকিল—সে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের স্থাননির্ণয়

অশ্বঘোষের সময় নিরূপণ করা একরূপ দুরূহ ব্যাপার হইলেও তাহার একটা আনুমাণিক কাল আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। চৈনিক ধর্ম্মরক্ষ ৪২০ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় 'বুদ্ধচরিত' অনূদিত করেন ('Fo—Sho—Hing—Tsan—King')। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বে অশ্বঘোষ বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের নামের তালিকায় কনিষ্কের স্থাপিত সঙ্ঘের সভাপতি পার্শ্বের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ ও নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বতন তৃতীয় পুরুষরূপে আমরা অশ্বঘোষকে দেখিতে পাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় নাগার্জ্জুনের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে একরূপ স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে অশ্বঘোষ তাহার অন্ততঃ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

Sir William Jones, কালিদাসকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, Fergusson, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে, Lassen, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে; Col. Wilford, James Princeps, Elphinstone এবং Macdonell পঞ্চম শতাব্দীতে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের মতে কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নবপ্রকাশিত Bihar and Urissa Research Society-র Journal-এ Kalidasa, (2) His age নামক প্রবন্ধে † কালিদাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া মনে করি। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর মহাকবি অশ্বঘোষের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া মহামতি Cowell সাহেব বলেন যে, রঘুবংশের সপ্তম সর্গে ৫-১২ সংখ্যক শ্লোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে নগরের পুরাঙ্গনাগণ যুবরাজ অজকে দেখিবার জন্য বাতায়নে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ চিত্র মহাকবি অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিত কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৩-২৪ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। যুবরাজ সিদ্ধার্থ যখন ভ্রমণ করিবার মানসে নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন তখনও যোষিৎ-বৃন্দ গবাক্ষ-পথে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার মতে অশ্বঘোষ আকার-ইঙ্গিতে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন কালিদাস তাঁহার অনবদ্য তুলিকা সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে এ চিত্র পারিপার্শ্বিক ঘটনা, অশ্বঘোষে প্রধান ঘটনা।

---

* J. A. S. B. New series. Vol. XII, 1916. p. 15.

† March number. 1916. (......'The only positive facts known about Kalidasa's date is that he lived some time before 634 and 620 A. D,)

অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিত কাব্যের তৃতীয় সর্গে ১৯শ সংখ্যক শ্লোকে 'বাতায়নেভ্যতুবিনিস্থতানি' ইত্যাদি বলিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কালিদাস তাঁহার সুন্দর বর্ণসম্পাতে ঐ চিত্রকে মনোরম করিয়া আমাদের নয়ন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। (রঘুবংশ, সপ্তম সর্গ, ১৯ সংখ্যক শ্লোক)।

রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে হনুমান দশাননের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরস্থিতা নিদ্রিতা মহিষীগণের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন, ঠিক সেইরূপ বুদ্ধচরিত কাব্যের পঞ্চম সর্গে ৪৮-৬১ সংখ্যক শ্লোকে এইরূপ একটি বর্ণনা দেখিতে পাই। যুবরাজ সিদ্ধার্থ চিরদিনের জন্য আবাসভূমি ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া রাত্রিকালে অন্তঃপুরস্থিতা নিদ্রিতা আলুলায়িত-কুন্তলা শ্লথবসনা স্ত্রীলোকগণকে দেখিয়া বিদায় লইতেছেন।

রামায়ণের বর্ণনা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের অনুভূতি-মূলক—ইহাতে কোনরূপ উদ্দেশ্য নাই। বুদ্ধচরিত কাব্যে ইহা গল্পের আখ্যানবস্তু। এই দৃশ্য বোধিসত্ত্বের পৃথিবী ত্যাগের অন্যতম কারণ। Cowell সাহেবের মতে রামায়ণের এই দৃশ্য 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের শ্লোকদ্বয়ের বিবৃতি মাত্র। (বুদ্ধচরিত কাব্যে পঞ্চম সর্গ, ৫,৫৫ শ্লোকদ্বয়)

বুদ্ধচরিত কাব্যে রামচন্দ্র-কাহিনী বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে ঐ সকল স্থলে অশ্বঘোষ রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া লেখেন নাই। অন্যত্র মার কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের প্রলোভন চিত্র; কুমারসম্ভবে হরের প্রতি মদনের শর-সন্ধানের অনুরূপ।

নানাপ্রকার প্রলোভনেও যখন মার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন তিনি বুদ্ধদেবকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই চিত্র কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে হুবহু নকল করা হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল যে রামায়ণে, কীরাতার্জ্জুনীয়ে ও রঘুবংশে অশ্বঘোষের প্রভাব বিদ্যমান আছে।

এমন-কি Cowell সাহেব প্রচলিত বর্ত্তমান রামায়ণ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের পরে রচিত হইয়াছে বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ডাক্তার Jacobi স্পষ্টই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে Cowell সাহেবের মত ভ্রান্ত; কারণ—(১) আমরা রামায়ণে বুদ্ধ কিংবা গ্রীক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখি না; কেবলমাত্র রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশে একবার বুদ্ধ শব্দ এবং দুইবার গ্রীক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে; (২) রামায়ণে পাটলিপুত্রের উল্লেখ নাই; অথচ এই জনপদের মধ্য দিয়াই রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছিলেন; (৩) মিথিলা এবং বিশালা ভিন্ন ভিন্ন নরপতির অধীন থাকার উল্লেখ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে উহারা অশ্বঘোষের সমসাময়িক, একত্রে অবস্থিত বৈশালী রাজ্য নামে পরিচিত ছিল না; (৪) পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায় যে কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা নামে পরিচিত ছিল; বৌদ্ধযুগের শাকেত নাম তখনও অপরিচিত ছিল; (৫) অধিকন্তু রামায়ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৎকালে মহা-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রামায়ণ মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানের পূর্ব্বে, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ৫০০ শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রক্ষিপ্ত অংশ খৃঃ পূর্ব্ব ২০০ শতাব্দীতে লিখিত।

Cowell বলেন যে অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত স্বকপোলকল্পিত নহে। ললিত-বিস্তরের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। হনুমানের রাত্রি-কালে পুরাঙ্গনাগণের শয়ন-কক্ষের বিবরণ অশ্বঘোষ হইতে গৃহীত না হইলেও ললিত-বিস্তর হইতে যে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে ললিত-বিস্তরে বুদ্ধের সংসার-ত্যাগ-কালে জরা ও মোহিনীর প্রলোভনের উল্লেখ নাই। ইহা অশ্বঘোষের নিজস্ব। যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় ব্যতীত বুদ্ধদেবের চরিত-কাহিনী বিবৃত করা যায়, তখন Cowell সাহেবের সহিত একমত হইয়া আমরা বলিতে পারি না যে, ঐ দুইটি ঘটনা স্বাভাবিক (Natural incidents) এবং কালিদাস ও ভারবী উহা অশ্বঘোষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

মারের প্রলোভনও অশ্বঘোষের নিজস্ব নহে। ললিত-বিস্তরের মার দৈত্যের নেতা, তাহার চরিত্রে কোন গুণই দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চশর মদনদেবের চিত্র হইতে এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে। কালিদাসের কামদেব সর্ব্বজনমনোরঞ্জক, জগতের আনন্দ-বর্দ্ধক। তিনি দেবগণের ও ধরিত্রীর উপকারের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। হরপার্ব্বতীর সম্মিলনের জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসারেও Cowell সাহেবের মত ঠিক নহে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অধুনা-প্রচলিত উপকরণ সকল হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, কালিদাস ও ভারবী অশ্বঘোষের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে বুদ্ধচরিত পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সহি স্বগাত্র প্রভয়োজ্জ্বলন্ত্যা
দীপপ্রভাংভাস্কর বন্মুমোষ
মহার্হজাম্বুনদ চারুবর্ণো
বিদ্যোতয়ামাস দিশশ্চ সর্ব্বাঃ

(বুদ্ধচরিত, প্রথম সর্গ, ৩২ শ্লোক)

তস্মাৎপ্রমাণং ন বয়োনকালঃ
কশ্চিৎ ক্কচিচ্ছ্রৈষ্ঠ্য মুপৈতি লোকে
রাজ্ঞামৃষীণাঞ্চ হিতানিতানি
কৃতানি পুত্রৈরকৃতানি পূর্ব্বৈঃ

(বুদ্ধচরিত, প্রথম সর্গ, ৫১ শ্লোক)

মহাত্মনি ত্বয্যুপপন্ন মেতৎ
প্রিয়াতিথৌ ত্যাগিনি ধর্ম্মকামে
সত্বান্বয় জ্ঞানবয়োঽনুরূপা
স্নিগ্ধাযদেবং ময়িতে মতিঃস্যাৎ

(বুদ্ধচরিত, প্রথমসর্গ, ৬০ শ্লোক)

ক্রন্ধা বচস্তচ্চ মনশ্চ যুক্ত্বা
জ্ঞাত্বা নিমিত্তৈশ্চ ততোঽভ্যুপেতঃ

দিদৃক্ষয়া শাক্য-কুলধ্বজস্য
শক্রধ্বজস্যেব সমুচ্ছ্রিতস্য
(বুদ্ধচরিত, প্রথমসর্গ, ৬৩ শ্লোক)

নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষঃ
(রঘুবংশ, তৃতীয়)

তেজসাং হিনোবয়ঃ সমীক্ষতে
(রঘুবংশ, ১১ সর্গ)

সর্ব্বংসখেত্বয্যুপপন্নমেতৎ
(কুমারসম্ভব, তৃতীয়সর্গ, ১২ শ্লোক)

কালিদাস তাঁহার কাব্যে বহুবার 'শক্রধ্বজ' ব্যবহার করিয়াছেন।

সূর্য্যঃ স এবাভ্যধিকং চকাশে
জজ্বাল সৌম্যার্চ্চিরণীরিতোঽগ্নিঃ
প্রাগুত্তরে চাবসথ—প্রদেশে
কূপঃ স্বয়ং প্রাদুরভূৎ সিতাম্বুঃ
(বুদ্ধচরিত, প্রথমসর্গ, ৪১ শ্লোক)

দ্বিরদরদময়ীময়ো মহার্হা
সিতসিত পুষ্পভৃতাংমণিপ্রদীপাং
অভজ, শিবিকাং শিবায় দেবী
তনয়বতী প্রণিপত্য দেবতাভ্যঃ
(বুদ্ধচরিত, প্রথমসর্গ, ৯১ শ্লোক)

স্ত্রীণাং বিরেজুর্মুখ পঙ্কজানি
সক্তানি হর্ম্ম্যেম্বিব পঙ্কজানি
ততো বিমানৈর্যুবতী কলাপৈঃ
কৌতুহলোদ্ঘাটিত বাতয়ানৈঃ
(বুদ্ধচরিত, তৃতীয়সর্গ, ১৯ শ্লোক)

ভাবজ্ঞানেন হাবেন চাতুর্য্যাদ্রূপ সংপদা
স্ত্রীণামেবচ শক্তাঃস্থ সংরাগেকিং পুনর্নৃণাং
(বুদ্ধচরিত, চতুর্থসর্গ, ১২ শ্লোক)

কাচিৎতাম্রাধরোষ্ঠেন মুখেনাসবগন্ধিনা
বিনিশশ্বাস কর্ণেঽস্য রহস্যং শ্রূয়তামিতি
(বুদ্ধচরিত, চতুর্থসর্গ, ৩১ শ্লোক)

দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃসুখাঃ
(রঘুবংশ, তৃতীয়সর্গ, ১৪ শ্লোক)

অপত্যনাথাং—নাথ = স্বামী
শকুন্তলার প্রথম সর্গে লিখিত।
লতাসনাথের সহিত তুলনা করুন।
(রঘুবংশ, সপ্তম সর্গ, ১৯ শ্লোক)

অপিনাম অহমেব পুরূবরাঃ স্যাম্।
(বিক্রমোর্ব্বসী)

কর্ণেলোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ
(মেঘদূত ২ সর্গ)

মুহুর্ম্মুহুর্মদব্যাজ স্রস্তনীলাংশুকা পরা
আলক্ষ্যরসনারেজে স্ফুরদ্বিদ্যুদিব ক্ষপা
(বুদ্ধচরিত, চতুর্থসর্গ, ৩৩ শ্লোক)

অশোকো দৃশ্যতামেষ কামি শোক বিবর্দ্ধনঃ
রুবন্তি ভ্রমরা যত্র দহ্যমানা ইবাগ্নিনা
(বুদ্ধচরিত, চতুর্থসর্গ, ৪৫ শ্লোক)

ফুল্লং কুরুবকং পশ্য নির্ম্মুক্তালক্তকপ্রভং
যোনখ প্রভয়া স্ত্রীণাং নির্ভৎসিত ইবানতঃ
(বুদ্ধচরিত, চতুর্থসর্গ, ৪৭ শ্লোক)

সরাজ সুনুর্ম্মৃগরাজ গামী
মৃগাজিরং তন্মৃগবৎ প্রবিষ্টঃ
লক্ষ্মীবিযুক্তোপি শরীর লক্ষ্ম্যা
চক্ষুংষি সর্ব্বাশ্রমিণাং জহার
(বুদ্ধচরিত, সপ্তমসর্গ, ২ শ্লোক)

হতত্বিষোঽন্যাঃ শিথিলাস্য বাহবঃ
স্ত্রিয়োবিষাদেন বিচেতনাইব
নচুক্রুশুর্নাশ্রুজহুর্নশশ্বসু
র্নচেতনা উল্লিখিতা ইব স্থিতাঃ
(বুদ্ধচরিত, অষ্টম সর্গ, ২৫ শ্লোক)

আদিত্য পূর্ব্বং বিপুলং কুলং তে
নবং বয়ো দীপ্ত মিদং বপুশ্চ
কস্মাদিয়ং তে ক্রমতি রক্রমেণ
ভৈক্ষাক এবাভিরতা-নরাজ্যে
(বুদ্ধচরিত, দশম সর্গ, ২৩ শ্লোক)

ব্যাজার্দ্ধসন্দর্শিতমেখলানি
(রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ)

কুমারসম্ভবের অকালবসন্তের সহিত তুলনা করুন :— কুমার (৩সর্গ)

অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরুবকম্
(মালবিকাগ্নিমিত্র)

সম্ভৃতচিহ্নামপিরাজ লক্ষ্মীম্
তেজোবিশেষানুমিতাং দধানঃ
(রঘুবংশ, ২ সর্গ)

নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষঃ
(রঘুবংশ ,তৃতীয় সর্গ)

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং
নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ
(রঘুবংশ, ২ সর্গ)

যোহেৰ্থধৰ্ম্মৌ পরিপীড্য কামঃ
স্যাদ্ধর্ম্মকামো পরিভূয়চার্থঃ
কামার্থয়োশ্চোপরমেণধর্ম্মঃ
ত্যাজ্যঃ স কৃৎস্নোযদি কাঙ্ক্ষিতার্থঃ
(বুদ্ধচরিত, দশমসর্গ, ২৯ শ্লোক)

অনয়া বিদ্যয়াবালঃ সংযুক্তঃ পঞ্চ পর্ব্বয়া
সংসারে দুঃখ ভূয়িষ্ঠে জন্ম স্বপি নিষিচ্যতে
(বুদ্ধচরিত, ত্রয়োদশ সর্গ, ৩৭ শ্লোক)

সূক্ষ্মত্বাচ্চৈব দোষাণাম ব্যাপারাচ্চ চেতসঃ
দীর্ঘত্বাদায়ুষশ্চৈব মোক্ষস্তু পরিকল্প্যতে
(বুদ্ধচরিত, ত্রয়োদশ সর্গ, ৭৩ শ্লোক)

নধর্ম্মমর্থ কামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ।
নার্থং কামেন কামং বা সোহর্থেন সদৃশস্ত্রিষু॥
(রঘুবংশ, সপ্তদশ সর্গ, ৫৭ শ্লোক)

বাহু প্রতিষ্টম্ভ বিবৃদ্ধমন্যুঃ
(রঘুবংশ, ২ সর্গ, ৪২ শ্লোক)

দিশঃ প্রসেদুঃ
(রঘুবংশ, তৃতীয় সর্গ, ১৪ শ্লোক)

এই সকল উদাহরণ ছাড়াও কতক গুলি শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, বৌদ্ধ, ও সংস্কৃত সাহিত্যের নবপ্রচারক, স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় অশ্বঘোষ-বিরচিত সৌন্দরানন্দ কাব্যের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন—

পরস্পরেণ স্পৃহনীয় শোভং
ন চেদিদং দ্বন্দ্ব ময়োজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ বিধান যত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোহ্ ভবিষ্যৎ।
(রঘুবংশ, সপ্তম সর্গ)

মার্গাচলাব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।
(কুমারসম্ভব, পঞ্চম সর্গ)

তাং সুন্দরীং চেন্নলভেত নন্দঃ
সা বা নিষেবেত নতং নতভ্রূঃ
দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্ বিকলং ন শোভেতা
ন্যোইন্যহীনাবিবরাত্রি চন্দ্রৌ
তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ
ভার্য্যানুরাগঃ পুনরাচকর্ষ
সোহনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ
তরন্ তরঙ্গেষ্টিব রাজহংসঃ।
(সৌন্দরানন্দ কাব্য)।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

শিল্প-প্রসঙ্গ

বিশেষত্ব বা অরিজিনালিটি দেখাবো মনে করে কোনো শিল্পী শিল্প-রচনা করতে পারেন না। কারণ ঐ বিশেষত্ব তাঁর মনে-করার উপর বা চেষ্টার উপর নির্ভর করে না—তা আপনিই তাঁর রচনার ভিতর থেকে ফুটে ওঠে। তাঁর নিজের দেহের গড়ন-সম্বন্ধে যেমন তাঁর কোন হাত নেই, এ-ক্ষেত্রেও প্রায় তেমনি। বিশেষত্বের ছাপ মারবার কোনো শিলমোহর শিল্পীর দপ্তরে থাকে না। সেইজন্য শিল্পীর পক্ষে—শিল্পের অতিরিক্ত বিশেষ-কিছু দেখাব—এই ভাবটির উপর প্রাধান্য দেওয়া চলে-না। শিল্পের উদ্দেশ্য—কিছু দেখাবো, এনয়;—কিছু প্রকাশ করব—এই! সেইজন্য যদি কোন শিল্পী তাঁর শুভাকাঙ্খী কোন সমালোচকের সৎপরামর্শ-মত 'বিশেষত্ব' দেখাব মনে করে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহ'লে দেখবেন, সেই বিশেষত্বের দিকে ঝোঁক থাকায়, আসল জায়গায় তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েচেন। তখন শিল্পে যথেচ্ছাচারিতার জন্য তাঁকে শেষে দায়ী হ'তে হবে। ইউরোপের Impressionist School প্রভৃতির দ্বারা শিল্প-জগতে এরূপ কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খলতা এই-ভাবেই জন্মগ্রহণ করেচে।

শিল্পীর নিজত্ব থেকেই শিল্প-সৃষ্টি হয়, কাজেই শিল্পীদের রচনায় ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকবেই। তারই দ্বারা ললিতকলায় বিশেষত্বের বিকাশ হওয়া সম্ভবপর। এক-কথায়, শিল্পীদের ইহা জানা উচিত যে, Individuality makes an artist এবং এইটেই হচ্চে আসল কথা। নিজেকে প্রকাশ করা চাই। শিল্পী, বিশেষত্ব দেখাতে চেষ্টা করুন বা না করুন, নিজের ভিতরকার জিনিসটিকে, যাঁর যতটুকু ক্ষমতা, দেখাতে যেন ত্রুটি না করেন। তাহলেই বিশেষত্বটি বিশেষভাবে আপনি তাঁদের কাজের মধ্যে থেকে প্রকাশিত হয়ে উঠবে।

বিশেষত্ব-সম্বন্ধে যেমন, অনুপ্রেরণা (Intuition) সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা খাটে। ওটা আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতেই কাজ করে; ওটাকে নিয়ে (বিশেষতঃ) শিল্পীদের নাড়াচাড়া করা মোটেই উচিত নয়। ওটা ঠিক মাটিতে পোঁতা বীজের মত অদৃশ্যভাবে কাজ করে; বারে-বারে তাকে মাটির ভিতর থেকে তুলে-তুলে দেখতে গেলে তার প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। অনুপ্রেরণা যে শিল্পীরা কোথা থেকে পাবেন, তা এ-পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করতে পারে নি, বা কোন শিল্পী নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরকে বোঝাতে পারেন নি। এ-বিষয়ে একজন ইংরাজ চিত্র-সমালোচক ঠিকই বলেছেন :—Intuitions are shy things and apt to disappear if looked into too closely.

* *
*

কিন্তু সাধারণকে বোধ হয় বোঝাবার প্রয়োজন নাই যে পারিপ্রেক্ষিক-বিজ্ঞানের সাহায্যে সমতল পটভূমির উপর শিল্পীর দৃষ্টিগোচরীভূত দৃশ্যকে হুবহু যথাযথভাবে স্থাপন করা যায়। কিন্তু বস্তুত যাঁরা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত, তাঁরা জানেন পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় কাজের সময় চিত্র-শিল্পে তা ঠিক খাটানো যায় না। শিল্প ও বিজ্ঞানে এখানে বিরোধ বাধে। মানুষের হাতের বিচিত্র ভঙ্গী বা সমুদ্রের তরঙ্গলীলা অথবা আকাশের মেঘের খেলা প্রভৃতি বিচিত্র শিল্পলীলায় পারিপ্রেক্ষিকের শাসন মানা চলেনা।

তবে চিত্র-শিল্পে গৌণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে ব্যবহৃত টেবিল, ঘর, বাড়ী প্রভৃতি যদি আঁকা যায়, তাহ'লে তার একটা সার্থকতা আছে দেখতে পাই। মোটকথা, পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়েও যে-কোন শিল্পী শুধু দৃষ্টিশক্তি ও সহজ বোধ-শক্তির দ্বারা যে-কোন চিত্র অনায়াসে আঁকতে পারেন। এ-বিষয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ অজন্তার প্রাচীন চিত্রগুলি জাজ্জ্বল্যমান রয়েচে। (১) চিত্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ মানুষ ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির ছবি আঁকতে গেলে পারিপ্রেক্ষিক-বিজ্ঞানের কোনই দরকার দেখা যায় না। পারিপ্রেক্ষিক না মানলে বিজ্ঞান না-মানা হতে পারে কিন্তু তাতে শিল্পের প্রতি অভক্তি প্রকাশ পায় না। প্রাচীনকালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা পারিপ্রেক্ষিক-বিজ্ঞানমতে ছবি আঁকেন নি—তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (২) এবং তার জন্যে সে সমস্ত ছবি যে শিল্প-হিসাবে নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় হয়ে আছে তা নয়। অবশ্য ইউরোপে প্রথম-প্রথম যখন এই বিজ্ঞানটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন সর্ব্ব-সাধারণের কাছে তার খুব-একটা আদর হ'য়েছিল। তখন কোন-কোন শিল্পী,সাধারণকে কতকটা খুসি করবার জন্যে, আবার কতকটা কৌতূহলপ্রযুক্ত নিজেদের ছবির মধ্যে কোন কোন জায়গায়—হয়তো-বা মাতৃমূর্ত্তির পশ্চাতে পটযবনিকায় (Back-ground) একটা খিলান এঁকে বা অমনি-একটা কিছু করে পারিপ্রেক্ষিক সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতার বদনামটুকু ঘুচিয়ে গেছেন মাত্র; কিন্তু আসলে বেশ বোঝা যায় তার উপর তাঁদের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না। ইউরোপের আরও আধুনিক শিল্পীদের বিষয়ে রাস্কিন্ স্পষ্ট স্বীকার করেচেন যে ডেভিড্ রবার্টস্ ছাড়া টার্ণার প্রমুখাৎ বড় বড় শিল্পীও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। টার্ণার যদিও নিজে রয়াল-অ্যাকাডেমিতে পারিপ্রেক্ষিক-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জীবনে তাঁর কোন ছবিতেই একটি বাড়ীও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত করে আঁকতে পারেন নি। স্থাপত্যবিজ্ঞানে Perspective এর একমাত্র প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়; চিত্র-শিল্পে তার বিশেষ কোন স্থান নেই বল্লেও চলে।

---

(১) 'অজন্তা'—দেখুন।

(২) Ruskin প্রণীত The Elements of Drawing, ভূমিকা দেখুন।

*
* *

অনেকে চিত্র-শিল্পে অঙ্কিত নরনারীর প্রতিমূর্ত্তিকে আদর্শ সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি-হিসাবে বিচার করে থাকেন। তাঁদের সাধারণতঃ বিশ্বাস যে, শিল্পীরা যা-কিছু আঁকবেন তাতে তাঁদের মনের মতন সুন্দর নাক-চোখ-মুখ ও কমনীয় সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠবই দেওয়া থাকবে। কিন্তু বস্তুতঃ ছবি বলতে কি বোঝায়? সাধারণে যে রূপ দেখে, সে রূপের ছবি নয়—অন্তরের একটি রসের রূপের প্রতিই শিল্পীর দৃষ্টি থাকে; সেই জন্য শুধু বাহিরে রূপ দিয়ে শিল্পের মর্ম্ম পাওয়া যায় না। অতি বিকৃতগঠন কুরূপ চেহারার মধ্যেও শিল্পী এমন রসের অবতারণা করেন যাতে তিনি অনায়াসে প্রকৃত দর্শককে আনন্দ দিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা রসের খাতিরে ছবি আঁকেন, রূপের খাতিরে নয়।

আধুনিক জগৎকে বৈজ্ঞানিকের জগৎ বলা হয়। এখন আমরা জানতে চাই, ছেলেকে মায়ের ভাল লাগে কেন, ফুলটি দেখতে এত চমৎকার লাগে কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন সব জিনিসেরই একটা মাপ প্রমাণ প্রভৃতি খাড়া করা হয়েছে। তাই কেবল রসের দোহাই দিয়ে সৌন্দর্য্য-বিচার যেন মনঃপূত হয় না; শিল্পজগতে যদি কোন আদর্শ সুপুরুষ বা সুন্দরী নারীর কথা ওঠে, তাহ'লেই বিজ্ঞেরা চোখে আঙুল দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীসের ভিনাস বা এপলোর বা এমনি একটা-কিছুর নজির দেখিয়ে দিয়ে তবে ছাড়েন। কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখা উচিত যে সৌন্দর্য্য জিনিসটা কি এতই সামান্য যে, যে-কোন খ্যাতনামা গ্রীক শিল্পীর শিল্পেই সেটা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে? —এবং তাঁরাই তার শেষ করে দিয়ে গেছেন? তা-ত নয়! তা'হলে সৃষ্টি থেমে যেত। সুন্দরকে মানুষ এখনও নব নব রূপে লাভ করছে এবং সেই পাওয়ার আনন্দ সে প্রকাশ করছে, তাইতে সুন্দরের নব-নব রূপ ফুটে উঠেছে; এবং একমাত্র এই পাওয়ার মধ্যেই তার রূপটি আছে, নইলে সে অরূপ। প্রাচীনকালে ভিনাস প্রভৃতি মূর্ত্তির কারিগরেরা যে রসলাভের সাধনা করেছিলেন, এখনও তাকে পাবার জন্যে মনের আনন্দে লিপ্ত থাকবার শিল্পীদের যথেষ্ট অবসর আছে। এ-বিষয়ে প্রত্যেকেই স্বাধীন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিশেষ শিল্পের সৌন্দর্য্যকে তিনি একমাত্র আদর্শ সৌন্দর্য্য বলে মনে করবেন না। তাঁর আদর্শ রসের আদর্শ,—রূপের নয়। তিনি সুন্দরকে নব নব রূপ ও রসের মধ্যে পাবার ইচ্ছা করবেন এবং তাঁর রচনায় নিত্য-নূতন রস-সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। এতে তিনি নিজেও পুলকিত হবেন এবং অপরকেও আনন্দ দেবেন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

পাখী

(নাটিকা)

[দৃশ্য ;—স্থান-কালের কিছু ঠিক নাই ।]

(১)

[বালক ও পাখী]

—ভাই পাখী, একটা গল্প বল-না, তোমার দেশের গল্প। তোমার দেশ কোথা ভাই ?

—আমার দেশ ?—আমার দেশ তো কোথাও নেই !

—কোথা থেকে তবে এলে ?

—ঐ—ঐখেন থেকে।

—অতদূর থেকে ?

—দূর কোথায় ? ও যে খুব কাছে ! মাটি দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হয়, কিন্তু উড়ে গেলে একেবারে সোজা !

—কোন্‌খান্‌ দিয়ে যাও ?

—বরাবর সিধে গিয়ে—পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে—

—পাহাড় ? পাহাড় ত আমি দেখিনি।

—তারপর, নদী পেরিয়ে—

—নদী ? নদী আমি দেখেছি !

—তারপর, সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, নীল আকাশের ভিতর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উড়ে উড়ে যাই।

—বাঃ বাঃ বেশ মজা ত !—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে ? নীল আকাশের ভিতর দিয়ে ? রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ? বাঃ বাঃ ! তারপর ?

—তারপর, কালো-কাজল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, সাগর-জলের ঝাপ্‌সা আলোর তলা দিয়ে, কালো কষ্টি-পাহাড়ের ফাটলের ভিতর ঢুকে পড়ি।

—উঃ ! কালো পাহাড়ের ভিতর ঢুকে পড় ? সেখান থেকে বেরোও কেমন করে ?

—অন্ধকারে গান গাইতে থাকি—কষ্টি-পাথরের বুকের উপর সুরগুলি বুলিয়ে যায় তাইতে সোনার আভা ফুটে উঠতে থাকে, তারই আলোয় পথ পাই।

—ঐ অন্ধকারে যাও কেন ভাই ?

—ঐ যে পথ। ওখান দিয়ে না গেলে যে যাওয়া হয় না।

—ভাই পাখী, তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে ভারি ইচ্ছে করছে।

—বেশ ত চলনা !

—কেমন করে যাব ?

—যেমন করে আমি যাই।

—আমি ত উড়তে পারি না।

—মনে করলেই পারবে।

—মনে করলেই পারব ?

—হাঁ, পারবে।

—কিন্তু ভাই, ঐ অন্ধকার ! ওখানে ত যেতে পারব না।

—কেন পারবে না ?

—আমার ভয় করবে।

—ভয় কিসের ?

—ঐ অন্ধকার !

—অন্ধকার—গান গাইলে—

—গান যে আমি জানিনা।

—গান জানবার দরকার নেই—গান আপনিই আসবে।

—তাহলে আমি যেতে পারব ?

—মনে করলেই পারবে।

—সত্যি ?

—সত্যি।

[হঠাৎ পদশব্দ। পাখী অদৃশ্য।]

—ঐ পাখী চলে গেল—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, কালো পাথরের—

[বাপের প্রবেশ]

—হ্যাঁরে, অত চেঁচাচ্চিস কেন ? এখানে ত কাউকে দেখচি না, তুই কার সঙ্গে কথা কইছিলি ?

—বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্ধুর সঙ্গে ? বন্ধু কৈ ?

—সে উড়ে গেল।

—উড়ে গেল কিরে ?

—হাঁ বাবা, ডানা মেলে উড়ে গেল।

—সে পাখী না কি যে উড়ে গেল ?

—হাঁ !

—তুই তার সঙ্গে কথা কইলি ?

—হ্যাঁ বাবা—সে কত কথা বল্লে।

—কথা বল্লে ? তবে বুঝি ঐ টোলের পড়া-পাখীটা উড়ে এসেছিল। রাধা-কৃষ্ণ বুলি বলছিল বুঝি ?

—না বাবা, রাধা-কৃষ্ণ ত বলেনি।

—ঠিক তাই বলছিল—তুই ছেলেমানুষ বুঝতে পারিস নি। তার গায়ের রং কেমন বল্ দেখি ? সবুজ ত ?

—না।

—লাল ?

—উহুঁ। ঝক্-ঝক্ করছে সাদা !

—সাদা পাখী ? সাদা পাখী ত এ গাঁয়ে কারুর নেই।

—সে এখানকার পাখী নয়।

—তবে কোথাকার ?

—সে বল্লে তার কোনো ঠিকানা নেই।

—তবে বুঝি বুনো পাখী ?

—তাই বোধ হয় হবে।

—না খোকা, তুমি বুনো পাখীর সঙ্গে কথা কোয়োনা। আমি তোমায় নতুন সোলার পাখী এনে দেব, তাই নিয়ে খেলা কোরো।

—সোলার পাখী ত আমার আছে।

—তবে সোনার পাখী গড়িয়ে দেব।

—সে আমার চাই না—আমি আমার বন্ধুকে চাই।

—বন্ধুকে নিয়ে করবে কি ?

—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, নীল আকাশের ভিতর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উড়ে উড়ে বেড়াবো—সে কত মজা !

—সর্ব্বনাশ ! উড়ে উড়ে বেড়াবি কি ? পাগল ছেলে ! তুই উড়বি কি করে ?

—বন্ধু বলেছে মনে করলেই পারব।

—ওরে ওরে তোর বন্ধুর কথা বিশ্বাস করিসনে—করিসনে ! কোন্-দিন মন্ত্র দিয়ে সে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—সে নিশ্চয় মায়াবী !

—না বাবা, সে আমার বন্ধু !

—ওরে সে তোকে বশ করেছে—তার কথায় ভুলিস্‌নি! সে তোকে নিশ্চয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

—বেশ ত মজা হবে!

—মজা কি রে!

—কেমন সেই কালো-কাজল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, সাগরজলের ঝাপ্‌সা আলোর তলা দিয়ে, কষ্টিপাথরের ফাটলের ভিতরে চলে যাব।

[খাতাঞ্জীর প্রবেশ]

—খাতা বগলে করে সেই তখন থেকে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে বেড়াচ্চি—এখন হিসেব দেখবার সময়, এ সময় এখানে বসে কি করচ? ছেলেকে আদর করবার সময় ত ঢের আছে—বাজে খরচ যে খাতায় ক্রমেই জমে উঠছে—

—খাতাঞ্জিমশায়, আমি বড় বিপদে পড়েছি!

—বিপদ ত তোমার লেগেই আছে। হিসেব-করে চলতে পারলে বিপদকে ভয় কিসের! কিন্তু এই হিসেবটা আর তোমার আয়ত্ত করাতে পারলুম না।

—খাতাঞ্জিমশায়, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

—হল কি?

—খোকার আমার কী হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—বলে, পাখী তার বন্ধু, পাখী তার সঙ্গে কথা কয়—এই বলে খালি আবোল-তাবোল বক্‌ছে।

—ও-সব কিছু নয়, কিছু নয়! আদর দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ। খুব কোসে নাম্‌তা মুখস্থ করতে দাও—পাখী-টাখী সব উড়ে যাবে। চলে এস, চলে এস—এখন কাজের সময়। [উভয়ের প্রস্থান]

[পাখীর আবির্ভাব]

—এস ভাই পাখী, এস। কোথায় পালিয়েছিলে তুমি?

—ঐ যে একখানা জলভরা বর্ষার মেঘ দেখছ—ওরই পিঠে চড়ে একটু বেড়িয়ে এলুম।

—বাঃ বাঃ বেশ ত! ভাই, আমায় কখন্‌ নিয়ে যাবে?

—তুমি তৈরি হলেই যাওয়া হবে।

—আচ্ছা আমি তৈরি হয়ে থাকব। তুমি কখন আসবে?

—তা ঠিক বলতে পারি না—তুমি ঠিক থাকলেই যাওয়া হবে।

[পদশব্দ। পাখীর অন্তর্দ্ধান।]

[বাপের প্রবেশ]

—বাবা, বাবা, পাখী বলেছে আমায় নিয়ে যাবে।

—চুপ্‌ কর! পাখী-পাখী করবি ত মার খাবি। এই নে ধারাপাত। সমস্ত দিন আজ নামতা মুখস্থ কর—বিকেলে ষোলোর কোটা অবধি গড়্‌ গড়্‌ করে বলা চাই। আমার কাজ আছে—চল্লুম।

[প্রস্থান]

[বালক নামতা পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।]

—

(২)

[খাতাঞ্জি ও ছেলের বাপ]

—খাতাঞ্জিমশায়, এই এতটুকু বেলায় বাবা আপনার হাতে আমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেই অবধি আপনার কাছেই আমি মানুষ। আপনার হেফাজতে থেকে আমায় সংসারের দুঃখ একদিনও টের পেতে হয়নি।

—কিন্তু বাবা, এত করেও তো তোমায় হিসেব শেখাতে পারলুম না।

—হিসেব আমি জানিনা খাতাঞ্জিমশায়, কিন্তু আমি আপনাকে জানি, সেই জন্যে আমার হিসেব জানবার দরকার হয় নি।

—কিন্তু আমি ত আর চিরদিন থাকব না। তোমাকে হিসেবটা শিখিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। তুমি তোমার ছেলেকে শেখাতে; এমনি করে হিসেবের ধারা বইয়ে দিতে পারলে এ সংসারে আর কোনো-দিন দুঃখদৈন্য আসতে পারত না।

—কি করব খাতাঞ্জিমশায়, আমি পারলুম না—আপনার এমনি নির্ভুল বন্দোবস্ত যে আমি হিসেব শেখবার ফাঁক পেলুম না, —প্রয়োজনই হল না। আপনি যেখানে আছেন, হিসেব সেখানে ঠিক আছে—এ যে জ্বলন্ত সত্য।

—তা না হয় মানলুম, কিন্তু তোমার ছেলের কথা কিছু ভাবছ কি ?

—ভাবছি, কিন্তু কিছু করতে পারচি না। ধনদৌলত নিজের হাতে কিছু উপার্জ্জন করিনি;—পৈতৃক-সম্পত্তি, হিসেবের খাতার মধ্যে পেয়েছিলুম;—জমাখরচের মধ্যেই তা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়ে গেল—তাকে নিজের খুসিমতো দুহাতে ছড়াতে কোনো দিন পারলুম না। জীবনে হিসেবের খাতার বাইরে যা পেয়েছি তা এই ছেলেটি—

—কিন্তু ঐ হল তোমার শনি। ওরই ফাঁকে আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফল সব গলে পড়ে যাবে। তুমি যদি হিসেব শিখতে তাহলে এ বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা থাকত না। তাহলে ছেলেটিকে তোমার সম্পত্তির মূলধন বলে খাতায় জমা করে নিতে। এখনও সময় আছে, হিসেব শেখ।

—হিসেব শিখতে রাজি আছি খাতাঞ্জি-মশায়, কিন্তু আমার ঐ ছেলেটিকে খাতার মধ্যে জমা করতে বলবেন না। সবই খাতা গ্রাস করবে—আমার কিছু থাকবে না—এ আমি সইতে পারব না।

—তা কি করে হবে ? হিসেবের অত বড় একটা গলদ সামনে রেখে কি হিসেব চালানো যায় ?

—খাতাঞ্জিমশায়, আপনাকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই—আপনার কথার মধ্যে কোথাও এমন ছিদ্র পাই না যে সেই ফাঁকে সরে পালাই।

--তবে খাতাখানা আন্‌তে বলি ?

—বলুন !

---

(৩)

[ছেলে ও বাপ]

—বাবা, আমার চোখের বাঁধা একটিবার খুলে দাও না।

—না খোকা, বাঁধা খুল্লে তোমার অসুখ সারবে না।

—আমার ত অসুখ করেনি! কৈ, গা ত গরম হয়নি!

—ও অন্য-রকম অসুখ।

—দাওনা বাবা, একটিবার খুলে—একটি-বার—একটুখানি দেখেই আবার বেঁধে দিয়ো।

—না খোকা, তাহলে রোগ সারতে দেরী হবে।

—তবে কখন্ খুলে দেবে?

—খাতাঞ্জিমশায় আসুন, তিনি এসে বলবেন। আমি ত জানি না।

—বাবা, তুমি ত নিজের হাতে বেঁধে দিলে—তুমি জান না?

—খাতাঞ্জিমশায় বল্লেন তাই বাঁধলুম, তিনি না বল্লে ত খোলবার জো নেই।

—ওঃ তাই? আমি ভাবলুম তুমি নিজের থেকে বেঁধেছ। তুমি নিজের হাতে বাঁধলে তাই বাঁধতে দিলুম নইলে আর কেউ হলে কক্‌খনো দিতুম না।

—মনে দুঃখ কোরোনা খোকা!

—খাতাঞ্জিমশায় চোখ বাঁধতে বল্লেন কেন বাবা?

—তিনি বলেন, কেবল আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে—তাই আকাশটাকে ঢেকে রাখতে হবে।

—কিন্তু বাবা, আমি ত আকাশ বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—দেখতে পাচ্ছ? সর্ব্বনাশ! রোসো আর-এক পুরু কাপড় জড়িয়ে দিই।

—বাবা, তবুও দেখতে পাচ্চি।

—রোসো, আর-এক পুরু—

—হাজার ঢাকলেও ঢাকা পড়চে না, তবে কেন আমায় মিছে বাঁধনের কষ্ট দিচ্চ বাবা?

—একটু সয়ে থাক খোকা।

—আচ্ছা বেশ।

[খানিকক্ষণ উভয়ে চুপ]

—খোকা, চুপ করে আছ কেন বাবা? বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি?

—তুমি বলচ, একটু সয়ে থাকি না বাবা!

—হ্যাঁ বাবা, একটু সয়ে থাক!

[উভয়ে আবার চুপ]

—বাবা খোকা, মুখটা অমন শুকিয়ে উঠেছে কেন বাবা? বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি?

—তুমি বলচ, একটু না-হয় সইলুম।

—না, না, না, সয়বার দরকার নেই। এস, এস খুলে দিই।

(চোখ খুলিয়া দেওয়া)

—বাবা! বাবা! তোমায় দেখতে পেয়ে আমার চোখ যেন জুড়োলো। এতক্ষণ সব দেখতে পাচ্ছিলুম, তোমার মুখ কেবল দেখতে পাচ্ছিলুম না।

[খাতাঞ্জির প্রবেশ]

—অ্যাঁ করেছ কি? এরই মধ্যে চোখ খুলে দিয়েছ? দেখচ-না, সমস্ত আকাশ-খানা ওর চোখের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠেছে।

—না খাতাঞ্জিমশায়, আর খোকার চোখ বাঁধতে বলবেন না। ওর চোখ বাঁধলে মনে হয় ও যেন আমার নেই—ওর সমস্তটা আমি ওর চোখের মধ্যে থেকেই পাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন থাক। তুমি চলে এস—হিসেব দেখবার সময় হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পাখীর আবির্ভাব]

—ভাই পাখী, তুমি কি আমায় নিতে এসেছ?

—তুমি যে আমার সঙ্গে গিয়েছিলে।

—কৈ কখন্? টের পাইনি ত!

—মনে পড়চে না? সেই যে তুমি আমার গানের সুর ধরে-ধরে ভেসে ভেসে চলেছিলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ রকম একটা স্বপ্ন দেখে-ছিলুম বলে মনে পড়ছে।

—সে স্বপ্ন নয়—সে সত্যি!

—সে সত্যি?

—হাঁ, আমার সঙ্গে যাওয়া-আসা ঐ রকম স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

—সত্যি? সত্যি? তা হলে যা দেখেচি সব সত্যি?

—সব সত্যি!

—কিন্তু ভাই পাখী, এ কি হল? যা দেখ্‌লুম সব মনে পড়ছে কিন্তু সে কী তা-ত মুখে বল্‌তে পার্‌ছি না।

—সে ত ভাই, বলা যায় না।

—তবে বাবাকে বল্‌ব কি করে?

—বলা তোমার আপনি ফুটে উঠবে—ফুল যেমন করে ফুটে ওঠে!

—কিন্তু ভাই পাখী, এবার যে-দিন নিয়ে যাবে, অমন আচম্‌কা নিয়ে যেয়ো না, একটু জানিয়ে দিয়ো।

—তা হলে যে যাওয়াই হবে না।

—নইলে যে ভাই বুঝতে পারি না তোমার সঙ্গে সত্যি যাচ্ছি কি-না;—স্বপ্ন বলে মনে হয়।

—বুঝতে গেলে যে সময় থাকে না ভাই; বোঝবার সময়ের মধ্যে যাবার সময়টুকু ফুরিয়ে যায়।

—আচ্ছা ভাই পাখী, তুমি যে নিয়ে গেলে সে ত কেবল পথে-পথেই বেড়ালে—কোনো জায়গায় ত নিয়ে গেলে না।

—কোনো জায়গায় যেতে গেলেই যে যাওয়া থেমে যায়;—আমি ত কোথাও থেমে থাকতে পারি না।

—তবে কি কেবল পথে-পথেই ঘুর্‌বো? কোনো জায়গা আমার দেখা হবে না?

—সমস্তই যে পথ—জায়গা ত আলাদা করে নেই।

—ভাই পাখী, আবার কবে নিয়ে যাবে?

—তা ত বল্‌তে পারি না।

[পদশব্দ। পাখীর অন্তর্দ্ধান।]

[বাপের প্রবেশ]

—বাবা! বাবা! পাখীর সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—তা বাবা, আমি বলতে পার্‌ব না। কিন্তু সে ভারি চমৎকার!

—কখন্ গিয়েছিলি?

—তা আমার খেয়াল হচ্ছে না।

—কি দেখলি?

—সে আমি এখন বল্‌তে পারব না—পাখী বলেচে, আমার বলা ফুলের মতন আপনি ফুটে উঠবে।

—খোকা এ-সব কি আবোল-তাবোল বকচ? এই নাও ধারাপাত। নামতা

মুখস্থ না হলে খাতাঞ্জিমশায় ভারি রাগ করবেন।

[নামতা পড়িতে পড়িতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল।]

---

(৪)

[খাতাঞ্জি ও বাপ]

খাতাঞ্জিমশায়, খোকা এখনও পাখী পাখী করছে!

—তুমিই ত বাবা খোকার মাথা খেয়েছ। মনকে হিসেবের লাগামে বাঁধতে না পারলে সে ত ছুটে ছুটে বেড়াবেই। জমাখরচের কোনো অঙ্কের মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে না, অথচ বাতিল করারও যো নেই। হিসেবের মধ্যে এমন সমস্যা না ঘটতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

—কিন্তু খাতাঞ্জিমশায়, আমিও ত হিসেব শিখিনি।

—তুমি শেখনি বটে কিন্তু হিসেবের প্রতি এবং বিশেষ-করে হিসেব-রক্ষকের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে। অবশ্য সে তোমার বিষয়ী পিতৃপুরুষের পাকা বুদ্ধির ফল। কিন্তু বাবা, তোমার ছেলের জন্যে ত তুমি কোনো পাকা ব্যবস্থাই করলে না।

—কি জানেন খাতাঞ্জিমশায়, ছেলেটাকে মোহরের থলির মধ্যে পুরে সিন্দুকে বন্ধ রাখতে আমার মন-কেমন করে। মনে হয়, ছেলেটা বেশ নিরাপদে জমা রইল বটে কিন্তু সে যেন সিন্দুকেই থেকে গেল।

—ঐ ত বাবা তোমার মস্ত ভুল। সিন্দুকে থাকাই ত থাকা—যখন খুসি গুণে দেখ ঠিক আছে। নইলে বাইরে, যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রাখলে হিসেব মিল্‌বে কি করে?

—তা ঠিক বটে কিন্তু তবু—

—ঐ তবুটুকু তোমার হিসেব না জানার কুফল।

—তা বলে ছেলেকে আদর করব না?

—আদর কেন কর্‌বে না? অত যে যত্ন করে সন্তর্পণে রাখা, সে কি আদর নয়? আসল আদর ত তাকেই বলি।

—খাতাঞ্জিমশায় বলছেন বটে ঠিক কিন্তু মন মান্‌ছে না।

—সে তোমার মনে হিসেববুদ্ধি পাকেনি বলে।

—ও-সব কথা যাক্! এখন আমার খোকাকে রক্ষা করি কি করে বলুন।

—ঐ ত বাবা, আবার ঘুরিয়ে সেই কথাই আন্‌লে! বাইরে আল্‌গা রাখলেই তার বিপদ আছে। বাইরের ত সীমা নেই, যে তার সমস্তটা তলিয়ে দেখবে! যে কেবল বাইরে ছড়িয়ে থাকবে তাকে হিসেবের মধ্যে বাঁধবে কি করে?

—খাতাঞ্জিমশায়, ওসব হিসেবের কথা রাখুন—ছেলেকে যেন না হারাই।

—হারিয়ে বসে আছ—আর না-হারাই!

—না খাতাঞ্জিমশায়, ও-কথা বলবেন না; আমি অন্তর থেকে বুঝচি তাকে হারাইনি।

—পেলেই না, তা আবার হারাবে?

—পেয়েছি বৈ কি—খুব পেয়েছি—পাওয়াতে আমার হৃদয় ভরে আছে।

—তোমার ও হৃদয়ের-পাওয়ার কোনো মানে নেই ;—তাহলে বলনা কেন সমস্ত বিশ্বটা তোমার পাওয়া হয়ে গেছে—তুমি তার সম্রাট।

—সে কথা যে বলা যায় না তা ত মনে হচ্ছে না খাতাঞ্জিমশায়।

—বল্লেই ত হয় না!—হিসেব দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

—তা আমার সাধ্যে নেই।

—তবে চুপ করে থাক। এত করেও তোমায় হিসেবের মর্ম্ম বোঝাতে পারলুম না!

—রাগ করবেন না খাতাঞ্জিমশায়!

—রাগ করা আমার স্বভাব নয়– রাগের মাথায় অনেক বাজে-খরচ হয়ে যায় আমার জানা আছে।

—তাহ'লে খোকার সম্বন্ধে কি করব?

—সে আমি ভেবে রেখেছি।

—কি ভেবেছেন বলুন না।

—আমাকে এমন বেহিসেবী পাওনি যে তোমার মতন আল্‌গা লোকের কাছে ফাঁশ করে দিয়ে আমার সব হিসেব ওলট-পালট করে ফেলি!

—আচ্ছা, আমার শোনবার দরকার নেই। কিন্তু আমার ছেলে—

—তার জন্যে ভাবনা নেই। হিসেবের জালে এমন ফাঁক নেই যে তার মধ্যে কেউ গলে পালায়! দুয়ে দুয়ে চার হতেই হবে।

—শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

—কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতুম যদি তুমি হিসেব শিখ্‌তে। আমি ত আর চিরদিন থাকব না—আমাকে এমন করে আঁকড়ে থাকলে কি হবে? তার চেয়ে যদি হিসেবকে আঁকড়াতে পারতে, তোমার মঙ্গল হত।

—যাই, একবার খোকাকে দেখে আসি।

[প্রস্থান]

—আরে চল্লে কোথায়? এখন যে খাতা দেখবার সময়। [খাতায় মনোনিবেশ]

---

(৫)

[দূরে বালক ও পাখীর কথোপকথন।]

[খাতাঞ্জির প্রবেশ]

—হিসেব ঠিক করা চাই, হিসেব ঠিক করা চাই—পাখীটা কখন্ আসে কখন্ যায় তার হিসেব রাখতে না পারলে সব ফেঁশে যাবে।…কিন্তু পাখীর তো যাওয়া-আসার কোনো হিসেব দেখচি না…নিশ্চয় একটা নিয়ম আছে—এই খামখেয়ালির মধ্যেও নিশ্চয় একটা নিয়ম আছে—সেই হিসেবটি বার করতে না পারলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। আমি সব টুকে টুকে রাখছি—মাপ-জোক ঠিক করে নিয়েছি; সে সব সাজিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে আমি নিয়মটা ধরে ফেলবই। আমার চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত! [খাতা খুলিয়া গম্ভীরভাবে মনোনিবেশ]

[দূরে চীৎকার]

—ভাই পাখী, ভাই পাখী—সে বেশ হবে! বেশ হবে!

[শব্দে খাতাঞ্জির মন বিক্ষিপ্ত হইল]

—নাঃ, এমন গোলমাল হলে সব ঘুলিয়ে যায়—হিসেবটা প্রায় ঠিক করে এনেছিলুম। যাক, আবার দেখি। [খাতায় মনোনিবেশ]

[দূরে আবার চীৎকার]

—নাঃ। এখানে দাঁড়িয়ে হিসেব চলবে না।—গোলমালে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান]

[বাপের প্রবেশ। পাখীর অন্তর্দ্ধান]

—বাবা, বাবা! পাখীকে এত করে বল্লুম যে চল্‌না ভাই, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবি—সে কিছুতে শুনলে না।

—তাইত খোকা, তোমার বন্ধুকে একবার দেখালে না।

—আমার ত ভারি ইচ্ছে, কিন্তু পাখী যে আসে না।

—সে বোধ হয় আমায় দেখে ভয় পায়।

—ভয় পায়না বাবা! সে বলে এখন নয়—একদিন তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। বাবা, তুমি দুঃখু কোরোনা, তোমার সঙ্গে পাখীর দেখা হবে।

—আচ্ছা খোকা, তোমার বন্ধু তোমায় ভালোবাসে?

—খুব ভালোবাসে।

—আমার চেয়ে ভালোবাসে?

—সে বাবা, আর-এক-রকম ভালোবাসা।

—আচ্ছা, তুমি তাকে বেশি ভালোবাস? না, আমায় বেশি ভালোবাস?

—তাকেও বেশি ভালোবাসি, তোমাকেও বেশি ভালোবাসি।

—সে তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না ত?

—সে ত কাউকে কোথাও নিয়ে যায় না;—ইচ্ছে হলেই তার সঙ্গে যাওয়া হয়।

—আমাকে ছেড়ে তোমার যেতে ইচ্ছে হয়?

—তা ঠিক বুঝতে পারিনা বাবা, একবার যেন হয়, একবার যেন হয় না।

—খোকা, তোমার এসব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—আমারও বাবা, মনে হয়, আমি যেন ঠিক বলতে পারচি না।

[খাতাঞ্জির প্রবেশ]

—চলে এস, চলে এস—অনেক হিসেব এখনো বাকি পড়ে আছে।

—খাতাঞ্জিমশায়, আপনার চোখ দেখে আমার কেমন ভয় করছে। আপনি কি ঠিক করেছেন জানিনা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পাখী না পেলে খোকা বাঁচবেনা। সে বুনো পাখী, কখন্ উড়ে কোথায় চলে যাবে ঠিক নেই—খোকা আমার হেদিয়ে সারা হবে।

—তোমাকেও পাখী-রোগে ধরেচে দেখচি।

—না খাতাঞ্জিমশায়, আপনার পায়ে পড়ি—

—কি তুমি করতে চাও?

—আমি বলি কোনো ব্যাধ ডেকে পাখীটাকে ধরে খাঁচায় পুরে রাখুন। তাহ'লে খোকাও থাকবে, পাখীও থাকবে।

—তা'হলে খোকা থাকবে না-হয় মানলুম, কিন্তু পাখী থাকবে কি করে জানলে?

—লোহার খাঁচা—

—লোহার জোর তোমার জানা থাকতে পারে—কিন্তু ঐ পাখীর জোর কি তুমি জান? যতক্ষণনা তা ঠিক জানছ ততক্ষণ বলতে পারনা পাখীকে খাঁচায় আট্‌কে রাখতে

পারবে কি-না। এ সব হিসেবের কথা। এখন চলে এস।

—আচ্ছা, চলুন।

—তাহলে খোকাকে ধারাপাতখানা—

—হঁ্যা বাবা খোকা, তুমি এই ধারাপাত নিয়ে নামতা মুখস্থ কর।

[নামতা পড়িতে পড়িতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল]

---

৬)

[দূরে খোকা ও পাখীর কথোপকথন।]

[খাতাঞ্জি ও বাপের প্রবেশ]

—খাতাঞ্জিমশায়, আমার কেমন ভয়-ভয় করছে।

—থাম। তুমি এখন গোল কোরো না। এই যে চিহ্নটা রয়েছে এইখানে বাঁ পা, আর এই চিহ্নের উপর ডান পা রেখে দাঁড়াও। পূবদিকে একটু ঘাড় হেলিয়ে দাও—না না অতটা নয়। রোসো মেপে দেখি। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। দেখো নড়ো না। খবরদার! (আবরণের ভিতর হইতে বাহির করিয়া)—এই নাও!

—এ কি!

—বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না—হিসেব করে দেখেছি—নষ্ট করবার মতো সময় অল্পই হাতে আছে।

—আমার বুক কেমন কাঁপচে।

—চোপ্! স্থির হয়ে দাঁড়াও। পাখীর বুকের ঠিক মাঝখানটিতে লক্ষ্য করো। ঠিক তোমার কাণ অবধি তীর টান্‌বে—আর এক-চুল বেশী নয়। নাও। দেখো লক্ষ্য ভুল কোরো না।

—খাতাঞ্জিমশায়, কাকে মারতে বলছেন?

—ঐ পাখী। দেখতে পাচ্চ না? ঠিক করে লক্ষ্য কর।

—কৈ না! পাখী ত দেখচি না—ও ত খোকা।

—খোকার বুকের কাছে? ভয় নেই—ও তীর পাখীর বুক বিঁধে এক চুলও বেশী যাবে না—হিসেব করে ছিলে বাঁধা আছে। পাখীকে দেখচ?

—কৈ না! ও ত খোকা!

—তার বুকের কাছে?

—খোকা।

—তার কাছে?

—সেখানেও খোকা!

—দাও, দাও, আমার হাতে ধনুর্ব্বাণ দাও। তোমার কর্ম্ম নয়!

[নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া খাতাঞ্জি তীর ছুঁড়িল। তীর বালকের বুকের কাছে পৌঁছিতেই পাখী মিলাইয়া গেল; বালক বিদ্ধ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।]

—খাতাঞ্জিমশায়, এ কি করলেন?

—তাই ত—কী হ'ল!—এ ত হবার নয়! তবে কেমন করে হ'ল! হবার নয় তবু কেমন করে হ'ল!

[পাখীর আবির্ভাব]

[বাপ বিস্ময়ে পাখীর পানে চাহিয়া রহিল।]

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

গোয়েন্দাগিরি

কার্য্য ও কারণের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, আপাতঅদৃশ্য অনুষ্ঠানকে ন্যায়-বিধানের শাসনে আনাই গোয়েন্দার কার্য্য। সাধারণ লোকে আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার সৎব্যবহার করে না; তাহারা দু-চারিটা জিনিস উপর-উপরি দেখিয়া মোটামুটি এমন-একটা ধারণা করিয়া লয়, যাহা কার্য্য ও কারণের রহস্যোদ্ভেদ করিতে অক্ষম। কাজেই ডিটেক্‌টিভ যখন হত ব্যক্তির ঘরের চারদিক শ্যেনদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ একখানা খাম কুড়াইয়া লইয়া দুই-চারিবার ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একটিবার শুঁকিয়াই বলিয়া দেয় যে, খুনীর চোখদুটো নীল, তাহার চুলগুলো কটা ও বামগালে একটা কাটা দাগ আছে, তখন আমরা হতভম্ভ হইয়া যাই। কিন্তু একটু ধীরভাবে আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণশক্তি ব্যবহার করি, তাহাহইলে গোয়েন্দার আবিষ্কারে অপূর্ব্বত্ব অপেক্ষা কার্য্য ও কারণের একটা শৃঙ্খলাই অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

চুরি হইয়া গিয়াছে,—ইহা একটি প্রকৃত ঘটনা; যন্ত্রের সাহায্যে সিঁদ কাটিয়া চুরি হইয়াছে, তাহাও সত্য; চোর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া প্যাঁটরা-সিন্দুক ঘাঁটিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়াছে তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। এখন পরস্পরের সংযোগে এই ঘটনাগুলিকে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিলেই ইহা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হইল। এইরূপেই অন্যান্য বিজ্ঞানের মত অপরাধ-বিজ্ঞানও গঠিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের ইংরাজী নাম "ক্রিমিনলজী"। অষ্ট্রীয় আইনজ্ঞ ডাক্তার হান্স গ্রস এই বিজ্ঞানের আবিষ্কার-কর্ত্তা।

ডাক্তার গ্রস সর্ব্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়ার গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিজ্ঞান ভূতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের মত যাহাতে এই "অপরাধ-বিজ্ঞানে"রও সম্যক অনুশীলন ও অধ্যাপনা হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এখানে মানব-সমাজে অনুষ্ঠিত যাবতীয় অপরাধসমূহ নানাভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্য পুস্তকেরও অভাব নাই। ডাক্তার গ্রসের প্রচারিত এই নূতন বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইউরোপে লটিক, বুখারেষ্ট, লগেন ও গ্রাজ এই চারিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রগণকে রীতিমত ডিগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু, অষ্ট্রীয়ার পুলিস সর্ব্বদাই এই সকল বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণ করে। গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ-সম্বন্ধে যে সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতে নানাপ্রকার অপরাধ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মত গবেষণাপূর্ণ, উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত। গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পত্রিকা-খানিই এই বিষয়ের প্রধান পত্রিকা।

ইহাতে ডাক্তার গ্রসের লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশী। তিনি যে কেবল নানাজাতীয় অপরাধ এবং তৎসম্পর্কীয় দ্রব্যসমূহেরই বিশেষজ্ঞ, তাহা নহে; পরন্তু, জ্ঞান-রাজ্যে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা তিনি নিখুঁতভাবে জানেন না। এমন কোনও বস্তু নাই যাহার উৎপত্তি বা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সেই বস্তুর নির্ম্মাতা যে ভাবে বুঝাইয়া থাকে ঠিক সেইভাবে তিনি বুঝাইতে পারেন না। পুরাতন বন্দুক-পিস্তলসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান প্রত্নতাত্ত্বিককেও লজ্জা দেয়; ইউরোপীয় ও মার্কিণ 'ভবঘুরে'দের নানা সঙ্কেত ও অদ্ভুত ভাষা, সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। সয়তানের অনুচরদিগের মন তিনি এমন জলের মত সরলভাবে পাঠ করিয়াছেন যে, মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে।

তিনি বলেন, "মানুষের মন ও তাহার কার্য্য লইয়াই গোয়েন্দার কারবার। কাজেই গোয়েন্দাকে মানুষের তৈয়ারি যাহা-কিছু আছে সমস্ত বিষয় জানিতে হয়। গোয়েন্দার পক্ষে নানা ভাষায় পণ্ডিত হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনই ম্যাপ আঁকা, নানাপ্রকার কারিকরি শিল্পবিদ্যাতেও তাঁহাকে পারদর্শী হইতে হইবে। ডাক্তারী-বিদ্যা জানা গোয়েন্দার পক্ষে যেমন বিশেষ প্রয়োজন, তেমনি বুককিপিং প্রভৃতি কাজও তাঁহার নখদর্পণে থাকা চাই। মাছ-চোর পাখী-চোরের স্বভাব হইতে টাকার বাজারের জুয়াচোরদিগের চাতুরী পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহাকে আয়ত্তে রাখিতে হইবে। বদমায়েসদিগের সঙ্কেত, তাহাদের কথা, চাল-চলন, রীতিনীতি সমস্তই তাঁহার জানিয়া রাখা আবশ্যক।"

সকলপ্রকার শিল্প ও যন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ হইতে না পারিলে গোয়েন্দার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-বিজ্ঞানে একদিকে যেমন হাতের লেখা, বোমা, ছোরা-ছুরি, বন্দুক, পিস্তল, ফটোগ্রাফ এবং চোরের ভাষা ও তাহাদের রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি সত্য-মিথ্যা চিনিয়া লওয়া, অপরাধীর মনো-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও হাতে-কলমে শেখানো হইয়া থাকে। মোটের উপর মানুষকে জানিতে হইলে মানুষের মধ্যে বিচরণ করিতে হইলে যাহা-কিছু আবশ্যক হয়, সমস্তই একটির পর একটি করিয়া ধারাবাহিক ভাবে অপরাধ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

ডাক্তার গ্রস বলেন, "পাপীরা মানুষ বৈ আর-কিছুই নয়; কাজেই তাহাদের চিনিতে হইলে মানুষ-চেনা বিশেষভাবে আবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথির হিমালয়ের উপরে চড়িয়া বসিতে পারিলেই মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। কাজেই গোয়েন্দাকে সকলশ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিচরণ ও তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে হইবে। কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী, কি দীন, সকলের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গভাবে ঘনিষ্ঠতা, সকলের চালচলনে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা, প্রত্যেকের কথাবার্ত্তা, —এমন-কি সামান্য সুখ-দুঃখের কথা ও রসালাপ পর্য্যন্তও বেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সামাজিকতা এবং সামাজিকতার যে সকল ভেক ও ভাণ আছে তাঁহা লক্ষ্য করা,

তাহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ ও বিচার করা অত্যাবশ্যক। সকল মানুষই জীবনে বহুবার ঠকিয়া থাকে, গোয়েন্দাও যে ঠকেন-না তাহা নহে; কিন্তু যিনি প্রকৃত গোয়েন্দা তিনি প্রতারিত হইলেও,—যেমন ভাবে অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ অঙ্কের সমস্যা সমাধান করিয়া থাকেন, যেমন ভাবে পদার্থ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তিলে তিলে নষ্ট করিয়া বৈজ্ঞানিক নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়া থাকেন,—তেমনি ভাবে সেই প্রতারণার আমূল রহস্য-ভেদ করিতে সক্ষম হন। ভবিষ্যতে সেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান, গোয়েন্দার পথ সুগম করিয়া তোলে।

সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সত্য কথা কোন লোকেই বলেনা; কেহ স্বেচ্ছায় জানিয়া-শুনিয়া, কেহ-বা অনিচ্ছায় এবং কেহ-বা আপনার অজ্ঞাতে খাঁটি সত্যের উপরে রঙ্গ ফলাইয়া থাকে। কোন সংবাদ যখনি অন্যমুখে যায়, তখনি তাহার কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটে—মানুষের স্বভাবই এই। স্বভাব, সংস্কার, বয়স, মানসিক গতি বুঝিবার ক্ষমতা ও মনোভাবের জন্যও সত্য রূপান্তরিত হয়। পুরুষ একটা বিষয়ের বর্ণনা একভাবে করে আর নারীতে আর-একভাবে করিয়া থাকে; কাজেই খাঁটি সত্য এবং খাঁটি মিথ্যা কি, কোন্‌খানেই-বা সত্য স্বাভাবিক প্রথায় রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, কতটুকু স্বেচ্ছা বা ভ্রমবশতঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে, কোন্ ঘটনার বর্ণনায় কতটুকু বাদ দিয়া কতখানি গ্রহণ করিতে হইবে, এই সকল চিনিয়া লইবার ক্ষমতা না থাকিলে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মদর্শী গোয়েন্দা হওয়া যায় না।

তারপর দুষ্টের ছল। কোন বদমায়েস হয়ত ধরা পড়িয়া জেরা এড়াইবার জন্য একেবারে কালা বনিয়া যায়, কাণের কাছে ঢাক বাজাইলেও একটুও না-চমকাইয়া পাথরের পুতুলের মত চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকে; সাধারণ লোকে মনে করিল এক বেচারা কালাকে ধরিয়া অনর্থক হয়রাণ করা হইতেছে; কিন্তু সে যে কালা নহে যদি তাহার প্রমাণ চাও, তবে চুপিচুপি তাহার পিছনে আসিয়া খুব ভারি একটা-কিছু জিনিস একটু উঁচু জায়গা হইতে মাটিতে ফেলিয়া দাও। যদি দেখ, সেই ভারি জিনিসটার পতনশব্দ কালা লোকটার খেয়ালেই আসিল না, তাহাহইলে বেশ জানিবে, সে কালা নয়—বধিরতা তাহার ছল! কেননা, উচ্চশব্দ হইলে আসল যে কালা, সে ফিরিয়া তাকাইবেই-তাকাইবে। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য!

কোথাও একটা খুন হইয়াছে, সাধারণ পুলিসের গোয়েন্দা সেখানে গিয়া মহা উৎসাহে মহা বিজ্ঞতার সহিত সমস্ত জিনিসপত্র উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া একেবারে তছ্‌নছ্‌ করিয়া ফেলে। ডাক্তার গ্রস কিন্তু বলিতেছেন, 'খবরদার! ঘটনাস্থলে গিয়া জিনিসপত্র মোটে ছুঁইবে না! আগে বেশ করিয়া দেখিয়া লও কোন্ জিনিস কোথায় কি অবস্থায় আছে! তারপর জিনিসপত্র-সমেত সমস্ত ঘরখানার একটা কাদার ছাঁচ বা একখানা ম্যাপ বা ফোটো তুলিয়া লও; তারপর জিনিসপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ।' ডাক্তার গ্রসের মতে, পরীক্ষার পূর্ব্বে এই কার্য্যটি গোয়েন্দার পক্ষে একেবারে

অপরিহার্য্য। ইউরোপের পুলিসও এখন ইহার সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া এইরূপেই কার্য্য করিতেছে। ইহাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হইয়া গিয়াছে; কারণ ঘটনাস্থলের একখানা ছবি তুলিয়া লইতে পারিলে যতদিন পরেই হউক-না-কেন, ব্যাপারটা যখনি আলোচনা করিতে হইবে তখনি তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি সঠিক পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল এই-রূপভাবে ছবি তুলিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে। বার্টিলন নামক একজন অপরাধ-তত্ত্বজ্ঞ, একপ্রকার নূতন ক্যামেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ছবি তুলিয়া মিলিমিটার-হিসাবে ঘরকাটা কাগজের উপরে তাহা উঠাইলে ঘটনাস্থলের প্রত্যেক জিনিসটির মধ্যে কতটুকু ব্যবধান, তাহা নিখুঁত বুঝিতে পারা যায়। কাজেই আর কোনরকমেই জিনিসপত্রের সমাবেশ ও অবস্থান প্রভৃতি লইয়া গোল হইবার উপায় থাকে না।

গোয়েন্দার নিকটে অবহেলার কিছুই নাই। গ্রস বলিতেছেন, 'সামান্য অথবা তুচ্ছ বলিয়া কোনও জিনিস অবহেলা করিবে না।

একটা ঘটনায় চারিদিকের সমস্ত প্রমাণাদির দ্বারা দেখা গেল যে, কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। ঘটনাটির তদন্তে গেলাম।

সন্ধানে যতদূর জানিলাম তাহাতে তাহার আত্মহত্যার কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। ঘরের মাঝখানে ঝাড়ের হুক হইতে লাশটা ঝুলিতেছিল, পা-দুইটা মাটি হইতে প্রায় দেড়ফুট উপরে। ঘরের ভিতরে একটা লিখিবার টেবিল ও তাহার নিকটে একখানা চেয়ার। এককোণে দুইখানা আর্ম-চেয়ার ও অন্যান্য দুই-একটা জিনিস। আমার মনে কি-রকম একটা খট্‌কা লাগিল। আত্মহত্যাকারী কি-করিয়া যে আপনার গলায় ফাঁশ পরাইয়াছে—তাহা লইয়াই আমার সন্দেহ। চেয়ার বা টুল বা এমনি একটা-কিছুর উপর দাঁড়াইয়া লোকে আপনার গলায় ফাঁশ লাগাইয়া তারপরে পা-দিয়া টুল বা চেয়ারটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, ইহাই চল্‌তি নিয়ম। কিন্তু এ ব্যক্তি কি-করিয়া গলায় ফাঁশ লাগাইল? কাছাকাছি কোন টুল বা চেয়ার উল্টাইয়া নাই—অথচ, এত-উঁচু ঝাড়ের নাগাল সে কেমন করিয়া পাইল? হয় কেহ ইহার আত্মহত্যায় সাহায্য করিয়াছে অথবা এ লোকটি অন্যের হাতে মারা পড়িয়াছে। আমি মন-দিয়া সন্ধান আরম্ভ করিলাম। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে লোকটা আত্ম-হত্যাও করে নাই অথবা হতও হয় নাই। বাড়ীতে সে একা থাকিত, লোকজনের মধ্যে একটা রাঁধুনী আর এক চাকর। ঘটনার দিনে রাঁধুনী ও চাকর যখন বাহিরে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়াছিল, হৃৎপিণ্ডের অসুখে এ লোকটি তখন হঠাৎ মারা পড়ে। সকালবেলা চাকরেরা বাড়ীতে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং প্রভুর প্রতি দৃষ্টি না রাখার জন্য হয়ত তাহারাই পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হইবে এমনি একটা সন্দেহ তাহাদের মনে বদ্ধমূল হয়। ফলে, তাহারা প্রভুর মৃতদেহটি দড়ি-দিয়া ঝাড়ের সঙ্গে ঝুলাইয়া দেয়—যাহাতে সকলে মনে করে যে, তাহাঁদের প্রভু আত্ম-

হত্যা করিয়াছেন!—অতিবুদ্ধি ফলাইতে গিয়া তাহারা বিপদকে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল!”

অপরাধতত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কোন সামান্য জিনিসও যেমন অবহেলা করা অকর্ত্তব্য, তেমনি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত না হইলে কোন-কিছু প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করাও উচিত নয়। এইজন্য গোয়েন্দাদের পক্ষে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ বলিতেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী খুব হোমরা-চোমরা একজন-কেহ বুঝাইবে, তাহা নহে। ডাক্তার গ্রসের মতে, যে, যে কার্য্য করিয়া হাত পাকাইয়াছে সে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তবে গোয়েন্দাদের এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, কোনও কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িলেই মুস্কিল! অর্থাৎ, গোয়েন্দার জানা দরকার, বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের সীমা কতটা—তিনি কতদূর অবধি বলিতে পারিবেন। পাথরের উপরে রক্তের দাগ দেখিলে, অনুবীক্ষণ-যন্ত্র লইয়া যিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। জামার হাতায় কোন-একটা দাগ দেখিলে রসায়নবিদের কাছে যাইতে হইবে। উইলখানা জাল না খাঁটি জানিতে হইলে হাতের লেখার ওস্তাদের সহিত দেখা করিলেই চলিবে। 'সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করা ভাল। আমি নিজেও যখন-তখন বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করি।

একটা খুনের তদন্তে আমি একজন কামারকে এক ছোরা দেখাই। সে, ছোরা-খানা দেখিয়াই বলিয়া দিল যে ইহা এক বহিমীয়া প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। তাহাকে না দেখাইলেও হয়ত আমার চলিত। কিন্তু, তাহাহইলে এত চটপট্ খুনের কিনারা করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ!”

এই ত গেল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লওয়ার কথা। গোয়েন্দাকে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। নহিলে, পদে পদে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ এইজন্য আবশ্যক, যে, একটা লোকের ঘরে রাসায়নিকের সূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কামারের বিরাশী-মণ ওজনের হাতুড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখা সম্ভব নহে। গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন ইন্সটিটিউট অফ ক্রিমিনলজী নামক যে সমিতি আছে, তাহা একটি অদ্ভুত যাদুঘর-বিশেষ। পৃথিবীর যাবতীয় পাপানুষ্ঠানের নিদর্শন আপন-আপন ইতিহাস বক্ষে লইয়া এখানে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। এইরূপ যাদুঘর আর দ্বিতীয় নাই। সারি-সারি মানুষের মাথার খুলি সাজান আছে; সকল খুলিই ফাটা। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক খুলিই ভিন্নধরণের আঘাতে ফাটিয়াছে। কোন্ জিনিস দিয়া মাথার কোন্ জায়গায় আঘাত করিলে কিরূপ ভাবে খুলিটা ফাটে তাহা দেখাইবার জন্যই এগুলি রক্ষিত রহিয়াছে। আবার, আর এক জায়গায় যে-সকল অস্ত্র দিয়া এই সকল মাথা ফাটান হইয়াছে, তাহাও রক্ষিত। কোথাও-বা আলমারীর পর আলমারী

ভরিয়া নানাজাতীয় বিষ সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; প্রত্যেকটার গায়ে টিকিট, কিরূপে ঐ-সকল বিষ সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়, কিরূপেই বা কোন্ বিষ ধরা পড়ে, সমস্ত ঐ টিকিটের উপরে লেখা। আর এক জায়গায় কেবল সেঁকো বিষ। এই বিষটাই খুনীদের বড় প্রিয়, তাহারা অধিকাংশ স্থলেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। তৃতীয় ঘরে নানাজাতীয় অস্ত্র। গুপ্তি, ছড়ির ভিতরে বন্দুক এমন চমৎকার কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহা সহজে ছড়ি ছাড়া আর কিছু বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই; বিছানার চাদর, পাজামা, কামিজ, কোট প্রভৃতি যে-সব জিনিস পাকাইয়া দড়ি করিয়া অপরাধী তাহার সাহায্যে পলাইয়াছে ঘরের দেওয়ালে সেই সমস্ত টাঙ্গান। এইরূপে যতপ্রকার পাপানুষ্ঠান আছে, যাদুঘরের মধ্যে সমস্তরই নিদর্শন রক্ষিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা হয়, কিন্তু এইখানেই সে শিক্ষার শেষ নহে। ইহার পরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ছাত্রদিগকে এখানে ডাক্তার গ্রসের প্রবর্ত্তিত নূতন প্রণালীর ফটো তুলিতে শেখানো হয়। কোন লোক পাঁচবৎসর পূর্ব্বে কিরূপ দেখিতে ছিল, যদি তাহা জানিতে হয় তবে এই প্রণালী-মত ফটো তুলিলে খুব সহজেই তাহা জানা যাইবে। আগে লোকটার বর্ত্তমান চেহারার ফটো একখানা প্লেটের উপরে লইতে হয়। তারপর সেই 'নেগেটিভ্বে'র উপরে তাহার দশবৎসর পূর্ব্বেকার চেহারার আর-একখান ফটো উঠাইতে হইবে; ফলে নূতন একখানা ছবি দেখা যাইবে;—ইহাই লোকটার পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার ফটো। ইহার নাম Average Photography। তারপর, এখানে ছেঁড়া-কুটিকুটি অথবা ভস্মসাৎ কাগজ হইতে পাঠোদ্ধার, টেবিলের চকচকে বার্ণিসের উপরে হাত রাখিলে অথবা বোতলের গায়ে হাত রাখিলে যে সামান্য দাগ পড়ে তাহার খুব পরিষ্কার ফটোগ্রাফ-তোলা, রক্তপরীক্ষা, পায়ের দাগ-তোলা, বদমায়েসদের ভাষা-শিক্ষা, তাহাদের সঙ্কেত-শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার শেখানো হয়। ধূলি-পরীক্ষাও এই শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ। যে পিতল কি লোহার কারখানায় কাজ করে, তাহার জামার ধূলি, আর যে ব্যক্তি রাজমিস্ত্রী,—তাহার গায়ের ধূলি এক রকম নহে। কাজেই ধূলা-পরীক্ষার দ্বারা অনেকসময় দোষী ধরা পড়ে। একবার ময়দার কলে একটা চুরি হয়। একজন লোকের জুতার তলার কাদা পরীক্ষা করিয়া সেই চুরি ধরা পড়ে। জুতার তলার শক্ত কাদার চাপটা ভাঙ্গিতেই দেখা গেল তাহা দুইথাকে বিভক্ত। প্রথম এক থাকে শুষ্ক কাদা, মধ্যে খানিকটা ময়দা, তারপর আবার একথাক শুকনো কাদা। লোকটা কাদার উপর দিয়া কলে প্রবেশ করে, তারপর চুরি করিয়া আবার কাদার উপর দিয়াই ফিরিয়া যায়।

পায়ের দাগ চিনাইবার জন্য গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়; কারণ ইহা দ্বারা বুঝা যায় কোন লোক আস্তে-আস্তে কিংবা দৌড়াইয়া

গিয়াছে, সে মোটা না রোগা, পুরুষ না স্ত্রীলোক ইত্যাদি। তারপর রক্তের দাগ চিনাইবার পালা। তোয়ালেখানা বেশ দুধের মত সাদা পরিষ্কার। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহারই মধ্যে রক্তের দাগ দেখিতে পাইবে। সে রক্তটা কিসের, মানুষ কিংবা জন্তুর, তাহা আসল রক্ত কিনা, শুষ্ক রক্তের দাগের ভিতরে হাতের ছাপ অথবা অন্য কোন প্রকার ছাপ পাওয়া যাইতেছে কিনা, সেই সব শেখানো হয়। এইরূপে হাতে-কলমে যতদূর-সম্ভব সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর অন্য অন্য শিক্ষার মধ্যে বদমায়েসদের হৃদয়বৃত্তির কথা, তাহাদের মনোভাব প্রভৃতি নিরূপণ করিবার তত্ব এবং তাহাদের সংস্কার-সম্বন্ধে নানা বিষয় বিশেষ করিয়া শেখানো হয়। অপরাধীদের প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা সংস্কার, একটা-না-একটা অন্ধবিশ্বাস আছে। যেমন, চোরের ধারণা যেখানে চুরি করিবে সেখানে তাহার নিজের কিছু ফেলিয়া আসিলে আর ধরা পড়িবে না। যাহারা জহরত চুরি করে, সে কোন জহরতের দোকানে গিয়াই চুণীর একটা-কিছু চাহিবে। তাছাড়া ইহাদের কতরকমের তাবিজ, কবজ, মন্ত্র-তন্ত্র আছে, খরগোসের পা, কফিনের টুকরা, ফাঁসীর দড়া প্রভৃতি, আইনকে ফাঁকি দিবার সকলরকম কুসংস্কারমূলক চেষ্টার নিদর্শন গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। শিক্ষানবিশদিগকে এগুলি বিশেষভাবে জানিতে হয়।

লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার ব্যবসায় বলা যায়। নাপিতের একটা স্কন্ধ অন্যটার অপেক্ষা একটু উঁচু হইবেই। মুচীর হাত বেয়াড়া রকমের মোটা হইতে বাধ্য। যে বাঁশী বাজায় তাহার দাঁতের দোষ আছেই-আছে। যে পকেট কাটে তার আঙ্গুলগুলো সরু আর লম্বা,,—এইরূপে প্রত্যেক মানুষের যে স্বভাব যে ব্যবসায় যে প্রকৃতি, তাহার চেহারা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যায়। অপরাধ-বিজ্ঞানের এই-রূপ ভাবে লোক-চেনা একটা বিশেষ অঙ্গ।

ইউরোপে এখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই ধরণের শিক্ষা-দেওয়ায় সুফলও ফলিয়াছে; কারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীতে সেখানকার সাধারণ পুলিসেরও অনেক উন্নতি সাধিত হইতেছে।

শ্রীনরেশ দত্ত।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

পরিবার—বংশ।

ধর্ম্ম ও জাতসংক্রান্ত ক্রমবিকাশের আলোচনার পরে, এক্ষণে আমরা পরিবার ও বংশ-সংক্রান্ত ক্রমবিকাশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পরিবার-গঠনের মধ্যেও সমস্তই পরিবর্ত্তন ও গোলযোগ;—সমস্তই, প্রাচীন সমাজের উচ্ছেদের কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করে, কতকগুলি অনিশ্চিত প্রবণতা-

সমন্বিত একটি নূতন সমাজ-গঠনের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেয়।

পারিবারিক প্রতিষ্ঠানাদির পরিপুষ্টি, এবং য়ূরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে উহাদের পরিবর্ত্তন—এই দুই বিষয় আমরা পৃথকরূপে আলোচনা করিব।

*

* *

প্রথমেই বিবাহ।

প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের নিকট আট প্রকার বিবাহ-রীতি বিদিত ছিল। প্রথম হরণ ও চৌর্য্য,—আমাদিগকে আদিম বর্ব্বরতা স্মরণ করাইয়া দেয়; গম্ভীর ও জটিল ধরণের শেষ-বিবাহ-রীতিগুলি হইতে জানা যায়, যে গৃহপতিতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল: কুল-ধর্ম্ম ও পিতৃপূজার অনুষ্ঠানের ভিতর কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা—একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া সকলের মধ্যেই পরিগণিত হইত। ঐ সকল বিভিন্ন রীতির মধ্যে দুইটি রীতি রহিয়া গিয়াছে: একটি—"ব্রাহ্ম-বিবাহ";—এই রীতি,—প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে, যে সকল বংশ সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত, সেই সকল বংশেই সংরক্ষিত হইয়াছে: পিতা নিজ কুল হইতে কন্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে ভিন্ন কুলে, ভিন্ন কুলের লোকের হস্তে প্রদান করেন; শাস্ত্রে যাহা নিন্দিত সেই "আসুর-বিবাহে" পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন না, পরন্তু বিক্রয় করেন। এই আসুর-বিবাহ এক্ষণে কেবল দক্ষিণ-ভারতের কৃষকদের মধ্যেই প্রচলিত (১)।

উদ্বাহ-বন্ধন দুইটি নিয়মের দ্বারা পরিশাসিত।

একটি নিয়ম খুব প্রাচীন, কিন্তু এখন ততটা বলবৎ নহে: ইহা "Exogamy" অর্থাৎ বহির্বিবাহ-সংক্রান্ত একটা নিয়ম। কোন হিন্দু নিজের সপিণ্ডকে বিবাহ করিতে পারে না: পুরুষের দিক্ দিয়া ছয় ধাপ পর্য্যন্ত, এবং নারীর দিক দিয়া চারি ধাপ পর্য্যন্ত যাহারা আত্মীয়—এইরূপ আত্মীয়-দিগকে সপিণ্ড বলে। তাহা ছাড়া, কোন কোন গ্রন্থকার, একগোত্রের মধ্যে অর্থাৎ বেদোক্ত একই ঋষির বংশধরদিগের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করেন। এই সকল নিয়ম, বিশেষত শেষোক্ত নিয়মটি, উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও কোন কোন বেনিয়ার জাত ছাড়া, আর কোন জাতের মধ্যে কড়াক্কড়ভাবে প্রযুক্ত হয় না (২)

(১) বস্তুতঃ একমাত্র ব্রাহ্ম-বিবাহই বৈধ বলিয়া পরিগণিত (Mayne Hindu law and usage—দ্রষ্টব্য)।

(২) Ibbethon দ্রষ্টব্য।

"গোত্র শব্দের অর্থ বংশ,—একই পিতৃপুরুষের বংশধরদিগকে বুঝায়...ব্রাহ্মণেরা দাবী করে,—বড় বড় হিন্দু ঋষির নাম-অনুসারে তাহাদের গোত্রের নাম হইয়াছে।' কিন্তু তাহারা জন্মদাতা পিতা, কি আধ্যাত্মিক পিতা, সে কথা তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলে না...সে যাহাই হউক, ব্রাহ্মণ্যিক গোত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কুলানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছে। সকল ব্রাহ্মণই এইরূপ কোন-এক গোত্রের অন্তর্ভূত। শাখা-বংশ অপেক্ষা গোত্র আরো বিস্তৃত; শাখা-বংশ ও নূতন নূতন গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু কোন নূতন গোত্র হইতে পারে না।

দ্বিতীয় নিয়মটি (Endogamy) অন্তর্বিবাহের নিয়ম। নিজের জাতের ভিতরেই বিবাহ দিতে হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের নিকট এই নিয়মটি অবিদিত: সকলেই নিকৃষ্ট পদ-মর্য্যাদাবিশিষ্ট পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; অনেকেই সমান পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় উহার সমান অধিকার নির্দ্ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষ্যকারেরা বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়াছে। আজিকার দিনে এইরূপ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ (৩)।

বিবাহ-যোগ্য বয়সের পূর্ব্বেই স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ করিবে; বিবাহের এই নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিয়া পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিলে উচ্চজাতের অন্তর্ভূত পিতা-মাতার পক্ষে উহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য এবং তাহার দরুন তাহারা জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়।

উচ্চ জাতের সকলেই বিধবার পুনর্ব্বিবাহ ও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ নিন্দা করিয়া থাকে।

যতদিন আর্য্য-প্রথা বিদ্যমান ছিল তত দিন এক ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত কেহ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত না, যদি কখন অন্য পত্নী অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিত, সেই পত্নী উপপত্নী রূপেই গৃহীত হইত। তথাপি মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ধনশালীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিরল ছিল না; মুসলমান বিজয়ের পর, বহুবিবাহ আরো বিস্তার লাভ করিল; ইংরাজের আদালত শেষে বহুবিবাহ আরো স্পষ্টাক্ষরে মঞ্জুর করিল (৪)।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-শ্রেণী ছাড়া অন্য জাতের মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যিক গোত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে, যে জাতেরই হউক না, সকল হিন্দুই কোন-না-কোন গোত্রের অন্তর্ভূত...হিন্দু কৃষকদিগের অধিকাংশই জানে না, তাহারা কোনো গোত্রের অন্তর্ভূত, অথবা জানে না—গোত্র জিনিসটা কি। কিন্তু, বেনিয়া, ক্ষত্রিয়, অরোরা—এই সকল জাতেরা জানে তাহাদের গোত্র আছে—এবং সেইরূপ তাহারা ঘোষণাও করিয়া থাকে। বেণিয়া ও এমন-কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে, ঋষিদের বংশধর নহে, ইহা স্বতই উপলব্ধি হয়; কোন ব্রাহ্মণ যে ঋষিকুল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু বহুকাল হইতে নারীর দিক দিয়া উৎপন্ন সহজাতদিগকে (cognate) সপিণ্ড এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে; কেবল চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত এইরূপ সহজাতেরা সপিণ্ড বলিয়া স্বীকৃত হয়; অন্য সহজাত ষষ্ঠ ধাপ পর্য্যন্ত, কিংবা আরো দূর-ধাপের আত্মীয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে।"

(৩) মনুর নিম্নলিখিত বচনটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এক মৃত ব্রাহ্মণের চারি বিভিন্ন জাতের পত্নীর গর্ভজাত চারিপুত্রের সম্পত্তিবিভাগ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

"উত্তরাধিকারের চারি অংশ ব্রাহ্মণ পাইবেন, ক্ষত্রিয়-গর্ভজাত পুত্র দুই অংশ, বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্র এক ও অর্দ্ধাংশ, শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্র এক অংশ।"

মিতাক্ষরাও সঙ্কর-বিবাহ স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তাহার উদ্ধৃত বচনে প্রকাশ পায়, সে-সময়ে এই সকল বিবাহ অতীব বিরল ছিল।

আজিকার দিনে, এই সকল বিবাহ স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এমন-কি অনেক স্থলে একই জাতের অন্তর্ভূত উপজাতের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৪) বাধ্যতামূলক বাল্যবিবাহের প্রথা আধুনিক যুগের আরম্ভে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার পূর্ব্বে নহে। এখনো কেবল কন্যাদিগের সম্বন্ধেই এই প্রথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মনু বলেন, ২৪ হইতে

এইরূপে যে সকল নিয়মের দ্বারা বিবাহ নিয়মিত হয়, সেই সকল নিয়ম হইতে প্রকাশ পায় যে, সমাজ কতকগুলি বিপরীত প্রভাবের বশবর্ত্তী ছিল :—যথা আর্য্যনিয়মের স্মৃতি, দ্রাবিড়ীর রীতিনীতি, মুসলমান প্রথা; কিন্তু একটা নিয়ম প্রবল ছিল, সেই নিয়মটি এই:—পুত্রোৎপাদন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম—কেন না, পুত্রই কৌলিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে, বংশের নাম রাখিবে।

* *
*

প্রাচীন হিন্দুরা পিণ্ড দিবে বলিয়া শুধু একটিমাত্র পুত্র লাভের আকাঙ্খা করিত না,—তাহারা বহুপুত্রলাভের আকাঙ্খা করিত,—এই জন্য যে, সেই সকল পুত্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, ধনসঞ্চয়ের জন্য পরিশ্রম করিবে। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ঔরসজাত পুত্রকে, অবৈধ গর্ভজাত পুত্রকে, দত্তক পুত্রকে, ব্যভিচারিণী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে, কন্যা-গর্ভজাত দৌহিত্রকে (বিবাহের সময় পুত্রের পিতা যদি এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে চুক্তি করে, যে ঐ বিবাহে পুত্র জন্মিলে একটি পুত্র তাহার প্রাপ্য হইবে), দাসপুত্রকে, আত্মদত্তপুত্র প্রভৃতিকেও পুত্র বলিয়া স্বীকার করে।

সমাজের ক্রমবিকাশে, পরিবারের গঠন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল; সন্তানেরা আর সাহায্যের হিসাবে রহিল না, পরিবারের উপর তাহাদের রক্ষণের ভার ন্যস্ত হইল। আইনে দুই প্রকার পুত্র-সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে:—ঔরস পুত্রসম্বন্ধ ও দত্তক পুত্রসম্বন্ধ। পিতৃকুলের উপর যে সকল সমাজ স্থাপিত, সেই সকল সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজেও দত্তকপুত্র গ্রহণ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা; বস্তুত দত্তকপুত্র গ্রহণের দ্বারাই অধিকাংশ প্রাচীন বংশের ধারা চলিয়া আসিয়াছে (৫)।

* *
*

কুলপুরোহিত ও পিতৃপুরুষদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতা, সম্মান ও ভক্তির দাবী করিতে পারেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার আধিপত্য কমিয়া আসিয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে, পিতার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল; কেননা, সকল কাহিনীর মধ্যেই

৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে ছেলের ও ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে; তথাপি, কন্যার সম্বন্ধেও, এই নিয়ম একেবারে অব্যভিচারী নহে। (মনু দ্রষ্টব্য) বর্ত্তমান যুগের তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত যাজ্ঞবল্ক্যের গ্রন্থে দেখা যায়,—ঋতুকালের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দিলে, কন্যার অভিভাবক গর্ভপাত-অপরাধে অপরাধী হয়। আরো-আধুনিক গ্রন্থকার পরাসর বলেন, পূর্ণবয়স্কা কন্যার বিবাহ না দিলে তাহার জনকজননী নরকস্থ হয়।

বহুবিবাহ-সম্বন্ধে মনুর বচনগুলা পরস্পরবিরুদ্ধ।

(৫) শাস্ত্রে পুত্রসম্বন্ধ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—"ঔরস", "পুত্রিকা-পুত্র", "ক্ষেত্রজ", "গূঢ়জ", "কানীন", "সহোঢ", "পৌণর্ভব", "নিষাদ", "পারস", "দত্তক", "কৃত্রিম", "ক্রীতক", "অপবিদ্ধ", "স্বয়ংদত্তক"—Mayne দ্রষ্টব্য।

দেখা যায়, পিতা পুত্রকে বলি দিতেছেন, অথবা দাসরূপে বিক্রয় করিতেছেন।

নারদ আরো বলেন :—

পিতামাতার মৃত্যুর পর, সন্তান প্রাপ্ত-বয়স্ক বলিয়া পরিগণিত হয়; তাঁহাদের জীব-দ্দশায়, যে বয়সেরই হউক না কেন, সন্তান তাহাদের অধীন হইয়া থাকিবে।

বুদ্ধের বনগমনসম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহা হইতে উপলব্ধি হয়, বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে পিতৃ-আধিপত্যের হ্রাস হইয়াছিল।

মনুতে আমরা দেখিতে পাই :—

"অপরাধ করিলে, পত্নীকে, পুত্রকে, দাসকে, ছাত্রকে, অনুজকে চাবুকের দ্বারা বা বংশদণ্ডের দ্বারা প্রহার করিবে;—কিন্তু পৃষ্ঠদেশেই প্রহার করিবে, শরীরের কোন উত্তম অংশে প্রহার করিবে না। যে ব্যক্তি উত্তমাংশে প্রহার করিবে, সে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইবে!"

দ্বিতীয় খণ্ডের ২২৫, ২২৬ প্রভৃতি বচনে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে :— •

"গুরু ব্রহ্মের প্রতিরূপ, পিতা প্রজাপতির প্রতিরূপ, মাতা পৃথিবীর প্রতিরূপ......

অতএব গুরুকে, পিতাকে ও মাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে। যে মাতার সেবা করে সে আমাদের এই অধোলোক প্রাপ্ত হয়, যে পিতাকে সেবা করে সে মধ্য-লোক প্রাপ্ত হয়, যে গুরুকে সেবা করে সে ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয়।"

অতএব পিতা অপেক্ষা মাতা কম শ্রদ্ধার পাত্র। আর-একটা শ্লোকে আরো বেশী নিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছে (VII-২৭) :—

"কোন বালক উত্তরাধিকারে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, যতদিন না তাহার অধ্যয়ন শেষ হয়, অথবা সে সাবালক না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত রাজা সেই সম্পত্তির রক্ষক হইবেন (হিন্দু গ্রন্থকারেরা ১৬ বৎসর সাবালকের বয়স নির্দ্ধারণ করেন।)"।

সমস্ত নাবালকের অভিভাবকস্বরূপ রাজা স্বকীয় প্রতিনিধিরূপে বালকের পিতার উপর অথবা পিতার অবর্ত্তমানে মাতার উপর স্বকীয় কর্ত্তৃত্বভার অর্পন করেন। পিতা রাজার প্রতিনিধি মাত্র; পুরাণের আখ্যায়িকা ও কাহিনীতে পিতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃত্বের যে উল্লেখ আছে, সেরূপ কর্ত্তৃত্ব আর পিতার নাই। অতি পুরাকালেই ত পিতার আধিপত্য কতকটা কমিয়া যায়, তাহার পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পিতৃ-আধিপত্য আরো হীনবল হইয়া পড়িয়াছে; তাহার পর ইংরাজী আইনে পিতার কর্ত্তৃত্ব আরো সংযত হইয়াছে, কিন্তু সাবালকত্বের বয়স বাড়াইয়া ১৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৬)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৬) পিতৃ-আধিপত্য কমিবার কারণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

"রাজার অপরিসীম ক্ষমতা। যাহারা চিরাগত প্রথার নামে পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে সেই ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য। সপিণ্ডদিগের একত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ :—পিতামহের জীবদ্দশায়, পিতা অপেক্ষা পিতামহেরই প্রাধান্য; পিতামহের মৃত্যুর পর, সমাজের দলপতি পিতার উপর এবং পিতার সন্তানের উপর একপ্রকার কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। তাছাড়া, সহোদর ভ্রাতার পুত্রেরা এবং খুড়তুতো

অভিসার

কবে রব সব ছেড়ে তোমারি ধেয়ানে,
মৌন মূক স্পন্দহীন নীমিল নয়ানে?
প্রিয়-শোকাতুরা যথা নিশ্চল কায়ায়
স্তব্ধ, স্থির, নিমগন, নিশিথিনী প্রায়!
বাক্যহারা নিশিদিন
তোমা মাঝে হয়ে যাবো লীন,
কেহ আর ডাকিবে না কাজে
শুধু মোর অভিসার নিত্য নব সাজে!

ম্লান ঝরা পুষ্পসম শুষ্ক অযতনে
সকলে রাখিবে ফেলে দূরে গৃহকোণে
বর্ণগন্ধ শোভা মূল্য, আবর্জ্জনা রাশি—
রবেনা লালিত্য আর মাধুর্য্য বিকাশি,
পড়ে রব শুধু একা,
তখন পাইব তব দেখা,
অসম্বদ্ধ কুন্তলের ভার
তাই লয়ে লুটাইব চরণে তোমার!

ত্রাসে ভয়ে নিন্দা লাজে অবিচল প্রাণ
কিছু পশিবেনা কাণে, পাষাণ সমান—
বক্ষতল ভেদ করি বহিবে নির্ঝর,
প্রেমের সে মন্দাকিনী নিত্য নিরন্তর,
অমৃত-নিস্যন্দী ধারা,
তোমা-মাঝে হয়ে যাব হারা,
সেই মোর অভিসার-নিশি
অবিচ্ছেদ সে মিলন চির মেশামিশি।

শ্রীলীলা দেবী

জ্যাঠতুতো প্রভৃতি ভ্রাতার পুত্রেরা চিরাগত প্রথা-অনুসারে একসঙ্গে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়; উহারা এক-পরিবারের ছেলেরই মতো বিবেচিত হইয়া থাকে, এবং পরিবারের পিতা উহাদের শিক্ষায় বড়-একটা হস্তক্ষেপ করে না। হিন্দুরা অল্প বয়সেই বিবাহ করে এবং ১২।১৩ বৎসর বয়সেই বাপ হইয়া দাঁড়ায়,—এরূপ স্থলে কোন পিতা কি তাহার সন্তানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে? পরিশেষে জাতের নিয়মাদি; এই নিয়মানুসারে বাধ্য হইয়া পিতা পুত্রকে কোন-একটা ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, কতকগুলি বিশেষ নিয়মাধীনে তাহার বিবাহ দেয়, একটা বিশেষ রকমে তাহার সহিত ব্যবহার করে। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জাত পরিবারের স্বাধীনতার উচ্ছেদ করে এবং পিতাকে সন্তানের শুধু অভিভাবক বলিয়া বিবেচনা করে। পিতা যদি জাতের নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহা হইলে দলপতি, অথবা জাতের পঞ্চায়ৎ সেই পিতাকে অভিভাবকত্ব হইতে অপসারিত করে। পূর্ব্বে যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত তাহাদের দশা এইরূপ হইত।

হিন্দু-ইংরেজি আদালত ভারতে ইংরেজি আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পিতা যদি এরূপ খামখেয়ালিভাবে ক্ষমতা পরিচালন করে যাহাতে-করিয়া পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে, আইনানুসারে পিতা অভিভাবক হইলেও, আদালত অভিভাবকের অধিকার স্বাধীন ন্যায়-বিচারের দ্বারা সংযত করিতে পারেন; পিতার আচরণ মন্দ হইলে, কিংবা নিজে সম্মতি দিলে, পিতা অভিভাবকের অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। পিতার চাল-চলন যদি এরূপ হয় যে তাহাতে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে তাহা হইলেও পিতাকে অভিভাবকত্ব হইতে অপসারিত করা হয়, অথবা তাহার ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হয়।—(Mayne পৃ—২৬৯ দ্রষ্টব্য)

তিনের অধ্যায়

(১)

পরদিন নতুন গৃহস্থ এসে বাড়িতে উঠল। ভোর থেকেই দাস-দাসী এবং কৃষাণরা এসে হাজির ছিল; সন্ধ্যাবেলা যখন কর্ত্তা-গিন্নী এসে পৌছিলেন তখন শুনলুম তাঁদের নাম আল্‌ফঁস্। তিরাঁদ দিন-দুই থেকেই চলে গেল; যাবার সময় বলে গেল যে, এখন থেকে আমি তার বৌমার খাস্-দাসী হলুম;—ঘরের কাজ ছাড়া বাইরের চাষের কাজ আমার আর দেখবার দরকার নেই।

সপ্তাহ না ঘুরতেই আল্‌ফঁস্-গিন্নী ইউজেনের ঘরটিকে সেলাইয়ের ঘর করে নিলে। একটা বড় টেবিলের উপরে নানা-রকম সুতির কাপড়ের টুক্‌রো ছড়ানো—সেইখানে আমায় কাজে বসিয়ে দিলে; বল্লে, ঐ সব কাপড় দিয়ে পাতবার চাদর এবং অন্য অন্য জিনিষ তৈরি করতে হবে। তারপর, সে নিজে এসে আমার পাশে বসল, এবং লেস্ বুনতে লেগে গেল। প্রায় রোজই সমস্ত দিন সেইখানে সে বসে থাকত—মুখটি বুজে, একটিও কথা না বলে। যদি দৈবাৎ কখনো কথা বলত—সে তার মায়ের কাপড়ের তোরঙ্গের কথা—তাতে কত রকমের কাপড় আছে তারই ব্যাখ্যানা।

তার বলার স্বরে সুরের কোনো ঝঙ্কার ছিলনা, এবং যখন সে কিছু বলত তার ঠোঁট প্রায় নড়তই না। তিরাঁদ তার বৌমাকে বড় ভালো বাসত। যখনই সে আসত, বৌমার কি চাই জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু বৌমার ঐ সুতির কাপড় ছাড়া আর কিছুর প্রতি লোভ ছিল না। শ্বশুর প্রত্যেকবার যাবার সময় বলে যেত, আচ্ছা, এবার আরো কাপড় নিয়ে আসব।

এক খাবার সময় ছাড়া বাড়ির কর্ত্তাকে দেখা যেত না। সমস্ত সময়টা তার যে কি করে কাটত কে জানে! তার মুখ দেখে আমার সেই গুরুমায়ের মুখ মনে পড়ত,—কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। তাঁরই মতন তার গায়ের রং হল্‌দেটে; এবং চোখ দুটো চিক্-চিক্ করচে। তাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন দিনরাত একটা আগুনের মাল্‌সা ভিতরে বহে বেড়াচ্চে—যা এক-মুহূর্ত্তে তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারে। ধর্ম্মের দিকে তার মতিগতি ছিল;—প্রতি রবিবার সে স্ত্রীকে নিয়ে তার বাপ যে গ্রামে থাকে সেইখানে উপাসনায় যেত। প্রথম-প্রথম তারা আমাকে সঙ্গে নিতে চাইত কিন্তু আমি যেতুম না। তার চেয়ে সাঁৎ-মতাঞ যাওয়া আমার ভালো লাগত;—আশা হ'ত হয়ত সেখানে পলিন কি ইউজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কখনো-কখনো গোলাবাড়ির কোনো চাকর আমার সঙ্গী হ'ত—কিন্তু প্রায়ই আমি একলাই যেতুম। পাহাড়ের উপর ঝাউগাছের মধ্যে দিয়ে একটা এব্‌ড়ো-খেবড়ো, পাথর-ওঠা পথ গেছে, সেখান দিয়ে গেলে খুব শীঘ্র পৌছান যায়—আমি

সেই পথ ধরে যেতুম। পাহাড়ের ঠিক মাথায় জঁা-ল্য-রুজের বাড়ি। সেইখানে একবার থামতুম। খুব নীচু ছাদওয়ালা বাড়ি, ছড়ানো-ছড়ানো ঘর, ছাদের মতন তার দেয়ালগুলোও কালো। পাশ দিয়ে চলে গেলে সহজে বাড়িটি নজরে পড়ে না—ঝাউ গাছে তা একেবারে ঢাকা। আমি প্রায়ই সেখানে গিয়ে একটু বসে গল্প করতুম। গোলাবাড়িতে এসে পর্য্যন্ত রুজের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সে সিল্‌ভঁ্যার কাজ করত। সিল্‌ভঁ্যার মুখে তার প্রশংসা ধরত না। ইউজেনও বলত, তার মতন কাজের লোক আর নেই;—যে-কাজই হ'কনা, তাতে তাকে লাগানো যায় এবং সে যা করে আনে তা ভালো হতেই হবে।

(২)

কিন্তু আল্‌ফঁস্ তাকে আর রাখতে রাজি হল না;—পাহাড়ের উপর যে-বাড়িটিতে সে থাকত সেখান থেকেও তাকে উঠে যেতে বল্লে। জঁা-ল্য-রুজ এই কথা শুনে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে মুখ দিয়ে তার কথা বার হল না।

উপাসনা ভেঙে গেলেই আমি সেই পথ দিয়েই ফিরে আসতুম। প্রসাদী রুটি নেবার জন্যে, জঁার ছেলেরা আমায় ঘিরে দাঁড়াত। তাদের জন্যে আমি গির্জ্জে থেকে ফি-বারেই রুটি আনতুম। সবশুদ্ধ ছয়টি কাচ্ছাবাচ্ছা; বড়টির বয়স বারো ভর্ত্তি হয়নি। রুটি যা আনতুম তা একগালের মতনও নয়—কাজেই জঁার স্ত্রীর হাতে আমি তা দিয়ে দিতুম—সে ছেলেপুলেদের ভাগ করে দিত। সে যখন ভাগ করতে থাকত, জঁা আমার জন্যে আগুনের সামনে একটা টুল পেতে দিত এবং নিজে একটা কাঠের গুঁড়ি পা দিয়ে গড়িয়ে এনে তার উপরে বসত। তার স্ত্রী একটা প্রকাণ্ড চিম্‌টে দিয়ে আগুনের উপরে গাছের শুকনো ডাল ফেলে দিত। আমরা বসে-বসে গল্প করতুম আর দেখতুম পেরেক থেকে ঝোলানো একটা পাত্রে বড় বড় আলু সিদ্ধ হচ্চে।

তার সঙ্গে আলাপ হবার প্রথম রবিবারেই জঁা আমায় বলে যে, সেও একজন অনাথ শিশু ছিল। তার পর ক্রমে ক্রমে একটু-একটু-করে তার কাছে শুনেছিলুম যে, বারো-বছর বয়সে তাকে একজন কাঠুরের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়—সে পাহাড়ের উপর এই বাড়িতেই থাকত। খুব শীঘ্রই জঁা গাছে চড়তে শিখে নিয়ে, তড়-তড় করে একেবারে আগ-ডালে উঠে যেত সেখানকার ডালে দড়ি বেঁধে দিয়ে নীচে থেকে টেনে ডাল ভাঙত। দিনকার কাজ শেষ হলে পিঠের উপরে কাঠের বোঝা ফেলে সে সব-আগে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে ছুট দিত। বাড়িতে ছিল কাঠুরের একটি মেয়ে। সে এসে দেখত, সেই মেয়েটি বসে রান্না করচে। সে ছিল তারই সমবয়সী; দেখবামাত্রই তাদের দুজনের ভারি ভাব হয়ে গিয়েছিল।

তারপর, এক ক্রিষ্টমাসের আগের রাত্রে এক মহা বিপদ ঘটল। ছেলেমেয়ে ঘুমিয়েছে দেখে বুড়ো কাঠুরে আস্তে আস্তে গির্জ্জের উপাসনায় যোগ দিতে চলে গেল। কিন্তু যেমন তার যাওয়া অমনি দুজনেরই উঠে পড়া। তারা ভাবলে ভারি একটা মজা হবে।

কাঠুরের জন্যে এই গভীর রাত্রে তারা খাবার তৈরি করে রাখবে;—সে ফিরে এসে দেখে অবাক হয়ে যাবে! এই মজার আনন্দে তারা নৃত্য করতে লাগল। ছোট মেয়েটি যখন রান্নার জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিচ্চে ছেলেটি গিয়ে তখন কাঠ ভেঙে আগুন ধরালে। এমনি করে সময় কাটতে লাগল। এক-এক করে খাবার তৈরি শেষ হল, কিন্তু কাঠুরে তবু ফিরে এলনা। মনে হতে লাগল সে যেন কতক্ষণ! শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে তারা আগুনের সাম্‌নে ভূঁয়ের উপরে জড়াজড়ি করে বসে ছিল। তার পর কখন্ ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ মেয়েটির চীৎকারে জঁার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি যে মেয়েটি কেন এমন করে হাত ছুঁড়চে আর আগুন নিয়ে চীৎকার করচে। সে ভয়ে লাফিয়ে উঠে যেই পালাতে গেল, অমনি বুঝতে পারলে যে তার গায়ে আগুন লেগেছে। মেয়েটি বাগানের দিকের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল;—তার গায়ের আগুনে গাছগুলো আলো হয়ে উঠল। জঁা তখন তাকে ধরে একটা চৌবাচ্ছার মধ্যে ফেলে দিলে। জল লেগে আগুন নিভে গেল বটে কিন্তু জঁা যখন তাকে জল থেকে টেনে তুল্‌তে গেল সে এত ভারি হয়ে উঠেছে যে তার মনে হল মেয়েটি নিশ্চয় মরে গেছে। তার নড়াচড়া একবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,—তাকে তুলতে তুলতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তার পর যখন জঁা তাকে ঠিক-করে তুলে ফেল্লে,তখন তাকে নিয়ে যাবার সময় মনে হ'ল যেন এক-বোঝা শুক্‌নো কাঠি হিঁচ্‌ড়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

কাঠের গুঁড়িগুলো পুড়ে গিয়ে তখন কয়লার আগুন গন্-গন্ করছে, কেবল বড় ভিজে গুঁড়িটা তখনো ধোঁয়াচ্ছে আর ফট্-ফট্ করছে। মেয়েটির সমস্ত মুখ একেবারে ফুলে উঠেছে; নীল শিরগুলো ঠেলে উঠে মুখখানা কালো করে তুলেছে। তার গায়ের চারদিকে লাল-লাল বড়-বড় পোড়ার দাগ।

অনেক দিন সে শয্যাগত ছিল। তারপর যখন মনে হল সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে, তখন দেখা গেল সে বোবা হয়ে গেছে। বেশ স্পষ্ট সে শুনতে পেত—আর-সবাইয়ের মতন হাসতেও পারত, কেবল কথা বলা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে গেল।

(৩)

জঁা যখন এইসব গল্প বলত, তার স্ত্রী তার দিকে চাইত,—এম্‌নি করে চোখ বুলিয়ে যেত যেন একখানা বই পড়ছে। তার মুখের উপরে তখনো সেই বড়-বড় পোড়ার দাগ ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণেই তা চোখে সয়ে যেত। তখন আর তার মুখের কথা মনে থাকত না, তার সেই সাদা দাঁত দিয়ে সাজানো হাঁ-টি, আর সেই চঞ্চল চোখ দুটি বেশি-করে নজরে পড়ত। সে তার ছেলেদের একটা দীর্ঘ অস্ফুটস্বরে ডাকত। তাইতে তারা কাছে ছুটে আসত এবং সে যা ইসারা করে বলত, সব বুঝতে পারত। পাহাড়ের উপর এই বাড়ি ছেড়ে তাদের যেতে হবে এইজন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছিল। বন্ধু বল্‌তে তারাই আমার বাকি ছিল। তাদের হয়ে দু-কথা গিন্নীর

কাছে বলব ঠিক করলুম। একদিন একটু সুযোগও হল। তিরাঁদ ও তার ছেলে সেলাইয়ের ঘরে এসে গোলাবাড়ির যা নতুন বন্দোবস্ত হবে সেই আলোচনা করতে লাগল। আল্‌ফঁস্ বল্লে, গোরু-বাছুরের পাট সে তুলে দেবে, তার বদলে কল বসিয়ে পাহাড়ের পাইনগাছগুলো কাট-বার ব্যবস্থা করে, পাহাড় সাফ করে ফেলবে। গোয়াল-ঘরগুলোকে কল-ঘর করা হবে—আর পাহাড়ের উপরকার ঐ বাড়িটা গুদোম হবে। এ-সব কথা গিন্নী শুনচে কিনা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না;—সে আপনার মনে লেস্ বুনে যাচ্ছিল এবং তার সমস্ত মন তার উপরেই পড়ে ছিল। যেমন বাপ ও ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি সাহসে বুক বেঁধে তাঁর কথা তুল্লুম। আমি বল্লুম, সে ভারি কাজের লোক—সিল্‌ভ্যাঁর কত উপকার সে করেছে—এখন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে তার বড় কষ্ট হবে। গিন্নী কি বলেন শোনবার জন্য আমি একটু থামলুম;—মনে হল, উত্তরের একটা আভাস যেন আসচে। আমার বুক দুরদুর্ করতে লাগল। গিন্নী সুঁতো থেকে ছুঁচটা বার করে নিয়ে বল্লে—"ঐ যাঃ, বোধ হয় ভুল হয়ে গেল।" এই বলে এক থেকে উনিশ অবধি গুণতে লাগল, তারপর বলে উঠল—"আঃ, কি আপদেই পড়লুম—সমস্ত সারটা আবার গোড়া থেকে বুন্‌তে হবে।" গিন্নীর এই কথা যখন তাঁর কাছে বল্লুম, সে রেগে আগুন হয়ে উঠল;—ভিলেভিয়েইর দিকে ঘুঁসি পাকিয়ে দেখাতে লাগল। তার স্ত্রী তার কাঁধের উপর হাত রেখে তার মুখের পানে একবার চাইলে; অমনি সে জল হয়ে গেল।

জাঁ-ল্য-রুজ্ জানুয়ারী মাসের শেষে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমার মন ভারি খারাপ হয়ে রইল।

(৪)

বন্ধু বলতে আমার আর কেউ বাকি রইল না। গোলাবাড়ি যেন আমার অপরিচিত জায়গা বলে মনে হতে লাগল। নতুন লোকেরা বেশ গুছিয়ে, পরস্পরে বেশ জমিয়ে বসেছিল, আমিই তাদের মধ্যে আগন্তুকের মতন হয়ে গেলুম। দাসীটা আমাকে মোটেই সুনজরে দেখত না; যে লোকটা লাঙল চালাত সে আমাকে দেখলে পাশ-কাটিয়ে চলে যেত। দাসীটার নাম ছিল এদেল। সমস্ত দিন তার খুঁৎখুতুনি লেগেই ছিল এবং চলবার সময় তার কাঠের জুতোটা টেনে টেনে চলত। খড়ের উপর দিয়েও হাঁটবার সময় সে জুতোর শব্দ করত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া ছিল তার স্বভাব। মনিবদের ডাকের জবাবে সে ভারি একটা রূঢ়তা দেখাত।

দরজার পাশের সেই বেঞ্চিটি আল্‌ফঁস্ সরিয়ে দিয়েছিল, তার জায়গায় লোহার জাল-ঘেরা একটা সবুজ ঝোপ বসিয়ে দিয়েছিল। সেই বুড়ো এল্‌ম গাছটা—যাতে গ্রীষ্মের রাত্রে বুনো পেঁচা এসে বসত—সেটাও সে কাটিয়ে ফেলেছিল।

অবশ্য বহুদিন থেকে ঐ এলম্ গাছটা বাড়ির উপর আর ছায়া দিতে পারত না। তার একেবারে ডগায় ঝুঁটির মতন গুটিকয়েকমাত্র

পাতা ছিল। সেটাকে দেখাত ঠিক যেন একটি মাথা, উপর থেকে ঝুঁকে রয়েছে,—নীচের লোকেদের কথাবার্ত্তা কান পেতে শুনচে। যে কাঠুরেরা সেটা কাটতে এল তারা বল্লে, কাজ বড় সিধে নয়, গাছ পড়বার সময় বাড়ির চাল ভেঙে নিয়ে পড়বার বিপদ আছে।

অবশেষে অনেক বচসার পর ঠিক হল যে দড়ি দিয়ে বেঁধে, পড়বার সময় গাছটাকে উঠোনের দিকে গোবরগাদার উপর টেনে ফেলা হবে। দুজন লোক সমস্ত দিন ধরে গাছটাকে কাটলে। তারপর যখন আমরা ভাবলুম এইবার গাছটা ঠিক জায়গায় পড়বে, সেই সময় কেমন-করে একটা দড়ি আল্‌গা হয়ে গিয়ে গাছটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ল; তারপর ছাদের উপর দিয়ে গড়িয়ে, চিম্‌নির মাথা ভেঙে, টালি ছিট্‌কে, দেয়ালের খানিকটা উড়িয়ে একেবারে দরজার সামনে এসে পড়ল। আল্‌ফঁস্ রেগে গাঁক্-গাঁক্ করতে লাগল। কাঠুরেদের একখানা কুড়ুল তুলে নিয়ে গাছের গায়ে এমন জোরে এক কোপ বসিয়ে দিলে যে একখানা বাক্‌লা ছিট্‌কে গিয়ে সেলাইঘরের শাসির উপর পড়ে কাঁচখানা চুরমার করে ফেল্লে।

গিন্নী দেখলে কাঁচের টুকরা আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। দেখেই সে এম্‌ন আঁৎকে উঠল যে তার সেরকম ধরণ কখনো দেখিনি। ভয়-মাখানো চোখ, আর থর থর করে কাঁপচে হাত নিয়ে, যে-টেবিল-ঢাকা কাপড়ের উপর ফুল তুলছিলুম, সেইখানাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আমার কপালে কাঁচের কুঁচি লেগে রক্তপাত হয়েছে, আমি যে তাই মুছচি—সেদিক পানে একবার চেয়েও দেখলে না। যে-সমস্ত কাপড় তৈরি হয়ে বস্তাবন্দী হয়ে উঠেছিল, পাছে সেগুলো খারাপ হয়ে যায় এই ভয় তার এমনি হতে লাগল যে তার পরদিনই সে আমাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে কেমন করে কাপড় গুছিয়ে তুলে রাখতে হয় তাই দেখিয়ে আনলে।

(৫)

গিন্নর মায়ের নাম ছিল দেলোয়া। কৃষাণরা কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় বলত—"গড়-বাড়ির লক্ষ্মী-মা!" তিনি মাত্র একবার ভিলেভিয়েই এসেছিলেন। আমার একেবারে গায়ের উপরে এসে তাঁর সেই আধ-বোজা চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। প্রকাণ্ড লম্বা মেয়েমানুষ;—আধখানা ঝুঁকে পড়ে চলতেন,-মনে হ'ত যেন মাটিতে কি খুঁজতে-খুঁজতে চলেছেন। তিনি যে মস্ত বাড়ীটাতে থাকতেন, তার নাম ছিল "লষ্ট-ফোর্ড।"

আলফঁস্-গিন্নী আমায় ছোট নদীর ধারের রাস্তাটা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তখন মার্চ্চ মাসের শেষা-শেষি—সমস্ত মাঠ তখন থেকেই ফুলে ভরে উঠছে। রাস্তার ঠিক উপর দিয়ে গিন্নী সোজা চলতে লাগল—কিন্তু নরম ঘাসের উপর পা ফেলে-ফেলে যেতে আমার ভারি ফুর্ত্তি হতে লাগল।

আমরা শীঘ্রই বনের মধ্যে এসে পড়লুম; —এইখান থেকেই আমার সেই ভেড়াটাকে নেকড়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই বনের

কথা মনে হলেই আমার গা ছম-ছম করে উঠত। যেমনি আমরা নদীর ধারের রাস্তা ছেড়ে বনের পথে ঢুকলুম অমনি আমার বুক ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ করতে লাগল। অথচ রাস্তা বেশ চওড়া ;—বোধ হয় গাড়ি চলে ; কারণ চাকার খুব গভীর দাগ রয়েছে দেখলুম।

আমাদের মাথার উপর পাইনগাছের ছুঁচগুলো পরস্পরে খোঁচাখুঁচি করে খস্‌খসিয়ে উঠছিল। ভারি মিষ্টি তার আওয়াজ। বরফের সময় বনের মাঝে কানে-কানে চুপিচুপি কথা-বলার মতন থেমে-থেমে ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ যেমন শুনতুম, এ শব্দ মোটেই তেমন নয়। কিন্তু তবু আমি বারে বারে পিছন দিকে ফিরে না চেয়ে পারছিলুম না। বনের ভিতরে বেশী দূর আমাদের যেতে হল না। রাস্তা বাঁ দিকে ঘুরতেই আমরা গড়-বাড়ির একেবারে উঠোনে এসে পৌঁছলুম। ছোট নদীটি গোয়াল-ঘরের পিছন দিয়ে বহে গেছে—ঠিক যেমন ভিলেভিয়েইতে। কিন্তু এখানকার মাঠগুলো খুব কাছাকাছি—এবং বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যেন তারা সব পাইন-চারার ঝোপের ভিতরে লুকোবার চেষ্টা করছে। বসত-বাড়িটা আশ-পাশের গোলা-বাড়িগুলোর মতন মোটেই নয়। নীচের তলাটা খুব পুরোনো মোটা দেয়াল দিয়ে গাঁথা কিন্তু উপর-তলাটা দেখলে মনে হয় যেন একটা ফিকির করে সেটাকে উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা দেখে ত আমার মোটেই গড়-বাড়ি বলে মনে হল না। বরং বোধ হল যেন একটা বুড়ো-গাছের গুঁড়ির খোঁদলের ভিতর থেকে একটা বাচ্ছা গাছ গজিয়ে উঠেছে—তাও আবার ভারি বিশ্রী রকম করে।

(৬)

দেলোয়াঠাকরুণ আমাদের আসার খবর পেয়েই দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই ছোট চোখ-দুটো পিট্‌-পিট্‌ করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন—এবং অন্য কোনো কথা না তুলে, চীৎকার করে এই কথা বলতে লাগলেন যে তাঁর একটা আধ-আনি খড়ের গাদার মধ্যে হারিয়ে গেছে ; ভারি আশ্চর্য্য, সপ্তাহখানেক হ'ল, তবু কেউ তা এ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলে না। কথা কইতে কইতে তিনি বার বার দরজার সাম্‌নে ছড়ানো খড়গুলো পা দিয়ে সরিয়ে দেখছিলেন। আমাদের গিন্নী মায়ের সে কথায় কান দিলে না। তার সেই বড় বড় চোখদুটো তখন আকুল দৃষ্টিতে বাড়ির ভিতরের দিকে পড়ে ছিল। কেন তার আসা হয়েছে একথা বলবার সময় তার চোখে-মুখে ভারি একটা অধীরতা ফুটে উঠতে লাগল। দেলোয়াঠাকরুণ বল্লেন যে তিনি নিজে আমাকে সঙ্গে করে কাপড়-রাখবার ঘরে নিয়ে যাবেন। আল্‌মারির কলে চাবিয়ে লাগিয়ে রেখে তিনি বল্লেন, "দেখো, খুব সাবধান, একটি জিনিষও যেন ওলটপালট না হয়।" তার পর সেই ঘরে আমায় একলা রেখে চলে গেলেন।

সেই চক্‌চকে বড় বড় আল্‌মারিগুলো খুলে দেখে বন্ধ করতে আমার বেশী সময় লাগল না। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সেই মুহূর্ত্তেই সেখান থেকে পালাই। সেই প্রকাণ্ড বড়, আর কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঘরটাকে আমার

কয়েদখানা বলে ভয় হতে লাগল। মেঝের টালির উপরে আমার পায়ের যে-রকম শব্দ উঠছিল তাতে বোধ হল যেন নীচে একটা খুব গভীর কবরখানা রয়েছে। হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল যেন এখান থেকে আমি আর মুক্তি পাব না। আমি কান পেতে রইলুম কোনো জীবন্ত প্রাণীর শব্দ শুনতে পাই কি-না। এক দেলোয়া-ঠাকরুণের গলার আওয়াজ ছাড়া আর-কিছু কানে এল না। ভারি কর্কশ, কড়া সে শব্দ—যেন দেয়াল ফুঁড়েও আসে—সব জায়গা থেকে শোনা যায়। আমার সেই গাঢ় নির্জ্জনতার গুরুভার অন্তত কিছুও কমবে এই আশায় জানলার দিকে ছুটে যাচ্ছি এমন সময় আমার পিছনে একটা দরজা, যা আমি আগে লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ খুলে গেল। আমি ফিরে দেখলুম একজন ছোকরা ঘরে ঢুকল। গায়ে তার লম্বা, সাদা আল্‌খাল্লা, মাথায় একটা পাঁশ-রঙের টুপি। সে থম্‌কে দাঁড়াল—যেন এ-ঘরে মানুষ দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। আমিও তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম—চোখ যেন নামানো গেল না। সে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখান দিয়ে চলে যেতে লাগল—আমার উপরে দৃষ্টিটি রেখে দিয়ে। আমার চোখও তার উপরে পড়ে রইল। তারপর দরজার কাঠে একটা ধাক্কা খেয়ে সে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই জান্‌লার পাশ দিয়ে আবার তাকে যেতে দেখলুম—আবার আমাদের চোখের মিলন হল। আমার ভিতরে কেমন-একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল; দরজাটা সে খুলে রেখে গিয়েছিল; আমি কেমন হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে দিলুম।

সেই মুহূর্ত্তে আল্‌ফঁস্‌-গিন্নী আমায় নিতে এল—আমরা বাড়ি ফিরে গেলুম।

যে-অবধি আল্‌ফঁস্‌-গিন্নী পলিনের জায়গা অধিকার করেছিল সেই থেকে রোজ আমি চেয়ারের মতন একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে রোজ বসতুম। সেটা ছিল একটা ঝোপালো-গাছের বাগানের মধ্যে;—গোলা-বাড়ির খুব কাছেই। সেখানে বসে-বসে আমি রোজ সন্ধ্যার গুঞ্জন শুনতুম—এবং সেইখানটিতে গাছ হয়ে থাকবার একটা ব্যাকুলতা আমার মনের মধ্যে জাগতে থাকত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেইখানটিতে বসে আমার সেই নতুন-দেখা মানুষটির কথা ভাবতে লাগলুম। যত বারই আমি তার চোখের রঙটি ঠিক কি-রকম ভাববার চেষ্টা করছিলুম, তত বারই মনে হচ্ছিল যেন সেই চোখদুটি আমার নিজের চোখ ভেদ করে যাচ্ছে; আর তাইতে বোধ হচ্ছে যেন আমার সমস্ত ভিতরটা আলো হয়ে উঠছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পল্লীর প্রতি

ওগো আমার পল্লী-মাগো, ওমা আমার পল্লী!
বল্ মা আমায় সত্যি করে কেন এমন কল্লি!
মা তোর কোলে ছুটে যেতে,
পরাণ আমার উঠ্ছে মেতে,
দিনযামিনী কেঁদে মরি—কি যে কানে বল্লি!
ওগো আমার পল্লী-মাগো, ওমা আমার পল্লী!

পাষাণকারার মাঝে মাগো আজ্কে আমি বন্দী!
বদ্ধবায়ু জীবন নিতে আঁট্ছে কত ফন্দি!
কাজ কি আমার বেশী জেনে,
বুকে আমায় নে মা টেনে,
শুক্নো জ্ঞানের সাথে মাগো কর্বো এবার সন্ধি!
সভ্যতার এই পাষাণকারায় আর রব না বন্দী!

শুন্বোনা মা শুন্বোনা আর শুন্বোনাকো যুক্তি!
মুক্ত মাঠের মধ্যিখানে দে মা আমায় মুক্তি!
স্নিগ্ধশ্যামল তরুলতায়,
দেখ্বো তোমার অনিন্দ্যকায়,
পাখীর গানে শুন্বো তোমার মুখের মধু উক্তি!
কারুর কথা শুন্বোনা আর শুন্বোনা মা যুক্তি!

এই জগতে তুই মা আমার চিরদিনের লক্ষ্য!
উড়ে যেতাম তোর কাছে আজ পেতাম যদি পক্ষ!
ঘুর্বো একা বনে বনে,
আপন-মনে একবসনে,
মেঠো-পথের সাথে আমার অটুট্ থাকুক্ সখ্য!
সকল দেশে সবার মাঝে তুই যে আমার লক্ষ্য!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রেঁদার বিশেষত্ব

ওগস্ত্ রেঁদার বয়স যখন পনেরো বছর, তখন তিনি পাঠশালার লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া শিল্পশিক্ষায় মন দেন। চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা মূর্ত্তিগঠনের পক্ষেই আপনাকে অধিক উপযোগী মনে করিয়া, তিনি ভাস্কর্য্যের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়া গেল—একান্তমনে তিনি কলালক্ষ্মীর সাধনায় ব্রতী হইলেন। ছাত্রজীবনে যখনি তিনি ছুটি পাইতেন, যাদুঘরে গিয়া ওস্তাদ-শিল্পীদের কারুকার্য্য দেখিয়া আসিতেন। তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া স্মৃতিবলে পূর্ব্বদৃষ্ট কারুকার্য্যগুলি নকল করিতেন। আজ তাঁহার বয়স চুয়াত্তর বৎসর; কিন্তু এই প্রাচীন বয়সেও নিত্যনূতন শিক্ষালাভের জন্য তিনি ছাত্রের মত আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলিতে-কি, তাঁহার সমগ্র জীবন-কালই,—সাধনার এক বিচিত্র ইতিহাস!

ভাস্কর্য্যের প্রথম শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু দারিদ্রের জন্য তখন তিনি জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন। তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের সুযোগ ছিল না—প্রাণে বাঁচিতে হইলে অর্থ চাই! বাধ্য হইয়া তিনি লোকের ফরমাইস্ খাটিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে তিনি কূল পাইলেন—তাঁহার অর্থ-ভাবনা দূর হইল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "L'age d'airain" নামে একটি শিল্পকার্য্যের দ্বারা রেঁদা সর্ব্বপ্রথমে গুণী-মহলে পরিচিত হইলেন। স্বাধীন জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে ললিতকলায় তাঁহার মানসী, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার নিজস্ব ক্রমে-ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল।

কিন্তু প্রতিভাকে চিনিতে দেরি লাগে। স্বদেশবাসীর নিকটে রেঁদা প্রথম-প্রথম কম লাঞ্ছনাভোগ করেন নাই। তাঁহার শিল্পের গূঢ় মর্ম্মটি লোকে বুঝিতে পারিত না; সাধারণের সেই নির্ব্বুদ্ধিতা ঠাট্টা-বিদ্রূপের আকারে আসিয়া শিল্পীর গায়ে তীরের মত বিঁধিত। রেঁদা কিন্তু অচঞ্চল রহিলেন। সেই অটলতার জন্য আজ তিনি জয়মালা পাইয়াছেন—আজ তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী! শিল্পজগতে আজ তাঁহাকে the Greatest since Michael Angelo বলিয়া মান্য করা হয়।

সামাজিকতার কৃত্রিমতা তাঁহার চোখের বিষ! তাঁহার মতে, শিল্প ও সমাজ এই দুই মনিবের মাঝখানে দাঁড়াইলে শিল্পীর বিশিষ্টতা থাকে না। তাই তিনি কৃত্রিম সামাজিকতার কেন্দ্র প্যারী ছাড়িয়া শ্যামল পল্লী-শ্রী, মুক্ত গগন-পবন, সুপ্ত বিজনতার মধ্যে আপন সৌন্দর্য্য-সাধনায় একাগ্র হইয়া দিনযাপন করিতেন। কিন্তু শোণিতপিপাসু সশস্ত্র সভ্যতা আসিয়া আজ তাঁহার নিভৃত আশ্রম দখল করিয়াছে; আজ সেখানে "শ্মশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ি-গীতে" আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ; বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অসহায় শিল্পী আজ বিদেশে নির্ব্বাসিত!

আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে—রেঁদা

সর্ব্বদাই উদার প্রকৃতির ভক্ত। দেশে যখন ছিলেন, তখন কি দিন কি রাত, কি শীত কি গ্রীষ্ম—সকল সময়েই তিনি প্রকৃতির বিপুল মুক্তির মধ্যে কাল কাটাইতেন। ফ্রান্স শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার শীতের কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। কিন্তু ফ্রান্সের সেই হাড়ভাঙ্গা শীতেও, রাত্রে যখন রক্ত বরফ হইয়া যায়, রেঁাদা আপনার শুইবার ঘরের চারিদিক্‌কার জানলা খুলিয়া না-দিয়া ঘুমাইতে পারিতেন না! খোলা বাতাস তিনি এতই ভালবাসেন!

স্ত্রীর সহিত রেঁাদা অতি সরল ভাবেই জীবন-যাপন করেন—ফরাসীদের বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। এ-যুগের অনেক বিখ্যাত প্রতিভাবান সাহিত্য-সেবী, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরলোকগত কবি হেনলি একবার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি সব-চেয়ে বড় যে শিক্ষা জানি, তা হচ্ছে তোমার কথা স্মরণ করা!"—ভাস্কর হইলেও রেঁাদা সাহিত্য-রসে রসিক; তাঁহার মত রসবোধ থাকিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকেই আপনাকে অমর করিতে পারেন! শুধু রসিক নন,—রেঁাদা সাহিত্যসেবীও বটে। পুস্তক-রচনাতেও তাঁহার আশ্চর্য্য কৃতিত্ব আছে। তাঁহার লিখিত নবপ্রকাশিত "Les Cathédrales de France" নামে পুস্তকখানি লইয়া চারিদিকে আজকাল খুব-একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। আমরা এখানে একটির উল্লেখ করিতেছি।

একবার আর্টের কোন হঠাৎ-ক্রিটিক, রেঁাদার কয়খানি ছবি বার্ণার্ড স'কে দেখাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিয়াছিলেন, "এ ছবিগুলো যে বিখ্যাত শিল্পী রেঁাদার আঁকা, আমিত তা কল্পনাও করতে পারি না। এগুলো না-যায় বোঝা, না-যায় কিছু—এ কি আর ছবি? আরে ছ্যাঃ!"

বার্ণাড স গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "বটে! ছবিগুলো তবে নিশ্চয়ই রেঁাদার আঁকা নয়—মাইকেল এঞ্জিলোর আঁকা!"

হঠাৎ-ক্রিটিকের মুখ একেবারে ভোঁতা! জোঁকের মুখে যেন নুন!

*

* *

প্যারীর অদূরে, সিন নদীর তীরে, Val-Fleury নামে একখানি ছোট্ট গ্রাম। সেইখানে পাহাড়ের উপরে কতগুলি বাড়ী দেখা যায়। বাড়ীগুলি এমনি সুন্দর ও রুচিসঙ্গত যে, সেগুলি শিল্পীর আলয় বলিয়া বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না। রেঁাদা এখানেই বাস করিতেন।

প্রাচীন রোম ও গ্রীশের অনেক শিল্প-কীর্ত্তির সুন্দর নমুনা এখানে সাজানো আছে। কোথাও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা কামিনী-মূর্ত্তি, কোথাও সুগম্ভীর বক্তার মূর্ত্তি, আবার কোথাও-বা পুষ্পশর মদনের মূর্ত্তি। এমনি বিচিত্রভঙ্গী নানামূর্ত্তির মাঝখানে গোলাপী মর্ম্মরে গঠিত, দুটি পরমসুন্দর 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ, তাহাদের অপরূপ রূপে দর্শকের নয়ন-মন একেবারে ভুলাইয়া দেয়।

রেঁাদার বাগানের শোভাও অপূর্ব্ব। সেখানে শান্তবিমল শীতল-অতল জলাশয়ে স্বাধীন রাজহাঁসেরা আপনাদের কমনীয় দীর্ঘ গ্রীবা লীলায়িত করিয়া নিরাপদ জল-কেলিতে

মাতিয়া থাকে। মাঝে-মাঝে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ ছোট-ছোট মর্ম্মর-বেদী —তাহাদের শুভ্র গাত্রে শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে কাব্যের মত কোমল পুষ্পমাল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে সবুজ ঘাসের মখমল বিছানায় শিল্পারচিত নানান প্রতিমা,—কোনটি ভাঙ্গাচোরা, কোনটি অটুট; কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ ঘুমাইয়া!

মূর্ত্তিগুলির সাজাইবার কায়দাতেও শিল্পীর হাতের ছাপ্ আছে। রেঁদা বলেন, "সবুজ ঘাসই হচ্ছে প্রাচীন মূর্ত্তির যোগ্য বিশ্রাম-স্থান। বাগানে এদের এনে সাজাতে পারলে মনে হবে, এরা সব বাগানেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! এই যে স্বচ্ছ ও সরস-সতেজ তরুপল্লব, এ-যেন ঐ-সব মূর্ত্তিরই প্রাণের দোসর। গ্রীক শিল্পীরা প্রকৃতিকে এমন ভালবেসেছেন যে, প্রকৃতির কোল থেকে তাদের গড়া প্রতিমাগুলিকে তফাতে টেনে আনলে, তাদের সকল শ্রীছাঁদ একেবারে ঘুচে যায়।"

রেঁদার কথা বুঝিতে হইলে আগে তাঁর মন বোঝা দরকার। বাগানে আমরা পাথরের ভাল-ভাল মূর্ত্তি আনিয়া রাখি কেন? বাগানটিকে নয়নমোহন করিতে। কিন্তু রেঁদা বাগানে মূর্ত্তি আনিয়া সাজাইয়া রাখেন এই মনে-করিয়া, যাহাতে উদ্যানের পুষ্পিত পল্লব-শ্রী, তাহাদের সৌন্দর্য্য আরও বেশী ফুটাইয়া তুলিতে পারে। তিনি বাগান সাজাইতে মূর্ত্তি আনেন না,—মূর্ত্তির ভাব-স্ফূর্ত্তির জন্য বাগান গড়েন।

আর-এক জায়গায় রূপরাণী ভেনাসের একটি নগ্নতনু ভগ্নমূর্ত্তি। তাঁহার পীবর, উন্নত বক্ষ একখানি রুমাল দিয়া ঢাকা। হঠাৎ দেখিলে সন্দেহ হইবে যে, বুঝি কোন রুচিবাগীশ উন্মুক্ত রমণী-বক্ষের সৌন্দর্য্য দেখা অধার্ম্মিকের কাজ ভাবিয়া ভেনাসের বুকে কাপড়-ঢাকা দিয়াছেন! কিন্তু, তা নয়। এ রেঁদারই কাজ! তাঁহার মতে, মূর্ত্তিটির নগ্নতনুর ঐ অংশটি দেহের অন্যান্য অংশের চেয়ে কম-সুন্দর! এখানেও প্রকৃত কলাবিদের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণে সাধারণত রমণী-তনুর যেখানটিতে বেশী সৌন্দর্য্য দেখে, আর্টিষ্টের চোখে সেখানে নিখুঁত লাবণ্যের কোন লক্ষণ ধরা পড়ে না! রেঁদার ভাস্কর্য্যে শিল্পীর এই বিশেষত্ব যাঁহারা ধরিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে খাঁটি রসবোধ হওয়া শক্ত কথা।

বাগানের পাশেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি প্রাচীন, ভগ্ন অট্টালিকা। বাড়ীটি একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল, রেঁদা নিজের অর্থব্যয়ে তাহার সামনের দিকটা আবার গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্থাপত্যের এই অপূর্ব্ব নিদর্শনের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তাহার রূপলাবণ্যে হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়। আটটি ধাপ উঠিয়া চমৎকার দ্বার-পথ। গুটিকয় থামের উপরে, সামনের তিন-কোণা অংশটি, গ্রীকআদর্শে স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে অতি-সুন্দর কয়েকটি মূর্ত্তি ক্ষোদিত।

রেঁদা বলিতেছেন, "আগে এই চমৎকার বাগানবাড়ীটি অন্য জায়গায় ছিল। তার কাছ দিয়ে যখনি আসতুম, আমার মন প্রশংসায় ভরে উঠত। কিন্তু এর মধ্যেই কবে জানিনা,—কোথাকার কতগুলো নির্ব্বোধ

আদম

ইভ

এই বাড়ীখানি কিনে আগাগোড়া ভেঙ্গেচুরে ফেললে! যে-দিন আমি এই অপকর্ম্ম প্রথম দেখলুম, সেদিন আমার মনে যে কি-রকম ত্রাশ হয়েছিল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এমন পুরাণো শিল্পকাজ একেবারে ভেঙ্গে ফেলা? কি ভয়ানক! আমার মনে হোল, এই পাপীগুলো আমার চোখের সামনে, যেন কোন কুমারীর সুশ্রী তনুকে চিরে-কেটে নষ্ট করে ফেলেছে!

সেই দুরাত্মাদের বল্লুম, তারা যেন এমন ভাবে সমস্ত আর তছ্‌নছ্‌ না করে; মালমশলাগুলো আমি সব কিনে নেব! তারা রাজি হোল। আমি সমস্ত পাথর এখানে তুলিয়ে আনালুম। তারপর যতটা-সম্ভব আগেকার মত করে বাড়ীখানি আবার গেঁথে তুলছি।"

রোঁদার নূতন-লেখা "Les Cathédrales de France" (ফ্রান্সের গীর্জ্জা) নামে বই-খানিতেও, তাঁহার প্রাচীন শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অগাধ প্রেম, ছত্রে-ছত্রে আবেগময়ী উচ্ছ্বাস-উচ্ছ্বসিতা ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। রাজ্যপিপাসার রক্তস্রোতে ফ্রান্সের চারিদিকেই প্রাচীন শিল্পের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-স্তম্ভগুলি ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সকল ভগ্নাবশেষের উপরে আধুনিক শিল্পীদের দ্বারা প্রাচীনের অনুকরণে আবার নূতন মন্দির গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রোঁদা বলিতেছেন:—"আমি চাই—এই অতুল শিল্পকে লোকে ভালবাসুক; এখনো যেটুকু অক্ষত আছে, সেটুকুকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করুক; অতীতের একটি মহৎ শিক্ষাকে বর্ত্তমান কিরূপে ত্যাগ করেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে তাহা জাজ্জ্বল্যমান করে রাখুক! এই উদ্দেশ্যে আমি সকলের হৃদয় ও মনে স্নেহ এবং বোধশক্তি জাগ্রৎ করতে চাই! ঐ-সব প্রাচীন ও জীবন্ত পাষাণের প্রতি আমি আমার প্রণাম নিবেদন করতে চাই! তাদের কাছ থেকে আমি যে সুখ-সৌভাগ্যের আস্বাদ লাভ করেছি, সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি পরিশোধ করতে চাই! যে-সকল বিনীত ও নিপুণ শিল্পী, কোমলপ্রাণে শিলার উপর শিলাখণ্ড তুলে অদ্বিতীয় কলা-নিদর্শণ রচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি মনে-প্রাণে সম্মান প্রদর্শন করতে চাই! ....আমরা ভালবাসব, আমরা আদর করব! অতীতের সেই বিরাট পুরুষগণ,—যাঁরা ঐ-সকল প্রণম্য প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন,—ধ্বংসের অতলে অদৃশ্য হওয়াই যদি তাঁদের অদৃষ্টে থাকে,—তবে তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন, কালবিলম্ব না করে তাহা গ্রহণ করতে—তাঁদের সকল প্রয়াসের মধ্যে তাহা পাঠ করতে আমরা যেন অগ্রসর হই!.........ঐ-সকল বিপুল মন্দিরের মেঘ-ভেদী উন্নত মুকুটের মহিমায় অভিভূত হয়ে তুমি যদি ভেবে থাক যে, কোন প্রাকৃতিক বা দৈব কারণে তাহাদের এ-হেন মহিমা, তবে তুমি ভ্রম করবে। আলোছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ-কৌশলেই গোথিক আর্টের আত্মা বিকসিত হয়েছে! সেইজন্যই এ-সব প্রাসাদ-মন্দির ছন্দের আনন্দে এত পরিপূর্ণ এবং প্রাণের লক্ষণে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে!......

অতীতে যে বিজ্ঞান ছিল, বর্ত্তমানে তাহা বিলুপ্ত! অতীতের সে উৎসাহ অনুরাগের মধ্যে যে চিন্তাশীলতা, যে সংযম, যে ধৈর্য্য ও যে শক্তি ছিল, আমাদের এই ব্যগ্র ও উত্তেজিত বর্ত্তমান শতাব্দী তাহা কল্পনা করতেও অক্ষম।......এই যে সব প্রাসাদ-মন্দির,—এদের মধ্যেই আছে আমাদের সমগ্র ফরাসী-ভূমির প্রাণ,—প্রাচীন গ্রীশের প্রাণ ছিল যেমন পার্থেননের মধ্যে!"

রোঁদা মনে করেন, ঐ-সকল চিরমৌন মন্দির জড় ও তুচ্ছ শিলাস্তূপমাত্র নহে; তাহাদের পাষাণে পাষাণে গোপন আছে শক্তিমানের সবলতা, কামিনীর কোমলতা, যৌবনের সরসতা, প্রাণের সজীবতা;—উৎসাহের উন্মাদনা, জীবনের উত্তেজনা এবং যোগীর ধ্যান ধারণা! ও-সব পাষাণ কথা কয়, ভালবাসে, সৌন্দর্য্যের শিক্ষা দেয়! যার কাণ আছে, ওদের ভাষা সে শুনিতে পারে,—যার প্রাণ আছে, ওদের ভালবাসা সে অনুভব করে,—যার রসবোধ আছে, ওদের শ্রীসৌন্দর্য্যে তাদের মন পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে!

*
* *

রোঁদার জীবন লইয়া যে দু-চার কথা বলিবার ছিল, বলিলাম; এইবারে আমরা স্বাধীনভাবে তাঁহার শিল্প-সম্বন্ধে আর দু-চার কথা বলিব।

বর্ত্তমান যুগে, পাশ্চাত্য ললিতকলায় একটি অসম্পূর্ণতা বিশেষ করিয়া আমাদের মনকে আঘাত দেয়। প্রতীচ্য শিল্পে এখন রমণী-আদর্শের ছড়াছড়ি যতটা বেশী, পুরুষ-আদর্শের সৃষ্টি ঠিক ততটাই কম! আধুনিক শিল্পীর প্রধান আদর্শ,—রমণী-সৌন্দর্য্য। উচ্চশ্রেণীর আর্টেও যেমন দেখি, নিম্নশ্রেণীর আর্টেও ঠিক তেমনি। একালকার বিলাতী মাসিকপত্রগুলির প্রচ্ছাদনী দেখুন, সুরূপ-সুবেশ রমণীর চেহারা ভিন্ন আর-কিছু নজরে ঠেকিবে না। তাহাদের কেহ কটাক্ষমধুরা, কেহ হাস্যচঞ্চলা, কেহ অভিমানে স্ফুরিতাধরা!

কিন্তু,—আমাদের মনে হয়,—প্রাচীন গ্রীকদের পক্ষে যদি মাসিকপত্র বাহির করা সম্ভব হইত, তবে তাহার প্রচ্ছাদনীর উপরে তাহারা হয়ত "যুবক অ্যাপলো"র একখানি ছবি দিতেন! "ভেনাসে"র মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রীকেরাই নিখুঁত রমণী-সৌন্দর্য্যকে শিল্পে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, ইহা সত্য; এবং আজ-পর্য্যন্ত আর-কোন দেশের আর-কোন শিল্পী এমন আর-কোন তিলোত্তমার মূর্ত্তি গড়িতে পারেন নাই, ইহাও সত্য বটে; কিন্তু গ্রীকশিল্পের প্রধান আদর্শ ছিল যে, সবল পৌরুষ, এ হচ্ছে ততোধিক সত্য কথা।

গ্রীকশিল্পের এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, প্রাচীন গ্রীকদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে মহিলারা যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীশে সে স্থানের অধিকারী ছিলেন, প্রধানত পুরুষজাতি। পুরুষের সবল যৌবন তখন সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল। Professor Jowettএর উক্তিতেও এই যৌবন-পূজার

শিল্পীর পাষাণ-প্রেয়সী

প্রমাণ পাওয়া যায়। * গ্রীক-আর্টেও তাই পুরুষত্বের এই পূজার পরিচয় Sophocles, Mars, Hermes, Apollo, Antinous,

Eros প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীকশিল্পী পৌরুষের এতই ভক্ত যে, তাঁহারা রমণীত্বের মধ্যেও

---

* Still more remarkable is the fact that the elevation of sentiment. which is regarded by Plato as the first step in the upward progress of the Philosopher, is aroused not by female beauty, but the beauty of youth, which alone seems to have been capable of inspiring the modern feeling of romance in the Greek mind. The passion which was unsatisfied by the love of women took the spurious form of an enthusiasm for the ideal of beauty—a worship as of some godlike image of an Apollo or Antinous."

স্থলে পুরুষত্বের বিকাশ না দেখাইয়া পারেন নাই। Dianna, Athena প্রভৃতি অগুন্তি রণরঙ্গিনী রমণীমূর্ত্তি এবং ভেটিক্যান মিউজিয়মের "Battle of Amazons" নামে শিল্পকার্য্যটি তাহার জলন্ত প্রমাণ।

আসীরীয় ভাস্কর্য্যেও পুরুষত্বের যথেষ্ট সম্মান ছিল; এমন-কি, তাহার মধ্যে রমণীর মূর্ত্তি অত্যন্ত দুর্লভ! ভারতের প্রাচীন শিল্পেও পুরুষ-সৌন্দর্য্যের বিকাশই অধিকতর দেখা যায়।

আজ কিন্তু আদর্শ বদলিয়া গিয়াছে। শিল্পীরা এখন রমণীর কোমল রূপলাবণ্যে যতটা মুগ্ধ, পুরুষের সবল সৌন্দর্য্যে ততটা নন। আধুনিক কলায় আমরা অনেক আদর্শ-রমণীর সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত আদর্শ-পুরুষরা কোথায়? রোঁদা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে তিনিও আপন ব্যক্তিত্ব মিশাইয়া ফেলেন নাই, শিল্পের ধারাকে তিনি প্রতিভা-প্রভাবে একটি নূতন খাতের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রমণীর পেলব সৌন্দর্য্যকে তিনি অবহেলা করেন নাই, অথচ পুরুষত্বের সম্মানও সমভাবে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গঠিত অসংখ্য পুরুষ-মূর্ত্তিই তাহার উদাহরণ। তবে প্রাচীন গ্রীশে, সেই বীরত্বপ্রধান যুগের শিল্পিগণ যে আদর্শের পুরুষ গড়িয়াছিলেন, রোঁদা সেই আদর্শকেই অবলম্বন করেন নাই। কারণ, এ যুগ জীবন-সংগ্রামের যুগ, চিন্তাপ্রধান যুগ, মস্তিষ্ক এখন মুখ্য—শরীর এখন গৌণ। আগেকার আর্টে থাকিত ছাঁকা সৌন্দর্য্য; এখন নিছক রূপে লোকের আর মন ভোলে না—আর্টে রূপাতিরিক্ত আরও-কিছু দরকার। গ্রীকশিল্পে তখনকার যুগধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে, রোঁদার শিল্পে এখনকার যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা যদিও আর্টের উদ্দেশ্য নহে, তবু শিল্পীর হৃদয়ে যুগধর্ম্মের অনুভূতি থাকে বলিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কার্য্যে যুগধর্ম্মের বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করে। এই হিসাবেই আর্টের সঙ্গে যুগ-ধর্ম্মের সম্পর্ক,—যদিও আর্ট, যুগধর্ম্মের অধীন নহে।

*

* *

প্রতিমূর্ত্তি-গঠনে রোঁদার আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখা যায়।

এখন, মূর্ত্তিগঠনে রোঁদার বিশেষত্ব কোথায়, যতটুকু বুঝিয়াছি, বলিব।

প্রতিমূর্ত্তি-গঠন বড় শক্ত কাজ। য়ুরোপের প্রাচীন ও নবীন অনেক কলাবিদ প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন বা গড়িয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের অঙ্কিত বা গঠিত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটি চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখিয়া এক-একজন শিল্পী এক-একটি মূর্ত্তির নাক-কাণ-চোখ বা পোষাক-পরিচ্ছদ এমন নিজের ভঙ্গীমত করিয়া গড়েন, যাহাতে লোকে 'এটা অমুকের প্রতিমূর্ত্তি' না বুঝিয়া, বুঝিতে পারে যে 'এটা অমুক শিল্পীর গড়া'। প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব থাকিবে না—থাকিবে আদর্শের নিজস্ব। বিখ্যাত চিত্রকর স্যর জসুয়া রেণল্ডস্ এবং গেন্‌স্‌বরোর নাম, এখানে আমরা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতে পারি। রেণল্ডসের আঁকা মূর্ত্তি-চিত্রগুলি দেখুন।

গ্রীকদেবতা অ্যাপলো

সকল মূর্ত্তির চোখই প্রায় একরকমের। সে চোখগুলিতে শিল্পীর আদর্শের ছায়া আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আদর্শের লক্ষণ নাই। পৃথিবীতে দুজন লোকের এক-আদর্শের চোখ থাকিতে পারে, কিন্তু একভাবের চোখ থাকা অসম্ভব। রেণল্ডসের আঁকা ছবি হইতে একমূর্ত্তির চোখ তুলিয়া যদি অন্য মূর্ত্তির চক্ষু-কোটরে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলেও বিশেষ-কোন ক্ষতি বা ভাবান্তর হয় না। গেন্‌স্‌বরোও ঐ দোষে দোষী। অথচ, ভ্যান-ডাইকের আঁকা মূর্ত্তিচিত্র দেখুন। প্রত্যেক মূর্ত্তির চোখ আলাদা রকমের, আলাদা ভাবের; তাহার মধ্যে শিল্পী আপনাকে বা আপনার মুদ্রাদোষকে কোথাও জাহির করিতে চেষ্টা পান নাই।

প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে বসিয়া অনেক নকলিয়া শিল্পী কেবল মাংসের ছবি গড়েন। সুধু শিল্পী নন, বিলাতের কোন-কোন বিখ্যাত সমালোচকও এখানে সত্যকে বুঝিতে পারেন নাই। মিঃ ফ্রেডারিক হ্যারিসন রোঁদার সমালোচনা করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন, মানুষের আকারের হুবহু নকল করিতে বা অবিকল ছাঁচ তুলিতে পারিলেই ভাস্করের কাজ শেষ হইল। এটি একটি মস্ত ভুল।

বহিরঙ্গের অবিকৃত ছাঁচ তুলিলেই যদি ভাস্করের কাজ শেষ হইত, তাহাহইলে আর্ট-স্কুলের নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রই এক-একজন শ্রেষ্ঠশিল্পীর আসন পাইতে পারে। চিত্রকর ওয়াট্‌স্ বলিতেছেন, 'Any fool can copy' —"যে-কোন বোকা হুবহু নকল করিতে পারে।"—নকল করাই আর্টের কাজ হইলে প্রত্যেক আর্টিষ্টকে 'ফ্যুল' বলিয়া মানিতে হয়। রোঁদা প্রথম জীবনে একটি মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, আদর্শের অবিকল ছাঁচ ও অত্যন্ত বাস্তব বলিয়া সেটিকে ফ্রান্সের Salon হইতে বাতিল করা হইয়াছিল। আর্ট যদি স্বভাবের অনুকৃতিমাত্র হইত, তাহাহইলে সে মূর্ত্তিটির ভাগ্যে অমন অবমাননা ঘটিত না।

আসল কথা, ফটোগ্রাফির যেখানে অবসান, আর্টের আরম্ভ সেইখান হইতে। ফটোগ্রাফ যেমন নিখুঁত নকল করিতে পারে, কোন মানুষের হাত তেমন পারে না। সুতরাং যেখানে নকল দরকার, সেখানে ফটোগ্রাফের কাছে আর্টের মান ঢের খাটো। যেখানে নকলের চেয়ে আরো বেশী-কিছুর দরকার, যেখানে বাহিরের সঙ্গে ভিতরকেও চাই, যেখানে দেহের সঙ্গে প্রাণকেও চাই, সেখানে ফটোগ্রাফারের মুখ শুকাইয়া যাইবে এবং আর্টিষ্টের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কাহারও প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময়ে ভাস্কর প্রথমে আদর্শের হুবহু নকল করিয়া একটি মাটির ছাঁচ গড়েন। মিঃ হ্যারিসনের মতানুযায়ী চলিলে, এই ছাঁচ তুলিয়াই ভাস্কর তাঁহার কাজ শেষ করিতেন। কিন্তু ভাস্করের আসল কাজ আরম্ভ হয়, এই ছাঁচ-তোলার পর হইতেই। বাহিরের ছাঁচ তুলিয়া ভাস্কর তাঁহার আদর্শের হৃদয়, চরিত্র, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করেন। আদর্শের মনের ভিতরটা বেশ ভালরকমে বুঝিয়া ভাস্কর তাঁহার ছাঁচের উপরে সেই মানসভাব ফুটাইয়া তোলেন। এমন-কি, এ-সময়ে আদর্শের আসল চরিত্র প্রকাশ করিবার সময়ে, ভাস্করের হাতে অনুকরণে-গঠিত ছাঁচে অনেক অদল-বদল হয়। ইহাই

হইল রোঁদার কার্য্যপদ্ধতি। যতক্ষণ-না আদর্শের বহিরঙ্গ এবং অন্তর-অঙ্গ একসঙ্গে বিকসিত হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচ সুধু মাটির ছাঁচই থাকিয়া যায়, তাহা জীবন্ত আর্টের একটি নিদর্শণ বলিয়া গৃহীত হয় না।

রোঁদার গড়া প্রতিমূর্ত্তিগুলি এক-একটি এক-একরকমের। তাহাদের গঠন-ভঙ্গীতে শিল্পীর কোন মুদ্রাদোষ জাহির হয় নাই। তাহাদের প্রত্যেকটিরই মুখ দেখিলে প্রত্যেকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন-কি, অনেকস্থলে শিল্পী, ভিতরের ভাব ফুটাইতে বিঘ্ন হয় দেখিয়া, বাহিরের সাদৃশ্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। প্রমাণ, রোঁদার ব্যালযাক। ব্যালযাকের এই মূর্ত্তিটি এমনি আকারহীন ও বিকৃতগঠন যে,ব্যালযাকের কোন ফোটোর চেহারার সঙ্গে এর মিল নাই। এইজন্য, এই মূর্ত্তি দেখিয়া ফরাশীদেশে রোঁদার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভার অবতার ব্যালযাকের অদ্ভুত মস্তকের দিকে চাহিয়া দেখুন; শিল্পী যে ঐদিকেই দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চান, সেটি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই গঠনহীনতায় শিল্পীর কোন নিজস্ব বিশিষ্টতা-প্রকাশের চেষ্টা নাই; এখানে শিল্পী সুধু অদ্বিতীয় সাহিত্য-ধুরন্ধর ব্যালযাকের অসাধারণ প্রতিভার বিশিষ্টতার প্রতি সকলের মন আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্যালযাকের বাহিরের চেহারা এখানে অবহেলার বস্তু; শিল্পীর লক্ষ্য, এখানে পার্থিবতার অতীত অন্য-কিছু। ব্যালযাকের এই মূর্ত্তি হইতে ভ্রান্ত শিল্পী এবং তথাকথিত আর্ট-ক্রিটিকরা যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারেন।

* * *

ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। চিত্রকরেরা কোন দৃশ্যের একদিক মাত্র দেখাইতে পারেন,—ভাস্করদের সুবিধা এখানে বেশী,—তাঁহারা যে-কোন বিষয়কে সকলদিক হইতে দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। চিত্রের আলোক-ছায়া নির্দ্দিষ্ট, তাহা একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের পক্ষে উপযোগী; আর ভাস্কর্য্যের আলোক-ছায়ার লীলা আরও স্বাভাবিক, আরও বিচিত্র, আরও জীবন্ত। কিন্তু চিত্রকরদের যতটা স্বাধীনতা আছে, ভাস্করদের ততটা নাই। পটুয়াদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় যে সাহায্য, তা হচ্ছে বর্ণের সাহায্য। ভাস্কর ফুল গড়েন, কিন্তু ফোটাফুলের রঙ্গের শ্রী দেখান না। চিত্রকরদের আর-এক সুবিধা,—জল-স্থল-আকাশের সমস্ত দৃশ্য, তাহাদের ক্ষুদ্রত্ব ও রুদ্রত্বর সহিত তাঁহারা সমান বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারেন; ভাস্করেরা এ-ক্ষেত্রে পরাজিত। কেননা, মানব-মূর্ত্তিই তাঁহাদের প্রধান এবং উপযোগী আদর্শ। নিসর্গ-চিত্র তাঁহাদের হাতে ফুটিতে পারে না। আবার, অন্যদিকে,—মানুষ আঁকিতে গেলে পটুয়াদের পক্ষে একটি কৃত্রিম 'ক্ষেত্রপৃষ্ঠে'র (Back-ground) আবশ্যক। কিন্তু ভাস্করের গড়া মানব-মূর্ত্তি, সজীব প্রকৃতির কোলে, স্বাধীন ছায়ালোকে, বিশ্বজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, ঠিক সত্যিকার মানুষের মতই অবস্থান করে। চিত্র, বদ্ধগৃহের সঙ্কীর্ণতার উপযোগী; ভাস্কর্য্য, মুক্ত প্রকৃতির রম্য অলঙ্কার। চিত্র-

করের ক্ষেত্র অধিক-বিতত হইলেও এমন সুবিধা-সুযোগ তাঁহার নাই।

ধাতু বা প্রস্তর নতোন্নত করিয়া ভাস্কর্য্যে যাহা গঠিত হয়, তাহার নাম "sculpture in relief"। ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ইহা মিলনক্ষেত্র। ইহা অর্দ্ধ-চিত্র এবং অর্দ্ধ-ভাস্কর্য্য। সকল দেশে সকল সময়েই মন্দিরাদির গাত্র অলঙ্কৃত করিতে হইলে, বিশেষভাবে ইহার উপযোগিতা দেখা গিয়াছে। রেঁাদার Gate of Hell বা নরক দ্বার, এই শ্রেণীর কারুকার্য্য।

চিত্রকরের পক্ষে ভাস্করের শিক্ষা না থাকিলেও চলে, কিন্তু ভাস্করের পক্ষে চিত্রকরের শিক্ষা অবশ্য-আবশ্যক। কারণ, মূর্ত্তি আঁকিতে না জানিলে ভাল মূর্ত্তি গড়িতে পারা যায় না। ড্রয়িং বা রেখা-চিত্রে রেঁাদার যে কতটা হাত, যাঁহারা তাঁহার আঁকা ছবি দেখিয়াছেন তাঁহারা সে কথা জানেন। এমনি, নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বলা যায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে চিত্রকর সৌভাগ্যবান হইলেও, ভাস্করের কার্য্য তাঁহার অপেক্ষা কঠিন।

কাঠিন্য এবং অসুবিধার দিকে দৃকপাত না করিয়া শিল্পী রেঁাদা ভাস্কর্য্যকেই আপন সাধনধন করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে ভাস্কর্য্য যতটা নাড়া দিতে পারে, চিত্রকলা ততটা পারে না। পরন্তু, কাঠিন্যের মধ্যেই আর্টের স্ফূর্ত্তি দেখাইতে পারা, বিশেষ বাহাদুরির কাজ।

মিঃ ফ্রেডারিক হ্যারিসন, রেঁাদার সমালোচন-প্রসঙ্গে আর-এক জায়গায় বলিতেছেন, দান্তের অদ্বিতীয় কাব্য Inferno হইতে বিষয় সংগ্রহ করা, রেঁাদার পক্ষে বিষম ভ্রম হইয়াছে। কারণ কাব্যের শব্দচিত্রের সমগ্রতা ভাস্কর্য্যের মধ্যে ঠিকমত ফুটিতে পারে না।

মিঃ হ্যারিসনের উত্তরে আর-একজন সমালোচক বলিতেছেন, "রেঁাদা যদি ভুল করিয়া থাকেন, তবে এ ভুল নতুন ভুল নয়। আতঙ্ককে, ভয়ানককে, ঘৃণিতকে প্রকাশ করিবার সময়ে শব্দ, ভাস্কর্য্য বা

ভাস্কর ওগস্ত্‌ রেঁাদা

চিত্র কলার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না; তফাৎ সুধু পরস্পরের অবিলম্বিত ফলে। শব্দ উল্লেখ করে, দেহকে দেখায় না; চিত্র বা ভাস্কর্য্য দেহকে দেখায়, কিন্তু কিছু বলে না।······ভাস্করের গঠিত ভীতিকর বা ঘৃণাকর মূরত, সুধুই যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা-নয়; পরন্তু, আমাদের কল্পনার শিখা উস্কাইয়া দেয়, আমাদের প্রাণে ভয় বা ঘৃণা বা বিদ্রোহের ভাব সঞ্চার করে। সে মূর্ত্তি আপন অর্থ আপনিই ঘোষণা করে।"

রেঁাদার হাতে-তৈয়ারি "বৃদ্ধা"র মূর্ত্তি দেখিয়াও অনেকে অনেক কথা বলিতে কসুর করেন নাই। (ভারতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ছবি দেখুন) একজন শিল্পী এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া নাক বাঁকাইয়া বলিতেছেন, "এমন মূর্ত্তি কোন ভদ্রলোক গড়িতে পারেন না।" —অবশ্য, এমন পলিতকেশা গলিতদেহা বৃদ্ধার মূর্ত্তি কোন বিলাসীর বৈঠকখানা আলো করিবে না। শিল্পী এখানে কুৎসিতকেই সাধ-করিয়া গড়িয়াছেন। কেননা, এখানে কালের হাতে-খোদা গভীর আস্ত-রেখায়, কুঞ্চিত-ক্ষয়িত দেহের উপরে অন্তরের ভাব কৃষ্ণপটে শ্বেতের আভাসের মত যেমন স্পষ্ট ফুটিয়াছে, কোন তরুণীর যৌবন-মধুর নিটোল তনুর উপরে তাহা তেমন ভাবে ফুটিতে পারে না। শিল্পী এখানে সৌন্দর্য্যের, বিলাসের, উদ্দাম যৌবনের শোচনীয় পরিণাম দেখাইতেছেন। কিন্তু সংসার-পাথারে মায়াভ্রান্ত জীব আমরা, —অন্ধ হইয়া ভাসিয়া যাইতেই ভালবাসি, চক্ষু মেলিয়া সে মৃত্যুতরঙ্গের পানে চাহিতে আমাদের ভয় করে—অপ্রিয় সত্য যে আমাদের স্বেচ্ছাভ্রান্ত মনের শত্রু! রেঁাদার বিরুদ্ধে এত অভিযোগের কারণ,—তিনি সত্যদ্রষ্টা!

Renaissance,—কথাটিকে যদি একটু সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি, তাহাহইলে বলা যায় যে, আধুনিক শিল্পজগতে রেঁাদা আপন প্রতিভাবলে আর্টের 'রেনেসাঁস' বা 'পুনরভ্যুত্থান' আনয়ন করিয়াছেন। য়ুরোপে মধ্যযুগে প্রাচীন আর্টের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল। সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে পাডুয়া ও ফ্লোরেন্সে, Alberti, Squarcione ও Mantegna প্রভৃতি শিল্পিগণ রোম ও গ্রীশের প্রাচীন আর্টের আদর্শে পুরাতনকে নূতন জন্মদান করেন। তাহার পর সেই নব জন্মের আনন্দে মধ্যযুগের শিল্প সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু একালের শিল্পীরা প্রাচীন আর্টের মহিমা আবার ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলেন। নবযুগের শিল্প উন্নত সভ্যতার কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল। এমনি সময়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে, প্রাচীন আর্টের মহিমামুগ্ধ রেঁাদা, শিল্পসমাজে প্রবেশলাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, নব-যুগের শিল্প ভুলপথে চলিতেছে; ফিডিয়াস ও মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্য-গণ, ললিতকলায় যে সরল সত্যের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আধুনিক বংশ-ধরেরা সে সত্য আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; জীবনের সে স্বাধীন লীলা, আর্টকে আর বিচিত্র করিয়া তুলিতে পারিতেছে না; অন্তর্গূঢ় ভাব আর তেমন করিয়া চিত্রপটে বা শিলাফলকে আপনাকে ফুটাইতে

পারিতেছে না ; সকলে এখন রঙের চটকে পাগল, আড়ম্বরে মোহিত, ছেলেখেলায় খুসী। শিল্পীদের এই অবনতির জন্য আধুনিক জীবন ধারার মধ্য হইতে আর্ট ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে,—জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সাড়া তাহার ভিতরে আর পাওয়া যাইতেছে না। লোকেও তাই আর্টের কোন উপকারিতা অনুভব করিতে না পারিয়া আর্টিষ্টের প্রতি যথাযোগ্য সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এই-সব বুঝিয়া রেঁদো নবযুগের উপযোগী করিয়া, নূতন বেশে, নূতন আকারে, নূতনভাবে পুরাতনকে নূতন জীবনে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার উপরে প্রাচীন শিল্পের,—বিশেষরূপে গ্রীক শিল্পের প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছে, তাঁহার কথা ও কার্য্যে তাহা জাজ্জ্বল্যমান হইয়া আছে।

রেঁদার সাধনা বিফল হয় নাই। তাঁহার শিষ্যগণ এখন বিখ্যাত হইয়া স্বদেশে-বিদেশে, সকলের হৃদয়ে শিল্পের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সকলে এখন আবার আর্টের মহিমা, সমাজ-সংসারে সকল কার্য্যে তাহার উপযোগিতা এবং উপকারিতা বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারিতেছেন।

প্রতীচ্য শিল্পে এখন আর-একটি নূতন ধারা বহিয়াছে। ফরাসী শিল্পী Maillol, সার্ভিয়ান শিল্পী Mestrovic ও অর্দ্ধ-ইংরেজ

মেষ্ট্রোভিকের গঠিত মূর্ত্তি

শিল্পী Epstein এই নূতন দলের মধ্যে প্রধান। Mestrovic রোঁদার পরম বন্ধু। ডোষ্টোএভ্‌স্কি যেমন রুশিয়ার প্রাণ দেখাইয়াছেন, দান্তে যেমন ইতালির প্রাণ দেখাইয়াছেন, মেষ্ট্রোভিকের শিল্পেও তেমনি দক্ষিণ সার্ভিয়াবাসীর প্রাণের কথা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে। নূতন পথের যাত্রী হইলেও পূর্ব্বকথিত শিল্পিগণ রোঁদার সাধনপ্রভাবে অল্প উপকারলাভ করেন নাই।

রোঁদার আর্টের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহার রসবোধ করিতে হইলে মনকে শিক্ষিত ও ভাবগ্রাহী করিতে হইবে। ধনীর বাগানে বাগানে যে-সব পাথরের পুতুল আকৃচার চোখে পড়ে, লোকের মনে চটক লাগাইবার ফিকিরে যেগুলি গড়া হয়,—রোঁদার গঠিত মূর্ত্তিগুলি একেবারেই তেমনধারা নয়। ভাস্কর্য্য যে ঘর সাজাইবার খেলনা গড়ে না, দু-দণ্ডের তরে চক্ষুকে তৃপ্ত করাই যে তাহার উদ্দেশ্য নয়, সে যে মানুষকে মস্তিষ্কের খোরাক যোগায়, দর্শকের সঙ্কীর্ণ প্রাণকে প্রশস্ত ও উদার করিতে চায়, জাতির হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করে, জাতীয় আদর্শ গঠন করে, সমাজের সকল কাজে লাগে, বিষয়ীর মনকে পার্থিবতা হইতে ফিরাইয়া আনে, হতাশকে আশার বাণী শোনায়, প্রকৃতির গোপন রহস্য-রত্নাকরে ডুব দিয়া হারামণি খুঁজিয়া বেড়ায়;—সর্ব্বোপরি, আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার সর্ব্বত্রই যে তাহার একান্ত উপযোগিতা আছে—শিল্পাচার্য্য রোঁদা এ-যুগে সর্ব্বপ্রথমে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লঘু-চিত্ত লইয়া যিনি রোঁদার কাছে যাইবেন, বিফল-মনোরথ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিবেন। ক্ষণিকের তরল ভাবে মাতিয়া ছেলেখেলা করিতে শিল্পী যে শিল্প-রচনা করেন না, রোঁদার আত্মউক্তিতেই তাহার প্রমাণ আছে। শিল্পী হইতে হইলে যে দর্শন-বিজ্ঞানে, সমাজতত্ত্বে, সাহিত্য-রসে এবং নরচরিত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইবে; গভীর ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রগাঢ় ধ্যান-ধারণা এবং জীবনব্যাপী সাধনা ভিন্ন যে ললিতকলায় মানসী মূর্ত্তি ফুটিতে পারে না, এ-সব কথাও রোঁদা ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন। নির্জ্জীব পাষাণে কিরূপে সজীব হৃদয়ের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে, সে গুপ্তকথা রোঁদা এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার উপরে আমাদের দ্বিতীয় কথা বলিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা।

তবে, রোঁদার আত্ম-উক্তিতে একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রোঁদা যখনই নিজের কথা তুলিয়াছেন, তখনই বিশেষ সাবধানতা এবং একান্ত বিনিত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন; আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও তিনি কোথাও আপনাকে জাহির করিতে যান নাই। তাঁহার ভক্ত যেখানেই উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁহাকে অন্য-কোন প্রতিভাধর ও মৃত ওস্তাদ-শিল্পীর সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ভক্তকে সংযত করিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে এমন অসাধারণ বিনয়-নম্রতা, বাস্তবিকই দুর্লভ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অমর

চোখের জলে উঠল ফুটে এই যে আমার ফুল,
নিশীথিনীর নীরবতায় ভরা,
আকাশ-কুসুম নয়-ক, আমার মর্ম্মে-বিঁধা মূল
হিয়ার রঙে পাপড়ি রঙিন করা !
মধুকরের মধুর-বাণী নাই সে কানের পাশে,
আলোর আশা নাইক চোখে তার,
উচ্ছ্বসিত গন্ধ শুধু বুকের 'পরে ভাসে
ধেয়ান-মাঝে পরশ দেবতার !
বিশ্ব যবে ঘুমিয়ে পড়ে নিখিল বাণীহারা,
নিঠুর আঁখি নাইক কোনোখানে,
আঁধার-বুকে তারার চোখে আসে আলোর সাড়া,
বাতাস শুধু বুকের মাঝে টানে,
সেই নিরালা, সেই আঁধারে, সেই অসীমে চেয়ে
পাতার বেড়া আপনি খসে ধীরে,
গন্ধে ভরে নিবেদন নিস্তব্ধ আকাশ ছেয়ে
সুদূর পূজা স্বপন দিয়ে ঘিরে !
মনের মাঝে যে জন আছে আমার বিশ্বরূপ,
চরণ তারি ফুলের বুকে রাজে,
সঞ্জীবনী, পরশমণি সে যে জীবন-ভূপ
পরম-আয়ু তাইতে ফুলের মাঝে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

যুগোত্তর সাহিত্য

(১)

পদ্মকে যে-পণ্ডিত পঙ্কজ-নামে প্রথম অভিহিত করেছিলেন, তিনি যে একজন অতি-পণ্ডিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কারণ, তাঁর অতিবুদ্ধিটি ডুবুরীর মতন ডুব-মেরে মাটি-গেলা মৃদ্‌গেল্ মাছের মতন একেবারে পাঁকের তলায় তলিয়ে গিয়ে, শেষে, পদ্ম বেচারীর নাড়ী-নক্ষত্র এবং হাঁড়ীর খবর হাটের মাঝে ফাঁস করে দিয়েছে। কিন্তু পাঁকের মধ্যে জন্মানোটাই কি পদ্মের প্রধান বিশেষত্ব? শুঁদি-শাপ্‌লা, হোঁজা-হেলা—এম্‌নি হাজারো ফুলের গোড়াপত্তন ওই পাঁকের মধ্যেই; এরাও সবাই পুখুরের জলেই জল্‌সা করে থাকে; পদ্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে একটুও তফাৎ নয়। এরা শতদলের সঙ্গে এক-সূর্য্যেই পাপ্‌ড়ি মেলেছে, এক হিল্লোলেই দুলেছে; কিন্তু শতদলের বিশেষত্ব মোটেই লাভ করতে পারেনি। কেন পারেনি? পারেনি, তার কারণ, শতদল সে বিশেষত্ব পাঁকের কাছেও লাভ করেনি, পুখুরের কাছেও পায়নি, এমন কি সূর্য্যের কাছেও না; সে বিশেষত্ব তার নিজস্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থা শতদলকে গড়ে তুল্‌তে পারেনা,—ফুটে ওঠবার অবকাশ দিতে পারে মাত্র।

পদ্মের সঙ্গে পঙ্কের যে সম্পর্ক,

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বা যুগেরও ঠিক্ তাই। পাঁক যে পদ্মকে রস জুগিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মধু জুগিয়েছে বল্লে একটু বেশী বলা হয়। সে জিনিসটাকে তারিফ করার তাগিদ্ মনে জাগলে, অবশ্য পাঁককে বাহবা না দিয়ে, পদ্মকেই দেওয়া উচিত। শেক্সপীয়রের মুগ্ধ পাঠক এলিজাবেথের যুগকে ধন্য ধন্য করলে ধন্যবাদটা অপাত্রেই গিয়ে পড়ে। যে সাহিত্যে, যে রস-রচনায় যুগধর্ম্মের গন্ধ অধিক, তা' কখনো সাহিত্য-রসিকের পূরোপূরি মনঃপূত হ'তে পারে না, বিশ্বমানবের তা' গ্রাহ্য নয়। যে পঙ্কজ পঙ্কলিপ্ত তা' দেবতার পূজায় লাগে না।

বিশ্ব-লীলা বিশ্বেশ্বরের লীলা; রসের লীলা তার হৃদ্মর্ম্মের বস্তু। যাঁরা রসিক, যাঁরা প্রকৃত কবি, বিশ্বচক্রের নাভিতে তাঁরা রসের চক্র প্রবর্ত্তন করে চলেছেন। যিনি মন সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মনের সৃষ্টি দিয়ে সংবর্দ্ধিত করছেন। যিনি সত্যরূপ-সিংহাসনে বিরাজমান, তাঁর জন্যে কল্পনার কাঞ্চন পাদপীঠ নির্ম্মাণ করছেন। আশা আছে, যদি বিশ্বনাথের পায়ের ধূলো কোথাও পড়ে, তবে সে ওই কল্পনার কাঞ্চন পাদপীঠেই পড়বে; কারণ ওটি মানুষের নিজের তৈরী জিনিস, ওটি আমাদের খাস্‌মহল। শুধু ওইখানেই মানুষ বিশ্বস্রষ্টাকে পায়ের ধূলো দেবার নিমন্ত্রণ করবার স্পর্দ্ধা রাখে।

এম্‌নি ক'রে কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে সাহিত্যের সৌভরাজ্য গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। জীবনের স্রোতে জন্মলাভ ক'রে জীবনকে এ ছাপিয়ে চলেছে,—ছাড়িয়ে চলেছে। এই সৌভরাজ্য রাত্রিদিন আকাশে ভেসে বেড়ায়, সূর্য্য-কিরণে শুচি হ'য়ে, জ্যোৎস্নায় সুন্দর হ'য়ে, শূন্যে শূন্যে ঘুরে বেড়ায়। এ আমাদের চমৎকৃত করে, সোৎসুক করে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দেয় না। এই রাজ্যের ছায়ামূর্ত্তিরা মেঘের আড়াল থেকে মাঝেমাঝে বাণ বর্ষণ ক'রে প্রয়োজনের পূজারীদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে; কিন্তু এর প্রতি বাণবর্ষণ বৃথা। কারণ, এ-রাজ্য কারো নাগালের মধ্যে নেই, কোনো বাঁধা-ধরার মধ্যে নেই;—এ নিজের আইনে চলে, সে আইনের নাম কবির খেয়াল। এ "লোকোত্তর চমৎকার," এ যুগোত্তর মৃত্যুঞ্জয়। যা' যুগধর্ম্মের অধীন, তা যুগের সঙ্গেই মরে যায়, দেওয়ালী পোকার লীলা দেওয়ালীর আলোতেই পর্য্যবসান। যা' যুগধর্ম্মের অতীত বা যুগোত্তর, তাই চিরকালের জিনিস। ভাব-জগতে যাঁরা যুগ-প্রবর্ত্তক, যাঁরা প্রতিভাবান্, তাঁদের উপর যুগের প্রভাব অতি অল্প। তাঁদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি নিজের যুগকে, জাতিকে, এমন কি নিজেকেও অতিক্রম করে চলে। যারা পাঁচপাঁচী-রকমের লেখক তাদের লেখাতেই যুগের-কালের জগদ্দল পাথর চেপে বসে থাকে। তার কারণ, তাদের নিজের ব্যক্তিত্ব তেমন সুস্পষ্ট নয়, তাই যুগধর্ম্মের ছাপ ও সমাজধর্ম্মের চাপ বিশেষ ক'রে তাদের রচনাতেই জাজ্বল্যমান হ'য়ে ওঠে।

(২)

বিচিত্র রীতি এই সৌভরাজ্যের। সাহিত্যের সৌভরাজ্যে বসন্তসেনা বেশ্যা নয়; ব্রজগোপী কলঙ্কিনী নয়; অহল্যা,

দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া। সহমর্ম্মিতা সে-রাজ্যের ধর্ম্ম, মরমী-জনের হৃদয় সে রাজ্যের দখলী স্বত্ববান প্রজা। সমাজের বা সংহিতার পরিবর্ত্তনশীল নিয়মকে সেখানে কেউ সনাতন ব'লে ভুল করে না। সে-রাজ্যে গুরুও নেই, শিষ্যও নেই; আছে কেবল সুহৃদের সহৃদয়তা। সেখানে ভ্রাতৃব্যের সঙ্গে পরিণয় প্রশস্ত, কি শ্যালীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ—এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই; প্রজাতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে ঝগড়া নেই;—তা থাক্‌লে শেক্সপীয়রের রচনা এতদিন ফ্রান্স ও আমেরিকার অপাঠ্য হ'য়ে পড়ত। কারণ শেক্সপীয়র প্রজাতন্ত্রের ধার মোটেই ধারেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করলে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ভুলে মানুষকে কল্পিত শোকে অশ্রুবর্ষণ করতে হয়, কিন্তু সে পুত্রশোকের কান্না নয়;—মড়া-কান্নার জায়গা সাহিত্য-রাজ্যে নেই। এ ছায়া-সুষমার রাজ্য। এ রাজ্যের রাজকার্য্য শুধু ভাবোচ্ছ্বাস জাগানো; তার বেশী নয়। ভাবাবেগ এখানে কর্ম্ম-প্রেরণার জনক নয়।

গোলাপের আতর জোলাপের জন্য তৈরী হয়নি; তবে কেজো লোকেরা যদি সুন্দর জিনিষকে কুৎসিত কাজে লাগায়, তবে তার জন্যে আতরের কারবারী জবাবদিহি কর্‌তে বাধ্য নয়। রস-সাহিত্য রোগীর পথ্য বা শিশুর খাদ্য নয়; ও জিনিষ পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী, চিত্ত-প্রসাধনের এবং চিত্তবিনোদনের উপাদান। সমাজ যখন মানুষকে পেষণ কর্‌তে চায়, সংসার যখন পীড়া দেয়, সত্য যখন সুন্দরের সুষমা থেকে ভ্রষ্ট ব'লে মনে হয়, তখন সাহিত্যের আব্‌হাওয়ার মধ্যে নশ্বাস ফেলে মানুষ বাঁচে। খাঁচার পাখী এইখানে অন্ততো কল্পনায় ডানা মেল্‌তে পায়। পরাধীন এখানে স্বাধীন। নিশ্ছিদ্র নিরেট বস্তুতন্ত্র জগতের মধ্যে এই ফাঁকটুকু আছে বলেই মানুষের ভাবুক-সত্ত্বা বেঁচে আছে। বিশ্বমানবের আনন্দময় কোষ এই কল্পনার রাজ্য,—এইখানেই রাম জন্মাবার ষাট-হাজার বছর আগে রামায়ণ-রচনা সম্ভব হয়েছিল, আর বাল্মীকি তা' না জান্‌লেও কৃত্তিবাসের তা' জান্‌তে আটক হয়নি, তাই বাল্মীকির কাব্য অনুবাদ করেও কৃত্তিবাস কবি।

(৩)

যুগে যুগে যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করে চলেছে মানুষের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এই রস-সাহিত্য। সাহিত্যের সৌভরাজ্যে যুগধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রভাব যদি থাক্‌ত, তবে স্যাফো হ'তেন থিয়োগ্নিস, বা থিয়োগ্নিস্‌ হতেন স্যাফো। বায়রন্‌ হতেন ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কিম্বা ওয়ার্ডসোয়ার্থ হতেন বায়রন্‌। ড্রাইডেন তা হ'লে মিলটন্‌ হতেন, বা মিলটন্‌ হতেন ড্রাইডেন্‌। মাইকেল ভূদেব হতেন, ভূদেব মাইকেল হতেন। মতিলাল রায় হতেন ডি, এল্‌, রায় বা ডি, এল্‌ রায় হতেন মতি রায়। কিন্তু তা যে হয়নি তার মানে এই যে, কাব্যজগতে কবির ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বই হচ্ছে প্রধান; দেশের জাতির বা যুগধর্ম্মের প্রভাব তার শতাংশের একাংশ মাত্র। কবির চিত্তধাতুর বিশেষত্বই এক্ষেত্রে প্রভু। প্রাচীন কালের একজন রসিক বলেছেন—

"অপারে কাব্যসংসারে
কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং
তথেদং পরিবর্ত্ততে॥"

সত্যিকার সংসারের এলাকার বাইরে যে কাব্য-সংসার আছে, কবিই সেখানকার প্রজাপতি, বিধানদাতা বিধাতা। কবি যখন সংসারকে মধুর দেখেন, তখনই সে প্রকৃত পক্ষে মধুর; কবি যখন বিশ্বকে বিস্বাদ মনে করেন, তখন সে একান্তই স্বাদহীন। তাঁর মনের রঙের ছোপ্ লেগে জগৎসংসার নিত্য নূতন রঙে রঙিন হচ্ছে।

"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে
জাতং রসময়ং জগৎ।
স চেৎ কবির্বীতরাগো
নীরসং ব্যক্তমেব তৎ॥'

কবির বীণায় যখন অনুরাগের সুর ধ্বনিত হয়, বিশ্ব তখন রসে ভরপূর; আবার যখন বৈরাগ্যের একতারায় কবি সুর লাগান তখন মনে হয়—

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।"

(৪)

যাঁদের ভাবতন্ময়তা নেই, সাহিত্যের সৌভরাজ্যেও যাঁরা পাশ-করা এঞ্জিনীয়ারের প্ল্যান অনুসারে সৌধ-রচনার ফর্ম্মায়েস ক'রে থাকেন, তাঁদের পক্ষে যুগোত্তর সাহিত্যের যথার্থ রস উপলব্ধি করা কঠিন। স্যাফো বা হাইন্, রুমি বা রবীন্দ্রনাথ, হাফিজ বা কবীর ভাবাবেশের মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে যুগোত্তর সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই রস-রচনার "চমৎকার সার" রসকেই অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলেছে "বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।"এই হ'ল যুগোত্তর সাহিত্য; মর্ত্ত্য মানুষের অমর-সত্বা। এ দেশ-কালের অতীত, বিশ্বমানবের চির-সম্পদ। ইরান দেশ জলের তলায় তলিয়ে গেলেও হাফিজ থাক্‌বে, সুফিধর্ম্ম লোপ পেলেও রুমির কবিতা লুপ্ত হবে না, আর বাঙালী জাতি ম্যালেরিয়ায় মরে গেলেও রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্য বিশ্বদেবতার ও বিশ্বমানবের কণ্ঠে অমর হ'য়ে বিরাজ করবে।

যুগোত্তর সাহিত্যের পরবর্ত্তী স্তরে যে সাহিত্য, তাকে যুগন্ধর সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপর যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও খানিকটা এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্তু-ভিত্তির বিপুল পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে, কিন্তু রস-সম্পদের প্রাচুর্য্যে দেশ-কালকে অতিক্রম করে। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে লক্ষ্য করেই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন—"The relation of literature to life is a double-sided relation."

এ সাহিত্য যে-পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে অমরতা অর্জ্জন করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি এবং ফরাসীর গদ্য-মহাভারত "লে-মিজেরাব্‌ল্" এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বাল্মীকি-ব্যাস, হোমার-দান্তে যুগন্ধর কাব্য-রচয়িতা, সেক্সপীয়র-সোফোক্লিস যুগন্ধর নাট্যকার; হিউগো-সিঙ্কিভিচ্ যুগন্ধর ঔপন্যাসিক; গ্যয়্‌টে-রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-বিয়োর্ন্‌সেন্ যুগন্ধর সাহিত্যিক।

এর নীচের স্তরে যুগোদ্ধারণ-সাহিত্য; যুগের ধর্ম্ম এ বদ্‌লে দিয়ে যায়, কিন্তু এর দৌড় খুব বেশী নয়। টলষ্টয় এই সাহিত্যের ধুরন্ধর। আর্টের হিসাবে অনিন্দ্য হলেও বঙ্কিমের "আনন্দমঠ," রবীন্দ্রনাথের "গোরা" এবং গোর্কির "Comrades" এই শ্রেণীর বই। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত এই

কোঠাতেই পড়ে। স্পেনের "দন্ কিয়োতে" (Don Quijote) এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু এ সব রুগ্ন সমাজের ঔষধ, —মৃগনাভি, ব্রাণ্ডি, বা মধুমিশ্রিত কড্‌লিভার অয়েল; সুস্থ শরীরের খাদ্য নয়। এ যে-পরিমাণে কেজো, সেই-পরিমাণে পঙ্গু; আর যে অনুপাতে রসের রসদ জোগায়, সেই অনুপাতে সচল ও সজীব। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ", মিসেস্ ষ্টৌ'র "টম্ কাকার কুটীর" এবং ইব্‌সেন ও তৎশিষ্য বার্ণার্ড শ'র অধিকাংশ রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তার নীচের স্তরে যে সাহিত্য তা' চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য;—তা যুগানুগ, যুগোচ্ছিষ্ট ও যুগোঞ্ছ সাহিত্য। অনুকরণে এর জন্ম, অনুসরণে এর পুষ্টি, আর যুগধর্ম্মের অনুমরণে এর মৃত্যু। ছেঁড়া মতে জোড়া-তালি দেওয়া এর কাজ। আধ-মরা আবেগের আধ-কপালে রোগে এর মাথা-ব্যথা, মানুষের মুক্ত মূর্ত্তি এখানে পদে পদে সঙ্কুচিত। এর ভাবোচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত সংহিতা-শাসিত; চিদ্ ধাতুর কোনো চিহ্নই এতে নেই। সাময়িক পত্র এর প্রধান বাহন, রঙ্গালয় এবং চায়ের দোকান এর দুর্গ। তোতাপণ্ডিত এবং হাতুড়ে সমালোচকের প্রশস্তি এর পুরস্কার। এই শ্রেণীর সাহিত্য হচ্ছে—

> পাতি-লেখকের প্রিয় আদর্শ,
> Mediocrityর হৃদয়-হর্ম্য,
> খাড়া-বড়ি-থোড়ে মহোৎকর্ষ
> সাধিত হতেছে ইথে!
> বাদ্‌লা-ফড়িং ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
> পিঁপড়ে উড়েছে ভর দিয়ে পাখে,
> —ভয় শুধু পাছে ধরে খায় কাকে
> পাখনা না পালটিতে।

(৫)

প্রথম-শ্রেণীর সাহিত্য অর্থাৎ যুগোত্তর সাহিত্য এই রকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিত্যের অর্থাৎ যুগোচ্ছিষ্ট সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত নয় ব'লে যাঁরা নিন্দা ক'রে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কারণ, কথায় বলে—

> "অজ্ঞ যদি বিজ্ঞ সাজে মৌন হ'য়ে বসি,
> শিখণ্ডী ধরিলে ধনু অস্ত্র না পরশি।"

তবে ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় শুধু এইটুকু বল্‌লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে—

"Charlatanism is always for confusing or obliterating the distinction between excellent and inferior." ভালোয়-মন্দয় গুলিয়ে দেওয়াই হাতুড়ে সমালোচনার লক্ষণ। "Fair is foul and foul is fair."—হাতুড়ের এই হ'ল ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু এই হাতুড়ে-গিরি কখনো সাহিত্য-রাজ্যের মণি-কোঠায়, অর্থাৎ ভাবের রাজ্যে বেশী দিন আমল পেতে পারে না; স্যাঁৎ বেভ্ বলেন, এমন কি, ঢুক্‌তেও পায় না, আমল পাওয়া তো দূরের কথা।

"In the order of thought, in art, the glory, the eternal honour is that charlatanism shall find no entrance; herein lies the inviolableness of that noble portion of man's being."—Sainte Beuve. কিমধিকমিতি।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

মাসকাবারী

ভুবনমনোমোহিনী

কবি গেয়েছেন,—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী!"

এই পবিত্র গানটি এ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তি-রসেরই উদ্রেক করে আস্‌ছিল; কিন্তু এখন হঠাৎ শোনা যাচ্ছে যে কোনো কোনো সমালোচকের অন্তঃকরণে ইহা দুষ্ট রসের সঞ্চার করেছে!—মাকে নাকি ভুবন-মনোমোহিনী বলা চলে না!

যাঁর চরণতল নীলসিন্ধুজলবিধৌত, যাঁর শ্যামল অঞ্চল অনিলকম্পিত, যাঁর উন্নত ললাট হিমাচলরূপে অম্বরচুম্বিত, যাঁর গগনে বিশ্বসভ্যতার প্রথম প্রভাত, যাঁর তপোবনে প্রথম সামগান, যাঁর বনভবনে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রথম প্রচার, যিনি অন্নপূর্ণা-রূপে দেশ ও বিদেশে অন্নবিতরণ করছেন, সেই আমাদের নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বলা ধরণী-রূপিণী জননী যে ভুবনমনোমোহিনী, তাতে আর সন্দেহ কি? রূপ বলতে কি শুধু কটাক্ষচঞ্চলা যৌবনপ্রধানা ষোড়শীর মাংস-ত্বকের রূপই বুঝায়? মাতৃত্বের কি পবিত্র রূপ নেই? সে রূপ কি ভুবনমনোমোহন হতে পারে না? তা-ছাড়া, প্রত্যেক হিন্দু যাঁকে দেশমাতৃকার চেয়ে অনেক বড় মনে করে থাকেন, সেই জগন্মাতাকে ষোড়শী ভুবনেশ্বরীরূপে পূজা করবার পদ্ধতি এ দেশের সাধকেরা কি প্রতিষ্ঠা করে যান্‌নি? কবির দেখা মাতৃত্বের যে রূপের মধ্যে পরতে-পরতে পবিত্রতা ফুটে উঠেছে, যে মাতৃত্বের বন্দনায় দেশবাসীর হৃদয় ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রণত হয়েছে, তার মধ্যে যিনি কুৎসিত ইঙ্গিতের আরোপ করতে এতটুকু লজ্জিত হন না, বঙ্কিমের ভাষায় তাঁকে বলতে হয়—"কবি এখানে অশ্লীল নয়, এখানে পাঠকের হৃদয় নরক!"

কেবল রবীন্দ্রনাথই যে দেশ-জননীকে ভুবন-মনোমোহিনী বলেছেন, তা নয়। আধুনিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নীচের লাইনটি লেখবার সময়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচের ভাব মনে আনেন-নি :—

"জয়মা, জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ!"

অন্যত্রও তিনি দেশজননীর "মনোমোহন রূপ" দেখ্‌তে একটুও লজ্জাবোধ করেন-নি। কারণ এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই। তারপর, আমাদের প্রাচীন সাধক কবিদেরও সকলেই জননীকে এইভাবেই বন্দনা করেছেন। যথা, রামপ্রসাদী গানে :—

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।"

সাধক কমলাকান্তের শ্যামা-সঙ্গীতেও ঐ একই কথা শুনি :—

"কালি জগমনোমোহিনী মুক্তকেশী।
মায়ের বদনশশী, মধুর হাসি
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥"

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা, তারা ও অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে জগন্মাতাকে সম্বোধন করে,

সেই সকল রূপের মধ্যেই দেশমাতৃকার রূপ দেখেছিলেন। ধর্ম্মসাধকের হৃদয়ে শ্যামার যে আসন, স্বদেশ-সাধকের কাছেও জন্মভূমির সেই আসন। দুজনেই প্রাণের আবেগে বিভোর হয়ে বলেছেন, "আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো।" এমন স্বর্গের আলোয় যে মনের কালো যায় না, সে মন অতি ভয়ঙ্কর কুৎসিত মন বলতেই হবে।

*
* *

কাব্যে নীতি

"ভারতী"তে প্রকাশিত "অতিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব" নামে প্রবন্ধটির প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে "ভারতবর্ষে" সম্প্রতি জনৈক লেখক লিখেছেন ঃ —"আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন ঃ— অধিকাংশ কাব্যে চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ......কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা।"

এই লেখকটি বঙ্কিমের উক্তি কেটে-ছেঁটে এমন কায়দায় নিজের মনের মতন করে সাজিয়েছেন, লোকে যাতে ভেবে নেয় যে, বঙ্কিমের অভিমত ছিল "কাব্যকুঞ্জবন পাঠশালার হট্টগোলে সরগরম" হয়ে উঠুক!

এখন দেখা যাক্ সত্যি বঙ্কিম কি বলছেন! ঃ—

"চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

"অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেননা, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষসৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।......কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য। অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি নিজের মনের মতন করে ঘুরিয়ে নিলে তার মানে যাই হোক, তিনি স্বয়ং যে গুরুগিরির ওকালতি করেন নি তা খুব স্পষ্ট। তাঁর সম্পূর্ণ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে কাব্য গুরুগিরি করে না; —তার সৌন্দর্য্যের কুঞ্জবনে পাঠশালার হট্ট-গোল নেই। গুরুমশায়ের হাতে থাকে নীতির মাপকাঠি বেতকাঠি; আর কবির হাতে থাকে সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠি। সেই সোনার কাঠি ছুঁইয়েই কবি মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে দেন—বেতের ঘায়ে নয়।

বঙ্কিম বলছেন, কবির মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই হচ্ছে, মানুষের চিত্ত-শুদ্ধি করা, চিত্তকে উন্নত, প্রশস্ত ও পবিত্র করা। নীতি এসে হাজার হাজার শ্লোক আওড়ালেও যা অসম্ভব থেকে যায়, যথার্থ সৌন্দর্য্য-বোধ হলে আপনিই তা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাব্যে এই স্বর্গীয়

সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশ থাকে বলেই তার গৌণ বা অপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, "চিত্তোৎকর্ষসাধন।" "নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।"—অর্থাৎ, নীতি পারুক আর না পারুক—কাব্যের মত তারও উদ্দেশ্য "চিত্তশুদ্ধিজনন"। এই হিসাবেই কবিরা শিক্ষাদাতা। কিন্তু এখানেও দুটি কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিম বলেছেন—প্রথমতঃ—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কবির প্রধান উদ্দেশ্য, "চিত্তোৎকর্ষ-সাধন" তাঁর অপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রধান ও অপ্রধানের বিরোধে প্রধানের মানই বজায় রাখতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। এইখানে আবার নীতি ও কাব্যের মধ্যে প্রভেদ। কারণ, নীতি-রাজ্যে যে উদ্দেশ্য প্রধান, কাব্য-রাজ্যে তাই অপ্রধান। দ্বিতীয়তঃ, কাব্য "চিত্তোৎকর্ষ-সাধন" করে বলে কেউ যেন ভেবে না বসেন, তার উদ্দেশ্য "নীতিজ্ঞান" বা "নীতিব্যাখ্যা"। (যথা, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে··· কবিরা নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষা দেন না") সৌন্দর্য্যের শিক্ষা ও নীতির শিক্ষা এক কথা নয়; কেননা, প্রথমটি কবির কাজ আর দ্বিতীয় কাজটি গুরুমহাশয়ের।

বঙ্কিমের উক্তির এই ব্যাখ্যাই স্পষ্ট ও স্বাভাবিক। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন-মহাশয়ও, "মানসী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিগুলি এই অর্থেই উদ্ধার করেছিলেন।

সুতরাং "ভারতী"র লেখক "কাব্যে যাহারা নীতি জিনিষটার অনুসন্ধান করে, তাহাদিগকে বিদ্রূপ" করে কিছু বলেছেন বলে, "ভারতবর্ষে"র পক্ষের উকীলটি বঙ্কিমচন্দ্রের যে নজির দিয়েছেন, তা একেবারে জাল। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কাব্য-রাজ্যে "নীতি জিনিষটার অনুসন্ধান" করেন নি, উল্টে যারা সে কাজ করে তাদের বিদ্রূপ করেই বলেছেন, "তবে হিতোপদেশ রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য।"

* *
*

ভাষার আকার ও বিকার

লেখা ও কথার ভাষা নিয়ে আজকাল কি প্রাজ্ঞ আর কি অজ্ঞ,—সকলেই বিলক্ষণ মুখর হয়ে উঠেছেন। এ তর্ক যে আজকের তা নয়। যাঁরা ভাষাকে আঁকড়ে থাকবার জন্য হাঁকুপাকু করেন, ভাষা তাঁদের কোল-জুড়ে আদুরে দুলালের মত বসে থাকে না—সে আপনার আনন্দে ছুটে বেরিয়ে যায়, এ কথা এঁরা হাড়ে-হাড়ে বুঝেও মুখে মানতে চান না। এঁদের দল সেই সনাতন কাল থেকেই গণ্ডগোল করে আসছেন। আজ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের জন্য এঁদের প্রাণ ককিয়ে উঠেছে; কিন্তু এমন একদিন গেছে, যেদিন এঁরাই তারাশঙ্করী ছেড়ে বিদ্যাসাগরী, আবার বিদ্যাসাগরী ছেড়ে বঙ্কিমী ভাষা গ্রহণ করতে বিষম আপত্তি তুলেছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমী ছেড়ে রবীন্দ্রীকে নিতেও এঁরা যে মায়া-কান্না সুরু করবেন, সেটা বেশী আশ্চর্য্যের কথা নয়। এঁদের স্বভাব হচ্ছে অনেকটা কাবুলীওয়ালার মত,—পুরানো জামা ছেড়ে নতুন জামা পরতে এঁরা সহজে রাজি হন না—যদিও শেষে সেই নতুনটাই গায়ে চেপে বসে।

পূর্ব্ববঙ্গ থেকে চলতি ভাষার প্রতি বিদ্রোহ-

ঘোষণা হয়েছে। সেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকেই কোন চিন্তাশীল লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি যে কথ্য ভাষার উপর পড়বে—আমরা তা আশা করিনি। কিন্তু ভাদ্র ও আশ্বিনের "ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনে" শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত এম এ, ডি এল, মহাশয়ের "ভাষার আকার ও বিকার" নামে প্রবন্ধটি পড়ে আমরা বড়ই আনন্দিত হয়েছি। যাঁরা আলোচন-প্রয়াসী, তাঁরা মূল প্রবন্ধের সমস্ত যুক্তি-তর্কের সঙ্গে পরিচিত হলে উপকৃত হবেন। সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা এখানে কেবল সে লেখাটির সারমর্ম্ম তুলে দিলাম।:—

"রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নানাস্তরের নানাভঙ্গী আছে। সংস্কৃতের শব্দসম্ভার, বাঙ্গলা শব্দের ইঙ্গিত, সমস্তই তিনি অতি দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া এক এক যুগে এক এক ভঙ্গীতে লিখিয়াও আগাগোড়া ভাষার ভিতর এমন একটা জোর এমন একটা প্রাণ ও বৈচিত্র্য দিয়াছেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বের কোনও লেখকের ভিতরই ছিল না। ইদানীং রবিবাবু তাঁর মধ্যযুগের সংস্কৃতবহুল ভাষা ছাড়িয়া আবার খাঁটি বাঙ্গলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ-দলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে।

ভাষার আকারটা কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে বাক্-বিতণ্ডার মত নিষ্ফল আলোচনা আর নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাবান লেখক পরের বাঁধা ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। সুতরাং আমরা মজলিশ ও বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া ভাষার একটা স্বরূপ বাঁধিয়া দিতে পারিলেও তাহার গণ্ডীর ভিতর যে আমরা প্রতিভাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিব—এটা স্পর্দ্ধার কথা। প্রকাশের বাহাদুরী না থাকিলে তুমি যত বড় ভাবসম্পদে ধনী হওনা কেন, সাহিত্যে তোমার স্থান নাই। কিন্তু প্রকাশের প্রণালী-সম্বন্ধে কোনও বাঁধা একটা মানদণ্ড করা যায় না। এ কথা বলা চলেনা যে ঠিক এমনি করিয়া প্রকাশ না করিলে তোমার ভাব বাজারে কাটিবে না। Raphael ও Reynoldsএর প্রণালী অনুসরণযোগ্য আর Rembrandt ও Turnerএর চিত্র আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না; Rembrandt যদি Raphaelএর প্রণালী নকল করিতেন, তবে তাঁহার ছবি যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভাল হইত,—এমন বলা চলে না। একই সময় সেক্সপীয়ার ও Ben Jonson কবিতা লিখিয়াছেন, Bacon দর্শন ও ব্যবহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা কি এক? Burkeকে যদি Brightএর ভঙ্গীতে বলিতে বাধ্য করা হইত, তবে কি বিসদৃশ ব্যাপার দাঁড়াইত। আসল কথা, প্রত্যেক কলাবিদের প্রণালী তাঁহার প্রতিভার ফল।

আজকালকার ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী বক্তৃতা-গুলি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে এমন একটা নূতন ভঙ্গী আসিয়াছে, এমন একটা নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহা সেকালে ছিল না। ইহা হইয়াছে চলতি ভাষাটা খুব বেশী পরিমাণে সাহিত্যের ভিতর আসিয়া পড়ায়।

যে ভাষায় যার প্রতিভা পরিস্ফুট হয়, সেইটাই তার ভাষা। যদি কোনও লেখকের ভাষা এই ওজনে ঠিক দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহাকে মন্দ বলিতে গেলে আমাদের সমালোচনা ঠিক দাঁড়াইবে না। তখন যদি আমরা দেখিতে বসি যে, লেখক কোন্ কথাটি কোন্ দেশ হইতে, কোন্ ভঙ্গীটি পূর্ব্ব বা পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ হইতে লইয়াছেন, এবং তাহা লইয়া ভাষার গুণাগুণ বিচার করিতে বসি, তবে আমাদের মর্য্যাদা হারাইতে হইবে। কারণ এ কথা এখন না মানিয়া উপায় নাই যে, শব্দের মধ্যে কুলীন-অকুলীন ভেদ নাই। সব কথাই সাহিত্যে চলিতে পারে, সুধু দেখিতে হইবে যে তাহা মানাইয়া চালান হইলে কি না, তাহাতে ভাষার শক্তি বা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা? সবুজপত্রের সম্পাদক বা রবীন্দ্রবাবুকে যাঁরা কলিকাতার কথা ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন, তাহারা রামপ্রসাদের

গানের ভিতর কোনও ভাষার ত্রুটি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সমস্ত বাঙ্গালীর মুখে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার বার আনা খাঁটি কলিকাতার ভাষা। দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধেও কেহ এ আপত্তি করেন না। বাউলের গান প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতে ভাষার প্রাদেশিকতা সকলেই অনায়াসে হজম করিয়া থাকেন। সুতরাং কলিকাতার ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বা প্রাদেশিকতার ভেজাল পড়িয়াছে বলিয়াই যে পুরাতনপন্থীরা সব সময়েই ভাষার দোষ ধরেন, এ কথা সত্য নহে। কথা উঠিয়াছে যে, রবীন্দ্রবাবু যদি কলিকাতার ভাষা চালাইতে চান, তবে আমরা কেন-না ঢাকার ভাষা চালাইব? আমি বলি কোন বাধা নাই, যদি আমাদের সে শক্তি থাকে, যাহাতে ঢাকার ভাষাকে ভাষার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারি। Burns তাঁহার প্রাদেশিক ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন সমস্ত ইংরেজ তাহাকে ইংরেজী ভাষার মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। Scottএর গ্রন্থে Scotch ভাষার ছড়াছড়ি,—তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। পুরাতনপন্থীর আপত্তি, সবাই যদি প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থ লিখে, তবে বাঙ্গলা ভাষা এক থাকিবে না, আমরা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিব না। এটা বাড়াবাড়ি। কারণ, বাঙ্গলাভাষার একটা প্রাণ আছে, তার সঙ্গে সমীকরণ না হইলে কোনও কথা বা ভঙ্গী সাহিত্যে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ কথিত ভাষা শুনিয়া বোঝা কঠিন হইলেও, লেখা হইলে বোঝা তত কঠিন হইবে না। কোনও প্রতিভাবান লেখকের লেখায় দুর্ব্বোধ কথা থাকিলে আমি চেষ্টা করিয়া তাহা শিখিয়া লইব—যেমন আমরা সবাই অল্পবিস্তর চেষ্টা করিয়া স্কটের উপন্যাস পড়িবার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি স্কচ কথার মানে শিখিয়াছি।

তবে কথা হইতে পারে যে শিক্ষানবীশদের কাছে কোন্ আদর্শ উপস্থিত করিব? প্রতিভাবান লেখকদের আদর্শই তাহাদের আদর্শ। তাহাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা—বিদ্যাসাগর হইতে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলের লেখা পড়িয়া তাহাদিগকে অবসর দিতে হইবে বাঙ্গলা ভাষার শক্তিকেন্দ্রগুলি আয়ত্ত করিতে—আয়ত্ত হইলে তাহারা আপনাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযোগী ভাষা আপনি গড়িয়া লইতে পারিবে। আমরা যতই কেন ঝগড়া করি না, আমাদের বিচারের ফল যেন ছেলেদের মুখের ভিতর গুঁজিয়া না দিই।

কথিত ভাষায় লিখিতে গেলেই যে প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িবে, তাহা নহে। কথিত ভাষায় দেশ-ভেদে যতই তফাৎ থাকুক, মোটের উপর সে ভাষারও বেশীর ভাগ কথা সকল দেশে এক, তফাৎটা কেবল উচ্চারণের। কতক কথা অবশ্য ভিন্ন, কিন্তু এত ভিন্ন নয়, যাতে তাকে এক ধাঁচে, একটা Standard dialectএ দাঁড় করান না যায়। এই শ্রেণীর প্রাদেশিক কথার সংখ্যা—সর্ব্বপ্রদেশের সাধারণ কথার তুলনায় কম। কদাচিৎ যাহা ব্যবহার করিতে হইবে সেই কথা লইয়া যে বিভ্রাট, তাহাকে অতিমাত্র বাড়াইয়া একটা ভাষার বিভীষিকার সৃষ্টি করা সঙ্গত নয়।"

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

"হেলাফেলা সারাবেলা"

শ্রীবিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪০শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৩ [১০ম সংখ্যা

স্বেচ্ছাচারী

শশিভূষণের ভৃত্য রঘুলাল প্রভাতে উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়াই দেখে, বাড়ীর রোয়াকের উপর কে-একজন শুইয়া আছে। দরজা খুলিতেই সেই ব্যক্তি ফিরিয়া বলিল, "কে ? ঠাকুর দা ?".

রঘুলাল তাহার মুখের দিকে চাহিল, মুখখানা যেন চেনা-চেনা বোধ হইল। সে প্রশ্ন করিল,

"আপনি কে ? কাকে খুঁজছেন ?"

"শশিবাবুকে। তিনি বাড়ীতে আছেন ?"

"আছেন, এখনো ওঠেননি।"

"সর্ব্ববাবু ?"

"তিনিও আছেন। আপনি চোখ বুজে রয়েছেন কেন ?"

"আমার চোখে আলো সয় না, তাকাতে পারি না। আমায় ওপরে নিয়ে যেতে পার ?"

রঘুলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আসুন।"

"আসব কি করে ? আমার হাত ধর।"

"এলেন কি করে ?"

"রাত্তিরে এসে এখানে শুয়ে আছি। রাতে আমার কষ্ট হয় না। তুমি আমায় ওপরে নিয়ে চল।"

রঘুলাল কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। যেন কবর হইতে উঠিয়া-আসা মানুষ! রঘুলাল একবার ভাবিল, নিশ্চয় পাগল; আবার ভাবিল বাবুদের নাম করিতেছে যখন তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেনা মানুষ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ সেইমাত্র দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখে, কার্ত্তিক!

এই দুদিন পূর্ব্বে সে পত্র পাইয়াছে যে কার্ত্তিক তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। ইহারি মধ্যে সে এমনভাবে এখানে আসিয়া উপস্থিত! সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি রঘুলালের

হস্ত হইতে কার্ত্তিকের হস্তটা টানিয়া লইয়া বলিল, "কার্ত্তিক!"

কার্ত্তিক। হ্যাঁ আমিই বটে—

সর্ব্ব। কিন্তু চেহারা দেখে যে তা বোধ হচ্চে না। মনে হচ্চে যেন পরলোক হতে তোমার Spiritটা ফিরে এসেছে।

কার্ত্তিক। পরলোক হতেই বটে, এখন ইহলোকে কি হয় তাই দেখতে এসেছি। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমায় তোমার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।

সর্ব্বানন্দ তাড়াতাড়ি তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "আর কে এসেছে?"

কার্ত্তিক বলিল, "আর কেউ নয়—আমি একলা এসেছি।"

সর্ব্ব। একলা? এই অবস্থায়?

কার্ত্তিক। হ'লেই বা এই অবস্থা, তবু আমি মুক্ত তাই আসতে পেরেছি, বদ্ধ থাকলে নড়তে-চড়তে পারতাম কি? শৈল আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সর্ব্বানন্দ ভীত হইয়া বলিল, "সে কি? শৈল? সে কেমন আছে?

কার্ত্তিক। সে ভালই আছে বোধ হয়—তাকে সুস্থই দেখে এসেছি।

সর্ব্ব। তবে?

কার্ত্তিক। তবে আর কি? সারা জীবনের সাধনা ফলেছে, সে আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

সর্ব্ব। বুঝতে পারলাম না।

কার্ত্তিক বলিল, "ভাই, আর কথা কইতে পারছি না। কাল থেকে একপ্রকার অনাহারে আছি। একজন আমায় অন্ধ দেখে দয়া করে কিছু খেতে দিয়েছিলেন তাই বেঁচে আছি। তিনি কলকতা আসছিলেন, আমাকে একখানা গাড়ী ভাড়া করে তুলে দিয়েছিলেন তাই তোমার এখানে আসতে পেরেছি। ভাড়াও তিনি দিয়েছেন, আবার পাঠিয়ে দিতে হবে। এখন আমি একটু ঘুমুব, তারপর সব কথা বলব। জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।"

সর্ব্বানন্দ তাহাই করিল। তারপর বাহিরে গিয়া শশিভূষণকে ডাকিল। শশিভূষণ বাহিরে আসিয়া বলিল, "ডাকাডাকি কেন?" সর্ব্বানন্দ তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাইত, এখন উপায়?"

"উপায় আর কি, নিশ্চয়ই ও পালিয়ে এসেছে। এখনি টেলিগ্রাম করতে হবে—তুমি ডাক্তার ডেকে আনো, আমি টেলিগ্রাম করে আসি।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "শরীরের ওপর দিয়ে ভয়ানক অত্যাচার গিয়েছে। এখন বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত, তবে—"

শশিভূষণ বলিল, "তবে আর কিছু নেই। সবই ভগবানের হাত। আপনি যদি দরকার বোঝেন আর যাকে হয় সঙ্গে করে আনতে পারেন। মোদ্দা প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।"

দশ বার দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর কার্ত্তিক প্রথম যখন সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিল, তখন নিশীথ রাত্রি। মৃদু আলোকে কক্ষটি আলোকিত, তাকের উপর একটা ঘড়ি টক্‌টক্‌ করিতেছে। দূরে কে একজন একখানা আরাম-চেয়ারে শুইয়া

ঘুমাইতেছে। কার্ত্তিক মাথা তুলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দেখিল, শিয়রে কে একজন বসিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। এ কি! এ কে? কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া মাথা নামাইয়া বলিল, "কে আপনি?

উপবিষ্ট ব্যক্তি চমকিত হইয়া বলিল, "আমি সরোজ।"

কার্ত্তিক। "সরোজ? কে সরোজ? শৈল কৈ?"

সরোজ লজ্জিতভাবে বলিল, "আপনি যে কলকাতায় এসেছেন, আপনাকে আমরা—"

কার্ত্তিক। কলকাতায়? কলকাতায় আমি কি করে এলাম? কে আনলে?

সরোজ। সে কথা পরে শুনলেই হবে। আপনি চুপ করে এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

কার্ত্তিক। না না তা হবে না, কলকাতায় আমি কি করে এলাম? শৈল এনেছে বুঝি? আমার কি খুব অসুখ বেড়েছিল? কৈ কিছু মনে পড়ছে না ত? শৈল ঘুমুচ্ছে?

সরোজ। তিনি এখানে নেই।

কার্ত্তিক। সে কি! কোথায় সে?

সরোজ। বোধ হয় বাড়ীতেই আছেন।

কার্ত্তিক। তবে আমায় কে আনলে? কি করে এখানে এলাম? এ কার বাড়ী? ও কে শুয়ে রয়েছে?

সরোজ। উনি সর্ব্ববাবু।

কার্ত্তিক। সব্ব-দাদা? কি আশ্চর্য্য! আমার কিছুই মনে পড়ছে না যে! কবে আমি এখানে এসেছি?

সরোজ। আজ বার দিন হ'ল।

কার্ত্তিক। আপনি কি করে আমার খবর পেলেন? সব্ব-দাদা ডেকে এনেছে বুঝি? সব্ব-দাকে ডাকুন।

সরোজ। উনি এই ক'রাত্রি জেগে আজ একটু ঘুমিয়েছেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি?

কার্ত্তিক। কিছু না—আপনি বসুন। বার দিন হ'ল এসিছি!

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। কিন্তু কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। শিবরামপুর হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে কলিকাতা আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই ভীষণ যন্ত্রণার আক্রমণে সংজ্ঞালোপের সঙ্গে-সঙ্গেই, স্মৃতি হইতেও লোপ পাইয়া ছিল। ক্ষণকাল বিফল চেষ্টার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু শৈল এল না কেন?"

সরোজ নীরবে রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় ঐ প্রশ্ন করায় বলিল, "তাত' আমি জানি নে—তাঁকে আনতে সর্ব্ব-বাবু গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর কি হয়েছে সর্ব্ব-বাবু আমায় বলেন-নি।"

কার্ত্তিক পুনরায় নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কলকাতায়—শৈল নেই! আচ্ছা, বাবা কৈ?"

সরোজ। তিনিও আসেন-নি।

কার্ত্তিক হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে সর্ব্বানন্দ জাগিয়া উঠিয়া সরোজকে বলিল, "একি, আমায় তিনটের

সময় জাগাওনি কেন? কেমন আছে কার্ত্তিক? রাত্রে আর কিছু করে-নি? যা তা বকে-নি?"

"না" বলিয়া সরোজ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের নিকটে আসিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষার জন্য গায়ে হাত দিবামাত্র সে চক্ষু মেলিল। সর্ব্বানন্দ বলিল, "এখন কেমন বোধ হচ্চে কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক। ভালই বোধ হচ্চে সব্ব-দা, আমার কি খুব অসুখ করেছিল?

সর্ব্ব। তা তোমার মনে পড়ছে না?

কার্ত্তিক। না, এ তোমরা কোথায় আমায় এনেছ বলত? শিবরামপুরের একটা ঘরে শুয়ে ছিলাম—রাতে জেগে দেখি এক অচেনা জায়গায় এসেছি—মাথার শিয়রেও এক অচেনা মানুষ।

সর্ব্ব। অচেনা মানুষ! সরোজকে চিনতে পার-নি?

কার্ত্তিক। প্রথমে পারিনি। কিন্তু কি করে যে এখানে এলাম তা আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

সর্ব্ব। তোমার অসুখ সারুক, তারপর বলব। যে ব্যাপার লাগিয়েছিলে তাতে আমাদেরই সব ভুল হয়ে গিয়েছিল তা তোমার! যাক, মুখে দুটো কুলি করে এই ওষুধটা দাও।

যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সারিয়া সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন চল্লাম।"

কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

সর্ব্ব। ভয় নেই, তুমি ভাল জায়গাতেই আছ। বাগবাজারে ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়িতে আছ। এঁরা তোমার যা করেছেন তা কোন আত্মীয়তেও করে না।

কার্ত্তিক। তা ত' বুঝতেই পারছি; কিন্তু এখানে কেন আনলে?

সর্ব্ব। সব কথা পরে জেনো ভাই, আর হয়তো আপনিই মনে পড়বে। দুদিন মাথাটা হতে বিকারের ঘোর কাটুক। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, এঁরা তোমার আপনার লোক। আর সরোজ—

কার্ত্তিক। কৈ তিনি?

সর্ব্ব। তাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—বেচারী সারারাত জেগেছে।

কার্ত্তিক। না না ডেকো না—সব্ব-দাদা, তুমি জেনেশুনে কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে!

সর্ব্ব। আমি জেনেশুনেই এনেছি—ভালোর জন্যই এনেছি। সব কথা পরে বলব।

সর্ব্বানন্দ আর দাঁড়াইল না। কার্ত্তিক চুপ করিয়া শুইয়াছিল। হঠাৎ মুক্ত গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরটা এত সুন্দর এত উজ্জ্বল হইল কি-করিয়া! কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আসিয়া ঐ রক্তাভ প্রভাত আকাশে, গৃহের ঐ-সব ছবিগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! কার্ত্তিক অবাক হইয়া তাহার নূতন ফিরিয়া-পাওয়া নয়ন দুইটী দিয়া আলোক-সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার অন্তরও আলোকে ভরিয়া উঠিল। বহুক্ষণ একদৃষ্টে আকাশের দিকে তন্ময়ভাবে চাহিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ কাহার পদশব্দে ফিরিয়া

দেখে, সরোজ এবং আর-একজন অপরিচিতা রমণী। কার্ত্তিকের সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যেন একটা ভয়ানক ধাক্কা খাইয়া একেবারে শয্যার আর এক প্রান্তে সরিয়া গেল। তাহার খাটের শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি জেগেছেন?"

কার্ত্তিক উত্তর দিল না। আর কোন শব্দ না পাইয়া দ্বিতীয় রমণী বলিল, "উনি বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

সরোজ। তবে যে সর্ব্ববাবু আমায় আসতে বল্লেন! ডেকে দেখব সুকু?

সুকুমারী। না, ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ কি! তুমি না হয় ব'স, আমি কাজ সারি না।

সুকুমারী চলিয়া গেল। সরোজ দু-এক-বার ইতস্ততঃ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই, সেই সরোজ! চির-ব্যবধানময় চিররহস্যময় সেই অন্ধ রমণী! ঐ সেই অন্ধনয়নদুটী, যাহার অতল অন্ধকারের গোপন শক্তি তাহার উপর কতনা অত্যাচার করিয়াছে। আজ যেন সেই শক্তিময়ী মূর্ত্তি ঝড়বৃষ্টির পর রৌদ্রোদ্ভাসিত অপসরণশীল মেঘের মত দূর দিগন্তে চলিয়া পড়িয়াছে।

সরোজকে নীরবে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের সমস্ত স্মৃতিই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই ছয় সাত বৎসরের ভয়ানক দুর্য্যোগ তাহার মনের চতুর্দ্দিকে ছবির ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে ঘিরিয়া ধরিল। কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সরোজ, আর কেন, আমায় ছেড়ে দাও! একজন বাইরের মুক্তি দিয়েছে, তুমি ভিতরকার মুক্তিটাও দাও।"

সরোজ চমকিত হইয়া চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। কার্ত্তিক আবার বলিল, "এই এতবড় অত্যাচার আমি তোমার জন্য সহ্য করলাম—"

সরোজ। আমার জন্য!

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, তোমারই জন্য—তোমারই জন্য আমার দৃষ্টি যেতে বসেছিল, তোমারই জন্য সব শক্তি হারাতে বসেছিলাম, এমন-কি তোমারই অন্তরের অন্ধকার মানুষটা আমাকে চির-অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, অন্তরে বাইরে আমি মরতে বসেছিলাম। কিন্তু ভগবান দয়া করে মেরে ধরে আমায় সব ভুলুচ্ছেন; আমি আবার আমার নিজেকে ফিরে পাচ্ছি। তুমি দয়া করে আমায় মুক্তি দাও।

সরোজের অন্ধনয়ন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আলোক নিবিয়া গেল। সে দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আমি—আমি, আমারই দোষ! তুমি নিজে এই অঘটন ঘটিয়ে আমার সব নষ্ট করে দেবার উদ্যোগ করে, আত্মীয়-স্বজন সকলের ওপর অত্যাচার করে এখন অন্ধ নারীর ওপর সব দোষ চাপাচ্ছ? আমি কি করেছি, কি করতে পারি আমি? কোথায় এককোণে পড়ে থাকতাম, কেউ আমার কথা জানতেই পারত না। তুমিই আমার গোপনতা নষ্ট করে এখন সমস্ত দোষের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছ! মানুষ এত অবিচারক এতবড় নিষ্ঠুর হতে পারে তা জানতাম

না। আমি চক্ষু হারিয়েছিলাম কিন্তু নিজেকে হারাই নি; কিন্তু তুমি দস্যুর মত আমার তাও কেড়ে নিচ্ছিলে—ভগবান বাঁচিয়েছেন, নইলে—"

কার্ত্তিক আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "থাম—থাম, তুমি রাক্ষসটাকে আর জাগিও না। এযে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা,—এতো দেবতার সুধার পিপাসা নয়! আমার মধ্যে এ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তুমিই ত' একে জাগিয়ে ছিলে?"

সরোজ। না, আমি জাগাই নি—আমি ওকে চিনি না—জানি না। আমি অন্ধ, আমি সামান্য নারী—আমার কি ক্ষমতা যে রাক্ষস নিয়ে খেলা করি? তুমি নিজে তাকে জাগিয়েছিলে, ভগবান তাকে মারছেন। যে যা চায় ভগবান তাকে তাই দেন, তুমি দেবতাকে চাওনি, দৈত্যকে চেয়েছিলে তাই পেয়েছিলে; আমি কি চেয়েছিলাম তা অন্তর্য্যামী জানতেন তাই সেই জিনিষ আমি পেয়েছি।

সরোজ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কার্ত্তিক চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "সরোজ, এই আমার নবপ্রভাতটাকে চোখের জল দিয়ে ম্লান করে দিও না। আলো যে এত সুন্দর তা ত' জানতাম না। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমি বেঁচেছি। তুমি আমায় ভুলে যাও—রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত আমাকে মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। রাক্ষস বলে ভেবো মানুষ বলে নয়, দুঃখী বলে নয়, ব্যথিত বলে নয়—স্বেচ্ছাচারী অহংকারী হত্যাকারী বলে মনে করো, তা-হ'লে আমায় ভুলতে পারবে। ঘৃণা করতে চেষ্টা করো তাহ'লেই সব সহজ হয়ে আসবে। আমি তোমায় ভয় কর্‌ছি, তুমি আমায় ঘৃণা ক'রো। বল, পারবে?"

সরোজ চুপ করিয়া রহিল। কার্ত্তিক পুনরায় বলিল, "কেন পারবে না? আমি কি মানুষ? আমি কি মানুষের মান্য জানি! ভক্তি ভালবাসা আমার যে কিছুই নেই। নইলে এমনটা কি কেউ করতে পারত? আমি তোমার দোষ দিচ্ছি বটে, কিন্তু সেটা কেবল মনকে চোখ ঠারা হচ্ছে। তবু আমায় তাই করতে হবে, তোমায় ভয়ই করতে হবে, নইলে যে উপায় নেই, নইলে মুক্ত হব কি করে?"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি মুক্ত হও, সুস্থ হও, আমি যে চিরদিন ভগবানের কাছে এইটেই প্রার্থনা করে আসছি। তুমি যা আমায় দিয়েছিলে তাতে যে আমার কোন অধিকার নেই, এই কথাটাই যে চিরদিন আমি আপনাকে বুঝিয়েছি। আমি ত কখনো কিছু চাইনি, তুমিই ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে দিয়ে সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছ। কিন্তু আজ যখন শান্ত হয়েছ তখন তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। তুমি যা দিয়েছিলে তা যে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর—কে তা সহ্য করবে? তুমি আমায় বিশ্বাস কর—আমি কিছু চাই না। তুমি ভুল বুঝ না, আমি কখনো কারও কাছে কিছু চাই-নি, চাইব না। ভগবান যখন 'আমায় অন্ধকারে ডুবিয়ে

রেখেছেন, তখন তাই আমার স্বর্গ। কিন্তু তোমাকেও আমার. এক অনুরোধ, তুমি যাকে ছেড়ে এসেছ তাকেই তোমার অন্তরের মানুষটি চাইছেন। এই ব্যারামের বিকারের অবস্থাতেও সেই তোমার অন্তর্য্যামীর কোলে বসেছিল, আমি দেখতে পেয়েছি। স্নেহ-ভালবাসা কি মানুষকে এমন করে পোড়ায়? তোমার ব্যাধির দুষ্টু ক্ষিদে সেরে গিয়েছে, এইবার সুস্থ হও। আমি যা পেয়েছি তাই আমার পরম লাভ,—তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমার কোন দুঃখ নেই—আমাকে ভয় করার কিছু দরকার নেই।"

সরোজ কার্ত্তিকের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। কার্ত্তিক চুপ করিয়া রহিল। তাহার উত্তেজনা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল, সরোজের অন্ধ নয়নের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচলাম সরোজ, তুমি আমায় বাঁচালে। তুমি যে হার মেনেছ, আগে হলে এইটেকেই বড় করে দেখতাম, কিন্তু তোমার পরাজয়কেই এখন আমার সব চাইতে ভয় হয়েছিল।"

সরোজ। আমায় ভয় করবার কিছু নেই—বরঞ্চ তোমাকেই তোমার ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী শক্তিটাকেই আমার ভয় ছিল। কিন্তু তোমার মাথার শিয়রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়ে আমার সব ভয় চলে গিয়েছে—আমি যে তোমার অন্তর্য্যামীর অন্তরের কথা টের পেয়েছি। সে যে কি চায়, কাকে চায় তুমি এতদিন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো নি, তাই মরীচিকার পিছনে ছুটেছিলে।' কিন্তু আর তাঁর কথা না-শুনবার যো নেই—তিনি জেগেছেন, ভগ্নী শৈল চিরায়ুষ্মতি হোক—সে জিতেছে। আমারও ভয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন তোমার কোন ভয় নেই। ভয় যতদিন ছিল কেবলই পুরাণের হিরণ্যকশিপুর মত কংশের মত রাবণের মত তোমাকে ভয়ঙ্কর ভেবেছি, কেবলি তোমার প্রচণ্ড আকর্ষণে চারদিকে তোমাকেই দেখেছি। ভগবান সে ভয় আমার কাটিয়ে দিয়েছেন—তাঁকে প্রণাম করি।

সরোজ উঠিয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া তাহার অন্ধনয়ন মুদিত করিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল। তাহার দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল—যেন সে নয়ন না থাকাতে তাহার সমস্ত দেহ দিয়া দেব-আশীর্ব্বাদের আলোককে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিল।

তারপর অতি আনন্দে তাহার ও কার্ত্তিকের দিনগুলি কাটিয়া গেল। শেষে একদিন সে সরোজকে বলিল, "সরোজ, বাড়ী যাব।"

সরোজ। শশি-দাকে বল।

কার্ত্তিক। বলেছি, সে বলে আরও দু-দিন যাক।

সরোজ। তুমি ত এখন উঠতে পার না, এত তাড়াতাড়ি কেন?

কার্ত্তিক। সরোজ, আমি ক'দিন থেকে ভাবছি তুমি আমার সঙ্গে শৈলের কাছে চল, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

সরোজ। ওগো অন্ধ মানুষ, তার কিছু দরকার হবে না।

কার্ত্তিক। না সরোজ হবে—আমি তার অন্তরটাকে যে একেবারে শুকিয়ে দিয়ে এসেছি। নৈলে সে একবারও আমার খোঁজ নিলে না

সরোজ। যদি শুধু খোঁজ নিত তাহলেই ভয়ের কথা ছিল, যখন নেয়-নি তখন কোন ভয় নেই। তোমার বাবাও ত খোঁজ নেন নি, কিন্তু তিনি কি তোমায় ভুলতে পারেন? তুমি যে একেবারে তাঁর বুকের মানুষটার অংশ। আমরা প্রতিদিন তাঁদের পত্র দিয়েছি। আর সর্ব্ব-দাদা যা দেখে এসেছেন তা যেদিন শুনবে সেদিন তুমি এক মিনিটও এখানে থাকতে পারবে না।

কার্ত্তিক। আমি তাই শুনব সরোজ, তাই তুমি আমায় বল। বাবা আমার জন্য কি করেছেন? মা গিয়েছেন, বাবা আছেন, তবু আমি এমন পিতৃমাতৃহারার মত হয়ে রয়েছি কেন? তিনি কেন এলেন না? আর শৈল—আমার সর্ব্বংসহা শৈলজা—না সরোজ, আমি আজই যাব, তুমি নিয়ে চল।

সরোজ হাসিয়া বলিল, "অন্ধ মানুষের উপর নির্ভর করছে—"

কার্ত্তিক। খোঁড়ামানুষে। তুমি সব্ব-দাদাকে ডাকিয়ে পাঠাও—রাসকেলটা সারা-দিন আমার ওপর পাহারা বসিয়ে আমাকে সত্যি-সত্যি খোঁড়া করে দেবে দেখছি। না, আর তা হচ্চে না—আমি শুয়ে থাকব না—এই আমি উঠলাম—আর শোবো না।

কার্ত্তিক সত্যসত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। সরোজ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "চল, ছাতে গিয়ে বসবে, বেলা পড়ে এসেছে।"

কার্ত্তিককে একখানা আরাম-কেদারায় শোয়াইয়া সরোজ বলিল, "তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি আবার এসে নিয়ে যাব।"

সরোজ চলিয়া গেলে কার্ত্তিক সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিল।

বেল-যুঁই-চামেলী সেই কৃত্রিম উদ্যানে আবার তেমনি শোভায় তেমনি গন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানটির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব নিপুণতার একটা আন্তরিক স্নেহের একটা গভীর অচঞ্চল আনন্দের অস্তিত্ব যেন সমস্ত লতায়-পাতায়-পুষ্পে-গন্ধের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। এই উদ্যানখানি যেন স্বয়ং সরোজ। কার্ত্তিক হাত বাড়াইয়া একঝাড় জুঁই-পুষ্পের স্তবক স্পর্শ করিতে করিতে মনে মনে সরোজকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তারপর শুভদিনে কার্ত্তিক, সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে লইয়া শিররামপুর যাত্রা করিল। গ্রামে পৌঁছিয়াই সরোজ ও সর্ব্বানন্দকে শৈলজার নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং পিতার নিকট চলিয়া গেল।

সর্ব্বানন্দ ও তৎপশ্চাতে একজন অপরিচিত রমণীকে দেখিয়া শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি সর্ব্ব-দাদা! ইনি কে?"

সর্ব্বানন্দ। ইনি সন্ধির দূত। ইনিই তোমার সরোজ-দিদি, এঁকে প্রণাম কর।

শৈলজা প্রণাম করিতেই সরোজ হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমি যে অন্ধ ভাই, তোমার হাতখানা আমায় দাও।"

শৈলজা তাহার হাত ধরিতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি এখন খুড়ো-মশাইয়ের কাছে চল্লাম সরোজ!"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "যাও—কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে নেব।"

সর্ব্বানন্দ চলিয়া গেলে সরোজ বলিল, "কোথায় বসব?"

শৈলজা তাহাকে একখানা পালঙ্কে বসাইয়া বলিল, "আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি কিন্তু আপনাকে কখনো দেখিনি।"

সরোজ। এখন দেখতেও পেলে, কিন্তু আমি কখনই তোমায় দেখতে পাব না। তোমার মুখখানায় আমায় একবার হাত দিতে দেবে?

শৈলজা তাহার হাতখানা লইয়া তাহার মুখের উপর রাখিতেই সরোজ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার ত' জয় হবেই ভাই—তোমার পলাতক মানুষটিকে এনে পৌছে দিয়েছি; আমাদের শেষ চিঠি পেয়েছিলে?"

শৈলজা। পেয়েছিলাম। আপনাকে প্রথমে কত কি ভেবেছি, কিন্তু আপনাকে দেখে কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে আপনি কি করে ওঁকে এমন করেছিলেন। আপনার মধ্যে এতবড় আগুণ কোথায় ছিল যাতে ঐ মানুষটা এমন হয়ে পুড়ে ছাই হতে বসেছিল?

সরোজ। ভুল, ভাই, ভুল—আমি জ্ঞানতঃ কোন অপরাধে অপরাধী নই ত'! তবে বোধ হয় যার জীবন ঠিক খড়ের গাদার মত, পুড়বার শক্তি তারই থাকে,—একটা স্ফুলিঙ্গ বা দিয়াশলাইএর কাঠির কতটুকু শক্তি যে, সে অগ্নিকাণ্ড করে?

তারপর শৈলজা ও সরোজ বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। শেষে সরোজ বলিল, "ভাই, মান-অভিমান কিছুই নয়, সেইজন্য বলছি ও-সব কথা জীবনে কখনো তুলো না। ওতে তুমিও সুখী হবে না, সেও নয়। কি হবে দুটো অন্যায়কে মনে রেখে? দুঃখটাকেই চিরদিন মনে রাখতে হবে, সুখকে নয়? তুমি যা হারিয়েছিলে বলে মনে করে রেখেছ, তাই ভগবানের খাতায় জমার ঘরে পড়েছিল সে খোঁজ ত' তুমি পাওনি! উনি তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে তোমার সেই জমার ভাণ্ডারটা নিজে ঘাড়ে করে এনেছেন। এখন স্বেচ্ছাবন্দীকে বন্দী কর। আশীর্ব্বাদ করি, এবারকার বন্ধন যেন মঙ্গলের হয়।"

শৈল। কিন্তু তুমি? তোমার কি হল?

সরোজ। আমি? আমার জন্য ভেবো না, আমি লাভই করেছি। যে লোকসান হতে বসেছিল তা হতেই ভগবান এমন বস্তু লাভ করিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার এই ভিতরকার চির-অন্ধকার একেবারে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে।

শৈল। কি তা?

সরোজ। তা না-হয় নাই শুনলে।

শৈল। তা হবে না দিদি, আমায় শুনতেই হবে।

সরোজ। আমি যদি না বলি?

শৈল। তাহলে আমার যেমন হচ্ছে সেইরকম একটা-কিছু অনুমান করে নেব। না সরোজ-দিদি, আমায় বলতেই হবে।

সরোজ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হয়তো তাতে তোমার দুঃখ হবে।"

শৈল। তা হোক, তবু আমি শুনব।

শৈলজা ও সরোজ মুখোমুখী হইয়া বসিয়াছিল। সরোজ খুব জোরে শৈলজার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। শৈলজা একদৃষ্টে

সরোজের অন্ধ চক্ষুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বল।"

সরোজ সজলনয়নে বলিল, "জানি না, তুমি আমার কথা বুঝবে কি না—তবু তোমায় বলতেই হবে; কারণ তোমার সঙ্গে একটা বুঝা-পড়া হওয়ার দরকার। আমি যা পেয়েছি তার নাম ভালবাসতে পারা। সংসারে যারা স্নেহ করতে স্নেহ দিতে পায় না তারাই সব-চাইতে হতভাগ্য। আমি যে তাঁকে ভালবাসতে পেরেছি তাই আমার পরম ভাগ্য। আমার মত অন্ধ হতভাগার অন্ধকার মনের মধ্যে কেউ কি ঢুকতে যেতো? কেউ না। উনিই সেই অন্ধকারকে ভেদ করে ঢুকেছিলেন। সেইটেই আমার পরম লাভ। আমি আর-কিছু চাই না—চাইব না; কারণ আর-কিছু পাওয়া আমার উচিত নয়—আমায় সইবে না।"

শৈল। কে বল্লে সইবে না—আমি বলছি নিশ্চয় সইবে! আমি তোমায় যেতে দেবনা।

সরোজ। ভুল বুঝ না বোন—আমার এর-চাইতে বেশী পাওয়া হবে না, আমি যা চাই তা কি কারুর হাতে করে এনে দেবার সাধ্য আছে? কতটুকু দিয়ে তুমি আমায় সন্তুষ্ট করবে? তুমি ত' ভাই মেয়ে-মানুষ—তুমি ত জান, কত-বড় আমাদের ক্ষিদে! সেই ক্ষিদে তুমি কতটুকু দিয়ে পুরুবে? তার চাইতে এই যা পেয়েছি এইটুকু যাতে না হারাই তাই আমায় করতে হবে। ভালবাসা এসেছে, তাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে না ভালবাসতে জানে সে কি দুঃখের সংসারে কোন কাজে লাগে? সেই শুকনো প্রাণ যে কেবল শুকিয়ে দেবার জন্যই সংসারে ঘুরে মরে। তুমি বেশ করে বুঝে দেখ, তুমি যা দিতে চাচ্ছ তাতে আমার অন্তর ভরবে না—অতএব মিছে চেষ্টা ক'র না। উনিও তাতে কষ্ট পাবেন, আমিও পাব।

শৈলজা চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ বলিল, "এইবার বুঝেছি, তুমি কি! তুমি এমন নইলে ঐ অতবড় প্রচণ্ড শক্তিকে এমনভাবে জাগাতে পার! দিদি, তুমি এ-দেশের এই রাতদিনের মানুষ নও—যে দেশ আলো-আঁধারের একেবারে ওপারে, তুমি সেই দেশ থেকে এসেছ। তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে—"

"থাম, থাম—আমিও মানুষ ভাই—"

শৈলজা থামিল না; সরোজের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিল। আর সেই অশ্রুবন্ধনে এই দুই রমণীর চিত্ত চিরকালের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ

(২) তুরস্ক

প্রায় সাতশত বৎসর আগেকার কথা। একদিন এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আই-কনিয়াম রাজ্যের সেলজুক-বংশীয় সুলতান কাইকোবাদ, আঙ্গোরার কাছে একদল মঙ্গোলিয়ান সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাহারা সুলতানের অনুচরদের পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর হয়। এমন সময় কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে একজন যুবক ঘটনাক্রমে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং মঙ্গোলিয়ানদিগকে প্রতি-আক্রমণ করিয়া সুলতানকে উদ্ধার করেন। এই যুবকের জন্মস্থান খোরাসানে। তিনি সুলতান কাইকোবাদকে চিনিতেন না। মাঙ্গোলিয়ানরা খোরাসান ধ্বংস করিবার পর তিনি অনুচরবর্গের সহিত আনাটলিয়া অভিমুখে যাইতেছিলেন; রাস্তায় আঙ্গোরার কাছে দৈবাৎ তাঁহার সহিত বিপন্ন সুলতানের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি মঙ্গোলিয়ানদের হাত হইতে সুলতানকে উদ্ধার করেন। এই গৃহহীন যুবকই বর্ত্তমান তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তুরস্কের সুলতানগণ ইঁহারই বংশধর। ইঁহার নাম আরতথ্রুল—ইনি জাতিতে ওখুজবংশীয় তুর্কী।

আরতথ্রুলের পর আজপর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশ জন সুলতান তুরস্কের সিংহাসনে ক্রমান্বয়ে আরোহণ করিয়াছেন। ইউরোপের অন্য কোন দেশে একবংশের এতজন নরপতি ক্রমান্বয়ে আর-কখনো রাজত্ব করেন নাই। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কাইকোবাদ তাঁহার রাজ্যের এস্কিশের নামক একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ আরতথ্রুলকে দান করেন। এইখানেই ভাবী তুরস্ক-সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। আরতথ্রুল যখন কাইকোবাদকে মঙ্গোলিয়ানদের হাত হইতে উদ্ধার করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই-যে এই কার্য্য দ্বারা তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ১২৫৮ খৃঃঅব্দে এস্কিশেরে আরতথ্রুলের পুত্র ওস্মানের জন্ম হয়। এই ওস্মানকেই তুর্কীরা তাহাদের প্রথম সুলতান বলিয়া জ্ঞান করে এবং ওস্মানের নামানুসারেই নিজেদের "ওস্মান-লি" বলিয়া অভিহিত করিতে গৌরব অনুভব করে। আগে তাহারা কখনো "তুর্কী" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিত না। তাই ইউরোপের অন্যান্ত জাতিরা তাহাদিগকে "অটোম্যান" বলিয়া ডাকিত। বর্ত্তমানে তুরস্ক নিতান্ত হীন-দশাপন্ন, সুতরাং অধিবাসীরাও এখন সামান্য "তুর্কী" নামেই তুষ্ট।

ওস্মানের সময় হইতেই তুরস্কের বিস্তার আরম্ভ হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসরের মধ্যেই তুরস্কের অধিকারভুক্ত ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ত্রিশলক্ষ বর্গমাইল হইয়া দাঁড়ায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত সুলতান Sulyman the Magnificent বা "মহামহিম সুলেমানের" রাজত্ব-কালে তুরস্কের রাষ্ট্রীয়শক্তি পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেই সময় ইউরোপ এবং

এশিয়ায় প্রায় একসঙ্গে অনেকজন বিখ্যাত নরপতির আবির্ভাব হয়ঃ—যথা, ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথ, ফ্রান্সে প্রথম ফ্রান্সিস্, জর্ম্মানিতে পঞ্চম চার্লস, পোল্যাণ্ডে সিগিস্-মুণ্ড, রুষিয়াতে ইভান, পারস্যে শাহ ইস্মাইল ও ভারতবর্ষে আকবর। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই সুলেমানের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না। "ভারতে ধন, ফ্রান্সে জ্ঞান, এবং তুরস্কে শ্রী"—ইউরোপে এই প্রবাদের সৃষ্টি সুলেমানের সময়ই হইয়াছিল। তখনকার ইউরোপে তুরস্কের প্রতিপত্তির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুলেমানের সময়ই তুর্কীরা ভিয়েনা নগর অবরোধ করিয়াছিল। সুলেমান হাঙ্গেরি রাজ্য জয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ভ্রাতা ফার্দিনান্দ্ সুলতানের প্রতিনিধিকে পরাজিত করিয়া হাঙ্গেরির সিংহাসন অধিকার করেন। সুলেমান এই সংবাদ পাইয়া তখনই আর্চ্চ-ডিউক ফার্দিনান্দকে লিখিয়া পাঠান, "ফার্দিনান্দ, আমি শীঘ্রই ভিয়েনায় আসিয়া তোমার সঙ্গে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন করিব। আমার সঙ্গে তেরটি রাজ্যের লোক থাকিবে।" সত্যসত্যই কিছুদিন পরে সুলেমান হাঙ্গেরিরাজ্য পুনরধিকার করিয়া প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া ভিয়েনার সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন তুরস্কের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ কিরূপ থরহরি কম্পিত হইয়াছিল—তাহা সেই সময়কার একটি জর্ম্মান কবিতা হইতে বুঝা যায়। তার মর্ম্ম এই—"তুর্কীরা বলবান, তুর্কীরা ধার্ম্মিক, তাই ভগবান তাহাদের প্রতি সদয়! তাহারা হাঙ্গেরি নিয়াছে, অষ্ট্রীয়া নিয়াছে, ব্যাভেরিয়াও প্রায় নিল। ঐ বুঝি রাইনের তীরে তাহাদের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল! হায়, স্বখাত-সলিলেই আজ আমরা ডুবিয়া মরিতেছি!" আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখন ধর্ম্মবীর লুথার তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লুথার বলিয়াছিলেন—"তুর্কীদের আসিতে দাও; তাহারা আমাদের চেয়ে দশগুণ অধিক ধার্ম্মিক।" ইউরোপের অনেক নৃপতি সুলেমানের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস সুলেমানের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অর্থাদি উপঢৌকন দিতেন। তাই সুলেমান গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, "ফ্রান্সিস্ আমার করদ রাজা না হইলেও—অনেক করদ রাজা অপেক্ষা আমার অধিক বাধ্য।" সম্রাট মাক্সিমিলিয়ানও তুরস্ককে রীতিমত কর প্রদান করিতেন। ছোট ছোট রাজার ত কথাই নাই। সুলেমানের সময় সুশাসনের জন্য তুরস্ক ইউরোপের একটি আদর্শ সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহার রাজত্ব-কালে তুর্কী সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ফজলি, খলিল প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার রাজত্বকালেই দেশ অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। তিনি নিজেও কবি ছিলেন। লোকে বলিত, সুলেমানের রাজত্বে অসি ও মসী—এ দুয়েরই বিশ্রাম ছিলনা। সুলেমানের মৃত্যুর সময় তুরস্ক-সাম্রাজ্য জর্ম্মানির সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রীস্ এবং সমগ্র বলকান্ উপদ্বীপ, ক্রিমিয়া, দক্ষিণ রুষিয়া,

ইউফ্রেটিস্ উপত্যকা, এবং মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া মরক্কো পর্য্যন্ত সমুদয় উত্তর-আফ্রিকা তুরস্কের অধিকারভুক্ত ছিল। এক রোম ব্যতীত বাইবেলে এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে যে সকল প্রসিদ্ধ জনপদের উল্লেখ আছে—তার সবগুলিই তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তুরস্ক তখন যেমন ডাঙ্গার বাঘ, সেইরূপ জলেরও কুম্ভীর ছিল। কৃষ্ণসাগর এবং এজিয়ান সাগরের ত কথাই নাই, স্পেনের উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমধ্যসাগরেই তুরস্ক-রণতরীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। তুরস্কের রণতরীর অধ্যক্ষেরা লোহিত সাগর এবং পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী অনেক জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তুরস্কের অনেক রণতরী ভারতমহাসাগরেও ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন যুদ্ধবিদ্যায় জগতের কোন জাতি তুর্কীদের সমকক্ষ ছিল না। তুর্কীদের কামান ও গোলা-বারুদ জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। আজ্ তুরস্ক নিতান্ত হীন-দশাপন্ন। বর্ত্তমানে ইউরোপে তুরস্কের অধিকৃত ভূখণ্ডের পরিমাণ মাত্র কয়েক শত বর্গ মাইল। আগে এক ইউরোপেই প্রায় তিনলক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত ভূভাগ তুরস্কের অধিকারভুক্ত ছিল।

"মহামহিম সুলেমানে"র মৃত্যুর পরই তুরস্কের অবনতির সূত্রপাত হয়। সুলেমানের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ প্রায় সকলেই বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনে বিমুখ এবং বিলাস ও ব্যসন পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যার কোনই ধার ধারিতেন না। দিবারাত্র অন্তঃপুরে সুন্দরীগণ-বেষ্টিত হইয়া কালযাপন করিতেন। এই কারণে সাম্রাজ্যের প্রধান সৈন্য জেনেসেরি-গণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং শাসনযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাজ-কর্ম্মচারীদের নিয়োগ প্রায়ই যোগ্যতা-অনুসারে করা হইত না। যে যত বেশী ঘুষ দিতে পারিত সে-ই তত বেশী যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে সামরিক বিভাগের ভার কতকগুলি অকর্ম্মণ্য রাজপুরুষের হাতে আসিয়া পড়ে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের যুদ্ধ-বিজ্ঞানে যে সকল নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইল এবং যে সকল নূতন যুদ্ধাস্ত্রের সৃষ্টি হইল—তুর্কী সৈন্যেরা তার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিল না—সুতরাং অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা ক্রমাগত পরাজিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের নামে ইউরোপে আগে যে বিভীষিকার সঞ্চার হইত তাহা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দুই-একজন দূরদর্শী সুলতান এই অবনতি-স্রোতের প্রতিকূলে হস্তোত্তোলন করিয়া কিছুকালের জন্য তুরস্কের প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই প্রতিকূল-স্রোতে একবারও ভাটা পড়ে নাই। তুরস্কের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় কারণ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তুরস্কের এই ইতিহাস সুখ-পাঠ্য নহে; শুধু যুদ্ধ, পরাজয় ও সন্ধি এবং সন্ধির ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস ও ঋণ বৃদ্ধি। এই তিন বিবরণ পাঠ করিতে করিতে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক সন্ধি-পত্রেই জেতারা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নাম করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন—তুরস্কের

অখণ্ডতার (integrity) উপর আর কখনো হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং সন্ধির সর্ত্তগুলি জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত মানিয়া চলিবেন। কিন্তু এই চির-বন্ধুত্ব (cternal friendship) প্রায়ই পাচশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্ক নূতন রাজ্য অধিকার করিবার কিম্বা পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাকে সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। তখন হইতে ইউরোপের জনসাধারণের মনে ধারণা হইয়াছে যে তুরস্কের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই কাহারো সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ বাধিলেই চীৎকার উঠে—এবার তুরস্ককে নিশ্চয়ই তল্পী-তল্পা লইয়া ইউরোপ ছাড়িতে হইবে। এরূপ অবস্থায় যে তুরস্ক এখনো ইউরোপের এককোণে বসিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কনস্তান্তিনোপল লইয়াই তুরস্কের সহিত ইউরোপের যত গোলযোগ; এবং কনস্তান্তিনোপল আছে বলিয়াই তুরস্ক এত দিন ইউরোপে থাকিতে পাইয়াছে। রুষ-সাম্রাজ্ঞী কেথারিণার সময় কনস্তান্তিনোপলের উপর রুষিয়ার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। সেই অনুসারে কেথারিণা তাঁহার এক পৌত্রের নাম কনস্তান্তাইন রাখেন। কনস্তান্তিনোপল রুষিয়ার খিড়কি-দ্বার এবং সমস্ত ইউরোপের যা-কিছু গোলযোগের শেষ-মীমাংসা এইখানে। রুষিয়া কনস্তান্তিনোপলে আপন অধিকার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ তাহার সেই সাধে বাদ সাধিয়া আসিতেছিলেন। কারণ কনস্তান্তিনোপল রুষিয়াকে ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের প্রধান জল-দুর্গ তাহার আয়ত্তে আসিবে; তাহাহইলে ভূমধ্যসাগরে রুষিয়ার একাধিপত্যে বাধা দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে এবং সমগ্র ইউরোপ রুষ-রণতরীর প্রতাপে অস্থির হইয়া উঠিবে। তা-ছাড়া কনস্তান্তিনোপলে ঘাঁটি বাঁধিয়া বসিতে পারিলে রুষিয়া এশিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশেও গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। তাই ইতালি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানি সকলেই দার্দ্দানেলেসে রুষ-বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করে। অথচ এই সকল শক্তির কেহই একা নিজের জন্য কনস্তান্তিনোপল দাবি করিতে সাহসী নহেন। তাই সকলে যুক্তি করিলেন যে, কনস্তান্তিনোপল কেহই পাইবে না—দুর্ব্বল বিদেশী তুর্কীর হাতেই থাকিবে, এবং ইহাই সব-চেয়ে বেশী নিরাপদ। অবশ্য এই সব কথা বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়ার কথা। এখনতো সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে তুর্কীদের ইউরোপ হইতে তাড়াইবার প্রস্তাব প্রথম রুষিয়াতেই উত্থাপিত হয়। ১৮২২ খৃঃঅব্দে গ্রীস প্রথমে রুষিয়ার প্ররোচনায়ই তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইউরোপের প্রধান শক্তি-বর্গের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করে। গ্রীস নিজের গুণে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। গ্রীসের অতীত গৌরবের কাহিনীই তখন সমগ্র ইউরোপকে গ্রীসের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। গ্রীসের সঙ্গে যদি হোমর, সফক্লিস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণের কিম্বা থার্ম্মপিলে, ম্যারাথন প্রভৃতি পবিত্র স্থানের নামের যোগ না থাকিত—

তাহাহইলে ইউরোপের এত লোক তখন গ্রীসকে স্বাধীন দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইত না। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই তখন গ্রীসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গ্রীস হারাইবার পর তুরস্কের দুই এক জন সুলতান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা রাখিয়া চলিতে হইলে শাসন-বিধির সংস্কার আবশ্যক। ১৮৪০ খৃঃঅব্দে সুলতান আবদুল মজিদ, স্যর ষ্ট্র্যাটফোর্ড ক্যানিংএর সাহায্যে রাজ্যে অনেকগুলি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। সুলতান ঘোষণা করেন যে তাঁহার অধীন প্রজাগণের মধ্যে সকল ধর্ম্মের লোকই সমভাবে গৃহীত হইবে, সকলেই সমভাবে আপনআপন ধর্ম্ম-কর্ম্ম পালন করিতে পারিবে, বিধর্ম্মীর উপর অন্যায় করিয়া কোনরূপ কর আদায় করা হইবে না। কিন্তু সুলতানের এই প্রস্তাব বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। তখনকার তুর্কীরা এত উদ্ধতপ্রকৃতির ছিল যে, কোন সার্ভ কিম্বা বুলগার একজন তুর্কীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে এ-কথা তাহারা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। তাই তাহারা সুলতানের এই ঘোষণা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিল। তখন তুরস্কের খৃষ্টিয়ান প্রজারাও পাঁচশত বৎসরের পরাধীনতার দরুণ অধঃপতনের শেষ-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, তখন কোন সার্ভ কিম্বা বুলগার একজন তুর্কীর মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে সাহস করিত না। সুলতান আবদুল মজিদ একটি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা-বিভাগের ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা ও সাহায্য করেন। তুরস্কে এই সামান্য কয়টি সংস্কারের প্রতিষ্ঠা হওয়াতেই রুষিয়া মহাচিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার ভয় হইল, বুঝি-বা সুপ্তসিংহ আবার জাগিয়া উঠে! তাই ১৮৪৪ খৃঃঅব্দে জার নিকোলাস্ ইংলণ্ডে গিয়া তুরস্ক-সাম্রাজ্যটাকে সকলের ভিতর ভাগাভাগি করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। সদাশয় ইংরাজ কিন্তু জারের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না, সুতরাং তুরস্ক সে যাত্রা ধনেপ্রাণে বাঁচিয়া গেল। এর কিছুদিন পরে কসুথপ্রমুখ কয়েকজন হাঙ্গেরিয়ান রাজপুরুষ অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তুরস্কে আসিয়া সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অষ্ট্রীয়ারাজ ও রুষ-সম্রাট তাঁহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আবদুল মজিদ তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই মুসলমানদের জাতীয় ধর্ম্ম। প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও আমরা জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি।" ইহাতে ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে সুলতানের খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। এই ওজরে রুষ, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষসমর্থন করিলেন দেখিয়া বাধ্য হইয়া সে এই বাসনা পরিত্যাগ করিল।

এই ঘটনার চার বৎসর পর ১৮৫৩ খৃঃঅব্দে রুষসম্রাট আবার তুরস্ককে ভাগাভাগি করিয়া লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময়েই তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গের ইংরাজ রাজদূতের নিকট তুরস্কের আভ্যন্তরিক

অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের হাতে একটি রুগ্ন লোক আছে, তার ব্যামো ভারি গুরুতর!" (We have on our hands a sick man, a very sick man) রুষ-সম্রাটের এই কথাটা তখন ইউরোপের কানে খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তখন হইতেই তুরস্কের নাম হইয়াছে—"বস্‌ফরাস-তীরের রুগ্ন ব্যক্তি।" তুরস্ক যে তখন খুবই কাহিল ছিল—তাহা মনে হয় না। সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক প্রায়ই ন্যায়মতে কাহারো কাছে পরাস্ত হয় নাই। ১৮১২ খৃঃ অব্দের রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ হার-জিত হয় নাই। ১৮২২—২৮ খৃঃঅব্দে গ্রীসের যুদ্ধে ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিরা গ্রীসের পক্ষসমর্থন না করিলে তুর্কীরা কখনো হার মানিত না। ১৭৫৪ খৃঃঅব্দে ক্রিমিয়ান সমরে মিত্র-সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তুর্কীরা রুষিয়ানদের দানীয়ুবের উত্তর পারে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছিল। ১৮৭৭—৭৮ খৃঃঅব্দের যুদ্ধে রুষিয়া জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকের মতে রুষিয়া তখন গোলাবারুদের সাহায্যে জয়লাভ করে নাই—করিয়াছিল উৎকোচের সাহায্যে। যদি তুর্কী সৈনিক-কর্ম্মচারীরা উৎকোচের দ্বারা বশীভূত না হইতেন—তাহাহইলে তুর্কীরা কখনও পরাজয় স্বীকার করিত না।

ক্রিমিয়ান সমরের পর প্যারির সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা তুরস্ককে প্রথমবার তাঁহাদের দলে গ্রহণ করেন এবং তুরস্কের অখণ্ডতায় উপর কখনো হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণসাগরে সকল জাতির সমান অধিকার থাকিবে এবং সেখানে রুষীয়া রণতরী রাখিতে পারিবেনা—ইহাও ধার্য্য হয়। এর পরিবর্ত্তে সুলতান তাঁহার রাজ্যে নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সুলতান এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এর পনর বৎসর পর যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মানিতে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তখন রুষসম্রাট সময় বুঝিয়া ঘোষণা করেন যে, প্যারির সন্ধিতে কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধে যাহা ধার্য্য করা হইয়াছিল—তিনি সেই সর্ত্তগুলি আর মান্য করিবেন না। কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার প্রাপ্য, সুতরাং সেখানে তিনি রণতরী রাখিবেন। ইংলণ্ড তখন একবারে একাকী, কারণ ফ্রান্স তখন নিজের প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল, তাই ইংলণ্ড ইচ্ছাসত্বেও রুষিয়ার এই স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারিল না। তখন হইতে কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার খিড়্‌কি-পুকুরে পরিণত হইল। ইহার কিছুদিন পর রুষিয়ার প্ররোচনায় হার্জিগভিনা ও বুলগেরিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে তখন তুরস্কের অধীনে বুলগেরিয়ানদের অবস্থা রুষ-জারের নিজের প্রজাদের অবস্থার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তুর্কীরা বুলগেরিয়ানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই পাশবিক অত্যাচারের খবর পাইয়া সমগ্র ইউরোপ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তার ফলে বল্‌কানে রুষিয়ার

প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া উঠে। সেই সময় দুর্ব্বলচিত্ত আব্‌দুল আজিজ তুরস্কের সুলতান ছিলেন। তিনি ক্রমশঃ ইস্তাম্বুলের রুষ-রাজদূতের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া পড়িলেন। তখন মিধাৎ-পাশাপ্রমুখ কয়েকজন তুর্কী রাজপুরুষ বুঝিতে পারিলেন যে, সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারিলে তুরস্কের আর প্রাণরক্ষার উপায় নাই। তাই তাঁহারা সেখ-উল্‌-ইস্‌লামের মত লইয়া আব্‌দুল আজিজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মুরাদকে তুরস্কের সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ইহাতেও কিছুই সুফল ফলিলনা। আব্‌দুল আজিজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন এবং তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ পাইয়া মুরাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল; সুতরাং তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আব্‌দুল হামিদকে সুলতান ঘোষণা করা হইল। আব্‌দুল হামিদ্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ১৮৭৬ খৃঃঅব্দে তুরস্ক-সাম্রাজ্যে নিয়মতন্ত্র-শাসনপ্রণালী ঘোষণা করিলেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তুরস্কের প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎকাল পর্য্যন্ত তুরস্কের সুলতান স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দেয়, কাহারও এতটা বুকের পাটা ছিল না। আইন, দেশের চলিত প্রথা বা প্রজার অভিযোগ কিছুই তাঁহাকে বাধ্য রাখিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহাকে কোরাণ মানিয়া চলিতে হইত। কোরাণানুসারে তাঁহার বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি পণ্ডিত-সভা ছিল। এই সভায় কোরাণমতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, ফৌজদারী, দেওয়ানী ও সামরিক সকল গোলমালের মীমাংসা হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুরস্কে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তুরস্কে প্রায় কুড়িটি বিভিন্নজাতীয় লোক বাস করে। এই ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে একত্র ও বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যবধান দূর করিয়া একটি অখণ্ড জাতীয়তা গঠন করা এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আন্দোলনকারীরা নিজেদের Young Turks বা 'নব্য তুর্কী' বলিয়া অভিহিত করিত। প্রথমাবস্থায় ইহাদের কোন বাঁধা-ধরা কার্য্যপ্রণালী বা সকলের আদর্শও এক ছিল না। ইহাদের ভিতর অনেকগুলি অন্ধ দেশহিতৈষী ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইউরোপে তুরস্ক-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যাহা-কিছু মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত নহে—তাহাই ধ্বংস করা এবং পৃথিবীর সমুদায় মুসলমান অধিবাসীকে অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত করিয়া ইউরোপের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা করা। ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে ইহাদের পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, অলজেরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ত্রিশ কোটি মুসলমান সংগ্রহ করিয়া সমস্ত ইউরোপ আক্রমণ করা হইবে এবং এক জর্ম্মানি ব্যতীত ইউরোপের সকল রাজ্য ধ্বংস করা হইবে। যাহা হউক ইহাদের পাগলামি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। নব্য তুর্কী-দলের নেতা ছিলেন মিধাৎ পাশা। ইঁহার ন্যায় অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত আজপর্য্যন্ত তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি তুরস্কে বৈধ

আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃঅব্দে মিধাৎ পাশা একখানি স্মারক লিপি প্রস্তুত করিয়া ইউরোপের সকল রাজ-শক্তির নিকট পাঠান। ইহাতে তিনি দেখান যে, তুরস্কের অবনতি খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদের বিবাদের দরুণ হয় নাই। সুলতানের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারই তুরস্কের অবনতির প্রধান কারণ। মিধাৎপাশার লক্ষ্য ছিল—ইউরোপের সাহায্য না লইয়া তুর্কীদের দ্বারা তুরস্কে নানাবিধ কার্য্যকরী সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিয়া তাহার সাহায্যে জাতীয় আন্দোলনকে সজীব রাখিয়া সুপথে চালান। মিধাৎ পাশা এই কার্য্যে কেমাল বে এবং জিয়া বে নামক তুরস্কের দুইজন প্রধান সাহিত্যিকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই নব্য তুর্কীদলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই দুইজনে চেষ্টায় তুর্কী সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইঁহারাই প্রথমে তুর্কী সাহিত্যে চিরপ্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ ও অস্বাভাবক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষার প্রচলন করেন এবং তাহা দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে নব জীবন আনয়ন করেন। ইঁহাদের চেষ্টায় ইস্তাম্বুলে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। নব্য তুর্কীদের অনেকেই প্যারিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাই বর্ত্তমান তুর্কী সাহিত্যে ফরাসী ভাবের যথেষ্ট প্রভাব। কেমাল বে "Vatan" বা 'স্বদেশ' নামক একখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। ক্রিমিয়ান সমরের প্রারম্ভে তুর্কী সৈন্যেরা দানিয়ুবের তীরে সিলিষ্ট্রীয়া দুর্গ অসীম বীরত্বের সহিত রক্ষা করিয়া সমগ্র ইউরোপকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। কেমাল বে এই বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে "Vatan" লিখিয়াছেন। স্বদেশপ্রীতি এই নাটকের মূলমন্ত্র, এ-শ্রেণীর রচনা তুরস্কে একেবারে নূতন। ইহার পূর্ব্বে তুর্কী সাহিত্যে স্বদেশ বলিয়া কোন-একটা ধারণা ছিল না। তুরস্কে এই নাটকখানির অত্যধিক আদর দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কেমাল বে-কে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন এবং নব্য তুর্কীদলের পরিচালিত "মুখ্‌বীর" নামক কাগজের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। ইহাদের চেষ্টায় দেশের নানা স্থানে সাধারণের জন্য পুস্তকাগার খোলা হয় এবং ইস্তাম্বুলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর ও পশুশালা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নব্য তুর্কীদলের অনেক দোষ থাকিলেও তাহারা যে তুর্কী সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের জন্য অনেক কাজ করিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মিধাৎ পাশা তুরস্কের বৈধ আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ এবং তাঁহারি চেষ্টায় ১৯৭৬ খৃঃঅব্দে সাম্রাজ্যে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শাসন-প্রণালীই "Midhak Constitution" বা 'মিধাতের বিধান" বলিয়া পরিচিত। 'এই শাসন-প্রণালীর প্রধান বিষয় ছিল,—আইনের প্রাধান্য, সংবাদপত্রের ও ধর্ম্মাধিকরণের স্বাধীনতা, সকল জাতির ও ধর্ম্মের সমান অধিকার, রাজপরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, দাসত্ব, বহুবিবাহ, বিনাবিবাহে মিলন প্রভৃতি কুপ্রথার দমন

এবং তুরস্কের রাজপরিবারের সহিত ইউরোপের অন্যান্য রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন। দুঃখের বিষয়, এই নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। অনেকের মতে উলেমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও ধর্ম্মোন্মত্ততার দরুণই এই শাসনপ্রণালী স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা যদি প্রথম হইতেই এই শাসন-প্রণালীকে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিতেন তাহা হইলে হয়ত মিধাৎ সফলতা লাভ করিতে পারিতেন।

১৮৭৫ খ্রীঃঅব্দ হইতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গরা তুরস্ককে তাহার ইউরোপীয় প্রদেশসমূহে স্বায়ত্ব-শাসন প্রচলিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইস্তাম্বুলে তাঁহাদের একটা সভা বসে। ঠিক সেই সময়ই সুলতান তুরস্কে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী ঘোষণা করেন। সমবেত শক্তিবৃন্দেরা দেখিলেন যে, তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তুরস্ক তার চেয়ে বেশী দিতে ইচ্ছুক। তাই তাঁহারা এই সভায় ঠিক করিলেন যে, তুরস্কের ইউরোপীয় প্রদেশসমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করিতে সুলতানকে অনুরোধ করা হইবে এবং সুলতান তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া পাঁচ বৎসরের জন্য এই সব প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন। তুরস্কের নূতন পার্লিয়ামেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন; সুতরাং রুষিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিবার এক মহা সুযোগ পাইল। রুষিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি, কি তাহার "অত্যাচারপীড়িত শ্লাভ ভ্রাতৃগণের" উদ্ধারসাধন, তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। অন্যান্য শক্তিরা চেষ্টা করিয়াও রুষিয়াকে দমন করিতে পারিলেন না। রুষিয়া জানিত জর্ম্মানি তুরস্ককে সাহায্য করিবে না। বিস্‌মার্ক বলিতেন, সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্যের মূল্য অপেক্ষা একজন প্রুসিয়ান সৈন্যের জীবনের মূল্য অধিক। অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে রুষিয়ার এই বন্দোবস্ত হইল যে, অষ্ট্রীয়া নিরপেক্ষ থাকিলে তুরস্কের বস্‌নিয়া-হার্জে-গেভিনা নামে প্রদেশদুইটী বকসিস্ পাইবে। ইংরাজ চিরকালই তুরস্কের বন্ধু; কিন্তু তখন বুল্‌গেরিয়ান্‌দের উপর তুর্কীদের পাশবিক অত্যাচারের খবর পাইয়া তুরস্কের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের সহানুভূতি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল; তাই ইংরাজ নিরপেক্ষ থাকিলেন। কিন্তু, যখন রুষিয়া তুরস্ককে পরাস্ত করিয়া San Stefanoর সন্ধি দ্বারা তুরস্কের একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল, তখন ইংরাজ রুষিয়াকে যুদ্ধের ভয় দেখাইলেন এবং অষ্ট্রীয়ার সাহায্যে San Stefanoর সন্ধি রদ করাইয়া তুরস্কের সঙ্গে বার্লিনে নূতন সন্ধি করাইলেন। এই সন্ধির ফলে রোম্যানিয়া, সার্ভিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করিল। বুল্‌গেরিয়া স্বায়ত্বশাসন পাইল, কিন্তু বুল্‌গেরিয়া তুরস্ককে করপ্রদান করিবে বলিয়া ধার্য্য হইল। এদিকে রুষিয়াকে তুরস্ক এসিয়ার অনেক জায়গা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। বস্‌নিয়া এবং হার্জেগেভিনা তুরস্কের অধীনে থাকিল বটে, কিন্তু এই দুইটী প্রদেশ শাসন

করিবার ভার অষ্ট্রীয়া পাইল। বার্লিনের সন্ধি-পত্রে ইউরোপের যাবতীয় শক্তিবর্গ তাঁহাদের নাম-সহি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, এই সন্ধি দ্বারা বলকানের গোলযোগের কিছুই মীমাংসা হইল না। কিছুদিন পর সুলতান সাম্রাজ্যে বার্লিন-কংগ্রেসের প্রস্তাবিত দুই-একটি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজস্ব এবং সৈনিক বিভাগের উন্নতিকল্পে জর্ম্মানি হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী আনা হইল এবং von der Goltzএর অধীনে ইস্তাম্বুলে একটি সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইল। সেই সময় হইতেই তুরস্কে জর্ম্মানির প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। সুলতান উল্লিখিত সংস্কারগুলির সূচনা করিয়াই আবার সমস্ত স্থগিত রাখিলেন। আবদুল হামিদ্ প্রথমে নিজেকে খুব উদারমতাবলম্বী বলিয়া দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বার্লিন-সন্ধির পর হইতে ক্রমে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে পার্লিয়ামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক-গণও তাঁহার আদেশে ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। আর্ম্মেনিয়া এবং ম্যাসিডনিয়াতে বার্লিন-সন্ধির প্রস্তাবিত সংস্কার প্রায় কিছুই আরম্ভ করা হইল না এবং যাহা হইতে লাগিল তাহাও অতিশয় ধীরে-সুস্থে। অন্যান্য শক্তিরা যখন একটু চাপ দিতেন তখনই সুলতান একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেন, কিন্তু তার পরেই আবার যে-কে সেই হইয়া দাঁড়াইতেন। এই সব কারণে আর্ম্মেনিয়নিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তুর্কী এবং খুর্দ্দি সৈন্যেরা হতভাগ্য আর্ম্মেনিয়ানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা দিন-রাত রাস্তা-ঘাটে সমানে আর্ম্মেনিয়ানদের হত্যা করিতে লাগিল। তুর্কীরা তখন অন্ততঃ দুই লক্ষ নিরীহ আর্ম্মেনিয়ান হত্যা করিয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ আর্ম্মেনিয়াতে সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সুলতানকে আবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সুলতান শুধু 'হচ্ছে-হবে' বলিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। সুলতান নিজে কিছু করিতেন না এবং কর্ম্মচারীদিগকেও বিশ্বাস করিয়া কিছু করিতে দিতেন না। রাজ্যের চারিদিকে সুলতানের গুপ্তচর ঘুরিত। ইস্তাম্বুলে গোয়েন্দার জ্বালায় লোকের জীবন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রজাদের উপর রাজকর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং কর আদায় করিবার ভার ঠিকাদারদের উপর ন্যস্ত হইল। ইহার দরুণ সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে গোল্লায় যাইতে বসিল এবং সহরের জনসংখ্যা কমিতে লাগিল। ১৯০২ খৃঃঅব্দে ম্যাসিডনিয়ার অত্যাচার-পীড়িত অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সুতরাং তুর্কীরা আবার নিরপরাধীর হত্যা আরম্ভ করিয়া দিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আবার সংস্কারের প্রস্তাব তুলিলেন; কিন্তু আবদুল হামিদ আবার করি-কচ্ছি- বলিয়া দেরি করিতে লাগিলেন। রাজ্যের চারিদিকে অত্যাচার, অরাজকতা ও নরহত্যা,—কিন্তু সুলতানের তা'তে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি দিন-রাত ইলদিজ কিওস্কের প্রাসাদে বসিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে কাল কাটাইতেন এবং সেখানে

বসিয়া ইস্তাম্বুলের রাস্তায় বাইসাইকেল্ চালাইতে দেওয়া উচিত কিনা সেই বিষয়ে যুক্তি করিতেন; কিম্বা পেরার উদ্যানে Café Chantantএর জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু এদিকে যে তুরস্কের রণতরী-সমূহ কর্ম্মচারীর অভাবে এবং আলস্যতার দরুণ নষ্ট হইতে লাগিল—সে বিষয়ে সুলতান কিছুই খবর রাখিতেন না। আবদুল হামিদের কাপুরুষতার সীমা ছিল না। তিনি নিজের সৈন্যদের বিশ্বাস করিতেন না। সেইজন্য সৈন্যদের শুধু খালি টোটা দেওয়া হইত। সুলতান ভয় করিতেন, হয়ত সৈন্যরা তাঁহাকে সুবিধা পাইলেই আক্রমণ করিবে। দুর্গের যে সমস্ত কামানের মুখ তাঁহার প্রাসাদের দিকে ফিরান ছিল—সেই কামানগুলি তাঁহার আদেশে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলা হইল। প্রাসাদে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল। আলোর জন্য সোলার উপর বাতি বসাইয়া—সেই বাতিগুলি বড় বড় গামলাতে জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইত। আবদুল হামিদের পুর্ব্বে কখনো তুরস্কের এত শোচনীয় অবস্থা হয় নাই। রাজকর্ম্মচারীদের বেতন বৎসর বৎসর কমাইয়া দেওয়া হইত এবং সৈন্যরা ত প্রায়ই বেতন পাইত না। আবদুল হামিদের সময় তুরস্কে জর্ম্মানির খুব প্রতিপত্তি ছিল। আর্ম্মেনিয়া ও ম্যাসিডনিয়াতে অত্যাচারের খবর পাইয়া ইউরোপের সকল দেশ প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু জর্ম্মানি এবং অষ্ট্রীয়া আবদুল হামিদের মন পাইবার জন্য এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি টুঁ-শব্দও উচ্চারণ করে নাই। তখন জর্ম্মানির সংবাদপত্র-সমূহে প্রায় প্রত্যহই সুলতানের প্রশংসা বাহির হইত। সব বিষয়েই তাঁহাকে প্রশংসা করা হইত। এমন-কি, একদিন একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছি, সুলতানকে আদর্শ স্বামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সব করিয়া জর্ম্মানির খুব লাভ হইয়াছিল। জর্ম্মানরা তুরস্কে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিবার ভারি সুবিধা পাইয়াছিল। বিখ্যাত বাগদাদ্-রেলওয়ে—প্রথম ইংরাজরাই আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সুলতান হঠাৎ তাহা ইংরাজদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জর্ম্মানদের দান করিলেন। ইহা ছাড়া জর্ম্মানদের আরো ছোটবড় সুবিধা দান করা হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃঃঅব্দে জুলাইমাসে নবীন তুর্কীদের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। তুরস্কের প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিবার পর এই দলের নেতারা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্যারিতে চলিয়া যান এবং সেখানে "একতা ও উন্নতি সমিতি" নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিতে আবদুল হামিদের পতনের যুক্তি করা হয়। ১৯০৮ খৃঃঅব্দে দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সেলোনিকা এবং মনাষ্টিরে আসিয়া তাঁহাদের প্রধান আস্তানা স্থাপন করেন। অতি অল্প সময়ের ভিতরই তুরস্কের সমস্ত সৈনিক কর্ম্মচারী ও সাধারণ সৈন্যেরা ইহাদের সঙ্গে দলে দলে যোগদান করিল। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আবদুল হামিদ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। সুলতান

যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হাতে একজন সৈন্যও নাই—তখন তিনি বাধ্য হইয়া নব্যতুর্কীদের কাছে নত হইলেন এবং বত্রিশ বৎসরের পর আবার নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী ঘোষণা করিলেন। এই বিপ্লবে একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই। সকলেই ভাবিয়াছিল, এবার তুরস্কের সুদিন আসিল। কিন্তু নব্যতুর্কীদের এই কৃতকার্য্যতা স্থায়ী হইল না। অষ্ট্রীয়া, নবীন তুর্কীদের অভ্যুদয়ের খবর পাইয়া ভারি ভাবিত হইয়া পড়িল। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভিনার শাসনের ভার অষ্ট্রীয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। তুরস্ক শক্তিশালী হইয়া উঠিলে অষ্ট্রীয়াকে এই দুইটি প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহা ভাবিয়া অষ্ট্রীয়া চিন্তিত হইল। অবশেষে রুষিয়া, ইতালি এবং বুলগেরিয়ার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া অষ্ট্রীয়া এই দুইটী প্রদেশ নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিল। তুরস্কে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া বুলগেরিয়াও ভারি চিন্তিত হইল। এতদিন বুলগেরিয়া নামে-মাত্র তুরস্কের করদরাজ্য ছিল, সুলতানকে কিছুই কর দিত না; কিন্তু এখন তাহার ভয় হইল নবীন তুরস্ক বুলগেরিয়াকে বাস্তবিকই করদরাজ্যে পরিণত করিতে পারে—তাই বুলগেরিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে তুরস্কের প্রধান উজীর এক ভোজ দেন। এই ভোজে ইউরোপের সকল রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কেবল বুলগেরিয়ানদের করা হয় নাই। বুলগেরিয়া এর জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলে প্রধান উজীর বলিলেন যে, বুলগেরিয়া তুরস্কের করদ রাজ্যমাত্র, সুতরাং স্বাধীন রাজ্য সকলের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে বুলগেরিয়ার রাজদূতকে নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে না। ঐ দিনই বুলগেরিয়ার রাজদূত ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ করিলেন এবং পরদিন রাজা ফার্দ্দিনান্দ বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা এবং নিজে "জার" উপাধি গ্রহণ করিলেন। অষ্ট্রীয়া এবং বুলগেরিয়া উভয়েই ভাবিয়াছিল ইহাতে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব নষ্ট হইবে। কিন্তু তুরস্ক তখন যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, শুধু একটিবার প্রতিবাদ করিয়া এবং কিছুদিনের জন্য অষ্ট্রীয়ার সমস্ত পণ্যদ্রব্য বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল। এই সব গোলযোগের শেষ না হইতে হইতেই ইস্তাম্বুলে আবদুল হামিদের সাহায্যে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। একদল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং পার্লিয়ামেণ্ট অধিকার করিয়া বসিল। যাহা হউক, নব্যতুর্কীরা এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করিতে পারিলেন এবং আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইনিই তুরস্কের বর্ত্তমান সুলতান। কিন্তু ইহাতেও সুফল ফলিল না। নব্যতুর্কীরা দেশে কিছুতেই শান্তি আনিতে পারিল না। নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী ঘোষণা হইবার পর প্রথম কয়দিন সাম্রাজ্যে খুব সাম্য ও মৈত্রীর ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই বিভিন্ন জাতির ভিতর আবার পূর্ব্বের হিংসা,

দ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। নব্য-তুর্কীরা তাঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজে হাত দিয়াছিলেন। এই দলের নেতারা সকলেই প্যারিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ফরাসী-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন চিন্তাশীল; মুসলমান-ধর্ম্মের সঙ্গে কিম্বা দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা ফরাসী ভাব লইয়া দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন, অথচ দেশের জনসাধারণের মনের ভাব জানিতেন না। এঁদের মধ্যে অনেকে জাতিতেও তুর্কী ছিলেন না। কেহ পোল, কেহ বা ছিলেন ইহুদিবংশোদ্ভব, ইঁহাদের কাহারো শাসনকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং ইঁহারা যতটা ভাঙ্গিলেন ততটা গড়িতে পারিলেন না। দেশের অবস্থা পূর্ব্ববৎই থাকিল, মধ্য হইতে কেবল গবর্ণমেন্টের শক্তি-সামর্থ্য কমিয়া গেল। নূতন গবর্ণমেন্টের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া তুরস্কের প্রতিবেশীদিগের রাজ্যলিপ্সা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৯১১ খৃঃঅব্দে হঠাৎ বিনা কারণে ইতালি, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া Tripoly আক্রমণ করিল এবং তার ফলে তুরস্ক আফ্রিকা-মহাদেশের শেষ উপনিবেশটি—প্রায় চারি লক্ষ বর্গ মাইল পরিমাণ ভূভাগ—হারাইল। টিউনিস, অলজেরিয়া, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি দেশ ত তুর্কীরা আগেই নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার দরুণ হারাইয়াছিল। ইতালীর সহিত এই গোলমালের মীমাংসা হইতে-না-হইতেই বলকানের যুদ্ধ বাধে। এতদিন পর্য্যন্ত বলকান্ রাজ্যগুলি—বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো এবং গ্রীস—পরস্পরের বিরুদ্ধে কেবল শত্রুতা করিয়াই আসিতেছিল, কিন্তু তুরস্কের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা পূর্ব্বের শত্রুতা ভুলিয়া গেল এবং তুরস্ককে ইউরোপ হইতে তাড়াইয়া তুরস্কের অধিকৃত ভূভাগ নিজেদের ভিতর ভাগাভাগি করিয়া লইবার নিমিত্ত একদল হইল। বুলগেরিয়ার নামজাদা রাজা ফার্দ্দিনান্দ এবং গ্রীসের মন্ত্রী ভেনি-জেলোস্‌এর চেষ্টায় Balkan League নামে ইহাদের এক মিলন-সমিতি স্থাপিত হইল এবং ১৯১২ খৃঃঅব্দের শেষভাগে এই মিলন-সমিতি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ এই Balkan Leagueকে জানাইলেন যে—তাঁহারা কিছুতেই বলকান্ রাজ্যগুলিকে তুরস্কের অধিকারভুক্ত ভূভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইতে দিবেন না। ১৯১২ খৃঃঅব্দে ৪ঠা অক্টোবরে লর্ড ক্রু House of Lordsএ ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ কখনো কাহাকেও তুরস্কের অখণ্ডতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। কিন্তু বলকান রাজ্যগুলি ইহাতে ভয় পাইল না। তাহারা তুরস্ককে আক্রমণ করিল। তাহারা জানিত যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হইবে এবং জয়ী হইলে তাহারা তুরস্কের সঙ্গে যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারিবে; মৃতপ্রায় তুরস্কের খাতিরে কেহ তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে আসিবে না। ফলে তাহাই হইল, তুরস্ক প্রথম হইতেই হারিতে লাগিল এবং লর্ড ক্রুর বক্তৃতার ঠিক এক মাস পরে ৪ঠা নভেম্বর Sir Edward

Gray ঘোষণা করিলেন যে, বলকান রাজ্যসমূহ তুরস্ককে তাহাদের ইচ্ছামত সন্ধি দ্বারা বাধ্য করিতে পারিবে, ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। তুর্কীরা সমানেই পরাজিত হইতে লাগিল এবং বুলগেরিয়ানরা আদ্রিয়ানোপল দখল করিয়া কনস্তান্তিনোপলএর পঞ্চাশ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ১৯১৩ খৃঃঅব্দে লণ্ডনে এক সন্ধি হইল। এই সন্ধির ফলে তুরস্ক এক কনস্তান্তিনোপল ব্যতীত ইউরোপের আর সবই হারাইল। কিন্তু ইতি-মধ্যে বিজেতাদিগের নিজেদের ভিতর লুটের ভাগ লইয়া এক নূতন যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধে অতি-লোভী বুলগেরিয়ার যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিল এবং তুরস্ক তখন সুবিধা বুঝিয়া চুপচাপ আবার আদ্রিয়া-নোপল দখল করিয়া বসিল। বুখারেষ্টের সন্ধিতে এই নূতন যুদ্ধের মিটমাট হইল, কিন্তু তুরস্ক আর কিছুতেই আদ্রিয়ানোপল ছাড়িয়া দিল না। অবশেষে বুলগেরিয়া নিজের বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরশত্রু তুরস্কের সঙ্গে আবার সন্ধি দ্বারা "অক্ষয় বন্ধুত্ব" স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। বর্ত্তমান তুরস্ক তাহার পূর্ব্বের শত্রুদের সহিত মিলিত হইয়া ইউরোপে যাঁহারা তাহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। বিস্মার্ক তুর্কীদের "ভদ্র জাতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের খবর হইতে বুঝা যায় যে, শত্রু-পক্ষের ভিতর একমাত্র তুরস্কই বাস্তবিক "ভদ্রলোকে"র মত যুদ্ধ করিতেছে।

এইরূপে তুরস্ক ক্রমে ক্রমে তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। এক-কালে ইউরোপে প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগ তুরস্কের অধিকারে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এক কনস্তান্তিনোপল এবং আদ্রিয়ানোপল ব্যতীত ইউরোপে আর তুরস্কের আপন বলিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। পূর্ব্বে সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা তুরস্কের অধিকৃত ছিল, বর্ত্তমানে আফ্রিকাতে তুরস্কের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও নাই। তাহার যাহা কিছু আছে এসিয়াতে, কিন্তু এই যুদ্ধের পর তাহাও হয়ত যাইবে। কারণ, তুরস্ক ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইলে এশিয়াতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। মাথা কাটিয়া নিলে দেহের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আরব স্বাধীন হইবে, আর্ম্মেনিয়া স্বাধীন হইবে এবং মেসোপটেমিয়া কোন ইউরোপীয় শক্তির হস্তগত হইবে। তখন পৃথিবীর মানচিত্রে আর তুরস্ককে খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

"মা"

(১)

কলেজ হইতে দ্বিপ্রহরে বাসায় ফিরিয়া অখিল একখানা চিঠি পাইল। হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিল, খুঁড়িমার চিঠি। খুলিয়া দেখিল, চিঠি সংক্ষিপ্ত; খুড়িমা লিখিয়াছেন, "এক-আধ-দিনের ছুটি পাওত' একবার এসো, বিশেষ দরকার।"

মা-কে অখিলের মনে পড়ে না, কিন্তু স্মৃতির আরম্ভ হইতে এই খুড়িমাই তাহার স্নেহময়ী জননীর স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই খুড়িমারই স্নেহ-সিঞ্চনে তাহার সারা জীবনের আদর-অভিমান, কামনা, বাসনা বাড়িয়া উঠিয়াছে—জীবনের একটী দিনও এই স্নেহের বিরামের কথা মনে পড়ে না। খুড়িমার নিজের ছেলে ছিল, কিন্তু তাহাকে তিনি স্নেহে ও আদরে মাতৃহীন অখিলের চেয়ে চিরদিনই ছোট করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন।

খুড়িমার এই স্নেহ-আহ্বান অখিল কিছুতেই অমান্য করিতে পারিল না; দিন-পাঁচেক পরে দুইদিনের ছুটি ছিল; সেই ছুটিতে সে স্বদেশ যাত্রা করিল।

অখিলের আকস্মিক আগমনে পিতা বৈকুণ্ঠ কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অখিল তাঁহাকে একরূপ একটা বুঝাইয়া দিল। খুড়িমার কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া অখিল কহিল, "আমায় ডেকেছ কেন খুড়িমা?"

খুড়িমা কহিলেন, "সে অনেক কথা বাবা, রাত্রে নিরিবিলিতে বলব।"

রাত্রে খুড়িমা কহিলেন, "তোমার একটী বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছি—তাই ডেকেছিলাম।"

অখিল কহিল, "তার জন্যে আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল, খুড়িমা! আর তুমি ত' জানই, আমার নিজের ইচ্ছা নয় যে এখন বিবাহ করি।"

খুড়িমা কহিলেন, "মেয়েটীর মা আমার আত্মীয়,—বিধবা। মেয়েটীকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন। মেয়েটী রূপে-গুণে লক্ষ্মী। আজও মা আর মেয়ে এসেছিল—আমার কাছে তার মা কত কাঁদলে! মেয়েটীকে আমি জানি—এমন মেয়ে যার সংসারে আসে তার সৌভাগ্য! তোমাকেই তাদের উদ্ধার করতে হ'বে বাবা।" খুড়িমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

অখিল কহিল, "খুড়িমা, তুমি যা বল্‌বে তার ওপরে আমি আর কি বল্‌তে পারি? কিন্তু বাবার মত নেওয়া হয়েছে?"

খুড়িমা কহিলেন, "তাঁরও মত আছে, কিন্তু তিনি চান তিন হাজার টাকা। বিধবা সে টাকা কোথায় পায় বাবা?"

অখিল তাহার পিতাকে ভাল করিয়াই জানিত। তিনি পাথরের মত কঠিন ও অটল। তিনি যখন একবার বলিয়াছেন টাকা চাই, তখন কেহই তাঁহার বিপক্ষে যাইতে পারিবেনা। তিন হাজার টাকা হইতে এক কপর্দ্দক কম হইলে তিনি রাজী হইবেন না। অখিল কহিল, "খুড়িমা,

ঐখানেইত’ মুস্কিল! তুমি ত’ জান, বাবা যখন বলেছেন তখন টাকা চাই-ই।”

খুড়িমা কহিলেন, “টাকার সম্বন্ধে আমি ভেবে একটা উপায় ঠাহর করেছি। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই তোমার এ বিবাহে মত আছে কি না,—সেইটেই বড় কথা।”

অখিল কহিল, “আমার নিজের মতামত ত’ কোনও দিনই তোমাদের মতের চেয়ে বড় হ’তে পায় নি, খুড়িমা!”

এমন সময়ে সেই ঘরে এক বিধবা প্রবেশ করিলেন। ইনিই খুড়িমার আত্মীয়া। অখিলের আসার সংবাদ পাইয়া তিনি এই-মাত্র এ বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া খুড়িমা কহিলেন, “এই যে দিদি এসেছ, ভালই হয়েছে; অখিলের সঙ্গে আমার এইমাত্র তোমারই কথা হচ্ছিল। টাকার যোগাড় হলে বিয়েতে আর কোন বাধা নেই বলে মনে হয়”—বলিয়া তিনি অখিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অখিল চুপ করিয়া রহিল।

বিধবার চোখে জল আসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া তিনি কহিলেন, “বেঁচে থাক বাবা! তোমরা দয়া না কর্‌লে এই অনাথা বিধবার আর দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? তিন বছরের মেয়ে নিয়ে সংসারে একা হয়েছি, এখন তার ব্যবস্থা হ’লে নিশ্চিন্ত হ’য়ে চোখ বুজ্‌তে পারি। কিন্তু অত টাকা কোথা থেকে পাই বোন্? আমার যে কিছু নেই!”

খুড়িমা কহিলেন, “সেইত’ ভাব্‌নার কথা!” খানিকটা থামিয়া আবার কহিলেন, “নলিনীকে সঙ্গে এনেছ কি?”

“হ্যাঁ, সে ঐ বারান্দায় আছে।”

খুড়িমা ডাকিলেন, “নলিনী, শোন ত’ মা।”

লজ্জায় জড়সড় হইয়া নলিনী ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই মনে হয়, সুন্দরী বটে! রূপের প্রভায় ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। খুড়িমা তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “এমন মেয়ে হাজারেও একটী মেলে না।”

অখিলের দুই চোখ যেন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কহিল, “খুড়িমা, এখন আমি যাই।”

খুড়িমা কহিলেন, “না বাবা, আরও একটু কথা আছে।”

খুড়িমার আত্মীয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “বোন্, আমিই বরং যাই, তোমরা কথাবার্ত্তা কও।” তাহার পর অখিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বাবা! নিরাশ যেন না হই।” বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নলিনীর সৌন্দর্য্য ও তাহার মাতার বিনয়-বাণী অখিলের মনকে আর্দ্র করিয়া দিল। বিবাহে মনে মনে নিজের তরফ হইতে তাহার আর কোনও আপত্তি রহিল না। কিন্তু ঐ টাকার কথাটা!

খুড়িমা কহিলেন, “আমার নিজের কিছু গয়না আছে, তার ওপরে আর কিছু ধার-ধোর করে তিন হাজার টাকা পুরিয়ে দিতে পার্‌ব বোধ হয়।”

অখিল কহিল, “তুমি বুঝি এই উপায় ঠাউরেছ! তা’ হ’বে না খুড়িমা, আমার বিয়ের জন্যে যদি তোমার সব গয়না গুলি

বেচ্‌তে হয় ত' তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর হ'তে পারে না। তা কিছুতেই হবে না।"

খুড়িমা কহিলেন, "বেঁচে থাক তোমরা, আমার অভাব কি বাবা? ঐ গয়নাগুলো ত' এখন আমার বোঝা!"

অখিল কহিল, "না তা হবে না। যে কাজে তোমার গয়না বিক্রী কর্‌তে হয়, তাকে আমি শুভকাজ ব'লে মনে কর্‌তে পারি না। টাকার জোগাড়ের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, সে আমি কর্‌ব।"

খুড়িমা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তুমি টাকা কোথায় পাবে?"

অখিল হাসিল, কহিল, "আমার আছে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আমার নামে মার সময় থেকে জমা আছে, সেটা আমারই টাকা। উপস্থিত তাই থেকে নিয়ে কাজ চালান যাবে। পরের কথা পরে হবে।"

খুড়িমা কহিলেন, "গোলমাল হবে না ত?"

অখিল কহিল, "না, গোলমালের কোন সম্ভাবনা নেই!" শুনিয়া খুড়িমা মনে মনে অখিলকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(২)

বাড়ীতে সেদিন হুলস্থুল। লোহার সিন্দুকের ভিতর মাস-চারেক আগে বৈকুণ্ঠ তিন হাজার টাকা রাখিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য তাহা বাহির করিতে গিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে,—পুলিশ আসিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বৈকুণ্ঠ তাঁহার পুরাণো সিন্দুক, আসবাব-পত্র খোঁজ করিতেছিলেন, এমন সময় অখিল আসিয়া কহিল, "সে টাকা আমি নিয়েছি।"

শুনিয়া বৈকুণ্ঠ বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন —"সব, তিন হাজার টাকা!"

অখিল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, "কেন, তিন হাজার টাকা তোমার কি দরকার হয়েছিল?"

অখিল কোন কথা কহিল না।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, "বুঝতে পেরেছি! তোমার বিয়ের জন্যে সেই টাকা দান করেছ বোধ হয়!"

অখিল কহিল, "হ্যাঁ।"

শুনিয়া ক্রুদ্ধ বিষধরের মত বৈকুণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "যোগ্য পুত্র বটে! আমাদের কাল হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশের বার করে দেওয়া হ'ত। কতই দেখলাম! আমি চোরের সন্ধানের জন্যে পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু কে জান্‌ত সে চোর আমার ঘরে, আমার শাশুড়ী-বৎসল ছেলে! সে টাকা আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে?"

অখিল কহিল, "না, এখন পার্‌বো না!"

বৈকুণ্ঠ ফুলিয়া ফুলিয়া ফুঁপিতে লাগিলেন। খানিক পরে কহিলেন, "শোন, আমাকে তুমি জান, সুতরাং বিবেচনা করে উত্তর দিও। যার জন্যে তুমি এতবড় পাপ কাজ, এতবড় কৃতঘ্নতার কাজ করেছ, সেই বৌকে তোমার ত্যাগ কর্‌তে হবে, তবে তোমাকে ক্ষমা কর্‌ব। পার্‌বে?"

অবিচলিত কণ্ঠে অখিল কহিল, "না।"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বৈকুণ্ঠ কহিলেন, "তবে যাও! দূর হও! আমার এ বাড়ীতে তোমার মত কুল-কলঙ্কের জায়গা

নেই। আর তোমার মুখ যেন আমাকে না দেখতে হয়। এই মুহূর্ত্তে দূর হও!"

অখিল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৈকুণ্ঠ তখন আপনার মনে চীৎকার করিতে লাগিলেন, "সবগুলো মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে পাগল ক'রে দেবে! চাইনা আমি কাউকে, দূর হয়ে যা সব!"

(৩)

খুড়িমা আসিয়া কহিলেন, "এ কি শুন্‌ছি অখিল?"

অখিল কহিল, "সব সত্যি খুড়িমা!

খুড়িমা কহিলেন, "ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গিয়েছে। কি হবে অখিল?"

অখিল কহিল, "যা হবে তা ত জান। আমাকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।"

খুড়িমা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন, "কেন এমন কর্‌লে বাবা? আমি যেমন বলেছিলাম তেম্‌নি ক'রে টাকার জোগাড় হ'ত, তাতে কোন গোল হ'ত না!"

অখিল হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তার চেয়ে ভাল জোগাড়ই হয়েছে। ও টাকা হয় সিন্দুকের কোণে পড়ে থাকৃত' না-হয় কোন ব্যাঙ্কে জমা হ'ত। তার চেয়ে যে ওটা মানুষের উপকারে লেগেছে তাতে ওর ঢের বেশী সার্থকতা হয়েছে। যা হয়েছে আমি তার জন্যে যে বিশেষ দুঃখিত হয়েছি তা নয়। আমরা পুরুষ, আমাদের খেটে খাবারই কথা। তারই সুযোগ এসেছে। সুতরাং এর জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না খুড়িমা।"

খুড়িমা কহিলেন, "তুমি এ.বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, এ-কথা মনে কর্‌তেও আমার বুক কেঁপে উঠছে। কেমন ক'রে তোমাকে না দেখে থাক্‌ব বাবা? আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।"

অখিল কহিল, "এ বাড়ীর সঙ্গে যে আমার সব সম্পর্ক শেষ হ'য়ে গেল তা আমার মনে হয় না। রাগ চিরদিন থাকে না, একদিন যখন রাগ শেষ হ'য়ে যাবে, তখন হয়ত ফির্‌তেও পারি। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা মাঝে মাঝে হবেই। তোমাকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে আমি বসে থাকৃতে পার্‌ব না খুড়িমা।"

অনুনয়, বিনয়, অনুযোগ, অভিযোগ করিয়াও খুড়িমা তাহাকে একটী দিনও ঘরে রাখিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন অখিল যাহা উচিত মনে করে, সে পথ হইতে তাকে ফেরানো সহজ নহে। সুতরাং অশ্রুজলস্নাত ও আশীর্ব্বচনে পূত করিয়া অখিলকে বিদায় দিতে. হইল।

* * * *

দেশ হইতে পাঁচ মাইল দূরে গ্রামান্তরে একটা ইংরাজী স্কুলের মাষ্টারী চাকরী অখিল গ্রহণ করিল।

একখানি ক্ষুদ্র মনোরম কুটীরে অখিল বাসা লইল; স্ত্রীকেও লইয়া আসিল।

নলিনী গরীবের ঘরের মেয়ে, সুতরাং স্বভাবতঃই নম্র! তাহার উপর তাহাকে লইয়া এই যে এতবড় একটা ঘটনা হইয়া গেল, সেটা যেন তাহাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া দিল। নূতন আসিয়া দু'দিন সে অখিলের সঙ্গে লজ্জায় কোন কথাই বলিতে পারে নাই, তাহার পর যখন অখিল একদিন

তাহাকে আদর করিয়া ডাকিল, তখন সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অখিলের এই দুর্দ্দশার জন্য একমাত্র সে-ই দায়ী! এ ক্ষোভ রাখিবার ঠাঁই নাই!

অখিল তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "নলিনী, এ আমাদের কিছুমাত্র দুর্ভাগ্য নয়। পুরুষ-মানুষের বিদেশে যাওয়াই স্বাভাবিক, মনে কর, আমিও তাই এখানে এসেছি। সুখ টাকায় হয় না, সুখ-দুঃখ মনে।"

কিছুদিনের মধ্যে তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। তাহাদের কুটীর-ঘেরা ফোটা বনফুলেরই মত এই নবদম্পতির জীবন পবিত্র মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। জীবনে যেন তাহাদের কোনও দিনই কোন ক্লেশ স্পর্শ করে নাই, এমনই!

* * * *

রৌদ্রদগ্ধ কাঠের মত বৈকুণ্ঠের জীবন একেবারে নীরস হইয়া গেল। জীবনে আপনার বলিতে যে ছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া সে একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল। সম্পত্তি দেখিয়া, টাকার হিসাব করিয়াও দিন কাটিতে চাহে না। দিনের কাজ করিয়া যে সময়টুকু বাকী থাকিত, তাহাতে বসিয়া বসিয়া সে অন্তরাগ্নির ইন্ধন যোগাইত। সে বেশ বুঝিতে পারে যে, তাহার জীবনসূর্য্য অস্তগগনের কাছাকাছি আসিয়াছে; এক-একবার মনে হয় তাহাকে ডাকি, কিন্তু না, তাহার ভিতরকার জীর্ণ, কঙ্কালসার সঙ্কীর্ণ জীবটী তাহার দীর্ণ অঙ্গুলি নড়িয়া কহে, না, না!

অবশেষে বছরখানেক পরে প্রবল জ্বর আসিল। বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করিল। মনে হইল সময় হইয়া আসিয়াছে,—হয়ত ডাক পড়িয়াছে। তখন ক্রোধ, ক্ষোভ, মান, অপমান সব মুছিয়া গেল, মনে হইল, সংসার হইতে যাইবার পথে শেষ-আশ্রয় না হইলে আর চলে না। মাথা ভাল করিয়া তুলিতে পারে না—এত ব্যথা, তবু মোটা মোটা অক্ষরে যা-তা করিয়া নিজের হাতে সে একটা চিঠি লিখিল, "বাবা শীঘ্র এস। শীঘ্র না এলে দেখা বুঝি হয় না।" তাহার পর গোমস্তাকে ডাকাইয়া কহিল, "আজ এখনই এ চিঠি অখিলের নিকট পাঠিয়ে দাও—বুঝ্‌তে পেরেছ? অখিলবাবু—আমার ছেলে।" বলিতে বলিতে চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে চিঠি পাইয়া অখিল তৎক্ষণাৎ বাহির হইল। যখন বাড়ী আসিল তখন রাত্রি গভীর। নলিনী শ্বশুরের মাথা আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইতেই বৈকুণ্ঠের চমক ভাঙ্গিল। ভাল করিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "মা এসেছিস্!" —বলিয়া বিড়্‌বিড় করিয়া কি বলিল, তাহার পর আপনার হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখ্‌ছিস্ কাঠ হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে—তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কি-না—তাই!" তার পর অখিলের ডান-হাত আপনার দুই হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আস্‌তে নেই—একবার আস্‌তে নেই?"

শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—দুই দিন রোগভোগের পর অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ, পর-পারে যাত্রা করিল।

(৪)

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর, অখিল ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় খুড়িমা আসিয়া কহিলেন. "আবার কোথায় যাবে?"

অখিল কহিল, "কর্ম্মস্থলে।"

খুড়িমা কহিলেন, "না, না, আর কোথাও যাবার দরকার নেই। সংসারের মাথা হয়ে যিনি ছিলেন, তিনি চলে গিয়েছেন, তোমার উপর ভার দিয়ে। তোমার ভাব্‌না কি বাবা?"

অখিল কহিল, "খুড়িমা, জান না?"

খুড়িমা কহিলেন, "কি?"

অখিল কহিল, "বাবা উইল করে বিনোদকে সব দিয়ে গিয়েছেন;—আমাকে ত্যজ্য-পুত্র করেছেন।"

খুড়িমা কহিলেন, "না!—বিনোদ আমার ছেলে, তাকে উইল করে দিলে আমি জান্‌তে পার্‌তাম না? তুমি থাক্‌তে বিনোদ? কে এ কথা বলেছে?"

অখিল বলিল; "বিনোদ।"

খুড়িমা কহিলেন, "বিনোদের কোন জ্ঞান হ'ল না। কি বল্‌তে হয় তা সে এখনও শিখ্‌লে না। সে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।"

অখিল কহিল, "বিনোদ উইলের প্রবেটের জন্য নালিশ করেছে; তার নোটিশ কাল আমার কাছে এসেছে।" খুড়িমা কহিলেন, "কি! নালিশ করেছে? অখিল! তুমি জেনো, সে মিথ্যা নালিশ। তোমার বাবা কোন দিন উইল করে তাকে এক কপর্দ্দকও দেন নি।"

অখিল কহিল, "খুড়িমা! আমি ত' ছিলাম না, আমার উপর রাগও করে-ছিলেন, হ'তে পারে উইল ক'রে গেছেন।"

খুড়িমা কহিলেন, "না—না—উইল করেন নি, করেন নি। এ আমি বেশ ভাল করে জানি। এ মিথ্যা কথা আমি শুন্‌ব না।"

অখিল চুপ করিয়া রহিল।

খুড়িমা কহিলেন, "অখিল! এ মাম্‌লা তোমায় লড়্‌তেই হ'বে। মিথ্যাকে বাড়তে দিলে চল্‌বেনা, তাকে নাশ করতে হবে।"

অখিল কহিল, "আমার সে ইচ্ছা নেই। উইল যদি সত্যি হয়ত কথাই নেই, মিথ্যা যদি হয়, তবু এ সম্পত্তি ভোগ কর্‌বে বিনোদ। সে ত' আমার ভাই-ই।"

খুড়িমা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তা হ'বেনা অখিল। আমি রাক্ষুসী হয়ে' এতদিন তোমাকে পিতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত করেছি, আজ আমার গর্ভের ছেলে যে তোমাকে পিতৃসত্ত্ব থেকেও বঞ্চিত কর্‌বে, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবোনা।"

অখিল কহিল, "তার ভোগ আমারই ভোগ করা।"

খুড়িমা কহিলেন, "তা নয়; তার ভোগ অধর্ম্মের ভোগ, অসত্যের ভোগ, তোমার ভোগ ধর্ম্মের!"

এমন সময় বিনোদ আসিয়া কহিল, "তোমাদের কি কথা হচ্ছে?"

বিনোদের মা কহিলেন, "বিনোদ, এসব কি শুন্‌ছি? উইলের কথা, তোমাকে সব দিয়ে যাবার কথা!"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তুমি ত সব জান, মা।"

বিনোদের মা কহিলেন, "মিথ্যাবাদী,

আমি জানি? তোমার অধর্ম্মের সাক্ষী আমি! ধ্বংসের পথে চলেছ তুমি, সঙ্গে নিতে চাও আমাকে? ও তোর মিথ্যা কথা, বানানো কথা!"

বিনোদ পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "এ দেখ্‌ছি আমাকে বঞ্চনা কর্‌বার ষড়যন্ত্র!"

বিনোদের মা কহিলেন, "ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে এখানে নয়, ঐ ওপরে! বিনোদ, সে ষড়-যন্ত্র থাম্‌বেনা যতদিন-না মিথ্যা, ধূলায় ধূলিসাৎ হয়, যতদিন-না পাপী মাটিতে লুটায়। মাতৃস্নেহ আমাকে বারণ কর্‌ছে নইলে এখনই আমি তোকে এম্‌নি অভি-সম্পাৎ দিতাম যা তোকে পুড়িয়ে দিত—ধ্বংস করে দিত। মা-র অভিশাপ এখনও মিথ্যা হয় না বিনোদ! তাই বলি, এখনও ফের্। আমাকে আর লজ্জা দিস্‌নে। মা-কে এমন অপমান করিস্‌নে।"

বিনোদ কহিল, "গভীর ষড়যন্ত্র! আমি চল্লাম।"

বিনোদের মা, উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "যাস্‌নে বিনোদ, এখনও ফের। এখনও চন্দ্র সূর্য্য ওঠে, ধর্ম্মে সইবেনা। এর পরে কেঁদে ফির্‌তে হ'বে।"

ততক্ষণে বিনোদ চলিয়া গিয়াছে। খুড়িমা কহিলেন, "দেখেছ অখিল, এতবড় দুঃসাহস! আমার মুখের সাম্‌নে আমাকেই মিথ্যাবাদী করা!"

অখিল কহিল, "ছেড়ে দাও না, খুড়িমা।"

খুড়িমা কহিলেন, "ছাড়্‌তে আমি পারিনে অখিল। আমি ছেড়ে দিলে কি মনে করেছ ও ছাড়া পাবে? ধর্ম্ম যেদিন জাগ্‌বে, সেদিন ওকে কে আট্‌কাবে? তাই আজ আমি ওকে আট্‌কাতে চাই, সে ভীষণ দিন যাতে না দেখ্‌তে হয়।"

অখিল কহিল, "আমার কিন্তু এ সব নিয়ে ঝগড়া কর্‌তে এতটুকু প্রবৃত্তি নেই।"

খুড়িমা কহিলেন, "তোমরা সবাই-মিলে আমার বিপক্ষে কেন দাঁড়িয়েছ জানিনে। ঝগড়া তুমি না কর, আমি কর্‌ব। আমারই দোষে তুমি তোমার সমস্ত থেকে বঞ্চিত হ'তে বসেছ। আমি ততদিন ঝগড়া কর্‌ব যতদিন-না তোমার অধিকারে তোমাকে ফিরিয়ে দি।"

(৫)

উইলের মকদ্দমা আরম্ভ হইল। বিনোদ সাক্ষী দিল যে টাকা চুরি করার জন্য অখিলের পিতা অখিলকে তাড়াইয়া দেন—সেই অবধি তিনি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তাহার পর তিনি সহসা পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়ার ঠিক্ পূর্ব্বেই উইল করেন। অখিলকে তিনি যে ত্যাজ্য-পুত্র করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানে। সুতরাং এ উইলে নূতন বা আশ্চর্য্য কথা কিছুই নাই। অখিলকে ত্যাজ্য-পুত্র করিলে বিনোদই পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী।

বিনোদের বক্তব্য শেষ হইলে তাহাকে জেরা করিবার জন্য বিপক্ষের উকিল দাঁড়াইলেন।

বিনোদ জানিত, অখিল এ মকদ্দমায় কোন তদ্বির করিতেছে না। তাহার পক্ষের উকিলকে দেখিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল। উকিল জেরার দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ নিজের হাতে চিঠি দিয়া অখিলকে ডাকিয়া পাঠান,

এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে অখিলের প্রতি তাঁহার সমধিক স্নেহই প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিনোদের সকল সাক্ষীই এই কথা বলিল। বিনোদের সাক্ষী শেষ হইলে অখিলের সাক্ষীর ডাক পড়িল।

বিনোদের মা, অন্নপূর্ণাকে একটা পাল্কী করিয়া কাঠগড়ার নিকট আনিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া রহিল এবং বিনোদের মুখ একখণ্ড কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা স্থির গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমি বিনোদের মা, অখিলের খুড়িমা। মা হইয়া বলিতেছি যে বিনোদের এ মকদ্দমা মিথ্যা! অখিল ও তাহার পিতার মনোমালিন্য হইয়াছিল এ কথা ঠিক্, এবং এই ভিত্তির উপরই এ মকদ্দমা গড়িয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু উইলের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অখিলের পিতা কোন উইল করেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং অখিলকে ডাকিয়া পাঠান এবং আপনার পূর্ব্ব-ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া তাহার প্রতি সমধিক স্নেহ প্রকাশ করেন।

উকিল জেরায় বলিলেন, "নিশ্চয় আপনার সহিত বিনোদের মনোমালিন্য আছে; না হলে মা হয়ে কেমন করে আপনি তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এলেন?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা বলেই এসেছি। মা হ'য়ে যদি অধর্ম্মের পক্ষ থেকে ছেলেকে না বাঁচাই ত কিসের মা? তার সঙ্গে আমার কোন মনোমালিন্য নেই।"

সুদীর্ঘ জেরা করিয়াও বিনোদের উকিলের কোন লাভ হইল না বরং ভিতরকার সত্য নাড়া পাইয়া বহ্নির মত আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুই দিন পরে বিচার ফল প্রকাশ পাইল। জজ্ সাহেব উইল মিথ্যা বলিয়াছেন এবং বিনোদের বিপক্ষে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার সত্যের বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

(৬)

অখিল কহিল, "শুনেছ খুড়িমা, বিপদের কথা।"

খুড়ীমা কহিলেন, "কই, না।"

অখিল কহিল, "জজ্ সাহেব নিজে থেকে বিনোদের উপর জাল-করার মকদ্দমা চালিয়েছেন।"

অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই ভয়ই বরাবর করেছিলাম অখিল!"

বিনোদ কহিল, "মকদ্দমার জন্য কলকাতা থেকে একজন ভাল ব্যারিষ্টার আনিয়েছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয়।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বাবা! ঐ অদৃষ্ট জিনিষটা সব চেয়ে ভয়ানক! সে ত' খেয়ালের উপর চলে না। তার জন্যে মানুষ নিজে যে মাটী খুঁড়ে রাস্তা তৈরী করে রাখে! সে রাস্তা দিয়ে একদিন সে ধূলো উড়িয়ে গর্জ্জন করে আসবেই—তাকে আট্‌কায় কে?"

অখিল কহিল, "দেখা যাক্ চেষ্টা করে।"

চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু কোন ফল হইল না। বিনোদের সশ্রম দুই বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল। তবুও বিচারপতি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপীলেও কোন ফল হইল না।

সংবাদ যখন অন্নপূর্ণার কাণে পৌছিল তখন তিনি শয্যা আশ্রয় করিলেন, কহিলেন,

"এ আমি জান্‌তাম যে পাপের কঠিন সাজা সেই পাবে। কিন্তু আমি মা! বুকের রক্ত দিয়ে যাকে মানুষ করেছি, বুক যে তার জন্যে ভেঙ্গে যায়!"

অখিল একবার বলিয়াছিল, "খুড়িমা, বিনোদ যখন উইলের মকদ্দমা করেছিল, সেই সময় তাকে ছেড়ে দিলেই ত হ'ত।"

অন্নপূর্ণার সজল দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল; কহিলেন, "না, আমি যা করেছি তার চেয়ে একবিন্দু কম কর্‌তে পার্‌তাম না। অখিল, তুই কি ভেবেছিস্ মা শুধু ছেলেকে স্নেহ দেবার জন্যে? তার অন্য কাজ নেই? তাকে হাতে ধরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে মা,—তার মিথ্যাকে বাড়িয়ে দেবার জন্যে মা? না; মা-র কাজ তাকে শাসন করা, তাকে শিক্ষা দেওয়া, মিথ্যের ফল থেকে তাকে বঞ্চিত করা।"

দিন যত যাইতে লাগিল অন্নপূর্ণা ততই ধীরে ধীরে শয্যায় লীন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। বুকের মাঝখানে হঠাৎ বেদনা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ছায়ার মত নলিনী তাঁহার সেবা করিত, তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেন, বলিতেন, "মা, কোনরকম ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ সেদিন পর্য্যন্ত, যেদিন বিনোদ ফিরে আস্‌বে। তারপর তোমার ছুটী, তখন আমার সকল আলো, সকল অন্ধকার নিবে যাবে!"

অখিল কহিত, "খুড়িমা, তোমার কি কষ্ট হয়—এমন কেন হয়ে যাচ্ছ?"

অন্নপূর্ণা কহিতেন,—"বাবা, আমার যা-কিছু কষ্টের ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। পাপী এখন পাপের শাস্তি পাচ্ছে—সেই শাস্তি শেষ করে যখন সে আস্‌বে তখন সে নির্ম্মল! তাকে একবার সেই রকম দেখে যাব!—সকালবেলাকার শিশিরে ধোয়া ফুলের মত শাদা!

বসাইয়া না দিলে বসিতে পারেন না, দেহ যেন কঙ্কালসার, তবু মনের তেজ যেন আগুনের মত! তিনি বলিতেন, "আমি যদি না তার মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিতাম, আমি যদি না তার শাস্তির উপলক্ষ্য হ'তাম, সে যদি মিথ্যা নিয়ে কোনরকম ক'রে বেঁচে যেত, তা হ'লে? তাহ'লে তার জন্যে যে ভীষণ শাস্তি সঞ্চিত থাকৃত, তার কথা মনে কর্‌তেও প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাহ'লে তাকে কি কখনও ফিরে পেতাম?—পাপ থেকে মুক্ত, সুনির্ম্মল, সুপবিত্র আমার নাড়ী-ছেঁড়া মাণিক!

* * * *

দু'বৎসর পরে আজ বিনোদ ফিরিবে। সকল-বেলা অখিল খুড়িমাকে সেই কথা বলিয়া তাহাকে আনিতে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞান-অজ্ঞান, আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া অন্নপূর্ণার দিন কাটিতেছে।

গাছের পাতার শব্দ হইলে উৎকর্ণ অন্নপূর্ণা কহিতেন, "দেখতো বউমা, এলো বুঝি! তারা দুজনে এলো বোধ হয়। ছোট বড় দুই ভাই। সদর দরজা বন্ধ নেই ত'? খুলে দিতে বল। তারা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকৃবে যে!"

নলিনী কহিল, "এখনও তাঁরা আসেননি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আসে নি? আশা

দিয়ে—এল না? আমি পাঠালাম, কিন্তু ফেরাতে পার্‌লাম না!"

এম্‌নি করিয়া সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যার সময় গাড়ীর আওয়াজ হইল। নলিনী কহিল, "এইবার তাঁরা আস্‌ছেন।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আস্‌ছে? আঃ! দু'জনে আস্‌ছে? দুই ভাই মিলে?"

নলিনী কহিল, "হ্যাঁ।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে আমাকে আস্তে আস্তে বসিয়ে দাও। আলোটা বাড়িয়ে দাও। বউমা, তাড়াতাড়ি কর। ঘরে ঢুকে বাছা যদি অন্ধকারে মা বলে না চিন্‌তে পারে! সে আবার সবসময়ে আমাকে ভাল করে চিন্‌তে পারে না।"

অখিল ও বিনোদ ঘরের ভিতর ঢুকিল। একমুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বিনোদ উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্নপূর্ণার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল—"মা, মাপ কর।"

অন্নপূর্ণা তাহাকে কোনরকমে দুই হাতে ধরিয়া বারবার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা আমার, মাণিক আমার, আগুনে-পোড়া সোণা আমার, হয়েছে—তোমার মাপ হয়ে গিয়েছে, ঐ ওপর থেকে হয়ে গিয়েছে। আম্‌রা দু'জনে পুড়ে তোমাকে খাঁটি করেছি।"

ছোটছেলের মত মা-র বুকে মুখ লুকাইয়া বিনোদ কাঁদিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা অখিলকে কহিলেন, "বাবা,, তোমার এই ছোট ভাইটিকে ধুয়ে-পুঁছে নির্ম্মল ক'রে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। আজ আমার কোন দুঃখ নেই, কোন বাসনা নেই,—সব সফল সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

নলিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বউমা জানলাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও। বুকের ভিতরটা কেমন করছে!"

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তার রূপ

চিহ্ন কিছুই নাই তাহাতে বিধির বিশেষ দক্ষতার,
চক্ষু ভ'রে দেখার মতন—বলার মতন লক্ষবার!
রঙ্গ-সুলভ অঙ্গ-বিলাস নাই সে চরণ-ভঙ্গিমায়,
পরশ তাহার ফুটায় না ফুল আকুল ধরার আঙ্গিনায়।

অবাক্-করা তৃপ্তি তাহার সুপ্তি-অলস পক্ষ্মজালে
অমোঘ-মদন-কুসুম-শায়ক নাই লুকানো অন্তরালে।
রক্ত-জবার ঠোঁটের মতন আল্‌তা-বিলেপ ওষ্ঠে নাই,
গণ্ডদেশে ভণ্ডহাসির টোল-খাওয়া না দেখতে পাই!

তিলোত্তমার নাই তুলনা তাহার রূপে বিদ্যমান,
নীল গগনের রঙ্‌ ফলিয়ে সহজ-গড়া অঙ্গখান!
অচল প্রভাত-রবির শোভা সিঁদুর-কোটার রশ্মিজাল
অলক-সীঁথির জলদ-সীমায় সঞ্চিত তার নিত্যকাল

নীলাম্বরীর অন্তরালে নিত্য করেন লক্ষ্মী বাস,
সলাজ আঁখির নীরব ভাষায় হৃদয়ভরা প্রেমবিকাশ!
চক্ষে আমার তার তনুতে নিখিল ভুবন বিলীন হয়,
রূপত প্রাণের ভাবের ছায়া, ব্যাপ্তবিরাট বিশ্বময়!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অভ্র-আবীর*

প্রতিভার একটা গুণ যা সাধারণতঃ দেখা যায় তা হচ্চে প্রাচুর্য্য। অবশ্য এ প্রাচুর্য্য অক্ষমতার প্রাচুর্য্য নয়—অর্থাৎ গতানুগতিক থোড়-বড়ি-খাড়ার প্রাচুর্য্য নয়;—এ হচ্ছে নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রাচুর্য্য। বাঙ্গলার নবীন কবি-কুলের মধ্যে আমরা এমন-এক কবির সন্ধান পেয়েছি যিনি এই প্রাচুর্য্যের অধিকারী। তিনি হচ্ছেন "অভ্র-আবীর"-প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থের কবি—সত্যেন্দ্রনাথ। ইনি অল্পদিনের ভিতরেই অনেকগুলি কাব্য-রচনা করে রসিক সমাজকে বিস্মিত করে দিয়েছেন।

সুধু প্রতিভাসুলভ প্রাচুর্য্যের জন্যে নয়—আরো কতকগুলি গুণের জন্যে তিনি এমন ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা বাঙ্গলার উঠ্‌তি কবিদলের ভিতরে আর-কেউ পারেন-নি। তাঁর এই অনন্যসুলভ গুণগুলি আমাদের বিশেষ-করে মুগ্ধ করেছে।

প্রথম, সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা। আজকাল সকলেই যে-ভাষায় লিখছেন, সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সেই ভাষাতেই কলম চালিয়ে সাদা কাগজ কালো করেন-নি। খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার ভিতরে যে জোর, যে ঝাঁঝ, যে সুর লুকানো আছে, তার খবর তিনি খুব ভালরকমেই জানেন। এত-বেশী চল্‌তি শব্দ নিয়ে এ-যুগে তাঁর আগে আর-কেউ কবিতার মালা গাঁথতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লোকে যাকে ঘৃণায়-অবহেলায় অকেজো করে রাখতে চায়, সেই আমাদের যথার্থ প্রাণবন্ত, 'অসাধু'-আখ্যায়-নিন্দিত খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার বহু শব্দ কবিসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টির বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাতে তাঁর অনেক কবিতা বাঙ্গলা-দেশের গন্ধে এমন ভুর-ভুরে হয়ে উঠেছে যে মনপ্রাণ ভরে যায়;—বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস, তার আবহাওয়া, তাদের যেন ঘিরে আছে; ফুলের মতন তাদের ফুটিয়ে তুলেছে! নাচতে না জানলেই উঠোনের দোষ। যারা অক্ষম, তারাই 'কথ্য'কে, অকথ্য' ভাষায় গাল পাড়ে। যিনি ওস্তাদ, তিনি যে জায়গা বুঝে, ওজন বুঝে, সুর বুঝে, ছন্দ ও তাল বজায় রেখে চল্‌তি শব্দে মোলায়েম ঝঙ্কার তুলে প্রাণমন তর্ করে দিতে পারেন সে পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। যারা আনাড়ি, তারাই ভাষার নাড়ির খবর না জেনে কেবল গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলে।

বাঙ্গালীর জীবনে প্রতিদিনকার খুঁটি-নাটির ভিতর, কিম্বা তার বারো-মাসের তেরো পার্ব্বণের মাতামাতির ভিতর যে ভাবের সঙ্গে যে ভাষা জড়িয়ে আছে সে ভাষার পরিচয় আমাদের সাহিত্যে কৈ? মোটামুটি রকমের বলা নয়;—বাঙ্গালী কেমন করে কাঁদে, কেমন-করে হাসে, কেমন-করে আদর করে, কি বলে গাল পাড়ে, কি বলে প্রিয়জনদের ডাকে, যে রঙ্গে তার চোখ

---

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভোলে সেই রঙের নানারকম সূক্ষ্ম-ভেদের সে কি নাম দিয়েছে, তার রোজকার দরকারের কিম্বা উৎসব-দিনের ব্যবহারের জিনিষ কি—এগুলি এবং এ-ছাড়া আরো অনেক জিনিষ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাদের বল্‌তে হবে—নইলে ভাষা অনেকখানি বোবা হয়ে থাকবে। সত্যেন্দ্রনাথ ভাষার বোবামি দূর করবার চেষ্টা করেছেন বলে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ করছি। যে ভাষা যতদূর বেশী প্রকাশ করে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের স্পন্দন পর্য্যন্ত যাতে যতটা ধরা পড়ে সে-ভাষা তত পূরন্ত। আমাদের ভাষাকে পূরন্ত করার জন্যে আমাদের ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারটা খুলে দেখা এখন দরকার হয়ে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ভাল করেছেন।

দ্বিতীয়—ছন্দ। "অভ্র-আবীর" বিচিত্র ছন্দলীলায় ঢল্‌ঢল্ করছে। হালের বাজারে এত রকমারি মন-মজানো ছন্দ নিয়ে আর-কোন নতুন কবিকে আমরা আসর জম্‌কাতে দেখি-নি। কবিতার দেহ, ছন্দের স্বচ্ছন্দ বন্ধনে যুক্ত হলেও তার প্রাণ যে মুক্ত থাক্‌তে পারে, সত্যেন্দ্রনাথ তা উপযুক্তরূপেই দেখিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থে, প্রচলিত-পুরাতন ও অপ্রচলিত-পুরাতন—দুই শ্রেণীরই হরেক-রকমের ছন্দের ঝুমুর বাজিয়েছেন; সুধু তাই নয়—নিজের মাথা থেকেও অনেকগুলি নূতন ছন্দ আবিষ্কার করে তাঁর সৃজন-শক্তির আভাস দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এত ছন্দের পরও তিনি যে ছন্দের নূতনত্ব দেখাতে পেরেছেন—এ তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। তাঁর "পিয়ানোর গানে"র ছন্দ অপূর্ব্ব। এই গান যখন প্রথমে মাসিকের আসরে গাওয়া হয়, তখন কেউ-কেউ তার ঝঙ্কার-মাধুর্য্য না-বুঝেই ব্যঙ্গ-ধনুকে টঙ্কার দিয়েছিলেন। কিন্তু পিয়ানোর টুং-টাংএর সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাঁরা এ গানটি গাইবেন, তাঁরাই বুঝবেন এই ছন্দের সার্থকতা কতখানি!

তৃতীয়,—বিষয়-বৈচিত্র্য। নিজের দেশ, তার সমাজ, তার ইতিহাস, তার দেবতা; দেশের মানুষ, তার মন, তার শৈশব, তার যৌবন—সমস্ত বিষয় নিয়েই কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। জায়গায়-জায়গায় তিনি এমন-সব সাধারণ বিষয় নিয়ে অসাধারণ কবিত্ব সৃষ্টি করেছেন যে, আশ্চর্য্য হতে হয়; কেননা, সে-সব বিষয় নিয়ে যে কাব্য-রসের বিকাশ হতে পারে, অনেকে তা মনে আনতেও ভরসা পাবেন না। একঘেয়ে, পচা, পুরানো বিষয় নিয়েই কেবল কস্তাকস্তি, ধস্তাধস্তি ও রগ্‌ড়া-রগ্‌ড়ি করছেন বলেই,—নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারছেন না বলেই, আমাদের নূতন কবিরা দেশের মন-দখলে অক্ষম হচ্ছেন। কবিত্বের স্ফূর্ত্তি—নূতনত্বে; এ সত্যটি ভুলে গেলে চলবে কেন?

নবযুগের কবিরা আঁতুড়-ঘর থেকেই ভগবানের নাম-গান সুরু কর্‌তে পারেন, মাতৃ-স্তন্যের স্বোয়াদ না ভুলতেই প্রেমের গান ধর্‌তে পারেন—কারণ, তাঁদের কবিতার জন্ম অনুভূতিতে নয়—অনুকরণে। সাত নকলে কেবল আসল খাস্তা হচ্ছে—নূতন ভাবের সাড়া উঠছেনা। সত্যেন্দ্রনাথ এ-দলের বাইরে;—তিনি পরের প্যান্‌ত্‌ড়ামারা নন

বলেই "তাতারসির গান", "বনমানুষের হাড়" "কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ" ও "কাজরী-পঞ্চাশৎ" প্রভৃতি পরমসুন্দর কবিতা রচনা করতে পেরেছেন।

'তাতারসি' দেখে, তাকে কাব্যের মধ্যে ঠাঁই দিতে পারেন কজন? সত্যেন্দ্রনাথ যে খাঁটি বাঙ্গলার প্রাণকে আপন প্রাণে কতটা বেশী অনুভব করেন, এই "তাতারসির গানে" তার প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান। 'তাতারসির মাতানো বাসে,' মেতে তিনি বলেছেন :—

"রসের ভিয়ান বার করে ভাই গুড় করেছে কে?
—গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে;
গুড়ের জনম-ঠাঁই এ বলে
জগৎ এরে গৌড় বলে
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিয়ান বার করেছি আমরা মন থেকে।

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্যজাতির আমরা বাঙালী।"

"বনমানুষের হাড়" কবিতাটিতেও সত্যেন্দ্রনাথ, কবিজনসুলভ অসাধারণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আর্টিষ্টের কাছে প্রকৃতিতে তুচ্ছ বলে কোন পদার্থ নেই; আমরা যাকে সামান্য ভাবি আর্টে তা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে; আমরা যাকে অযোগ্য ও তুচ্ছ মনে করি, আর্টে তা ভোগ্য ও পূজ্য হয়ে ওঠে। বনমানুষের হাড়ে আমরা আকর্ষণ করবার কিছুই পাই না—কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি মহৎ ও গম্ভীর ভাববিকাশ করতে সেই 'বনমানুষের হাড়'কেই অবলম্বন করেছেন। এখানে আমরা সত্যিকার আর্টিষ্টের হৃদয় দেখতে পাই।—

"বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুট্‌ল ভুবনে!
মনের পাগল জাগ্‌ল, ও সে জান্‌ল কেমনে!
ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর খাড়,
(তবু) পঞ্জরে তোর জাগছে কি ও? বনমানুষের হাড়!
[কোরাস] (ও যে) বনমানুষের হাড়!

ভেল্‌কি চলে গো ভুবন জুড়ে ভেল্‌কী চালায় সে!
হিসাব-কিতাব গুলিয়ে দিয়ে শাস্ত্র জ্বালায় রে!
(ও সে) মানেই নাক' বেদের পুঁথি কিম্বা বেদব্যাস!
জ্বালিয়ে কেতাব আগুন পোহায় এম্‌নি বদ্ অভ্যাস!
আগুন লাগায় ভূত সে ভাগায় দেয় করে সাবাড়!
[কোরাস] (ও যে) বনমানুষের হাড়।

বনমানুষের হাড় পেয়েছে শাক্য-কেশরী,
(ও সে) বিজন বনে পালিয়ে গেছে প্রাসাদ পাশরি।
আর পেয়েছে—পেয়েছে গো কমল-মুখী রাই!
(ও সে) কলঙ্কিনী নাম কিনেছে (কুলে) ছায়নি ক' ঠাঁই!
(তবু) অন্তরে তার ফুটেছে ফুল—কদম-ফুলের ঝাড়
[কোরাস] (ও যে) বনমানুষের হাড়!"

সমস্ত কবিতাটি যিনি পড়বেন, তিনিই মুগ্ধ হবেন;—এমন চমৎকার, মৌলিক ও জমজমাট্ লেখা যে নবযুগের কোন নব্য কবির কলম থেকে বেরুতে পারে—আগে আমাদের সে ধারণা ছিল না।

চতুর্থ,—সাময়িক কবিতা। নূতন কবিদের মধ্যে বিশেষ করে এ তল্লাটে সত্যেন্দ্রনাথের যুড়ি আর-কেউ নেই। আমাদের সমাজে, সাহিত্যে ও দেশে যখন যে-কোন

ভাবের লহর উঠেছে, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ তখনি তা অনুভব করেছে।

তাঁর এই সাময়িক কবিতাগুলির একটি মস্ত গুণ আছে। সাময়িক কবিতা সার্থক হয় সাময়িক উত্তেজনার দ্বারা;—তাদের জীবন হচ্ছে সাবান-ফেনার বুজ্‌গুড়ির মতন ক্ষণিক; সাময়িক উত্তেজনা কেটে গেলেই তারা মারা পড়ে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ সাময়িক কবিতাতেই স্থায়ী-সাহিত্যের মালমশলা আছে অঠেল পরিমাণে।

পঞ্চম—কবির প্রাণ। আজকাল কবিতা লেখা হচ্ছে যত-খুসী, কিন্তু তাদের মধ্যে কবি-প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না একটুও। অধিকাংশ কবিতাই, হয় রবীন্দ্রনাথের, নয় অন্য-কোন শক্তিধর কবির নকল, সে-সব অনুকৃতির গুণ:—ছন্দ, মিল ও ভাষার লাবণ্য; তার দোষ:—কবির প্রাণের একান্ত অভাব। কবিতার মধ্যে লোকে কবির তাজা প্রাণটাকেই খোঁজে;—জান্‌তে চায়, কবির নিজের কথা কি বলবার আছে, তাঁর প্রাণের স্বাধীনতা কতটা, উদারতা কতটা, গভীরতা কতটা;—তিনি কি চোখে এই বিশ্বকে দেখছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-শিষ্য; রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে এবং সেইটেই স্বাভাবিক; কিন্তু তা-বলে সে প্রভাবে এই নবীন কবির তরুণ প্রাণটি ঢাকা পড়ে যায়-নি। সত্যেন্দ্র-নাথের সকল কবিতাতেই কবির প্রাণের স্পষ্ট ছাপ্‌,—কবির নিজস্ব বিশেষত্বের শীলমোহর মারা আছে। তিনি নিজের কথা নিজের মতন করে বলতে পারেন। আপন মনের কথা পরের মনের মতন হল কিনা, সে-সব কথায় শাস্ত্রীদের টিকি এবং সমাজ-পতিদের মাথার টনক নড়ে উঠবে কিনা এবং তথাকথিত টিকি-আন্দোলন প্রভৃতির ফলে ঘরে-বাইরে তাঁকে একঘরে হতে হবে কিনা—এই পরমসাহসী তরুণ কবি তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান-নি;—অন্তরে যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, বাইরে তাকে সত্য এবং সুন্দররূপে প্রকাশ করতে তিনি আদোপেই পিছপাও হন-নি। যেমন:—

"হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,—
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি'।"

"ধর্ম্ম নাকি নষ্ট হবে!...বাংলা দেশের বাইরে, হায়,
হিন্দু কি আর নেই ভারতে?...কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যায়?
তারা কি কেউ পালন করে একাদশীর নির্জ্জলা?
ভ্রষ্ট সবাই?...বঙ্গে শুধুই হিঁদুয়ানী নিশ্চলা?"

বরপণ-প্রথার বিরুদ্ধে কবি বলছেন:—

"সত্যিকারের পুরুষ যারা ফির্‌ত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিলনা'ক লোলুপদৃষ্টি শ্বশুড়-বাড়ীর মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।"

কবির "ইজ্জতের জন্য" ও "৺গোখ্‌লে" প্রভৃতি কবিতাও নব-ভারতের মূর্ত্ত বাণীর

মত। এ-সব কবিতা যে সুধুই কবির প্রাণকে খোলা-বইএর মত সকলের সুমুখে তুলে ধরছে—তা নয়; এরা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছে, দেশের মর্ম্মব্যথা ও তার স্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছে। নবযুগের আর কোন্ নবীন কবির কাব্যে এমন কবিত্বস্নিগ্ধ দেশের কথা শোনা যায়?

ষষ্ঠ,—সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য। ভাষার বৈচিত্র্য, বিষয়ের বৈচিত্র্য, ছন্দের বৈচিত্র্য—একসঙ্গে এত বিচিত্রতা কোন-একখানি কাব্যে সহজে চোখে পড়ে না। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী সত্যেন্দ্রনাথ দুরস্ত করে ফেলেছেন—যাদের অল্প-পুঁজি, তাদের মত তিনি সকালে বেহাগ বা অকালে ভৈরবী ধরে যাচ্ছেতাই করেন-নি, কিংবা সমঝদারের কান ঝালাফালা করে দেন-নি। এখনকার বেশীরভাগ কবিই দু-চারটির বেশী সুর জানেন না; দেশ মরুক-বাঁচুক, কাঁদুক-হাসুক—'স্বর্ণলতা'র 'নীলকমলের মত তাঁরা সেই এক 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিল' বলে গলা-ছেড়ে চীৎকার করতে থাকেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'সুরবাহারে' সুরের বাহার আছে;—সুরের আগুন তা-থেকে ফুলঝুরির মতই ঝরে-ঝরে পড়ছে—কখনো দীপক কখনো মল্লার, কখনো পুরবী কখনো ভৈরব, কখনো ইমন-কল্যাণ কখনো ললিত। কখনো তাঁর সুর রৌদ্রের মত কঠোর, কখনো জ্যোৎস্নার মত কোমল, কখনো মেঘের মত গম্ভীর আবার কখনো-বা ঝরণার মত তরল। সুরের খেলায় তিনি আমাদের প্রাণ মাৎ করে দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সৌন্দর্য্য এখানে দেখাতে গেলে চল্‌বে না; আমরা অভ্র-আবীরের সুধু গুটিকয় কুম্‌কুম্ সংগ্রহ করে দিলামঃ—

সমুদ্র-বন্দনা ঃ—

"সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয়।
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।"

বাদলের দুখানি শব্দচিত্র ঃ—

"তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!"

"(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী
নিবিড় বাদলে—
শ্যামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে!"

"গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি"র অপূর্ব্ব স্তব।ঃ—

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজার গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভারত নন্দনে;
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বল্‌ছে চিতা, তুল্‌ছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুইগো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী।"

একখানি ছোট ছবি ঃ—

"দেখ্‌ছি তুমি আস্‌ছ নেমে—আস্‌ছ নেমে নেমে
শৈল-শিলায় চরণ রেখে রেখে,
ঝঞ্ঝা-তরস ঝরছে ঝিলম পায়ের পাতা ঘেমে

পাষাণ-সোপান ঢাকা দিয়ে ঢেকে ;
ঝর্ণা-ঝোরার ঝারির ধারা পাতে
ঝরছে তোমার অমৃত দিন-রাতে।
চক্ষু সফল হোক দেখে ওই বিনিসূতার গাঁথা
বলাকা-বকফুলের মালা তব,
স্বর্ণমেঘে মায়ামৃগ-চর্ম্ম-আসন পাতা
সন্ধ্যাদেবীর স্বপ্ন-সমুদ্ভব।"

কিন্তু এ-সব খণ্ড সৌন্দর্য্যের নমুনা দিয়ে কবির ভাব-যমুনার প্রশস্ত ধারা দেখানো যাবে না। যাঁরা তা দেখতে চান, তাঁদের এই কাব্যগ্রন্থখানি দরদ-করে পড়তে হবে। সে পড়া শাস্তি না-হয়ে যে সুখের হবে তা আমরা বলতে পারি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

উত্তর বাতাস

উত্তর বাতাস,
দূর শুভ্র হিমমেরু পারাবার হ'তে
স্বচ্ছ অন্ধকার দীর্ঘ রজনীর পথে
চিরস্থির ধ্রুবতারকার দৃষ্টি নিয়া
কি বারতা আনিলে বহিয়া,

অতি ধীরে বক্ষে মোর ফেলিলে নিশ্বাস,
পরিপূর্ণ শরতের গভীর আশ্বাস—
চিরজীবনের যত অকথিত বাণী
নিঃশব্দে ভরিল বক্ষখানি,
জীবন করিল পূর্ণ নূতন জীবনে
বীতরাগ প্রদোষের প্রচ্ছায় ভুবনে!

কবে একদিন
চন্দনসুরভি-ভ্রান্ত চঞ্চল বাতাসে
কাঞ্চন-লাঞ্ছন শোভা চম্পক-সুবাসে,
রক্তরাঙা অশোকের চেলাঞ্চল ভরি
এসেছিল বাসন্তী-অঞ্জলি,
পীত রৌদ্রে বসুন্ধরা হয়েছিল লীন
কল বিহঙ্গের গানে সারাদীর্ঘ দিন,
আনন্দের নহবৎ প্রহরে প্রহরে
বেজেছিল অন্তরে অন্তরে!
পলাতক সুখ-পাখী স্তব্ধ গীত-গান—
ঝরা ফুলে বসন্তের অন্তিম প্রয়াণ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছন্নছাড়া

(৭)

পরের রবিবারটা ইষ্টার-রবিবার পড়ল। আল্‌ফঁস্‌-গিন্নীর গাড়িতে চড়ে এদেল গির্জ্জেয় চলে গেল। আমি একলা একটা চাষীর সঙ্গে বাড়ি-আগ্‌লাবার জন্যে রইলুম। চাষীটা খাওয়া-দাওয়া করে দুপুর-বেলা ফটকের সামনে খড়-গাদার উপরে ঘুম দিতে লাগল। আমি সময় কাটাবার জন্যে আমার সেই ছোট বাগানটিতে গিয়ে বসলুম। গির্জ্জের ঘণ্টা শোনবার আশায় আমি কান পেতে রইলুম কিন্তু গোলাবাড়িটা আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক দূর বলে ঘণ্টার শব্দ পাওয়া গেল না।

আমি তখন মারি-এমের কথা ভাবতে আরম্ভ করলুম। ভাবতে-ভাবতে সোফিকে আমার মনে পড়ে গেল। সে ফি-বছর এই ইষ্টারের ঘণ্টা আগা-গোড়া-সমস্ত শোনাবার জন্যে আমায় জাগিয়ে দিত। এক-বছর পারেনি, তাইতে তার এত আপশোস হয়েছিল যে পরের বছর যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার জন্যে মুখের ভিতর একটা বড় পাথর সে পুরে রেখেছিল। যেমন তার ঝোঁক আস্‌ত, দাঁতে পাথরটা লাগত, আর ঘুম ভেঙে যেত।

আমি বসে-বসে আমাদের সেইসব উৎসবের কথা ভাবতে লাগলুম, যাতে কোলেৎ তার সেই চমৎকার গলায় গান গাইত। ভাবতে-ভাবতে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে লাগলুম আমাদের সেই বিকেলটি ঘাসের উঠোনের উপরে এসে পড়েছে, আর মারি-এমে আমাদের উৎসবের সময়কার সান্ধ্য-ভোজের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। আজকের রাত্রে খাবার সময় মারি-এমের সেই হাসি-হাসি মুখের বদলে আল্‌ফঁস্‌-গিন্নীর কর্কশ মুখ, আর তার স্বামীর সেই চিক্‌-চিকে চোখ, যা দেখলে আমার ভয় করে, তাই দেখতে হবে! বসে থাকতে-থাকতে এই কথাই কেবল মনে উঠতে লাগল—হায়, আরো কতদিন এইখানে আমায় থাকতে হবে কে জানে!—আমার কান্না পেতে লাগল।

কাঁদতে-কাঁদতে যখন অবসন্ন হয়ে পড়লুম, তখন দেখি সূর্য্য পাটে বসেছেন। আমার সেই বসবার ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম ঝাউগাছের ছায়াগুলো ঘাসের উপর ক্রমেই গা-ঢেলে দিচ্ছে, আর আমার খুব কাছে একটি লম্বা ছায়া—ধীরে ধীরে নড়ছে। একবার সেটা এগিয়ে এল, তারপর স্থির হয়ে রইল—তারপর আবার এগিয়ে এল। আমি তখনই বুঝতে পারলুম নিশ্চয় কেউ আমার এই লুকানো জায়গাটির পাশে চলা-ফেরা করছে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখি সাদা আলখাল্লা-পরা সেই মানুষটি আমার ঝোপের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে—গাছের ডাল-পালা সরিয়ে, গুঁড়ি মেরে-মেরে। আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। চট্‌-করে আমি নিজেকে সাম্‌লে নিলুম বটে কিন্তু কাঁপুনিটা চাপতে পারলুম না। সে আমার সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বসে-বসে তার সেই স্নিগ্ধ চোখদুটি দেখতে লাগলুম; আমার

শরীরের উত্তাপ আবার ফিরে এল। আমি দেখলুম ইউজেন যেমন পরত, সেও তেমনি একটা রঙিন কামিজ পরেছে, এবং তার গলায় একটা গলাবন্ধ বাঁধা। সে যখন কথা কইলে তখন মনে হল সে-স্বর যেন আমার অনেক দিনের জানাশোনা। আমার সামনের একটা মস্ত ডালের গায়ে ঝুঁকে পড়ে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে, আমার কি আপনার-বলতে কেউ নেই? আমি বল্লুম—না। অম্‌নি তার চোখের দৃষ্টি সেই নতুন পল্লবে ঢাকা ডালটির গায়ে বুলিয়ে গেল; আমার দিকে মুখ-তুলে না চেয়েই সে আবার বল্লে—তা'হলে তুমি এ পৃথিবীতে একেবারে একা! আমি বলে উঠলুম—না, না! আমার মারি-এমে আছে। তারপর অন্য কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দিয়েই আমি বলে যেতে লাগলুম, মারি-এমেকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ যে কী ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তা বলতে পারিনে! —কবে দেখা হবে সেই আশা এখনো বুকে আঁকড়ে আছি। তাঁর কথা বলতে-বলতে আমার এত আনন্দ হতে লাগল যে আমি কথা থামাতে পাল্লুম না। তিনি এমন চমৎকার সুন্দরী, এত বুদ্ধিমতী যে আমার মনে হয় তার তুলনা এ জগতে নেই—এ-কথাও তাকে বল্লুম। আরো বল্লুম যে আমাকে ছেড়ে দিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল এবং আমাকে ফিরে পেলে তাঁর যে কি আনন্দ হবে তা আমিই জানি।

যখন আমি এই সব কথা বলে যাচ্ছিলুম, তার চোখ আমার মুখের উপরেই স্থির হয়ে পড়েছিল—কিন্তু মনে হচ্ছিল সেই চোখ যেন তা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখচে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে —"এখানে কি তোমার বন্ধু কেউ নেই?" আমি বল্লুম—"না! যাদের আমি ভালো বাসতুম তারা সবাই চলে গেছে।" তার পর খানিকটা রাগের সঙ্গে বলে ফেল্লুম— "এরা শেষে জাঁ-ল্যা-রুজকেও তাড়িয়ে তবে ছেড়েছে!" সে বল্লে—"কিন্তু আল্‌ফঁস্‌-গিন্নী কি সত্যি তেমন নিষ্ঠুর?" আমি বল্লুম— "তাঁর নিষ্ঠুরতাও নেই, দয়াও নেই;—তাঁর উপর আমার এতটুকু মায়া বসেনি।"

এই সময় আল্‌ফঁস্‌-গিন্নীর গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। আমি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম—সে একটু হটে গিয়ে আমায় পথ ছেড়ে দিলে। আমি তাকে সেই ঝোপের মধ্যে একলা রেখে চলে এলুম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এদেলের মেজাজ আশ্চর্য্য রকমের খুসি দেখে আমি তাকে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলুম যে সে 'নষ্ট ফোর্ডের" কোনো চাষীকে চেনে কি-না। সে বল্লে যে সে কেবল পুরোনো লোকদেরই চেনে, কারণ দেলোয়া-ঠাকরুণ বিধবা হওয়ার পর থেকে নতুন লোক কেউ সেখানে টেঁকে না। কেমন-একটা অজানা ছম-ছমে ভয় আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেল্লে যে সেই সাদা আল্‌খাল্লা-পরা মানুষটির কথা মুখ-ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। এদেল তার থুৎনি নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল—"যা-হোক, তবু তাঁর ছেলে পারি থেকে ফিরে এসেছে! এখন ওখানকার লোকেদের হাড়-মাস জুড়োবে।"

পরদিন আল্‌ফঁস্‌-গিন্নী লেস্ বুনছিল,

আমি সেলাই করছিলুম, আর সেই সাদা আলখাল্লা-পরা চাষীর কথা আমার মনের মধ্যে তোলাপাড়া হচ্ছিল। মনে-মনে ইউজেনের সঙ্গে তার তুলনা না-করে পারছিলুম না। তার কথাবার্ত্তার ধরণ ঠিক ইউজেনের মতন;—তাদের দুজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে বলে মনে হতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মনে হল যেন তাকে একবার গোয়াল-ঘরের কাছে দেখলুম। তার পরেই দেখি সে সেলাই-ঘরে এসে বসেছে। চকিতের মতো আমার দিকে একবার দৃষ্টি হেনেই সে আল্ফঁস্-গিন্নীর পানে সোজা চেয়ে রইল। মাথা তুলে সে বসেছিল; কেবল তার মুখের বাঁ-দিকটা অল্প-একটু নুয়ে পড়েছিল। আল্ফঁস্-গিন্নী আনন্দের সুরে বলে উঠল—"এই যে আঁরি!" বলেই তাকে দু-গালে চুমু দিলে; পাশে একখানা চেয়ার এনে বস্‌তে বল্লে। সে কিন্তু টেবিলের সাম্‌নে সোজা না বসে একটু আড় হয়ে বসল। তারপর এদেল ঘরে আসতেই আল্ফঁস্-গিন্নী বল্লে—"দেখ, আমার স্বামীকে দেখলে বোলো যে আমার ভাই এসেছে।"

আমি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলুম। তারপর বুঝতে পারলুম যে ঐ সাদা আল্‌খাল্লা-পরা মানুষটি দেলোয়া-ঠাকরুণের বড়-ছেলে। এমন-একটা দারুণ লজ্জা এল যে তেমন কখনো হয়নি; তার তাড়নায় আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল যা আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই জিনিসকে আমি হাওয়ার আগে লুটিয়ে দিয়েছি। শত চেষ্টা করেও আমার দু-ফোঁটা কান্নার জল রোধ করতে পারলুম না—গড়িয়ে এসে যে কাপড় সেলাই করছিলুম তার উপরে পড়ল। আঁরি অনেকক্ষণ ধরে টেবিলের সেই কোণটিতে বসে রইল। মনে-মনে জানতে পারছিলুম সে আমার দিকে চাইচে, কিন্তু তার সেই দৃষ্টি এমন গুরুভার হয়ে আমার উপর চেপে বসল যে আমায় মাথা তুলতে দিলে না।

(৮)

দু-দিন পরে তাকে আমার সেই ঝোপটির মধ্যে আবার দেখলুম। সেইখানে সে বসে রয়েছে দেখতে পেয়ে আমার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল—আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, যাতে আমি বসি। কিন্তু আমি বসলুম না—তার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার চোখ সেই প্রথম দিনকার মতোই স্নিগ্ধ—যেন আজকেও আমার গল্প শোনবার জন্যে উৎসুক। সে বলে উঠল—"আজ এই সন্ধ্যা-বেলা তোমার কথা কিছু শোনাবে না?" কত কথা যে আমার মাথার মধ্যে নৃত্য করে গেল তা বলতে পারি না, কিন্তু তার কোনোটাই বলবার যোগ্য মনে হল না;—আমি শুধু ঘাড়-নেড়ে জানালুম—"না।" সে বল্লে—"কেন, সে দিন তো আমায় পর ভাবনি!" সেদিন! সে দিন যা বলে ফেলেছিলুম সেই-সব কথা মনে প'ড়ে আমি যেন মরমে মরে যেতে লাগলুম। আমি শুধু বল্লুম—"তুমি ত আল্ফঁস্-গিন্নীর ভাই!" বলেই চলে গেলুম। আর ঐ ঝোপের

কাছে যাবার আমার সাহস হত না। সে প্রায়ই ভিলেভিয়েইতে আসত। আমি তার দিকে আর চোখ তুলতুম না; কিন্তু তার কথার স্বর আমার মধ্যে ভারি-একটা অস্বস্তি জাগিয়ে তুলত।

(৯)

জাঁ-ল্যা-রুজ্ চলে যাবার পর থেকে উপাসনা হয়ে গেলে আমার সময়টুকু কি-করে কাটাই খুঁজে পেতুম না। প্রতি-রবিবারেই পাহাড়ের উপরে সেই বাড়িটির পাশ দিয়ে আমি যেতুম। মাঝে মাঝে জানলার ফাঁক-ফুক দিয়ে ভিতরটা দেখতুম—কখনো-কখনো দেখতে গিয়ে আমার মাথা ঠুকে যেত—সেই শব্দে আমার বুক দুরদুর্ করে উঠত। এক-রবিবারে দেখলুম দরজায় কুলুপ লাগানো নেই। আমি যেমন দরজার গায়ে আঙুল ঠেকিয়েছি অমনি দমাস্-করে সেটা খুলে গেল। এত শীঘ্র যে খুলে যাবে আমি ভাবিনি। আমি একটু দাঁড়িয়েছিলুম—শুধু সেটাকে বন্ধ করে চলে যাবার জন্যে। কিন্তু আর কোনো শব্দ হচ্চেনা দেখে, এবং ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড এক-ফালি আলো এসে পড়াতে আমার ভিতরে যাবার উৎসাহ হতে লাগল। দরজাটা খুলে রেখে আমি ভিতরে ঢুকে পড়লুম। দেখলুম সেই প্রকাণ্ড আগুনের জায়গাটা একেবারে খালি। সেখানে সে পেরেকও নেই, সে পাত্রও নেই—উনুনের সেই বড় ঝাঁঝরিটাও গেছে। ঘরের মধ্যে যা পড়ে আছে তা গোটা-কতক কাঠের গুঁড়ি—যেগুলোকে রুজের ছেলেরা টুল করে বসত। তাদের গায়ের ছালগুলো সব উঠে গেছে—উপরটা কেবল চক্‌চক্ করছে—যেন মোম দিয়ে ঘষা;—ছেলেরা বসে-বসে তার পালিশ হয়ে গেছে।

পরের ঘরটা একেবারে খালি। মেঝের টালি একখানিও নেই। খাটের পায়াগুলো মেঝের উপর চেপে থেকে-থেকে ছোটো ছোটো গর্ত্ত রেখে দিয়ে গেছে। ওপাশের দরজাটাতেও কুলুপ লাগানো ছিল না। আমি বেরিয়ে বাগানের মধ্যে গেলুম। শীতকালের গোটাকতক শাক-সবজি; তখনো কেয়ারিগুলোর উপর জিয়োনো রয়েছে। ফলের গাছগুলো ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই বুড়ো গাছ। কারুর কারুর চেহারা ঠিক কুঁজো লোকের মতন;—তাদের ডালপালাগুলো মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—যেন ফুলের ভারটুকু বহন করবারও শক্তি নেই। বাগানের তলা থেকে পাহাড়টা গড়িয়ে গিয়ে একটা চওড়া সমান জমির উপরে পড়েছে—সেখানে গোরু-বাছুরগুলো চরে বেড়ায়; ঠিক তার কিনারায় এক প্রকাণ্ড ঝাউয়ের সার, বেড়া তুলে, মাঠ থেকে আকাশকে তফাৎ করে দিয়েছে। অল্পে অল্পে এক-এক করে আমি জায়গাগুলো সব চিনে নিলুম। পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটি ছোটো নদী বহে গেছে। জল তার দেখা যাচ্চে না কিন্তু উইলো গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা এক-পাশ-হয়ে দাঁড়িয়ে নদীটাকে যেতে দিচ্চে। ভিলেভিয়েইর বাড়িগুলোর পিছনে নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানকার ছাদগুলো সমস্ত চেস্‌নাট গাছের রঙের সঙ্গে এক। তার পিছন দিয়ে নদী বহে-বহে চলেছে;—ঝাউগাছের ফাঁক-দিয়ে এখানে

একটু, ওখানে একটু চক্‌চক্ করছে দেখা যাচ্চে। তারপর সেটা কালো অন্ধকার পাইন-বনের মধ্যে মিশিয়ে গেছে। ঐখানেই 'লষ্ট ফোর্ড" বাড়িটা চাপা পড়ে আছে। ঐ সেই-রাস্তা যেখান দিয়ে আল্‌ফঁস্-গিন্নীর সঙ্গে তার মায়ের বাড়ি গিয়েছিলুম। আল্‌ফঁস্-গিন্নীর ভাই যেদিন ঝোপের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করে সেদিন নিশ্চয় সে ঐ-পথ দিয়েই এসেছিল। আজ ওপথে লোক নেই। চারিদিকে কেবল কোমল সবুজ রং—গাছের ঝোপ-ঝাড়ের পাশে কোথাও সেই সাদা আল্‌খাল্লা দেখা যাচ্চে না। আমার সেই ঝোপটি দেখবার চেষ্টা করলুম কিন্তু দেখা গেল না, সেটি গোলাবাড়িতে আড়াল পড়েছে। ইষ্টারের পর আঁরি বহুবার সেই ঝোপের মধ্যে এসেছিল। সে যে সেখানে এসেছে তা কেমন করে জানতুম ঠিক বলতে পারিনা কিন্তু সেই সময়ে ওর পাশ দিয়ে একবার ঘুরে যাওয়াটা কিছুতেই দমন করতে পারতুম না।

কাল আমি যখন একলাটি সেলাই-ঘরে ছিলুম, তখন সে এসেছিল। সে এমন-ভাবে মুখ খুল্লে যেন আমায় কিছু বলবে। সেই প্রথম-দিনের মতন-করে আমি তার দিকে চোখ তুলে চাইলুম—কিন্তু কিছু না বলেই সে চলে গেল। আজ এই খোলা-বাগানের মধ্যে ফুলে-ভরা লতার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, চিরদিন যেন এইখানটিতেই থাকতে পাই। একটা প্রকাণ্ড আপেলের গাছ আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে—তার ডালপালার ডগাগুলি সে ঝরণার জলে ডুবিয়ে রেখেছে। একটা গাছের ফোঁপরা গুড়ির ভিতর থেকে এই ঝরণাটি লাফিয়ে উঠেছে—এর জলের উচ্ছ্বাস, ছোটো নদীর মতন, গাছের বেদীগুলির উপর দিয়ে ঝির্‌-ঝির-করে বহে চলেছে। এই ফুলের বাগান আর এই স্বচ্ছ জলের স্রোতটি দেখে মনে হতে লাগল পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর জায়গা আর নেই। তার পর, বাড়িটার দিকে ফিরে চাইলুম; দরজা খোলা, রোদ গিয়ে ভিতরে পড়েছে। মনে হতে লাগল ওর ভিতর থেকে এখনি সব আশ্চর্য্য-রকমের মানুষ বেরিয়ে আসবে। বাড়িটার আগাগোড়া যেন বিস্ময়ে মোড়া! ওর ভিতর থেকে কতরকম যে অদ্ভুত খুট্‌খাট্ শব্দ আসে বলা যায় না। এই একটু আগেই যেন মনে হচ্ছিল এমন-একটা শব্দ শুনলুম যা, সেদিন আঁরি যখন সেলাই-ঘরে আস্তে-আস্তে এল, ঠিক সেই পায়ের শব্দের মতন।

আমি কান পেতে রইলুম—সে যেন এই এল বলে। কিন্তু আর তার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি চারদিকে গাছপালারা ফিস্‌ফিস্ করে কি বলতে লেগেছে! আমার মনের মধ্যে বোধ হতে লাগল আমি যেন একটি ছোটো গাছ—আর বাতাস তার নিজের খুসি-মতো আমাকে দোল দিচ্চে। যে স্নিগ্ধ হাওয়া কাশের গুচ্ছের উপর ঢেউ তুলে দিচ্চে, সেই হাওয়াই আমার মাথার উপর দিয়ে বহে গিয়ে আমার চুলের সঙ্গে জড়াজড়ি করতে লাগল। গাছেরা সবাই যা করছিল তাই করবার জন্যে আমিও হেঁট হয়ে পড়লুম আর আমার আঙুলগুলি সেই ঝরণার স্বচ্ছ জলে ডুবিয়ে দিলুম।

ফের একটা শব্দে বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। আঁরি দরজার মধ্যে ঠিক ফ্রেমে আঁটার মতন দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার একটুও আশ্চর্য্য বোধ হল না। মাথা তার খালি—হাত তার দুলচে। সে ধীরে ধীরে বাগানে নেমে এল, তার দৃষ্টি দূরের ঐ মাঠের উপর গিয়ে পড়ল। পাশ-দিকে তার সিঁথে কাটা—কপালের কাছে চুলগুলি একটু পাতলা হয়ে এসেছে। এক দীর্ঘ মুহূর্ত্ত ধরে সে একেবারে স্থির হয়ে রইল, তারপর আমার দিকে ফিরল। আমাদের মাঝখানে কেবল দুটি গাছ ছিল। সে এক-পা এগিয়ে এল, এক-হাতে তার সাম্‌নের কচি গাছটা চেপে ধরলে;—তার মাথার উপরে ফুলেরা জড়ো হয়ে তোড়া বেঁধে উঠল। হঠাৎ এত আলো হল যে মনে হল গাছের গা পর্য্যন্ত চিক্‌চিক্‌ করে জ্বলছে—ডালের প্রত্যেক ফুলটি উস্কে উঠেছে। আঁরির চোখের মধ্যে এমন একটি গভীর শান্ত ভাব দেখলুম যে তার কাছে এগিয়ে যেতে কোনো লজ্জা হল না। যখন তার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম সে একটুও নড়ল না। তার সেই সাদা আল্‌খাল্লার চেয়েও তার মুখ সাদা হয়ে গেল—তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে আমার হাতদুটি তুলে নিয়ে কপালের উপর চেপে ধরলে। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে—"আমি হচ্ছি সেই কৃপণ যে তার হারানো ধন ফিরে পেয়েছে।" ঠিক সেই সময় সাঁৎ মতাঞের গির্জ্জের ঘণ্টা বেজে উঠল। তার শব্দ পাহাড়ের গা অবধি ছুটে এল, আমাদের মাথার উপর একটু দাঁড়িয়ে, আবার ছুটে গিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যেতে লাগল—দিনও অগ্রসর হতে থাকল, মাঠ থেকে গোরু-বাছুর অদৃশ্য হল। সেই ছোট্ট নদী থেকে একটা সাদা কুয়াশা উঠতে লাগল, তারপর একখণ্ড পাথর ঝাউগাছের আগলের পিছন-থেকে খসে গেল, ঝালুরে-গাছের ফুলগুলো ক্রমে কালো হয়ে আসতে লাগল। আঁরি আমার সঙ্গে গোলাবাড়ির দিকে ফিরে চল্ল। সরু রাস্তায় সে আমার আগে-আগে যাচ্ছিল, তারপর যখন সে বাদামগাছের বীথিকার সাম্‌নে থেকে বিদায় নিলে তখন আমি বুঝতে পারলুম আমি তাকে ভালোবাসি;—মারি-এমের চেয়েও ভালোবাসি।

পাহাড়ের উপরকার বাড়িটা আমাদেরই বাড়ি হয়ে গেল। প্রত্যেক রবিবারই দেখতুম আঁরি আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে। জাঁ-ল্য-রুজরা যখন ওখানে ছিল, তখন যেমন প্রসাদী রুটি নিয়ে যেতুম, এখনও তেমনি উপাসনা থেকে ফেরবার সময় নিয়ে যেতে লাগলুম; সেটা ভাগ করে নেবার সময় আমাদের দুজনের খুব হাসা-হাসি হত।

পরস্পরের মনে সঙ্কোচের কোনো বাধা না থাকাতে আমরা দুজনে মিলে বাগানময় খুব ছুটোছুটি করতুম, ঝরণার জলে জুতো ভিজোতুম। আঁরি বলত—"এই রবিবারগুলোয় আমার মনে হয় আমারো বয়স যেন সতেরো!" কখনো-কখনো আমরা পাহাড়ের কিনারা দিয়ে যে বন গেছে তার মধ্যে অনেক দূর চলে

যেতুম। আমার ছেলেবেলাকার কাহিনী, আর মারি-এমের গল্প শুনতে আঁরির কখনো বিরক্তি দেখতুম না। মাঝে মাঝে আমরা ইউজেনের কথা পাড়তুম—আঁরিও ইউজেনকে চিনত। সে বলত, ইউজেন সেই দলের মানুষ যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যে লোকের একটা আগ্রহ হয়। আমি ভেড়া-চরানোর কাজে কি-রকম অল্‌বড্ডে ছিলুম তা তাকে বলেছিলুম। জানতুম সে শুনে হাসবে, তবুও সেই যে ভেড়াটা যার সর্ব্বাঙ্গ ব্যামোয় ফুলে উঠেছিল তার গল্পও করেছিলুম। সে কিন্তু হাসলে না। সে আমার কপালে একটা আঙুল রেখে বল্লে—"ভালোবাসাই একমাত্র জিনিস যা সমস্ত দোষ শুধরে দেয়।"

(১০)

একদিন আমরা এক প্রকাণ্ড ক্ষেতের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেটা এত বড় যে তার শেষ দেখা যায় না। হাজার হাজার সাদা প্রজাপতি গমের শীষগুলির পাশে-পাশে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্চে। আঁরি চুপ করে ছিল, আমি ঐ শীষগুলি দেখছিলুম—তারা সব কোঙা হয়ে-হয়ে পড়ছে—যেন উড়ে যাবার উদ্যাগ করছে। ঠিক এমনি দেখাচ্ছিল যেন প্রজাপতিরা তাদের উড়িয়ে নেবার জন্যে ছোটো-ছোটো ডানা এনে-এনে দিচ্চে। কিন্তু বৃথা এই আয়োজন—বৃথা তাদের ব্যাকুলতা! মাটি ছেড়ে তাদের যাবার যো নেই। এই কথা আঁরিকে বল্লুম। সে শীষগুলির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর প্রত্যেক কথাটি টেনে-টেনে বার করে যেন নিজেকেই নিজে বলতে লাগল—"মানুষের অবস্থাও ঠিক এই! হঠাৎ একদিন রমণী তার কাছে আসে—ঠিক ঐ সাদা প্রজাপতির মতন। পুরুষ বুঝতে পারে না কোথা থেকে সে এল—মাটি থেকে উঠে এল, কি আকাশ থেকে নেমে এল। তার মনে হয় তাকে নিয়ে ঐ ঝির-ঝিরে বাতাস আর ঐ ফুর-ফুরে কচি ফুলের উপরেই তার জীবন চলবে। কিন্তু যেমন ঐ শীষগুলো মাটির কামড় ছেড়ে উঠতে পারছে না, তেমনি ঐ মাটির মতনই কঠিন কর্ত্তব্যের একটা নিগূঢ় টান মানুষকে টেনে রেখে দেয়।" আমার মনে হতে লাগল এই কথাগুলোর মধ্যে ভারি একটা বেদনার সুর বেজে-বেজে গেল—তার মুখের উপর একটা নৈরাশ্যের শিথিলতা গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আমার চোখের দিকে চেয়েই খুব জোর করে বলে উঠল—"আমাদের নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস রাখা চাই!"

(১১)

গ্রীষ্ম গেল, শরৎ গেল—শীত এসে পড়ল, শীতের দুর্যোগ, তবু আমরা সেই পাহাড়ের বাড়ি ত্যাগ করতে পারলুম না। আঁরি সঙ্গে-করে বই নিয়ে যেত—বাগানের দিক্‌কার, পিছনের ঘরটায় একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে সে পড়ত। আমি সন্ধ্যা হলেই গোলাবাড়িতে ফিরে যেতুম। এদেলের ধারণা আমি গ্রামে গিয়ে খুব হৈ-হৈ করে সময় কাটিয়ে এলুম, তবুও আমার মুখ বিমর্ষ দেখে সে বিস্ময় প্রকাশ করত।

প্রায় রোজই আঁরি আমাদের বাড়ি আসত। অনেক দূর থেকে আমি তার সাড়া পেতুম। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে

খটাখট্ শব্দে সে আসত—তার জিনও ছিল না, লাগামও ছিল না। ভারি ঠাণ্ডা জানোয়ার। আঁরি নেমেই ঘোড়াটাকে উঠোনে ছেড়ে দিত। তার গলার স্বর আল্‌ফঁস্-গিন্নীর কানে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে সেলাই-ঘরে এসে পড়ত। তারা দুজনে গোলাবাড়ির উন্নতি-সম্বন্ধে কিম্বা তাদের বন্ধুবান্ধবদের কথাই কইত। কিন্তু তার মধ্যে থেকে আঁরি স্পষ্টভাবে আমাকেও দু-একটা কথা বলত। আমি দেখতুম আল্‌ফঁস্-গিন্নী আমার দিকে মিট-মিট-করে চাইচে—আমি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতুম।

একদিন বিকেলে আঁরি হাসি-মুখে ঘরে এসে দাঁড়াতেই আল্‌ফঁস্ বলে উঠল—"জান আঁরি, আমরা পাহাড়ের বাড়িটা বিক্রি করে ফেলেছি!" দুজনে দুজনের দিকে চাইতে লাগল—দুজনের মুখ এত সাদা হয়ে গেল যে মনে হল যেন ঐখানেই দাঁড়িয়ে দুজনে মরে পড়বে। তার পর, আল্‌ফঁস্ সরে গিয়ে চিম্‌নির ধারে ঝুঁকে দাঁড়াল, আর আঁরি দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুট্-খাট্ করতে লাগল। আল্‌ফঁস্-গিন্নী তার হাতের লেশ কোলের উপর রেখে দিয়ে মুখস্থ বুলির মতন বলে গেল—"বাড়িটা কোনো কাজের ছিল না, বিক্রি হয়েছে ভালোই হয়েছে—আমি খুসী হয়েছি।" আঁরি ফিরে এসে আবার টেবিলের পাশে দাঁড়াল—একেবারে আমার কাছ ঘেঁষে। তার গলার স্বর কেঁপে গেল, সে বল্লে—"আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে—আমাকে না বলে তোমরা বাড়িটা বিক্রি করে ফেল্লে—আমার কেনবার ইচ্ছে ছিল।" আল্‌ফঁস্ কেঁচোর মতন কুঁকড়ে গেল;—খুব হো-হো-করে হেসে ওঠবার চেষ্টা করে সে হাসতে-হাসতে বল্লে—"তুমি কিন্‌তে? কিনে কি করতে?" আঁরি তার হাতখানা আমার চেয়ারের পিঠে রেখে বল্লে—"জাঁ-ল্য-রুজের মতন আমিও ঐ বাড়িতে বাস করতুম।" আল্‌ফঁস্ টেবিল থেকে চিম্‌নি অবধি পায়চারি করতে লাগল। তার মুখের রং বদ্‌লে মেটে হলদে রং হয়ে গেল। পা-জামার পকেটের ভিতর হাত পুরে সে এত তাড়াতাড়ি পা ফেলছিল যে মনে হচ্ছিল যেন পায়ের সঙ্গে দড়ি বাঁধা আছে—তার খুঁট সে দুহাতে ধরে টানচে। তারপর, তার সেই চিক্‌-চিকে চোখ নিয়ে আমাদের উল্টো দিকে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—"যাক্, বিক্রি যখন হয়ে গেছে আর চারা নেই!" সবাই চুপ হয়ে রইল—কেবল কানে এসে লাগতে লাগল বাইরের উঠোন থেকে সাদা ঘোড়াটার খুর ঠোকার শব্দ—যেন সে তার মনিবকে ডাকছে। আঁরি দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এল; জানতে পারিনি আমার হাতের কাজ কখন্ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সে এসে তুলে দিলে। তারপর তার বোনকে চুমু খেয়ে, যাবার আগে আমার দিকে চেয়ে বলে গেল—"কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ফুল-শয্যায়

ফুলের পরে ফুল জমেছে,
ফুলের স্বপন-পারা—
একটি কুঁড়ি গোপন আছে
তারি মাঝে হারা।
সরম তারে ঢেকে আছে,
সঙ্কোচে সে নত,
বুকের মাঝে গন্ধটুকু
ঘুমিয়ে চেতন-হত।
ফুলেরা সব বলচে তারে
—ফোটো সখী, ফোটো!
সেই ডাকে সে কেঁপে-কেঁপে
ছোটোর চেয়ে ছোটো!

ভয়ের মতো আনন্দে তার
বুকটি থর-থরা,
ভাবছে মনে সঙ্গোপনে
কথন্ পড়ে ধরা!
বাতাস তারি কানে-কানে
শোনায় সাহস-কথা;
আলো তাহার প্রাণে-প্রাণে
জাগায় ফোটার ব্যথা।
ওগো অলি, কুড়ির অলি!
শোনাও তোমার গান;
ফুলের মাঝে একটি কুঁড়ির
ফুটিয়ে তোলো প্রাণ।

শ্রী—

ভারতের উদ্যান

ভারতীয় অন্যান্য কলা-শিল্পের ন্যায় উদ্যান-শিল্পেও এ-দেশের বিশেষত্বের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পী প্রমোদ-কাননের সাজসজ্জার মধ্যেও দেশের ধর্ম্ম এবং আদর্শের ইঙ্গিতটুকু খুদিয়া রাখেন। উত্তর-ভারতে ও কাশ্মীরে মোগল-রচিত বিরাট সৌধমালা আজ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু সেই বিশাল ধ্বংস-স্তূপের গা বেড়িয়া এখনও যে সকল শীর্ণ খাল, বিল, ও শুষ্ক কানন পড়িয়া আছে, সহস্র অনাদর ও অবহেলার মধ্যেও তাহাদের শিল্পচাতুর্য্য দর্শকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে; পাশ্চাত্য দর্শক সে-সবের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না—যে এই কানন ও সৌধমালার বহির্বৈচিত্র্যের মধ্যেও সর্ব্বত্র একটি সুশৃঙ্খল ধারা বজায় আছে।

সেই ধারাটি বুঝিতে গেলে হিন্দু ও মোগল শিল্পীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উপরই শুধু নির্ভর করিলে চলিবে না। প্রাচ্য শিল্পী সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার ধর্ম্মের আদর্শ কখনও ভুলিতে পারেন নাই। 'আর্টের জন্যই আর্ট' (Art for art's sake)—এ কথাটি পাশ্চাত্য দেশের। প্রাচ্য শিল্পীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ, সন্দেহ নাই—তবে

সে সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের বিকাশমাত্র করিয়াই স্থির থাকে না—সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে ধর্ম্মা-দর্শের একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও সে প্রচ্ছন্ন রাখে। এইখানেই প্রাচ্য শিল্পের বিশেষত্ব।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে ফুল ও গাছের আদর এবং চর্চ্চা চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উদ্যানের প্রসঙ্গ অত্যধিক; বৌদ্ধ মন্দিরাদি-সংলগ্ন বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত কাননাদিরও বিস্তর উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং উদ্যান-শিল্পে প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে অতি প্রাচীন কালেও এদেশে শিল্পীর যত্ন ছিল অপরিসীম।

তাহার পর মধ্য-এসিয়া ও পারস্য হইতে একটা জোয়ারের বান আসিল। মুসলমান আসিয়া ভারতের কাননগুলিকে আরও অভিনব সজ্জায় সাজাইয়া তুলিল। কাশ্মীরে এবং উত্তর-ভারতে তাহার চিহ্ন আজও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কানন-সজ্জায় যাঁহারা অসাধারণ অনুরাগ ও শক্তি দেখাইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোগল-সম্রাট জাঁহাগীর ও তদীয় পারস্য মহিষী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গ ও সৌধাদি নির্ম্মাণ-কৌশলে আফগান ও পাঠান অপূর্ব্ব শক্তি দেখাইয়া গিয়াছে। সে পরিচয় আজও ভারতের নানা স্থানে জাজ্জ্বল্যমান আছে। ভারতবর্ষের বহু শ্রেষ্ঠ হর্ম্ম্যভবনাদি এই সময়েই গঠিত হইয়াছিল। সে সকল হর্ম্ম্যাদির কারুকার্য্য চমৎকার—তাহাদের বিরাট দেহ আজ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিলেও সে সকল হর্ম্ম্য-সংলগ্ন কানন, কালের নির্ম্মম করস্পর্শে মুছিয়া গিয়াছে। সেগুলির উপর দিয়া কি বিষম ঝঞ্ঝাই না বহিয়া গিয়াছে! সে সময় বিভিন্ন বংশীয় রাজগণের দ্রুত উত্থান-পতন, অসংখ্য রাজ-বংশের সমূল উচ্ছেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির ভীষণ সংঘর্ষ—এ সবের মধ্যে তিলার্দ্ধ-কালও কাহারও চারু-শিল্প-চর্চ্চার অবসর ছিল না! এইরূপ বহু ঝঞ্ঝা, বহু অশান্তির পর ফিরোজ সা তুগলকের সময় (১৩৫১-১৩৮৮ খৃঃ অব্দ) ঝড়ের বেগ থামিল—তাই সে সময় দিল্লী (সেকালের ফিরোজা-বাদ) কোন-মতে আত্ম-প্রকাশের অবসর পাইল। বলিতে গেলে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা—এই ফিরোজ সা তুগলকের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল। ফিরোজ সা অসংখ্য উদ্যান রচনা করাইয়াছিলেন—তাহার একটিও আজ নাই—চিহ্ন অবধি লোপ পাইয়াছে। বিচিত্র প্রস্রবণ দীর্ঘিকা হর্ম্ম্য-শ্রেণী দিল্লীর কোন্ বালুময় মরুপ্রান্তরে ডুবিয়া গিয়াছে! শুধু উত্তর-ভারতের কয়েক স্থলে ফিরোজ সা তুগলকের রচিত কতকগুলি খাতের শীর্ণ খোলস মাত্র পড়িয়া আছে!

ফিরোজ সা তুগলকের পর,—প্রায় দুইশত বৎসর পরে (১৫২৬ খৃঃ অব্দ) দিগ্বিজয়ী বীর বাবর যখন আগ্রায় রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন আবার উদ্যান-রচনায় শিল্পীর ডাক পড়িল। সম্রাট বাবরের আদেশেই মোগল আমলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রাচীন উদ্যান রামবাগ রচিত হইল।

* * * *

উদ্যান-শিল্পে পারস্য ও তুর্কিস্তানের প্রতিভা যেমন চূড়ান্ত লীলা দেখাইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন কেহ দেখাইতে

পারে নাই। পারস্যের কবি কানন-ভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বিপুল মাধুর্য্যের গানে আত্মহারা। গুলেস্তাঁর (গোলাপ-বাগ) ভূমিকায় কবি সাদী লিখিয়াছেন, "ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বর্গের আদর্শে আমার এই নিবিড়-ঘন কাব্য-কুঞ্জটিকে আটভাগে ভাগ করিলাম —কাহারও শ্রান্তি হইবে না।" কোরান-বর্ণিত ভগবানের কাননকে আদর্শ করিয়াই সাদী এই কথা বলিয়াছিলেন। কোরানে আছে, "ভগবান প্রথমে উদ্যান সৃষ্টি করেন।" মহম্মদের শিষ্য ও অনুচরগণ স্বর্গের যে কল্পনা করিয়াছেন—তাঁহারা তাহার ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—পরিদৃশ্যমান এই মর্ত্ত্য-ভূমিরই বিচিত্র রম্য উদ্যানশ্রেণী হইতে। হাফেজের কবিতা সিরাজের রম্য কাননের বর্ণনায় পরিপূর্ণ; ওমর খৈয়ম উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিহ্বল, মুগ্ধ। পারস্য-কবির কবিতায় গানে ফুলের ফুলঝুরি ঝরিয়া পড়িয়াছে—বর্ণে গন্ধে তাহার তুলনা নাই! ওমরের শিষ্য সামারখন্দ নিবাসী খ্বাজা নিজামী গুরুর সহিত উদ্যানে বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতেন। একদিন গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এমন জায়গায় আমার সমাধি রচিত হইবে যেখানে উত্তর-বাতাস অজস্র গোলাপ-পাপড়ি ঝরাইয়া সে সমাধিকে আচ্ছন্ন রাখিবে!" নিজামী লিখিয়াছেন, "তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—কারণ তিনি ত কখনও 'কথার কথা' কিছু বলেন না।...বহুকাল পরে আমি নৈশাপুরে আসি। তাঁহার সমাধি দেখিতে গেলাম। কি দেখিলাম! একটি বাগানের ঠিক বাহিরেই সমাধি;—বাগানের প্রাচীর ঝুঁকিয়া কয়েকটা গাছ ডালপালা মেলিয়া সমাধির উপরে যেন চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখিয়াছে—আর অজস্র ঝরা-ফুলে সমাধিটি এমন আচ্ছন্ন—যে তাহার পাথরটুকুও পাপড়ির তলে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।"

ফুলের প্রতি মুসলমান জাতির এই যে অনুরাগ ইহার প্রধান কারণ—মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্ত্তি-গঠনে কোরানের নিষেধ আছে; এবং সেই নিষেধ বলিয়াই ফুল ও গাছের আদর মুসলমান জাতির কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে এমন-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কার্পেট প্রভৃতিতেও শিল্পী তাই নানাছাঁদে রঙ ফলাইয়া আপনার প্রতিভার ছাপ আঁকিতে ব্যাকুল; বিবিধ শিল্পে ফুল ও গাছের অত্যধিক এই আদর হইতেই উদ্যান-শিল্প স্বতন্ত্র একটি কলাশিল্পে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিল।

* * *

মুসলমানী উদ্যানে দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম, উদ্যানের মধ্যে খাল দীঘি বা কোনরূপ জলাশয় রাখা চাই; সেই খালে ও দীঘিতে জল যাহাতে দুইধারের তট ছুঁইয়া কানায়-কানায় পরিপূর্ণ থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্যও রাখা হয়। দ্বিতীয়,—খাল ও দীঘি-গুলি উজ্জ্বল নীলবর্ণের টালিতে আগাগোড়া বাঁধাইয়া দেওয়া চাই; কারণ তাহা হইলে মাথার উপরকার সুনীল আকাশ জলে বিম্বিত হইয়া জলতলস্থ টালির নীল-বর্ণের সহিত রীতিমত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে।

পাশ্চাত্য উদ্যান দেখিলে মনে হয়, সেখানে যেন ফুল, ঘাস ও গাছ সকলেই আপনাদের অস্তিত্বটুকুকে জাহির করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট—ফুল, ঘাস ও গাছের

প্রাচুর্য্য এবং সজ্জার দিকে উদ্যান-শিল্পীর লক্ষ্যও সেখানে সমধিক; কিন্তু প্রাচ্য উদ্যানে স্নিগ্ধ-সঞ্চারী বায়ু-হিল্লোলে কম্পিত দীর্ঘিকার জলরাশিই হইল, উদ্যানের প্রাণ। এই জল থাকায় উদ্যানের গাছপালাগুলিতে জল দেওয়ার সুবিধা হয়—উদ্যানও সে কারণে বেশ সতেজ, সজীব থাকে। এই ব্যবস্থার দিকে এতখানি লক্ষ্য থাকা হেতু প্রাচ্য দেশে পাহাড়ের উপরও সুদৃশ্য উদ্যান রচনা করা কঠিন হয় নাই এবং শোভায় সৌন্দর্য্যেও তাহা উজ্জল, অনুপম। কাশ্মীরের নিশৎ বাগ (Nishat Bag) ইহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। ইতালীর উদ্যান-সমূহে প্রস্রবণ ও কৃত্রিম জলপ্রপাত আসবাবমাত্র—শুধু শোভা-সম্পাদনের জন্যই রচিত হয়; কোন উদ্যানে প্রস্রবণ থাকে, কোথাও বা থাকে না। কিন্তু প্রাচ্য উদ্যানসমূহে জলই হইল আসল জিনিষ—দীঘি বা খাত উদ্যানে রাখা চাইই; তাহার অভাবে উদ্যানকে কেহ উদ্যানই বলিবে না!

মোগল-রাজত্বকালে ভারতে যে-সকল উদ্যান রচিত হইয়াছে, সেগুলিতে পারস্য ও তুর্কিস্তানের আদর্শ অনুকরণ করা হইয়াছে। আকারে, সজ্জায় এমন কি পরিধিতেও এ সকল উদ্যানে পারস্য ও তুর্কিস্তানের বিশেষত্বটুকু সম্পূর্ণ বজায় আছে। বাগানের বাহিরে সুদীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর—প্রতি কোণে চতুষ্কোণ গম্বুজ—উদ্যানের সীমান্তে দুর্গের আকারে রচিত রম্য গৃহ—এবং সম্মুখে বিশাল ফটক। এই বিরাটতাই মোগলাই পদ্ধতি। যে উদ্যানগুলি বৃহৎ সেগুলিতে ফটকের সংখ্যা চারিটি করিয়া থাকে;—চারিটি প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ফটক রচিত হয়—এবং প্রতি কোণে অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ছোট ছোট গৃহ—মাথায় সচূড় গম্বুজ—এবং উদ্যানের মধ্যে দীর্ঘ খাত পাথরে বা ইষ্টকে বাঁধানো—মধ্যে মধ্যে স্নিগ্ধ প্রস্রবণের সারি থাকে। উদ্যানের প্রধান গৃহের অভ্যন্তর এই সকল প্রস্রবণাদির জন্য তপ্ত রৌদ্রে ঝলসিত হইতে পায় না—জলকণাবাহী পবন-সঞ্চারে গৃহাভ্যন্তর বেশ স্নিগ্ধ শীতল থাকে। কোন কোন উদ্যানে আবার প্রাচীরের বাহিরে চারিধার বেড়িয়া খাত তৈয়ার করা হয়—প্রচ্ছন্ন নল দিয়া এই সকল খাতে সুদূরস্থ বা অদূরস্থ কোন নদী হইতে জল টানিবার ব্যবস্থাও ভালরূপ থাকে।

উদ্যানে বড় বড় গাছগুলি সুশৃঙ্খলভাবে ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান; তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কোথাও গোলাপকুঞ্জ, কোথাও বা অন্যরূপ ফুলের গাছ—ছায়াশ্যামল কুঞ্জগৃহ,—শান্তি ও আরামের অপরূপ আবাস।—উদ্যানের মোটামুটি গঠন এই।*

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

* সঙ্কলিত। ক্রমশ প্রকাশ্য।

কেরাণী-স্থানের জাতীয়-সঙ্গীত

(সুর—"ধাও ধাও সমর-ক্ষেত্রে")

ধাও, ধাও, চাকুরী-ক্ষেত্রে
খাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা' তা',
রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্ম্মে
শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।
কে বলো কাঁদিবে মানেরি কান্না,
যখন মুরুব্বী চাকী বই চান্ না!
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

সাজে কখনো কি হীন দোকানে
পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা?
পল্লীগ্রামে—বাবা!—পদ্মার পারে
হয়ে যেন চাষা-ভুষো মাঝি-মাল্লা!
ডেস্ক-নিবদ্ধ রবে দরখাস্ত!—
যখন বেরুলেই কিছু-কিছু আস্‌ত!
সাজ সাজ সকলে চাপকানে
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্—ইত্যাদি।......

আফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,
মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি;
ডরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,
বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।
টিকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,
ছুরি, ফিতা, পেন্সিল্ ও পেন্সন্-লুব্ধ;
সাজ সাজ সকলে চাপকানে
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ—ইত্যাদি।

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
চেপে দাও বাহিরের যত দরখাস্ত,
পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত!
সে দরখাস্তে করি' জুতা সাফ্,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ!
সাজ সাজ সকলে চাপকানে
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

অভিষেক

(গল্প)

সে ছিল একেবারে কালো কুরূপ;—মানুষের অমন ভয়ানক চেহারা কেউ কখনো দেখেনি। দেশের লোক তার দিকে ফিরে চাইতে পারতনা—সাম্‌নে পড়লে মুখ-ফিরিয়ে চলে যেত। উৎসবের দিন তার ডাক ত পড়তই না,—বিপদের সময়েও কেউ তার কথা মনের কোণেও আনত না।

সে ছিল একলা;—সঙ্গের সঙ্গী, আলাপের

বন্ধু কেউ তার ছিল না। তার সঙ্গে কেউ হেসেও কথা কইত না, তাকে তিরস্কারও করত না। সে তার সেই কালো রূপের অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে থাকত।

কিন্তু কেউ যদি ভালো-করে তাকে দেখত তাহলে দেখতে পেত, তার সেই কালো-কাজল রঙের উপরে একটি বিদ্যুতের আভা থেকে-থেকে খেলে যায়; তার সেই কুৎসিত মুখের উপরে সময়-সময় এমন হাসি ফুটে ওঠে যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না; আর সেই গোল-গোল ভাটার মতন চোখের ভিতর থেকে কি-একটা কাঁপুনি উঠতে থাকে যাতে মনে হয় যেন তার ভিতরের একটা আলো বাইরের কালো পর্দ্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করচে।

কিন্তু কে তার ভিতরের খবর রাখে! বাইরের বাধায় সকলকার মন ফিরে-ফিরে যায়—কালোর বুকের ভিতরে যে আলো জ্বলচে, কেউ তার সন্ধানই পায় না। সবাই তাকে অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অনাদরে দূর থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

সে আপন-মনে নদীর বিজন তীরটিতে গিয়ে বসে—তার মনের যত কান্না সুর দিয়ে গেঁথে একলাটি গেয়ে যায়—কেউ তা কান-পেতে শোনে না; কেবল বনের পাখী হঠাৎ কখনো সেই সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে।

(২)

রাজা এক সভা আহ্বান করলেন। সে সভায় এলেন দেশের যত ধনবান, জ্ঞানবান, যত বুদ্ধিমান, যত পণ্ডিত, যত কবি, যত বাউল। ধনবান এসে রাজার পায়ে ধন-দৌলত উপহার দিলেন, জ্ঞানবান এসে গভীর তত্ত্ব-কথা শোনালেন, বুদ্ধিমান এসে রাজাকে সৎ-পরামর্শ দিলেন, পণ্ডিত শাস্ত্রীয় তর্ক তুল্‌লেন আর কবিরা শ্লোক শোনাতে লাগলেন—সব-শেষে বাউলের গান হল। দেশের যত লোক সবাই আজ এসে সভায় উপস্থিত। আসেনি কেবল একটি লোক—সেই কালো। কেউ তার খবরও করেনি।

ধনীদের মণিমাণিক্যে দর্শকের চোখ ঝল্‌সে যেতে লাগল, জ্ঞানবান বুদ্ধিমানদের কথার যমকে চমক লাগতে লাগল, পণ্ডিতের তর্কে জটিল কথা যতই জটিল হয়ে উঠতে লাগল, ততই বাহবা পড়তে লাগল। তার পর কবিরা একে-একে যখন শ্লোক শোনাতে লাগলেন—কেউ প্রভাত বর্ণন, কেউ সন্ধ্যা বর্ণন, কেউ বিরহ, কেউ মিলনের কাহিনী শোনালেন, তখন চারিদিকে ধন্যধন্য রব পড়ে গেল। কে যে বড়, কে যে ছোটো মীমাংসা করা শক্ত হয়ে উঠল। সবাই বলতে লাগল, আশ্চর্য্য কথার বাঁধুনি!—এ ত শ্লোক নয়, এ যেন তুবড়ি-বাজির ফুলঝুরি! এমন অদ্ভুত শব্দ চয়ন, কথার এমন আশ্চর্য্য কারসাজি ত কোথাও দেখিনি। এমন অপরূপ বাহাদুরী কে দেখাতে পারে!

(৩)

একে-একে কবিদের শ্লোক শোনানো শেষ হল। বিচারকের দল বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। সভা প্রায় ভাঙে-ভাঙে, এমন সময় হঠাৎ একটা গোল-মালে চারিদিকের লোক চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখা গেল সেই কালো ভিড়-ঠেলে প্রবেশ

করছে। আজকের সভায় কারো আসার মানা নেই—রাজার হুকুম! কাজেই পথ ছেড়ে দিতে হল।

সে এসে একেবারে সিংহাসনের সমুখে দাঁড়াল। সভাসুদ্ধ সকলে মুখ বিকৃত করলে।

মন্ত্রী বল্লে—"কি চাও তুমি?"

সে মহারাজের দিকে চেয়ে বল্লে—"মহারাজ, আজকের দিনে দেশের লোক আপনার পায়ে যার যা ভালো তাই দিতে এসেছে। আমিও আপনার প্রজা—আমিও কিছু দেব।"

রাজা বল্লেন—"কি দেবে তুমি?"

সে বল্লে—"মহারাজ, আমার মাত্র একটি সম্পদ আছে, তাই আপনাকে নিবেদন করব।

রাজা বল্লেন—"কি দেবে বল।"

সে বল্লে—"মহারাজ, আমার কান্না।"

কান্না! সভাশুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। চারিদিক থেকে টিটকারি পড়তে লাগল। কিন্তু সে অচল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বল্লেন—"আচ্ছা বেশ, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলুম।"

সবাই অবাক। যাকে দেশের লোক অবজ্ঞা করে, দেশের রাজা তাকে আদর দিলেন? কেউ দিলে ধন-রত্ন, কেউ দিলে জ্ঞান-রত্ন, কেউ দিলে কাব্য-রত্ন তারই সঙ্গে কি-না কান্নাও রাজার গ্রাহ্য হল!—সবাই চোখ-টেপাটেপি করতে লাগল।

কাপড়ের ভিতর থেকে একটি এক-তারা বার করে— তারই সেই একটি তারের উপরে বারবার সে ঘা দিতে লাগল। অতি ক্ষীণ তার সুর—কানে লাগে-কি-না-লাগে। বাইরে তার জোর নেই, কিন্তু বুকের ভিতরে গিয়ে তা কাঁপতে থাকে। এমন মৃদু তার ধ্বনি যে সবাইয়ের কানে তা প্রবেশই করলেনা—কেউ শুনতে পেলে কিনা তাও বোঝা গেলনা। সকলের মধ্যেই একটা অবজ্ঞার চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাজা পাথরের মূর্তির মতন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন— সুরের ঘায়ে তাঁর চোখের পাতা কেবল কাঁপতে লাগল।

তারপর রাজার দিকে মুখ করে সে গান আরম্ভ করলে—নিজের কান্না সুর দিয়ে বেঁধে সেই গান তৈরি। অনেকে নাক-সিঁটকে বল্লে—ওর কান্না আবার শুনব কি! বলে তারা রহস্যালাপে মন দিলে। সে কিন্তু চোখ বুজে গেয়ে যেতে লাগল। সেই গান তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আকাশের উপর ছড়িয়ে গেল—সমস্ত সভাকে পরিপূর্ণ করে বহে যেতে লাগল। সেই সুর কখনো কণ্ঠের সীমা অতিক্রম করে আকাশের দিকে আলোর মতন ছুটে গেল; কখনো বুকের মধ্যে বদ্ধ হয়ে গুমরাতে লাগল; কখনো চলার আনন্দে তালে-তালে নৃত্য করতে লাগল; কখনো কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটবার বেদনায় কাতরাতে লাগল। কেউ তা শুনলে, কেউ শুনলে না—কেউ বুঝলে, কেউ বুঝলে না। যে দু-একটি লোক শুনলে, বুঝলে, তাদের মনে হল তাদের বুকের ভিতরকার কোন্ তারে যেন ঘা পড়েছে—সেখান থেকে ঠিক অমনিতর একটা সুর বেজে-বেজে উঠছে;—সেই কালো যা গাইছে সে যেন তারই নিজের হৃদয়ের ব্যথা! কেউ-কেউ আশ্চর্য্য হল কেমন-করে ঐ গায়ক তার গোপন মনের কথাটি জানলে! কেউ অবাক হল, যে-কথা

বলবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না, কেমন-করে সেই-কথাও বল্লে! অবাক হল, আশ্চর্য্য হল অতি অল্পই লোক;—অধিকাংশ লোকই মনে-মনে হাসতে লাগল। রাজার ভয়ে তারা চুপ করে ছিল—নইলে কালোর লাঞ্ছনার আজ অন্ত থাকত না।

কালো তার গান শেষ করে চোখ খুলে দাঁড়াল। কোথাও একটা বাহবা শোনা গেল না—কেবল নিশ্বাসের মত অস্ফুট একটি মৃদু গুঞ্জন উঠতে-না-উঠতেই কোলাহলের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। রাজা বল্লেন—"কবি!—" বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

"কবি!"—সভার মধ্যে একটা টিটকারির রোল পড়ে গেল। রাজার আজ হল কি! কেউ অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আস্ফালন করলেন, কেউ রহস্যের তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

রাজা বল্লেন—"কবি! তোমার গানে আমি মুগ্ধ হয়েছি—কিন্তু তুমি বড় অসময়ে এসেছ, আজকের সভার কবির পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তোমায় কী দিই?"

সে বল্লে—"মহারাজ ক্ষোভ করবেন না;—পুরস্কার আমি পেয়েছি।"

—"কৈ কবি?"

—ঐ ত মহারাজ, আপনার চোখের জল এখনো শুকোয়নি—ঐ ত আমার পুরস্কার।"

রাজা বল্লেন—"ধন্য ধন্য—কবি! এস তোমায় আলিঙ্গন করি।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বুদ্ধিমান বলে উঠলেন—"রাজার যেরূপ বুদ্ধির বিকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে ঐ গবু-চন্দ্র মন্ত্রীই ওঁর মানাবে ভালো।" এক কবি বল্লেন—"বৃথা এতকাল অরসিকের কাছে রস নিবেদন করেছি।" এক পণ্ডিত বল্লেন—"কাব্য-সুন্দরী দেখছি আজ অলঙ্কার খুলে বিধবা হলেন!" বলে একে-একে সব চলে যেতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে সভা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

তখন রাজা বল্লেন—"কবি আমার এই সামান্য চোখের জলে তোমার তৃপ্তি হল?"

—"হল বৈ কি মহারাজ!"

অমনি এক-কোণ থেকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"কবি এই দেখ, আমাদেরও চোখের জল তোমার অভিষেকে দিয়েছি।"

কবি বল্লে—"ধন্য আমি।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পথ-শেষের পারে

এল যেদিন পথ-শেষের পারে,
ছড়িয়ে দিল শ্রান্ত আপনারে
বহু দূরে আলোর মোহানায়।
তিমির নীল পারাবারে
পড়লো ভেঙে ভারে ভারে
রাঙা ঢেউয়ে রঙীন ফেণার গায়।

অকূলভরা অন্ধকারে
অতলতার শীতল ধারে
সকল দাহ জুড়িয়ে এল বুকে;
দীপ্তি শুধু রইল চেয়ে
সীমাহীনের দৃষ্টি ছেয়ে
লক্ষ শত তারার মুখে মুখে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিজন তীর
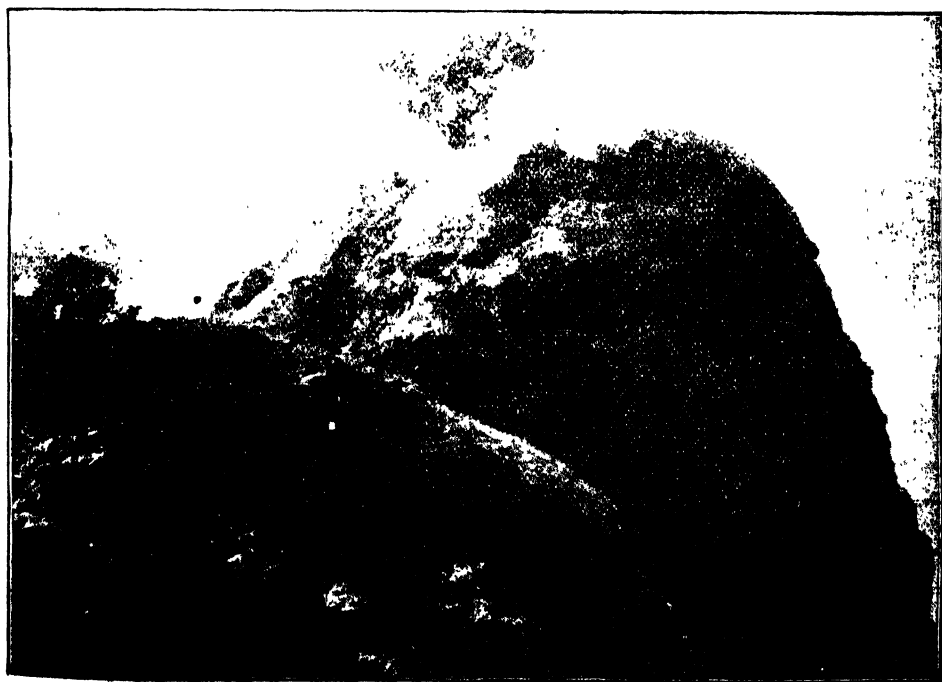
শিখর-প্রহরী

সাহিত্যের ভাষা

আমি ইদানিং মনস্থির করেছিলুম যে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে আর তর্ক করব না; কেননা যে তর্ক এগোয় না, তাতে যোগ দেওয়ার অর্থ ঘুরে-ফিরে সেই একই কথার একই জবাব দেওয়া। এককথা বলে একশ-কথা শোনায় আমার আপত্তি নেই—কিন্তু একশ কথা বলে একশ-জনের কাছ থেকে উত্তরে একই কথা শোনাটা ঈষৎ কষ্টকর। সাধুভাষীদের ঐক্যতান শুনে-শুনে অন্ততঃ আমার শ্রবণ-মন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। তর্কক্ষেত্রে বুদ্ধি-বৃত্তিকে সজাগ রাখ্‌তে হলে, পূর্ব্বপক্ষের কাছ থেকে নিত্যনূতন চিন্তার ধাক্কা পাওয়া আবশ্যক; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ সে ধাক্কা প্রায়ই দেন না। সমাজের কিম্বা জীবনের যে রীতি পূর্ব্বাপর চলে আস্‌ছে, না ভেবে-চিন্তে, একমাত্র অভ্যাসবশতঃ মনে ও ব্যবহারে যার সঙ্গে আমরা বনিবনাও করে আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছি, কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বল্‌লে, আমরা না ভেবে-চিন্তে সেই বিরুদ্ধবাদের সমস্বরে প্রতিবাদ করি। পুরাতন যে কোনও প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে, নৈসর্গিক নিয়মে ক্রমপরিবর্ত্তিত হয়ে নূতনে পরিণত হয়,—এর চাইতে বড় মিথ্যে কথা দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া ভার। কালবশে পুরাতন শুধু সনাতন হয়ে ওঠে। প্রচলিত প্রথার প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা। সুতরাং যিনি কোনও নূতন মত প্রচার করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যাঁদের কোনও মত নেই, তাঁদের একমত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং একমাত্র পুনরুক্তির বলে এ সত্য একরকম সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে যাঁরা বাংলা ভাষার দৌলতে বাংলা সাহিত্য গড়ে তুল্‌তে চান—তাঁদের বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। শুধু তাই নয়—যখন দেখ্‌তে পাই যে আমাদের মতের বিরুদ্ধে কোনও কোনও ব-কলম সই-করা উচ্চভাবও সাহিত্য-সমাজে উচ্চচিন্তা বলে সম্মান লাভ করেছে, তখন "মৌন অসম্মতির লক্ষণ" এই প্রাচীন বাক্য অনুসারে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলুম।

(২)

কিন্তু চুপ করে থাকা শ্রেয়ঃ হলেও সাহিত্যিকের পক্ষে কথা কওয়াটাই প্রেয়ঃ। সুতরাং পুনরায় এই তর্ক-যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আমার পক্ষে যদিচ কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই—তবুও তা দিচ্ছি। অগ্রহায়ণ মাসে নারায়ণ পত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত সাধুভাষার স্বপক্ষে যে-সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন তা আমার মতে বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। পূর্ব্বপক্ষের যত লেখা অদ্যাবধি আমার চোখে পড়েছে, তার মধ্যে উক্ত প্রবন্ধের একটা বিশেষত্ব আছে। এ প্রবন্ধের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পাওয়া যায়। গুপ্তমহাশয় যা বলেছেন, তার অনেক কথা সত্য; বাদবাকী সব সত্যাভাস—একটি কথাও একেবারে মিছে

নয়, সুতরাং আমি সাগ্রহে এঁর মতামতের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

এঁর মতের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল যে কোথায় তা এক-নজরে ধরা যায় না; অথচ অমিল যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা ইনি তথাকথিত সাধুভাষার স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্যই বহুবিধ আলঙ্কারিক এবং ঐতিহাসিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। যখন আমাদের পরস্পরের প্রায় প্রতি-কথারই গোড়ায় মিল আছে, তখন শেষে অমিল হবার কারণ—হয় আমি ঠিক-নামাতে ভুল করেছি, নয় তিনি করেছেন। আমার মনে এ-সন্দেহ হয় যে এ ক্ষেত্রে গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে আমরা Principlesএ একমত—আমাদের মধ্যে যা-কিছু মতভেদ Facts নিয়ে। গুপ্তমহাশয় এই বলে তাঁর প্রবন্ধ সুরু করেছেন—

"পণ্ডিতীভাষা ব্যতিরেকেও এক সাধুভাষা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার প্রবর্ত্তক এবং যাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া এ যাবৎ পরিচিত।......সম্প্রতি এক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে যে, মৌখিক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত প্রতিভা এই চেষ্টায় ঢালিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলার যে দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, যাঁহারাই একরকম বাঙ্গলা ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের এই দুটি বিভিন্ন আদর্শ আজ বাঙ্গালীর সম্মুখে। বঙ্গসাহিত্য আজ কাহাকে অনুসরণ করিবে —বঙ্কিমচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ?"

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সাধুভাষার প্রবর্ত্তক এবং রবীন্দ্রনাথ যে তার নিবর্ত্তক এ Fact নয়। তারপর বঙ্গসাহিত্য যে কোনও উভয়সঙ্কটে পড়েছে এমন ত আমার মনে হয় না। প্রতিভার অনুসরণ অর্থাৎ অনুকরণ করতে গেলে আমাদের সাহিত্যসমাজে অপ্রতিভ হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। বঙ্গসাহিত্যের প্রাণরক্ষার জন্য নবীন সাহিত্যিকদের প্রত্যেককেই নিজের মন আবিষ্কার করতে হবে এবং নিজের রচনা-রীতি উদ্ভাবন করতে হবে। যে লেখায় আত্মরতি ও আত্মরীতি নেই—তা আর যাই হোক্, কাব্য নয়। বাঙালীর আত্মপ্রকাশের পক্ষে মাতৃভাষা বিশেষরূপে অনুকূল—এ বিশ্বাসের বলেই আমরা সে ভাষার পক্ষ নিয়েছি।

চলিত ভাষা বনাম সাধুভাষা নিয়ে আজকাল যে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়েছে, সে তর্ক আমিই তুলি; সুতরাং স্বপক্ষ বজায় রাখবার ভার আমাকেই নিতে হবে। যথাশক্তি সে কর্ত্তব্য পালন করতে আমি পূর্ব্বেও চেষ্টা করেছি—আবশ্যক হলে ভবিষ্যতেও করব। এ প্রচেষ্টা অপূর্ব্ব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূত্রপাত করে গিয়েছেন, আমরা তারই জের টেনে আনছি। তিনি সাহিত্যের ভাষাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন, আমরা সেখান থেকে তাকে বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরের দিকে আরও দু'এক পা এগিয়ে দিতে চাই। যার প্রাণ আছে তাকে আমরা কোথায়ও দাঁড় করিয়ে রাখবার বিপক্ষে। কেননা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বসতেই হবে এবং শেষটা শুতেই হবে।

(৩)

গুপ্তমহাশয় এই কথা বলে বিচার আরম্ভ করেছেন—নব্যতন্ত্রীরা চান "নিজের এক নূতন সাহিত্য সর্ব্বজনবোধ্যভাষায় সর্ব্বজন-উপভোগ্য সাহিত্য।" আমরা অবশ্য এ রকম কথা কখনো বলেছি বলে স্মরণ হয় না। গুপ্তমহাশয় বোধ হয় অবগত নন্ যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালপ্রমুখ সাহিত্যিকেরা "অসাধুভাষা"র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, তা দুর্ব্বোধ্য। সাহিত্যের মহা-মহারথীদের নিকট যে ভাষা দুর্ব্বোধ্য, সে ভাষা যে "সর্ব্বজনবোধ্য" হবে—মনে এ রকম কোনও দুরাশা পোষণ করে আমরা লিখতে বসিনে। সে যাই হোক্, গুপ্তমহাশয় সজোরে বলেছেন—

"প্রথমেই আমরা বলিতে চাই আপামর সর্ব্বসাধারণের জন্য সাহিত্য নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলের মনস্তুষ্টি করা বা সকলের বোধগম্য হওয়াও নয়।"

আমি কাব্যসম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বরাবর বলে আস্‌ছি। এ বিষয়ে আমার দু-একটি পূর্ব্বকথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"মনেরও উপর্য্যুপরি নানা লোক আছে, এবং শ্রেষ্ঠসাহিত্য মানসিক উর্দ্ধলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই—সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিষ। Utilitarianismএর সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না।...

"সাহিত্যচর্চ্চার যে অধিকারী-ভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।)

তারপর "সকলের মনস্তুষ্টি" করা যে সাহিত্যের কর্ত্তব্য এ ধারণাও আমার কস্মিনকালেও ছিল না। প্রমাণ, আমি বলেছি —"সাহিতের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়।"

"আমি জানি যে পাঠক-সমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারি নাম বেদনা।"

"বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্রের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই করনা কেন, পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরোনা।"

"সমাজের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।"—(সবুজ পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।)

এত স্পষ্ট করে জন-সাধারণের অপ্রীতিকর এই সকল কথা বলবার কারণ ভর্ত্তৃ-হরির একটি শ্লোক আমি কখনও ভুলতে পারি-নি। এই "অসাধারণ" কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন :—

"ন নটা ন বিটা ন গায়না ন পরদ্রোহনিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
নৃপসদ্মনি নাম কে বয়ং কুচভারানমিতা ন যোষিতঃ॥"

তা ছাড়া—"পরের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হলে সরস্বতীর বরপুত্রও নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র।" (সবুজপত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।)—এ কথাও আমার মনে ছিল। পরের মনোরঞ্জন করতে হলে, নিজের মনোগত নয়, পরের মনোমত কথা কইতে হয়; সুতরাং আর যে-কারণেই হোক, King Demosএর মনস্তুষ্টির জন্য আমরা মাতৃভাষার গুণগান করিনে। জানা জিনিষের অন্তরে যে অজানা গুণ থাকতে পারে—এ জ্ঞান জনসাধারণের নেই। বাংলা ভাষা বাঙালী মাত্রেই জানে, সুতরাং তা সকলেরই অবহেলার সামগ্রী। গুপ্তমহাশয় বলেছেন যে "Democracyর উচ্চ আদর্শ সহজেই Mob-rule বা Vulgarismএ পরিণত হইতে পারে।" ন্যাশানাল কংগ্রেসের দল অবশ্য এ কথা শুনে চম্‌কে উঠবেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে যাই হোক, সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্ত-মহাশয়ের কথা যে সত্য তার প্রমাণ "রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত প্রতিভা" যে কাব্যে "ঢালিয়া দিয়াছেন" সেই "ঘরে-বাইরে"র উপর সাহিত্যের শাসনকর্ত্তাদের সদলবলে আক্রমণ। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রই হচ্ছে Democracyর একাধারে শাসনযন্ত্র ও পীড়ন-অস্ত্র। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে জনসাধারণের মন-যোগানো কথা বলাই যদি আমাদের অভিপ্রায় হত তাহলে আমরা মাতৃভাষাকে সাহিত্যের উচ্চাসনে বসাবার চেষ্টা করতুম না। আমাদের এ জ্ঞান ছিল যে প্রথম-থেকেই দেশশুদ্ধ লোক এ চেষ্টায় বাধা দেবে; যে সাহিত্যে আটপৌরে মনোভাব পোষাকী ভাষা ধারণ করে, সেই সাহিত্যই লোকপ্রিয় ও লোকপূজ্য। সুতরাং দেখা গেল এ বিষয়ে গুপ্ত-মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের মতের ষোলআনা মিল আছে। তবে অমিলটা যে কোথায় তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(৪)

গুপ্ত-মহাশয় বলেছেন যে আমাদের মতে—"চলিত ভাষা সহজ সরল প্রাণস্পর্শী দ্যোতনাপূর্ণ, জীবনীশক্তিপূর্ণ—তাই চলিত ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা উচিত।" এ কথা সত্য। আমি একবার নয় বহুবার বলেছি যে মৌখিক ভাষা সহজ সরল সজীব সতেজ সরাগ ও সচল। মৌখিক ভাষার এ সকল গুণ যে আছে তা গুপ্ত-মহাশয় অস্বীকার করেন না। এবং সাহিত্যের ভাষায় এ সকল গুণ থাকাটা যে দোষের এ কথাও তিনি বলেন না। ভাষা যত কৃত্রিম, যত জটিল, যত নির্জ্জীব, যত নিস্তেজ, যত বিবর্ণ, যত নিশ্চল হবে, তত যে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে—এ কথা তর্কের খাতিরেও কেউ বল্‌তে পারেন না।

গুপ্তমহাশয় বলেন যে সাহিত্যের ভাষার সরলতা (Simplicity) একমাত্র গুণ নয়, স্বাভাবিকতা (Naturalness) একমাত্র গুণ নয়, সজীবতা একমাত্র গুণ নয়। কিন্তু একমাত্র না হলেও, এর প্রতিটি যে একটি গুণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং এইসকল গুণের একত্র সমাবেশে অন্ততঃ গদ্যসাহিত্য যে তার পূর্ণশ্রী, পূর্ণশক্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের উপরই এই সকল

গুণের আধার ফরাসী-সাহিত্য যে গড়ে উঠেছে—তা গুপ্তমহাশয়ের অবিদিত নয়। কেননা, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, সে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার "অলঙ্কারের সূত্রপাত" নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে এবং "ফরাসীসাহিত্যের বর্ণপরিচয়" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁর সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে এ বিষয়ে ফরাসী ও সংস্কৃত আলঙ্কারিক উভয়েই একমত। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে শাস্ত্রমতে বৈদর্ভীরীতি বিশেষ করে কবিতার পক্ষে উপযোগী এবং ফরাসী মতে গদ্যের পক্ষে। সুতরাং এই দুই মতের সমন্বয়ে এই মীমাংসা করা অসঙ্গত হবে না যে এরীতি উভয়ের পক্ষে সমান উপযোগী।

ভাষার সরলতা স্বাভাবিকতা সজীবতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সাহিত্যের গুণ কিনা সে বিষয়ে গুপ্তমহাশয় নিঃসন্দেহ নন।

তিনি বলেন,"natural হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়।" "গৌ তৃণং অত্তি"—এ উক্তি সত্য হলেও যে "স্বভাবোক্তি নয়" এ-বিষয়ে নব্য-প্রাচীন সকল সংস্কৃত আলঙ্কারিক যে একমত সে কথা আমি অনেক দিন হল পাঠক-সমাজকে শুনিয়ে রেখেছি। "গরুতে ঘাস খায়" এ কথাটা সত্য হলেও বলবার কিছু প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধুভাষীদের মতে "ধেনু তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে"—এ হচ্ছে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের কথা। এই নিয়েই ত ঝগড়া। তবে কি un-natural হওয়া সাহিত্যের ধর্ম্ম? অবশ্য তাও নয়। গুপ্ত-মহাশয় বলেন "সাহিত্যের লক্ষ্য আর্ট—শিল্প রচনা।" এ সত্য আমরা সজ্ঞানে কখনও অস্বীকার করি-নি। এ ত ভাষার কথা নয়, রচনার কথা; উপাদানের কথা নয়, গড়নের কথা। যে ভাষার গড়ন নেই তা সাহিত্য নয়। আর্টহীন লেখার জন্য ভাষা দোষী নয়; দোষী লেখক।

পঞ্চতন্ত্রে একটি প্রবচন আছে যে অস্ত্র, যন্ত্র, ভাষা ও নারীর অন্তরে যে কতটা শক্তি নিহিত আছে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়—যখন ও-সকল বস্তু গুণীর হাতে পড়ে। আমারও বিশ্বাস এই যে, যে-কোনও ভাষা হোক না কেন, আর্টিষ্টের হাতে পড়লে তার থেকে উঁচু দরের সাহিত্য রচিত হয়।

"যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।"—এ কথা যাঁর কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় আর্টিষ্ট, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র। অতএব মৌখিক ভাষার সঙ্গে যে আর্টের মুখ দেখা-দেখি নেই এ-কথা আমরা স্বীকার করবার কোনও কারণ দেখিনে, যেহেতু আমাদের দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণ এবং প্রাচীন কবিগণ সমস্বরে আমাদের বরাভয় প্রদান করেছেন।

গুপ্তমহাশয় আসলে তাঁর প্রবন্ধে ভাষার নয়, styleএর বিচার করেছেন। সুতরাং তিনি মৌখিক এবং লিখিত ভাষার ভিতর যে পার্থক্য আছে তাই প্রমাণ করতে বিশেষ প্রয়াস পেয়েছেন। লিখিত ও কথিত ভাষার ভিতর যে পার্থক্য আছে এ সত্য উপেক্ষা করে আমরা মাতৃভাষার

কোণে গিয়ে চলে পড়িনি। আজ চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত আমার একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি; তার থেকেই গুপ্তমহাশয় দেখতে পাবেন যে আমাদের আসল বক্তব্যটা কি।

"Art এবং Artlessnessএর মধ্যে আস্‌মান-জমিন ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়,—Style গত। লিখিত ভাষার কথাগুলি শুদ্ধ, সুনির্ব্বাচিত এবং সুবিন্যস্ত হওয়া চাই এবং রচনা সংক্ষিপ্ত এবং সংহত হওয়া চাই। লেখায় কথা ওল্টানো চলে না, বদলানো চলে না, পুনরুক্তি চলে না, এবং এলোমেলো ভাবে সাজানো চলে না। "ঢাকা রিভিউ"য়ের সম্পাদকমহাশয়ের মতে যে-ভাষা প্রশস্ত (সাধুভাষা), সে-ভাষায় মুখের ভাষার যা-যা দোষ, সে-সব পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষার যে-সকল গুণ আছে—অর্থাৎ সরলতা, গতি ও প্রাণ—সেইগুলিই তাতে নেই।" (ভারতী।)

তথাকথিত সাধুভাষার বিরুদ্ধে আমাদের একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে; তা শতকরা নিরানব্বই জন লেখকের হাতে সুগঠিত হয় না;—কেননা এই কৃত্রিম উপাদানের উপর তাঁদের সহজ অধিকার নেই। ভাব ও ভাষাকে নিজের মনোমত রূপ দিতে হলে কঠিনকে তরল করা, জটিলকে সরল করা দরকার। এই যুগসঞ্চিত সভ্যতার চাপের ভিতর মানুষের পক্ষে সহজ অর্থাৎ natural হওয়া সব-চাইতে শক্ত। বাইরের কোন বস্তু, তা ভাষাই হোক্ আর ভাবই হোক্, হুবহু নকল করে natural হওয়া যায় না—অতএব আর্টিষ্ট হওয়া যায় না। আর্টিষ্টের কাছে বাইরের সব জিনিষ উপাদান মাত্র—যা নিয়ে সে নিজের nature অনুসারে রূপ গড়ে।

(৫)

গুপ্তমহাশয়ের মতে আমাদের মৌখিক ভাষা সাহিত্য-রচনার পক্ষে উপযুক্ত উপাদান নয়। আমাদের মত অন্যরূপ। সুতরাং গুপ্তমহাশয় মৌখিক ভাষার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন তার বিচার করা আবশ্যক। গুপ্তমহাশয়ের প্রথম কথা এই যে—

"প্রতিদিন আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহা মুখ্যতঃ প্রয়োজনের ভাষা। প্রতিদিনের ভাষা কর্ম্মসিদ্ধির ভাষা।"

এ কথার আমি প্রতিবাদ কর্‌তে পারি নে—কেননা আমি পূর্ব্বে নিজ-মুখেই স্বীকার করেছি যে—

"মানুষের ভাষা তাহার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে,—এবং সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল।" "মানুষের ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ গেরস্থালীর ভাষা।" (সবুজপত্র, ৩য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।)

কিন্তু এর জন্য যদি মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করা না যেতে পারে—তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নেই এবং থাকৃতে পারে না যাতে সাহিত্য রচিত হতে পারে। কেননা ভাষা হচ্ছে মানুষের মুখের জিনিষ। সেই জিনিষকে ধরে রাখবার জন্য মানুষে অক্ষর নির্ম্মাণ করেছে। লেখা জিনিষটে হচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়কে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় করবার একটা কৌশল—

একটা mechanical উপায়মাত্র। পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে—তা সে সে যত উচ্চ হোক্—এমন শব্দ নেই যা কস্মিনকালে কারও মুখের কথা ছিল না। অক্ষর যে একটি শব্দেরও সৃষ্টি করে নি, আমরা পুঁথি-পড়া লোক সে সত্য সহজেই ভুলে যাই। সুতরাং বাংলা ভাষা অপরাপর ভাষার মত মৌখিক ভাষা বলে সাহিত্যে অগ্রাহ্য নয়।

তার পর, পৃথিবীর অতীত, বর্ত্তমান সকল ভাষাই প্রয়োজনের ভাষা; এবং অনাগত ভাষাও যে অপ্রয়োজনের ভাষা হবে এ আশা করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। গুপ্তমহাশয় বলেন, প্রতিদিনের ভাষা কর্ম্মসিদ্ধির ভাষা—আমি যাকে বলি গেরস্থালীর ভাষা—কিন্তু তা বলে আক্ষেপ করে কোনও ফল নেই—কেননা কর্ম্মের ভাষা অর্থাৎ জীবনের ভাষাই হচ্ছে সকল ভাষার মূলধন। জীবনের আদিম এবং সনাতন অর্থ—কর্ম্মজীবন; জ্ঞান ও ভক্তির মূলে ঐ কর্ম্মই বিদ্যমান। কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করা। মানব-সমাজ ও মানব-ভাষা উভয়েই এই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। আমাদের দর্শনে এক-রকম জ্ঞান, অথবা অনুভূতির কল্পনা করা হয়েছে যার কর্ম্মের সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। আত্মার তুরীয় অবস্থায় যদি কোনও জ্ঞান কিম্বা অনুভূতি থাকে তার প্রকাশের যে কোনও ভাষা নেই, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বৈদান্তিকেরা সেই জ্ঞান, সেই অনুভূতির বিষয় সম্বন্ধে নেতি নেতি ছাড়া আর কোনও কথা বলতে পারেন না। সুতরাং আমি যে পূর্ব্বে বলেছি যে যে-ভাষা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-মত গড়ে উঠেছে, সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল, আমার বিশ্বাস সে উক্তি সত্য। জীবনযাত্রার জন্য মানুষের দেহ ও মন দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহের মত, আমাদের মনেরও ক্ষুৎ-পিপাসা আছে; সুতরাং জীবনের প্রয়োজনবশতঃই মানুষে বাইরের মত ভিতরকার বস্তুরও নামকরণ কর্‌তে বাধ্য হয়েছে। এবং যেহেতু সাহিত্য ভিতর-বাহির দুই নিয়ে কারবার করে, তখন সাহিত্যের উপাদান সকল-ভাষাতেই পাওয়া যায়—বাংলা ভাষা এ বিষয়ে এক-ঘরে নয়। গুপ্তমহাশয়ের মতে—

"সাহিত্য প্রধানতঃ ভিতরের অন্তরাত্মারই বস্তু, সাহিত্যের ভাষাও ভিতরের অন্তরাত্মারই ভাষা।"

আমার বিশ্বাস বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগাযোগটা এত ঘনিষ্ঠ যে বুদ্ধির অস্ত্র দিয়ে সে যোগসূত্র ছিন্ন করে যে খণ্ড-সত্য পাওয়া যায় তা সাহিত্যের বস্তু নয়। ভিতরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বাহির—বিজ্ঞানের এবং বাইরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভিতর—দর্শনের বস্তু। আর সাহিত্যের বস্তু যদি কেবলমাত্র "ভিতরের অন্তরাত্মার" বস্তু হয়, তাহলে সে বস্তু প্রকাশ কর্‌বার ভাষা একরকম নেই বল্লেই হয়। যে-কোনও ভাষার শব্দ-রাশি আলোচনা কর্‌লেই দেখা যায় যে তার মধ্যে হাজারে নশ-নিরনব্বইটি হচ্ছে বাহ্যবস্তুর বিশেষ্য কি বিশেষণ। গুপ্তমহাশয় বলেন সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সুন্দর ও মহৎ মনোভাব প্রকাশ করা সুতরাং তার ভাষাও

"স্থির সংহত গভীর গম্ভীর দৃঢ়সম্বদ্ধ" হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, তিনি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার যে ক'টি গুণের উল্লেখ করেছেন সে-সব ভিতরের বস্তুর নয়, বাইরের বস্তুরই গুণের নাম; বস্তু-বিজ্ঞানে যাকে বলে poperties of matter। এর জন্য আমি তাঁকে দোষ দিইনে—কেননা আমরা মনের বিষয়ের উপর বস্তুর ধর্ম্ম আরোপ কর্‌তে বাধ্য। কিন্তু একের ধর্ম্ম অপরের উপর আরোপ করবার ভিতর বিপদ আছে,—কেননা সে ধর্ম্ম যে যথার্থ নয়, কেবলমাত্র আরোপিত, এ সত্য ভুলে গেলে আমাদের সকল কথাই ভুল হয়। গুপ্তমহাশয় যে এ ভুল করেন তার প্রমাণ—তিনি বলেন যে মুখের কথায় আমরা "যত সংক্ষেপে যত অল্প শব্দোচ্চারণে মনের ভাব পরকে জানাইতে পারি, তাহার অতিরিক্ত কিছু শক্তিক্ষয় করিতে চাহি না।" উদাহরণ আমরা "করিয়া" না বলে "করে" বলি। তারপর তিনি বলেন যে "জিনিসকে সুন্দর করিয়া মহৎ করিয়া পূর্ণ করিয়া বলাতেই সাহিত্যের মর্য্যাদা। সরল সহজ করিতে যাইয়া বস্তুকে যদি ছোট করিয়া ফেল, অল্পের মূর্ত্তি দাও তবে সে সরলতা সাহিত্যের সরলতা নয়।" এই কি স্পষ্ট প্রমাণ নয় যে কাগজের উপর কতখানি জায়গা জোড়ে সেই অনুসারে তিনি শব্দের মহত্ব নির্ণয় করেন? বাচকের দেহ অল্প হলে তার বাচ্যকে যে ছোট করে ফেলা হয়, তাকে অল্পের মূর্ত্তি দেওয়া হয়—এ ধারণার মূলে শুধু Space-এর ধারণাই আছে; আর Space মনোজগতের নয়, বাহ্যজগতের জিনিষ। ইঞ্চি-মাপ অনুসারে যে শব্দের শক্তি বাড়ে এ বিশ্বাস সাধুভাষীদের যে মজ্জাগত তার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। এ বিশ্বাস যে ভুল তার প্রমাণ—মানুষের মনের পক্ষে যা সব-চাইতে বড় সত্য, পতঞ্জলির মতে তার বাচক হচ্ছে একটি মাত্র অক্ষর—ওঁ। "পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতির পূর্ণ অখণ্ড বাক্" যে অল্প সময়ে উচ্চারণ করা যায় না—এ সত্য গুপ্তমহাশয় কোথা হতে পেলেন? শব্দের শক্তি দেশকালের অতীত; কেননা সে শক্তির মূল মনোজগতে,—জড়জগতে নয়।

(৬)

গুপ্তমহাশয় সজীবতাকেও ভাষার গুণ বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"তার পর দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সজীব বল। কিন্তু এ সজীবতার মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলীর চঞ্চলতাই অধিক। দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই ব্যস্ততা, ত্রস্ততা... ইহার ভাষাও তাই অস্থির বিক্ষুব্ধ। চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্যের ভাষা গতি চায়, কিন্তু তাহা হইবে আত্মস্থ, স্থিরসত্ব, সংযতপ্রবাহ।"

সাহিত্যের ভাষা যে গতি চায় এ কথা তিনি যখন স্বীকার করেন, তখন গুপ্ত-মহাশয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি সে গতির একটি মাত্রা নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন যার সীমা অতিক্রম কর্‌লেই তা চাঞ্চল্যে পরিণত হবে? হয়ত তিনি যাকে বল্‌বেন ভাষার স্থিরসত্ব গতি, আমরা তাকে বলব আধ-মরা। চাঞ্চল্য, জীবনের একমাত্র লক্ষণ না হলেও, একটি প্রধান লক্ষণ;—জড়তাই হচ্ছে মৃতের লক্ষণ। গুপ্ত-

মহাশয় যাকে ভাষার স্থৈর্য্য বলেন, আমরা যদি তাকে জড়তা বলি, তাহলে তিনি তার কি উত্তর দেবেন? ভাষার গতি কি-পরিমাণে বেড়ে গেলে তা চঞ্চল হয়, কি-পরিমাণে কমে এলে তা জড় হয়—তার মাপকাটি কারও হাতে নেই। এ সমস্যার কোনও মীমাংসা নেই, কেননা ভাষাসম্বন্ধে এ রকম কোনও সমস্যাই নেই। অস্থিরতা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম,—ভাষার নয়। সাহিত্যে সংযমের আমি একান্ত পক্ষপাতী এবং সেই কারণেই আমি সজীব ভাষার একান্ত পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আমি আমার গুটিকতক পূর্ব্বকথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত; যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।)

(৭)

অতএব দেখা গেল, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে আমি এক-মত। কি উপায়ে তা সিদ্ধ হতে পারে তাই নিয়েই যা মতভেদ। গুপ্তমহাশয় প্রচলিত-সাধুভাষার পক্ষপাতী, আমি মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস তথাকথিত সাধুভাষা ঢিলেমির প্রশ্রয় দেয়, কেননা সে ভাষার আশ্রয়ে আমরা শব্দাড়ম্বরের ভিতর ভাবের দৈন্য সহজেই গোপন করতে পারি। এ বিষয়ে আমার মত আমি বাংলার সাহিত্য-সমাজের নিকট পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি। আমার কথা এই :—

"আমাদের গদ্যের ভাব ও ভাষা দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ বাক্য কিছুই সুবিন্যস্ত নয়, এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পর-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে, আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।)

সাধুগদ্য যে বেচাল ও বে-প্যাটার্ণ তার কারণ এ গদ্য অনুবাদজন্য পণ্ডিতী ভাষা সংস্কৃতের অনুবাদ এবং সাধুভাষা ইংরাজির অনুবাদ এবং এ-দুইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা ভাষার সংস্কৃত অনুবাদ। "মূল ও অনুবাদ যে কোন দিন সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।"—এই হচ্ছে গুপ্তমহাশয়ের মত; এবং আমারও সেই মত।

গুপ্তমহাশয় বলেছেন চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ যে তা সাবয়ব। জীবনীশক্তি নিজের অনুরূপ দেহ গড়ে নেয়—যে দেহের ভিতর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এ বিশ্বের যে-অংশের ভিতর জীবন নেই তা inorganic। জড়পদার্থেরও

আমরা গড়ন দিই কিন্তু সে যোড়াতাড়া দিয়ে—ইংরাজিতে যাকে বলে mechanical পদ্ধতি অনুসারে। সজীব ভাষাই organic সাহিত্য রচনার পক্ষে একমাত্র উপযোগী ভাষা। সাহিত্যের বিশিষ্টতা কথার সমষ্টিতে নয়, ভাবের সমগ্রতার উপর নির্ভর করে—এবং এ সমগ্রতা কেবলমাত্র বিদ্যার বলে কি বুদ্ধির কৌশলে লাভ করা যায় না। মনোভাবকে শুধু মূর্ত্তিমান নয়, সজীব করে তোলাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। সুতরাং সাহিত্য জীবন্ত-ভাষার সম্পর্ক ত্যাগ কর্‌তে পারে না। লেখকমাত্রেই জানেন যে লেখায় ভাষার জীবনরক্ষা করাই কঠিন;—বধ করা সহজ। লেখনীর স্পর্শে ভাষা স্বতঃই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকতা (naturalness) সাহিত্যের একমাত্র গুণ না হতে পারে—কিন্তু কৃত্রিমতা মহাদোষ।

(৮)

আমরা এ-যাবৎ গদ্যসাহিত্যেরই আলোচনা করে আস্‌ছি;—কবিতার নয়; এবং সরলতা স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দতা হচ্ছে গদ্যের প্রধান গুণ। গুপ্তমহাশয় Mathew Arnoldএর মতামতের অতি ভক্ত এবং সাধুভাষার স্বপক্ষে বারম্বার তাঁরই দোহাই দিয়েছেন। সেই Mathew Arnold গদ্য-সাহিত্যে বৈদর্ভীরীতির এতটা ভক্ত ছিলেন যে তিনি ইংরাজিগদ্যের অরাজকতার শাসনের জন্য French Acdemyর অনুকরণে ইংলণ্ডেও একটি Acdemyর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গদ্যের যে একটি standard হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল—এবং আমারও আছে। এ কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে গদ্য শুধু কবিত্বের নয়, জ্ঞানেরও বাহন। সেকালে এদেশে অঙ্কশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রও কবিতায় লেখা হত—একালে ইতিহাস, পুরাণও গদ্যে লেখা হয়। মানুষের জ্ঞান, মানুষের চিন্তা, অপরের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে হলে ভাষা যে সহজ হওয়া আবশ্যক এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই। যেভাষা সর্ব্বলোকসামান্য সেই ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষাই যে জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লেখকমাত্রেই জানেন যে ভাবের সঙ্গে ভাষার সমন্বয় করা কতটা যত্নসাধ্য। গুপ্তমহাশয় স্বীকার করেন যে মৌখিক ভাষার সঙ্গে মানব-মনের একটা "সহজ সামঞ্জস্য" আছে। সে সামঞ্জস্য নষ্ট করাই কি সাহিত্যের ধর্ম্ম? প্রসাদগুণই গদ্যের সর্ব্ব-প্রধান এবং অসাধারণ গুণ। কেননা ভাষার স্বচ্ছতা ভাবের স্বচ্ছতার পরিচায়ক। যার মনের ভিতর আলো নেই, তার ভাষায় প্রকাশ-গুণ থাক্‌তে পারে না। আর আলোক হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ—তা সে বহির্জগতেই হোক্, আর মনোজগতেই হোক্। আর আলোকের ধর্ম্ম হচ্ছে শুধু বস্তুকে নয়, নিজেকেও প্রকাশ করা। আলোক স্বপ্রকাশ বলেই পরম সুন্দর। এই প্রসাদগুণ থাক্‌লে দর্শনও কাব্য হয়ে উঠে। ভাষার এই গুণের সদ্ভাবে Plato শঙ্কর ও Bergsonএর দর্শন চিন্তা-জগতে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য, সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি গুণ-সকলের সমাবেশেই ভাষা প্রসন্নতা লাভ করে।

(৯)

গুপ্তমহাশয়ের আলোচ্য বিষয় গদ্যের নয়, পদ্যের ভাষা। আমি ইতিপূর্ব্বে পদ্যের ভাষা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিনি। একালে পদ্যে শুধু কাব্য লেখা হয়,—শাস্ত্র লেখা হয় না। কাব্য অবশ্য কেবলমাত্র জ্ঞান কিম্বা চিন্তার আধার নয়। কবি মাত্রেরই দৃষ্টির এবং অনুভূতির বিশেষত্ব আছে। আমার মতে "প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস।" (সবুজপত্র ১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।) সুতরাং প্রতি কবির ভাষারই সুস্পষ্ট বিশিষ্টতা থাকতে বাধ্য। সুতরাং কাব্যের ভাষার কোনও Standard থাক্‌তে পারে না। যে গদ্যসাহিত্য কাব্যের অন্তর্ভূত সে গদ্যও Standard গদ্য হতে পারে না, তবে এই স্বাতন্ত্র্য-লাভ সম্বন্ধে পদ্যের অপেক্ষা গদ্যের স্বাধীনতা ঢের কম। গুপ্তমহাশয় যখন বিশেষ-করে এই কবিতার কথাই আলোচনা করেছেন, তখন তাঁর ব্যক্তব্য কথার বিচার করা আবশ্যক বোধে এ বিষয়েও দু'-চার কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। কাব্যের ধর্ম্ম কি? কি কি গুণের সদ্ভাবে কাব্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে?—সে সম্বন্ধে গুপ্ত-মহাশয় বহু আলোচনা করেছেন। সে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমি যোগ দিতে চাই নে। কাব্যের ভাষা ওরফে Style সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলি গ্রাহ্য করবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করা দরকার। বলা বাহুল্য গুপ্তমহাশয় অধিকাংশ স্থলেই Style অর্থে ভাষা শব্দ ব্যবহার করেন। এ দুয়ের প্রভেদটা উপেক্ষা করায় তাঁর বিচার অনেকটা উল্টোপাল্টা হয়ে পড়েছে। গুপ্তমহাশয় বলেছেন যে—

"মহৎকে সর্ব্বসাধারণের গোচর বা বোধগম্য করাইতে যাইয়া তাহার মহত্বই তুমি নষ্ট করিবে। এ কথাটি বিশেষরূপে প্রযোজ্য কবিতার জগতে। সাধারণে সকলে বুঝিল বা না বুঝিল তাহার সহিত কাব্য স্থষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই।"

এককথায় প্রসাদগুণ কবিতার গুণ নয়। আমাদের আলঙ্কারিকের মত এর ঠিক উল্টো। তাঁরা বলেন—

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিন্যাসমাত্রেন যয়া নাপহৃতং মনঃ॥

সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই যে তার সাক্ষাৎলাভ করবামাত্র মানুষে মুগ্ধ হয়। যার মর্ম্মগ্রহণ করবার জন্য টীকাভাষ্যের প্রয়োজন তা সত্য হতে পারে, শিব হতে পারে, কিন্তু সুন্দর নয়। রূপ স্বপ্রকাশ, অতএব প্রকাশগুণ অর্থাৎ প্রসাদগুণ তার একমাত্র ধর্ম্ম। গুপ্তমহাশয়ের নিকট Democracy এতই অবজ্ঞার জিনিষ যে জনসাধারণকে তিনি মনেও অস্পৃশ্য করে রাখতে চান। তাঁর বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ কাব্য শুধু শিক্ষিত লোকের জন্যই রচিত হয়। একহিসাবে কথাটা যে আমিও মানি তার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি। তবে আমার ধারণা এই যে, আমরা যাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় বলি, শিক্ষার দোষে তাদের মধ্যে বেশির-ভাগ লোকই কাব্য-রসের আস্বাদন করতে অসমর্থ। কবি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কোনও বিশেষ শ্রোতাকে চোখের সুমুখে রেখে নিজের মনের কথা বলেন না। তিনি কাব্যে

অবশ্য আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু কার কাছে? মানব-মনের কাছে। ভাষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একের মনের বস্তু অপরকে দান করা। কবির উক্তি perfect speech এবং সে উক্তি এই কারণেই চরমোক্তি যে তা perfectly communicative, অর্থাৎ তা অবলীলাক্রমে অপরের মনে সম্পূর্ণ সংক্রমিত হয়;—তার রূপ পরিচ্ছিন্ন আর তার গতি অবাধ। যে উক্তির রূপ অস্পষ্ট, দেহ শব্দভারাক্রান্ত, গতি সবাধ, তার স্থান কাব্যে নেই—আছে পাণ্ডিত্যের রাজ্যে। প্রসাদগুণবঞ্চিত ভাষা—ভাষা নয়, স্তূপীকৃত শব্দরাশি মাত্র। এবং এ কথাও বলা বাহুল্য যে যে-ভাষা বক্তা ও শ্রোতাসামান্য নয়, সে ভাষায় প্রসাদ-গুণের চরমোৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই। আমার চিরদিনের মত এই যে, দুর্ব্বোধের আদর শুধু নির্ব্বোধের কাছে এবং এ মত পরিবর্ত্তন করবার অদ্যাবধি আমি কোনও কারণ দেখিনি।

(১০)

কিন্তু পাছে ভাবের মহত্ব নষ্ট হয় এই ভয়েই গুপ্তমহাশয় আকুল। মৌখিক ভাষা তাঁর মতে সাহিত্যে অগ্রাহ্য; কেননা "গভীর প্রদেশস্থ ঘননীলাম্বুর যে নিথর সত্বপূর্ণ স্থানুত্ব" তার পরিচয় গুপ্তমহাশয় মাতৃভাষার ভিতর পান না। তিনি যে প্রসাদগুণকে উপেক্ষা করেন তার প্রমাণ তাঁর পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ভিতরই পাওয়া যায়। আমাদের আলঙ্কারিকেরা যাকে বলে ওজঃগুণ তিনি একমাত্র সে গুণের অতিমাত্রায় ভক্ত। অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব-আলঙ্কারিক-নিন্দিত গৌড়ী রীতিরই পক্ষপাতী। দণ্ডী বলেছেন—"অনুপ্রাসধিয়া গৌড়ৈ স্তদিষ্টং বন্ধগৌরবাৎ।" অর্থাৎ গৌড়জন অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের অতিশয় পক্ষপাতী; কেননা তাদের ধারণা যে উক্ত উপায়ে রচনা গাঢ়বন্ধ হয়। গুপ্তমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বহুবার বন্ধনের গাঢ়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং মেঘনাদ-বধের অনুপ্রাসসম্বল নিম্নলিখিত কবিতা সাধুভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে"—

তার পর, তিনি Style সম্বন্ধে Cicero, Corneille এবং Victor Hugoর নজির দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ তিন ব্যক্তিই Rhetorician বলেই সাহিত্যজগতে বিখ্যাত। যে রচনারীতির প্রধান সম্বল শব্দাড়ম্বর, বাংলা ভাষায় সে রীতির অবলম্বন সুসাধ্য নয়। কেননা বাংলা ভাষা "অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল"। অতএব শাস্ত্রমতে বৈদর্ভীরীতির উপযোগী ভাষা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে ওজঃ-গুণের অতিলোভবশতঃ সেকালের কবিরা "অনত্যর্জ্জুনাব্জন্ম সদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ" প্রভৃতি বাক্য রচনা করে গিয়েছেন। উক্ত বাক্য যে সার্ব্বজনবোধ্য নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন, এবং সে কারণ সম্ভবতঃ এতে ভাবের মহত্ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু যদি রক্ষিত হয়ে থাকে তবে সে ভাবধন মাটির নীচে রক্ষিত হয়েছে;—দিনের আলোয় প্রকাশিত হয়নি। ভাবের মহত্ব যে শব্দের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের উপর নির্ভর করে না—এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে তা প্রমাণ করবার জন্য তর্ক যুক্তির কোনও

প্রয়োজন নেই। ওজঃগুণ যে styleএর একটি বিশেষগুণ তা আমরা সকলেই স্বীকার করি। নিম্নে বামনের অলঙ্কারসূত্র থেকে দু-চারটি কথা তুলে দিচ্ছি; তার থেকে দেখতে পাবেন সে গুণ প্রসাদ-গুণেরই অন্তর্ভূত।

"সমগ্রগুণা বৈদর্ভী।"

"ওজঃকান্তিমতী গৌড়ীয়া।"

"গাঢ়বন্ধত্বম্ ওজঃ।"

"শৈথিল্যং প্রসাদঃ।"

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে শৈথিল্য যখন ওজঃবিপর্য্যয়াত্মা তখন তা দোষ না হয়ে গুণ হয় কেন?

উত্তর—"গুণঃ সংপ্লবাৎ।"

ওজঃগুণের সংপ্লবেই প্রসাদ-গুণের পূর্ণতা। এস্থলে পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে প্রসাদ ও ওজঃ এ দুটি যখন পরস্পরবিরোধধর্ম্মী তখন এ উভয়ের সংপ্লব কি করে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর—স ত্বনুভবসিদ্ধঃ।

অর্থাৎ সে সংপ্লব কবিহৃদয়ের অনুভব-সিদ্ধ।—যেমন বিভিন্নজাতীয় রত্নের একত্র সমাবেশ। বামনাচার্য্যের এই মত সম্পূর্ণ সত্য। অলঙ্কারিকদের মতে যে সংস্কৃত-কবি প্রসাদগুণসর্ব্বস্ব, আমরা জানি সেই কালিদাসের কবিতাই ওজঃগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার একটি বন্ধু বলেন, ওজঃগুণ এবং ওজনগুণ এক জিনিষ নয়। ভাষার সরলতা যে কবির মনোভাব প্রকাশের প্রতিকূল নয়, তা গুপ্তমহাশয়ের সমালোচক-গুরু Mathew Arnoldএর কথাতেই প্রমাণ করা যায়। তাঁর মতে নিম্নলিখিত ছত্র ক'টিতে ইংরাজি কবিতা সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় পৌঁচেছে।

"After life's fitful fever he sleeps well"

—Shakespeare.

"though fal'n on evil days,
On evil days though fallen, and evil tongues"

—Milton.

"A thing of beauty is a joy for ever."

—Keats.

পাঠকমাত্রেই দেখতে পাচ্ছেন, উপরোক্ত বাক্য ক'টির ভাষা কত-সহজ, কত-সরল, কত-সর্ব্বজনবোধ্য। আমাদের মৌখিক ভাষাও শিল্পীর হাতে পড়লে যে কতদূর সরাগ ও সতেজ হতে পারে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"র ভাষা। অত শক্তিশালী অত শ্রীসম্পন্ন গদ্য বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে কখনও লেখা হয় নি। গৌড়ীয় রীতি শোভা পায় বক্তৃতায়—লেখায় নয়। কেননা বক্তৃতার উদ্দেশ্য ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য শ্রোতার চিত্তকে উদ্দীপিত, উত্তেজিত করে তোলা—এবং তার জন্য চাই ভাবের বাড়াবাড়ি ও ভাষার ধুমধড়াক্কা—যার প্রকোপে শ্রোতার "স্নায়ুমণ্ডলী" বিক্ষুব্ধ ও অস্থির হয়ে ওঠে। গুপ্তমহাশয় বলেন, কবির উক্তি "অতি সাধারণ"—আলঙ্কারিক ভাষায় যাকে বলে অতিশয়োক্তি। কিন্তু আলঙ্কারিকদের মতে অত্যুক্তি হচ্চে অতিশয়োক্তির উল্টো জিনিষ।

(১১)

আমি পূর্ব্বে বলেছি গুপ্তমহাশয় অনেক-স্থলে Style অর্থে ভাষা শব্দ ব্যবহার করেন; আবার অনেক স্থলে ভাষা অর্থে

তিনি বোঝেন শব্দ। শব্দসমষ্টি যে ভাষাপদবাচ্য নয়—এ সত্য তিনি বরাবর উপেক্ষা করেন। বাক্য অর্থাৎ গঠিত শব্দই হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান; এবং প্রাণ সেই বাক্যেরই আছে—শব্দের নেই। সে যাই হোক, গুপ্তমহাশয়ের মনোগত ভাব এই যে—যে-সকল শব্দ এক-কালে মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন নেই, এবং যে-সকল শব্দ কর্ম্মজীবনে নিত্য ব্যবহৃত হয় না, সেই সকলই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান। সেই সকলই নয়, সে সকলও যে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত এ কথা আমিও মানি। কর্ম্মজীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণ এবং যে-জাতির কর্ম্মজীবনের পরিধি যত সঙ্কীর্ণ, সে জাতির নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ তত স্বল্পসংখ্যক। সুতরাং কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তিন নিয়ে যখন সাহিত্যের কারবার তখন আমাদের নিত্যকর্ম্মের শব্দে তার কাজ চলে না। কিন্তু যা নিত্যকর্ম্মের কথা নয় এমন অসংখ্য কথা আমাদের মৌখিক ভাষারই অঙ্গীভূত।

তারপর যে ভাষার সাহিত্য আছে সে ভাষায় এমন অনেক শব্দ লিপিবদ্ধ আছে যাদের আজকাল মুখে-মুখে প্রচলন নেই। তা ছাড়া এমন অনেক শব্দ আছে যা কস্মিনকালেও আমাদের মুখের কথা ছিল না—যা ক্রমে বাংলাভাষার অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে। এ সকল শব্দ অপর সাহিত্য হতে—বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য হতে সংগৃহীত। মৌখিক ভাষার বুনিয়াদের উপর, এ সকল শব্দ-সহযোগেও আমরা সাহিত্য রচনা কর্‌তে পারি। আমরা চাই শুধু আমাদের সাহিত্যের বুনিয়াদ্‌ বজায় রাখতে।

সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন কর্‌লে আমাদের সাহিত্য ঐশ্বর্য্যহীন হয়ে পড়্‌বে, কেননা কেবলমাত্র বাংলাকথায় আমাদের সকল মনোভাব ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌ব না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাক্‌। যা আমাদের মনের বিষয় তারই আমরা নামকরণ করি। আমাদের মনের প্রধানতঃ দুটি বিষয় আছে—একটি বস্তুজগৎ, আর-একটি মনোজগৎ। বস্তুজগৎ এক হলেও আমাদের মনোজগৎ দুই ঃ—একটি নিজের মনের, আর-একটি পরের মনের। এই পৃথিবীতে যেমন সময় যাচ্ছে সেই সঙ্গে একটি বাহ্যমনোজগৎ গড়ে উঠছে—যে জগতের সন্ধান পাওয়া যায়—কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে। এ জগৎ বস্তুজগতের মতই যথার্থ। মেঘদূতের অলকা, পরমাণুর জগতে অসত্য হলেও পরমানুভূতির জগতে চিরসত্য হয়ে রয়েছে।

বস্তুজগতের জ্ঞান আমাদের যে-পরিমাণে বাড়ছে, সেই অনুসারে আমাদের ভাষায় নূতন শব্দের আমদানি হচ্চে—কতক সংস্কৃত হতে, কতক ইংরাজি হতে। এ সকল শব্দ, সাহিত্যে আমাদের গ্রাহ্য করে নিতে হবে—অবশ্য যাচাই করে, বাছাই করে, ঝাড়াই করে।

গুপ্তমহাশয় সাহিত্য-রাজ্য হ'তে বাংলা-শব্দ বহিষ্করণের পক্ষপাতী। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের প্রধান প্রভেদ এই যে আমরা বাংলা ভাষার কোন শব্দ অস্পৃশ্য

মনে করিনা—তা সে প্রাকৃতই হোক, আর সংস্কৃতই হোক।

"ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহাঙ্কবেঃ॥"

এই আলঙ্কারিক মত যে আমি সত্য বলে শিরোধার্য্য করি সে কথা আমি ইতিপূর্ব্বে কালি-কলমে স্বীকার করেছি। গুপ্তমহাশয় বলেন, সাহিত্যের পরিভাষা আছে। আমি বলি পরিভাষা নয়, পরিপূর্ণ ভাষাই হচ্চে সাহিত্যের পূর্ণ সম্বল। কেননা মানুষের সমগ্র মন ও সমগ্র জীবনের উপর সাহিত্যের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ উৎসাহ অবসাদ আশা নৈরাশ্য অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতি যে-সকল মনোভাব আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ, সে সকলের প্রকাশের জন্য আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য শব্দসকলই বিশেষ উপযোগী, আর আমাদের বাহ্যমনোজগতের যে অংশ সংস্কৃত ভাষায় গড়া তার কথা কাব্যে আনতে হলে উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দই আমাদের ব্যবহার কর্‌তে হবে, যাতেকরে তার Associationএর ঐশ্বর্য্য আমরা না হারাই। আমরা শুধু ভাষায় নয়, ভাবেও আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং যে যুগসঞ্চিত সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে তা একেবারে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে সাহিত্য রচনা করা স্বদেশী গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু মানুষের সম্পদেই তার বিপদ। এই সংস্কৃত-শব্দের ব্যবহারে অতি সতর্ক না হলে, আমাদের পদে-পদে বিপদ ঘটে। কথার যে শুধু শব্দ আছে তাই নয়, রূপ রস তেজ, এমন-কি গন্ধও আছে। কবি কথার এই পঞ্চ গুণেরই সন্ধান রাখেন। এবং আমার বিশ্বাস এই কটির মধ্যে শব্দ-গুণই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ ধ্বনিগত আনন্দ কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়জ সুখ। সংস্কৃত কথার শব্দচ্যতাই আমাদের বিপদ ঘটায়। শাস্ত্রে বলে গৌড়ীয়েরা সেই শব্দের পক্ষপাতী যা শ্রোত্ররসায়ন। আমরা চাই সেই শব্দ যা কানের নয়, প্রাণের রসায়ন। সে শব্দ ব্যবহার করতে হলে তার যথার্থ ও সম্পূর্ণ অর্থ জানা চাই—তারপর সে শব্দ আমাদের ভাষার ভিতর খাপ খায় কি-না সে জ্ঞানও থাকা চাই।

সকল ভাষারই একটা নিজস্ব সুর আছে। সে সুরের প্রতি কান রেখে আমাদের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর্‌তে হবে—যাতে আমাদের রচনা আগাগোড়া বেসুরো না হয়ে যায়। কোন্ কথা সুরে বসবে আর কোন্ কথা বস্‌বে না—তা দেখানো অসম্ভব; কেননা কানই তার একমাত্র বিচারক। আমি প্রাগ্‌বৃটীশ যুগের দুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি যাতে অনেক সংস্কৃত কথা আছে, অথচ আমার কানে যার সুর পুরো বাংলা লাগে—

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
কপালে কঙ্কণ হানে—অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল বলে।"

—ভারতচন্দ্র।

রজনী শাওনঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

—জ্ঞানদাস।

অপর-পক্ষে মেঘনাদ বধের আওয়াজ প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্য্যন্ত ভরাট ও বিরাট হলেও সে আরাব বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার নয়—গড়ের বাদ্যির।

তার পর, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি অনুপাতে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত মেশালে তা ভাল বাংলা হবে। এর অবশ্য কোনও উত্তর নেই। কেননা দু-ভাগ বাংলার সঙ্গে এক-ভাগ সংস্কৃত মেলালেও লেখা জল হবে না—যদি লেখকের অন্তরে সেই শক্তি থাকে যার বলে এ-উভয়ের রাসায়নিক মিশ্রণ হয়। আসল কথা—এ সব সমস্যার মীমাংসা প্রতি-লেখককে তাঁর স্বীয় রুচি ও শক্তির অনুসারেই করতে হবে।

গুপ্তমহাশয় সর্ব্বশেষে ছন্দের কথা তুলেছেন; সে সুরের নয়—তালের কথা। আমি কবি নই, সুতরাং ছন্দ-বিচাররূপ অনধিকার চর্চ্চা করতে প্রস্তুত নই। এই মাত্র বল্লেই যথেষ্ট হবে যে যখন তাঁর মত যে গুরুভার শব্দই সাহিত্যের গৌরব বাড়ায়, তখন অবশ্য ভাষার একমাত্র মন্দগতিই তাঁর নিকট গ্রাহ্য। বস্তুজগত তাঁর মনের উপর ভারের মত চেপে রয়েছে, সুতরাং আমাদের কথা তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। এ সত্বেও এ-সব তর্কবিতর্ক নিষ্ফল নয়; কেননা যিনি সাহিত্যের আভিজাত্য রক্ষা করতে চান, তিনিই আমাদের দলের লোক। তাঁদের সঙ্গে আমরা মতে পৃথক কিন্তু মনে এক। Walter Paterএর নিম্নোদ্ধৃত কথা কটি এ বিষয়ে শেষ কথা,—এ কথা আমি মানি এবং আমার বিশ্বাস গুপ্তমহাশয়ও মানবেন।

"For in truth, the legitimate contention is, not of one age or school of literary art against another, but of all successive schools alike, against the stupidity which is dead to the substance and the vulgarity which is dead to form."

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বঙ্গীয় সেনরাজগণের উত্তরচরিত *

পলাশীর যুদ্ধেও বাঙ্গালী সৈন্য ও বাঙ্গালী সেনাপতি ছিলেন—এ কথা বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তার পর হইতেই যবনিকা পতন।

ইংরেজ-শাসনাবধি বাঙ্গালী জাতি যে কোন কারণেই হোক সৈন্যদলে গৃহীত না হওয়ায় বাঙ্গালীদের সৈন্যবৃত্তির যোগ্যতাই সন্দিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাই বেঙ্গলি ডবল কম্পানী গঠিত হওয়া বাঙ্গলার পক্ষে এক নূতন যুগ। সশরীরে বাঙ্গালী সৈন্য দর্শন ও কুটের ফেরতা বাঙ্গালী বন্দীগণের সহিত কথোপকথনে যে অতিরিক্ত আনন্দ লাভ

* ৩য় ডিসেম্বর ১৯১৬ লাহোর বঙ্গীয় সাহিত্যসভায় পঠিত।

পূজার পথে

হয়, তাহা বহুদিনের সঞ্চিত অপমান-বোধের তিরস্করণজনিত, জাতীয় কলঙ্কের ক্ষালন-প্রযুক্ত এবং আহত জাতীয় অভিমানে প্রলেপ-প্রসূত।

এককালে যে বাঙ্গালীর সৈনিকবৃত্তি নিতান্তই দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল—পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মেকলের ইতিহাস-পাঠক আবালবৃদ্ধবনিতার রক্তে সে কথা সহজে প্রবেশের স্থান পায় না। সুতরাং অপমানক্ষুব্ধ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করিয়া যাহা কিছু তথ্য বাহির করেন, আবশ্যকের অতিরিক্ত জোরের সহিত সেগুলিকে জাহির করিতে হয়।

শেষ বাঙ্গালী হিন্দুরাজা, বক্তিয়ার খিলিজির বা তাহার পুত্রের ছলে প্রতারিত হইয়া সপরিবারে পলায়নপূর্ব্বক দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিজাতীয় ঐতিহাসিকেরা কলঙ্কের টীকা দিয়া সেন-কুলের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় বীরত্বের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ক্ষান্ত আছেন। বাঙ্গলার বিদেশী ইতিহাস-লেখকেরা কিম্বা গতানুগতিক দেশীয়েরা সেন-কুমারগণের উত্তরচরিত অনুসরণের প্রয়াস করেন নাই। সেই উত্তরচরিত ভারতবর্ষের অন্যপ্রান্তে লব্ধ হইলেও বাঙ্গলার ইতিহাসের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই।

বাঙ্গলার রাজা বলিয়া সেনবংশীয় রাজাগণের কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির সঙ্গে বাঙ্গলার সুযশ কুযশ জড়িত। ইংরেজ রাজকুমার ইংলণ্ডেই হৌক, ক্যানাডাতেই হৌক, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই হৌক, বা নর্থপোলেই হৌক যে ভূমিতেই বীরত্বপ্রকাশ করুন তাহা ইংরেজের বীরত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, যেখানেই রাজ্যস্থাপন করুন তাহা ইংরেজকৃত রাজ্য-বিজয় বলিয়া বর্ণিত ও ইংরেজের গৌরব বৃদ্ধিরই অন্যতম কারণ হইয়া উঠিবে। তদ্রূপ বঙ্গীয় রাজ-কুমারগণ, লক্ষ্মণসেনের সন্তানগণ যদি কোথাও কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকেন তবে তাহা বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি। যদি তাঁহাদের স্থাপিত কোন রাজ্য আজ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষের কোন অঙ্গে শোভমান থাকে তবে শেষ সেন-রাজের পলায়ন-অপযশের ভাগী যেমন সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, তাঁহার পুত্রগণের নব-রাজ্য বিজয়-গৌরবের ভাগীও সমস্ত বাঙ্গালী জাতি। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই গৌরব-বোধের সুযোগপ্রাপ্তির জন্য স্কুলপাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসে এ উত্তরচরিত সন্নিবিষ্ট করা উচিত।

বাঙ্গলায় আমরা এ-পর্য্যন্ত জানি যে, যে লক্ষ্মণসেনের প্রতাপসূর্য্য একদিন সমুচ্চ-শিখরে উঠিয়া তাঁহাকে শূরসেন উপাধিতে প্রখ্যাত করিয়াছিল, সেই লক্ষ্মণসেনের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে তিনি সপুত্রকলত্র প্রয়াগ-প্রবাসী হইলেন।

পঞ্চনদের ইতিহাস সেনকুমারগণের প্রয়াগ-প্রবাসের পরবর্ত্তী অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। আমি নিম্নে যাহা উদ্‌ঘাটন করিব তাহা গবর্ণমেণ্ট সঙ্কলিত পাঞ্জাবের কতিপয় দেশীয় রাজ্যের গেজেটিয়র হইতে সংগৃহীত, আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। পাঞ্জাবের গেজেটিয়র প্রণেতৃগণ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর প্রতি অযথাপক্ষপাতিতাবশতঃ লেখেন নাই; বক্ষ্যমান রাজকুলের পিতৃ-

পিতামহাগত ভাট ও চারণমুখবর্ণিত, বংশানুক্রমে উক্ত ভাট ও চারণগণের পুঁথিতে লিপিবদ্ধ গীত ও কবিতাদি অবলম্বন করিয়া গেজেটিয়রে স্থান দিয়াছেন। এই সকল ভাট ও চারণগণও বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমার ন্যায় বঙ্গমাতার নিন্দাক্ষুব্ধ সন্তানগণের হৃদয় উল্লাস ও আত্মপ্রসাদের জন্য আমাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া শতাব্দী-কতিপয় পূর্ব্ব হইতেই সেই সকল গীতাদি রচনা করিয়া রাখে নাই। বরঞ্চ এ কথা বলা যাইতে পারিবে যে এখন যদি বাঙ্গালীদের আত্মানুসন্ধানের ফলে জাতীয় গ্লানি অপনোদন-আনন্দে ঈর্ষাবশতঃ কেহ বক্ষ্যমান রাজবংশের আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত, প্রচারিত ও মুদ্রিত ইতিহাসের পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হয় তবে তাহা ষড়যন্ত্রপ্রসূত হইবে।

১২৫৯ সম্বতে লক্ষ্মণসেন বা শূরসেন পুত্রপৌত্রাদিসহ বঙ্গদেশ হইতে প্রয়াগ যাত্রা করেন। যতদিন রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যচ্যুত বৃদ্ধ পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন রাজকুমার রূপসেন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পিতৃভক্ত দৃপ্তসিংহ আত্মসম্বরণপূর্ব্বক স্থির রহিলেন। এক বৎসরের মধ্যে পিতার দেহাবসানের পর রূপসেন আপনার ও আপনার সঙ্গীদের বাহুবলমাত্র সম্বল করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পঞ্চনদধৌত প্রদেশের পূর্ব্বতম প্রান্ত শতদ্রুনদ পরিরক্ষিত। প্রয়াগ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পাঞ্জাবে আসিতে হইলে প্রথমে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইতে হয়। বঙ্গের রাজকুমার পঞ্চবাহুপ্রদেশের এই নিকটতম বাহুর শরণ লইলেন। ইহার তীরে আসিয়া সুযোগমত একটি প্রদেশ বাছিয়া মুসলমানদিগকে সেখান হইতে নিষ্কাসিত করিয়া স্বাধিকার স্থাপন করিলেন। তাঁহার রাজধানীর নাম হইল রূপগড় বা রূপড়। আজ পর্য্যন্ত রূপড় সহর বিদ্যমান্। তাহা এক্ষণে ইংরেজ অধিকারে বারিদোয়াব ক্যানালের হেড ওয়ার্কস্। ইহা লুধিয়ানার অতি সন্নিকটেই। বঙ্গের রাজকুমার রূপসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই রূপড় সহর অন্ততঃ পঞ্জাবপ্রবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালীরই দর্শনীয়। †

রূপসেনের সহিত তাঁহার তিনটি যোগ্য পুত্র বীরসেন, গিরিসেন ও হামিরসেন ছিলেন। এই বাঙ্গালী রাজকুমারেরা সবেমাত্র মাতৃভূমি গৌড় হইতে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। রূপড়ে রূপসেনের পৌত্র ও বীরসেনের পুত্র ধীরসেন জন্মলাভ করিলেন।

† এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে গেজেটিয়রে বোধ হয় ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে প্রদেশের নাম প্রথমে রূপড় ছিল পরে রূপসেন "নিহাদ" রাখিলেন। শেষ নাম যদি "নিহাদ" হইত, সেই নামই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিত। দ্বিতীয়তঃ "নিহাদ" অপেক্ষা 'রূপগড়' বা 'রূপড়'ই রূপসেনের পক্ষে রাখার সম্ভাবনা বেশী। তৃতীয়তঃ সুকেত ও মণ্ডিরাজ্যের লোকশ্রুতিতে আজ পর্য্যন্ত ইহাই প্রসিদ্ধ যে রূপড় নাম রূপসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ঐ নাম চলিয়া আসিতেছে। সার লেপেল গ্রিফিনের "Rajas of the Punjab" নামক পুস্তক অনেক চেষ্টায় পঞ্জাবের কোনও লাইব্রেরীতে পাই নাই। গেজেটিয়র-লেখক "Rajas of the Punjab" নামক পুস্তককে তাঁহার উপজীব্য বলিয়া মানিয়াছেন। সুতরাং যে মূলগ্রন্থ হইতে গেজেটিয়র সংগৃহীত তাহার সহিত গেজেটিয়রের এইখানটুকুর পার্থক্য আছে কিনা ধরিতে পারিলাম না।

বীরসেন, গিরিসেন ও হামিরসেন ইহাঁরা ষোলআনা বাঙ্গালী, প্রবাসে জন্মপ্রাপ্ত ও পালিত হইলেও লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র ধীরসেন পর্য্যন্ত সকলে পূরা বাঙ্গালী। ধীরসেনের পুত্রেরা অতঃপর বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া আর কোন নামে অভিহিত হইলেও হইতে পারেন।

পৌত্রমুখদর্শনান্তর রাজা রূপসেন ছয় সাত বৎসর নবরাজ্যভোগের পর চিরশত্রু মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হত হইলেন। সেনবংশের আবার পতন হইল। কিন্তু বাঙ্গালীর উদ্যম ও বাহুবল ইহাতেও নিরস্ত হইল না। আবার বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজার পৌত্রেরা বঙ্গকুলদীপক রাজা রূপসেনের পুত্রত্রয় পড়িতে পড়িতে উঠিলেন, মরিতে মরিতে অমর হইলেন। তিন ভ্রাতায় পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে তিন বিভিন্ন অংশে বাঙ্গালীর বাহুবলের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ তিনটি রাজ্য স্থাপন করিলেন।

বাঙ্গালী রাজকুমারগণের স্থাপিত সেই হিন্দুরাজ্যত্রয় এক্ষণে ষট্‌রাজ্যে প্রসারিত হইয়া হিমালয়ের বক্ষে প্রশস্ত জায়গা জুড়িয়া আজ পর্য্যন্ত বিরাজমান। আদিরাজ্যত্রয়ের নাম সুকেত, কেঁউথল বা জুন্‌গা ও কিস্তাবার বা জম্বু। সুকেত হইতে মণ্ডিপ্রসূত এবং কিস্তাবার বা জম্বুর সেন-রাজগণই অধুনা কাশ্মীরেরও অধিপতি, আর পুঞ্চ কাশ্মীরেরই একটি শাখা। সুতরাং সুকেত, মণ্ডি, জুন্‌গা, জম্মু, কাশ্মীর ও পুঞ্চ পঞ্জাবের এই ছয়টি প্রখ্যাত পার্ব্বত্য রাজ্যের রাজধমনীতে বাঙ্গালীর রক্ত প্রবহমান এবং ইহার মধ্যে তিনটি সাক্ষাৎ বাঙ্গালীর বাহুবল-জিত। বঙ্গের শেষ হৃতাদর রাজার জ্যেষ্ঠ পৌত্র বীরসেন সুকেত, মধ্যমপৌত্র গিরিসেন জুন্‌গা ও কনিষ্ঠপৌত্র হামিরসেন কিষ্টাবার বা জম্মুরাজ্য স্থাপন করেন।

লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠপৌত্র বীরসেনের বিজয়-কাহিনী নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। সুকেত রাজ্যের গেজেটিয়র হইতে ইহা সংগৃহীত।

সম্বৎ ১২৬৮তে বীরসেন শতদ্রু পার হইয়া শিউরি নামক ঘাটে সৈন্যসজ্জা করিয়া আশপাশের রাজাদের আক্রমণ করিলেন। করালী ও দ্রেটের অধিপতি, তাঁহার মিত্র বাটবারাদুর্গের অধীশ্বর রাণা শ্রীমঙ্গল, কোট ও পরনাগা ইলাকাসহিত নাগ্রার ভূপতি, বটাল ও চাবস্তি ইলাকাসমন্বিত চরাগবালার রাজা এবং উদয়পুররাজ চেদিবালার ঠাকুর সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শেষোক্ত ঠাকুরের সন্ন্যার্ত্ত-রাজার সহিত শত্রুতা ছিল। সন্ন্যার্ত্তরাজ আপনাকে আশপাশের সমস্ত প্রদেশের অধীশ্বর জানিতেন। চেদিবালার ঠাকুর বীরসেনকে সতর্ক করিয়াছিলেন যে সন্ন্যার্ত্তকে বশ করিতে না পারিলে তাঁহার প্রভুত্ব টলমলায়মান থাকিবে। তাহা শুনিয়া বঙ্গবীর বীরসেন সন্ন্যার্ত্তকে আক্রমণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে খুনু অভিযান করিলেন। সেখানকার ঠাকুর তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পলায়ন করিলেন। বীরসেন মুসিলদুর্গ অধিকার করিয়া স্ববশে রাখিলেন। ঐখান হইতে সন্ন্যার্ত্তের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। তীব্র যুদ্ধের পর পালিদুর্গ ও কজ্জন ও ধারাকোট থানা পতিত হইল এবং রাণা

দেবপাল (বোধ হয় সন্ন্যার্ত্তের পুত্র) বন্দী হইলেন।

সমগ্রপ্রদেশে বীরসেনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেবপালকে কারামুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী জায়গীর প্রদান করা হইল। রাজা শ্যামসেনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দেব-পালের উত্তরাধিকারীগণ বঙ্গীয় রাজাপ্রদত্ত এই জায়গীর ভোগ করিয়াছিলেন।

যতদিন রাজ্যহীন গৃহহীন ছিলেন, ততদিন রাজকুমার বীরসেন রাজবধূ ও রাজকুমারদের সঙ্গে আনেন নাই, তাঁহাদের কোন সুরক্ষিত স্থানে নিভৃতাবাসে রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন। যখন সম্পূর্ণভাবে সুকেত প্রদেশ স্বায়ত্ব হইল তখন রাজা বীরসেন রাণী ও রাজকুমারদিগের আনিতে পাঠাইয়া কুন্নধার পাহাড়ের উপর 'নিরোল' অর্থাৎ 'নিভৃত' নামে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। এই অঞ্চলে শুকমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই প্রদেশের নাম শুকক্ষেত্র বা সুকেত। স্কন্দপুরাণে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

বীরসেনের দিগ্বিজয় এইখানেই ক্ষান্ত হইল না। অতঃপর কাজুয়ানার সৈন্যসহায়ে কোটিধারের ঠাকুরকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কৌশলে নন্ধু, সলালু ও বেলু ইলাকা এবং মগরা থানা ছিনিয়া লইলেন, এবং কজ্জন ও মগরায় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন, এতৎপূর্ব্বে তাহা খোলা গ্রাম মাত্র ছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত বীরসেনের বিজয়-উদ্যম শতদ্রুর পশ্চিমে ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার তিনি তাঁহার বিজিত রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে অস্ত্রচালনা করিয়া কান্দালকোটের ঠাকুরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ঠাকুর প্রতিকূলতা করিলেন না। সুরহির ঠাকুর যিনি চন্দমারা ও জহোর থানা এবং পাঙ্গনা ইলাকার মালিক ছিলেন—রাজা বীরসেনের পরাক্রম দেখিয়া স্বয়ং আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় শত্রু হরিয়ারার ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেও প্রেরণা করিলেন। বীর-সেনের অমিত তেজ ও বীর্য্যের সম্বাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া হরিয়ারার ঠাকুর পলায়ন করিলেন এবং বীরসেন সেই প্রদেশকে সুশাসিত করিয়া টিকার থানাকে দুর্গে পরিণত করিলেন। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বীরসেন রাজা-নির্ম্মিত টিকার দুর্গ বিদ্যমান্ আছে।

ইহার পর সুরহি ইলাকায় পাহাড়ের উপর ৫০০০ ফিট উচ্চে পাঙ্গনা দুর্গ নির্ম্মিত হইল। কালের কবল এড়াইয়া আধুনিক বাঙ্গালীর পুষ্প-অর্ঘ্য লাভের জন্য পাঙ্গনা প্রাসাদও আজ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে।

চাবাসিতে আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কুম্হারসেন-রাজ্যের প্রান্তে আসিয়া বীর-সেন যে দুর্গ বিজয় করিলেন তাহার নাম হইল বীরকোট।

চাবাসি দুর্গকে অবলম্বন করিয়া বীরসেন সরাজ প্রদেশে অগ্রসর হইলেন। উক্তরাজ্যে শ্রীগড়, নারায়ণগড়, রাঘোপুর, জাঞ্জ, জলৌরি, হিমড়ি, রায়গড়, চঞ্চবালা, মগরু, মানগড়, তুঙ্গ, মধোপুর, বঙ্গা, ফতেপুর, রামথাজ, রৈসন, গদা ও কোট-মনালি নামক বিভিন্ন

রাজার অধীনস্থ দুর্গসকল অধিকার এবং পারোল, নগ, রূপী, সারি ও দুমারি নামক দেশজয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একমাত্র কুলুরাজ ভূপাল বীরসেনের এই সর্ব্বরাজ্যাপহারী ভীষণ উদ্যমে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। বীরসেন আবার বীরের সম্মান দেখাইলেন। তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বাৎসরিক করের সর্ত্তে রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন।

কুলু হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বীরসেন পাণ্ডা, নাচনি, গড়, চিরিয়াহাঁ, রাইয়াহাঁ, জুরাহন্দি, সাতগড়, নন্দগড়, চটিওট ও সাবাপুরি দেশ জয় করিলেন। উত্তর ভাগ এইরূপে স্বায়ত্ত করিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া বল, ইলাকা ও নিরয়াদি দুর্গ অধিকার করিলেন। সিকন্দ্রাধারে হাথলি-রাণাকে পরাজয় করিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এ অঞ্চলেও বীরকোট নামে দুর্গ নিম্মাণ করিলেন—অধুনা তাহা ধারের অর্থাৎ পাহাড়ের উপর বিহার-কোট নামে অভিহিত।

এইরূপে হাথলি পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া শ্রীখদের উচ্চ চূড়ায় কাঙ্গড়া রাজ্যের উপান্তে নিজের সীমান্ত রচনা করিয়া বীরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

দ্বিতীয় বীরকোট বা বিহারকোট ও বীরা এই উভয় দুর্গই অধুনা মণ্ডিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপে বঙ্গের লক্ষ্মণসেনের পৌত্র, বাঙ্গালী বীরসেনের রাজ্য দক্ষিণে শতদ্রু ও উত্তরে বিপাশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পূর্ব্ব দিকেও শতদ্রু নদ বুশাহির রাজ্য হইতে তাঁহার রাজ্য বিভক্ত করিতেছিল, এবং পশ্চিমে কান্নুচুন রাজ্যের উপান্ত আসির্খদ তাঁহার সীমান্তে পরিণত হইল। ৩৫ বৎসর রাজত্বের পর পুত্র ধীরসেনের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া বীরসেন দেহত্যাগ করেন।

বীরসেনের ৪৪তম সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ রাজা বিক্রমসেন আজ সুকেতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

বীরসেনের পরবর্ত্তী সপ্তম রাজা বিজয় সেনের দুই পুত্র ছিলেন, সাহুসেন ও বাহু সেন। জ্যেষ্ঠ সাহুসেন সুকেতের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন ও কনিষ্ঠ বাহুসেন স্বীয় বাহুবলে 'মণ্ডি' নামধেয় নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সুকেত ও মণ্ডির রাজকুমারদের নামের পরে 'সিংহ' বসান হয়, কিন্তু যেমনি তাঁহারা রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন 'সিংহ' কাটিয়া 'সেন' আখ্যা গ্রহণ করিতে হয়।

এখানকার ব্রাহ্মণেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—গৌড়, গৌড়সারস্বত, ও সারস্বত। সুকেতের আদিম বাসিন্দা ব্রাহ্মণেরা সারস্বত, কৃষিকার্য্য তাঁহাদের জীবিকা। সুকেতের গৌড় ব্রাহ্মণেরা বীরসেনের সঙ্গে আগত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা কৃষিকার্য্য করেন না। পৌরোহিত্যই ইহাঁদের জীবিকা। এই বঙ্গীয় গৌড় ব্রাহ্মণ-বংশের সহিত বিবাহজাত সারস্বতের সন্তানেরা গৌড়সারস্বত নামে অভিহিত। ইহাঁরা জীবিকাদি বিষয়ে গৌড় ব্রাহ্মণগণের পদানু-সরণ করিয়া থাকেন।

রূপসেনের ন্যায় বীরাগ্রগণ্য ঔরসপুত্র যাঁহার, বীরসেনাদির ন্যায় অমিতপরাক্রমী দিগ্বিজয়ী পৌত্র যাঁহার, সেই লক্ষ্মণ সেনের

নব্য আর্ট স্কুলের অঙ্কিত মূর্ত্তি কি সহনীয়? এ মূর্ত্তি কি 'ফ্যাসানেবল' বাঙ্গালী নিজেদের ঘরে ঘরে আর রাখিবেন?

শুধু পুত্র-পৌত্রের বীরত্বের দোহাই কেন? লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং যৌবনে বীর ছিলেন না কি? তাঁহার রাজ্য গৌড়ের সীমা ছাড়িয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে উত্তরে অনেক দূর বিস্তৃত হওয়ার কিংবদন্তী দেশে দেশে আজও প্রচারিত নাই কি?

সেই কলঙ্কজনক ছবি এই দেখুন—ইহা রাখিবেন কি ভাঙ্গিবেন? বাঙ্গলার ইতিহাস যেমনটি লেখা আছে তেমনি থাকিতে দিবেন কি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মারফৎ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটিকে দরখাস্ত করিবেন তাঁহাদের মনোনীত টেক্সট্‌বুকে সেন-রাজকুমারগণের বীরত্ব-কাহিনী জুড়িয়া দিয়া শেষ সেন রাজার বঙ্গত্যাগ বৃত্তান্ত নূতন ধাঁচে লেখা হউক?

শ্রীসরলা দেবী।

বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজবংশ*

বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজবংশ বলিলে সেনবংশই বুঝায়। এই সেনবংশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পালবংশের রাজত্ব ছিল।

৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা হর্ষের মৃত্যু হয়। তাহার পর বঙ্গদেশে শতাব্দব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়। তাহাতে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া বঙ্গীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। এই গোপাল দেবের বংশই পাল রাজবংশ নামে খ্যাত। এই বংশ সাড়ে চার শত বৎসর অর্থাৎ ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল উত্তরভারতের বহুস্থানে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তৎপুত্র দেবপাল দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ অধিকার করেন। পালবংশের এই বিস্তৃত প্রভাব অধিককাল স্থায়ী না হইলেও তাঁহারা দীর্ঘকাল আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগের অধীশ্বর ছিলেন। গোপালের অধস্তন দশম পুরুষে রাজা বিগ্রহ পাল যখন মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল নামক তিন পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন গৌড় বঙ্গ ও মগধ পাল-রাজগণের অধীন ছিল। মহীপালের অত্যাচারবশতঃ বরেন্দ্র ভূমির প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত্ত-জাতীয় দিব্বোক ও তাঁহার ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম যথাক্রমে বরেন্দ্র-ভূমির শাসনভার গ্রহণ করেন।

বরেন্দ্র-ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া শূরপাল রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রের পুনরুত্থান করেন। রাম-চরিত কাব্যে এই রামপালের বিবরণ পাওয়া যায়।

* শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রবন্ধের পূর্ব্বে সভাপতিমহাশয় উপক্রমণিকা স্বরূপ এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উৎকলের অধিপতি কর্ণকেশরী রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। এই কেশরী-বংশ সম্ভবতঃ অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গ ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামপাল সম্ভবত এই সময়ে কেশরী-রাজগণকে আশ্রয় দান করেন। বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-মহাশয় সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। Vincent Smith বলেন, অনন্তবর্ম্মা, চোড়গঙ্গের সেনাপতি সামন্ত সেনই বাঙ্গলার সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ। ডাঃ ভাণ্ডরকর বলেন যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু সেনাপতির কার্য্য করিতেন বলিয়া তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় ও পরিশেষে ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হন।

বঙ্কিমবাবুর মতে সেনবংশ পালবংশের পরবর্ত্তী নহে পরন্তু সমসাময়িক। বস্তুতঃ যখন দেখা গিয়াছে যে পালবংশ ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন এইরূপ হওয়াই সম্ভব। পালবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী মুদ্গিরি অথবা মুঙ্গের ছিল। সেনবংশীয়-গণের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম ছিল। আদিশূর এই সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। ৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই উভয় মতের ঐক্য করিলে সম্ভবত সামন্ত সেন আদিশূরের বংশীয় কোনও রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বল্লালসেন এই সামন্তসেনের বংশধর। বল্লাল সেন আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা নহেন। তাঁহার বহু পরে ইনি রাজা হন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে সময়-প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বল্লাল সেন দানসাগর নামক গ্রন্থের রচনা ১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। আঈন আকবরীতে লেখা আছে যে বল্লাল সেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই উভয় মতের কোনও পার্থক্য নাই। বল্লাল আদিশূর হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। এদিকে আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু অষ্টম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর দশম পুরুষ, শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ, এবং দক্ষ হইতে বহুরূপ ৮ম পুরুষ। সুতরাং উভয় দিকেই সামঞ্জস্য হয়। এক পুরুষ ২০ বৎসর করিয়া ধরিলে ৮ পুরুষে ১৬০ বৎসর হয়। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৪২ বিয়োগ করিলে ১৫৫ বৎসর হয়।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন বক্তিয়ার খিলিজির পুত্র মহম্মদকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৮০ বৎসর। তিনি অল্প বয়সেই রাজা হন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী-মহাশয়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম এই :—

"যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যগঠন আবশ্যক। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই। শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্‌বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে এবং সেই চিন্তাপ্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে; তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমনভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় আবিষ্কার এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয়-সমূহ এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্‌বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অবশ্য, এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু এক দিনে বা দু' দশ বৎসরে সম্ভব নহে বা আরম্ভমাত্রেই ফললাভের আশা নাই, কিন্তু যদি বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞান-ধামতার পরিচয়, স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গ ভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশী ভাষায় প্রথমত প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তি সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না; এমন করিয়া ধন উপচয় করিব, বৃদ্ধি

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান সভাপতি

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সি, এস, আই

করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত অসাধ্য-সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধী ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা সকলেই এক মার সন্তান, বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী; মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন। মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃ-মন্দিরের দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব নিকাশ করিব না, করিতে হয়, আমাদের

অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। বঙ্গের অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতর-ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমাদের মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয় জাতীয় অভ্যুদয় গ্রথিত। মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীমশক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এই প্রতিজ্ঞা পরিপূরণের জন্য যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালী জাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

* *
*

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান সভাপতি-মহাশয়ের এই অভিভাষণের ভাষার স্থানে স্থানে গুরুভারে আমাদের মন পীড়িত হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে ঐকান্তিক মনের টান ফুটে উঠেছে তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বঙ্গ-সরস্বতীকে বিশ্ব-জনের আরাধ্য করে তুলতে হবে—এই কথা বার-বার বলেও যেন তাঁর মনের আশ মেটেনি। কি-করে তা সম্ভব হবে, নানা উপায়ে সেই দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সে-সব কথা নিয়ে তর্ক তোলবার দরকার নেই। বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালীর ইজ্জত বেড়ে উঠুক—তাঁর মনের এই যে একান্ত শুভ-কামনা তিনি জানাতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর হৃদয়ের এমন-একটি মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে যার জন্যে বাঙালী জাতি তাঁকে শ্রদ্ধা করবে। সাহিত্য-হিসাবে এই অভিভাষণটি মূল্যবান না হলেও, সহৃদয়তায় এটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তিনি যে বাংলা-সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তুলেছেন, তা সার্থক হবার সূত্রপাত হয়েছে, আমরা জানি। বিশ্বের রসিক-সভায় বাঙালী কবির আদর হয়েছে। বিশ্ববাসী বাংলা-কাব্যের রসাস্বাদ করতে সুরু করেছে;—বাংলা এখন আর অবজ্ঞাত থাকবার নয়। "বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব!"—কবির এ উক্তি এখন আর অত্যুক্তি নয়। বিজ্ঞান-রাজ্যেও বাঙালীর প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এটা সূত্রপাত। কিন্তু এই আরম্ভকেও

আমাদের জয়ধ্বনি করে ঘরে তুলতে হবে, নইলে এর পূর্ণতাকে অপমান করা হবে। জানি—জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির নানা সওগাদ দেশীয় উপচারে আমাদের বিশ্ব-সভায় পাঠাতে হবে, তবেই পূর্ণরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু যা হয়েছে তাতে এই প্রমাণ হয় যে বাঙালী শক্তির কাঙাল নয়।

* * *

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার-য়্যাট-ল মহাশয়ের অভিভাষণ "বাঙ্গলার গীতিকবিতা" নিয়ে। তাঁর ভাষার উচ্ছ্বাস
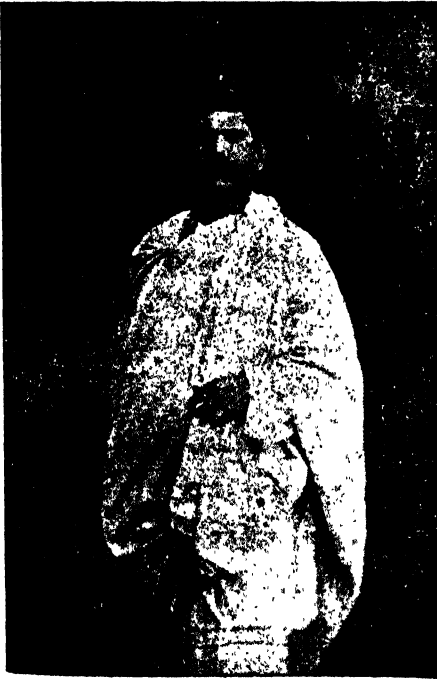
সাহিত্য-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ

এবং ভাবের নানা জটিল মার-প্যাঁচের ধাক্কা কাটিয়ে অনেক কষ্টে আসল বক্তব্যের ঠিকানা পাওয়া যায়। তিনি বাঙ্গলার গীতিকাব্যের জন্ম, তার বিকাশ, তার ইতিহাস, তার ফিলসফি প্রভৃতি আলোচনা করে একসা করেছেন। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার জন্যে তাঁর শোক পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন—"যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে 'বিষামৃতে একত্র করিয়া' প্রাণরন্ধ্রে, সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না।" কেন যে উঠে না, তার মানে অবশ্য বাঙ্গলার গীতিকবিতার প্রাণবিয়োগ হয়েছে। সে প্রাণের সন্ধান সভাপতিমহাশয় দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"চম্পকবরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়া নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।

—ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ।" সভাপতিমহাশয় এত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেও আমরা কিন্তু ঐ 'পরাণ' কথাটি ছাড়া ওর মধ্যে বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ-পদার্থটি দেখতে পেলুম না। অবশ্য স্বীকার করি, প্রাণ জিনিষটা বড় গোলমেলে।

মোটামুটি তিনি বলেছেন যে,—"চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য।" বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্যও লুপ্ত হয়েছে। সে পুরানো ভাব, পুরানো সুর এখন নেই—এখন প্রতীচ্য সুর ও ভাবের আমদানিতে সব নষ্ট হয়েছে। আবার যখন

সেই পুরানো সুর আসবে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতাও তখন ফের জেগে উঠবে।

কথা দাঁড়াচ্চে এই যে, এখনকার কবিরা একালের মানুষ বলে, একালের প্রভাব তাঁদের মনের পরে কাজ করছে বলে, এখনকার জীবনের সমস্যা, উত্থান-পতন তাঁদের হৃদয়কে দোল দিচ্চে বলে তাঁদের মহা অপরাধ! প্রাচীন বাঙ্গলার গীতিকবিতা যদি থাকতে পারে, নবীন বাঙ্গলার নব গীতি-কবিতা হতে পারবে না কেন?—তা সভাপতি-মহাশয়ের রচনা আগাগোড়া পড়েও ধরতে পারলুম না।

তারপর, কোন দেশে, কোনকালে কখনো যা হয়-নি, এ দেশে সেই অসম্ভবই যে সম্ভব হবে, বাঙ্গলার মাটিতে এমন যাদু আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কোন দেশের গীতি-কাব্যেই সেকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত একসুরের একটানা খেলা দেখা যায় না,—দেশের ও সমাজের অবস্থাভেদে,এবং কালপ্রভাবে কাব্যের চেহারার বদল হয়েছে।

এখন যেমন প্রতীচ্যের ধাক্কা বাঙ্গলা কাব্যে এসে পড়েছে তেমনি কোনোকালেই যে বৈষ্ণব কবিদের উপরে সুফি কবিদের প্রভাব পড়ে-নি, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারেন?

প্রতীচ্য ভাবের আমদানির আগেও বাঙ্গলা কবিতার সুরে অনেক অদল-বদল হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, প্রথম যুগের বৈষ্ণব-কবিতার ও দ্বিতীয় যুগের বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে, আবার কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের কবিতার ও কবিওয়ালাদের যুগের কবিতার মধ্যে, সুরের মিল নেই বল্লেই হয়। সুর বরাবরই বদলে আসছে। এ পরিবর্ত্তনে উন্নতি হয়েছে, কি অবনতি হয়েছে, সে অবশ্য আলাদা কথা।

তারপর, সেকালের আওতায় একালের কবিদের তুলনামূলক সমালোচনা চল্‌তেই পারে না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি পুরানো পদ-কর্ত্তারা যে-সময় জন্মেছিলেন, তখন বাঙ্গালীর জীবন বিশ্ববাসীর সংস্পর্শে আসে-নি, বাঙ্গালীর নিভৃত পল্লীগ্রামই তখন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর পৃথিবী ছিল; ভারত ত দূরের কথা—বাঙ্গলার বাইরেকার সুখ-দুঃখেও তখনকার কবিচিত্ত বিক্ষিপ্ত বা বিলোড়িত হবার অবকাশ পায়নি। তখনকার সঙ্গে এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ; কাজেই তুলনা চলতে পারে না। বিলাতী কবি চষারের সঙ্গে এখন যদি কোন সমালোচক টেনিসন কি ব্রাউনিংএর তুলনামূলক সমালোচনা করে বলেন, টেনিসন ও ব্রাউনিং চষারের সুরে বীণা ধরতে পারেন-নি, তবে সে কথা সত্য হতে পারে—কিন্তু সে রস-বিচারের কথা নয়। এখনকার কবিতার নিকৃতি, একালের আদর্শ। আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয়, আধুনিক কাব্যে ফুটেছে কিনা, সেইটেই আগে দেখা দরকার। প্রতীচ্যের ভাব এসে বাঙ্গলা কবিতার উপরে পড়েছে বলে হাহাকার করলেও এই নূতনকে জোর-করে বাইরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। পৃথিবীর ভাবরাজ্য এখন সকল জাতির সমান-দখলের মধ্যে এসেছে। প্রতীচ্য এখন প্রাচ্যের ভাব আত্মসাৎ করবে—প্রাচ্য এখন প্রতীচ্যের ভাবকে নিজস্ব করে নেবে; এই হচ্ছে এখনকার ধারা। কারণ, চিত্তলোকে জাতিভেদ নেই।

বৈষ্ণব কবিদের সমস্তই ভাল ছিল,

আর আধুনিক কবিদের সমস্ত খারাপ, এ-রকম একতরফা ডিক্রি সাহিত্য-ক্ষেত্রে চলবে না। একালের কবিতা যে পাঠককে বিভোর করে, মুগ্ধ করে, অভিভূত করে,—এইতেই বোঝা যায় তার মধ্যে প্রাণের অভাব নেই। একালের এত বৈচিত্র্য সে কালের কাব্যে ছিল কি? প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির যা প্রধান দোষ, সেই ভাবের ও কথার পুনরুক্তি, তাও একালের কোন ভাল কবির কাব্যে পাওয়া যাবে না। যদিও তুলনা করা ঠিক নয়—তবু লেখক তুলনা করেছেন বলেই এ-সব কথা তুল্‌লুম।

আসল কথা—লেখক যে-হিসাবে বলেছেন, সে-হিসাবে 'বাঙ্গলার যথার্থ গীতি-কাব্য' বা অ-যথার্থ গীতিকাব্য বলে কোন জিনিষ নেই—ও-সব হচ্ছে কথার মারপ্যাঁচ। যে-কোন বাঙ্গলা কবিতায় আমরা প্রাণের সাড়া পাব, সুখে-দুঃখে যা আমাদের অভিভূত করবে, যা আমাদিগকে ভাবের আবেগে মাতিয়ে তুলবে, তাকেই আমরা বুকের নিধি বলে বুকে না টেনে নিয়ে পারব না।

লেখক 'রূপান্তর' বলে একটি অদ্ভুত কথা ব্যবহার করেছেন, যা বলতে তিনি বোঝেন 'স্বাভাবিক মনের বিকাশকে' 'ভাগবৎ সত্যে তুলিয়া ধরা।' তার মানে 'ভোগের মধ্যে ত্যাগ' দেখান, প্রভৃতি। লেখকের বিশ্বাস, আধুনিক কাব্যে এই তথাকথিত 'রূপান্তর' নামে আশ্চর্য্য জিনিষটি নাকি পাওয়া যায় না। তিনি এ কথা কি অর্থে বলেছেন জানিনা—কিন্তু আমরা যে অর্থ বুঝেছি তাতে আমাদের বিশ্বাস যে, আধুনিক কবিতার মধ্যে আমরা এ 'রূপান্তর' দেখেছি। তবে ঐ সব কবিতায় যিনি কবি, তিনি যদি "বৈষ্ণব" কবি নন বলে অগ্রাহ্য হন, তাহলে অবশ্য আমরা নাচার।

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা করতে বসে অনেকেই দার্শনিক গোলকধাঁধার সৃষ্টি করে সরল বৈষ্ণব কবিতাকে অসরল করে তোলেন। বৈষ্ণব কাব্যের যে সহজ সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণস্পর্শ করে, এঁদের সমালোচনায় সেটা একটা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বোধ ব্যাপার হয়ে ওঠে; এঁরা টেনে-বুনে এমন-সব অচিন্তনীয় চিন্তার জাল রচনা করেন, যার মধ্যে পড়ে বৈষ্ণব কবিতা একেবারে হ-য-ব-র-ল হয়ে যায়। এঁদের মনে-মনে ধারণা, বৈষ্ণব কবিতা যেমন, তাকে ঠিক তেমনি সহজ ভাবে দেখালে বুঝি কবিরা খাটো হয়ে পড়বেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধরণের ব্যাখ্যানা দেবার চেষ্টা হয়েছে। তাতে তত্ত্ব-হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার বাজার-দর বাড়তে পারে, কিন্তু কবিত্ব ও রসতত্ত্বের হিসাবে তার কোনো মূল্য নেই।

লেখক 'বাঙ্গলা গীতিকবিতা'র একটা ধারাবাহিক আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের অনেক দিকপাল তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন। অনেক জায়গায় তিনি এমন-সব বিষম গলদ করেছেন যে, তাঁর এই লেখাটি একেবারে অসম্পূর্ণ ও নিস্ফল হয়ে পড়েছে।

তিনি বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করছেন, অথচ অমর বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দ-দাসের নাম একবার ভ্রমেও মুখাগ্রে আনেন-নি। যাঁর রচিত "তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম সুত-মিত-রমণী-সমাজে" প্রভৃতি

অপূর্ব্ব গীতি আজও বাঙ্গলার ঘরে-বাইরে গীত হচ্ছে, যাঁর কাব্যে ভাব ও ভাষার সুন্দর মিলনসাধন হয়েছে, সেই গোবিন্দদাসকে বাদ দিয়ে কি বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা চলতে পারে?

তিনি আজু গোঁসাইএর নাম করেছেন কিন্তু সাধক কমলাকান্তের শ্যামা-সঙ্গীতের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন-নি। তাছাড়া ঈশ্বরগুপ্তকে তিনি একালের কবিদের কোঠায় ফেলে যতদূর অবিবেচনার কাজ করবার, তা করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত সর্ব্বত্রই সেকালের শেষ বাঙ্গালী কবি বলে স্বীকৃত,—এটুকুও অন্তত লেখকের জানা উচিত ছিল।

তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।…ভারতচন্দ্রের (কবিতায়) ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।…তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল।"

কৃষ্ণচন্দ্রের যুগকে ও ভারতচন্দ্রকে 'রাজার পৃষ্ঠপোষিত' বলে তাচ্ছীল্য করে লেখক বলেছেন 'তাহার পর কোন্ শুভমুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল।'—এই 'তাহার পর' কথাদুটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, লেখক রামপ্রসাদকে কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের পরের কবি বলে ধরেছেন। কিন্তু তা নয়। রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হলেও, তাঁহার দ্বারাই 'পৃষ্ঠপোষিত'। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই রাম-প্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও নিষ্কর একশো বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। এমন-কি রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'ও ভারতচন্দ্রের আগে ও কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধেই রচিত হয়েছিল বলে বিখ্যাত। প্রসাদী-বিদ্যাসুন্দর কৃষ্ণচন্দ্রের নামেই উৎসর্গ-করা।

মোটকথা, এবারকার সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ পড়ে আমরা সকলদিকেই নিরাশ হয়েছি।

*
* *

পলায়নের ছবি

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' ছবি নিয়ে শ্রীমতী সরলা দেবী যে ঐতিহাসিক আন্দোলন তুলেছেন তা নূতন নয়। এর আগে বাংলার অন্য ঐতিহাসিকেরা এই একই কথার আলোচনা করেছিলেন। সে সমস্ত কথাই পুরোনো প্রবাসী-পত্রের পাতায় আছে। ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের দিক দিয়ে যে আপত্তি তুলেছিলেন সে কথা অমান্য করবার যো নেই; কিন্তু শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের দিক দিয়ে এই ছবিখানিকে যে-ভাবে সমর্থন করেছিলেন তাও অকাট্য। এই শিল্প ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব মেটানো যাবে না—কারণ দুটি দুই-শ্রেণীর জিনিষ,—দুজনের লক্ষ্য এক নয়। যে-মনোভাব থেকে মানুষ ইতিহাস লেখে, কিম্বা ইতিহাস খুঁড়ে বার করে ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে শিল্পী শিল্প-রচনা করে না। ঐতিহাসিক যেখান থেকে রস পায়, শিল্পীও সেখান থেকে রস পেতে পারে বটে কিন্তু তা ছাড়িয়েও তার রসের জায়গা আছে—যা কোনো রাজার শাসনে শাসিত নয়। শিল্পের জিনিষ শিল্প-হিসাবে ভালো কি-না তাই তার চূড়ান্ত বিচার; তার বিচার করবার অন্য মাপকাঠি নেই;

বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলন

দর্শন-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ইতিহাস-শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শিল্প-রসিক ছাড়া তার অন্য বিচারকর্ত্তাও নেই। সাধারণ-ইতিহাস, সাধারণ-বিজ্ঞান প্রভৃতির বিচারে কোনো ছবি হেয় হলেও তা শিল্প-হিসাবে শ্রেয় হতে পারে—এই কথা ভুলে গেলে চলবে না। শিল্পের নিজের ইতিহাস আছে, নিজের বিজ্ঞান আছে; সে তাকেই মানে,—আর কারোর চোখ-রাঙানিকে ভয় করতে সে বাধ্য নয়। তা করলে তাকে পদে-পদে ঠেকে খোঁড়া হয়ে পড়তে হয়।

বাঙালীর মিথ্যা পলায়নকলঙ্ক দূর হোক্—এই কামনা বাঙালীমাত্রেই করেন। তার জন্যে যত আন্দোলন হতে পারে তাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তার জন্যে এই ছবিখানি জলাঞ্জলি দিতে আমরা এখন রাজি নই; রাজি হব তখন যখন শিল্প-বিচারকের বিচারে তা অগ্রাহ্য হবে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিসের উত্তেজনায় এই ছবিখানি এঁকেছিলেন ঠিক জানিনা, কিন্তু বাঙালী হয়ে তাঁর প্রাণে যে এই পলায়ন-কলঙ্কের খেদ ছিল না তা মনে হয় না। তিনি এই কিম্বদন্তীর ভিতরে নিশ্চয় এমন-একটি করুণ ছবি দেখেছিলেন যা তিনি রঙে না ফুটিয়ে থাকতে পারেন নি। ছবির গড়নে এই করুণ-রসটিই বিশেষ-করে আমাদের চোখে পড়ে। রাজ্যহারা রাজার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে যাওয়ার মধ্যে যে অদৃষ্টের বিড়ম্বনার অসহায়তা আছে সেইটি বিশেষ-করে শিল্পীকে মুগ্ধ করেছিল—তারই ছাপ এইতে পড়েছে,—লক্ষ্মণসেন উপলক্ষ্যমাত্র। এ-কথা কখনোই বলা যায় না যে বাঙালীর পলায়নকলঙ্ক ঘোষণা করবার জন্যেই' চিত্রকরের তুলি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। এতবড় অপবাদ তাঁকে আমরা দিতে পারি না।

ইতিহাসের সত্য রক্ষা করবার জন্য এই পলায়ন-কলঙ্ক দূর করবার দরকার আছে। কিন্তু তারই উপরে যদি সমস্ত জাতির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে এমন ভাব দেখানো হয় তাহলে সেটা হাস্যকর হয়ে ওঠে। এমন জাতের ইতিহাস অল্পই, যাদের কোনো-না-কোনো রাজা যুদ্ধ থেকে, যে কারণেই হোক, পলায়ন না করেছেন। দূরদেশের কথা দূরে থাক—এই ভারতবর্ষে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তাতে করে তাদের জাতীয় বীরত্ব জগতের সমক্ষে চিরজন্মের-মতো হীন হয়ে যায় নি—কারণ এক-জায়গায় তাদের দৌর্ব্বল্যের পরিচয় থাকলেও অন্য ক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের নিশেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তেমনি বাঙালীর বীরত্বের নিশানা যদি বহু স্থানে থাকে তাহলে এক লক্ষ্মণ সেনের পলায়নকলঙ্কের ছবিতে আমাদের মুখে চুণকালি পড়বার ভয় নেই। শ্রীমতী সরলা দেবী যে ইতিহাস-সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন তা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু এই পলায়নের ছবির জন্যে যদি হৈ-চৈ করি তবে আমরা যে বড় ছিঁচ-কাঁদুনে সেই কথাই জাহির করা হবে।

* * *

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

হোরি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

৪০শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৩ [১১শ সংখ্যা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুমহাশয় যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, বাংলা মাসিক পত্রাদিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত মহা সত্যগুলিকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের গোচরে আনিবার জন্য বসুমহাশয় প্রায় পনেরো বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ যাত্রা করেন। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ তখন তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলে একবাক্যে তাঁহার উক্তিগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গোঁড়ামি যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন পরম সত্যকেও তাহার নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেই সময়ে প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও জড়ের নানা কার্য্যের যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা প্রচলিত সিদ্ধান্তের সহিত মিলে নাই, কাজেই গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল নূতন ব্যাখ্যায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহার পরে বসুমহাশয় আরও দুইবার বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বারেই প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন নূতন কথা বৈজ্ঞানিকদিগকে জানাইয়া আসিয়াছেন। এখন আর সেই অবিশ্বাসের ভাব নাই, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন। ইউরোপের মহাসমরে আজ-কাল বিজ্ঞানের গবেষণা একপ্রকার বন্ধ আছে বলিলেই হয় কিন্তু তথাপি নানা বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে বসুমহাশয়ের আবিষ্কার লইয়া আলোচনা চলিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত নানা তত্ত্বের মধ্যে কেবল কয়েকটির মোটামুটি পরিচয় দিব।

জীবরাজ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ্ লইয়া গঠিত। কিন্তু জীবগণের মধ্যে কোন্‌টি প্রাণী এবং

কোন্‌টি উদ্ভিদ্‌ ইহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিতেন,—প্রাণীর দেহে নানা প্রকার যন্ত্র আছে, তাহা দিয়া উহারা বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতি শক্তিকে গ্রহণ করিয়া জীবনের কার্য্য দেখায়; কিন্তু উদ্ভিদের সে প্রকার যন্ত্রাদি নাই। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের যাঁহারা খবর রাখেন, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, প্রাচীনদিগের এই কথা এখন কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না। উদ্ভিদের দেহে প্রাণি-দেহের ন্যায় চক্ষু কর্ণ নাসিকা নাই সত্য, কিন্তু যে সকল দেহযন্ত্র দ্বারা প্রাণীরা জীবন ধারণ করে, সেই প্রকার অনেক যন্ত্র উদ্ভিদের দেহেও আছে। প্রাণী চক্ষু দিয়া বাহিরের আলোক অনুভব করিয়া জীবনের কার্য্য চালায়, উদ্ভিদ্‌ তাহার প্রত্যেক পাতাটি দিয়া আলোক গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। প্রাণী বাহিরের নানা পদার্থ আহার করিয়া দেহ পুষ্ট করে, উদ্ভিদ্‌ও বাহিরের মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের মোটামুটি কার্য্যে এই প্রকার অনেক মিল দেখা যায়। সুতরাং প্রাণীর দেহে নানা ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই তাহা উদ্ভিদ্‌ হইতে পৃথক, এখন আর সে কথা স্বীকার করা যায় না।
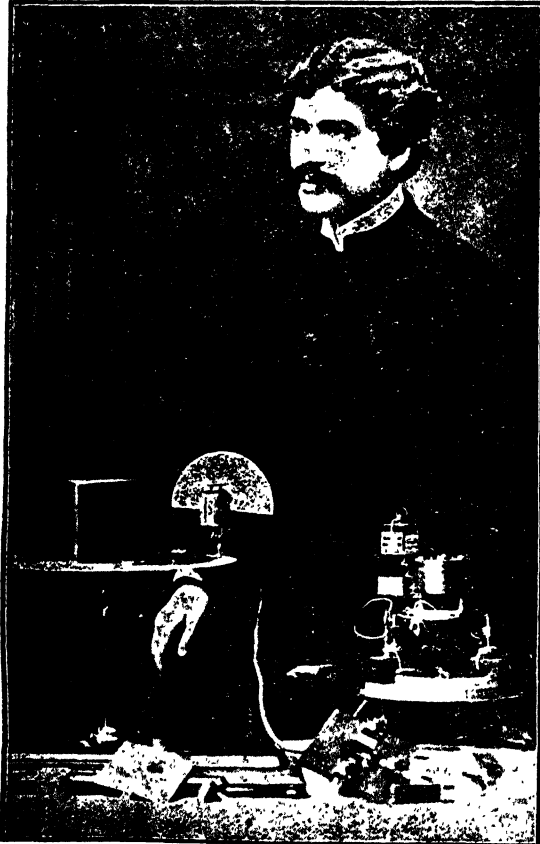
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গত কয়েক বৎসরে উদ্ভিদের জীবন-সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতরকার পার্থক্য আরো অল্প হইয়া আসিয়াছে। প্রাণীদের গায়ে আঘাত দিলে, তাহারা আঘাত অনুভব করে। উদ্ভিদের মধ্যে এক লজ্জাবতী লতা ছাড়া অপর কোনো গাছ যে আঘাতে সাড়া দিতে পারে, এই কথা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই জানা ছিল না। আচার্য্য বসুমহাশয় প্রত্যেক গাছকেই প্রাণীর ন্যায় আঘাতে সাড়া দিতে দেখিয়াছেন। মনোরাজ্যে উদ্ভিদের স্থান নাই। প্রাণীরই মনোবৃত্তি

আছে,—ভয় ক্রোধ লোভ এবং আনন্দবোধ প্রভৃতি প্রাণীরই নিজস্ব। উদ্ভিদে এই সকল বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং আচার্য্য বসুমহাশয়ও পরিচয় পান নাই। কিন্তু প্রাণীদেহের সর্ব্বাংশে যে স্নায়ুজাল বিস্তৃত থাকিয়া মননক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা বসুমহাশয় উদ্ভিদের দেহেও দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, মনোবৃত্তির মূলেও প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে যে সকল বড়-বড় আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোনো বৈজ্ঞানিকই কোনো বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া গবেষণা করেন নাই। মধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিতেই হইবে, ইহা মনে রাখিয়া নিউটন্ বৃক্ষ হইতে ফলের পতন লক্ষ্য করেন নাই; ফলের পতনই তাঁহার মনে মধ্যাকর্ষণের কথা আনিয়া দিয়াছিল। এবং তাহারি ইঙ্গিতে চলিয়া তিনি মধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে সকল আবিষ্কার দ্বারা আজ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার ইঙ্গিতও তিনি একটি অবান্তর ব্যাপারে পাইয়াছিলেন।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে তার-হীন টেলিগ্রাফে সংবাদ আদানপ্রদান চলিতেছে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ম্যাকস্‌ওয়েল সাহেব কাগজ-কলমে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, ঈথরের ঢেউ যেমন আলোক-তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছুটাছুটি করে, সেই প্রকারে তাহা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকার গ্রহণ করিয়া আলোকের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। ম্যাক্স্‌ওয়েলের এই সিদ্ধান্ত কিছুদিন পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া পড়িয়া ছিল,—ঈথরের তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া কেহই বিদ্যুৎকে দূরে পাঠাইতে পারেন নাই। ম্যাক্স্‌ওয়েলের মৃত্যুর পর জর্ম্মান্ পণ্ডিত হার্জ সাহেব বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ঈথরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। জলে যে তরঙ্গ উঠে, তাহার অস্তিত্ব আমরা চোখে দেখিতে পাই এবং স্পর্শ করিয়া জানিতে পারি; কিন্তু ঈথরে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমাদের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দিয়া চিনিয়া লওয়া যায় না। কাজেই ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য একটি সহজ উপায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ্ সাহেব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরিবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যন্ত্রটির গঠন জটিল ছিল না,—একটি কাচের নলে কিছু লৌহ-চূর্ণ রাখিয়া যন্ত্র নির্ম্মিত হইত। বিদ্যুতের তরঙ্গ নলের ভিতরকার লৌহচূর্ণে ঠেকিলে তাহার বিদ্যুৎ-পরিচালন-ধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন হইত, তাহা দেখিয়া তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যাইত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় একটা দোষ ছিল,—ধাতু-চূর্ণে একবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ঠেকিলে, তাহা পরে আর কোনো তরঙ্গে সাড়া দিত না; সাড়া পাইতে হইলে ধাতু-চূর্ণগুলিকে খুব ঝাঁকাইয়া রাখিতে হইত। সাড়া পাইবার জন্য সেগুলিকে কেন ঝাঁকাইতে হয়, তখনকার বড় বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা বলিতে পারেন নাই।

এই ব্যাপারটির কথা আচার্য্য বসু-মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই-সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রাণিদেহের পেশী যেমন পুনঃ পুনঃ সঞ্চলনে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নির্জীব ধাতু-কণিকাগুলিও বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ধারা-বাহিক আঘাতে সেই প্রকারে অবসন্ন হয়। এই কারণেই ধাতু-চূর্ণ কিছুক্ষণ বিদ্যুতের তরঙ্গের সাড়া দিয়া, আর সাড়া দিতে পারে না। প্রাণীর অবসন্ন পেশীতে কোন-প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, ক্লান্তি দূর হয়, এবং তাহা কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। ধাতু-চূর্ণে ঝাঁকানি দিলে, তাহা ঐ প্রকারে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পূর্ব্ববৎ সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসুমহাশয় নির্জীব বস্তুতে সজীব পদার্থের এই লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীব-দেহের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দেহের যে সকল পরিবর্ত্তন চোখে ধরা যায় না, বা স্পর্শ করিয়া বুঝা যায় না, বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। বসুমহাশয় নানা ধাতু ও অধাতু পদার্থের এই প্রকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক কার্য্যের সহিত নির্জীব ধাতুপিণ্ডের কার্য্যের যে মিল বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে তিনি নিজেই অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাণীর পেশীতে বিষ প্রয়োগ করিলে, তাহা নিষ্ক্রিয় ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু বিষনাশক কোনো ঔষধ দিলে সেই পেশীই আরোগ্য লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষম হয়। ধাতুপিণ্ডে বিষ প্রয়োগ করিয়া বসুমহাশয় তাহাকেও প্রাণীর ন্যায় অবসন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন এবং শেষে বিষঘ্ন ঔষধপ্রয়োগে তাহাকে সুস্থ করিয়াছিলেন। সুস্থ প্রাণীর দেহে চিম্‌টি কাটিলে, দেহের আহত ও অনাহত স্থানের মধ্য দিয়া একপ্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়; প্রাণিদেহের কোনো অংশ বেদনাযুক্ত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার ইহাই সূক্ষ্ম উপায়। বসু-মহাশয় চিম্‌টি কাটিয়া ধাতুপিণ্ড পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রাণীর ন্যায়ই তাহা বেদনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল। প্রাণি-দেহের কোনো স্থানে বার বার আঘাত দিলে তাহা অসাড় হইয়া পড়ে এবং আঘাত-প্রদানের পর বিশ্রামের অবকাশ দিলে তাহাই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়ায়। বসুমহাশয় ধাতুপিণ্ড লইয়া ঐ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে সজীব প্রাণি-দেহের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। এই প্রকার শত-শত পরীক্ষায় প্রাণিদেহের কার্য্যের সহিত নির্জীব ধাতুর কার্য্যের অবিকল ঐক্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। লৌহচূর্ণের উপরে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের কার্য্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া জড় ও জীবের এই প্রকার ঐক্য যে কোনো দিন ধরা পড়িবে, তাহা স্বয়ং আবিষ্কারকও পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারের বিবরণ আচার্য্য বসুমহাশয় রয়াল সোসাইটি, রয়াল ইনষ্টি-টিউসন্ এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞান-পরিষদে প্রচার

করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইহা লইয়া য়ূরোপে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার কথা হয় ত পাঠকের স্মরণ আছে। কিন্তু এখানেই বসুমহাশয় তাঁহার গবেষণা শেষ করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, জড় ও জীবের মধ্যে যখন এত সাদৃশ্য দেখা গেল, তখন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেকার সাদৃশ্য সম্ভবতঃ আরো অধিক দেখা যাইবে। আমরা অনেক কথা মনে করি এবং অনেক কল্পনাও করি, কিন্তু তাহার সকলগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। উৎসাহের এবং সুবিধার অভাবে অনেক সাধু সংকল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই সময়ে উদ্ভিদের জীবনের কার্য্য পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্রাদি কিছুই ছিল না এবং যাহা ছিল তাহাতে সূক্ষ্ম-পরীক্ষার কার্য্য চলিত না। কাজেই কার্য্যারম্ভেই আচার্য্য বসুমহাশয় পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না,—কখন নিজের হাতে এবং কখন আমাদের দেশীয় মিস্ত্রিদের সাহায্যে মনের মতো যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যন্ত্রগুলি এমন সূক্ষ্মভাবে এবং সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, সেগুলিকে উদ্ভিদের দেহে সংলগ্ন রাখিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলে, দেহের অবস্থার পরিচয় আপনা হইতেই যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইত। এই উপায়ে বসুমহাশয় প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের যে সকল ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত।

প্রাণিদেহের কোনো স্থানে আঘাত দিলে সেখানকার মাংসপেশী সংকুচিত হয়; তাজা ফুলকপির ডগায় বা লাউ কুমড়ার ডগায় আঘাত দিয়া বসুমহাশয় সেগুলিকেও সংকুচিত হইতে দেখাইয়াছেন। দেহে এসিড্‌, আমোনিয়া বা গরম লোহশলাকা স্পর্শ করাইলে প্রাণিগণ বেদনা অনুভব করে; ঐ প্রকার পরীক্ষা করিয়া তিনি উদ্ভিদের দেহেও বেদনার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

শরীরের কোনো স্থানে আঘাত দিলে তাহার বেদনা প্রাণিগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে না;—আঘাত-প্রাপ্তি এবং বেদনা-অনুভূতির মধ্যে বেশ একটু অবকাশ থাকে। উদ্ভিদ্‌মাত্রেই আঘাত পাইলে, লজ্জাবতী লতার ন্যায় অল্পাধিক সাড়া দেয়, ইহা দেখিয়া আচার্য্য বসুমহাশয় তাহাদের বেদনা-অনুভূতির সময় নির্ণয় করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্রে উদ্ভিদ্‌গণ বেদনা-অনুভূতির কাল আপনা হইতেই লিখিয়া দিয়াছিল। শরীর দুর্ব্বল থাকিলে বা শীতে দেহ আড়ষ্ট হইলে প্রাণীরা তাড়াতাড়ি আঘাত অনুভব করিতে পারে না। দুর্ব্বল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা লইয়া পরীক্ষা করায় বসুমহাশয় প্রাণিদেহের অনুরূপ ফল পাইয়াছিলেন। তাজা গাছ আঘাতে তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়াছিল এবং দুর্ব্বল ও শীতে আড়ষ্ট গাছের সাড়া অনেক বিলম্বে পাওয়া গিয়াছিল।

অক্সিজেন্ এবং ক্লোরিন্ প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ প্রাণিদেহের উপরে কি-প্রকার কার্য্য করে, তাহা আমরা সকলেই জানি। মদ, আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য এবং নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিলে প্রাণীর অবস্থা কি-প্রকার হয়, তাহাও আমাদের জানা আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্-দেহে নানা বাষ্প

ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া শত শত পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে ঐক্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আরো আশ্চর্য্যজনক। ওজোন্-বাষ্পের মধ্যে রাখায় উদ্ভিদ্‌মাত্রই উত্তেজিত হইয়াছিল, এবং কয়লার বাষ্পে তাহাই আবার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। ঈথর ও ক্লোরোফরমের বাষ্প প্রাণীদিগকে হতচেতন করে; এই দুই বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া বসুমহাশয় উদ্ভিদ্‌দিগকেও চেতনাহীন হইতে দেখিয়াছিলেন এবং পরে কিছুক্ষণ শীতল বায়ুতে রাখিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিয়াছিলেন। অঙ্গারক-বাষ্প ও নাইট্রোজেন-ডাক্সাইড্ এবং সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি গ্যাস্ ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইহা দেহে প্রবেশ করিলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বসুমহাশয় উদ্ভিদ্‌কে একে একে ঐ সকল বাষ্পে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রাণিদিগের ন্যায়ই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল।

মদ খাইলে মানুষের অবস্থা কি-প্রকার হয়, তাহা আমরা প্রায়ই পথে ঘাটে দেখিতে পাই। উদ্ভিদ্‌কে মদ খাওয়ানো যায় না, তাই আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্‌দিগকে মদের বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মাতালের চলাফেরা ও কাজকর্ম্মের মধ্যে যেমন সংযম থাকে না, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় পড়িয়া উদ্ভিদ্‌গণও সেই প্রকার অসংযত হইয়া পড়িয়াছিল। মাতাল বৃক্ষের গায়ে যন্ত্রের যে কলম গোঁজা ছিল, তাহা দিয়া সে যাহা ইচ্ছা, পাগলের মত, লিখিয়া গিয়াছিল। এই পরীক্ষার পরে বসুমহাশয় সেই মাতাল বৃক্ষকেই কিছুক্ষণের জন্য নির্ম্মল শীতল বাতাসে উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। শীতল বাতাসে থাকায় তাহার নেশা ছাড়িয়া গিয়াছিল এবং সে সুস্থ উদ্ভিদের ন্যায় যন্ত্রে সাড়ার চিহ্ন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আজকাল ডাক্তার ও কবিরাজমহাশয়েরা যে সকল পদার্থকে ঔষধরূপে ব্যবহার করেন, সেগুলি কেন ঔষধশ্রেণীভুক্ত হইল, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য এখন চিকিৎসকমহাশয়েরা ঔষধের উপরে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আচার্য্য বসুমহাশয় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর নানা খুঁটিনাটি কাজের মধ্যেও যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের প্রচলিত ঔষধগুলির গুণাগুণ বিচার করা চলিবে বলিয়া খুব আশা হয়। ঔষধের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারমহাশয়েরা বহু ইতরপ্রাণী হত্যা করেন, এখন উদ্ভিদের উপরে ঔষধের ক্রিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলে বৃথা প্রাণিহত্যাও নিবারিত হইবে।

প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও স্নায়ু আছে, এই আবিষ্কারটি আচার্য্য বসুমহাশয়ের একটি বড় আবিষ্কার। আজকাল বিদেশের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বসুমহাশয় জীবনে আর-কিছু না করিয়া যদি কেবলমাত্র এই আবিষ্কারটিই করিতেন, তবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক পেফার্ এবং হাবার্‌ল্যাণ্ডের নামই প্রসিদ্ধ। এই দুই পণ্ডিত নানা বৃক্ষ লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাদের স্নায়ুর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান নাই।

লজ্জাবতী খুব লাজুক উদ্ভিদ্,—একটু আঘাত পাইলেই সে সাড়া দেয় এবং যন্ত্রের কলম শাখায় গুঁজিয়া দিলে, দেহের অবস্থা অতি সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া জানায়। উক্ত দুই পণ্ডিত লজ্জাবতীর ডাল পোড়াইয়া এবং তাহাকে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে হতচেতন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি সে আঘাতে সাড়া দিতে ছাড়ে নাই। দেহে স্নায়ুমণ্ডলী থাকিলে, আগুনের এবং ক্লোরোফরমের প্রভাবে তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত এবং সাড়া পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদ্বয় ঐ পরীক্ষা হইতেই উদ্ভিদ্‌গণ স্নায়ুবর্জ্জিত, এই সিদ্ধান্তটি দাঁড় করাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন,- রবরের নলে জল পুরিয়া তাহার এক প্রান্তে চাপ দিলে, যেমন চাপ নলের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনিই চলিয়া যায়, অবিকল সেই প্রকারেই লজ্জাবতীর দেহের ভিতরকার রসের সাহায্যে উত্তেজনা চলে; এই জন্যই গাছের শাখার উপরিভাগ পোড়াইয়া দিলে বা তাহাকে ক্লোরোফরম্ দিয়া অচেতন করিলে, তাহা সাড়া দিতে ছাড়ে না।

যে লজ্জাবতী লতা লইয়া পেফার্ সাহেব উদ্ভিদ্‌দিগকে স্নায়ুহীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, আচার্য্য বসুমহাশয় সেই লজ্জাবতী লতার উপরে পরীক্ষা করিয়া তাহার স্নায়ুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। উদ্ভিদের স্নায়ু আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি লজ্জাবতী গাছকে অঙ্কুর অবস্থা হইতে সযত্নে পালন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রয়োজন মত জলসেচন করা হইত এবং তাহার গায়ে যাহাতে কোনো প্রকার আঘাত না লাগে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। ভোগবিলাসে পুষ্ট লোক যেমন অকর্ম্মা হইয়া দাঁড়ায়, গাছটির অবস্থা তাহাই হইয়াছিল। সে আঘাতে সাড়া দিতে পারিত না। বসুমহাশয় গাছটিকে তাঁহার পরীক্ষাশালায় লইয়া গিয়া তাহার হাতে যন্ত্রের কলম গুঁজিয়া দিয়া নানা প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সে অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই সহজ পরীক্ষা দ্বারাই বসুমহাশয় উদ্ভিদে স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি

পরীক্ষার পূর্ব্বে লজ্জাবতী লতা

বলিতেছেন, দেহের রসই যদি উত্তেজনার বাহক হইত, তাহা হইলে এই সরস লজ্জাবতী লতাটি প্রত্যেক আঘাতেই সাড়া দিত। অব্যবহারে উহার স্নায়ুমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই উহা নানা উত্তেজনার সাড়া দেয় নাই।

যে-সকল রোগীর স্নায়ু কোনো কারণে অসাড় বা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সুচিকিৎসক রোগীর দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করেন বা তাহাকে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পরামর্শ দেন। আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত অসাড় লজ্জাবতীর উপর ঐ প্রকার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া তিনি তাহার দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইয়াছিলেন এবং গরম জলের সেক্ দিয়াছিলেন; এই চিকিৎসার পরে সে সুস্থ গাছের মতো সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

গাছের স্নায়ুজালের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াই বসুমহাশয় এই সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করেন নাই। দেহের স্নায়ু যে বেগে উত্তেজনা মস্তিষ্কে বহন করে, তাহা সকল প্রাণীতে সমান দেখা যায় না। প্রাণিভেদে এবং একই জাতীয় প্রাণীর স্বাস্থ্যের অবস্থা-ভেদে কখন দ্রুত এবং কখন মৃদু গতিতে উত্তেজনা চলিয়া থাকে। বসু-মহাশয় উত্তেজনার চলাচল ব্যাপারেও উদ্ভিদের ও প্রাণীর স্নায়ুর একই রকমের কাজ দেখিতে পাইয়াছেন। স্লেটের উপরে পেন্সিল্ ঘসিলে, ঘটিবাটিতে ঠোকাঠুকি লাগাইলে বা দরজা ভেজাইলে যে শব্দ হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয়,—ইহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আবার ভয়ানক মেঘ ডাকিতেছে, বা বোমার আওয়াজ হইতেছে এই অবস্থায় একমনে বই পড়িতেছেন, এ প্রকার লোকও দেখা যায়। এই শ্রেণীর লোকদের স্নায়ু খুব সবল। বসুমহাশয় তাঁহার নানা পরীক্ষায় গাছদের মধ্যেও স্নায়ুর ঐ প্রকার দুর্ব্বলতা ও সবলতা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুস্থ লজ্জাবতীর দেহের স্নায়ু প্রতি-সেকেণ্ডে চৌদ্দ ইঞ্চি বেগে উত্তেজনা চালাইতে পারে। কিন্তু ঐ গাছই যখন অবসন্ন ও দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে, তখন গতি কমিয়া আসে।

জীবপর্য্যায়ে যে-প্রাণী যত উচ্চ হয়, তাহার দেহযন্ত্রও তত জটিল হইয়া পড়ে। কেঁচো প্রাণীদের মধ্যে খুব নিকৃষ্ট, দ্বিখণ্ড করিলেও সে মরে না, বরং তাহার দেহকে যতগুলি অংশে ভাগ করা যায়, ততগুলি নূতন কেঁচো জন্মে। কিন্তু মানুষের মতো উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর একটা যন্ত্র দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেই তাহার মৃত্যু হয়। এই কারণে মনুষ্যদেহের স্নায়ু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করা চলে না,—বিচ্ছিন্ন হইলেই স্নায়ু মৃত হইয়া পড়ে। কাজেই মানুষের স্নায়ুর উপরে কোন্ পদার্থ কি-প্রকার ফল উৎপন্ন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। গাছ হইতে কাটিয়া লইলে শাখাপ্রশাখা তৎক্ষণাৎ মরে না এবং তাহার স্নায়ুও তখনি নিষ্ক্রিয় হয় না। বসুমহাশয়ের আবিষ্কারের কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী লইয়া পরীক্ষা করিলে মানুষের স্নায়ুর উপরে নানা পদার্থের কার্য্য সহজে ধরা পড়িবে, এবং

ইহাতে স্নায়বিক পীড়ার নূতন নূতন ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

প্রাণীর স্নায়ুর কার্য্য পরীক্ষা যেমন কঠিন, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ভাল করিয়া দেখা ঠিক সেইপ্রকারই কঠিন। মানুষ সুকৌশলে কত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের সমকক্ষ একটি যন্ত্রও অদ্যাপি নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার স্পন্দনের বিরাম নাই; জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তালে তালে নাচিয়াই চলে। কোথা হইতে শক্তি আসিয়া কোন্ সূত্রে ইহাকে নাচায়, তাহা আজও প্রায় রহস্যাবৃত হইয়া আছে।

হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের ন্যায় স্বতঃস্পন্দন কোনো-কোনো উদ্ভিদের দেহেও দেখা যায়। আমাদের দেশের বনচাঁড়াল গাছ, ইহার একটি উদাহরণ। এই গাছের ছোট পাতাগুলি প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায়ই উঠা-নামা করে। বনচাঁড়ালের এইপ্রকার নৃত্য সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ কোনো গবেষণা করেন নাই। কাজেই ব্যাপারটি রহস্যাবৃত ছিল। আচার্য্য বসুমহাশয় তাঁহার নিজের সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। তিনি বনচাঁড়াল গাছে হৃদ্‌পিণ্ডের অনুরূপ অংশ আবিষ্কার করিয়া তাহার কার্য্য এবং হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের ঐক্য দেখাইয়াছেন। অল্প-পরিমাণে ঈথর প্রয়োগ করিলে প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য দ্রুত চলে, কিন্তু অধিক-মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই কার্য্যই কমিয়া আসিয়া প্রাণীর
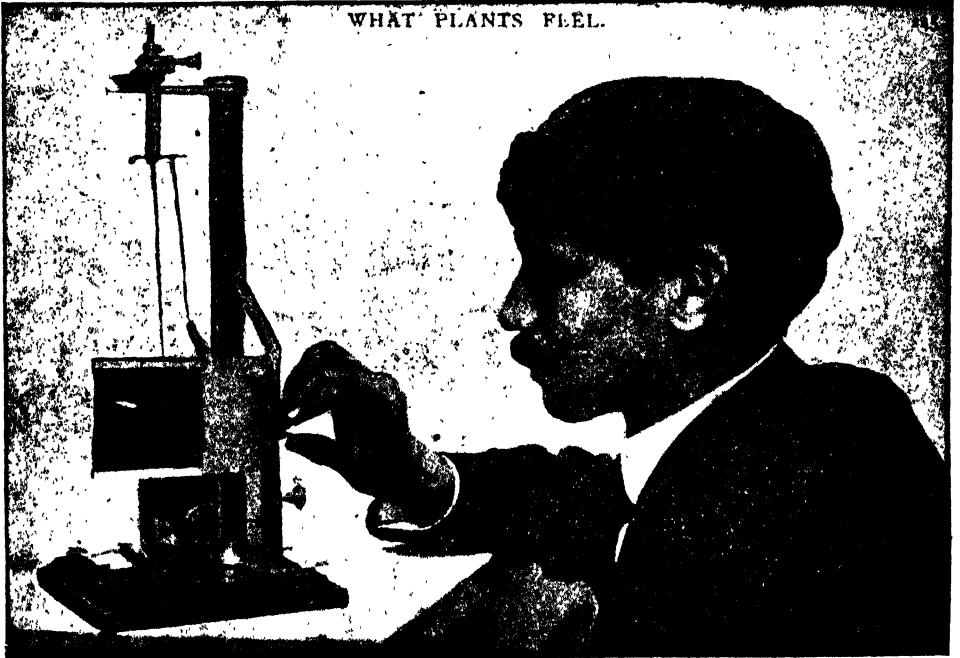
আচার্য্য বসুমহাশয়ের স্বহস্তনির্ম্মিত যন্ত্রে বনচাঁড়াল গাছের পরীক্ষা

মৃত্যু ঘটায়। ঈথরের বাষ্পের মধ্যে তাজা বনচাঁড়াল গাছ রাখিয়া বসুমহাশয় অবিকল ঐ-প্রকার ফল পাইয়াছিলেন। অল্প বাষ্পের স্পর্শে তাহার পাতা জোরে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পের পরিমাণ অধিক করিবামাত্র নৃত্য কমিতে কমিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল ঈথর লইয়াই পরীক্ষা শেষ হয় নাই,—ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের উপরে কার্য্য করে, তাহার প্রত্যেকটি বনচাঁড়ালে প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় তাহার ছোটো পাতাগুলি হৃদ্‌পিণ্ডের অনুরূপ কার্য্য দেখাইয়াছিল।

বনচাঁড়ালের নৃত্যের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া আচার্য্য বসুমহাশয় যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনেরও কারণ নির্ণীত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ড কি-প্রকারে নিয়মিত স্পন্দিত হয়, শারীরবিদ্‌গণের নিকটে তাহার সুব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁহারা বলেন, প্রাণীর দেহের ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই উহার চালক,—এই শক্তিই "জীবনী-শক্তি"। কিন্তু জীবনী-শক্তিটা যে কি পদার্থ, তাহার সন্ধান ইঁহাদের নিকটে পাওয়া যায় না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এইপ্রকার অস্পষ্ট ব্যাখ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। বনচাঁড়াল গাছ লইয়া পরীক্ষায় তিনি দেখিয়াছিলেন, উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন বাহিরের শক্তিরই কার্য্য। বাহিরের বাতাস বিদ্যুৎ আলো তাপ সকলি উহার সাহায্য করে। বাহির হইতে ঈথর, ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তিও ঠিক্ সেপ্রকারে বনচাঁড়ালের পাতাকে কখনো উঠায় এবং কখনো নামায়। প্রাণী বা উদ্ভিদ্ সকল সময়েই বাহিরের শক্তি পায় না,—অথচ হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন এবং পাতার উঠা-নামা সকল সময়েই চলে। এই প্রসঙ্গে বসুমহাশয় বলেন,—বাহিরের শক্তি কাছে পাইলে উদ্ভিদ্‌গণ প্রাণধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখিতে চায়, কিন্তু এই অনাবশ্যক শক্তিকে সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা তাহাদের দেহে নাই কাজেই উদ্বৃত্ত শক্তি দেহে থাকিতে না পারিয়া পাতার উঠা-নামা করাইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও সম্ভবতঃ এই প্রকার শক্তিদ্বারাই সম্পন্ন হয় বলিয়া বসুমহাশয় আভাস দিয়াছেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বড় বড় কেতাবে গাছ কি-প্রকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলিই অনুমানমূলক,—কারণ গাছপালা যে-প্রকার অল্পে অল্পে বাড়ে, তাহা মাপিবার মতো যন্ত্রের এ পর্য্যন্ত বিশেষ অভাব ছিল। কাজেই এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কোনো বিষয়ই প্রকাশ পায় নাই। আচার্য্য বসুমহাশয় নিজের অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া এই প্রসঙ্গের অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যেই বাহিরের তাপ, আলোক, রসায়নিক শক্তি ও বায়ু-প্রবাহের দ্বারা গাছের বৃদ্ধি নিয়মিত হয় বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার

যন্ত্রটি এমন সূক্ষ্মভাবে সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, দশ সেকেণ্ড বা বিশ সেকেণ্ডে গাছে যে একটু বৃদ্ধি হয়, তাহাও যন্ত্র দিয়া জানিতে পারা যায়। কোন্ সার কোন্ উদ্ভিদের পক্ষে ভালো, এবং কোন্‌টি উদ্ভিদের খাদ্য বা কোন্‌টি অখাদ্য, এই সকল ব্যাপার পনেরো মিনিটের মধ্যে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্থির হইয়া যায়।

গাছ বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা রুগ্ন হইলে তাহার আর বৃদ্ধি থাকে না। তার পরেই দেহের ক্ষয় সুরু হয় এবং ক্ষয়-পরিমাণ অধিক হইলে মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণীর মৃত্যু হইলে তাহার হৃদ্‌স্পন্দন রোধ হয়, দেহ বিবর্ণ ও আড়ষ্ট হয়। চিকিৎসকেরা এই সকল লক্ষণ মিলাইয়া প্রাণীর মৃত্যু নির্ণয় করেন এবং মৃত্যুর কালও নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই-গুলি দ্বারা উদ্ভিদের মৃত্যুকাল নির্ণয় করা যায় না। উদ্ভিদের মৃত্যু অতি ধীরে ধীরে আসে এবং হঠাৎ দেহের কোনো পরিবর্ত্তন করে না। এই কারণে ঠিক্ কোন্ সময়ে উদ্ভিদের মৃত্যু হইল, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইত না। আচার্য্য বসুমহাশয় তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত একটি যন্ত্র দ্বারা গাছের মৃত্যু-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার সহিত প্রাণীর মৃত্যু-লক্ষণের অনেক মিল দেতেখি পাইয়াছেন।
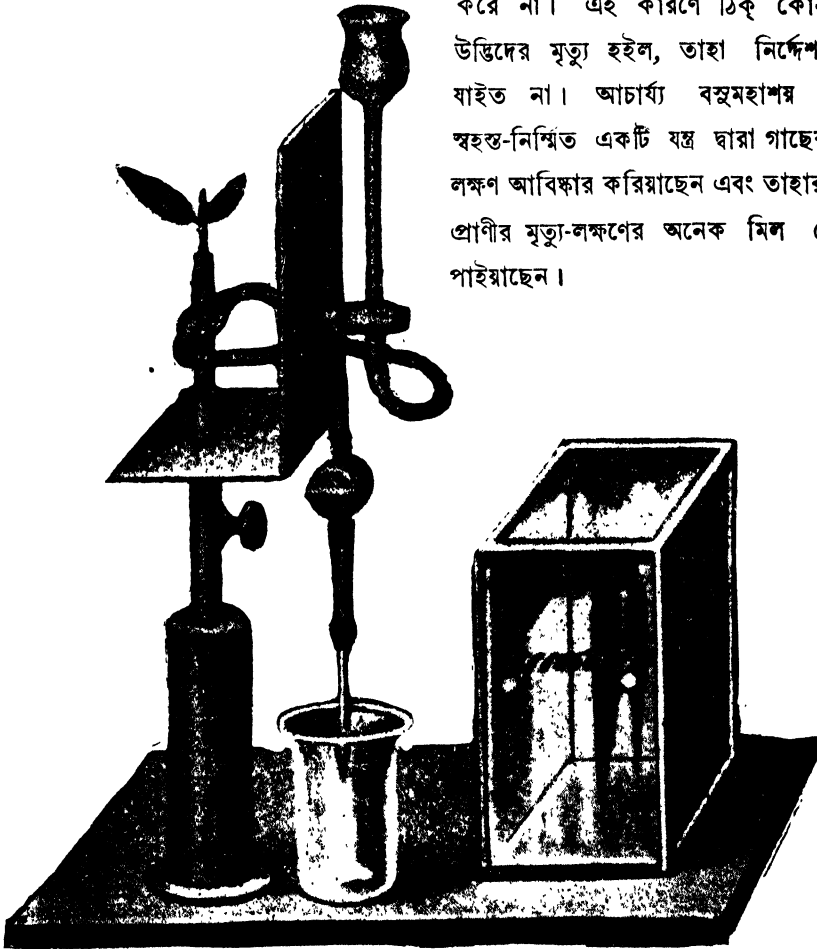
নানা রাসায়নিক পদার্থের যোগে বনচাঁড়ালের পরীক্ষা

এই প্রসঙ্গে তিনি যে একটি পরীক্ষা দেখাইয়া থাকেন, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক। গাছমাত্রেই আঘাতে সাড়া দেয়, কিন্তু লজ্জাবতী জাতীয় লাজুক গাছের সাড়াই সুস্পষ্ট হয়। এই কারণে লজ্জাবতী লতা লইয়াই পরীক্ষাটি করা হইয়া থাকে। লজ্জাবতীর পাতা ও যন্ত্রের কলম সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া সংযুক্ত থাকে। এই অবস্থায় পাতা যেমন উঠিয়া বা নামিয়া সাড়া দেয়, তাহা যন্ত্রে ঢেউ-খেলানো রেখা দ্বারা আপনা হইতেই অঙ্কিত হইয়া যায়। বসুমহাশয় এই প্রকারে লজ্জাবতী লতার হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া নিজের মৃত্যুর কথা সে যাহাতে নিজেই লিখিয়া দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঠাণ্ডায় গাছ ভালো সাড়া দিতে পারে না। গরমে সাড়ার মাত্রা বাড়ে; কিন্তু গরম অধিক হইলে সেই সাড়াই কমিতে আরম্ভ করে এবং শেষে অধিক গরমে গাছের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত লজ্জাবতী গাছে বসুমহাশয় অল্প অল্প তাপ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গাছটি জোরে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উষ্ণতার পরিমাণ যেমন ক্রমে ত্রিশ ডিগ্রি হইতে পঞ্চান্ন ডিগ্রি পর্য্যন্ত বাড়ানো হইল, তেমনি তাহার সাড়ার পরিমাণও কমিয়া আসিতে লাগিল। তার পরে উষ্ণতার মাত্রা সেন্টিগ্রেডের ষাট্ ডিগ্রিতে পৌঁছিলে, সেই প্রায়-অসাড় লজ্জাবতী হঠাৎ একবার প্রবল সাড়া দিয়া নিস্পন্দ হইয়া গেল। প্রাণীর মৃত্যুক্ষণে সমগ্রদেহে একটা প্রবল আক্ষেপ দেখা দেয়,—ইহা দেখিয়া প্রাণীর মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করা যায়। মৃত্যুকালে উদ্ভিদের দেহেও আক্ষেপ হয়,—ইহা প্রকৃতই বিস্ময়কর!

কেবল লজ্জাবতীর মৃত্যুকাল ও মৃত্যুর ক্ষণ নির্ণয় করিয়া বসুমহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। শত শত উদ্ভিদ্ লইয়া ঐপ্রকার পরীক্ষা করায় তিনি একই ফল পাইয়াছিলেন,—প্রত্যেক সুস্থ উদ্ভিদ্ ষাট্ ডিগ্রি উত্তাপে মৃত হইয়া ছিল। যে আঘাত সবল ও বয়স্ক ব্যক্তি অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, রুগ্ন ব্যক্তি বা শিশু তাহা সহ্য করিতে পারে না। বসুমহাশয় ছোটো এবং দুর্ব্বল গাছ লইয়া তাহাদের সহ্যগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এখানেও পরীক্ষার ফলের সহিত প্রাণীর কার্য্যের অবিকল মিল দেখা গিয়াছিল। চারা গাছ ষাট্ ডিগ্রি অপেক্ষা অল্প তাপেই মরিয়া গিয়াছিল। সুস্থ ও সতেজ গাছকে বিদ্যুতের প্রবাহ দ্বারা জখম করিয়া তিনি তাহাকে দুর্ব্বল করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল গাছ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি উষ্ণতায় মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া তিনচারিখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হইয়াছে। চারিখানি পুস্তকের আলোচ্য বিষয় এই প্রকার ক্ষুদ্র রচনার অন্তর্গত করিতে গেলে যাহা সম্ভব, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই হইয়াছে;—বসুমহাশয়ের আবিষ্কারগুলির এক-একটু আভাসও সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইল না। কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া তিনি কোনো কথাই

বলেন নাই, প্রত্যেক উক্তির সত্যতা তিনি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। ভাব কল্পনা এবং অনুমান সাধারণ সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিক যখন তাঁহার নিভৃত পরীক্ষাশালার কোণে বসিয়া কোনো বিষয়ের গবেষণা করেন, তখন ভাব কল্পনা ও অনুমানই সুপথ দেখাইয়া লইয়া চলে। এই জগৎ যতই বিচিত্র হউক না কেন, মূলে সকলই যে এক, এই ভাবটি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই ভারতেরই ঋষিদিগের বাক্য হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, ভারতের তাপসবর্গ কেবল চিন্তা দ্বারা যে মহাসত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সে সত্য কখনই লুকাইয়া থাকিতে পারে না,—পরীক্ষাশালায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে তাহা নিশ্চয়ই ধরা দিবে।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বসুমহাশয়ের আবিষ্কারগুলির যে অসম্পূর্ণ আভাস দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিবেন, জগদীশচন্দ্র সেই মহাসত্যের কথা মনে রাখিয়া জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর কার্য্যের একতা দেখিবার জন্যই প্রথম হইতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য
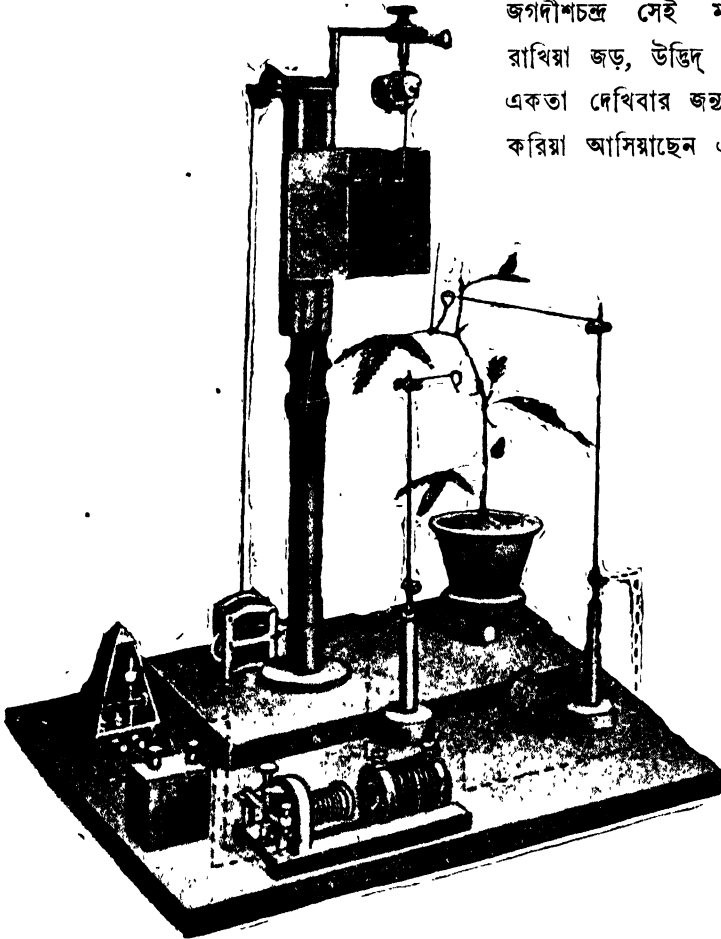
আঘাত বা উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া-পরীক্ষার যন্ত্র

হইয়াছেন। ভারতের ধ্যানমগ্ন মহাতাপস-দিগের নিকটে আকাশ-আলোক মেঘ-বৃষ্টি তরু-লতা কেহই আত্মগোপন করে নাই,—সকলেই বলিয়াছিল আমরা এক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অন্যপথে যে তপস্যা করিয়াছেন, তাহাতেও উঁহারা সেই মহাবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্বেচ্ছাচারা

উপসংহার

[আবার আলোকে]

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ষষ্ঠী তিথি। আজ হিন্দুকুললক্ষ্মীদের আরণ্যক ষষ্ঠী-ব্রত। বাঙ্গলা-দেশের ঘরে ঘরে আজ মহা আনন্দ-কোলাহল। জামাতৃ-অর্চ্চন এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ হইলেও সন্তানবতীগণের পক্ষে আজ পুত্র-কন্যাগণের মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র কৃচ্ছ ব্রত আচরণ করিলে চলে না, আজ তাহাদিগকেই বিশেষ ভাবে আহারাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়।

শিবরামপুরের ষষ্ঠীতলায় আজ মহাধূম। ভারে ভারে দধি দুগ্ধ, ছানা চিনি ইত্যাদির নৈবেদ্য, কদলি, আম্র, পনসাদি বহু প্রকারের ফল, এমন-কি ছাগাদি পশুবলি পর্য্যন্ত ষষ্ঠীবৃক্ষের তলে উপহৃত হইতেছে। সন্তান-বতীগণ কলার 'পেটো'য় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড, আম্রাদি ফল ক্ষীর-ছানা প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীরধনুক সাজাইয়া ভারে ভারে ষষ্ঠীদেবীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণ বসিয়া ষষ্ঠীর 'কথা' বলিতেছেন, এবং এক-একগাছি হলুদরঞ্জিত সূত্র ধরিয়া পুত্রবতী কুললক্ষ্মীগণ, সেই কথা শুনিতেছেন। কেহ কেহ বাঁশের শীষ দুর্ব্বা কদলি ইত্যাদি মাঙ্গলিক ফল-সমন্বিত তালবৃন্তের দ্বারা পুত্রকন্যাগণকে 'অমুক মাসে অমুক ষষ্ঠী ষাট্, ষাট্, ষাট্', ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত ব্যজন করিয়া শেষে আপনার উদরের উপর বাতাস দিতেছেন। পরে হলুদরঞ্জিত সূত্রখণ্ডের দ্বারা তাহাদের বাঁধিতেছেন। বিবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত জমিদার-গৃহ হইতে ষষ্ঠীর পূজোপহার আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতি বৎসরই পুরোহিত আসিয়া পূজা দিয়া যাইতেন, এবং জমিদার-গৃহ হইতে একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আসিয়া আশীর্ব্বাদাদি লইয়া যাইতেন; কিন্তু অদ্য শৈলজা কয়েকজন আত্মীয়ার সহিত স্বয়ং আসিয়াছে। যদিও সে পুত্রহারা, তথাপি ষষ্ঠীব্রত একবার লইলে আর ফেলিতে নাই, ফেলিলে পরজন্মে রাক্ষসী হয়—এই শাসন-বাক্যের জন্য সে ষষ্ঠীব্রত ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার স্বয়ং আসিবার কারণ কেহই অনুমান করিতে না পারিয়া সেই পবিত্র বটবৃক্ষের তলস্থ সমবেত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। যাহাদের সহিত শৈলজার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাহারা তাহাকে ঐ বিষয়ে

প্রশ্ন করিলে সে ম্লানহাস্যে তাহাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "কেন? তোমরা যদি আসতে পার, আমিই কি এমন রাজরাজেশ্বরী যে হেঁটে মার চরণে পূজা দিয়ে যেতে পারব না। দেবতার কাছে আবার বড়লোক গরীবলোক আছে নাকি ভাই?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। শৈলজার অমায়িক ব্যবহারে চিরদিনই তাহারা তাহাকে ভালবাসিত। বিশেষতঃ সে যেদিন হইতে একমাত্র পুত্রটিকে হারাইয়াছে সেইদিন হইতে সমস্ত পুত্রহারা এবং পুত্রবতীগণের সমবেদনার পাত্রী হইয়াছে। আর পুত্রের মৃত্যুর পরও আজ তাহাকে এত ভক্তিভরে "মা ষষ্ঠী"র পূজা দিতে দেখিয়া অনেক পুত্রহারাই গোপনে অশ্রুমোচন করিল।

পুরোহিত পূজা শেষ করিলে, শৈলজার কোন প্রৌঢ়া আত্মীয়া শৈলকে আশীর্ব্বাদাদি প্রদান পূর্ব্বক মাঙ্গলিক তালবৃন্তখানি হস্তে লইয়া পুনরায় তাহা রাখিয়া দিলেন। শৈলজা অগ্রসর হইয়া বলিল, "তা হবে না তিনুপিসী, আমার পেটে বাতাস দাও! আমার দেবু যায় নি, সে আছে, লুকিয়ে আছে।" তিনুপিসী কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনরায় তালবৃন্ত তুলিয়া লইলেন এবং শৈলজা তাহার পার্শ্বদেশ উন্মুক্ত করিলে তাহার উপর ব্যজন করিলেন। আর-একজন বর্ষীয়সী আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এক গিয়েছে সাত হবে মা, দাও তিনু ওর কোঁকে হাওয়া।"

পূজা সারিয়া, গৃহস্থদের বধূর চুরি করিয়া খাওয়া ও নিরীহ কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের উপর দোষারোপঘটিত 'ষষ্ঠীর কথা' ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া 'জয় দেবি জগন্মাতা' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণামান্তে শৈলজা আত্মীয়াগণের সহিত প্রস্থান করিল।

কার্ত্তিকচন্দ্র আত্মীয়াগণের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। শৈলজা ও তাহার সঙ্গিনীগণ গৃহে পৌঁছিলে কার্ত্তিক একে একে সকলের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ, মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া শৈলজার নিকটে উপস্থিত হইল। সালঙ্কৃতা পট্টবস্ত্র-পরিহিতা শৈলজা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল, "চল, একবার বাবার কাছে যাই।" কার্ত্তিক দুঃখিত ভাবে বলিল, "মা নেই, বাবার কাছে আজকের দিনে গিয়ে কি হবে?"

শৈল। তিনিই একাধারে মা বাবা দুই।

কার্ত্তিক। আমি সকালে উঠেই তাঁকে প্রণাম করে এসেছি।

শৈল। তা হোক, তবু আর একবার চল, একসঙ্গে গিয়ে প্রণাম করে আসি।

কার্ত্তিক। চল, কিন্তু তিনি হয়তো কেঁদে ফেলবেন, আমি তা সইতে পারব না।

শৈল। তিনি তোমার মত কিনা, তাই একটুতেই কেঁদে ফেলবেন। চল, ছেলেমানুষী ক'র না।

কার্ত্তিক আর তর্ক না করিয়া শৈলজার সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূকে একসঙ্গে প্রণাম করিতে দেখিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক প্রমাণ বস্তুবিচার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আনন্দে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে

তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রবধূকে বলিলেন, "মা, তোমার যদি জয় না হবে তাহলে যে সমস্ত বিশ্বরচনাই ভ্রমসংকুল হয়ে যাবে। বাবা কার্ত্তিক, তুমি যে আমার মাকে এতদিন পরে সুখী করতে পেরেছ এতেই আমার সংসারের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। আজ তোমাদের একত্রে দেখে তোমার গর্ভধারিণীর জন্যে আমার খুবই দুঃখ হচ্চে। কিন্তু সে স্বর্গে গিয়েছে, তার জন্য বৃথা শোক করার দরকার নেই। তোমরা যে সুখী হয়েছ এতে সে পরলোকেও নিশ্চয় সুখানুভব করছে। কিন্তু আজ আমার এখানেই তোমাদের খেতে হবে; এই দেখ, তোমাদের জন্যে আমি নিজেই সব জোগাড় করে রেখেছি।" বধূ শ্বশুরের কথা শুনিয়া অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল, এবং শ্বশুর ও স্বামীকে আহার করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ করিল।

বৈকালে কার্ত্তিক একখানা পত্র হস্তে শৈলজার নিকটে গিয়া বলিল, "শৈল, এই মাসের ২৭শে সর্ব্বদাদার বিয়ে; আমি বরের পক্ষ থেকে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, আর এই বোধ হচ্ছে কনের পক্ষ থেকে সরোজবাসিনী দেবী তোমায় নিমন্ত্রণ করছেন, দেখ দেখি চিঠিখানা খুলে?"

শৈলজা পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই বটে।"

কার্ত্তিক। তা হলে তুমি কোন্ পক্ষে যাচ্ছ? আমার ত' সদলবলে বরের বাড়ী যেতে হচ্চে, কারণ বরের ত' তিন কুলে কেউ নেই, বিশেষতঃ তার জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেউ তেমন আসছেও না। তার আত্মীয় বলতে আমি, আত্মীয়া বলতে তুমি এবং তোমার আমার খুড়ি জেঠী মাসীপিসীরা। এখন কি করবে?

শৈল। সর্ব্বদাদার যেমন কাণ্ড, খবরা-খবর নেই—ব্যাস, বিয়ে করতে চল্লেন। আমার দু'পক্ষই রাখতে হবে, চল। কবে যেতে হবে?

কার্ত্তিক। তোমার যেদিন অভীরুচি—আমার ত' কালই যেতে হচ্চে।

শৈল। তুমি ত' গিয়ে সবই করবে। মেয়েমানুষ না গেলে তোমাদের যজ্ঞিকাজের যা দশা হবে তাত' জানি। যাক তা'হলে এত আগে থাকতে সবাইকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, তিনুপিসী, সুবুমাসী আর রতন কুমুদী দুই ঝি নিয়ে যাওয়া যাক; তারপর সমসম কালে আর যাদের দরকার বুঝব ডেকে পাঠাব।

কার্ত্তিক। তাহ'লে তুমি ত যাচ্ছ?

শৈল। তা না হলে তুমি কি নিজে বরণ ডালা মাথায় করবে না'কি?

কার্ত্তিক। এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার আমাদের জন্যই ত বরণ-ডালা, আমাদেরই বরণ আগে। আমরা আবার কাদের বরণ করব, আমাদেরই তোমরা চিরদিন বরণ করে থাক।

শৈল। ঐ অহংকারেই ত' তোমাদের এতটা বাড় বেড়েছে।

কার্ত্তিক। তোমরা যদি আমাদের চিরদিন পূজাই করতে পার তাহ'লে আমরা কি দয়া করে সেই পূজা নেবার পরিশ্রমটু করতে পারব না?

শৈল। অনুগ্রহ করে পূজা নিতে পার বটে কিন্তু সব সময় যে পূজার উপযুক্ত থাকতে পার না, এইটেই দুঃখ।

এই কথায় হঠাৎ কার্ত্তিকের হাস্যোজ্জ্বল মুখের সমস্ত উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া গেল। শৈলজাও তাহা লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ করজোড়ে বলিল, "ক্ষমা কর, আর আমি এমন কথা বলব না।"

কার্ত্তিক। ক্ষমা! ক্ষমা কেন শৈল? আমি তোমায় এই কথার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি অন্যায় করব আর তুমি যে তা ক্রমাগত সয়ে যাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি দোষ করলে তুমি তা দেখিয়ে দেবে, তুমি অন্যায় করলে আমি তোমায় দেখিয়ে দেব; আমি অসৎপথে গেলে তুমি আমায় যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনবে, আমিও তাই করব। এমনি করেই ত' তোমার-আমার মধ্যে সমস্ত মিথ্যা অসামঞ্জস্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টত্বের ভাব দূর হয়ে ভালবাসার সমকক্ষতা ফুটে উঠবে। তুমি যে আমায় প্রণাম কর, আমার এখন মনে হয় সেইটিই অন্যায় কর।

শৈল। তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, যখন দুষ্টুমির দিকে ঝুঁকেছিলে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝুঁকেছিলে, আবার যখন এদিকে ঝুঁকেছ তখন ব্যস্, একেবারে মেয়েমানুষকে ঠেলে আকাশে তুলতে চাও। ওসব যা-তা কথা বলো না, ওসব শুনতে নেই, শুনলে পাপ হয়; আর যদি অন্য কেউ শোনে ত' কি মনে করবে বল দেখি! ছিঃ! ও কি—মুখ ফেরাচ্ছ কেন!

কার্ত্তিক অশ্রুরোধ করিতে করিতে বলিল, "জানিনে, তোমরা কি দিয়ে তৈরি, তোমাদের ভালবাসাও যা, ভক্তিও তাই। যাকে ভালবাস এবং যার কাছ থেকে স্নেহ আদায় করে নাও, তাকেই আবার ঠাকুরের আসনে বসিয়ে পূজা করতে পার! তোমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের মধ্যে, ধূলোখেলার মধ্যে যার স্থান, তাকেই আবার অনায়াসে ধূলো ঝেড়ে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে পার। তোমাদের কেউ বুঝতে পারে না।"

শৈলজা তাহার স্বামীর নিকট ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চোখের উপর চক্ষুস্থাপন করিল; এবং ক্ষণপরে হাসিয়া বলিল, "এত কথাও তুমি বানিয়ে বলতে পার! যদি বাস্তবিকই তোমায় দেবতার মত ভক্তি করতে পারতুম তাহলে কি এ জীবনে আমি দুঃখ পেতুম? সেই পূণ্যেই যে আমার সব পাপ খণ্ডে যেত।"

কার্ত্তিক দুই পাণিতলের মধ্যে শৈলজার মুখখানি সযত্নে ধরিল এবং তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া পরমস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখের এই মধুর আলোটুকুকে কেমন করে ভয় করতুম!"

শৈলজা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "চুপ কর, ভূতে পেলে কি মানুষের কিছু ঠিক থাকে! তোমারও ভূত ছেড়েছে, আমিও শান্তি পেয়েছি। এ জীবনে আর ও কথার আলোচনা নয়।"

কার্ত্তিক সেই কথার উপর যথারীতি স্নেহের মোহর অঙ্কিত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

ধনসম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার

পরিবার-গত ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বাধিকারের ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

ইহার তিন যুগ;—প্রত্যেক যুগ বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির দ্বারা পরিচিহ্নিত।

*
* *

তিন ব্যক্তি কোন সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইতে পারে না বলিয়া আইনে ঘোষিত হইয়াছে।—পত্নী, পুত্র ও দাস। তাহারা যাহা-কিছু অর্জ্জন করে, তাহা তাহাদের প্রভুতেই বর্ত্তায়। (মনু ও নারদ)।

*
* *

অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি:—এই নিয়ম-পদ্ধতি স্থাপনের পথে দুইটি বিশ্রামস্থান।

পিতার মৃত্যু হইল। সম্পত্তি কাহাতে বর্ত্তাইবে? মনু বলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রে; কিন্তু হিন্দুআইনে জ্যেষ্ঠপুত্রের কোন বিশেষ পদ-মর্য্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। অন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন, যে-পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ, সম্পত্তি তাহাতেই বর্ত্তাইবে। পিতার মৃত্যুর পর, পরিবারের মধ্যে প্রকৃত কর্ত্তা কেহই থাকে না; সমান অধিকারের কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে একজনের উপর বিষয়-সম্পত্তির কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার পড়ে। সকলেরই সমান অধিকার, সমান কর্ত্তব্য: প্রত্যেকেই কাজ করে, অথচ তাহার সেই কাজের কেহই হিসাব লয় না এবং সে আবশ্যকমত অর্থাদি গ্রহণ করে, অথচ কেহ তাহা টুকিয়া রাখে না।

দ্বিতীয় বিশ্রামস্থানটি,—সামাজিক ক্রম-বিকাশের কোন এক নিশ্চিত সময়কে পরি-চিহ্নিত করে। অবিভক্ত সম্পত্তির পদ্ধতিটি তখন আর পিতৃপুরুষের মৃত্যুর উপলক্ষে একটা অবশ্যম্ভাবী নৈমিত্তিক পদ্ধতিরূপে অবস্থিত নহে, তখন উহা আইন-সঙ্গত স্থায়ী পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৌলিক সম্পত্তি তখন আর পরিবারের অন্তর্ভূত কোন এক জনের (পিতামহ হইলেও) অধিকারে আসিতে পারে না; ঐ সম্পত্তি সাধারণ পারিবারিক সম্পত্তি; বংশাবলীর মধ্যে যে পুরুষেরই লোক হোক না কেন, পরিবারের অন্তর্ভূত সকল ব্যক্তিই ঐ সম্পত্তির অংশীদার। ঐ সম্পত্তির উপর পিতামহের যে অধিকার, দৌহিত্রেরও সেই অধিকার, এবং পিতার ভোগদখল-স্বত্ব পুত্র অপেক্ষা বেশী বিস্তৃত নহে। সুতরাং ঐ সম্পত্তি বাঁধা রাখিতে পারা যায় না, বা হস্তান্তর করিতে পারা যায় না। (১)

---

(১) একান্নবর্ত্তী পরিবারতন্ত্র—মনুর বচনাদি, জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ধন-সম্পত্তির পরিচালনের ভার আরোপ করিয়া থাকে। মনু IX, 105। নারদের বচন, সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ পুত্রের উপর পরিচালনের ভার আরোপ করে: নারদ XIII, ৫ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি।—অজ্ঞাতনাম গ্রন্থকারদিগের কতকগুলি বিশেষ-উল্লেখযোগ্য বচন "মিতাক্ষরায়" উদ্ধৃত হইয়াছে—একটা বচনে বিক্রয়-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে:—"সম্পত্তি হস্তান্তরকরণের ছয় প্রকার রীতি আছে: একই নগরের অধিবাসীদিগের সম্মতি, এক গোত্রীয় লোকের সম্মতি, প্রতিবেশীগণের সম্মতি,

নিজস্ব সম্পত্তির নিয়ম-পদ্ধতি। এই নিয়ম-পদ্ধতি দুই-প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে:—

একপক্ষে, বংশানুক্রমিক ধন-সম্পত্তি ও যে ধন-সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত এই দুয়ের ভেদ স্বীকার করা। স্ত্রীধন ও বিশেষ ব্যবসায়াদি হইতে সমুৎপন্ন লভ্যাংশ, পরিবার-মণ্ডলীর মধ্যে ফিরিয়া আসে না।

পক্ষান্তরে, পরিবারমণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিরা মণ্ডলীর বন্ধন ছেদন করিতে পারে; এমন-কি, তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি, অবিভাজ্য পরিবার-তন্ত্র হইতে বাহির হইয়া যাইবার দাবী করিতে পারে। ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে বাটোয়ারার সত্বাধিকার অতি কষ্টে স্বীকৃত হইয়া থাকে; কেননা, অনেক সময় ভূমি গ্রামের অধিকার-ভুক্ত; তারপর, ভূসম্পত্তি বিভাগ না করাই, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থানুকূল।

কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তির সৃষ্টি,—বুদ্ধিমান ও কার্য্যতৎপর লোকদিগকে, স্বকীয় অক্ষম সহচরগণ হইতে পৃথক্ হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছে; এ-বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাও উৎসাহ দিয়াছে: যতগুলা গৃহ, ততগুলা দেবারাধনার স্থান, সুতরাং সেই পরিমাণে পুরোহিতবর্গেরই লভ্য। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকালেই অবিভক্ত পরিবার-মণ্ডলীর অন্তর্ভূত সকল ব্যক্তিই আপন ভ্রাতৃগণ হইতে নিজ অংশের দাবী করিতে পারে, কিন্তু পিতার নিকট হইতে দাবী করিতে পারে না। মধ্যযুগের গ্রন্থকারেরা এই অধিকার প্রদান করিয়াছে।

ব্যক্তিগত নিজস্ব-সম্পত্তিতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—উত্তরাধিকার। সমবেত সাধারণ সম্পত্তি-পদ্ধতিতে, নবজাত শিশুরা—উত্তরাধিকার শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে,—উত্তরাধিকারী না হইয়াও, পরিবার-মণ্ডলীতে প্রবেশ লাভ করে। মনু উত্তরাধিকারের একটা পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারের অধিকার পিতৃবংশের সমস্ত পুং-সন্তানের মধ্যেই (agnate) বদ্ধ ছিল; মধ্যযুগে মাতৃবংশের সন্তানদিগের (cognate) অধিকারও পুরাপূরি স্বীকৃত হইল।

উত্তরাধিকারীগণের সম্মতি এবং সুবর্ণ দান অথবা জল দান।" আর এক বচনে বন্ধক রাখিবার ব্যবস্থা আছে: "স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিষিদ্ধ, কিন্তু আবশ্যক হইলে কোন পক্ষ বন্ধক রাখায় সম্মতি দিতে পারে।" পরিবারের কোন ব্যক্তি পরিবার-মণ্ডলী হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, কোন কোন বচনে এরূপ অনুজ্ঞা আছে, তবে তাহাকে অবিভক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে হইবে। মনু IX, ২০৭; যাজ্ঞবল্ক II,, ১১৬ ইত্যাদি। সাধারণ সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ত্যাগ না করিয়াও, স্বকীয় ব্যক্তিগত শ্রমের ফল ভোগ করা যাইতে পারে—কতকগুলি বচনে এরূপ অনুজ্ঞাও আছে: মনু X., ২০৬—২০৯। গৌতম XXVIII., ২৭—২৮; নারদ XII, ৬,১০, ও ১১ ইত্যাদি।

পিতায় জীবদ্দশায় পিতার অনুমতি লইয়া পরিবারমণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারে—এরূপ কতকগুলি বচন আছে: অপস্তম্ভ XIV., ১১; বোধায়ন II., ২, ১; গৌতম XXVIII., ২, ইত্যাদি।

পিতৃইচ্ছার বিরুদ্ধেও, পুত্র অবিভক্ত পরিবারতন্ত্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, কোন কোন বচনে এরূপ অনুজ্ঞা আছে: "বিষ্ণু" XVII, ১, ২; "মিতাক্ষরা" ১, ২, ৭; ইত্যাদি। "স্মৃতিচন্দ্রিকা" I., ১২—১৭ ইত্যাদি।

Mayne দ্রষ্টব্য, পৃ ২০৬, এবং Magnaghten দ্রষ্টব্য, IV পরিচ্ছেদ।

দানপত্রবর্জ্জিত উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দানপত্রসহকৃত উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারেই হইয়া থাকে। নিজ ধনবৃদ্ধির আশায় ব্রাহ্মণ মুমূর্ষুদের পারলৌকিক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কথা সত্য, এই স্বেচ্ছা-নিয়মিত উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের মনোভাবের বিরুদ্ধ। হিন্দুর ভাষায় মৃত্যু-কালীন দানপত্রের বা (will) "ইচ্ছাপত্রে"র অস্তিত্বমাত্র নাই। (২)

অতএব য়ুরোপীয় স্বত্বাধিকার-সম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের ন্যায়, হিন্দু স্বত্বাধিকার-সংক্রান্ত ক্রমবিকাশ হইতেও আমরা অবগত হই যে, পরিবারতন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিয়াছে। অব্যভিচারী পিতৃআধিপত্যের পর, নাবালকের অধিকার ও সাবালকের অব্যভিচারী অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; পিতৃশাসনতন্ত্রের পর সমবেত সাধারণ-সম্পত্তিতন্ত্র, তাহার পর নিজস্ব-সম্পত্তি-তন্ত্র। কিন্তু সমাজের ক্রম-বিকাশের পূর্ব্বেই স্বত্বাধিকারের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। পিতৃশাসনতন্ত্র অন্তর্হিত হইলেও এবং পুত্রগণ কৌলিক সম্পত্তির অংশীদার বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া দিবার জন্য পুত্রেরা পিতার নিকট কদাচিৎ দাবী করে; প্রায়ই সহোদর ও "খুড়তুতো" "জেঠতুতো" ভাইরা পারিবারিক ভূমি সমবেতভাবে কর্ষণ করে; অনেকেই এক গৃহে বাস করে; সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তিই পরিবারমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত সাধারণ বিষয়সম্পত্তির পরিচালনা করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অসমা

প্রথমে পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় বাসা পাড়িতে আসিয়া বিপদে পড়িলাম, ঝী-চাকরের জন্য। আমাদের দরিদ্র দেশে এক টাকা মাহিনা ও খাওয়া-পরায় ঝী, এবং আড়াই টাকায় খোরাকী চাকর যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে পাঁচ টাকা মাহিনার খোরপোষওয়ালা চাকরদের ব্যাপার দেখিয়া আমার তাক লাগিয়া গেল। কায করিতে আসিয়া প্রতি কথায় তাহারা জানাইতে থাকে যেন মনিবদের কৃতার্থ করিবার জন্যই তাহাদের আসা! যতটুকু ইচ্ছা কায করিবে, তাহার বেশী কিছু বলিবার অধিকার মনিবের বা কাহারও নাই!

(২) দানপত্রবর্জ্জিত উত্তরাধিকার। বচন: মনু IX "অপস্তম্ভ" II, "গৌতম" XXVIII "মিতাক্ষরা" I ও II; "দায়ভাগ" XI.

Mayne দ্রষ্টব্য, XVI—XIX পরিচ্ছেদ ও Magnaghten II পরিচ্ছেদ। দানপত্র-সহকৃত উত্তরাধিকার। এ-সম্বন্ধে কোন প্রাচীন বচন নাই; কেবল কোম্পানী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "Digeste"এ কতকগুলি বচন পাওয়া যায়; এইরূপ;—১৮৭০ অব্দের XXI আইনে ও আদালতের অনেকগুলি বিচার-নিষ্পত্তির মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তিন মাসের মধ্যে তিনটা চাকর পলাইবার পর আমি নিজেই যথাসাধ্য সব কাজ করিতে ছিলাম, সঙ্গে ছিলেন বিধবা খুড়শাশুড়ী। আমরা পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, ঘরে ধান সিদ্ধ করা হইতে সময়-বিশেষে বিশজন কৃষাণের ভাত-জলখাবার দেওয়া আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। জল ঘাঁটিলে বা আগুন-তাতে গেলে আমাদের অসুখ হয় না।

মন্দ চলিতেছিল না, কিন্তু আমার স্বামার তাহা ভাল লাগিল না। "ভদ্রলোক এলে নিজে তামাক সাজব এখন" ইত্যাদি বলিয়া তিনি বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহার দোকানে আয় এখন বেশ জমিয়া উঠিতেছে; বহুদিনের বহু কষ্টের পর তিনি এখন একটু আরাম চান।

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার নিজেরই মন ছোট হইয়া গেল। আর চাকরদের লইয়া কোন কথা বলিব না, যাহা ইচ্ছা হয়, করুক, বাদ-বাকী নিজেরা যেমন করিতেছি. করিব। বলিলাম, "ছাখ, এবার না হয় একটা হিন্দুস্থানী চাকর এনো, ছেলেমানুষ পাও ত আরও ভাল। বাঙ্গালী মিন্সেদের ঐ চুলের ফ্যাশান আর পাৎলা কালাপেড়ে কাপড়, আমি সহ্য করতে পারি না।"

"হোক্, তারা কিন্তু ভদ্র আর পরিষ্কার।" বিরক্তভাবে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সেইদিন বৈকালে একটা হিন্দুস্থানী যুবককেই সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

তাহাকে দেখিয়া খুড়িমা হাসিয়া খুন, "কথা শোন বৌমা! ও কেঁই-মেই বুঝতে পারছ কি? চুল কাটার ঢং দ্যাখ, তেলে যেন নেয়ে এসেছে!"

তা হোক! তাহার তরুণ মুখখানি কিন্তু আমার মন্দ লাগিল না। সরল দৃষ্টি, ভীত, বিস্ময়াপন্ন ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, এই সবে মাত্র সে সংসারে ঢুকিয়াছে। আহা, মায়ের বাছা, শুধু দুটি অন্নের জন্য দেশ ছাড়িয়া এতদূর আসিয়াছে। কথাটাও সত্য! এই পরশু দিন সে কলিকাতায় পা দিয়াছে।

পশ্চিমে কোন্ গ্রামের নাম করিল, সেই-খানে তাহার বাড়ী। দেশে বড় আকাল পড়িয়াছে, খাইতে পাইত না, তাই ঘরের লোকেরা জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়ীতে তাহার "জানানা লোক্ উপাস্" করিতেছে; আমরা ভাল বিবেচনা করিয়া যাহা দিব, সে তাহাই লইবে। বিনীত ব্যথায় এই কথা জানাইয়া সে তাহার করুণ দৃষ্টি তুলিয়া কৃপা-প্রার্থী ভিখারীর ন্যায় দাঁড়াইল। দেখিয়া খুড়ীরও মায়া হইল; তিনি কহিলেন, "থাক্, থাক্, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই হবে। কায কেমন করে, দেখা যাক্।" বলিয়া তিনি তাহাকে লইয়া নামিয়া গেলেন।

২

তাহার নাম নাথু। বয়স প্রায় উনিশ কুড়ি হইলেও স্বভাবটি শিশুর ন্যায় নির্ভরশীল এবং সে একান্ত স্নেহভিক্ষু। খুড়িমাকে সে এমন সুরে "মায়ী" বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে যে তাঁহার চিররুক্ষ ভাষাও নাথুয়ার নাম করিতে কোমল হইয়া আসিত। সে তাঁহার নিকট দোষ করিলে সে কথা আর আমার কানে উঠিত না। নাথু প্রথমে আমার

'বহুমা' বলিতে আরম্ভ করে, পরে খুড়ীর শিক্ষায় এখন 'বহুজি' বলিতেছে।

বৎসর দুই বেশ ছিলাম। বাহিরে বোধ হয় স্বামীর উন্নতিরই দিন চলিতেছিল, কারণ আসার কিছুদিন বাদেই আমরা ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি। দোতালা বাড়ী পুরানো হইলেও নীচে-উপরে অনেক ঘর। তাঁহার নিকট শুনিলাম, যেমন সস্তায় বাড়ীখানা পাওয়া গিয়াছে, নূতন করিয়া মেরামত করাইতে হইলেও অলাভ পড়িবে না। উনি ব্যবসায়ী হইলেও সাধারণ দোকানদারদের মত সংযমী উপাধি-ধারী অর্থাৎ কৃপণ ছিলেন না। আমার জন্য কোন সৌখীন সামগ্রী আনিলে আমি হাসি বলিয়া রাগ করিয়া তিনি সে হিসাবের ক্ষতি-পূরণে পুত্রকন্যার সাজ-সজ্জায় অনেকখানি খরচ করিয়া ফেলিতেন। কিছু বলিলে উত্তর হইত, "তুমি ত উপার্জ্জন করতে যাচ্ছ না! যে চিরটা কাল খেটে পয়সা রোজগার করছে তাকে আর জমা-খরচের হিসেব শেখাতে এসো না। আমার আয়-ব্যয় কি আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ?"

বাড়ীতে দুইটা গরু—নাথুয়া ছাড়া আরও একজন চাকর রাখা হইয়াছিল, তবু আমার স্বামী সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ করিতেন, একজন ঝী না থাকায়। রান্নাঘরের কাযের দিকে একজন মেয়ে মানুষ রাখিয়া নাথুয়াকে তাঁহার নিজের কাযে লইবার ইচ্ছা, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

শীতের পর সবে মাত্র ফাল্গুন পড়িয়াছে। নাথুয়া আসিয়া বলিল, সে দুই বৎসর বাড়ী যায় নাই, এবার একমাসের ছুটি চায়। তাহাকে ছাড়িলে খুড়ীর বড় বিপদ! "এখন সেখানে তোর কি দরকার? খবর পাঠিয়ে দে—পূজোর সময় যাস্ তখন।" ইত্যাদি বায়না সুরু করিয়াছিলেন তিনি; কিন্তু তাঁহার ভাসুর-পুত্র আসিয়া সব গোল মিটাইয়া দিলেন। "এক মাসের বেশী যেন এক দিনও না হয়, দেখিস্!" কড়া আওয়াজে এই মন্তব্য শোনাইয়া প্রাপ্য ও এক মাসের অগ্রিম বেতন দিয়া নাথুয়াকে ছুটি দিলেন। কথা রহিল, এ মাসটা দোকানের চাকর আসিয়া বাড়ীর কায করিয়া যাইবে।

যাইবার সময় খুড়িমা তাহাকে ভজাইতে-ছিলেন, "সে ছাই দেশে একমাস থেকে কি করবি নাথুয়া? পয়সা-কড়ি দিয়ে ঘর গুছিয়ে—চলে আসিস্, কেমন?"

ঘাড় নাড়িয়া নূতন-শেখা বাঙ্গ্লায় নাথুয়া বলিতেছিল, "হাঁ মায়ী, হোরিকা বাদ নিচ্চয় আস্‌বে।"

আমি বলিলাম, "খুকীর জন্য তোর মন কেমন করবে না নাথু?"

"কাহে মন কেমন করবে না বহুজি, আলবৎ করবে। লেকিন ঘরমে যে এক জোনের মন কেমন করতে লাগল! যে-যে আদমি দেশ-সেঁ আসছে, সবকোই বোলছে যে উয়ো বহুৎ কান্‌ছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "কে রে, তোর বৌ না কি?"

সস্মিত মুখে সেলাম দিয়া সে বলিল, "হাঁ বহুজি, উস্‌কা বি বহুৎ মন কেমন করছে।" তাহার মুখে লজ্জার চিহ্নমাত্র নাই! আমি অবাক হইলাম।

হাসিও আসিল; সত্য, ছেলেটা বহুর

জন্যই যাইতেছে বটে! বন্ধুর মন কেমন করুক না করুক, ইহার ব্যগ্রতা কিন্তু অনেক ক্ষণ কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমার কেবলি হাসি আসিতেছিল; কিশোর-কিশোরীর তরুণ প্রেম প্রকৃত প্রস্তাবে সুকুমার সুন্দর হইলেও আমাদের মত বয়সের লোককে অনেকখানি হাসাইয়া দেয় যে!

তাহাদের হঠাৎ-সাক্ষাতের আনন্দ-কল্পনায় আমার হৃদয়খানা তাই নিমেষে ছুটিয়া গিয়া সেই সুদূর মুঙ্গের জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের সামান্য কুটীর-দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া হাসিয়া খুন হইতেছিল। হোরির পর আসিবে! ঠিক বলিয়াছে, হোরি যে তাহাদের দেশের বড় সাধের খেলার দিন!

৩

নাথুয়ার ছুটির এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আরও এক মাস যায়। খুড়ী রাগিয়া অনর্থ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে চাকর না হইলেও স্বচ্ছন্দে দিন যাইত, এখন কিন্তু নাথুয়া চাকরটার জন্যও অনেক কাজ আটকাইতেছে। বাবু বলিলেন, "এমন করে আর চলে না, বল ত অন্য লোক দেখি।"

খুড়ী বলিলেন, "আসবে ত অমনি আর একটি নেমক-হারাম! শিখে পড়ে যখন তালিম হল, তখনি কি না মুখপোড়া পালাল! দেশে গিয়ে ছাতু খাচ্ছেন,—মরছেন, পাজীর হাড়—ওদের আবার রাখে?"

তিনি বকিয়াই চলিলেন। আমি বলিলাম, "চাকর দরকার হবেই, তবে সে এতদিন আছে, দুদিন দেখাই যাক্। আর তোমায় ত সে ঠিকানা দিয়ে গেছে, একখানা চিঠি দিয়ে খবর নাও না?"

স্বামী বলিলেন, "তা কি আমি বাকি রেখেছি, ভাব? রিপ্লাই কার্ডে আমার ঠিকানা লিখে দিয়েছি, প্রায় মাস খানেক হল, কিন্তু তার কোন উত্তর আসে নি! বোকা—আহাম্মক। যা দু পয়সা নিয়ে গেছে তা কড়ায়-গণ্ডায় ফুরিয়ে অন্ন-কষ্টে পড়বার পূর্ব্বে ত ঘর থেকে বেরুবে না। লোক-টোক রেখে যখন স্থির হয়ে বস্‌ব তখন একদিন হুস্ করে বেটা এসে উঠবে।"

আমারও তাই মনে হইতেছিল। দূর হইতে খুড়ী উত্তর দিলেন, "ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব তখন।" গৃহকর্ত্তা চিন্তিত মুখে চলিয়া গেলেন, আমিও তখন কি করিব স্থির পাইতেছিলাম না।

সকালে এই সব কথা,—বৈকালে দ্বিতীয় চাকরটাও আসিল না। ঘরের কাজ যেমন করিয়া হোক্ চলিবে, কিন্তু গরু-বাছুরগুলা ও বাহিরে কর্ত্তার সাধের সব্‌জি বাগানের কি হইবে? সারাদিনের রৌদ্রে কচি লতা পাতাগুলা যে মরিয়া যায়! তাঁহার আসিতেও প্রায় সন্ধ্যা হয়। বড় ছেলে অজিত স্কুল হইতে আসিলে তাহাকে একটা মজুর ডাকিতে বলিতেছিলাম, এমন সময় অকালে —বোধ হয় পাঁচটাও বাজে নাই—অজিতের পিতার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। চাকর নাই, তাঁহার কাজ আমাদেরই দেখিতে হইবে; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেছি, দূর হইতে সানন্দ স্বরে তিনি বলিলেন, "আজ কোন কায নেই তাই চলে এলাম। আর জান, তোমাদের নাথুয়ার চিঠি পেয়েছি। সে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "কবে আসবে, কিছু লিখেছে?"

"লিখেছে বৈ কি! তার ভয়ানক অসুখ গেল, মরতে মরতে বেঁচেছে; তাই আমার চিঠির উত্তর দিতে পারে নি। কাছারির কোন্ বাবুকে দিয়ে লিখিয়েছে—"

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি বলিলাম, "তারপর আসতে পারবে ত?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, সেইটেই এখন কথা। সে লিখিয়েছে কি, শুনবে? লিখিয়েছে, তার হাতের পয়সা-কড়ি সব ফুরিয়েছে, খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু তবু তার বৌ তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। বড্ড বেশী অসুখ করেছিল কি না, মেয়েটা তাই বলছে, মনিব-বাড়ী দাসীর কায করে দুটি-দুটি খেতে পেলে স্বামীর সঙ্গে সেও আসে। সম্পূর্ণ না সাম্লা পর্য্যন্ত কিছুতেই সে নাথুয়াকে ছেড়ে দিতে পারবে না। ঘরে কিছু নেই, খেতে পায় না, এত দিন কষ্টেসৃষ্টে সেই চালাচ্ছিল—"

অনেকখানি বিস্ময়ের মধ্যেও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামীর দুরবস্থার সময় স্ত্রীর এমন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তবুও নাথুয়ার বৌ, সেই তরুণী মেয়েটি দুঃখ করিয়া সংসার চালাইতেছে শুনিয়া অনেকখানি ঔৎসুক্যের সহিত তাহার প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মিল। কিন্তু হাসি পাইল স্বামীর সঙ্গে তাহার আসিবার জিদ শুনিয়া। পাঁচ জনের পরামর্শে, তাহাদের দেশের অভ্যাসে না হয় অল্প বয়সেই সে কিছু বিশেষ রকম "গুছুনে মেয়ে" হইয়াছে, তাই বলিয়া এখনি তাহার এত বুদ্ধি হয় নাই যে অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া আসিবে, সর্ব্বোপরি স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না! এ সব নাথুয়ার দুষ্টামি, ছেলেটা বছর দুই বাংলা দেশে থাকিয়া বাঙ্গালীর অভ্যাস শিখিয়াছে! যাইবার সময়ও ত এমনি বায়না ধরিয়াছিল!

তা হোক, কথাটা আমার স্বামীর ন্যায় আমারও ভাল লাগিল। গোশালার পার্শ্বে আস্তাবলের জন্য দুখানা ঘর পড়িয়াই আছে—তাহারা আসে ত ঐখানেই থাকিবে।

সব শুনিয়া খুড়িমাও খুসী, কিন্তু তেজের স্বরে বলিতেছিলেন, "হাঁ, মাইনে অমনি পড়ে আছে! একরত্তি মেয়ে—নোংরার হাড় ভোজপুরে, তিনি কি রাজ্যি-পাট ঘুরোতে আসবেন যে তাঁকে মাইনে দিতে হবে? উঃ! ভারী এ আর কি! কল্‌কাতা সহরে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকুক দেখি—"

টাকা-পয়সার অত সূক্ষ্ম হিসাব আমার স্বামী ভালবাসিতেন না। নিজেই তিনি মজুর ডাকাইয়া ঘর পরিষ্কার করাইয়া দিলেন; আমায় বলিলেন, "নতুন দেশে হঠাৎ এসে পড়বে, দুটোই বাচ্ছা—হাতে কিছু নেই; তুমি একটু দেখো।"

ওদিকে ছোট খোকা সশব্দে লাফাইতেছিল, "নাথুয়ার বৌ আসবে রে।" খুকী তাহার পুতুলটা কোলে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার কাছে আসিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "মা, এইটে আমি নাথুয়ার বৌকে দেব।"

৪

সেদিন রাত্রের ট্রেনে তাহাদের আসিবার কথা। হাওড়ায় লোক গিয়াছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে স্মরণ হইল, তাহারা আসিয়াছে ত! জানালার পানে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, নাথুয়া দাঁড়াইয়া—বাবুর শুখনা কাপড়গুলি

তুলিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে নূতন চাকরটার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন, পুরন্ত গাল দুইটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এত অসুখ হইয়াছিল তাহার? দেখিলে চেনা যায় না যে!

ছেলে-মেয়েরা ঘুমাইতেছিল; নাথু আসিয়াছে শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিল। কলে তখন জল আসিয়াছে,—বাহিরে রৌদ্র, আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম।

খুড়িমাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু ও কে আবার? একটা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক একগোছা বাসন লইয়া যাইতেছে। রান্না-ঘরের বারান্দা, সিঁড়ি পরিষ্কার ধোয়া-মোছা; চৌবাচ্চার চারিদিক ঘষিয়া মুছিয়া জল ছাড়িয়া দিয়াছে। নাথুয়া যাওয়ার পর এমনটি ঘটে নাই, আমার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু নাথুয়া রুগ্ন শরীরে এতটা করিতেছে কেন? সে কোথায়? আর এই স্ত্রীলোকটিই বা কে? তাহার বউ ত নয়, ইহার বয়স প্রায় আমারই মত যে! এ কাহাকে সঙ্গে আনিল? ইহার কথা কিছু লেখে নাই ত সে!

আমার পায়ের শব্দ পাইয়া স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া চাহিল; তাহার পর বাসন নামাইয়া দূর হইতে হিন্দুস্থানী প্রথায় নমস্কার করিল। সহসা কি বলিব—ভাবিতেছি, ততক্ষণে সে হাত ধুইয়া আমার নিকটে আসিয়া পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "গোড়ে লাগেইছি।"

ইতিমধ্যে খুড়িমাও আসিলেন, বলিলেন, "এ কে বৌমা, ঝী না কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঝী কেন? নাথুয়ার সঙ্গে এসেছে, কি জানি তার কে?"

সেও আমার কথার সঙ্গে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হাঁ বুড়া মায়ি, পরণাম"— কথা শেষ হইল না, দূরে নাথুয়া আসিতেছে দেখিয়া সে খুড়ীকে প্রণাম করিয়া বাসন উঠাইল। তাহার গাল-ভরা হাসির সহিত সসম্ভ্রম বিনয়টুকু আমার বেশ লাগিতেছিল। বেশ-ভূষাও অপরিচ্ছন্ন নয়, সিঁথি-ভরা সিন্দুর থাকিলেও চুল-বাঁধাটি পরিপাটী; হাতে সোনালী পাত-মোড়া গালার চুড়ি, ছেঁড়া হইলেও সদ্য-ধৌত কাপড়খানিকে পলাশের রং করিয়াছে। কলতলায় বসিল, তাও বেশ সাবধানে, কাপড় বাঁচাইয়া। আমি তাহার প্রতিই চাহিয়াছিলাম, নাথুয়া তাহার অভ্যাসমত বুকে দুই হাত বাঁধিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

"ওগো বৌমা, ছোঁড়া কি হয়ে গেছে, ছাখ্! তোর কি অসুখ হয়েছিল রে নাথুয়া?"

খুড়ীর প্রশ্নে সে "বোড়ো অসুখ—বোখার আসেছিল মায়ি—" বলিয়া হাসিতে লাগিল; কিন্তু অদূরে উপবিষ্টা সেই রমণী স্নেহস্বরে আকৃষ্ট হইয়া মুখ তুলিল। তাহার দৃষ্টি কৃতজ্ঞতার ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে ছল-ছল করিতেছে, সমস্ত মুখখানিতে ভীত বেদনার সুস্পষ্ট আভাস। সে দুই হাত জোড় করিয়া খুড়িমার উদ্দেশ্যে বলিল, "মরি যাইছেলেই মায়ি! বৈদ্ ছোড়ি দেল্কেই গামক্ লোক কি মানি কহেঁ লাগ্লেই, তবে হাম্মে কহি কি, —ডাগদরে দেখেইব, ডাগদরে দেখেইব'—এ মাই সেহে কি থোড়া রূপেইয়াক বাত?"

সহাস্যে বাধা দিয়া নাথুয়া বলিল, "চুপি

রহ! তোরহা বাৎ মাইজি ত্যারুঁ নেই সমঝতেই।" তাহার পর আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ও এখোন দেশরং কথা বোল্‌ছে, লেকিন থোড়া দিনেই শিখে লিবে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা সে হবে, কিন্তু তোর বৌ কই?. এ কাকে এনেছিস?"

খুড়ী বলিলেন, "বৌ হয় ত পড়ে ঘুমুচ্ছেন।"

নাথুয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "নেহি মাম্নি ঘুমাবে কেন? বিহান্ পর আবিকে আমি ওকে সব কাম শিখ্‌লিয়ে দিছি, চৌকা বর্ত্তন তামাম বাৎলিয়ে বাবুর হুক্কায় জল ভরতে যাচ্ছিলাম।"

"তোর বৌ?—কোথা গেল তবে সে?"

তাহার পাণ্ডু মুখে এক ঝলক্ স্নিগ্ধ হাসি ঝরিয়া পড়িল। শিশুর মত উচ্ছ্বসিতভাবে আঙ্গুল তুলিয়া নাথুয়া বলিল, "ঐ যে বহু! দেখছেন নাই? ও আপলোগের কাম করতে লাগিয়েসে।"

'বহু' মুখ তুলিয়া সকলের প্রতি, পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। এই নাথুয়ার বউ? খুড়িমা কত কি বকিয়া যাইতেছিলেন, আমি কিন্তু বিস্ময়ে,—বুঝি একটু ভয়েও—অবাক হইয়া গেলাম। তরুণ বালক নাথুয়া, ঐ যৌবনোত্তীর্ণা বয়স্কা নারী তাহার স্ত্রী? এ কি অসম্ভব ব্যাপার! এমন কাণ্ড যে ঘটিতে পারে, স্বপ্নেও আমার তাহা জানা ছিল না! কেমন করিয়া ইহা ঘটিল? পরে শুনিলাম, এমন ঘটনা তাহাদের দেশে সর্ব্বদাই চলিতেছে; তাহাদের সকল ঘরেই প্রায় এই ব্যাপার। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

এমন অদ্ভুত কাণ্ডে যাহা হয়—চারিদিকে হাসাহাসির গুপ্ত প্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের কৌতূহল-প্রশ্নের মধ্যে পড়িয়া বউ একটু বিরক্তও হইল। এ ব্যাপারের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসম্ভাব্য থাকিতে পারে, তাহা সে বুঝিতেও পারে না। বুঝিলাম, দেশাচার ও অভ্যাসের বশে আমরা যাহা এমন কুৎসিত দেখিতেছি, সেই ধারণার জন্যই ঐ অসম দম্পতীর পক্ষে তাহা স্বাভাবিক ও সুন্দর। বধূকে নিকটে পাইয়া নাথুয়ার আনন্দের সীমা ছিল না, সুখে দুঃখে সমানভাবে সে পত্নীর কাছে ছুটিয়া যাইত। আর সেই পরিণত-স্বভাবা স্ত্রী, তাহাকে ঠিক্ স্বামীর ভাবে নয়—যেন স্নেহ-বৎসলা জননীর ন্যায়, সোহাগে, আদরে, কখনও বা বিরক্তি-ভৎর্সনায় লালন করিতে থাকিত। স্ত্রী স্বামীকে যত্ন করে, জানি, কিন্তু এই সতত স্নেহ-ব্যাকুল ভীতি-সমাচ্ছন্না আদর-পরায়ণা নারীর ন্যায় এ ভাবের বিকাশ তাহাদের মধ্যে দেখা যায় কি? ভালবাসার প্রকৃতি-ভেদ আছে, রূপান্তর আছে; পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ এক নয়। তাহারা বুঝুক না বুঝুক, আমরা সকলেই বুঝিলাম, ইহার নিকট নাথুয়া অপর্য্যাপ্তভাবে যাহা পাইতেছে, তাহা যতই অমূল্য, যতই প্রচুর হোক্ না কেন, সে ভালবাসা যৌবন-বাঞ্ছনীয় নারী হৃদয়ের চাঞ্চল্য—প্রেম নয়। সাধারণ দৃশ্যে এখন তাহাদের গৃহচিত্রখানি দেখিতে বেশ, কিন্তু ভবিষ্যৎ?

নাথুয়ার স্ত্রী যতখানি পারে, কাজে ভাগ বসাইত। নাথুয়া কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিলেই সে ছুটিয়া গিয়া বাধা দিত। ফলে

বাবুর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল; তাঁহার ঘরখানি, আস্‌বাবপত্র, ও ছোট-খাটো ফর্‌মাস্ লইয়াই নাথুয়া বাবু হইয়া বসিল। এদিকে ঘর-কন্নার যত-যা কাজ বৌয়ের কাছে আটকাইত না। হিন্দুস্থানী মেয়েরা পরিশ্রমী হয় জানিতাম, কিন্তু এমন বুদ্ধিমতী ধীর পরিচ্ছন্ন-স্বভাব স্ত্রীলোক যে তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে, এ ধারণা ছিল না।

সে দরিদ্রা, দেশে অন্নকষ্টের সহিত চিরদিন যুদ্ধ করিয়া খাদ্যাখাদ্যের লোভ বলিয়া কিছুরি ধার ধারে না; দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া সে যেন কৃতার্থ। মাহিনার নাম শুনিয়া জিভ্ কাটিয়া বলিত, সে যে মায়ীর ছেলে, আপনাদের ভাই, ঘরের বৌকে কি আপনারা বাঁদী করিতে চান্ বহুজি, তাই মাহিনার কথা বলিতেছেন?

বাবু শুনিয়া একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "বৌটিকে তোমরা যত্ন করিয়ো।"

খুড়ীর কিন্তু আনন্দের সীমা নাই! নাম মাত্র খরচে এমন মনোমত দাসী কোথায় পাওয়া যাইত? আর নিজের স্বভাব-গুণে ও কর্ম্মেই সে সকলের স্নেহ-যত্ন কাড়িয়া লইয়াছে!

অল্পদিনের মধ্যেই সে খুড়িমার প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িল। "নাথুয়া আর কিছুই করে না, বৌটো খেটে খুন হচ্চে—" বলিয়া মাঝে মাঝে তর্জ্জন চলে। বধূরও আমাদের প্রতি ভক্তির সীমা নাই। কিন্তু কি জানি কেন, মুখে যাহাই বলি, বা কাজ সে যতই দেখাক্, অন্তরের মধ্যে সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণা নারীর প্রতি আমার তেমন সহানুভূতি ছিল না। জানি না, কেন! কিন্তু সে যে নাথুয়ার স্ত্রী—ঐ সদ্যবিকশিত নবীন প্রাণটির চির-সঙ্গিনী, এই বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া—ইহা আমার কোন মতেই ভাল লাগিত না। আমাদের সংসারে মনোযোগিনী সহকারিণী ভাবিয়া তাহাকে ভাল বাসিতাম, তাহার স্বভাব-গুণে হয়ত তাহাকে শ্রদ্ধাও করিতাম, কিন্তু এই বিসদৃশ মিলনের কথা মনে করিয়া আমার শুধু রাগই হইত; তাহাদের দেশের নিয়মের উপর, উহাদের মাতার উপর এবং সেই সঙ্গে সেই রমণীর উপরও বিরক্তি জন্মাইত। যতই স্নেহ থাক্, এই বালকের জীবনটি কি সত্যই উহার দ্বারা সার্থক হইয়া উঠিবে? আমাদের দেশের শিক্ষাগত সংস্কার বারবার বিরোধী হইয়া বিদ্বেষী হইয়া সেই নির-পরাধিনী নারীর উপর অন্যায় করিতে লাগিল।

কেন এমন হইয়াছে! নাথুয়ার মুখে সহাস্য উত্তর, "আমাদের দেশে এমনি হয়।" কি বিশ্রী দেশ! এই বিবাহের ফলে অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটে,—না, থাক্! সে কথা নিশ্চয় এখানে খাটিবে না। নাথুয়ার স্ত্রীর দিকে চাহিলে, তাহার স্বভাবের উপর কাহারও এতটুকু সন্দেহ আসিতে পারে না। তবু, কি জানি, তবু কেন আমার তাহা ভাল লাগিত না।

কিন্তু তাহারা পরস্পরে এত সুখে ছিল যে দেখিয়া আমাদের সুখী বঙ্গদম্পতীকেও আশ্চর্য্য—এমন-কি ঈর্ষান্বিত হইতে হয়। ও বাড়ীর ঝীটা প্রায় বলিত, "মাগীর না হয় তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ছোঁড়াটার মন রাখবার জন্য দিন-রাত সিঁদুর টিপ্ কেটে বেড়াচ্চে, কিন্তু ও মুখ-

পোড়াটা কোন্ লজ্জায় ঐ বুড়ীর সঙ্গে রং করে মরে? মাগো, ছিঃ—ঘেন্না!"

৫

কয়দিন হইতে আমার ছোট ননদ আসিয়াছে। আজ সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেই ঝী তাহাকে কি বলিতেছে। নিকটে খুড়িমাও আছেন, কি কথা জানি না—কিন্তু তাহা লইয়া সকলই হাসিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

আমি নিকটে আসিয়া বলিলাম, "তোমাদের এত হাসি কেন গা?"

খুড়ী বলিলেন, "আর কি—নাথুয়া আর তার বৌ! না হেসেও থাকা যায় না, সত্যি।"

তখন ঝীর মুখে শুনিলাম, আজ বৈকালে খাবার আনিতে গিয়া নাথুয়া নিজের বৌয়ের জন্যও সন্দেশ ও রাবড়ী কিনিয়া আনিয়াছে,—এতক্ষণ দুইজনে মিলিয়া কত হাসাহাসি আদর-সোহাগ করিয়া তাহা খাইতেছিল। উপসংহারে ঝীটা বলিল, "কি করে এত করে? ছোঁড়াটা কি—বল ত মা?"

আমরা জানিতাম না যে বউটা দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছে। ঝীর কথা শেষ হইতে না হইতে সে আপনার স্বভাব-বিরুদ্ধ তীব্রস্বরে বলিল, "কি করে, কেন করে, তাহা তোমরা বুঝিবে না জানি, কিন্তু যদি মাথার উপরের ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে তিনিই ইহার উত্তর দিতে পারেন।"

সে হিন্দুস্থানীতেই কথা বলিয়াছিল, আমাদের রসগ্রাহিণী ঝী তাহার কতক বুঝিল কিছু-বা বুঝিল না; একটু থতমত খাইয়া গোল করিয়া বলিল, "অ—ইনি আবার কোত্থেকে বেরুলেন? আমি মায়েদের সঙ্গে কথা কচ্চি—তোমার তাতে কি বাবু!" মেয়েটা বোধ হয় প্রকাশ্য কলহে তেমন পটু নয়—কিম্বা হাতে কাজ, সময় নাই,—যাহা হউক মুখের কথা মুখে লইয়া সে সটান্ পলায়ন দিল।

বউ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চোখ দুইটা অসম্ভব উজ্জ্বল হইলেও, ক্রমে পাতা নীচু হইয়া আসিতেছিল। আমি নিজেও লজ্জিত হইয়াছিলাম। ব্যাপার দেখিয়া খুড়িমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, —"ওরে বৌ, মশ্‌লা বেটে রাখিস্ নি বাছা, রান্না কিসে চড়ে বল্ দেখি?"

"দিই। কিন্তু মা, আমার একটা কথার উত্তর দাও। তোমরাও কি আমায় দেখিয়া অমনি হাস?"

খুড়ী আমার দিকে চাহিয়া ইতস্তত করিতেছিলেন, আমি কিন্তু স্পষ্টই বলিলাম, —"তুই দুঃখ করিস্‌নে বৌ, হাসিনে—কিন্তু আমাদের দেশে ত এমন হয় না, তাই তোদের দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়—অনেকে হাসেও।"

"কেন হাসিবে বহুজি, আশ্চর্য্যই বা কেন হইবে? আপনারা ত আমাদের কথা কিছু জানেন না, ও কি শুধু আমার স্বামী, না, আমি উহার স্ত্রী বলিয়াই সে এত করে?"

ইহার পর সে অনেক কথা বলিয়া গেল। নাথুয়ার দরিদ্রা মাতা 'বহু'র অপেক্ষা-কৃতা ধনশালিনী জননীর প্রতিবেশিনী ছিল। দুইজনের সখীত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ জড়াইবার

জন্য উভয়েই প্রতিশ্রুত ছিল যে তাহাদের পুত্র-কন্যা জন্মিলে বিবাহ দেওয়া হইবে। হইয়াছিলও তাই, কিন্তু তখন তাহার মাতা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর সময়ও সে বলিয়াছিল, "রুকা আমার সত্য রাখিস্, অমুকের ছেলেকেই বিবাহ করিস্।"

তখন শিশুর বয়স এক বৎসর মাত্র, রুকা বারো-তেরো বৎসরের কিশোরী। অনেকে অনেক কথা বলিল, গ্রামের মোড়ল নিজের পুত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ পাঠাইল, কিন্তু সে তাহা শুনিল না। তাহার পর নাথু যখন তিন বৎসরের, তখন তাহার মাতাও হঠাৎ এক রাত্রির কলেরায় পুত্রকে ছাড়িয়া গেল। রুকা তাহার নিকটেই ছিল, মৃত্যুকালে চিরদুঃখিনী বিধবা ভাবী পুত্র-বধূর হাতেই শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিলেন।

যত শীঘ্র পারে বিবাহ শেষ করিয়া সেই অবধি সে তাহার ক্ষুদ্র স্বামীটিকে লইয়া আছে। কত দুঃখ, কত বিপদ চলিয়া গেল, অসহায় পাইয়া আত্মীয়েরা তাহার উপর অত্যাচারের শেষ রাখিল না, মোড়লের লোকেরাও সে বিরোধে জ্ঞাতিদের সহিত যোগ দিয়া বালিকাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল। লোকের বাড়ী ধান কুটিয়া ময়দা পিষিয়া এতদিন ধরিয়া সে স্বামীর সেবা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে বৎসর বড় আকাল—বড় দুর্ভিক্ষ ছিল, মজুরী করিয়া পয়সা মিলিত না, নাথুয়ার খাইবার কষ্ট হইতে লাগিল। তাই সে যখন বলিল যে কলিকাতায় গিয়া কাজ করিলে অনেক পয়সা হয়, তখন গ্রামের একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গ পাইয়া তাহাকে সে এই দূর দেশে পাঠাইয়াছিল। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহার অনাহার-শুষ্ক মুখও ত চোখে দেখা যায় না!—তাই অনেক দুঃখেই সে স্বামীকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল। পরে যখন আবার তাহার পীড়া হইল, সে অসুখের পর রুগ্ন শরীরে পথ্যাভাব ঘটিল, তখন সে তাহাকে লইয়া নিজেই এখানে আসিয়াছে।

তাহার এই সব পূর্ব্বাপর ঘটনা, চিরজীবনের এত কষ্ট—সে কাহার জন্য? —ঐ মাতৃহীন অনাথ শিশুকে সে না দেখিলে তাহার কি হইত?—স্বামীর সেবা, স্বামীকে ভালবাসা সে ত স্ত্রীলোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য! কিন্তু তাহার স্বামী—সে কি সত্যই সব-স্ত্রীলোকের সকল স্বামীর মতই?—রুকা যাহা করিয়াছে ও করিতেছে, ধর্ম্মের কাছে নাথুয়া কি তাহার কোন বাঁধনে বাঁধা নয়? —সন্দেশ-রাবড়ী সে চায় না, কিন্তু যে স্নেহে ও আদরে স্বামী তাহা আনিয়াছিল, সে ভালবাসা ষোল আনাই তাহার প্রাপ্য নয় কি—এই বিচার-ভার আমাদের উপরেই ফেলিয়া বউ তাহার জীবন-কাহিনী শেষ করিল।

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইতে ছিলাম না। কি জানি কেন, তাহার কথা শুনিয়া বুকের মধ্যে একটা বেদনার খোঁচা বাজিতেছিল। তাহার জন্য কি? হাঁ, তাহা ত বটেই! কিন্তু তবু? বেচারা নাথুয়া!—আহা, ভগবান তাহাকে এই স্ত্রীর সাগর-তুল্য স্নেহের মধ্যেই চিরদিন ডুবাইয়া রাখুন; দুঃখ-কষ্টের ছায়াও যেন তাহার জীবনটিকে স্পর্শ না করে! সে সুখী

হোক্,—তাহা হইলেই এই স্নেহাতুরা ধৈর্য্যশীলা নারীর সমস্ত ভালবাসা ধন্য হইবে।

আমি নীরব ছিলাম, কিন্তু খুড়ী আপন মনেই বলিতেছিলেন, "বেশ করেছিস্ বাছা, বেশ করেছিস্। তোদের দেশে যদি হয়ই —তা কর্ব্বি না কেন? নাথু বেঁচে থাকুক্—তোর সুখ হবে বৈ কি।" তখন সে আমাদের পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, "ঐ আশীর্ব্বাদই কর তোমরা, সে যেন কখনো দুঃখ না পায়।"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তার আলো দেয়ালে আসিয়া পড়ায় সম্মুখটা উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, আর সব আঁধার। বউ ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেল।

৬

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের সংসারে বড় খুকীর বিবাহ ছাড়া আর কোন নূতন ব্যাপার কিছু ঘটে নাই। নাথুয়ারাও স্বামী-স্ত্রীতে ভাল আছে। তাহাদের আবাস-কুটীর দুইটিকে তাহারা নিজেরাই ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইয়াছে।

কলিকাতা সহরটা সম্বন্ধে কোনকালেই আমার অভিজ্ঞতা হইবে না দেখিতেছি! আমি ভাবিতাম, ইহা আমাদের বাঙ্গলা দেশের শুধু বাঙ্গালীরই রাজধানী, অন্য কোন দেশের নরনারীর সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। কিন্তু নাথুয়াদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতায় দেখিলাম, এই একটা মাত্র চাকরের সম্পর্কে যতগুলি হিন্দুস্থানী আসিয়া জুটিতেছে, একজন বাঙ্গালীর বন্ধুত্বে কখনও এত জনতা হইত না। স্বামী বলিতেন, "নিকটে ত আর কোথাও জাত-ভাই নাই, তাই যাকে দেশের লোক দেখে, তার ওখানেই সব ঝুঁকে পড়ে।"

সত্য বটে, তবু যে কয়জন 'জাতভাই' চোখে পড়িতেছে, তাহারা ত নিত্য নূতন ও অগণন! পরিচিতের মধ্যে রুকার মাতুলকেই প্রায় দেখিতাম। নিকটে তাহার চাচা-চাচীরাও কোথায় থাকে। ছট্‌পরবের দিন বা হোলির সময় এই পরিবারগুলিতে উৎসব পড়িয়া যাইত। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া চেঁচামেচিতে খুড়িমা বিরক্ত হইলেও আমার মন্দ লাগিত না। হাসি-ভরা মুখে বহুজি-সম্বোধনে আবীরের থালা আনিয়া নাথুয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইত, বেশী দাম দিয়া সুগন্ধি রং-ভরা কুম্‌কুম্ কিনিয়া আমায় উপহার দেওয়া তাহার ভারি সাধ! —আর রুকা? আমার নিষেধ-সত্ত্বেও কয় দিন ধরিয়া ঠেকুয়া ও পুয়া খাওয়াইয়া ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ বাধাইত। সেই অদ্ভুত মিষ্টান্নের মধ্যে উহারা কি যে স্বাদ পাইত, জানি না, মার খাওয়ার পরও কিন্তু তাহারা ঠেকুয়া খাইতে ছুটিত।

কিন্তু এবারের হোলিতে তাহারা বড় দুশ্চিন্তায় ছিল; রুকার মামার বড় অসুখ তখন। চিকিৎসা হইতেছিল কি না জানি না, শুনিলাম ডাক্তার বলিয়াছে, সে আর বাঁচিবে না।

শুধু আমাদের শিশুদের জন্যই বউ কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিল, আর কোন আয়োজন মাত্র না করিয়া কয়দিনের ছুটি চাহিল। নাথুয়ার যে খুব উৎসাহ ছিল, তা নয়, তবু বধূর ব্যগ্রতায় সেও যথাসাধ্য মামাশ্বশুরের সেবায় যোগ দিত।

বউ যাওয়ার পাঁচদিন পরে নাথুয়ার কাছে শুনিলাম, সেই বৃদ্ধটির মৃত্যু হইয়াছে। তাহারও স্ত্রী-পরিবার সঙ্গে ছিল। দিন-মজুরের গৃহস্থালী, এই বিপদে তাহারা বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। আমার নিকট টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য নাথুয়া তাহার স্ত্রীর হাঁসুলী বাঁধা দিতে আসিয়াছিল, বকিয়া ঝকিয়া অমনই টাকা কয়টা দিলাম।

দশ-বারো দিন পরে রুকা ফিরিল। দেখিলাম, এই কয়দিনেই সে রোগা হইয়া গিয়াছে। আমি ফেরত দিলেও সে হাঁসুলী তাহার গলায় নাই, শুনিলাম, মাতুলের শেষ কার্য্য করিবার জন্য সেটি সে মাতুলানীকে দিয়া আসিয়াছে। গল্প শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার মামার এই দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যাটি উপযুক্ত গৃহিণী ছিল না। স্বামীর উপার্জ্জন সমস্তই খাইয়া উড়াইয়া দিয়াছে, সঞ্চয় বলিয়া কিছুই রাখে নাই। তাই রুকা কি করে? মাতুলের অধোগতি ত আর দেখিতে পারে না!

সে ভাল কথা, কিন্তু সে আর-একটি বোঝা মামার গৃহ হইতে বহিয়া আনিল কেন? তেরো-চৌদ্দ বৎসরের এক মেয়ে, রুকার মামার প্রথমা পত্নীর কন্যা শুনিলাম। নাথুয়ার সংসারে স্থায়ীভাবেই সে বাস করিতে আসিল। বিমাতা তাহাকে কোন কালেই দেখিতে পারিত না, এখন মুক্তি পাইয়া সে ভাইয়ের কাছে চলিয়া গেল, অনাথা মেয়েটি—রুকা তাহাকে ফেলিবে কোথায়?

আমরা ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিলাম, কি জানি কেন, ঐ পিতার মৃত্যুতেও মালিন্যহীনা চঞ্চলা বালিকাটিকে আমার ভাল লাগিতে ছিল না। কিন্তু আমার স্বামী তাহাতে বিরক্ত হইলেন। "স্ত্রীলোকদের মন ভাল নয়, সবেতেই বিরক্ত হওয়া তোমাদের স্বভাব। মেয়েটি না খেয়ে মরত কিম্বা তার চেয়েও যা খারাপ—সেই পথ ধরত। বউ ঠিক কাজ করেছে, আমি ওর মাইনে ঠিক করে দেব।" বলিয়া নাথুয়ার বউকে ডাকিয়া বালিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

নাথুয়াও কিন্তু স্ত্রীর কার্য্যে সুখী হয় নাই। বলিল, "ঘর খাঁউ কি বাহার খাঁউ বহুজি? দুরোজ বাদে ছৌঁড়িকে দেশ ভেজি দিব। কোনো আদমী ঘর যেতে লাগলেই—ওকে সঙ্গে লাগাব।"

৭

কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, সর্ব্বদা তাই ঘটে না। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু রুকার ভগিনী সুরতীর আর দেশে যাওয়া হইল না। প্রথম-প্রথম যাওয়ার কথা বলিলে রুকা স্বামীর উপর রাগ করিয়া কান্নার উপক্রম করিত, পরে দেখিতেছি নাথুয়াও আর সে-বিষয়ে কোন কথা বলে না।

প্রথম যখন আসে, সুরতী তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত; ভোরে আমাদের উঠানে বসিয়া রুকার কাজে সাহায্য করিত। ক্রমে সে ভাব ঘুচিয়া আসিতে লাগিল; এত কাজ করা তাহার অভ্যাস নাই, খাটিতেই যদি হইবে, তবে অন্যত্র মাহিনা লইয়া থাকিবে না কেন?—ইত্যাদি কড়া কথায় সে আর এদিকে আসে না। রুকা বিরক্ত হইলেও কিছু বলিত না।

এমনি করিয়া কয় মাস কাটিয়া গেল। কি জানি কেন, রুকার মুখ যেন পূর্ব্বেকার চেয়ে গম্ভীর বোধ হইতেছে। খুড়িমা প্রায় অনুযোগ করিতেন, "বউটো আগের মত মন দিয়ে কাজ করে না।"

আমারও মন যেন কিসের আশঙ্কায় মৃদু পীড়া বোধ করিত! যাহা অসম্ভব নয়,—এমনি কোন বেদনাকর ঘটনা সম্মুখে থাকিলে সর্ব্বদাই যে ভয় হয়,—তেমনি! হয় ত এ ভয় মিথ্যা—তবু!

কিন্তু না, তাহা মিথ্যা নয়। যাহা সন্দেহ ছিল, অস্পষ্ট ছিল, ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর সেই ঝীই—যেন সে নাথুয়ার বৌয়ের কত আত্মীয়া,—সে একদিন চুপি চুপি বলিল, "বউটা ত আপনাদের কাজ নিয়ে পড়ে আছে মা, তার ভাল-মন্দর ভার আপনাদের উপর। সে এখানে থাকে আর ছোঁড়া-ছুঁড়ি ওদিকে কি কীর্ত্তি বাধাচ্ছে, তা টের পাও কি?"

আঁধারের মধ্যে হঠাৎ যেন সত্যের বিদ্যুৎ ঝলক্ দিয়া গেল। তবু আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দূর, ও কথা বলতে নেই, নাথুয়া তেমন ছেলেই নয়।"

"নাথুয়া ভাল হলে কি হবে মা? মেয়েটা কেমন, তা দেখতে পাও না? আমার কথা বিশ্বাস না হয় ত জগুয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস্ কর দেখি।"

জগুয়া আমাদেরই চাকর; সে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ঝীর আহ্বানে ব্যাপার বুঝিয়া "আমার ও-সবে কাজ নেই বাবু—" বলিয়া টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল।

ঝী আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু আমার আর সে সব কথা ভাল লাগিতেছিল না। দূরে রুকা বাসন মাজিতেছে; সে আমাদের কথা শুনিয়াছে কি না জানি না, তবু তখন তাহার পানে চাহিতেই আমার নিজের বুকটা যেন ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। এতদিন ত আমি ইহাকে এমনি কারণেই কত বিরক্তি দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝি আমার সর্ব্বান্তঃকরণ তাহার ভাবী বেদনার চিন্তায়—লজ্জায়—ঘৃণায়—ক্লান্ত হইয়া পড়িল!

ঘটনাটা সত্য কি? বউকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু না—কোন প্রয়োজন নাই, একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গতি ও ভঙ্গী দেখিয়াই আমার সকল সংশয় দূর হইল। লক্ষ্য করিয়া ত দেখি নাই, কিন্তু এই কয় দিনেই স্ত্রীলোকটি এ কী হইয়া গিয়াছে! মুখে সে কোন কথাই বলে না, কিন্তু সেই শুষ্ক চোখের দৃষ্টিটুকুতেই তাহার সর্ব্বস্বান্ত হৃদয়ের সমস্ত হাহাকার ভাসিয়া উঠিয়াছে যে!

কি করিব? আমার দ্বারা কি ইহার প্রতিকার সম্ভব? যদি কিছু হয় ভাবিয়া স্বামীকে সকল কথা বলিলাম। তাঁহারও মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "না, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে কাকে দোষ দি? আমরা যে সবাই ভুল করেছি। সংসারটা এমনি—যাক্, দেখি, যদি কোন উপায় হয়।"

কয় দিন পরে শুনিলাম, নাথুয়াদের বাড়ীতে সুরতীর সেই বিমাতা ও মামা আসিয়া উপস্থিত। সুরতীর না কি বর

জুটিয়াছে, শীঘ্রই বিবাহ,—তাহারা মেয়ে লইয়া যাইবে।

খুড়ী বলিলেন, "যাক্ বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!"

রুকারও মুখ অনেকখানি মেঘমুক্ত দেখিলাম। তবু যেন তাহার চোখের উপর কি-এক সজল-ভাব চক্-চক্ করিয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোকের মন! অভিমানে আত্মসম্মানে সান্ত্বনার স্পর্শটুকুও তাহার অসহ্য। আমারও কান্না আসিতেছিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, পরদিন প্রভাতেই রুকা আসিয়া আমার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বলিল, "কি করিতে কি হইল বহুজি? আমি কি করিব, তাহা তোমরাই বল।"

কি হইয়াছে? প্রশ্নে জানিলাম, নাথুয়ার বিশ্বাস যে বউই ষড়যন্ত্র করিয়া বাবুকে বলিয়া সুরতীকে তাড়াইয়াছে। তাহার মায়ের এমন গরজ বা পয়সা নাই যে এক কথায় বর জোগাড় করিয়া বিবাহ দিতে বসিবে! নাথুয়া বলিয়াছে,—সে আর এ দেশে থাকিবে না, জন্মে মুখ দেখাইবে না, হয়ত "গঙ্গাজিমে ধঁস্"ও দিতে পারে! এমনি কত কি! রুকা বলিল, "সে মিথ্যা বলে নাই। ছেলেবেলা হইতে তাহাকে আমি জানি, চিরদিনের জেদের মানুষ সে; —তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।"

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তাহার প্রতি চাহিতে ভয় হইতেছিল। হায়, আজ তাহার কি দুঃখের দিন! কিন্তু যখন চাহিলাম, তাহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। অজস্র জলের মধ্যেও চোখদুটি যেন উদ্যম ও চেষ্টার প্রখরতায় দীপ্ত হইয়া আছে। স্ত্রীলোকের মনের ভাব স্ত্রীলোকই বুঝে, তবু তখন যাহা দেখিব বলিয়া চাহিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে সে ভাবের উল্টা জিনিষ দেখিয়া আমায় ধাঁধা লাগিল। বলিলাম, "তা এখন কি করবি বল্। যদি—"

"কি করিব তাহাই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি বহুজি। আমার সুখের জন্য সে যে এত কষ্ট সহ্য করিবে, তাহা আমি দেখিব কি করিয়া, বল?"

খুড়ী বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন? ত্যাখ্ না ছোঁড়া দুদিনে ঢিট্ হয়ে যাবে।"

সে আর কোন কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িতে লাগিল। "কলের জল বহিয়া যাইতেছে, ছেলেদের স্কুলের ভাত" ইত্যাদি কথায় খুড়ী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেও সে আজ আর সে কথায় মন দিল না। এমন সময় উপর হইতে বাবু ডাকিলেন, "নাথুয়া—"

তখন বউ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু আমায় আজ ছুটি দিতে হইবে, ঠাকুরাণি!" খুড়িমা কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে তাহাতে কান না দিয়া চলিয়া গেল। বিরক্তভাবে খুড়ী বলিলেন, "এ মাগীরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে!"

কি জানি! তাহার বুদ্ধির কথা ভাবিতে গিয়া কি একটা ভয় হইতেছিল। এই মেয়েমানুষগুলার হতভাগা মন,—সে যে কখন্ কোন্ দিকে ছোটে, তাহা তাহারা নিজেরাই বোঝে না।

বেলা বাড়িতেছিল, তবু নাথুয়া আসিল না। আমাদের সংসারে গোল বাধিবার উপক্রম দেখিয়া আমি নিজেই উঠিলাম। খোঁজ করিয়া দেখা গেল, নাথুয়াদের কুটীর শূন্য। বুঝিলাম, আর তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের আশা নাই।

বাবু বলিলেন, "তাদের খোঁজ নেওয়া উচিত নয় কি?"

আমি বলিলাম, "না, আর কিছুরি দরকার নেই, ভগবান যা করবেন, তাই হতে দাও এবার।"

বাবুর মুখ বড় বিষণ্ণ; তিনি বলিলেন, "যদি কিছু অন্যায় ঘটে?"

যদি অন্যায় ঘটে! হা ভগবান, এমন স্নেহ-বিশ্বাস আত্মদানের পরিবর্ত্তে, তোমার স্নেহের রাজ্যে কি শুধু অন্যায়ই ঘটিবে? সংসারে কি কিছুরি প্রতিদান নাই? তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, কিন্তু বলা, না-বলা সকল কথাই যিনি শুনিতে পান, আমার প্রাণের কাতর অভিমান যেন তাঁহারই পায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। সংসারে নারী জাতিরা কাহাদের জন্য ভাবিয়া মরে? ইহারা সত্যই আমাদের কেহ নয়?

কিম্বা ভুল বুঝিতেছি আমি? পৃথিবীটা ত শুধু মানুষের মন লইয়াই চলে না! তাহার দেহে অস্থি আছে, মাংস আছে,—তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিতেছে! বাহিরের খোলা আকাশের নির্ম্মল বাতাস অবিরাম চেষ্টার ফলেও তাহাকে শীতল করিতে পারিতেছে না। মানুষের প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি-ভরা হৃদয়—সংসারে সে কাহারও দাস নয়—কিন্তু মানুষ চিরদিন তাহার পদানত।—ধিক্!

৮

সকলেই ভাবিতেছিল যে আর তাহারা ফিরিবে না, কিন্তু সে ভুল। দিন-সাতেক পরে সন্ধ্যাবেলায় দেখিলাম, দুইখানি গাড়ী-বোঝাই হিন্দুস্থানী স্ত্রী-পুরুষ নাথুয়াদের দুয়ারে নামিতেছে। ব্যাপার কি? আঁধারে কাহারও মুখ দেখা যায় না,—নানা রঙের কাপড়-পরা, মোটা মোটা মল পায়ে—মেয়েগুলা জটলা করিয়া কি করিতেছে। অল্পক্ষণ পরে সবাই মিলিয়া 'হাউ-হাউ' শব্দে গান ধরিয়া দিল।

কাণ্ডটা কি বুঝিতে পারিলাম না। নীচে নামিতেছি, এমন সময় খোকা দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া বলিল, "মা, নাথুয়া গিয়ে সুরতীকে বিয়ে করে আনলে।"

যাহা সন্দেহ করিয়াছি, তাই। তবু কি জানি কেন, আমারও বুকের ভিতর হইতে খানিকটা মুক্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল, মরি-বাঁচি প্রশ্নের শেষ উত্তর। সম্মুখে নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ছোট চাঁদটিকে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ চাহিতেই মনে হইল, তাহার ম্লান জ্যোৎস্না যেন কান্নার হাসি ছড়াইতেছে!

বাবু রাগ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "তুমি কিছু বলো না, ছাখ, শেষে কি হয়।"

"হবে আর কি, বড় বৌটাকে জ্বালিয়ে মারবে। যাই হোক্—আমার বাড়ীতে আর না।"

"কেন? আহা, না, না, ও কথা বলো না। আমরা ছেড়ে দিলে রুকা বৌটা মরে যাবে।"

তাহাই হইল। বিবাহের খানা-পিনা শেষ হইবার পর তাহারা আবার কাজে লাগিল। রুকা পূর্ব্বের মতই প্রাণপণে সব করিত, কিন্তু নাথুয়া বৌ লইয়াই ব্যস্ত। বউ বেচারী তাহারও কাজ যতদূর-সম্ভব করিয়া দিত। খুড়ী কত প্রশ্ন করিতেন, আমিও লক্ষ্য করিতাম—রুকার

ভাব-ভঙ্গী হইতে ঈর্ষা বা বেদনার কোন চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সে যাহা করিয়াছে, তাহার মধ্যে যে কিছু বাহুল্য ঘটিয়াছে এ কথা সে বুঝিতেই পারে না! অথবা বুঝিতে চায় না?

সুরতী বৌ সাজিয়া ঘর হইতে বাহির হয় না, রুকা তাহারও স্নানের জল আনিয়া দিত, আমাদের বাড়ী হইতে ভাত লইয়া গিয়া খাওয়াইত। আর সপত্নীর সিঁদুর, চুড়ি, রঙিন্ কাপড় গুছাইবার সময় সে যেন পাগল হইয়া যাইত। পুতুলকে কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া বালিকারা যেমন কিছুতেই তৃপ্তি পায় না, এই নূতন খেলায় সেই প্রৌঢ়া নারীও তেমনি মাতিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু আমরা বলি আর না বলি, বাবুর বিরক্ত ভাব নাথুয়া ধরিল। স্নেহময় প্রভুর নিকট এতদিন যাহা পাইয়াছে,—এখন যে তাহার অভাব ঘটিয়াছে, ইহা তাহার তখনকার সেই আনন্দোজ্জ্বল প্রাণে ভাল লাগিল না। হঠাৎ একদিন সে বিদায় চাহিয়া বসিল। শুনিলাম, সে হাওড়ায় কুলির কাজ পাইয়াছে, ঘরও ভাড়া লইয়াছে।

এইবার দেখিলাম, রুকার মুখ মলিন হইয়া গেল। সে যেন আমাদের আশ্রয়-টুকুর উপরই নির্ভর করিয়া এতদিন যুদ্ধ করিতেছিল, এবার তাহাও হারাইয়া অকস্মাৎ সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ব্যথিত হইয়া বলিলাম, "ওরা যাচ্ছে যাক্, তুই এখানেই থাক্ না বৌ! নাথুয়াও তাই বলছে।"

সেও জানিত যে নাথুয়া তাহাকে রাখিয়া যাইবার জন্যই বিশেষ ইচ্ছুক। তিন জনের ভরণ-পোষণ তাহার সাধ্যে কুলাইবে কিনা, এই ভাবনায় সে ব্যস্ত হইয়াছে। আমি নাথুয়াকে বলিবা মাত্র সে এমন সাগ্রহে সানন্দে সম্মতি দিল যে দেখিয়া রুকার মুখ-জ্যোতি একেবারে নিবিয়া গেলেও সে তাহাতেই রাজী হইল।

কিন্তু আবার কি হইল জানি না, পর-দিন শুনিলাম, না, সেও যাইবে, নাথুয়া বলিয়াছে। বাবু বলিলেন, "যা খুসি করুক, ওদের কথায় আর থেকো না।"

যাওয়ার সব স্থির। হঠাৎ যাইবার পূর্ব্ব রাত্রে রুকা আসিয়া বলিল, তাহার যাওয়া আর কিছুতেই ঘটিবে না। প্রশ্ন করিলাম না; কিন্তু স্পষ্ট বুঝিলাম, আজ আবার নূতন-কিছু বিশেষ কথা হইয়া গিয়াছে, রুকা সেদিন কাঁদিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু যাইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "চলিলাম বহুজি।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সে কি রে? এই কাল যে বল্লি—"

"বলিয়াছিলাম বটে! আমার না যাওয়াই উচিত, তোমাদের ঘরে যেমন ছিলাম, আপন শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেও কেহ এমন থাকে না। যেখানে যাইতেছি, সেখানেও আমায় খাটিয়া খাইতে হইবে। কিন্তু দিদি, আমি কি করিব বল না! উহাকে না দেখিয়া আমি বাঁচিব কেমন করিয়া?"

আমি মুখ নীচু করিয়াছিলাম, সে কখন গেল ভাল করিয়া দেখি নাই,—শব্দে বুঝিলাম, তাহাদের গাড়ী ফটক পার হইল। তাহার স্নেহাতুর হৃদয়ের ব্যথাদীর্ণ স্বর,— তখন আমাকেও অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ

যখন হইতে দর্শন-শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, তখন হইতেই মানুষ 'অদৃষ্ট ও পুরুষকার' —এই দুইটা পরস্পর-বিরোধী মত লইয়া তর্ক সুরু করিয়াছে। এ তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নাই ;—কোনকালে যে হইবে তাহাও বোধ হয় না।

অদৃষ্টবাদী বলেন যে, ঈশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তখন সৃষ্ট পদার্থের সকল প্রকার সম্বন্ধ, কার্য্যপ্রণালী ও পরিণাম সমস্তই, তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সৃষ্ট পদার্থের কোন অবস্থাই তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইতে পারে না। মানুষকে তিনিই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন। সুতরাং মানুষ যাহা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা করে বা করিবে, তাহাও তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ মনে করে 'আমিই ইচ্ছা-শক্তির বলে, সকল কার্য্য করিতেছি' ; কিন্তু আসলে সে যন্ত্র-মাত্র ;— যন্ত্রী ভগবান তাহাকে যেমন চালাইতেছেন, সে তেমনি চলিতেছে। যে পথ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার এক-চুল এদিক-ওদিক যাইবার তাহার সাধ্য নাই। অদৃষ্টের সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা তাহার জীবন পদে পদে নিয়মিত।

পুরুষকারবাদী বলেন, যদি তাহাই হয়, তবে ভগবান মানুষকে জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তিই বা দিলেন কেন ? ঐ সকল শক্তি মানুষকে দেওয়ার উদ্দেশ্যই এই যে, মানুষ নিজের নিজের বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা খাটাইয়া নিজে কার্য্য করিবে। অনেক নিম্নস্তরের প্রাণীকে ভগবান ঐ সকল শক্তি দেন নাই। তাহারা যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চতর জীব জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সে কথা খাটে না। নিম্নতর জীবের মত মানুষ যদি যন্ত্র-মাত্র হইত, তবে তাহার পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মই বা কোথায় থাকিত ! যাহার সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট, নিজের কিছুই করিবার নাই, তাহার আবার পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ? সে যাহা ইচ্ছা করুক না কেন,—ভগবানই সমস্তের জন্য দায়ী।

তৃতীয় একদল মধ্যপন্থী দার্শনিক ইহার সামঞ্জস্য করিতে কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা করিয়া-ছেন। তাঁহারা বলেন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা কতকগুলি বিরাট শক্তিদ্বারা চালিত—কতকগুলি বড়-বড় নিয়মে বাঁধা। সে সকল নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় ও অলঙ্ঘ্য। সেই অনুসারে জগদ্ব্যাপার ও সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতেছে। মানুষ এবং তাহার সমাজও সেই বৃহৎ নিয়ম ও শক্তি-সকলের অধীন, কিন্তু মানুষকে আবার ভগবান স্বতন্ত্র জ্ঞান ও ইচ্ছাও দিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র জ্ঞান ও ইচ্ছা যোগে সে—একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারে। তাহার মধ্যে মানুষ পুরুষকার দ্বারা কার্য্য করে ও ফলাফল ভোগ করে, পাপ-পুণ্যের অধীন হয়। সত্যকথা বলিতে গেলে ইহাও অদৃষ্টবাদের প্রকারান্তর মাত্র। কেননা

এই যে ছোট ছোট বিষয়ে মানুষের পুরুষকারকে বজায় রাখিবার চেষ্টা, তাহাতেও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তার বিরোধ উপস্থিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য-জগতে বিজ্ঞানে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন হইল। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, প্রকৃতির নিত্যনূতন রহস্য আবিষ্কার করিতে লাগিগেন। প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে অনেকে নানারূপ অদ্ভুত যন্ত্রাদিও উদ্ভাবন করিয়া মানব-সভ্যতায় যুগান্তর আনিয়া ফেলিলেন। আকাশ, পাতাল, ভূপৃষ্ঠ—কিছুই তাঁহাদের শক্তির সীমার বাহিরে রহিল না বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহার ফলে তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিহত, তাহার পুরুষকার সর্ব্ববাধামুক্ত। এই সৃষ্টির মধ্যে, তাহার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ সে করিতে পারে;—উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত জগৎ আবার নূতন করিয়া গড়িতেও বুঝি পারে। কতকগুলি অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক জগদ্ব্যাপারে ঈশ্বরের সত্তাই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। বলিলেন, কোন সর্ব্বজ্ঞ ভগবানকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি অন্ধশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যাঁহারা অতটা সাহসী নহেন, তাঁহারা বলিলেন যে, ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন; কিন্তু এই বিশ্বব্যাপারে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার কার্য্য ফুরাইয়াছে। এখন এই সৃষ্টিপ্রবাহ নিজের স্বভাব বা প্রকৃতি বলেই আপনা-আপনি চলিতেছে।

বলা বাহুল্য, এই নব্য বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও অনুসন্ধান কেবল প্রাকৃতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রহিল না। মানব এবং মানব-সমাজও এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হইল। মানবের জন্ম, কর্ম্ম ও প্রকৃতি এবং সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল; তদুপরি নিত্য-নূতন মত-বাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ফলে এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকদের অধ্যবসায়ের ফলে মানব ও মানবসমাজ সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব কথা জানিতে পারা গিয়াছে ও অনেক অভিনব মতবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেগুলি দেখিলে মনে হয় যে, যে-অদৃষ্টবাদকে বৈজ্ঞানিকেরা ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই বুঝি আবার নূতনভাবে সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া তাঁহাদের দরবারে সম্মানের আসন পাইয়াছে।

আধুনিক মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, মানবের স্বভাব ও প্রকৃতি—জন্ম, কর্ম্ম ও পরিবেষ্টনী—এই তিনটির উপর নির্ভর করে। এই তিনটির দ্বারাই তাহার জীবনের গতি ও পরিণাম সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহাদের অতিরিক্ত কোন শক্তির কল্পনা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এই তিনটি শক্তি কি? এবং কিরূপেই বা তাহারা মানবজীবনের

উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে, এখন তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১। জন্ম বা বংশানুক্রম (Heredity)।

সকলেই জানেন, মানুষ ও অন্যান্য অধিকাংশ জীবের মধ্যেই নূতন জীব-স্থষ্টির জন্য যৌন-সম্মিলনের প্রয়োজন হয়। যে পিতা ও মাতার যোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, তাহাদের গুণ ও চরিত্র অনেক পরিমাণে সন্তানে সংক্রামিত হয়,—এরূপ একটা মোটামুটি ধারণাও অল্পবিস্তর সকল সভ্যসমাজেই অনেকদিন হইতে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাদ্বারা এই বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষও মূলতঃ একটিমাত্র ক্ষুদ্র কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কোষকে জীব-কোষ (cell) বলা যাইতে পারে। মানুষের—তথা অন্যান্য জীবের—দেহ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহা কতকগুলি এইরূপ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জীবকোষের সমষ্টি ছাড়া আর-কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে আমাদের সমস্ত প্রকাণ্ড দেহটাই অসংখ্য জীবকোষের একটা বিরাট সাধারণ-তন্ত্র মাত্র। আদিতে একটিমাত্র কোষই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলে আপনাকে বিভাগ ও বৃদ্ধি করিয়া এতগুলি নানারূপ কোষের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে ও তাহার ফলে এই বিপুল দেহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে-সকল জীবের মধ্যে নূতন স্থষ্টির জন্য যৌন-সম্মিলনের প্রয়োজন হয়, তাহাদের মধ্যে দুই জাতীয় জীবকোষ আছে;—পুংকোষ (Sperm-cell) ও স্ত্রীকোষ (Ovum)। যৌন-সম্মিলনের ফলে গর্ভাধান—আসলে আর-কিছুই নহে—এই দুই জাতীয় দুইটি কোষের একত্র মিলন। এই মিলনের ফলে একটি নূতন কোষের উৎপত্তি হয়। সেই সম্মিলিত নূতন কোষের নাম দেওয়া যায়—মূল-কোষ (Stem-cell)। এই মূল-কোষই নূতন জীবের আদি। উহা মাতৃগর্ভে জরায়ুতে থাকিয়া বিকাশ পায়, এবং নিজেকে বিভাগ ও বৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যতের জটিল জীবদেহ গঠিত করিয়া তোলে।

এখন এই যে জীবকোষ যাহা নূতন জীবের আদি—মানুষের যত-কিছু দৈহিক ও মানসিক গুণ তাহার সকলই প্রথম হইতে উহার মধ্যেই থাকে। জীবদেহের যত বিকাশ হইতে থাকে, সেগুলিও ততই বিকাশ পাইতে থাকে। আবার এই মূল-কোষ পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন বলিয়া পুং ও স্ত্রীকোষের প্রত্যেকের মধ্যে পৃথক ভাবে যে-সকল দৈহিক ও মানসিক (পৃথক) গুণ থাকে, তাহারাই পরস্পরের সংযোগ ও সম্মিলনের ফলে মূলকোষের অন্তর্নিহিত দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর সৃষ্টি করে। তাহা হইলে মোটের উপর কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ :—পিতার মধ্যে যে পুংকোষ আছে, তাহাতে পিতার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নিহিত থাকে; আবার মাতার মধ্যে যে স্ত্রীকোষ আছে তাহাতেও মাতার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী নিহিত থাকে; পরে যৌন-সম্মিলনের ফলে মূলকোষের গঠনে যখন নূতন জীবসৃষ্টি হয়, তখন পিতা ও মাতা এই উভয়ের গুণাবলী পুংকোষ ও

স্ত্রীকোষের সহযোগে মূলকোষে সম্মিলিত হয়; তাহার ফলে মূলকোষের মধ্যে নূতন জীবের ভবিষ্যৎ গুণাবলীর উদ্ভব হয়। মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে যে-সকল গুণের বিকাশ হইবে, তাহার বীজ পূর্ব্ব হইতেই সে এইরূপে প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার গুণাবলীই তাহার মধ্যে সম্মিলিত হইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতে তাহার শারীরিক ও মানসিক যেরূপ পরিণতিই হউক না কেন, এই পিতামাতার গুণসমূহের সম্মিলিত প্রভাব সে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ মনস্বী হেকেল বলেন;—

"All the bodily and mental features of the new-born child are the sum-total of the hereditary qualities which it has received in reproduction from parents and ancestors. All that man acquires afterwards in life by the ex-cercise of his organs, the influence of his environment and education—cannot obliterate that general out-line of his being, which he inherited form his parents." (Hackel—Evolution of Man—R. P. A. Ed. P. 58.)

কুশাগ্রবুদ্ধি অধ্যাপক টমসন এই কথাটাই সুন্দর কবিত্ব করিয়া বলেন ঃ—

"We may fairly say that the maternal and paternal contributions form the warf and woof of the growing organism." (Thomson—Heredity. P. 51.)

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিসমান (Weismann) এইটুকুতেই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন, যে-সকল পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ জীবসৃষ্টির নিদান, তাহারা পৃথকরূপে পিতামাতার দেহে সঞ্চিত থাকে। আবার নূতন দেহ-গঠনে সমস্ত মূল-জীববস্তুই নিঃশেষে ব্যয়িত হয় না; মূল-জীববস্তুর কিছু অংশ পৃথকরূপে ভবিষ্যৎ জীবসৃষ্টির জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ধারা জীবসৃষ্টির প্রথম হইতে ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি পাকা মহাজন। সে তাহার মূলধন সব খরচ করিয়া ফেলে না। নূতন জীবসৃষ্টি সে করিতেছে বটে; কিন্তু আসল মূল-জীববস্তু সে অপূর্ব্ব উপায়ে পরম্পরাক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিসমান তাঁহার এই মতের নাম দিয়াছেন—Germinal Continuity।

"In development a part of the germ-plasm contained in the parent egg-cell, is not used up in the construction of the body of the offspring, but is reserved unchanged for the formation of the germ-cell of the following generation.' Thus the parent is rather the trustee of the germ-plasm than the producer of the child." (Thomson's Heredity. P. 43.)

তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ ঃ—প্রত্যেক মানুষ তাহার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর জন্য মূলতঃ পিতা-মাতার কাছে ঋণী। কিন্তু সেই পিতামাতা আবার তাঁহাদের প্রত্যেকের পিতামাতার কাছে ঋণী। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষ হইতে বংশানুক্রমে মানুষের সমস্ত গুণাবলী সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। মানুষ এই বিরাট, বিচিত্র, জটিল, আবহমানকালব্যাপী, বংশ-পরম্পরা-ক্রমের জালের দ্বারা 'আষ্টেপৃষ্ঠে' জড়িত; তাহার নিজের বলিতে বিশেষ কিছুই নাই। কালপ্রবাহ ও বংশানুক্রমের কঠোর নিয়ম-বন্ধনে তাহার চারিদিক আবদ্ধ। ডিস্‌রেলীর

সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাহার পক্ষে "Race is everything." (Quoted in Thomson's Heredity)

২। পরিবেষ্টনী (Environments)।

এইরূপে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলীর সংযোগে নূতন মানুষের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহার পরে সেই নূতন মানুষ যখন বহির্জগতে আসিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন তাহার জীবনগতি ও পরিণামের উপর পরিবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ কার্য্য করে, দেখা যাক্।

মানুষের পরিবেষ্টনীকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) বাহ্যপ্রকৃতি ও (২) সমাজ। এ দুইই মানুষের জীবনগতি নির্ণয়ে প্রবলভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতি অর্থে যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর মধ্যে মানুষ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই। ইহারা যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদের দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। আবার সমুদ্র-তীরবাসী, মরুভূমিবাসী বা পার্ব্বত্য দেশবাসী মানুষদেরও প্রত্যেকের আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক প্রভেদ দেখা যায়। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের মধ্যেও সেইরূপ। কোন-কোন প্রাচীন অভিব্যক্তিবাদী বাহ্য-প্রকৃতির প্রভাব-সম্বন্ধে এতদূর আস্থাবান ছিলেন যে, তাঁহারা সমগ্র-জীবজগতের বিকাশের মূলে বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাবকেই প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। বাকল তাঁহার সুপরিচিত History of Civilisation গ্রন্থে এই বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাবকেই সভ্যতার প্রধান গতি-নির্ণায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণ অবশ্য এতটা বলেন না। তবে বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাব যে মানব-জীবন ও জাতির উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না।

পরিবেষ্টনীর আর-এক অংশ সমাজ। সমাজ বলিতে সামাজিক বিধিব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, পরিবার প্রভৃতি সকলই বুঝায়। এ-সকলের প্রভাব যে মানবজীবনের উপর কত-বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে-সমাজের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যেরূপ আচার-ব্যবহার ও প্রথার মধ্যে সে বর্দ্ধিত হয়, যে-সকল বিধি-ব্যবস্থার সে অধীন হয়, যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা সে পাইয়া থাকে, যেমন পরিবারের মধ্যে সে বাস করে—সে সকলই যে তাহার দৈহিক ও মানসিক গতি নির্ণয় করিয়া থাকে, তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি যে তাহাদের ছাঁচেই ঢালা হয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই।

মানুষ জন্মের সময় পিতামাতা ও পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট হইতে যে-সকল দৈহিক ও মানসিক গুণ মূলধনরূপে পায়, তাহাই হইল তাহার জীবনের কাঠামো। তার পর যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হয়, তাহাই হইল সেই কাঠামোর উপর বর্ণসংযোগ। সুতরাং একদিকে বংশানুক্রম—অন্যদিকে পরিবেষ্টনী—এই দুইই প্রধানতঃ মানুষের স্বভাবকে গড়িয়া তোলে। সে যে সুস্থ বা দুর্ব্বল, পণ্ডিত বা মূর্খ, সুমতি বা দুর্ম্মতি, এমন-কি, ধনী বা

নির্ধন হয়—তাহাতে তাহার কোন হাত নাই। এই বংশানুক্রম ও পরিবেষ্টনীই তাহাকে ঐরূপ করিয়া তোলে। সে যদি পুণ্যবান হয়, অশেষ সামাজিক গুণের আধার হয়, সুশিক্ষিত, সুস্থ ও ধনী হয়, লোকরঞ্জক হয়, প্রতিভার অধিকারী হয়, তাহাতে তাহার কোন কৃতিত্ব নাই। তাহার বংশানুক্রম ও পরিবেষ্টনীর কাছেই সেজন্য সে ঋণী। অপর পক্ষে, তার যা মন্দ তার জন্যও দায়ী তাহার ঐ বংশানুক্রম ও পরিবেষ্টনী। পরম জ্ঞানী স্পেন্সার সমাজের চরিত্রগর্ব্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"It is very easy for you, O respectable Citizen, seated in your easy chair with your feet on the fender, to hold forth on the misconduct of the people ;—very easy for you, to censure their extravagant and vicious habits ; very easy for you to be pattern of frugality, of rectitude, of sobriety. What else would you be ? Here are you surrounded by comforts, possessing multiplied sources of lawful happiness, with a reputation to maintain, an ambition to fulfil, and the prospect of a competency for your old age. A shame indeed would it be, if with these advantages, you were not well regulated in your behaviour. * * * * But what would you do, if placed in the position of the labourer ? How would these virtues of yours would stand in the wear and tear of poverty ? Where would your prudence and self-denial be, if you were deprived of all the hopes that now stimulate you ?" (Spencer—Social statiecs. P. 54).

বাস্তবিক, অপরাধী, নিয়মভঙ্গকারী বলিয়া সমাজ যাহাদিগকে দণ্ড দেয়, তাহারা কি-পরিমাণে তাহাদের অপরাধের জন্য দায়ী, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অনেক সময়, সমাজই সেই সকল অপরাধের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহার আচার নিয়ম, বিধিব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষাই তো কতকগুলি হতভাগ্যকে অপরাধী হইতে বাধ্য করিয়াছে। যদি সে বিষয়ে কাহারও অপরাধ থাকে, তবে তাহা একমাত্র সমাজের ; এবং আসল শাস্তির ভাগী সে। যদি দোষ শুধরাইতে হয় তবে সমাজ তাহার বিধিব্যবস্থার, শিক্ষা-দীক্ষার সংশোধন করুক। যে হতভাগ্য অপরাধ করিয়াছে তাহাকে দণ্ড দেওয়া,—আর, কাহাকেও জলের মধ্যে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিয়া, জলমগ্ন হইবার জন্য তাহাকে তিরস্কার করা, একই কথা। মনুষ্যসমাজ অসম্পূর্ণ, তাহার বিধি-ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ। যতদিন সেই অসম্পূর্ণতা দূর না হয়, ততদিন সে যেন অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী না করে। মহামতি ম্যুনষ্টারবার্গ বলেন ;—

"The causes refer to our ancestors, our teachers and the surrounding conditions of society, and with the causes must the responsibility be pushed backwards. The unhealthy parents and not the immoral children are responsible ; the unfitted teacher and not the misbehaving pupil, should be blamed ; society and not the criminal is guilty. To take it in its most general meaning, the cosmic elements, with their general laws and not we single mortals, are fools." (Quoted in Thomson's Heredity.)

আধুনিক যুগের কোন-কোন সমাজ ও রাষ্ট্র এই কথা বুঝিয়াছে। তাই তাহাদের লক্ষ্য—আর অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়, তাহাকে সংশোধন করা। Borstal System-এ এই আদর্শই অবলম্বিত হইয়াছে।

৩। কর্ম্ম। যে তৃতীয় শক্তি মানুষের জীবনের উপর কার্য্য করে তাহার নাম দেওয়া

যায়—কর্ম্ম (Function)। যেরূপ কার্য্য মানুষ করে, যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাকে প্রাণধারণ করিতে হয়, যেরূপ ভাবে সে আপনার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির প্রয়োগ করে, তার উপরে নির্ভর করিয়া তাহার জীবনের গতি, স্বভাব ও প্রকৃতি তৈরি হইয়া উঠে। মনে হইতে পারে, এইখানে মানুষের অনেকটা স্বাধীনতা রহিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মানুষের যে কর্ম্ম, তাহাও তাহার বংশানুক্রম ও পরিবেষ্টনীর দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। কারণ যেরূপ গুণাবলী লইয়া সে জন্মায়, যে দেশে ও পরিবারে সে বর্দ্ধিত হয়, যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা সে পায়, তাহার কর্ম্মও সেই অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং বলিতে হয় তাহার নিজের কর্ম্মের উপর তাহার নিজের বিশেষ হাত নাই। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তাহার কর্ম্মও প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এখন আমরা আর একবার দেখি, আমাদের বৈজ্ঞানিক মানুষটির কি দশা হইল। দুইটি পিতৃমাতৃকোষের সহযোগে তাহার জন্ম। ঐ পিতৃমাতৃকোষের মধ্য দিয়া তাহার পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি সম্মিলিত হইয়া, তাহার নিজের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর মূলধন রূপে আসিয়াছে। এই বংশানুক্রমপ্রাপ্ত মূলধনকে অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার যেরূপ বিকাশই হউক না কেন, এই মূলধনই তাহার ভিত্তিস্বরূপ। তাহার পর প্রকৃতির অবস্থা ও সমাজ সেই ভিত্তির উপর আপনাদের কারিগরি খাটাইয়া তাহাকে নানারূপে বিকাশ করিয়া তুলিয়াছে। যে দেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, যেরূপ পরিবারে সে বাস করিয়াছে, যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা সে পাইয়াছে, যেরূপ বিধিব্যবস্থার সে অধীন হইয়াছে,—তাহার জীবনগতি, স্বভাব ও প্রকৃতি ঠিক সেই অনুসারেই গঠিত হইয়াছে। তাহার কর্ম্মও ঐ-সকল শক্তির দ্বারা নির্ণীত। এই কর্ম্মও আবার তাহার স্বভাব ও প্রকৃতির উপর কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য করিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল আমাদের এই বৈজ্ঞানিক মানুষটি একেবারে স্বাধীন নহেন,—সম্পূর্ণ পরাধীন, পরতন্ত্র। বংশানুক্রম, পরিবেষ্টনী ও কর্ম্ম—এই তিন অলঙ্ঘ্য শক্তির দ্বারা তাহার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি, জীবনের গতি ও পরিণাম সমস্তই স্থিরীকৃত। ইহাকে একপ্রকার অদৃষ্টবাদ ছাড়া আর কি বলিব? অদৃষ্টবাদী মানুষকে নানারূপ অদৃশ্য শক্তির অধীন ও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত বলিতেন। এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদও মানুষের সকল স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে কয়েকটি প্রবল শক্তির অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞ টমসন বলিয়াছেন :—

"In days of scientific enlightenment, we still think of Fates and Norns, though our conceptions and terms are very different." (Thomson's Heredity)

অতএব ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, আধুনিক যুগের পণ্ডিতগণ, প্রাচীন দার্শনিকগণের অদৃষ্টবাদকে অস্বীকার করিয়া আবার নিজেরাই এক নূতনরকম বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

আলো

(নাট্যচিত্র)

[দৃশ্য—অন্ধকার। কতকগুলি লোক।]

প্রথম। দেখ ভাই, একটা কথা—

দ্বিতীয়। কি কথা?

প্রথম। সে বড় ভয়ানক—কিন্তু সেটা বোধ হয় সন্দেহ! হঠাৎ সব কেঁপে উঠ্‌ল না!

দ্বিতীয়। কেঁপে উঠ্‌ল? কৈ, না।

প্রথম। ওঃ, তবে বোধ হয় আমার মনের ভুল।

দ্বিতীয়। তোমার হোল কি বল ত?

প্রথম। তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

দ্বিতীয়। তুমি কি-একটা কথা বল্‌ছিলে না?

প্রথম। কিন্তু সেটা কি ঠিক একটা কথা!—সেটা বোধ হয় আব্‌ছায়া!

দ্বিতীয়। আচ্ছা, তাই বল না।

প্রথম। না, না, সে বলবার মতন নয়, সে সন্দেহ মাত্র—সে হয় ত একেবারে ফাঁকা। একটা ভয়ানক শব্দ শুন্‌তে পেলে কি?

দ্বিতীয়। কৈ না।

তৃতীয়। তোমার হোল কি হে? অমন করছ কেন?

প্রথম। কৈ, কি করছি? আমি ত কিছু করিনি—এই ত ঠিক রয়েছি।

দ্বিতীয়। কিন্তু তুমি যে বলছ না হে!

প্রথম। কি বল্‌ছি না?

দ্বিতীয়। ওই যে কি-একটা সন্দেহ—

প্রথম। ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাদের কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে না?

দ্বিতীয়। কৈ না!

প্রথম। তবে থাক!—সে কিছু নয়।

দ্বিতীয়। না না, বল-না, শুনিই-না।

প্রথম। আচ্ছা, তোমাদের মনে হচ্ছে না, কে যেন একজন এখান থেকে চলে গেছে?

তৃতীয়। (সবিস্ময়ে) কে চলে গেছে!

প্রথম। তা ত ঠিক জানি না—এই অন্ধকারে ত ভালো ঠাহর পাইনে—কিন্তু কেমন-যেন একটু ফাঁকা বোধ হচ্ছে, তাই মনে হচ্ছে কে যেন নেই—তার জায়গাটা খালি পড়ে আছে।

দ্বিতীয়। সত্যি না-কি! হাঁ হাঁ, তুমি বল্‌তে আমার এখন ঐ-রকম বোধ হচ্ছে বটে!

তৃতীয়। আমারও বোধ হচ্ছে।

চতুর্থ। কিন্তু কে গেল?

প্রথম। আমরা ত কেউ কাউকে চিনি না—কি করে বলি বল।

সকলে। তা ঠিক, তা ঠিক।

প্রথম। আচ্ছা, আমাদের সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

সকলে। ঠিক বলেছ।

[সর্দ্দার ঘুমাইতেছিল। সকলে চীৎকার করিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইল।]

সর্দ্দার। কিরে, তোরা সব জেগে উঠলি কেন? এত অনিয়ম ত এখানে চলবে না।

দ্বিতীয়। সর্দ্দারমশায়, আমাদের একটা সন্দেহ—

সর্দ্দার। সন্দেহ? এখানে সন্দেহ করা চলবে না। সন্দেহ ত্যাগ করতে হবে; —এ-কথা বার বার বলেছি।

তৃতীয়। কিন্তু—

সর্দ্দার। আবার কিন্তু!

দ্বিতীয়। না সর্দ্দারমশায়, শুনুন, আমাদের যেন মনে হচ্ছে কে এখান থেকে চলে গেছে।

সর্দ্দার। কে এ খবর দিলে?

দ্বিতীয়। ঐ উনি।

প্রথম। না না আমি নই। আমি ঠিক ও-কথা বলিনি—আমি বল্‌ছিলুম একটা আবছায়ার মতন মনে হচ্ছে—

দ্বিতীয়। তা কি সত্যি সর্দ্দারমশায়?

সর্দ্দার। তোদের জানবার দরকার কি! বলেছি না তোদের কিচ্ছু জানবার দরকার নেই!

দ্বিতীয়। হাঁ, তা বটে।

চতুর্থ। তা বটে, কিন্তু কেন জানব না?

সর্দ্দার। আবার—কেন?

দ্বিতীয়। থাম্ না ভাই, থাম্ না।

চতুর্থ। (সরোষে) না থামব না।

তৃতীয়। কখ্‌খনো থামব না।

আর-সকলে। কিছুতেই থামব না। শুনে তবে ছাড়ব।

সর্দ্দার। আচ্ছা আচ্ছা, বলছি শোন।

সকলে। বল।

সর্দ্দার। সত্যি একজন বেরিয়ে গেছে।

তৃতীয়। কে সে?

সর্দ্দার। সে আমাদের শত্রু।

চতুর্থ। শত্রু?

সর্দ্দার। হাঁ—তার মতলব আমাদের এই বাসা ভেঙে দেবে।

সকলে। কোথায় সে পাজি!

চতুর্থ। চল্, তাকে ধরে আনি।

সর্দ্দার। না, না। থাম্ তোরা। এখানে বসেই তাকে জব্দ করতে হবে।

সকলে। সেই ঠিক, সেই ঠিক!

দ্বিতীয়। আচ্ছা, সে কি বলে গেল?

সর্দ্দার। সে আমায় শাসিয়ে গেল।

দ্বিতীয়। তোমায় শাসিয়ে গেল? ভারি ত তার স্পর্দ্ধা!

তৃতীয়। সে কি বল্লে?

সর্দ্দার। সে বল্লে, আমি এখানে আলো আনব।

সকলে। আলো!

সর্দ্দার। হাঁ, আলো।

দ্বিতীয়। আলো কি হবে?

সর্দ্দার। সে বল্লে, আলো না হলে সব মিথ্যে।

দ্বিতীয়। আমাদের এই এতবড় জমাট অন্ধকার মিথ্যে! কী স্পর্দ্ধা তার!

তৃতীয়। যে অন্ধকার আমাদের নীড়, যা আমাদের পক্ষী-মাতার পাখ্‌নার মতন ঝাপ্‌টে রেখেছে, যার জন্যে এক-মুহূর্ত্তের তরে কষ্ট-করে চোখের পাতা খুলতে হয় না, তাকে বল্লে কি না মিথ্যে!

প্রথম। আলোয় তার কি হবে?

সর্দ্দার। সে বল্লে, আমি দেখব—দেখবার আশায় থাকব না, তাই আমার আলো চাই।

তৃতীয়। ফুঃ!

দ্বিতীয়। আপনি তাকে যেতে দিলেন

কেন? জোর করে ধরে রাখলেন না কেন? আমরা তাকে একবার দেখে নিতুম।

সর্দ্দার। অমন পাষণ্ড আমাদের গণ্ডী থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

তৃতীয়। ঠিক বলেছ। কিন্তু তাকে পেলে আমরা ছাড়ব না।

সর্দ্দার। সে হবে এখন—এখন থাম্! অনেকক্ষণ তোরা জেগে আছিস—এত অনিয়ম চলবে না। যা ঘুমোগে।

[সকলে চুপ]

প্রথম। (সসঙ্কোচে) আমি তিন-তিন বার স্বপ্ন দেখেছি।

সর্দ্দার। স্বপ্ন? কিসের স্বপ্ন?

প্রথম। কে যেন আমাদের ডাকছে। বলছে—আলো এনেছি।

দ্বিতীয়। সত্যি? কি ভয়ানক!

তৃতীয়। স্বপ্ন?—সে ত আমাদের এই অন্ধকারের জীব—সে ত মিথ্যে বলবে না।

সর্দ্দার। আমি ঐ শত্রুটাকে ভয় করি না। কিন্তু স্বপ্নদেবীর আদেশ—

তৃতীয়। তবে উপায়?

সকলে। উপায়?

সর্দ্দার। তাই ত!

প্রথম। ঐ কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না?

সকলে। কৈ, কৈ!

প্রথম। ঐ যে কে বল্লে—আমি এসেছি—আলো এনেছি।

সর্দ্দার। কে বল্লে?

প্রথম। তা ত বুঝতে পারছি না। যেন স্বপ্নে দেখলুম বলে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়। আবার স্বপ্ন?

সর্দ্দার। হে স্বপ্নদেবী—তোমায় ষোড়শ উপচারে পুজো দেব—তুমি অভয় দাও।

প্রথম। ঐ শোন, আবার বল্লে।

দ্বিতীয়। হাঁ, হাঁ, শোনা গেল বটে।

তৃতীয়। হাঁ ঠিক বটে।

সকলে। ঠিক, ঠিক!

সর্দ্দার। মাগো স্বপ্নদেবী, তুমি অভয় দাও।

সকলে। মাগো অভয় দাও।

সর্দ্দার। ওরে তোরা সব ঘুমো। তোদের অনাচারে এই সব অমঙ্গল ঘটছে।

সকলে। ওরে আয় ভাই ঘুমুই।

[ঘুমাইবার চেষ্টা]

প্রথম। ঘুম আজ কিছুতেই আসছে না;—কে যেন চোখকে বলছে—চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ!

দ্বিতীয়। ঠিক বলেছিস ভাই, আমারও চোখে ঘুম নেই।

তৃতীয়। আমারও তাই।

সকলে। ঠিক বলেছ ভাই।

সর্দ্দার। কিন্তু খবরদার, কেউ চাস্‌নে!

সকলে। উঁহু।

[সকলে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল]

প্রথম। কে একজন এল না?

দ্বিতীয়। তাই মনে হচ্ছে বটে।

তৃতীয়। কার পায়ের আওয়াজ পেলুম।

চতুর্থ। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ঐ কালো বেদীটা থর-থর করে কাঁপছে।

পঞ্চম। আমার চোখের পাতার উপর কে যেন সাদা কাজল বুলিয়ে দিচ্ছে।

সকলে। ওরে আমারও তাই—আমারও তাই।

সর্দ্দার। কিন্তু খবরদার, কেউ চোখ মেলে চাস্‌নে

[নূতন লোকের প্রবেশ]

নূতন। আমি এসেছি।

সর্দ্দার। (চমকাইয়া) কে তুই ?

নূতন। আমি তোমাদেরই একজন ছিলুম।

সর্দ্দার। কখ্‌খনো না! তোকে আমরা চিনি না।

নূতন। আমি যে নতুন হয়ে এসেছি, তাই চিনতে পারছ না।

সর্দ্দার। নতুন ?

নূতন। হাঁ নতুন। এই দেখ আলো আমার নতুন রূপ ফুটিয়ে দিয়েছে।

সর্দ্দার। বেরোও—বেরোও—ও-কথা এখানে মুখে এনো না।

[সকলে চুপ।]

প্রথম। আমার মনে হচ্ছে এ আমার সেই স্বপ্নের মানুষ।

দ্বিতীয়। আমারও তাই।

সকলে। আমারও তাই—আমারও তাই।

সর্দ্দার। সর্ব্বনাশ!

নূতন। চেয়ে দেখ—আমার কী অপরূপ রূপ!

প্রথম। সত্যি না কি!

সর্দ্দার। চোপ্‌!

নূতন। চেয়ে দেখ—কেমন সুন্দর আমি!

প্রথম। ওরে ভাই, দেখব নাকি ?

সর্দ্দার। খবরদার!

নূতন। চেয়ে দেখ।

সর্দ্দার। যাও, যাও, এ অন্ধকারে তোমায় দেখা যাবে না।

নূতন। অন্ধকার কৈ—আলোয় যে সব আলো হয়ে উঠেছে। চেয়ে দেখ।

সর্দ্দার। মিথ্যে কথা। এই ত অন্ধকার রয়েছে।

নূতন। না, অন্ধকার নেই।

প্রথম। (হঠাৎ চোখ খুলিয়া) তাই ত, অন্ধকার ত নেই। ও ভাই, চেয়ে ছ্যাখ্‌, চেয়ে ছ্যাখ্‌!

দ্বিতীয়। অ্যাঁ, অন্ধকার নেই! যে আমাদের ভিতর-বাহির জুড়ে আছে, জুড়িয়ে আছে, যার সুষমা সুষুপ্তির মত নিবিড়—সে অন্ধকার নেই ?

সকলে। বলিস কি ভাই ?

প্রথম। হাঁ ভাই, চেয়ে দ্যাখ—চেয়ে ছ্যাখ।

সর্দ্দার। খবরদার!

নূতন। চেয়ে দেখ ভাই, চেয়ে দেখ!

দ্বিতীয়। ওরে চাইব না কি ?

সর্দ্দার। খবরদার!

দ্বিতীয়। কে যেন আমার চোখের পাতা ধরে ধীরে-ধীরে আদর করে ডাকছে।

তৃতীয়। ওরে আমারও তাই।

দ্বিতীয়। তবে যা থাকে কপালে! (চোখ খুলিয়া) কী সুন্দর!

তৃতীয়। সত্যি নাকি ? (চোখ খুলিয়া) কী চমৎকার!

আর-সকলে। ওরে আমাদের সে অন্ধকার সত্যি নেই না কি ?

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। আরে না ভাই, চেয়ে ছ্যাখ্‌!

[নূতন লোক অদৃশ্য হইয়া গেল]

সকলে। (চোখ খুলিয়া) তাইত—

অন্ধকার ত নেই—কেবল আমরাই রয়েছি!

[সকলে বিস্মিতভাবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিতে লাগিল—তাইত, কেবল আমরাই রয়েছি!]

প্রথম। ওরে ভাই, সর্দ্দার অমন চুপ করে রয়েছে কেন?

সকলে। সর্দ্দারমশায়, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ।

সর্দ্দার। কি দেখব?

প্রথম। অন্ধকার আর নেই।

সর্দ্দার। মিথ্যে কথা!

দ্বিতীয়। মিছে রাগ করছ কেন?

সর্দ্দার। কৈ তোদের আলো?

প্রথম। এই যে! [সর্দ্দার নিরুত্তর।]

দ্বিতীয়। (সর্দ্দারের কাছে গিয়া) ওরে সর্দ্দার আমাদের অন্ধ!

সকলে। আহা, বেচারা অন্ধ!

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শিল্প-প্রসঙ্গ

অনেকের বিশ্বাস যে, চিত্রকর যত বেশী-মাত্রায় পরিশ্রম করবেন, তাঁর চিত্র ততই ভালো হয়ে উঠ্‌বে। কথাটি প্রথমে শুনতে খুব ঠিক্ বলেই মনে হয়; কিন্তু বস্তুত দেখা যায় যে শ্রেষ্ঠ শিল্প-কলা কখনও বহু আয়াসে বা বহু চেষ্টায়—কথায় যাকে বলে কচ্‌লে—শিল্পীদের হাত থেকে বেরোয় না; তাঁর অন্তরের রূপের ছাপ হাতের আগায় আপনা-আপনি অতি সহজেই ফুটে ওঠে,—আঁকবার জন্যে পরিশ্রমও লাগে না বা কোনো সাজ-সরঞ্জামেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না—দু'একটা তুলির আঁচড়ই তখন যথেষ্ট। শিল্পীর মনই শিল্প-রচনার প্রধান সহায়, হাত বা রঙ-তুলি তার উপলক্ষ্য মাত্র; তাই চিত্তস্থির করে তবে চিত্রকরকে চিত্রপটে হাত দিতে হয়। ভারতীয় শিল্পীদের মত জাপানী শিল্পীরাও প্রাচ্যশিল্পের এই প্রথাটা খুবই মেনে চলেন। আমাদের এই নবীন শিল্প-সাধনার দিনেও দেখেছি যে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ-শিল্প, যথা:—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর 'সতী'—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' প্রভৃতি অনেক চিত্রই দু-একদিনের মধ্যেই আঁকা হয়েচে এবং তাঁদের সেই সামান্য দু-একদিনের কাজই অনেক শিল্পীর বহুদিনব্যাপী পরিশ্রমকে হার-মানিয়ে দিয়েছে। বেশী পরিশ্রমের দ্বারা 'সতী'র প্রাণের আসল রূপটি বা 'ভারত- মাতার' সরল ও গুরুগম্ভীর ভাবটি কখনই অধিক বেড়ে যেত না। শিল্পীর তুলি কোথায় এসে থামবে, সেটা জানাই শিল্পীর প্রধান গৌরব। প্রথামত এঁকে চলা সহজ, কিন্তু আঁকাটা শেষ করাই শক্ত কাজ।

* *
*

বস্তুত দেখা যায় যে জগতে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলে যা পরিচিত, তার যাঁরা শিল্পী, তাঁদের জীবন নিতান্তই অবকাশ-বিরল—বাধা তাঁদের পদে পদে। কিন্তু এই বাধাই তাঁরা ঠেলে ফেলে বেঁচে উঠেছেন। জ্যান্ত মানুষের প্রকৃতি কোনো বাধায় একেবারে মরে যায় না; বরং সে ঘা খেয়ে-খেয়ে আরো বেশী সজাগ হয়ে ওঠে, এবং আলোর সোজাসুজি রাস্তা না পেলেও গাছ-পালার মত যে-কোনো উপায়ে আলোর পথ খুঁজে নেয়।

* *
*

শিল্পীরা মৌমাছির মতন। ছবিটি যতক্ষণ না গড়ে উঠ্‌চে ততক্ষণ তারা কাজ করে চলে, তারপর মৌমাছিরা যেমন সঞ্চিত মধু খেয়ে নিয়ে তাদের স্বরচিত চাক ছেড়ে অন্যত্র উড়ে যায় এবং পুনরায় নতুন চাক তৈরী করতে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি শিল্পীও ছবিটি শেষ হলেই তার আনন্দ-রসটুকু লাভ করে অভিনব চিত্র-রচনায় মন দেয়। তখন পূর্ব্বের চিত্রটির চেয়ে নতুনটির উপরই তার টান হয় ষোল-আনা। শিল্পীর শিল্প এই হিসাবে অহৈতুকী। অন্তরের প্রেরণাতেই শিল্পকলার সৃষ্টি হয়—বস্তু বা অর্থলাভের আশায় নয়।

* *
*

প্রায়ই দেখা যায় যে সাধারণ লোকে রংচং বেশী ভালোবাসে। কিন্তু রঙের বাস্তবিক বাহার কোথায় তা' অনেকেই জানে না। সুন্দরীর গহনা বা কাব্যের অলঙ্কারের মতন ছবিতেও বেশী রং চাপালে তার আসল রূপটি ঢাকা পড়ে যায়। সেই জন্যে রং-চাপানো বিশেষ ওস্তাদের ও রসজ্ঞের কাজ। প্রকৃতির মধ্যে যে রঙের খেলা ও সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে তার হুবহু নকল-করা মানুষের অসাধ্য। শিল্পী পর্ট-যবনিকায় তার এমন-একটা আদ্‌রা রচনা করেন, যাতে দর্শকের মন, প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য্যটির রস পেয়ে চরিতার্থ হয়। শিল্পীর এই বিশেষ ভাবে আঁকাটাই হ'ল ললিত কলা। যেমন, কথা শুধু স্পষ্ট-করে বল্লেই বলা হয় না—একটা বিশেষ-ভাবে কইলে তবেই কথা লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করে, তেমনি চিত্র-শিল্পেও প্রকৃতিকে স্পষ্ট-করে ধরে দিলেই চলেনা, তাকে শিল্পীর বিশেষ দিক থেকে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। কথা স্পষ্ট করে বোঝাতে হলে যেমন বিশেষ কথাটির উপর জোর দিয়ে বলতে হয়, তেমনি চিত্রের বিশেষ-ভাবটি প্রকাশ করতে হলে সেই ভাবের উপযোগী রেখা ও বর্ণের দ্বারা বিশেষ জায়গাটিই ফুটিয়ে তুলতে হয়।

* *
*

ঐতিহাসিক বা দার্শনিক তথ্যের গবেষণার দ্বারা শিল্পসৃষ্টি বা তার বিচার করা চলে না। শিল্পকে তার নিজের বিশেষ দিক থেকে দেখাই কর্ত্তব্য। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—"লক্ষ্মণ-সেনের পলায়ন" চিত্রটিকে 'কলঙ্কের' চিত্র ভেবে শিল্পীর প্রতি যে কলঙ্ক আরোপ করচেন তাতে আমার একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে গেল।

ঘটনাটি এই: ইংরাজি ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে যখন সার টমাস্ রো ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস কর্ত্তৃক মোগল-বাদশাহ শাহানশা শাহজাহানের কাছে দূতস্বরূপ প্রেরিত হন, তখন ভারত-সম্রাটের জন্যে ইংরাজ-রাজের তরফ থেকে বিবিধ সামগ্রীর মধ্যে কোন খ্যাতনামা শিল্পীর আঁকা Venus ও Satyrএর একটি চিত্র নিয়ে এসেছিলেন। ছবিটির বিষয় ছিল—Venus দৈত্যটির নাক ধরে টানচে। সম্রাট সাহজাহান ছবিখানি দেখেই ভয়ানক চটে গেলেন! তিনি মনে করলেন যে ইংলণ্ডেশ্বর বুঝি তাঁর প্রেয়সী সম্রাজ্ঞী নুরমহল ও তাঁকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই ছবিখানি আঁকিয়ে পাঠিয়েছেন। বেচারী সার টমাস্ রোর উপর ভারতেশ্বরের কোপটা খুবই ভয়ানক ভাবেই পড়তো, যদি নানান জরুরি কাজ এসে পড়ায় ব্যাপারটা তিনি ভুলে না যেতেন। শোনা যায়, সার টমাস নাকি ভারত-সম্রাটকে শেষে একটা বুলডগ দিয়ে খুসি করেছিলেন। দৈবাৎ চিত্রের বিষয়টির সঙ্গে ভারত-সম্রাটের অবস্থার হুবহু মিল হয়ে যাওয়ায় কি অঘটনই না হবার উপক্রম হয়েছিল! আজ তাই দেখচি, ৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিতে যে রাজ-জনোচিত বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এবং সেই সঙ্গে বার্দ্ধক্যজনিত অসহায় পঙ্গু ভাব একত্র মিশে যে অম্লমধুর রসের অবতারণা করে তুলেচে, তার দিকে কারো নজরই পড়চে না। এখানে ভাববার কথা এই যে, ভারত-সম্রাটের মত এই ঐতিহাসিকদের অকারণ কোপে পড়ে যেন এমন-একটি শিল্পকলার ভাগ্যে কোন অঘটন না ঘটে!

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

মনের কথা

মন জিনিসটাকে ঠিক্ ধরা-ছোঁয়া যায় না; সে এই এক বলে আবার ক্ষণকাল যেতে-না-যেতে অন্য সুর সুরু করে। বাতাসের মত স্পর্শে অস্তিত্ব জানায়, তাই তার রহস্য নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য,—চোখে দেখে, বুঝে-পড়ে নেবার সুযোগ তো পাওয়া যায় না। আভাসে যে প্রকাশ করে, তার কথা, ভাষায় ব্যক্ত করা ভারি দুরূহ;—বুঝেছি বুঝেছি মনে হতে-না-হতে হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন হয়, যে বার্ত্তা বয়ে আসছিল সব কোথায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাতাসকে জীবনী-শক্তি পূর্ণ করতে হলে তাকে স্বাধীনতা দিতে হয়, আবদ্ধ বাতাস ব্যাধি-বীজের আকর; মনকেও তাই বাঁধলে চলে না, তাকে ছাড়া দিতেই হয়, কিন্তু তার গতি নিয়মিত করে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে পারা চাই; তবেই তার অদৃশ্য প্রবাহ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবারিত হয়।

মন যা দেখে তা চোখে দেখার চেয়ে ভালো আর সত্যিকার দেখা। উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা নেশার খেয়ালের মত, সেটা আধ-ঘুমের স্বপ্নের মত বিক্ষিপ্ত, তার পরম্পরা-

গত সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু মনের অনু ও দূরবীক্ষণে যা দেখা যায় তার মধ্যে বিষমতা নেই। সে ঠিক একটি নিয়ম-সূত্র ধরে চলে। অতীত এবং আগতের কারণ-সমবায়ে ভবিষ্যতের আকার ধারণা করে। যা গিয়েছে এবং যা সমুপস্থিত তা' হতেই যা আসবে তা বুঝতে পারা যায়।

* *
*

এই একটা কথা মনে হচ্ছিল, মানুষ যখন বড় কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, তখনই তারা ভিন্ন হয়ে পড়ে, নানা-রকমের আড়াল তাদের মধ্যে এসে পড়ে। আকাশ আর পৃথিবী যেখানে ঘেঁষাঘেষি করে আছে, সেইখানেই তাদের রঙের আড়ালে তারা ব্যবহিত, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যেখানে তারা দূরে, সেইখানেই তাদের আড়াল দূর হয়ে গেছে, আকারের আর বর্ণের তারতম্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ রচনা করতে পারছে না;—তারা বাতাসের বুকে একেবারে অভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আকাশ তো যথার্থ পৃথিবী হতে দূর নয়, তার শূন্যতাই উভয়ের মিলনক্ষেত্র, তবু ঐ যে নীল আর এই যে সবুজ—এই যেন তাদের ভিন্ন করে করে রেখেছে। যেখানেই একটা আকার গড়ে ওঠে, বর্ণের তারতম্য বোধ জন্মায়, সেইখানেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সপ্তবর্ণ যখন আপন আপন মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়ায়, তখনি তাদের জাতি বর্ণের ভেদ আমরা দেখ্তে পাই, তখনই বিচার করে তাদের বর্ণনা করি। কিন্তু যখনি আলোকের প্রেরণায় সব পার্থক্য পরিহার করে, মিলে-মিশে নিরাময় শুভ্রতায় পরিণত হয়, তখনি সে নির্ব্বিকার, একবর্ণের;—আর কোন বর্ণনাই খুঁজে পাওয়া যায় না। দূরতাই এই বর্ণ-ভেদ দূর করে, বৈচিত্র্যকে এক করে, বিচ্ছেদে মিলনের সম্পূর্ণতা এনে দেয়। এই জন্যই বোধ হয় প্রণয়ী বিরহের দিনে অধিক করে এই বিশ্ব, প্রিয়জনে তন্ময় দেখেন।

* *
*

কিছু লাভ করতে হলে দেখছি, এক জোর করে আঁকড়ে ধরতে হয়, নয়তো মুঠো আল্‌গা করে একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়। এক হাতের পাওয়া, আর-এক পাওয়া মনের। হাতের পাওয়াটাও কতক মনেরও পাওয়া এ-কথা ঠিক্, কিন্তু যেটি একেবারে মনের পাওয়া, তার সঙ্গে হাতে পাবার কোন সম্পর্কই নেই। হাতে পাওয়া জিনিস হারিয়ে গেলেই গেল, কিন্তু মনে পাওয়া জিনিসের হারানো নাই। সে একেবারে আমাদের প্রাণের মতই,—যুগ-যুগান্তের জন্মজন্মান্তের সঞ্চয়,—রয়েই গেল, নষ্ট হল না। সহসা দেখ্‌লে কিম্বা ভাবলে মনে হয় দুঃখে-কষ্টে কিছুই পাওয়া গেল না, বরং লব্ধ দ্রব্য হারিয়েই গেল, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে হারিয়ে-যাওয়া অনেক সময় কি পাওয়ারই সামিল নয়? কেন না যে দ্রব্যটি আমার কাছে ছিল, অথচ তার মূল্যজ্ঞান আমার মনে ছিল না, ততক্ষণ যথার্থ আমি তা' লাভ করিনি। হারিয়ে যখন তার অভাব বোধ হল, যখন তার মূল্য জ্ঞান আমার মনে জন্মাল, তখনি

আমি তা পেলাম। বর্ব্বর যে হীরক পেয়েও তাকে কাচ-খণ্ড জ্ঞান করে, সে হীরক তার করতলগত হয়েও সে তা পায়নি। কিন্তু যে জহুরি তার মূল্য জানে, হীরকখানিকে লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখতে না পারলেও, সেই বেশী করে তাকে পেয়েছে বল্‌তে হবে। মূল্য-জ্ঞানও থাকে, অধিকারও জন্মায়, আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীটি স্বায়ত্ব হয়, তবে ত সোণায় সোহাগা! এ দুর্লভ সৌভাগ্য তো বড়-একটা ঘটতে দেখিনা। যে যা পেয়েছে সে তার মূল্য বোঝেনি, ধূলিসাৎ করে তাকে তুচ্ছ করেছে, আর যে পায়নি সে তাকে কামনা করাই সৌভাগ্য জ্ঞান করেছে। বানরের গলায় মুক্তার হার, বেনা বনে মুক্তা ছড়াছড়ি সচরাচর না হ'লেও, অনেক সময় যে হয়, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য।

* * *

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" দেখে শেখা নয়, ঠেকে শেখা এ-কথাটি বড়ই সত্য। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্য-পথে দোলায়মান অবস্থা বড় অসহ্য, অত্যন্ত অসম্ভব। এ জীবনও নয়, একে মৃত্যুও বলা যায় না। বাঁচতে হলেও শক্তি চাই, মরবারও ক্ষমতা দরকার। মানুষ শরীরকে মারতে পারে, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে আত্মাকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু মারা অসম্ভব, কেন না সে স্বতঃই অমর। দুর্ব্বলতা কি অনবধানতাবশতঃ এই আত্মাকে যদি হারিয়েই ফেলা যায়, তবুও বলের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের গুণে, সতর্ক জাগ্রৎ মনে অনুসন্ধান করে, তাকে ফিরে পেতে পারি; কেন না এই আত্মা লভ্য।

মানবের বর্ব্বর হতে সুসভ্য অবস্থা পর্য্যন্ত এতাবৎ কাল ধারাবাহিকরূপে, এই আত্মাকে লাভ করবার জন্যে একটি অহেতুকী স্পৃহা আর অবিরাম চেষ্টা চলে আস্‌ছেই। একটিমাত্র জীবনে, এই কামনার পরিতৃপ্তি, এই সাধনার সিদ্ধিলাভ হয় ত হয় না, কিন্তু যার মনে এই কামনার উদ্বোধন হয়েছে, জন্মে-জন্মে সেই মানবমন একে প্রবলতর করে নিয়ে জন্মায়, তার পর একদিন জীবাত্মা সাধনার শক্তিতে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়, আর সেই হচ্ছে পরিনির্ব্বাণ। মানুষ মৃত্যুর পর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে কি নরকে স্থায়ীভাবে বস-বাস করে, তারা বিশ্বব্যাপারের আর কোন কাজেই আসে না—এ-কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। জন্মে-জন্মে মানবাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মভোগের ক্ষয় সাধন করে, ক্রমেই বাসনাবর্জ্জিত লঘুগতিতে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, এই ত সুযুক্তিসঙ্গত, সরল বিশ্বাস-অনুগত বলে মনে হয়।

* * *

অজ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি, জ্ঞানকৃত দোষের শাসনের চেয়ে যে কিছু কম হয়, তা নয়। ছোট ছেলে জানেনা যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, জ্বালা করে, কত রকমের কষ্ট হয়। কিন্তু তা হলেও যন্ত্রণা

তাকে সমানই ভোগ করতে হয়, সে একেবারে অবাক হয়ে যায় কেমন করে এমন নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান হ'ল! জ্ঞানকৃত দোষের এইটুকু আশ্বাস, যে দোষী, সে জানে—শাস্তি তার অকারণ হয় নি। ছোট ছেলে ঠেকে শেখে আগুনে হাত দিলে পুড়বে, কষ্ট ভোগ করতে হবে, এ জ্ঞানলাভ হবার পর সে আপনাকে বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু মানসিক আগুনে হাত দেবার শাস্তি অবিলম্বে আসেনা বলেই মানুষ এ বিষয়ে অত সাবধান কিম্বা সতর্ক নয়। আগুন যে জ্বালা সঞ্চার করে, তা প্রায় সকলের ভাগ্যেই সমান-ভাবে আসে। কিন্তু মানসিক শাস্তির আইনের ঠিক্ নেই,—এর মাপকাঠি সমান নয়। একই দোষে কেউ বা খুনি আসামীর শাস্তি পায়,—হয় মৃত্যু, নয় দ্বীপান্তর; আবার কারো-বা কিছুই হয় না। ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা বলে, একজন দিব্যি মনের সুখে কাল কাটায়, বরং এই মিথ্যা বলাটা তার বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞানে গর্ব্বই করে থাকে; আবার অন্য জন ইঙ্গিতে কোন মিথ্যা প্রকাশ করে অনুশোচনায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বসে। বিবেক-বুদ্ধির এতখানি প্রশ্রয় দুঃখের হয়েও সুখের। সংসারে দশজনের মত না হ'তে পারলে, অর্থাৎ মাত্রা-জ্ঞান যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয় তবে অপরের সঙ্গে হিসাব পরিষ্কার করা ঘটে ওঠে না। দশের পৃথিবীতে সাধারণ ভাবে না চল্‌তে পারলে আরাম না হতে পারে, দুঃখ ঘটাও অসম্ভব নয়, তাহ'লেও আবার অপূর্ব্ব সুখেরও সঞ্চয় করা যায় কিন্তু। আমার মনের দুঃখ যেমন কেউ ভাগ করে নিতে পারে না, আমার মনের সুখও তেমনি কেড়ে নেবার সাধ্য কারো নেই। দুঃখ ঘটে কেন? না, মনের আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে নিজেকে চালনা করতে পারিনা তাই। অথচ যে আদর্শ মনে আসন-পেতে বসে আছে, সে এমনি জীবন্ত, জাগ্রৎ, উজ্জ্বল, প্রবল, যে সে কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়! ভালো মায়ের মত সে কোন অন্যায় আবদারই শোনে না, তা তুমি যত কেন মাথা-কুটে আপসা-আপসি করনা! তোমাকে তোমার বায়না ছাড়তেই হয়, কেঁদে চোখ ফুলিয়ে, মুখ ভার করে, যেমনই হও না, তোমায় বলতে হয়—"আমায় ক্ষমা কর, আর অমন করব না, আমায় তুমি ভালবাস!" কেননা আদর্শ যদি থাকে, তার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে তোমার চলে না, তার স্নেহদৃষ্টি ভিন্ন তুমি এক পাও এগোতে পারনা। মানুষ নিজের মনের দরবারে ছাড়পত্র না পেলে মোটেই পথ চল্‌তে পারে না। নিজের মনের আদর্শের মত এমন বন্ধু, এমন সঙ্গী, এমন নেতা, এমন নিত্যসহায়, সে আর কোথায় পাবে?

* * *

ভালো হতে হ'লে কি এতও নিষ্ঠুর হতে হয়! প্রথম-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন, এ নির্ম্মমতা অপরের উপরে। তাতো নয়,—এ বিরাগ নিজের মিথ্যার প্রতি। প্রবল শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে যথার্থ দয়ার অবসর হয় না। যেটি ভালো, শুভ, কল্যাণ বলে মনে হয়, সেটি কার্য্যে পরিণত

করবার জন্য, যে পরিমাণ দৃঢ়তা আবশ্যক, তাকে কত-সময় অনর্থক মনে হয়; মন বলে—এতটুকু দিলে ক্ষতি আর কি হ'ত! সমস্ত মন ব্যথায় ভরে ওঠে; কিন্তু মনের মধ্যে যে মাতা বসে আছেন, তাঁর তুলা-দণ্ডকে ফাঁকি দেবার যো নেই, সেখানে একতিল কমতি হলে চলে না—কাঁদতে কাঁদতেই পরিমাপ ঠিক করে দিতে হয়। রিক্ত, শূন্য, নিঃস্ব, দীন হয়েই ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানে বেরুতে হয়। এ দান কিন্তু কোনও প্রত্যাশার জের না রেখেই দিতে হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছন্নছাড়া

(১২)

পরদিন সকালে দেলোয়াঠাকরুণ সেলাই-ঘরে এসে হাজির; বরাবর সোজা আমার কাছেই এল। আমার উপর আক্রোশ দেখে কে! কিন্তু আলফঁস্ তাকে চুপ করতে বলে আমার দিকে ফিরে বল্লে—"দেখ, গিন্নী বল্‌তে বল্‌ছিলেন যে তোমাকে তাঁর চাকরাণী রাখতে আপত্তি নেই—কিন্তু এবার থেকে আমাদের সঙ্গেই তোমায় গির্জ্জেয় যেতে হবে।" সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলতে লাগল —"তোমাকে আমরা গাড়ী করে নিয়ে যাব—আবার গাড়ীতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসব।" এই প্রথম সে আমার সঙ্গে মুখোমুখী কথা কইলে। তার গলার আওয়াজ কেমন বসে গেল—যেন এই-সব কথা বলতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে সে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে। কেন জানিনা, আমার মনে হল, সে মিছে কথা বল্লে—আল্‌ফঁস্-গিন্নী অমনধারা কোনো কথাই বলেনি। তা-ছাড়া, তাকে দেখতে ঠিক সেই গুরুমায়ের মতন বলে তাকে অবিশ্বাস করতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ হল না। তাকে আমি স্পষ্ট বল্লুম যে আমি গাড়ী চড়তে চাই না!—আমি বরাবর যেমন যাচ্ছি, এখনো তেমনি সাঁৎ মতাঞর গির্জ্জেতেই যাবো। তার নীচের ঠোঁটটা মুখের ভিতর টেনে নিয়ে সে কামড়াতে লাগল। দেলোয়াঠাকরুণ আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে শাসিয়ে বল্লে—বড় বাড় বেড়েছে তোমার! এই এক-কথা সে বার-বার বলতে লাগল—যেন অন্য কোনো কথা তার মাথায় তখন আসছিল না। ক্রমেই তার গলার স্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়ে উঠতে লাগল—রাগে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল! তার চোখের সাদাটা ক্রমেই লাল হয়ে উঠতে লাগল;— আমাকে মারবার জন্যে সে হাত ওঁচালে। আমি ফস্ করে চেয়ারের পিছনে হটে গেলুম। দেলোয়াঠাকরুণ দমাস্ করে চেয়ারের উপর ধাক্কা-খেয়ে সেটাকে উল্টে ফেল্লে, তারপর টেবিলটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিলে। তার সেই কর্কশ চেঁচানিতে আমার বুক কাঁপছিল। সেলাই-ঘর থেকে ছুটে পালাতে গেলুম, কিন্তু দেখি আল্‌ফঁস্ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি

আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলুম—টেবিলের এধারে থেকে, ওধারে দেলোয়াঠাকরুণের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালুম। সে আবার বকুনি সুরু করলে—কথাগুলো এমনি ভাবে বার হচ্ছিল কে যেন গলা টিপে ধরেছে। সে-সব কথার যে কি মানে তা কিছু বুঝতে পারছিলুম না—কিন্তু সেই বকুনির মধ্যে কেমন-কতকগুলো বাক্যি ছিল, এবং তার বলবার ধরণ এমনি, যার জন্যে আমার আগাপাস্তলা জ্বলতে লাগল। শেষে তার বকুনি থামল, সে দম ফেটে চেঁচিয়ে উঠল—"জানিস! আমি তার মা!"

আলফঁস্ আমার কাছে এগিয়ে এল। আমার হাত ধরে বল্লে—"এস, যা বলি শোনো।" আমি সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তাকে ধাক্কা দিয়ে, বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলুম। দেলোয়াঠাকরুণের শেষ-কথাগুলো আমার মাথার ভিতর ঘা মারতে লাগ্‌ল;—সে কথাগুলো [illegible] সত্যিই একটা হাতুড়ি—যার একদিকটা [illegible] সরু। "আমি তার মা—জানিস!" মাগো মারি-এমে—তুমি মা! এও মা! এই মায়ের তুলনায় তুমি কত ভালো!—তোমায় আমি কত ভালোবাসি! তোমার সেই নানান্ রঙে ভরা চোখ থেকে আভা বেরিয়ে তোমার কালো পোষাকটির উপর কী উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিত! সেই সাদা টুপির নীচে তোমার সেই মুখখানি কী সুন্দর, কী পবিত্র! আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—যেন এই তুমি আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছ!

(১৩)

হঠাৎ দেখে চমকে উঠলুম যে আমি পাহাড়ের উপরের সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি! যখন সেখানে পৌঁছলুম তখন রীতিমত তুষারের ঝড় চলেছে। আশ্রয় নেবার জন্যে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলুম—এবং বরাবর সেই বাগানের দিকের ঘরটায় গিয়ে হাজির হলুম। আমি ভাব্‌বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা মাথার ভিতর ঐ তুষারের ফেঁকড়ি-গুলোর মতো ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল—যেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যে একই সময়ে তারা মাটি থেকে উঠছে ও আকাশ থেকে ঝরছে। যত-বারই আমি ভাববার চেষ্টা করতে লাগলুম, ততবারই আমার মনে আর-কিছু এল না, কেবল একটা গান যা আমাদের আশ্রমের মেয়েরা প্রায় গাইত তার একটু অংশ মনে পড়তে লাগল:—

"বুড়ো মেয়ে লাফিয়ে ম'ল, ঝাঁপিয়ে ম'লরে!
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যে তার মরণ হলরে!"

এই নিস্তব্ধ বাড়ির মধ্যে আমার মন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এল। এই ফুর্‌-ফুর্ করে তুষার-পড়া ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল! গাছগুলো ফুলে-ফুলে ভরে উঠে সেই সেদিন যেমন চমৎকার দেখিয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলুম। তারপর হঠাৎ, এই একটু আগে যা ঘটে গেছে, সেই সব মনে পড়ে গেল। অমনি দেলোয়াঠাকরুণের সেই চওড়া আঙুলসুদ্ধ হাতখানা আমি চোখের সামনে দেখতে পেলুম,—আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। তার পর আমার মনে পড়ল আল্‌ফঁসের সেই-সময়কার মুখের ভাব, যখন সে এসে আমার

হাত ধরেছিল। আমার মনে হল ঠিক এমনিতর ভাব এর আগে একদিন আমি একটা ছোট মেয়ের মুখে দেখেছিলুম। একদিন একটা পেয়ারা আমি গাছতলা থেকে কুড়িয়ে নিতে, মেয়েটা আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে—"আমায় আধখানা ভাগ দাও—আমি কাউকে বলব না।" কিন্তু তার সঙ্গে ভাগ করে পেয়ারা খাওয়াটা আমার এমন ঘৃণাকর মনে হতে লাগল যে মারি এমের সামনে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকলেও, আমি তখনই গিয়ে সেই পেয়ারা যেখানে পড়েছিল সেইখানে রেখে চলে এলুম।

এই-সব কথা ভাবতে-ভাবতে মারি এমের কাছে যাবার জন্যে আমার প্রাণ ফুক্‌রে উঠতে লাগল। আমি তখনই ছুটে যেতুম, কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল আঁরি যাবার সময় বলে গিয়েছিল—"কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।" হয় ত সে এতক্ষণে গোলাবাড়িতে এসেছে, আমাকে খুঁজছে—আমাকে না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি ভিল্‌ভিয়েইতে ফিরে যাবার জন্যে বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলুম। দু-চার পা যেতেই দেখি, সে উঠে আসছে। দেখে মনে হচ্ছিল তার সেই সাদা ঘোড়াটা যেন পথের বরফ-ভেঙে আর উঠতে পারছেনা! প্রথম দিনের মত আজও আঁরির মাথা খালি। তার গায়ের সেই আল্‌থাল্লা হাওয়ার তোড়ে ঢেউ খেলে উঠছে। এক-হাতে সে ঘোড়ার কেশর ধরেছিল। ঘোড়াটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই আঁরি ঝুঁকে পড়ে, আমার হাত-দুখানা ধরে নিলে। আমি দেখলুম তার মুখের উপর কেমন-একটা অস্বস্তির ভাব—আগে তেমন কখনো দেখি নি। আরো লক্ষ্য করলুম যে তার চোখদুটো দেলোয়া-ঠাকরুণের মতো পিট্‌পিট্‌ করছে। সে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল; সে দম নিতে নিতে বল্লে—"আমি জানতুম এইখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।" সে আবার মুখ খুল্লে। আমার মনে হল তার ঐ মুখের কথা আমার সুখসৌভাগ্য বহন করে আনবে। সে আমার হাত সজোরে চেপে ধরে আগের মত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আর রইল না!" আমার মনে হল কে যেন আমার মাথায় সজোরে বাড়ি বসিয়ে দিলে। আমার কানের ভিতর করাত-কাটার মত শব্দ হতে লাগল। আঁরি কাঁপতে লাগল, তাকে বলতে শুনলুম—"আমার সমস্ত ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে!" তারপর আমার হাতের উপর তার হাতের সেই উষ্ণতা আর পেলুম না। যখন জ্ঞান হল যে আমি রাস্তার মাঝে একলাটি দাঁড়িয়ে আছি, তখন একটা প্রকাণ্ড সাদা আকৃতি নিঃশব্দে বরফের উপর দিয়ে সরে-সরে যাচ্ছে—এই ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলুম না।

(১৪)

পাহাড়ের অন্য-দিক দিয়ে আমি বরফ মাড়িয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলুম—আমার পায়ের তলায় বরফগুলো মচ্‌মচ্‌ করতে লাগল। অর্দ্ধেক-পথে এক চাষা তার গাড়িতে আমায় তুলে নিতে চাইলে।

সে সহরে যাচ্ছিল। আমরা অল্পক্ষণেই সেই অনাথ-আশ্রমে এসে পৌঁছলুম; ফটকে গিয়ে ঘণ্টা টিপলুম। প্রতিহারিণী এসে দরজার ছিদ্র দিয়ে আমায় উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আমি দেখেই তাকে চিন্‌তে পারলুম;—এখনও সেই "গোরু-চোখী"ই আছে। তার বড়-বড় গোল-গোল চোখ ছিল বলে আমরা তার নাম দিয়েছিলুম "গোরু-চোখী।" আমাকে চিনতে পেরে সে ফটক খুলে দিলে; আমাকে ভিতরে ডাকলে; কিন্তু ফটকটা বন্ধ না করেই আমাকে বল্লে—"মারি এমে ত এখানে নেই।" আমি কোনো উত্তর করছি না দেখে, সে আবার বল্লে—"মারি এমে ত এখানে নেই।" আমি তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেলুম; কিন্তু সে কথায় যেন কান গেল না। আমার মনে হতে লাগল আমি যেন রয়েছি স্বপ্নের মধ্যে—যাতে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার সহজে ঘটে যায়—কোনো বিস্ময় লাগে না। তার সেই বড়-বড় চোখের দিকে চেয়ে বল্লুম—"আমি আবার ফিরে এসেছি!" সে দরজা বন্ধ করে দিলে, ফটকের কাছে তার সেই ছোট্ট ঘরটির ছাঁচের নীচে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, সে গুরুমায়ের কাছে চলে গেল। ফিরে এসে বল্লে যে সিষ্টার আঁজের সঙ্গে আগে কথা কয়ে দেখে তবে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ঘণ্টা বেজে উঠল। "গোরু-চোখী" দাঁড়িয়ে উঠে তার সঙ্গে আমায় যেতে বল্লে। তখন ফের বরফ-পড়া সুরু হয়েছে। গুরুমায়ের ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। ঢুকে প্রথমে চোখে কিছু দেখতে পেলুম না—কেবল সোঁ-সোঁ শব্দ করে আগুন জ্বলছে তাই নজরে পড়ল। তারপর গুরু-মায়ের গলার স্বর কানে এল। তিনি বল্লেন—"কি, ফিরে আসা হল বুঝি!" আমি ধীরভাবে ভাববার চেষ্টা করলুম কিন্তু আমার সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল—সত্যি ফিরে এসেছি কি-না তা খেয়াল করতে পারলুম না। তিনি বল্লেন—"মারি এমে এখানে নেই!" আমার মনে হতে লাগল সেই দুঃস্বপ্ন যেন আমাকে আবার ঘিরে ধরেছে। নিজেকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে আমি সজোরে কেশে উঠলুম। তারপর আগুনের দিকে চেয়ে কেন সেটা ঐ রকম সোঁ সোঁ করছে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলুম। গুরুমা বল্লেন—"তোমার কি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?" আমি বল্লুম—"না।" ঘরের উত্তাপে আমার আরাম হতে লাগল—আমি সুস্থ বোধ করলুম। তখন একটু-একটু করে জ্ঞান হলে বুঝতে পারলুম যে আমি অনাথ-আশ্রমে ফিরে এসেছি—গুরু-মায়ের ঘরে রয়েছি। তাঁর চোখের উপর আমার চোখ পড়ল। তিনি একটু হাসলেন, বল্লেন—"কই, তোমার তো বিশেষ-কিছু বদল হয়নি! কত বয়স হল তোমার?" আমি বল্লুম—"আঠারো।" তিনি বললেন—"সত্যি! কিন্তু বেশি বাড় হয়নি ত!" তারপর একটা কনুই টেবিলের উপর ঝুঁকিয়ে রেখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি মতলবে ফিরে এসেছ?" আমার ইচ্ছা হচ্ছিল বলি যে মারি এমেকে দেখতে এসেছি; কিন্তু তিনি আবার বল্লেন যে মারি এমে এখানে নেই, তাইতে আমার সেকথা

বলতে সাহস হলনা। টেবিলের টানা থেকে তিনি একখানা চিঠি বার করে হাতে নিলেন; মিছামিছি উত্যক্ত হলে মানুষ যে-রকম করে কথা কয় তেমনি সুরে বল্লেন—"তোমার আসার আগেই এই চিঠি থেকে টের পেয়েছি যে তোমার সাহস অতিরিক্ত-রকম বেড়েছে!"—বলে তিনি চিঠিখানা এমন করে ছুঁড়ে রাখলেন যেন এই নিয়ে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে। তারপর তিনি কথা টেনে-টেনে বলতে লাগলেন—"এখন যাও ঐ রান্নাঘরের কাজ করগে—তারপর দেখেশুনে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।" আগুন থেকে তখনো সোঁ সোঁ শব্দ উঠছিল—আমি সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলুম—তিনটে গুঁড়ির মধ্যে কোন্‌টা থেকে শব্দ উঠছে ধরতে পারছিলুম না। আমার চমক ভাঙিয়ে দেবার জন্যে গুরুমা তাঁর সেই একঘেয়ে সুর উঁচু করে তুল্লেন। আমাকে শাসিয়ে বলতে লাগলেন যে সিস্‌টার আঁজ আমার উপর খুব করে কড়া পাহারা দেবে;—আমার আগেকার বন্ধুদের কারুর সঙ্গে যেন কথা না কই! তারপর তিনি দরজার দিকে আঙুল দেখালেন;—বাইরের তুষারপাতের মধ্যে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

উঠোনের ওধারে রান্না-বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। তার দরজায় সিষ্টার আঁজ্ আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চেহারা লম্বা, রোগা; কেবল তাঁর টুপি ও কালো ঘাগ্‌রা ছাড়া আর-কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমার ধারণা হল নিশ্চয় ও একটা খুঁট্‌কি বুড়ি হবে। অমনি মনে হল যাই এখান থেকে পালিয়ে। ফটকের কাছে ছুটে গিয়ে গোরু-চোখীকে বল্লেই হ'ত যে আমি কেবল দেখা করতে এসেছিলুম, তাহলেই সে ফটক খুলে দিত—আর-কিছু করতে হতনা।

কিন্তু ফটকের কাছে না গিয়ে ছেলে-বেলায় যেখানে ছিলুম সেই কোঠার দিকে এগিয়ে গেলুম। কেন যে সেদিকে গেলুম তা বলতে পারিনা—কে যেন টেনে নিয়ে গেল। আমার ভারি ক্লান্তি বোধ হতে লাগল;—খালি মনে হচ্ছিল কোথাও শুয়ে পড়ে, কেবল ঘুমুই।

আগেকার সেই জায়গাটাতেই সেই পুরোনো বেঞ্চিটি এখনো রয়েছে। তার উপর থেকে খানিকটা বরফ ঝেড়ে ফেলে আমি সেখানে বসলুম—গাছের গায়ে হেলান দিয়ে—যেমন-করে পাদ্রীমশায় বসতেন। আমার বোধ হচ্ছিল আমি যেন কিসের প্রতীক্ষায় বসে আছি—কিন্তু তা যে কি তা জানিনা। আমি মারি এমের ঘরের জানলার দিকে চাইলুম। সেই সুন্দর কাজ-করা পর্দা এখন নেই। অন্য জানলার সঙ্গে সে জানলাটার কোনো তফাৎ ছিলনা কিন্তু তবুও আমার কাছে তা আলাদা বোধ হতে লাগল; অন্য জানলার পর্দার মতন এ জানলার পর্দাও কালো কাপড়ের কিন্তু তবুও আমার এই জানলাটিকে মনে হতে লাগল যেন চোখ-বোজা একখানি মুখ!

বাইরের উঠোনটা অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল—ভিতরের ঘরগুলো বাতির আলোয় হেসে উঠল। গোরু-চোখীকে বল্লেই দরজা খোলা পাব—এই ভাবতে ভাবতে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়বার মতলব করলুম।

কিন্তু আমার সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়তে লাগল—মনে হতে লাগল প্রকাণ্ড দুখানা শক্ত হাত আমার মাথা যেন চেপে ধরেছে। "গোরু-চোখী ফটক খুলে দেবে"—এই কথাগুলা বারবার এমনি করে নিজেরা প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল—যেন আমিই তা চীৎকার করে বলছি! হঠাৎ পিছন থেকে কার স্নেহমাখা গলার স্বর কানে এসে লাগল। শুনলুম কে বলছে—"আহা, মারি ক্লেয়ার এই বরফের ঠাণ্ডায় বাহিরে বসে আছ?—উঠে এস—উঠে এস।" আমি মুখ তুলে দেখি আমার সামনে এক তরুণী দাঁড়িয়ে; —একেবারে কাঁচা বয়েস—এমন সুন্দর মুখ কোথাও দেখিনি। সে হেঁট-হয়ে আমাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগল—আমার নিজের থেকে উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য হচ্ছেনা দেখে সে আমার হাত ধরে তুলে বল্লে—"আমার গায়ের উপর হেলান দাও ভাই।" তারপর দেখলুম সে আমায় রান্নাবাড়ির দিকে নিয়ে চল্ল—কাঁচের দরজা-গুলো তার আলোয় ঝক্-ঝক্ করছে। আমি তখন কোনো কথাই ভাবতে পারছিলুম না। বরফ-কণা আমার গায়ে এসে সজোরে বিঁধছিল—চোখের পাতা জ্বালা করছিল। রান্না-ঘরে আসতেই যে দুজন মেয়ে উনুনের ধারে দাঁড়িয়েছিল তাদের চিনতে পারলুম—তাদের একজন হচ্ছে সেই বেহায়া ভেরোনিক্, আর-একজন ভুঁদি মেলানী। মেলানীর পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আমায় নমস্কার করলে। আমি সেই তরুণীর কাঁধে ভর দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম—সেখানে দেখি মিটমিটে বাতি জ্বলছে। প্রকাণ্ড একটা সাদা পর্দ্দা দিয়ে ঘরটাকে দুভাগ করা হয়েছে। ঐ পর্দ্দার পিছন থেকে একখানা চেয়ার এনে সেই মেয়েটি আমায় বসিয়ে দিলে—তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেল। একটু পরে সেই ভুঁদি মেলানী আর বেহায়া ভেরোনিক্—এই দুটোতে এসে আমার পাশের একটা লোহার খাটিয়ায় একখানা পরিস্কার চাদর বিছিয়ে দিতে লাগল। ভেরোনিক্ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখেনি; বিছানা করা হয়ে গেলে সে আমার দিকে ফিরে বল্লে—"ওমা, তুমি যে আবার ফিরে আসবে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।" কথাটা এমন-করে বল্লে যেন কাজটা ভারি নিন্দের বলে আমায় তিরস্কার করছে। মেলানী যেমন ছেলেবেলায় করত তেমনি-ধারা হাত-দুটো জড়ো করে দাড়ির নীচে রেখে মুখ কাৎ করে রইল।—সে আমার দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছিল; সে বল্লে—"তোমাকে এই রান্নাঘরের কাজে দিয়েছে, বেশ হয়েছে—আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে।" তার পর বিছানাটা চাপড়ে বলতে লাগল—"তুমি আমার জায়গাটা পেয়েছ—এই ছিল আমার বিছানা।" তার পর পর্দ্দাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চুপি-চুপি বল্লে—"ঐখানে সিষ্টার আঁজ ঘুমোয়।" তারা দরজা বন্ধ করে চলে গেল; আমি বিছানা ঘেঁসে বসলুম। সেই প্রকাণ্ড সাদা পরদাটার দিকে চেয়ে আমার গা কেমন ছম্-ছম্ করছিল; আমার বোধ হতে লাগল যেন ঐ পরদার অন্ধকার ভাঁজে ভাঁজে নানা-রকম ছায়া নড়ছে। ঘণ্টা বেজে উঠল—শোনবা-

মাত্রই আমি বুঝতে পারলুম—এ খাবারের ঘণ্টা! আমি এক-দুই-করে গুণে যেতে লাগলুম—কেন যে গুণলুম তা জানি না। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তার পর সেই তরুণীটি আমার জন্যে এক বাটি গরম সুরুয়া—ধোঁয়া উড়ছে—হাতে করে ঘরে ঢুকল। সেই বড় পরদাটা সরিয়ে বল্লে—"এই হল তোমার ঘর, আর ঐটে আমার।" তার লোহার খাটিয়াটাও ঠিক আমার মতন,—দেখে আমি যেন আশ্বস্ত হলুম। আমার মনে-মনে ধাঁধা লাগছিল—এ-ই কি সত্যি সিষ্টার আঁজ! আমার বিশ্বাস করবার সাহস হচ্ছিল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে ফেল্লুম। সে ঘাড় নেড়ে বল্লে—"হাঁ।" তার পর তার চেয়ারখানা আমার খুব কাছে টেনে এনে মুখখানা ভালো করে আলোতে ধরে বল্লে—"আমায় চিনতে পারছ না?" না, আমি তাকে চিনতে পারলুম না। সত্যি আমার দৃঢ় ধারণা হতে লাগল আমি তাকে কখ্খনো দেখিনি—কারণ আমার বিশ্বাস সে-মুখ একবার দেখলে কখনো ভোলা যায় না। সে একটা মজার-রকমের মুখভঙ্গী করে বলে উঠল—"তাই ত দেখছি, বেচারা দেজিরে জোলীকে তোমার মনে নেই।" দেজিরে জোলী? তাকে খুব মনে আছে। তার মুখটি ছিল গোলাপ ফুলের চেয়েও লাল—বেশ তন্বী, ভারি সুশ্রী তার চেহারা—সমস্ত ক্ষণ হাসিটি মুখে লেগে আছে। আমরা সবাই তাকে ভালোবাসতুম। আমাদের সঙ্গে খেলবার সময় সে এত লাফালাফি করত যে মারি এসে প্রায়ই বলতেন—"আর নয়, অত উঁচু হয়ে নয় জোলী!—তোমার হাঁটু বেরিয়ে পড়েছে!" আশ্চর্য্য! এতক্ষণেও তার দিকে চেয়ে-চেয়েও আমি তাকে চিন্‌তে পারছিলুম না! সে বল্লে—"পোষাকে মানুষকে অনেক বদলে দেয়।" আমার হাতাটা টেনে উঠিয়ে আবার সেই মজার-রকমের মুখভঙ্গী করে সে বল্লে—"ভুলে যাও, আমি সিষ্টার আঁজ,—মনে রেখো আমি সেই দেজিরে জোলী যে তোমায় ভালোবাসত!" বলেই সে তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগল—"কিন্তু আমি তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম—এখনো তোমার সেই তেমনি ছেলে-মানুষের মতনই মুখ আছে।" আমি যখন বল্লুম যে সিষ্টার আঁজকে আমি একজন বুড়ী, বদমেজাজী বলে ঠাউরে নিয়েছিলুম, তখন সে বল্লে—"আমরা দুজনেই ভুল করেছিলুম। আমি শুনেছিলুম তুমি ভারি অহঙ্কেরে, দেমাকে; কিন্তু যখন দেখলুম তুমি বরফপড়ার মধ্যে বসে-বসে কাঁদছ তখন আমার মায়া করতে লাগল—তোমার কাছে ছুটে গেলুম।" আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে পরদাটা টেনে ঘরটাকে আবার দুভাগ করে দিলে। আমি ঘুম দিতে লাগলুম।

কিন্তু ভালো ঘুম হল না। মিনিটে মিনিটে জেগে উঠতে লাগলুম। আমার বুকের উপর একখানা ভারি পাথর যেন চাপানো ছিল—অনেক কষ্টে সেটাকে যেমন উঠিয়ে ফেল্লুম, সেটা খণ্ড খণ্ড হয়ে আমার উপরে পড়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁৎলে দিলে। তার পর স্বপ্নে দেখলুম যে আমি একটা রাস্তার উপর রয়েছি—রাস্তাটা সরু সরু ধারালো পাথরের কুঁচিতে ভর্ত্তি—

সেগুলো আমায় চারদিক থেকে বিঁধছে। অনেক কষ্টে আমি তার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। রাস্তার দুধারে ক্ষেত, আঙুরের লতা, আর বাড়ি-ঘর। বাড়িগুলো সব বরফে ঢাকা, কিন্তু গাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে রয়েছে, তার উপর রৌদ্রের উজ্জ্বল আভা ঠিকরে পড়ছে। আমি রাস্তা ছেড়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলুম, প্রত্যেক গাছের সামনে থেমে-থেমে তার ফলের আস্বাদ নিতে লাগলুম, কিন্তু কী বিশ্রী তার স্বাদ! —আমি ফল ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। বরফ-ঢাকা বাড়িগুলোর ভিতর যাবার একবার চেষ্টা করলুম কিন্তু দেখলুম সেগুলোর দরজাই নেই! আমি আবার রাস্তায় ফিরে গেলুম; অমনি চারিদিক থেকে পাথর এসে এত তাড়াতাড়ি আমায় ঘিরে ফেলতে লাগল যে আমার পা বাড়াবার যো রইল না। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলুম। চেঁচানিতে আমার গলা ফেটে গেল কিন্তু জন-মনিষ্যি কেউ সাড়া দিলে না। তারপর যখন দেখি, পাথরের স্তূপ আমার প্রায় সমস্ত গ্রাস করে ফেলে-আর-কি, তখন এমন প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলুম যে তাইতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ মনে হতে লাগল যে আমি তখনো স্বপ্ন দেখছি। ঘরের ছাদটাকে বোধ হতে লাগল যেন ভয়ানক উঁচুতে রয়েছে। যে দাওয়ায় পরদাটা ঝুলছিল তার জায়গা-জায়গা চিক্-চিক্ করছিল এবং দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা একটা ডালের ফেঁক্‌ড়ি কোনের কাছে ভার্জ্জিনদেবীর মূর্ত্তির উপরে কালো ছায়া ফেলছিল। হঠাৎ একটা মোরগ ডেকে উঠল—তার পর সে অনবরত ডেকে যেতে লাগল—যেন তার সেই প্রথম-ডাক যা একবার একটুখানি উঠেই যেন বেদনা-রুদ্ধ হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল, সেটা আমায় ভুলিয়ে দিতে চায়। ঘরের আলোটা মিট-মিট করতে আরম্ভ করলে,—অনেকক্ষণ ধরে মিট্-মিট্ করে তার পর নিভে গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি শুনতে লাগলুম সিষ্টর আঁজের নিশ্বাস উঠছে পড়ছে—তালে-তালে, ধীরে-ধীরে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আহোমরাজের বাঙ্গালী গুরু

রাজকার্য্যের অনুরোধে নদীয়া জেলায় অবস্থান-কালে একবার ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের ভিটা দেখিতে যাই। ফিরিবার পথে নিকটবর্ত্তী সিমুলিয়া গ্রামে কয়েকটি অট্টালিকা দেখিয়া সেগুলির সম্বন্ধে তথ্য জানিবার কৌতূহল হয়। সন্ধান করিয়া অবগত হই যে ইহার মধ্যে দুইটি বৃহত্তম সৌধে (১) আসামীয়া গোঁসাইদিগের বর্ত্তমান বংশধর-

(১) এই দুইটি অট্টালিকার মধ্যে একটি স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবং অপরটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অপর সরিকগণের বসত-বাটী।

গণের নিবাস। কোথায় নদীয়া, আর কোথায় আসাম! কেমন করিয়া বিদেশ-গমন-বিমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল, তাহার যে বিবরণী পাইলাম, তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক—বাঙ্গালার ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শোভাকর বংশের কুলপ্রদীপ পরম-শাক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ সিমুলিয়া-মালীপোতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিঙ্গরামারা বা টেঙ্গরামারার ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। আহোম রাজা রুদ্রসিংহ, পণ্ডিত-মহাশয়ের গুণগরিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; পরে আহোমরাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাৎকালীন নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুরাম রায়ের অনুমতি লইয়া আসাম গমন করেন। এ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী বা রাজার অনুমতি-গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নদীয়ার রাজ-সরকার হইতে স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরাদির ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বিবুধ-শুভানুধ্যায়ী নদীয়া-রাজের অজ্ঞাতসারে দেশ-ত্যাগ অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু কিম্বদন্তী-মূলক বৃত্তান্ত বিনা-বিচারে গ্রহণ করা সকল সময়ে নিরাপদ নহে।

রাজা রুদ্রসিংহ ১৬১৭ শকের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে সিংহাসনে অধিরোহণ এবং ১৩ই ভাদ্র ১৬৭৬ শকে দেহত্যাগ করেন। ইংরাজী ইতিহাসে তাঁহার রাজত্ব-কাল ১৬৯৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৭১৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত Pertsch সম্পাদিত "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতং" নামক নদীয়া রাজগণের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে রাজা রঘুরাম রায় ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন; সুতরাং রঘুরামের জীবিতাবস্থায় ন্যায়বাগীশ মহাশয় আসাম যাত্রা করিলেও তিনি যে তাঁহারই রাজত্ব-কালে এবং তদনুমতিক্রমেই দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে বা ১৮০১ খৃঃ অঃ রচিত রাজীবলোচন শর্ম্মার কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক ন্যায়বাগীশ মহাশয় যে রুদ্রসিংহ কর্তৃক আসামে আনীত হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আসাম বুরুঞ্জী গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং Gait সাহেবও তাহাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণরামের আগমনের পূর্ব্বে আহোমগণের মধ্যে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব অল্লাধিক মাত্রায় অনুভূত হইলেও হিন্দু আচার ও পূজা-পদ্ধতি তখনও সম্পূর্ণরূপে অবলম্বিত হয় নাই। কামাখ্যা মন্দিরে পূজার্চ্চনা-সম্বন্ধে যে প্রণালী আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অনুসৃত হইতেছে, তাহা ন্যায়-বাগীশ মহাশয় কর্তৃকই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে অনার্য্য বংশ-সম্ভূত স্বাধীন

রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুত্ব তথা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। আজ-কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, বাঙ্গালীরা আর্য্য নহে, মাত্র Dravido-Mongolian জাতি হইতে উদ্ভূত। এ কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে যে রক্ত-সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি হইয়াছিল, পার্ব্বত্য সান-জাতি-সমুদ্ভব আহোমগণের দেহে সে রক্ত প্রবাহিত ছিল না এবং তাহারা সে সময়ে বাঙ্গালীর ন্যায় মানসিক উৎকর্ষও লাভ করিতে পারে নাই। Ney Elias (নে এলিয়াস) প্রণীত সান জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই (vide p 9.) যে তাৎকালীন মাউংমান রাজের ভ্রাতা ও প্রধান সেনাপতি সামলুংফা প্রথমে আসাম জয় করেন এবং ইহারই কয়েক বৎসর পরে (বোধ হয় ১২২৯ খৃঃ অঃ) এই বংশোদ্ভূত চান-কা-ফা নামক অপর এক ব্যক্তি আসামের প্রথম আহোম রাজা বা শাসনকর্ত্তারূপে বৃত হন। নে এলিয়াস আসামের এ যুগকে ইংলণ্ডের নর্ম্মান যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি আহোম ইতিহাসের সূত্রপাত এইখান হইতেই। (—it holds a corresponding position to the Norman conquest of England and serves the purely Ahom race in Assam as a starting point from which to date their history. p. 9.) ১৭৮০ হইতে ১৭৯৫ খৃঃ অঃ মধ্যে রাজা গোরীনাথ সিংহ এক পণ্ডিত-সঙ্ঘ নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা শান বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সাহায্যে আহোম জাতির অতীত ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায়ের উদ্ধার সাধন করেন! আহোম ইতিবৃত্তের এ অংশটি নিতান্ত সামান্য নহে—সুত্রলী নদীতটে সান রাজধানী-সংস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম-জয় পর্য্যন্ত—ঘটনার বিস্তৃত বিবরণীতে এ অধ্যায় পূর্ণ।

হিন্দুয়ানীর ছায়ায় আসিয়া আহোমরাজগণ আপনাদিগকে "স্বর্গদেব" বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ কিম্বদন্তী প্রচারিত হইল যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের বংশধর স্বর্গ হইতে কোন-একখণ্ড লম্বমান রজ্জু বা শৃঙ্খলের সাহায্যে মর্ত্তে অবতরণ করিয়াছিলেন। এই লম্বমান রজ্জুর কল্পনাটিও অহিন্দু কল্পনা বলিয়া মনে হয় (২); কারণ, হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপুত্রকে বিমানচারী রথেই গমনাগমন করিতে দেখা গিয়াছে; কোন দিন রজ্জুর প্রয়োজন হয় নাই!

রুদ্রসিংহের পিতা গদাধর সিংহ বা গদাপাণি সিংহ ১৬৮১ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৯৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কথিত

(২) Ney Elias তাঁহার History of the Shans গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশীয় সান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রায় এইরূপ কিম্বদন্তীই প্রচলিত আছে। এই প্রবাদ-অনুসারে দেবরাজের পুত্রদ্বয় কুংলুং ও কুনলাই স্ব-স্ব বুদ্ধিহীনতার জন্য অসভ্য সানজাতিতে রূপান্তরিত হয় এবং তাহাদিগের সুচতুর মানব-বুদ্ধিবলে পরে চীনরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তাহারা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করে। Introductory Sketch of the History of the Shans of Upper Burmah. W. Yunnan p. 13)

আছে, তিনি এরূপ শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন যে হেলায়, মত্ত হস্তীর গতিরোধ করিতে পারিতেন! তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যের কথা শুনিলে নিষ্ঠাবান হিন্দু নিশ্চয়ই কানে হাত দিবেন—একটি দগ্ধ বা অর্দ্ধ-দগ্ধ গো-বৎস এবং তৎসহ রক্তাভ নূতন আউস তণ্ডুলের পর্য্যাপ্ত অন্ন! গেট সাহেব এ প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "The king is reported to have been of very powerful physique with a remarkably gross appetite. His favourite dish—coarse spring rice and a calf roasted in ashes." (p. 164)

এ-হেন রাজা গদাপাণি বা তাঁহার পুত্র যে বৈষ্ণব মত অপেক্ষা শাক্ত মতেরই বিশেষ পোষকতা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে! কিন্তু কোন নূতন ধর্ম্ম বা আচার-গ্রহণকালে প্রথমটা কিছু সঙ্কোচ অনুভব করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। রুদ্রসিংহের স্বাভাবিক বাঙ্গালী সভ্যতাপ্রীতি (৩) ও ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্ব্বে তাঁহাকে যথেষ্ট ইতস্তত করিতে হইয়াছিল। শুনা যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করাইয়াও কিছুকাল যাবৎ তিনি মতি স্থির করিতে পারেন নাই। দীক্ষাকালে নত মস্তকে "স্মরণ গ্রহণ" প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদিতেও তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। তাঁহার এইরূপ ইতি-কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া ন্যায়বাগীশ বিরক্ত হইয়া আহোম রাজ্য ত্যাগ করেন। সেই দিনই রাজ্যে ভূকম্প হয়। ব্রাহ্মণের ক্রোধই এই ভূমিকম্পের কারণ—ইহা মনে করিয়া কৃষ্ণরাম ঠাকুর মহাশয়কে রাজা অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহার হস্তে কামাখ্যা মহাপীঠ সংক্রান্ত পূজাদির ভার অর্পণ করেন। নামে হিন্দু হইলেও অনেকের মতই রুদ্রসিংহও পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ দাহ করা হইয়াছিল কি সমাহিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধেও মত-ভেদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। (৪) রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ পিতার অন্তিম আদেশ-ক্রমে সস্ত্রীক ন্যায়বাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেও নিজের আহোম নাম (সাতানফা) পরিত্যাগ করেন নাই।

বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ক্রম-পরিণতি আলোচনা করিলে দেখা যায়,

(৩) রুদ্রসিংহ বঙ্গদেশ হইতে গুরু গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কুচবিহার হইতে ঘনশ্যাম নামক বাঙ্গালী স্থপতিকেও রাজধানীতে আনাইয়া সুদৃশ্য সৌধ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া লন। ভারতীয় Master-builderগণ কেবল Havell সাহেবের উর্ব্বর কল্পনা-প্রসূত নহে।

(৪) আহোমগণ হিন্দুধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে আত্মীয়গণের মৃতদেহ পূর্ব্বদিকে মস্তক ও পশ্চিম দিকে পদদ্বয় সংন্যস্ত করিয়া সমাহিত করিত; শিয়রের নিকট একটি তৈল-পূর্ণ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিত—এবং উচ্চ পদস্থ মৃতের সঙ্গে রত্নালঙ্কারাদি—কখনও বা জীবিত দাস-দাসীও প্রোথিত করিয়া ফেলিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইহাতে পরলোকে মৃতের ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং দাস-দাসীর অভাবে কোন কষ্ট হইবে না।

লিঙ্গ ও যোনিমুদ্রা প্রভৃতির উপাসনা প্রাচীন আমেরিকায় মেক্সিকো, পেরু, চিলি ও ইউকাটানে এবং আফ্রিকায় মিশর প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত ছিল (৫)। আহোমদিগের মধ্যেও স্ত্রী এবং পুং চিহ্নের পূজা (membra conjuncta in coitu) ধর্ম্ম-বিবর্ত্তন-ফলে কতকাংশে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। (৬) রাজা গদাপাণি উমানন্দ ভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করান বটে কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বা তাঁহার সমসাময়িক স্বজাতিগণ যে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ন্যায় একই ভাবে শৈব বা শাক্ত মতবাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করদেব প্রথমে আহোম রাজ্যে নিজ ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন, কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। আহোম-দিগের জাতিগত প্রকৃতির সহিত ভালরূপ মিলে নাই বলিয়াই হউক বা রাজসভাস্থ ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই হউক, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথমে সেরূপ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তাহার পর বৈষ্ণব গোঁসাইগণের উপর দিয়া বহু অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব গোঁসাইগণের মধ্যে অনেকে শূদ্র বলিয়া আরও অধিকতররূপে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। খৃঃ সতের শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে দেখিতে পাই, রাজা প্রথম প্রতাপ সিংহের রাজত্বকালে মহা-পুরুষিয়াগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। গদাপাণি সিংহের রাজত্বকালে এ অত্যাচারের আর পরিসীমা ছিল না। ইংলণ্ডে রাণী মেরির রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ইতিহাস যেরূপ, আসামীয় বৈষ্ণবগণের ইতিহাসে গদাপাণির রাজত্বকালও কতকটা সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

যাহারা কোন নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা প্রায়ই সে ধর্ম্মের খুব গোঁড়া হইয়া থাকে। রাজা শিবসিংহ নিজ গুরুকে নীলাচল বা কামাখ্যা পীঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; তাঁহাকে

---

(৫) মেক্সিকো-বিজয়ী ফার্ণাণ্ডো কর্টেজের একজন সহচর লিখিয়াছেন, "In certain countries and particularly at Panuco they adore the phallus and it is preserved in temples." প্রাচীন মেক্সিকোর অন্যতম নগর ফাস্কালাতেও এইরূপ পূজা প্রচলিত ছিল। Squier's Serpent Symbol (p. 46) and Westropp's Primitive Symbolism (p. 33).

At philae Osiris was worshipped as the generative cause and Isis the receptive mould. (Westropp p. 13.)

(৬) পরস্পর-সম্পর্কশূন্য বিভিন্ন দূরবর্ত্তী দেশে একই প্রকার মূর্ত্তি বা চিহ্নের উপাসনা দেখিলে উহাকে মানব সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তন-ফল ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? Squier অপর একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন "......that the worship (sex worship) existed in countries a long time unknown to the world...with which the people of the eastern continent had formerly no communication is an astonishing but well-attested fact. (Serpent Symbol, p. 46)

প্রচুর অর্থ এবং কামরূপে বিস্তর জমি ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম কামাখ পর্ব্বতেই বসবাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা "পাহাড়িয়া গোঁসাই" (১) নামে বিখ্যাত হন। বৈষ্ণব গোঁসাই-সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে "ন গোঁসাই" বা "নতি গোঁসাই" নামেও অভিহিত করা হইত। সাধারণ্যে প্রচারোদ্দেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সমারোহে নদীয়ার ব্রহ্মশাসন-গ্রামে-উদ্ভাবিত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির পূজা করিতেন, গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে শিবসিংহও বোধ হয় সেই একই উদ্দেশ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া রাজবাটীতে দুর্গোৎসব-পর্ব্বের অনুষ্ঠান করান। ইহার পূর্ব্বে জাতি-দেবতা (Tribal God or Fetish) সমদেও বা সোমদেবের পূজা ব্যতীত প্রতীকোপাসনা রাজ-পরিবারে প্রচলিত ছিল না। শিব সিংহের রাণী ফুলসহ্‌রী বা ফুলেশ্বরী দেবী শাক্ত ধর্ম্মে বড়ই অনুরাগিনী ছিলেন। রাজার কোষ্ঠীতে গ্রহ-বৈগুণ্যে রাজ্য-চ্যুতির সম্ভাবনা আছে প্রকাশ পাওয়ায় গুরু ও অমাত্যগণের পরামর্শে রাণী ফুলসহ্‌রী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাণী কার্য্যতঃ রাজা-অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালিনী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় জনসাধারণ তাঁহাকে "বর-রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই "Grey mare is the better horse" এই ইংরাজী প্রবাদ-বাক্যটি মনে পড়ে। কাহারও কাহারও মতে রাজার পাটরাণীকেই "বর-রাজা" বলা হইত; কিন্তু ফুলেশ্বরীর ন্যায় অপর কোন আহোম-পাটরাণীর প্রতিমূর্ত্তি রাজার সহিত একত্র রাজ-মুদ্রাদিতে অঙ্কিত দেখা যায় না। ইতিপূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসে বোধ হয় কেবল নূরজাঁহার অদৃষ্টেই এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব গোঁসাইগণ শক্তি পূজার প্রতি বিমুখ বলিয়া রাণী ফুলেশ্বরী তাহাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। মোয়া-মারিয়ার মোহান্ত প্রভৃতির প্রতি বিশেষ উৎপীড়ন করা হয়। রাণীর আদেশে বৈষ্ণব গোঁসাইদিগকে ধরিয়া আনাইয়া জোর করিয়া দেবী প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করানো হইত এবং রক্ত চন্দনের সহিত বৈষ্ণবোপাসকের অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু পশু-বলির "তেজ" বা

(১) আমরা "গোঁসাই" বলিলে সাধারণতঃ বৈষ্ণবদিগের গুরুই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু আসামে শক্তি মূর্ত্তিকেও গোঁসাই নামে অভিহিত করা হয়।

এই মোয়ামারিয়া সম্প্রদায়ের লোকদিগের দ্বারাই পরে আহোম রাজ্যের অধঃপতন ঘটে। "মোয়া" এক প্রকার মৎস্যের নাম। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে বিলের নিকটে বাস করিয়া মৎস্য ধরিত বলিয়াই বিদ্রূপচ্ছলে তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হয়। Gait রাজা শিবসিংহের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "Thanks to his support, Hinduism became the predominant religion and the Ahoms who persisted in holding to their old beliefs and tribal customs came to be regarded as a separate and degraded class" বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার একটি সুন্দর analogy আছে। মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে বৌদ্ধ আচার পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব করার জন্যই সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি জাতিগণের এইরূপ সামাজিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল। (Introduction to N. N. Vasu's "Buddhism in Orissa")

রুধির মিশ্রিত করিয়া তাঁহাদিগের ললাটে তদ্বারা ফোঁটা-তিলক দেওয়ানো হইত। এইরূপে ফুলেশ্বরীর প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী-বুদ্ধিতে দেশে অশান্তির সূত্রপাত হয়।

ক্রমে আহোমগণ ম্লেচ্ছ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আচার গ্রহণ করিল। যাহারা প্রাচীন প্রথা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিল না, তাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইল। আজকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার জন্য অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি বিবিধ অনুষ্ঠান-আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন; কিন্তু মাত্র দুই শতাব্দী পূর্ব্বে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চেষ্টায় গো-খাদক অনার্য্য জাতি কিরূপে নিরুপদ্রবে হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে হয়!*

শ্রীগুরুদাস সরকার।

স্ত্রীলোকের ভিক্ষুজীবন ও বৌদ্ধধর্ম্ম

বেদপন্থীর প্রাচীন শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কি না, ইহা লইয়াই আলোচনাটা আরম্ভ করা যাউক। ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের বিশেষ-বিশেষ মন্ত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এই সমস্ত স্ত্রী-ঋষিরা ব্র হ্ম বা দি নী নামে কথিত হইয়া থাকেন। বৃহদ্দেবতাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে—"ব্র হ্ম বা দি ন্য ঈরিতাঃ।" ব্রহ্মবাদিনী-শব্দের অর্থ—যিনি ব্র হ্ম অর্থাৎ বেদকে ব লে ন, অর্থাৎ বেদ বা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। † যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী ব্র হ্ম বা দি নী ছিলেন, ইহা ব্রাহ্মণেরই অক্ষরে দেখা যায় ("তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্র হ্ম বা দি নী বভূব"—বৃহদারণ্যক, ৪. ৫. ১)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত বৈদিক স্ত্রী-ঋষি ব্রহ্মবাদিনীরা যে, সংসারত্যাগিনী ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সংহিতায় ব্র হ্ম বা দী শব্দ অনেক আছে (অথর্ব্ব, ১১. ৩. ২৬; ১৫. ১. ৮; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭. ৪. ১০. ১—২; ইত্যাদি), কিন্তু উহা সন্ন্যাসীকে বুঝাইতেছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অতএব ব্রহ্মবাদিনী শব্দও ঠিক সন্ন্যাসিনীকে বুঝাইছে বলিতে পারা যায় না। বিশেষত, সংহিতার সময়ে সন্ন্যাস-প্রথার প্রমাণ নাই, ইহা স্থানান্তরে বলিয়াছি (প্রাতিমোক্ষ, প্রবেশক, ২০ পৃ.)।

---

* এই প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্য নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট প্রাপ্ত একখানি পত্র হইতে অবগত হইয়াছি; সে জন্য পত্র-লেখক ও মহারাজ বাহাদুরের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

† সায়ণ অথর্ব্বভাষ্যে (১১. ৩. ২৬) ইহাই বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বেদঃ তদ বদিতুং শীলম্ এষাম্ ইতি ব্রহ্মবাদিনঃ, ব্রহ্মবিচারকা মহর্ষয়ঃ।"

তবে হইতে পারে, ঐ ব্রহ্মবাদিনীদের কেহ-কেহ মৈত্রেয়ীর ন্যায় পরিণীতা হইয়া সংসারিণী ছিলেন, কেহ-কেহ বা পরিণীতা না হইয়া আকৌমার ব্রহ্মচারিণীই ছিলেন। ইহা মনে করিবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণেরই মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গীর নাম দেখিতে পাই (বৃহদা. ৩. ৬. ১, ৮. ১ ১২), তিনি পরিণীতা হন নাই, সংসারিণী ছিলেন না। যদিও বৃহদারণ্যকের কোনো লেখায় ইহা বলা হয় নাই, তথাপি ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরিষদে ঐরূপ নির্ভীক ব্রহ্মবিচারে কতকটা এই ভাব সূচিত হইতে পারে। যে ভারতে শ্বশুরকেও দেখিয়া বধূরা লজ্জিত হইয়া থাকেন, † সেখানে পরিণীত কন্যারা ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। ইহা যাহাই হউক, শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গার্গী পরিণীতা হন নাই। তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলেন না ("রৈক্ব-বাচক্নবী-প্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুতেরবগমাৎ"—বেদান্ত. ৩. ৪. ৩৬; দ্রষ্টব্য ঐ ৩৬—৩৯)। এখানে ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে গার্গী কোনো আশ্রমেই ছিলেন না, অনাশ্রমিণী ছিলেন; কিন্তু জপ উপবাস দেবতারাধনাদি করিতেন, ইহাতেই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা ছিল।

ধর্ম্মশাস্ত্রের বা গৃহ্যসূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, পরে ব্রহ্মবাদিনী শব্দ কুমার ব্রহ্মচারিণী অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। হারীত (২১. ২৩) বলিতেছেন ‡ "স্ত্রীজাতি দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, অগ্নীন্ধন (অগ্নিতে সমিদাধান), বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা। আর সদ্যোবধূগণের বিবাহ উপস্থিত হইলে কোনোরূপে উপনয়ন দিয়া বিবাহ দিতে হইবে।"

এখানে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মশাস্ত্রকার যম স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন—

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥"

পণ্ডিতেরা (মাধবাচার্য্য-প্রভৃতিও) পুরাকল্প শব্দের এখানে অর্থ করেন প্রাচীন কল্প,—বর্ত্তমান কল্প নহে; অর্থাৎ এই ব্যবহার পূর্ব্ব সৃষ্টিতে ছিল, আমরা যে সৃষ্টিতে আছি তাহাতে নহে। আমার মনে হয়, পুরাকল্প শব্দ এখানে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অংশবিশেষকে বুঝাইতেছে। মীমাংসাদর্শনের বৃত্তিকার বলিয়াছেন (২. ১. ৩৩), ব্রাহ্মণের "হেতুনির্ব্বচনং নিন্দা"...ইত্যাদি দশটি লক্ষণের মধ্যে একটি পুরাকল্প। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে পুরাকল্পও থাকে। শবরস্বামী ইহার উদাহরণ দিয়াছেন—"উল্মুকৈর্হস্ম পূর্ব্বে সমাজগ্মুঃ"—পূর্ব্ববর্ত্তিগণ উল্মুক

† শ্বশুরকে দেখিয়া পুত্রবধূদের লজ্জা বৈদিককালেও দেখিতে পাওয়া যায়—"তদ্‌যথৈবাদঃ স্নুষা শ্বশুরাল্লজ্জমানা নিলীয়মানা।" ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৩প. ১২ অ. ১১অ.।

‡ পরাশরসংহিতার মাধবাচার্য্যকৃত ভাষ্যে ধৃত (Bombay Sanskrit Series, Vol. I, Part II. P. 82):—"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্য্যা ইতি। সদ্যোবধূনাং তুপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

(জ্বলন্ত-অঙ্গার) লইয়া আসিয়াছিলেন (প্রসিদ্ধি আছে)। সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় নিরুক্তালোচনে (১৯২ পৃ) আর একটি উদাহরণ দিয়াছেন—"পুরা ব্রহ্মণা অভৈষুঃ" —পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা ভয় পাইয়াছিলেন। এই পুরাকল্পের মধ্যে কুমারীদের উপনয়নাদি ছিল, ইহাই যেন যম বলিয়াছেন। শ্লোকের অন্তর্গত "ইষ্যতে" পদটিও ইহাই সূচনা করিতেছে।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ-কেহ যে, পরিণীতা না হইয়া, সংসারাশ্রমে না যাইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুজীবন যাপন করিতেন, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে ইহা বহুলভাবে প্রমাণ করিতে পারা যায়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে শ্র ম ণী * শবরীর উল্লেখ আছে। ইনি "চিরকৃষ্ণাজিনাম্বরা," "জটিলা" (৭৪. ৩৩), "সিদ্ধা", "সিদ্ধসম্মতা," "বৃদ্ধা", "তাপসী" (৭৪. ১০) ছিলেন। পম্পার পশ্চিম তীরে ইঁহার "রম্য আশ্রম" (৭৪. ৪) ছিল। ইনি মতঙ্গশিষ্য-ঋষিগণের পরিচারিণী ছিলেন (৭৩. ২৬; ৭৪. ২৯), "গুরুশুশ্রূষা" করিতেন (৭৪. ৯)। এস্থানে একটি কথা বলা মন্দ নহে, এই শ্রমণী শবরজাতীয়া ছিলেন না, তাঁহার নামই শবরী ছিল ("শ্রমণী শ ব রী না ম," —৭৩. ২৬)। তিনি যে ঋষিদের পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহাদের গুরুরও নাম ছিল ম ত ঙ্গ (তুলঃ—মাতঙ্গ-চণ্ডাল)। শ্রমণী শবরীর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না, রামায়ণে তাহা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত যে, ভিক্ষুজীবন যাপন করিয়াছেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে অষ্টাবক্রের সহিত যখন সেই বৃদ্ধার আলাপ হয়, তখন তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কৌ মা র ব্র হ্ম চ র্য্য, অর্থাৎ কুমারী হইতেই তিনি ব্রহ্মচারিণী আছেন, তিনি তখনো ক ন্যা (কুম্ভকোণম্-সংস্করণ, ৫১ ২২)। †

মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা কৌ মা র-ব্র হ্ম চা রি ণী ছিলেন। তিনি যো গ যু ক্ত, ত পো যু ক্ত, ও নি য় ত হইয়া ব্রত ধারণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন। তিনি ব্রা হ্ম ণী ছিলেন। ‡

মহর্ষি গার্গ্যের একটি কন্যা হইয়াছিল। পিতা কন্যাকে যে বরের নিকট সম্প্রদান করিতেছিলেন, সে বর কন্যার অভিমত হয় নাই—তাঁহার সদৃশ হয় নাই। তাই তিনি

---

* শ্র ম ণ শব্দ ব্রাহ্মণেও রহিয়াছে। "শ্রমণোঽশ্রমণঃ" বৃহদা, ৪, ৩, ২২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২-৭।

† কৌ মা রং ব্র হ্ম চ র্য্যং মে, ক ন্যৈ বা স্মি ন সংশয়ঃ।
পত্নীং কুরুষ মাং বিপ্র, শ্রদ্ধাং বিজহি মা মম॥"

‡ "অত্রৈব ব্রা হ্ম ণী বৃদ্ধা কৌ মা র ব্র হ্ম চা রি ণী।
যো গ যু ক্তা দিবং যাতা ত পো যু ক্তা বিশাং পতে॥
বভূব শ্রীমতী রাজ্ঞ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নি য় তা ব্র হ্ম চা রি ণী॥"

মহাভারত, শল্য, ৫৫, ৩—৭।

কৌ মা র ব্র হ্ম চা রি ণী হইয়াছিলেন। এবং এইরূপেই তিনি বৃদ্ধা হন। *

মহাভারতে ভি ক্ষু কী সুলভার সহিত রাজর্ষি জনকের সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ (শান্তিপর্ব্ব, ৩২৫ অধ্যায়)। সুলভা রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়া (১৮২-১৮৩) ছিলেন,—যদিও জনক ইঁহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়াই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন (৫৯)। তিনি নিজের অভিমত স্বামী না পাইয়া মোক্ষধর্ম্মে শিক্ষালাভ করেন এবং মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া একাকিনী সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেন (১৮৫)। † জনকের রাজসভায় তর্কবিদগণের মধ্যে ("সর্ব্বভাষ্যবিদাং মধ্যে" ৫৫) তাঁহার সহিত জনকের যে বিচার হয়, তাহাতে পরিশেষে জনককেই নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। ‡

বৃহদারণ্যকের গার্গীর সহিত মহাভারতের সুলভার তুলনা হইতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতের কাল লইয়া খুবই বিবাদ রহিয়াছে। অতএব ইহাদের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও বৃহদারণ্যকের গার্গী এবং মহাভারতের সুলভার § উল্লেখেই বলিতে পারা যায়, বুদ্ধপন্থী বা জীনপন্থীর পূর্ব্বেই বেদপন্থীর সমাজে স্ত্রীলোকেরা কুমারব্রহ্মচারিণী হইতেন, এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণও করিতেন। হারীত-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কথাটাই খুব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

বিনয়ের অনেক স্থানে (মহা. ১. ২৩. ২৪ ; ২ ১. ১, ২ ; ইত্যাদি ; চুল্ল. ৫. ২৩,

---

* "সা পিত্রা দীয়মানাপি পতিং নৈচ্ছদনিন্দিতা।
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্ত্তারং নাম্বপশ্যত ॥
* * *
জগাম বৃ দ্ধ ভা বং তু কৌ মা র ব্র হ্ম চা রি ণী।
বার্দ্ধকেন চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব কর্শিতা ॥
মহাভারত, শল্য, ৫৬, ৭ ৯।

† সাহং তস্মিন্ কুলে যাতা ভর্ত্তর্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতা ॥"
অথ ধর্ম্মযুগে তস্মিন্ যো গ ধ র্ম্ম ম নু ষ্ঠি তা।
মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী ॥"
তয়া জগদিদং কৃৎস্ন ম ঠ স্ত্যা ॥"...৭-৯।

‡ বেদপন্থীদের অনতিপ্রাচীন সাহিত্যেও কুমারব্রহ্মচারিণী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শকুন্তলায় রাজা প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সম্বন্ধে যে, জিজ্ঞাসা করেন "আহো নিবৎস্যতি চিরং হরিণাঙ্গনাভিঃ"—অথবা ইনি কি চিরকাল হরিণীদের সঙ্গে বাস করিবেন?—ইহাও সূচনা করিতেছে যে, শকুন্তলা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হইবেন কি না। উত্তররামচরিতের আত্রেয়ীও স্পষ্টই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী, তিনি "নি গ মা স্ত বিদ্যা" অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকির নিকট হইতে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন।

§। সুলভার নাম আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (৩. ৪. ৪) যাহাদের নামে তর্পণ করিতে হইবে, তাহাদের সহিত দেওয়া হইয়াছে :—"সুমন্ত—গার্গী-বাচক্নবী বড়বা প্রাতীথেয়ী (প্রাতি॰)—সু ল ভা মৈত্রেয়ী...।"

২; ইত্যাদি; সুত্তবি-ভিক্ষুপ্রা. সজ্ঘা. ৩. ৪. ৭; পাচি. ৪১—১, ইত্যাদি।) প রি ব্রা জ ক ও প রি ব্রা জি কা র উল্লেখ আছে। এই পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা কোন্-পন্থীর সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে বুঝাইতেছে, তাহাও বিনয়েরই লেখায় জানা যায়।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বুঝাইতে বিনয়ে সর্ব্বত্র ভি ক্ষু ও ভি ক্ষু ণী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী সর্ব্বত্র প রি ব্রা জ ক ও প রি ব্রা জি কা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। চুল্লবগ্‌গে (৫. ২৩. ২) এক জন (বৌদ্ধ) উপাসক আজীবক শ্রাবকগণের নিকট কতকগুলি সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"আর্য্য, ইঁহারা ভি ক্ষু নহেন, প রি ব্রা জ ক।" বক্ষ্যমাণ কয় স্থানে এই কথাটা খুবই পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষের ৪১শ পাচিত্তিয়টি এই (প্রাতিমোক্ষ, পৃ. ৩১, ৮৪):—

"যে-কোন ভিক্ষু অচেলক, বা পরি-ব্রাজক, বা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য বা ভোজ্য প্রদান করিবে, তাহার প্রায়শ্চিত্তিক।"

এখানে অ চে ল ক প্রভৃতি তিনটি শব্দের অর্থ সুত্তবিভঙ্গে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে (পৃ. ২০৪):—অ চে ল ক বলিতে যে-কোন প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত ন গ্ন। প রি ব্রা জ ক বলিতে ভি ক্ষু ও শ্রা ম ণে র ছা ড়া প্রব্রজ্যা-প্রাপ্ত যে-কোন ব্যক্তি। প রি ব্রা জি কা বলিতে ভি ক্ষু ণী, শি ক্ষ মা ণা ও শ্রা ম ণে রী ছাড়া প্রব্রজ্যা-প্রাপ্ত যে-কোন স্ত্রী।" দ্রষ্টব্য সুত্ত-বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ পাচি. ২৮; ৪৬।

ত্রিপিটকে অ চে ল, আ জী ব ক, জ টি ল, তে দ ণ্ডি ক (অঙ্গুত্তর, Vol. III P. 276.), নি গ ণ্ঠ (নির্গ্রন্থ), প রি ব্‌ বা জ ক, মা গ ণ্ডি ক (অঙ্গুত্তর, Vol. III, P. 276.), মু ণ্ড, ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের সাধার[ণ] নাম হইতেছে তি ত্থি য় (তীর্থিক) উল্লিখিত নামগুলি ইহাদের মূল স্থানে[র] সহিত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে এক-একটি সম্প্রদায়ে[র] অবান্তর সম্প্রদায়েরও নাম করা হইয়াছে যেমন উরুবেল কস্‌সপকে (উরুবি[ল্ব] কাশ্যপ) জটিল বলা হইয়াছে (মহা. ১. ১ ইত্যাদি)। ইনি যে, বেদপন্থী যাজ্ঞি[ক] অগ্নিহোত্রী ছিলেন (মহা. ১. ১৯. ১ ২০. ১৯), তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই নদীকাশ্যপ, ও গয়াকাশ্যপও এইরূ[প] জ টি ল ছিলেন (মহা. ১. ১৫, ১০; ২ ২০—২২)। আবার তে দ ণ্ডি ক অর্থ ত্রৈ দ ণ্ডি ক ও যে বেদপন্থী তাহাও সুপ্রসিদ্ধ জটিল ও তেদণ্ডিকের মধ্যে এই ভেদ [যে] জটিলগণ কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিক ছিলেন, এ[বং] তেদণ্ডিকেরা কর্ম্মসন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন তেদণ্ডিক শব্দের এই অর্থই প্রসিদ্ধ এইরূপ ভেদ আছে বলিয়াই অঙ্গু[ত্তর] নিকায়ে (Vol III P. 276) এব[ং] বাক্যে উহাদের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ আ[ছে] নিগণ্ঠ ও অচেলক অর্থত ও বস্তুতও একই নগ্ন জৈন সন্ন্যাসী, কিন্তু ত্রিপিটকের [লেখা] দেখিয়া বোধ হয়, উহাদের মধ্যেও কি[ছু] অবান্তর ভেদ আছে। তাই একই বা[ক্যে] উহাদের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ দেখা [যায়] (সংযুত্ত, ৩. ২. ১. ৩; vol. I. P. 78

পরিব্রাজক ও এইরূপ বেদপন্থীর সন্ন্যাসীকে বুঝায়। ত্রিপিটকের মধ্যে পরিব্রাজকের এমন কিছু সুস্পষ্ট বর্ণনা দেখা যায় না, যাহাতে তাহাকে সম্প্রদায়বিশেষের বলিয়া একবারে নিশ্চয় করা যায়; কিন্তু যেটুকু বিবরণ আছে তাহাতে একটা নিশ্চয় করিতে হইলে বেদপন্থীর ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের বলা যাইতে পারে না। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৩৯. ২-৫; Vol. IV. P. 35) ব্রহ্মচর্য্য-কালের (১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ বৎসর) যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সেখানে পরিব্রাজক-শব্দ বেদপন্থী সন্ন্যাসীকেই বুঝাইতেছে, ইহা বলিতে হইবে (দ্রষ্টব্য প্রাতিমোক্ষ, প্রবেশক, ২০ পৃঃ)। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন প্রচারিত হয়, বা ত্রিপিটক (অথবা দ্বিপিটক, সূত্র ও বিনয়) রচিত হয়, তখন যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল (যেমন, আজীবক, অচেলক, নিগণ্ঠ, জটিল ইত্যাদি) তাহাদেরই পৃথক্-পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ আছে।* ভিক্ষু-শব্দ যে ত্রিপিটকে কেবল বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বুঝায়, তাহাও উক্ত হইয়াছে। ইহাতেও মনে হয়, বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিব্রাজক বেদপন্থীর সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কেহ নহে।

অতএব পরিব্রাজিকা বলিতে বেদপন্থীরই সন্ন্যাসিনীকে বুঝিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচ্য স্থলে (ভিক্ষুপ্রা. পাচি ৪১) পরিব্রাজক-পরিব্রাজিকা এই উভয়ই শব্দ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিন্ন সমস্ত সম্প্রদায়েরই সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। † উক্ত পাচিত্তেয়ের উৎপত্তির মূলে আজীবকের সম্বন্ধ থাকায় (প্রাতিমোক্ষ ২০৪ পৃ.) নিয়মটির মধ্যে যদিও আজীবক-শব্দ থাকিলে ঠিক হইত, তথাপি অচেলক (নগ্ন জৈন) ও আজীবকের অনেকটা একই ভাব থাকায় উভয়ের অভেদ মনে করিয়া অচেলক শব্দই দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ শব্দটি না দিলেও পরিব্রাজক শব্দে তাহাকেও এখানে বুঝিতে পারা যাইত।

ভিক্ষুণী অর্থাৎ শাক্য ভিক্ষুণীর পূর্ব্বে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরো সন্ন্যাসিনী ছিল, উল্লিখিত বিবরণে ইহা স্পষ্ট জানা যাইবে। ত্রিপিটকেরই অন্যান্য লেখায় ইহা আরো সমর্থিত হয়। ‡ অতএব বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে ভিক্ষুণীর সৃষ্টি নূতন নহে। ভিক্ষুণী সঙ্ঘেরও সৃষ্টি নূতন বোধ হয় না। পরিব্রাজিকারা (অর্থাৎ ভিক্ষুণী, শিক্ষমাণা ও শ্রামণেরী ছাড়া যে-কোনো সন্ন্যাসিনী; দ্রষ্টব্য—প্রাতিমোক্ষ, ২০৪ পৃ.) যখন ছিল,

* "সত্ত চ জটিলা, সত্ত চ নিগণ্ঠা, সত্ত চ অচেলা, সত্ত চ একসাটকা, সত্ত চ পরিব্বাজকা।" সংযুত্ত, ৩, ২, ১, ৩—(Vol. I P. 74)." দ্রষ্টব্য—অঙ্গুত্তর, Vol. III. p. 267. একস্থানে পরিব্রাজকের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে (সংযুত্ত ঐ) "পরূল্হকচ্ছনখলোমাঃ", এখানে "কচ্ছ" শব্দটির অর্থ আমার নিকটে সুস্পষ্ট নহে। তথাপি বোধ হয়, ইঁহারাও কেশ-শ্মশ্রু, নখ রাখিতেন।

† অঞ্ঞতিত্থিয়া পরিব্বাজকা (মহা, ২, ১, ১)"—এখানেও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া অপর সম্প্রদায়ের (প্রধানত জিনপন্থীর) সন্ন্যাসীকে বুঝাইতেছে।

‡ "এই যে শাক্য-দুহিতারা শ্রমণী হইয়াছেন, ইঁহারাই কেবল শ্রমণী নহে, আরো শ্রমণী রহিয়াছে।" —ভিক্খুনীপাতি. সঙ্ঘা ১০। "আজীব কিনিয়ো"—Anguttara. Vol. III 384.

এবং তাহারা অনেকে একত্র আহারাদি করিতে যাইত (সুত্তবিভঙ্গ, ভিক্ষুপ্রা. ৪১), তখন বুঝা যাইতেছে, তেমন নিয়মবদ্ধ না হইলেও, সেই সন্ন্যাসিনীদের একটা দল ছিল। ত্রিপিটকের তীর্থিকগণের মধ্যে নিগণ্ঠ অর্থাৎ নিগ্রন্থ বা জৈনদিগের বহুল উল্লেখ আছে। বুদ্ধঘোষ আলোচ্য স্থলে (প্রাতিমোক্ষ ২০৪ পৃ.) অচেলক, পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা অর্থে সাধারণত "অন্য তীর্থিকগণ" এইমাত্র বলিয়াছেন। এই অন্য তীর্থিক সন্ন্যাসিনীগণের মধ্যে নিগণ্ঠ বা জৈন সন্ন্যাসিনী ছিল না, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জৈনগণেরও প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাদের মতের সন্ন্যাসিনীদের অনেক কথা ও নানা বিধি-বিধান পাওয়া যায়। *

বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকগণকে সন্ন্যাস দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্মবিনয়ে স্ত্রীজাতি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেখানে ব্রহ্মচর্য্য বেশী দিন থাকে না। † ইহাতে মনে হয় বুদ্ধদেব তাৎকালিক অন্যান্য ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের অবস্থা দর্শন করিয়াই এই কথা বলিয়া থাকিবেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে বলিতে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে ভিক্ষুণী বা ভিক্ষুণী সঙ্ঘ একবারে নূতন সৃষ্টি নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* জৈন-সন্ন্যাসিনীরা অজ্জা অর্থাৎ আর্য্যা বা আর্য্যিকা নামে প্রসিদ্ধ। আবার ভিক্ষুণী নামেও ইঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন (আচরাঙ্গসূত্র, ২. ১. ১. ১, ইত্যাদি)। জিনসেন-কৃত মহাপুরাণে দেখা যায়, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নামে দুই ভগিনী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইঁহাদের বিবাহই হয় নাই। ইঁহারা পিতার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা চেতকের কন্যা চন্দনা মহাবীরের শিষ্যা ছিলেন ইঁহারো বিবাহ হয় নাই, একবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ৩৬,০০০ সহস্র আর্য্যা বা ভিক্ষুণীর অধ্যক্ষ (গণিনী) ছিলেন (কল্পসূত্র, S. B. E. ৩৫)। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের ৩,২০,০০০ জন ভিক্ষুণী শিষ্য ছিল। গুণভদ্র-কৃত উত্তরপুরাণে অন্যান্য তীর্থঙ্করেরও এইরূপ ভিক্ষুণীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

ভিক্ষুণীগণের উল্লিখিত সংখ্যার অঙ্ক অতিরঞ্জিত মনে হইলেও, পূর্ব্বে যে, জৈনধর্ম্মে ভিক্ষুণী হইবার প্রথা ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। রবিষেণ-কৃত পদ্মপুরাণে দেখা যায়, সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিবার পর আর্য্যিকা হইয়াছিলেন। ভগবতী-আরাধনা ও মূলাচার প্রভৃতি গ্রন্থে আর্য্যিকাদের আচার-সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম দেখা যায়। আচারাঙ্গসূত্র ও কল্পসূত্রাদি প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহাদের নানা নিয়ম রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীশীতলপ্রসাদজী, শ্রীপান্নালাল বাকলীবালজী ও শ্রীকুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদজী জৈন-সন্ন্যাসিনীদের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

† "যস্মিং ধম্মবিনয়ে লভতি মাতুগামো অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজ্জং ন তং ব্রহ্মচরিযং চিরট্ঠিতিক হোতি।" চুল্ল, ১০-১-৩।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক যুবক *

আধুনিক যুবকদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

যৌবনের আর যে যে লক্ষণই থাক্, একটা প্রধান লক্ষণ উৎসাহ। বড় চিন্তায় উৎসাহ, বড় কথায় উৎসাহ, বড় কাজে উৎসাহ। এই উৎসাহ জিনিষটা যৌবনের দেহে রক্তসঞ্চালনের মত, ইহা যতদিন থাকে ততদিনই স্বাস্থ্যের আনন্দ যৌবনকে তাজা করিয়া রাখে। উৎসাহের তাপ ও গতি যতই কমিতে থাকে, বড় চিন্তার প্রতি টান ততই মন্দীভূত হয়, বড় কথা ততই ফাঁকা বলিয়া ঠেকে এবং বড় কাজের উপর ভরসা আর থাকে না।

আমি যদিও যুবক এবং কোন কালেই বুড়ো হইতে ইচ্ছা করিনা, তবু ঠিক কলেজ-পড়ুয়া তরুণবয়স্ক ছাত্র এখন নই বলিয়া আমার ছাত্র-জীবনে কবি-সম্বন্ধে কি রকম উৎসাহ বোধ করিতাম, তাহা একটুখানি ছাত্রদের কাছে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ছেলে-বয়সে যখন কবির কবিতা পড়িতাম, "ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে", "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা", কিম্বা গান গাহিতাম "তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার", তখন কোন কবিতার অর্থ বুঝিবার বয়স নয়, অর্থ বুঝিবার দরকারও ছিলনা। শুধু মনে পড়ে মনটা কি রকম উতলা হইয়া উঠিত, সমস্তই কি ভাল লাগিত! তখনকার সে ভাল-লাগাটাকে ব্যাখ্যা করার কোন উপায় নাই, কারণ বলিতে গেলেই তাহাতে এখনকার সুর আসিয়া পড়িবে ও সব মাটী হইয়া যাইবে। তখন কবিকে মনে হইত যেন কোন্ ইন্দ্রচাপবিচিত্র তুঙ্গাভ্রলোকবাসী। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-কথার রূপলোকের কাম্য বস্তুটি হইয়া তিনি ছিলেন আমার সেই তরুণ মনটিতে, আমার শৈশব-কল্পনায়।

যৌবনে একদিন তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিলাম এবং সব-চেয়ে আশ্চর্য্য লাগিয়াছিল যে তিনি প্রথম আলাপেই আমার মত অর্ব্বাচীনের সঙ্গে দুঘণ্টা ধরিয়া কথা বলিয়াছিলেন। তখন রূপকথার রাজ্যে আর বাস করি না। তখন কঠিন বাস্তব-লোকের সমস্ত দরজাগুলি খুলিয়াছে, নানা সংশয়-দ্বন্দ্ব সেখানে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে। সেই সময়, যখন সঙ্গের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন অথচ সঙ্গ সব চেয়ে বেশি দুর্লভ, বয়স্কদের আসরে যখন অনুগ্রহ-মিশ্রিত নৈতিক উপদেশ ভিন্ন অনুরাগ-মিশ্রিত সজীব সঙ্গ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং নিমজ্জিত নৌকার আরোহীরা যেমন পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া পরস্পরকে ডুবাইবারই যোগাড় করে তেমনি সমবয়সীরা ভালবাসিয়া সংশয়-দ্বন্দ্বকে

---

* গত ২১শে মাঘ ছাত্রসমাজের অধিবেশন উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে পঠিত।

সরাইতে গিয়া তাহাদিগকে আরো প্রবল করিয়া তোলে, তখন, সেই সঙ্কটের সময় অমন সঙ্গলাভ কি সৌভাগ্য! যে কোন কথা লইয়া গিয়াছি, দ্বার সর্ব্বদাই অবারিত, সময় সর্ব্বদাই অসঙ্কুচিত। মানুষের জগৎ যে কি আশ্চর্য্য, এই জীবন যে কি সুগভীর, বিশ্বপ্রকৃতি যে কি পরমসুন্দর, সর্ব্বদাই তাহারি বিচিত্র নূতন উপলব্ধির অপূর্ব্ব রণনে অনুরণিত হইয়া ফিরিয়াছি, সে অনুরণন ত আজও ভুলিবার নয়!

> "Music when soft voices die
> Vibrates in the memory."
> মধুকণ্ঠে গান যবে মিলায়
> স্মৃতিতে তার রেশ নাহি যায়।

কতদিন কলেজ পালাইয়া তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি তাহাও মনে পড়ে, কিন্তু সেটা নাকি লজ্জার বিষয়, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি কাহাকেও উৎসাহিত করিতেছি এমন সন্দেহ কেহ যেন না করেন।

নিজের সেই ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করিয়া মনে হয় যে, কবির সম্বন্ধে কবিতা সম্বন্ধে—শুধু তাই কেন—কোন বড় জিনিস সম্বন্ধে এই উৎসাহ জিনিসটা এখনকার ছাত্রদের মধ্যে আছে কিনা আমি জানিনা। এ উৎসাহ বিচার-বিতর্ক করেনা, ইহার মধ্যে অনেক মূঢ়তা থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বস্তু ইহার মধ্যে আছে—তাহা প্রাণ। এখন অবশ্য বিচার করি, বিতর্ক করি, কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে যদি করিতাম তবে কবির প্রাণের সঙ্গে ত প্রাণের অমন ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগ হইত না। প্রাণ থাকিলেই প্রাণ পাওয়া যায়। আলোর দিকে সমস্ত পল্লব মেলিয়া ধরে বলিয়াই গাছের প্রাণ প্রাণ পায়, আকাশ হইতে সে তার প্রাণের পুষ্টি সংগ্রহ করে। তেমনি করিয়া বড় ভাব বড় চিন্তা বড় কাজের দিকে যৌবনে সমস্ত প্রাণের সমস্ত ডাল-পালা মেলিয়া না ধরিলে যৌবন যে শুকাইয়া মরিবে! যৌবনেই সব-চেয়ে বেশি দরকার প্রাণের প্রবল উৎসাহ, বড় জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা।

কবি ব্রাউনিং তাঁর Rabbi Ben Ezra কবিতাটিতে যৌবন আর বার্দ্ধক্যের মধ্যে এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন যে, যৌবনের কাজ সন্দেহ করা, পরখ করা, এবং নানা ভাল-মন্দের ভিতর দিয়া জীবনটাকে ক্রমশঃ গড়িয়া তোলা; এবং বার্দ্ধক্যের কাজ লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ জীবনে যাহা কিছু জমিয়াছে তাহা সমস্তই তৌল করিয়া হিসাব করিয়া দেখা যে—জীবনের মধ্যে আসলই বা কতটুকু আর ভেজালই বা কতখানি। অর্থাৎ সংক্ষেপে তাঁহার কথাটা দাঁড়ায় এই যে, যৌবন বে-হিসাবী আর প্রবীণতা হিসাবী। যৌবনকে চলিতে হয়, তাই পথ ও পাথেয়ের বিচার সে করিতে পারে না। বার্দ্ধক্যকে থামিতে হয়, তাই জীবনের চলিয়া-আসা পথের দিকে পিছন ফিরিয়া পুরাণো পথ ও পাথেয়ের বিচারে তাহাকে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই প্রবীণ বয়সই জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া জানিবার ও অনুভব করিবার বয়স। তাই বুড়া র‍্যাবি বেন্ এজ্‌রা সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছেন:—

"Grow old along with me
The best is yet to be".

"আমার সঙ্গে তোমরা বুড়ো হও, কারণ জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ এখনো ফুটিতে বাকী আছে।"

প্রবীণতা যদি পরিণতি হয় তবে তাহাকে সকল দেশেই মানুষ ত সম্মান দিবেই; শুধু বয়সের প্রাচীনতাও সম্মানার্হ। ছেলে-মানুষকে বড় বড় বিষয়ে কথা বলিতে ও আলোচনা করিতে দিলে তাহাকে ইঁচড়ে পাকানো হয় অনেকের এই বিশ্বাস, কিন্তু এই ইঁচড়ে-পাকানোর একটা সনাতন ব্যবস্থা, আমাদের মানব-ধর্ম্ম-ব্যবস্থাকার-দিগের আদি যিনি, সেই ভগবান মনুই, দিয়া গিয়াছেন। বয়সে প্রবীণ হইলেই যে প্রাচীন হয় না—ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ—এই কথার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নবীনদিগকে প্রবীণ হইবার দিকে কোন প্ররোচনা আছে কিনা তাত্ত্বিকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। আমার বোধ হয়, মনুর বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মনের বয়স আর শরীরের বয়স এক নয়, কোন লোক বয়সে তরুণ হইলেও মনে বৃদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং মনে রাখা দরকার যে কাহারও বাহিরের চুল না পাকিলেও মনের মাথার চুল সমস্তই পাকিয়া যাইতে পারে। বলাবাহুল্য ব্রাউনিং এই ধরণের কাঁচাপাকামি চান্ না; তিনি চান্ জীবনের পূর্ণ পরিণতি।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ বয়সের প্রবীণতার দিকে কোন খেয়ালই রাখেন না, তার প্রমাণ অর্ব্বাচীন দলকে প্রশ্রয়; এবং আরো স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সময় সময় পাকাচুল, প্রবীণতার একমাত্র নজির হইয়া নবীন সমাজের পেলবসুকুমার হৃদয়-পদ্মদলের উপর উপদেশ অনুশাসনের যে নিরুদ্বিগ্ন অসহ্য নিপীড়ন উপস্থিত করে, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্নরূপেই অজ্ঞ। চল্লিশ বছর বয়সে "ক্ষণিকা"য় তিনি "কবির বয়স" নামে এক কবিতায় বয়সে প্রবীণ নাম লইবার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছেন। কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে:—

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক!
বসে বসে উর্দ্ধপানে চেয়ে
শুন্‌তেছ কি পরলোকের ডাক।

কবি উত্তর করিতেছেন—কিন্তু উত্তরের কথাটা আপনাদের এখানে হঠাৎ ফাঁস করিতে আমি ইতঃস্তত করিতেছি; কারণ সে উত্তরের মধ্যে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার মত কোন ভাল কথা খুঁজিয়া পাই না। কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার দেহ শ্রান্ত হইলেও তিনি ভাবিতেছেন যে অদূরে বকুলবনচ্ছায়ে লৌকিক প্রেমের কোন অপূর্ব্ব দৃশ্য যদি অকস্মাৎ খুলিয়া যায় তবে—

কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুল্‌বে প্রতিধ্বনি
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালমন্দই গণি!

তারপরে বলিতেছেন:—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।

বয়সে সবার একবয়সী হওয়াই রবীন্দ্র-নাথের সাধনা। যৌবনেরও সেই সাধনা

হওয়া উচিত। যুবার বন্ধু শুধু যুবা নয়, বালকও; যুবার বন্ধু বৃদ্ধও। যৌবন যে জীবনবৃত্তের কেন্দ্র—সেইখান হইতে সমস্ত জীবনেরই ব্যাসার্দ্ধরেখাগুলি পরিষ্কার দেখা যায়।

এতো গেল বয়সের কথা। মনে প্রবীণ হইতে রবীন্দ্রনাথের আরও আপত্তি। তার প্রমাণ প্রবীণ বয়সেই তিনি যৌবনের জয়-গান সুরু করিয়াছেন। তাঁহার শেষ রচনা "ফাল্গুনী" নামক গীতিনাট্যে জগতের মধ্যে যে ভীষণ প্রাচীন, জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, প্রভৃতি নানা আকারে দেখা দেয় এবং মানুষের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে, কবি সেই প্রাচীনের মুখের উপরকার রহস্যের আবরণখানি নিতান্ত রহস্যছলে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকেই চিরনবীন চিরযৌবন রূপে দেখাইয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতিতে শীতের ভিতরেই যেমন বসন্তের সমস্ত রূপ সমস্ত গান সব সৌগন্ধ লুকানো থাকে, তেমনি জরামৃত্যুর ভিতরেই অমর-অফুরাণ জীবনযৌবন সংগোপিত থাকে। সেই জরা-মৃত্যুর তমসঃপরস্তাৎ যাহারা সেই চিরনবীন সেই চিরযৌবন জীবনের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, কবি তাহাদের মুখে গান দিয়াছেন—"আমাদের পাকবেনা চুলগো, মোদের পাকবেনা চুল"। গান দিয়াছেন যে, তাদের "চরণঘায়ে মরণ মরে পলে পলে"। সেই 'দুরন্ত' 'জীবন্ত' 'অশান্ত' যুবাদলকে কত কবিতায় ডাক দিয়া তিনি বলিয়াছেন—'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। কারণ, "জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।" রবীন্দ্রনাথের শেষ-বয়সের গান এই অফুরাণ প্রাণের জয়গান।

জীবনের মধ্যে এই চিরযৌবনের তত্ত্বটি আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি কবিতায় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে :—

O Living always, always dying !
O the burials of me, past and present
O me while I stride ahead, material,
visible, imperious as ever ;
O me what I was for years, now dead,
(I lament not, I am content ;)
O to disengage myself from those
corpses of me, which I turn and look
at where I cast them,
To pass on, (O living ! always living !)
And leave the corpses behind.

কেবলি বাঁচা আর কেবলি মরা এ জীবনে গো!
জীবনের কবর হইয়া গেল কতবার অতীতে বর্ত্তমানে।
এই যে সামনে পা ফেলিয়া চলিয়াছি, এই যে প্রত্যক্ষ
বাস্তব গর্ব্বিত আমি,
বহু বৎসর ধরিয়া আমি যাহা ছিলাম,
সে জীবন তো নাই, সে তো মৃত।
তাহার জন্য মনে খেদ নাই, আমি সন্তুষ্ট।
সেই আমারি মৃত শরীররাশি হইতে
আমাকে বিমুক্ত করিয়া চলিতে হইবে—
যেখানে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছি, মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়ামাত্র সেই শবগুলিকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইব—
কেবলি নবতর জীবনে, কেবলি জীবন হইতে জীবনে।

আমরা যে কেবলি মরিয়া মরিয়া বাঁচিতেছি, কত মৃতশরীর ত্যাগ করিয়া নব শরীর ধারণ করিতেছি, জীবনের এই তত্ত্বটি বুঝিলেই জীবনের মধ্যে চিরযৌবন কোথায় তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। পৃথিবীতে মানুষ নিতান্ত এই স্থূল শরীটার জরা এবং মৃত্যুকেই মস্ত-বড় একটা

বিভীষিকা মনে করে অথচ কতবার যে আমাদের আসল শরীর, আমাদের মনঃশরীর অন্তঃশরীরের মৃত্যু ঘটিতেছে তাহা সেই বোঝে যাহার জীবন সচল ও সক্রিয়। আমাদের দেশে আগে দ্বিজ হইতে হইত, দুইবার জন্মাইতে হইত—একবার মানবলোকে আর-একবার ব্রহ্মলোকে। খৃষ্টান দেশে Crucifixion ও resurrection প্রতি মানুষের জীবনেই ঘটে বলিয়া ভক্ত খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন—একবার সংসারে মরিয়া পরে অধ্যাত্মলোকে পুনরুজ্জীবিত হইতে হয়। কিন্তু মানুষ ত দ্বিজ নয়, সে একই জীবনে শতজ সহস্রজ। আর শুধু ধর্ম্মজীবনে কেন, শিল্পজীবনে, দর্শনজীবনে এই মৃত্যু বারম্বার বিচিত্র আকারে ঘটিয়া নবতর জীবনের অভ্যুদয় দেখা দিতেছে। শিল্পজীবনে কত অভিজ্ঞতার প্রাণ-স্তর; দর্শনজীবনে কত মতবাদের মৃতস্তূপের উপরে তবে কোন তত্ত্ব প্রাণবন্ত হইয়া আকাশে মাথা তোলে। কার্লাইলের ভাষায় বলিতে গেলে Everlasting Nay, চিরন্তন নেতি, শূন্যতা ও অস্বীকারের অবস্থা হইতে আত্মা যে Everlasting Yea, চিরন্তন হাঁ, পূর্ণতা ও সর্ব্বস্বীকারের অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, সে কি সহজে হয়? Pilgrim's Progress এর Valley of the Shadow of Death, Tennyson যাহাকে Slough of Despond বলিয়াছেন, একবার তাহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। দান্তের মহাকাব্যে তাহাই Inferno বা নরকের ছবি। পাপে হোক্, আত্মবিকারে হোক্, অজ্ঞানতায় হোক্, যেখানেই অখণ্ড সমগ্র পরিপূর্ণ জীবন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বিকৃত হইয়াছে সেইখানেই মৃত্যু ও বিভীষিকা। সেই মৃত্যুর দিকে তাকাইয়াই ঋষি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—মৃত্যোর্মামৃতংগময়—আমাকে এই রাশি রাশি মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ কর। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাট্যে সুদর্শনার পতন সেই মৃত্যুর ইতিহাস, এবং আত্মগ্লানির ভিতর দিয়া শোধিত হইয়া তাহার উদ্ধার, মৃত্যু হইতে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইবার ইতিহাস। 'O Living always, always dying !'

জগতের মধ্যে চিরনবীন এবং জীবনের মধ্যে চিরযৌবনকে এমন নিশ্চিতরূপে সত্যরূপে এই কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁর কাছে কোথাও একটা শেষ হওয়া সম্পূর্ণ হওয়ার ভাবটি একেবারেই নিরর্থক। কারণ যেখানে আমরা শেষ দেখি, সেইখানেই আবার নূতন আরম্ভের সূত্রপাত হয়। যেখানে সম্পূর্ণতা কল্পনা করি, সেখানে সম্পূর্ণতরতার আয়োজন। সৃষ্টি-সম্বন্ধে তাই কবি লিখিয়াছেন, "নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল একথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না।" তার মানে সৃষ্টি একটুও পুরাণো নয়, সৃষ্টি সর্ব্বদাই সদ্যনূতন। তাহার পূর্ণতা দাঁড়ি টানে না, তাহার বিরাম নাই। সৃষ্টিকে এইজন্য তিনি বহুস্থানে গানের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। অদ্বৈত এক যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয়, তবে তাহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যগুলির স্থান কোথায় এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঐ উপমাটি ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাতন্ত্র্যগুলি গানের তানের মত। "তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্ না, গানটিকে

অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়।" অর্থাৎ সৃষ্টির যেটি বাহ্যরূপ, সৃষ্টির সেইটিই আন্তর-রূপ বা স্বরূপ—সৃষ্টি বৃত্তাকার, সৃষ্টি অখণ্ড, তাই চিরনূতন। ব্রাউনিংয়ের ভাষায় আমরা সেই অখণ্ড বৃত্তটির এ-টুক্‌রা সে-টুকরাগুলি দেখিতে পাই, অখণ্ডকে চিরঅখণ্ড করিয়া দেখিতে পাইনা। "On the Earth the broken arcs; in the heaven a perfect round." সেই perfect round-টাই বিশ্বসৃষ্টি এবং চিরনবীন সৃষ্টি, সেই perfect roundটাই জীবনসৃষ্টি এবং চির-যৌবনের সৃষ্টি। তাহা একই সময়ে গানের তানের মত টুক্‌রায় টুক্‌রায় বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন; অথচ নিমেষে নিমেষে সম্পূর্ণ সুগোল ও সুন্দর।

আমি হঠাৎ একটা শক্ত কথার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই তত্ত্বটির উপলব্ধির যে আশ্চর্য্য বাণী কবির ভাষায় ফুটিয়াছে তাহার কতকটা এখানে উদ্ধার করিয়া শুনাইয়া দিবার প্রলোভন সামলাইতে পারিতেছি না। কবি বলিতেছেন!

"একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপর খেলা করতে।...এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরাণো, এটা সাধারণ, এর কোন দাম নেই।...জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাসচে; নীলা-কাশের নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়েনি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করচে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনাআপনি ভ'রে উঠ্‌ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসেনি; আজও প্রতি রাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলচে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি? তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্র-পুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে পসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলি ফুটে ফুটে উঠ্‌ছে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধ'রে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয়নি।"..."এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে এই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। সেই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, সেই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে ও কাব্যের মধ্যে নানা স্বাতন্ত্র্যের তান বিচিত্র সুরে বাজিতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু সঙ্গীতের এই সম্পূর্ণতা ও চিরনবীনতা, সেই সব তানকে ঘিরিয়া আছে, মিলাইয়া আছে। সেইজন্য তাঁর জীবনও কেবলি নূতন, তাঁর কাব্যও কেবলি নূতন। কড়ি ও কোমলের জীবন সোণার তরী চিত্রার জীবন নয়, কথাকল্পনার জীবন ক্ষণিকার জীবন নয়, ক্ষণিকার জীবন নৈবেদ্য ও স্বদেশসঙ্কল্পের " জীবন নয়, নৈবেদ্যের জীবন খেয়ার জীবন নয়, খেয়ার জীবন রাজা, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য গীতালির জীবন নয়, আবার গীতাঞ্জলির জীবন বলাকার জীবন নয়। "O Living always, always dying!" শুধু ভাবের

বিচিত্রতা ও নূতনতা নয়, প্রকাশের, ষ্টাইলেরও কেবলি বিচিত্রতা ও নূতনতা।

কাব্যজীবনে যেমন এই তফাৎ, আসল মানুষটির জীবনেও ঠিক তেমনি তফাৎ। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের চেহারা দেখিলেই সেটা ধরা পড়ে। বাল্যের উজ্জ্বল প্রগল্‌ভতা-দ্যোতক চেহারা, যৌবনের স্বপ্নাবিষ্ট রমণীজনসুলভ কমনীয় সুদীর্ঘকেশদামলম্বিত চেহারা, মাঝবয়সের অপেক্ষাকৃত দৃঢ় আত্মসম্বৃত অথচ সৌন্দর্য্যাবেশময় মূর্ত্তি, এবং শেষবয়সের প্রসন্নউদার সৌম্যগম্ভীর চিন্তা ও কর্ম্মদ্রঢ়িষ্ঠ ব্রতনিষ্ঠ মূর্ত্তি—পরে পরে দেখিলে একটা ভাল Portrait Gallery দেখার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য্য ও রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়। "Finest flesh stuff" যাহাকে ব্রাউনিং বলিয়াছেন, সেই রমণীয়তম ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে highest spiritual enjoyment মহোচ্চতম অধ্যাত্ম আনন্দ পর্য্যন্ত জীবনের বিচিত্র আনন্দ-উপভোগের সপ্তস্বরগ্রাম এই কবির বীণায় বিচিত্র রাগিণীতে বাজিয়াছে বলিতে পারি। জীবনের কোন অংশকে ইনি কোথাও বাদ্ দেন্ নাই। অথচ এই বাদ্ দেবার কথা এবং বাদ্ দেবার প্রণালী আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাই। নীতিমার্গে যে যায় সৌন্দর্য্যসাধনা রস-সাধনাকে সে অনেক সময় বাদ্ দেয়, fleshএর দাবী সে পরিহার করে। রসমার্গে যে যায় অনেক সময় সে নীতিকে খাতির করেনা, জ্ঞানকে চায়না। শুধু জ্ঞানের সাধনায় যে যায়, সে হয়ত অনুভূতির দিক্‌টাকে হৃদয়ের দিক্‌টাকে তেমন করিয়া সব সময় দেখিতে পায়না, কর্ম্মের দিকে সেবার দিকে প্রেরণা তাহার মধ্যে সহজে হয়ত আসেনা। এমনি করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন পায়রার বাসার মত খোপে খোপে ভাগ হইয়া যাইতেছে, জ্ঞাতসারে হোক্ অজ্ঞাতসারে হোক্। আমাদের temperament প্রকৃতির ভিন্নতা তাহার কারণ বটে, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন হইলেও তাহার মধ্যে সমগ্র মানব-প্রকৃতির সবদিকই অল্পবিস্তর পরিমাণে আছে। তা যদি না হইত তবে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিশেষ স্বতন্ত্র হইয়া জগৎটাকে বহুর জগৎ করিত, বহুর জগৎ একের জগৎ হইতেই পারিত না।

সে সব তর্ক যেমনি থাক্, রবিবাবুর কাছে এই শিক্ষা আমরা পাই যে জীবনকে যে দিক্ হইতেই গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, পিছপাও হইও না, বাদ দিয়া বসিয়ো না। তোমার প্রকৃতি যে রাস্তায় যায় তাহাই তোমার রাস্তা। 'পথ তোমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।' "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" প্রথমেই যৌবনকালের একটা ভীষণ সমস্যার কথা ধরা যাক্—ঐ ইন্দ্রিয়ের দাবীর কথাটাই। ইহা কত বিকারের দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়, কত morbid অসুস্থ ভাব আমাদের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। যেমন করিয়াই ইহাকে চাপা দিই, যতই নিয়ম-সংযমে বাঁধি, ধর্ম্মের আলোচনা করি, ইহা যায় না। কারণ, ইহা যে একটা সত্য পদার্থ —যা সত্য তাহাকে আমি অস্বীকার করিলেই তো সে অস্বীকৃত হইবার নয়। নীতিউপদেষ্টাগণ আমাদিগকে এই পথের

বিপদ দেখাইয়া ইন্দ্রিয়-নিরোধের উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে এ সমস্যার কোন সমাধান হয় না। ইহাকে আত্মার সঙ্গে মিলাইয়া অখণ্ড জীবনের অঙ্গীভূত অংশীভূত করাই ইহার শ্রেষ্ঠ সমাধান। কবি ব্রাউনিং তাই বলিয়াছেন :—

"Let us not always say
"Spite of this flesh today
I strove. made head,
gained ground on the whole !
As the bird wings and sings,
Let us cry "All good things
Are ours, nor soul helps flesh more,
now, then flesh helps soul."

আমরা যেন কেবলি বলিনা যে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির তাড়না সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করিয়াছি এবং মোটের উপর সফলকাম হইয়াছি। পাখী যেমন উড়িয়া উড়িয়া গান গায়, তেমনি আমরা এই কথাই বলিব যে, সবই ভাল এবং সব ভাল জিনিসই আমাদের। আত্মাই যে ইন্দ্রিয়ের বেশি সহায় তা নয়, ইন্দ্রিয়ও আত্মার কম সহায় নয়।

ব্রাউনিং-জায়া "Inclusions" নামক কবিতায় এই কথাটিই আরেক রকম করিয়া বলিয়াছেন—শরীরের পাওয়া পাওয়াই নয়, আত্মাকে পাইলেই শরীরকে ঠিক মত পাওয়া হয়। সেই কবিতাটি এই :—

Oh, wilt thou have my hand dear,
to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop, the poor pale hand,
dear, unfit to ply with thine.

Oh, wilt thou have my cheek dear,
drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn
by many a tear run down.
Now leave a little space, dear,
lest it should wet thine own.

Oh must thou have my soul, dear,
commingled with thy soul ?
Red grows the cheek, and warm the
hand, the part is in the whole !
Nor hand nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul.

ওয়াল্ট হুইটম্যান এই কথাটিই তাঁর ভাবে লিখিয়াছেন :—

I am the poet of the body and I am
the poet of the soul,
The pleasures of heaven are with me
and the pains of hell are with me.
The first I graft and increase upon myself,
the latter I translate into a new tongue.

আমি শরীরের কবি, আত্মারও কবি। স্বর্গের পুণ্যও আমার, নরকের দুঃখও আমার—প্রথমটাকে আমি আমাতে কলমে জোড়া লাগাইয়া বাড়াইয়া তুলি এবং দ্বিতীয়টাকে আমি একটা নূতন বাণীতে রূপান্তরিত করি।

রবিবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' ব্রাউনিং যে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় আত্মার কম সহায় নয় তারি উদাহরণ; ব্রাউনিং-জায়ার Inclusions এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ; হুইটম্যানের ইন্দ্রিয়-বেদনার নব রূপান্তরিত বাণী, new tongue। চিত্রাঙ্গদার বাহ্যরূপ এবং অন্তরের যথার্থ নারীত্ব এ-দুয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া

সেই দুয়ের ভিতরকার দ্বন্দ্বের উপর সমস্ত নাটককে রবীন্দ্রনাথ ভিত্তি দিয়াছেন এবং সেই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া দ্বন্দ্বের সমাধানে পৌঁছাইয়াছেন। কড়ি ও কোমলের বিস্তর কবিতায় ইন্দ্রিয়-লালসা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি তাহার বেদনা, সমগ্র হইতে ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছিন্নতার বেদনা, কি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। "পবিত্র প্রেম," "পবিত্র জীবন" প্রভৃতি কবিতাই তার সাক্ষী। 'মানসী'র বহু কবিতার মধ্যেও এই fleshএ spiritএ দ্বন্দ্ব—ইন্দ্রিয়ে ও আত্মায় দ্বন্দ্বের সমাধান দেখিতে পাই। 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি বলিতেছেন—"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের"। "হৃদয়ের ধন" কবিতায় কবি বলিতেছেন—"হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?" সে চেষ্টা কেমন! না—'নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া', কি চমৎকার উপমাটি! 'গুপ্তপ্রেমে' কোন রূপহীনার মুখ দিয়া বলিতেছেন,

"এ তনু আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে
হৃদয় মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে!"

'আঁখির অপরাধ' কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন যে একবার ইন্দ্রিয় দিয়া প্রিয়-জনের যে মূর্ত্তি 'জীবনমূলে' প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে ছুরি দিয়া কাটিয়া তুলিয়া লওয়া হোক্, সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া যাক্। তারপর সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে যে 'পবিত্র মুখ মধুর মূর্ত্তি' ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই অনন্ত তাহাই চিরন্তন। তখন,

"সে নব জগতে কালস্রোত নাই পরিবর্ত্তন নাহি
আজি এই দিন অনন্ত হ'য়ে চিরদিন রবে চাহি!"

আমার বিশ্বাস যে যৌবনের এই ঘোর সমস্যায়, এই বিষম দ্বন্দ্বের অবস্থায় রবিবাবুর কবিতা হইতে আমরা যত সাহায্য পাইতে পারি এমন আর কাহারও নিকট হইতে নয়। আমাদের সৌন্দর্য্যভোগকে আমাদের মানবপ্রেমকে এই কবি শুচিতায়, শুভ্রতায়, মধুরতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বলিতে পারি। তাঁহার সৌন্দর্য্য-সাধনার চরম বিকাশের রূপ পাই 'উর্ব্বশী' ও 'বিজয়িনী'তে।—সৌন্দর্য্য সেখানে নগ্ন অথচ পরমপবিত্র। তাঁহার প্রেমের সাধনারও চরম বিকাশের রূপ পাই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ও 'বৈষ্ণব কবিতায়'—যেখানে তিনি 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি ভূতলের স্বর্গ খণ্ড' গড়িয়াছেন, যেখানে তিনি দেবতাকে প্রিয় করিয়াছেন ও প্রিয়কে দেবতা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রেমকে যেখানে তিনি স্বর্গ করিয়া প্রেমাস্পদকে দেবতা করিয়া বসাইয়াছেন। ইহার চেয়ে নির্ম্মলতর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের রূপ আমরা আর কোথায় পাইব?

অথচ, আমাদের এই অমর যৌবনকে যে নেতিত্বের বাদ ও সাধনা, যে negative তত্ত্ব বুড়া করিয়া দিতে চায়, শুধু এখন 'সবুজপত্র' ও 'বলাকায়' নয়, চিরকালই রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রবল প্রতিবাদী! "সোনার তরীতে" সেই নেতিত্ব বা negative বাদ বেদান্তের যে বিশেষ তত্ত্ব ও সাধনার আকারে এদেশের মানুষকে নিরানন্দ ও বিশ্বসংসারবিমুখ করিয়াছে, তাহাকে কবি সজোরে ঘা দিয়াছেন। তাহাকে 'পরশপাথর'

ও 'আকাশের চাঁদ' অন্বেষণের মত ব্যর্থ অন্বেষণ বলিয়াছেন। কি বেদনার সঙ্গে অনুভব করিয়াছেন যে এদেশে—

"নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান,
নাহি কোন কাজ, নাহি কোন প্রাণ,
বসে আছে এক মহা নির্ব্বাণ
আঁধার মুকুট পরিয়া।"

এবং কি আবেগের সঙ্গে আশার সঙ্গে গাহিয়াছেন :—

"জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।"

সমস্ত বিশ্বটা যদি খেলা মাত্র হয়, তবে কবির কথা এই—

"থেকোনা অকাল বৃদ্ধ বসিয়া একেলা
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা।"

যদি সংসারটা বন্ধন হয়—তবে কবির কথা এই যে এ বন্ধন স্তন্যের পিপাসা ; বিশ্বের রস আকর্ষণ করিয়া জন্মে জন্মে প্রাণে মনে পূর্ণ করিয়া এই দুর্লভ জীবনটিকে গঠিত করিতেছে—সুতরাং

"স্তন্যতৃষ্ণা নাশ করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন্ মুক্তিভ্রমে ?"

যেমন এই এক ধরণের সংসারবিমুখ বেদান্তের সাধনাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন, কারণ এ সাধনা negative, নেতিত্বের সাধনা, তেম্নি আর এক ধরণের নেতিত্বের সাধনা রসসাধনাতেও আছে। বৈষ্ণব সাধনাতেও সেই জীবনবিমুখ বাস্তববিমুখ রসসাধনা দেখা যায়। বৈষ্ণব-সাধনায় ভগবান ও জীবের মধ্যে যে নায়কনায়িকার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে লৌকিক প্রেমের বাস্তব প্রেমের ত কোন সম্বন্ধ নাই। কবি তাই তাহারও বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?

* * *

এ সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা !

* * *

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

Negativism বা নেতিত্ববাদ, abstraction বা কোন রকমের অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব ও সাধনা, চিরকালই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদকে জাগ্রৎ করিয়াছে। সংসারবিমুখ বাস্তব-বিমুখ বেদান্তের তত্ত্ব ও সাধনা এবং বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা যেমন সেই বয়সে তাঁহার প্রতিবাদকে জাগাইয়াছে, তেমনি এ বয়সে আমাদের দেশে যে ধরণের অতি-সামাজিকতা (over-socialisation) বিধিবিধানের নিয়ম-নিগড়ে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশকে ঘটিতে দেয় না তাহাও একরকমের abstraction বা অবচ্ছিন্ন জিনিস বলিয়া কবি তাহাকেও আঘাত করিতেছেন যথেষ্ট। আবার পশ্চিম মহাদেশে যে ধরণের স্বাজাত্য

(nationalism) জাতীয় স্বার্থসুবিধাকে যন্ত্রবদ্ধ করিয়া মানুষকে সেই যন্ত্রের সামিল করিয়া তুলিয়াছে এবং বিশ্বমানবের বিরাট অভিপ্রায়কে ব্যাহত করিতেছে, কবি তাহাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন একটা বস্তু জানিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে লড়িতেছেন এবং সম্প্রতি আমেরিকায় যথেষ্ট তীব্রতীক্ষ্ণ সুরে তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। "সমস্তকে স্বীকার, সমস্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ"—এই তাঁর motto। যৌবনের এই তো সুর, যৌবনের এই ত কথা। কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান ইহারি কথা তাঁহার Song of the open roadএ গাহিয়াছেন। জীবনকে সর্ব্ববন্ধন সর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া খোলা রাজপথে পথিক করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই রাজপথে—

"The profound lesson of reception, nor preference, nor denial" কেবলি গ্রহণ, বাচবিচার নয়, অস্বীকার নয়।

সমস্ত গ্রহণের মধ্যেই যাহা অপূর্ণতা তাহা পূর্ণতার মধ্যে বিলীন হয়, যাহা বিকার তাহা স্বাস্থ্যে বিলুপ্ত হয়, যাহা ক্ষতি, যাহা ব্যর্থতা, যাহা বিচ্ছিন্নতা তাহা পরমলাভ পরমসার্থকতা ও পরম আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া সার্থক হয়। এই দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেন বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মসাধনাও সমস্ত জীবনকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাও কোন নেতিত্ব, কোন আংশিকতা, কোন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কখনই গিয়া পড়ে নাই।

এইবার সেই ধর্ম্মসাধনার কথায় আসা যাক্।

গোড়াতেই একটা কথা বলা দরকার। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মঙ্গলের আদর্শের পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ আছে। কীট্‌স্ যেমন বলিয়াছেন Truth is Beauty, Beauty truth—সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য; রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা তেমনি বলে Beauty is good and good beauty—সুন্দরই মঙ্গল এবং মঙ্গলই সুন্দর। তিনি 'উর্ব্বশী'র কবি, 'কল্যাণী'রও কবি। 'ক্ষণিকা'—যে কাব্যকে Gospel of Beauty বলা যাইতে পারে—তার শেষের দিকে একটি কবিতা আছে, 'কল্যাণী'র প্রতি।

"বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে—
* * * *
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।"

কবির সৌন্দর্য্য-পূজার সর্ব্বশেষ অঞ্জলি এই কল্যাণীর কাছেই নিবেদিত। 'বলাকা'তেও উর্ব্বশী এবং কল্যাণী সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে—একজন সৌন্দর্য্য, 'বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী', ; অন্যজন, কল্যাণ, 'বিশ্বের জননী তাঁরে জানি।'

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যাহাকে morality বা নীতিমার্গ বলি, তাহার সাধনা বা তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই না। ইহার কারণ কি? কারণ কেবলমাত্র নৈতিক জীবনে

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি মাত্র, তাহাকে উপভোগ করি না। অয়কেন নৈতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিভেদ দেখাইতে গিয়া এই use এবং enjoyment দুটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। নৈতিক সাধনায় we use our experiences, আমরা অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যবহার করি, অধ্যাত্ম সাধনায় we enjoy them, আমরা তাহাদের আনন্দ সম্ভোগ করি। কারণ, সেই জিনিসকেই আমরা ব্যবহার করি, যাহা উপায়ের মত আমাদিগকে কোন উদ্দেশ্যের দিকে লইয়া যায়; আর সেই জিনিসেরই আনন্দ উপভোগ করি যাহাকে আর উপায়-উপকরণ স্বরূপে দেখি না। কেবলমাত্র যে মানুষ নৈতিক, আধ্যাত্মিক নন্, তিনি কোন দিনই কোন গভীর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তিনি আপনাকে হারান না, তিনি আপনার রাশ টানিয়া ধরিয়া কেবলি আপনাকে এই প্রশ্ন করেন—ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তাঁহার কেবলি চাওয়া, কেবলি দ্বন্দ্ব; পাওয়ার আনন্দ তাঁর নয়।

সুতরাং নিজের মধ্যে যাঁহার দ্বন্দ্ব, এবং সেই দ্বন্দ্ব যিনি বরাবর জাগাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত, তিনি পরকেও ক্রমাগত সেই দিকেই তাগিদ দিবেন। ভাল করিবার জন্য, মন্দকে ঠেকাইবার জন্য তাঁহার যে চেষ্টা, চিন্তা ও কথা, তাহার মধ্যে শান্তির প্রসন্নতা বিরাজ করে না।

কিন্তু যিনি জানেন যে সব অপূর্ণতাই পূর্ণতার জন্য, সব অকৃতার্থতাই কৃতার্থতারই সাক্ষ্য বহন করে, সব বেসুরা সুরেই পরিণাম লাভ করিবে—আমাদের কাজ সেই অখণ্ড, পূর্ণ, চরিতার্থ, জীবনসঙ্গীতটিকে জীবনের মধ্যে ধ্বনিত ঝঙ্কৃত করিয়া তোলা মাত্র, তিনি মানুষকে খুব বড় রকমের একটি আশ্বাস দেন। তিনি বলেন :—

> "জীবনে যত পূজা হল না সারা
> জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
> যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
> যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
> জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

তিনি বলেন :—

> "জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
> জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে।
> আমার অনাগত আমার অনাহত
> তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা।
> জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

ঠিক ব্রাউনিং যেমন বলিয়াছেন :—

> "What is our failure here but a triumph's evidence
> For the fullness of the days? Have we withered or agonised?
> Why else was the pause prolonged but that singing might issue thence?
> Why rushed the discords in but that harmony should be prized?"

আমাদের এখানকার অকৃতার্থতাটা পূর্ণতর দিনের বিজয়-গৌরবের সাক্ষ্য কি বহন করে না?

আমরা কি শুকাইয়া মরিয়াছি, আমরা কি দাহ ভোগ করিয়াছি?

কেন বিরামযতি এত দীর্ঘায়িত হইয়াছিল যদি তাহা হইতে সঙ্গীতই উচ্ছ্বসিত না হইবে?

কেন বেসুরগুলো এত গোলমাল বাধাইয়াছিল যদি সুরসঙ্গতিই সমাদৃত না হইবে?

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনায় কোন বাঁধা মত, বাঁধা creed নাই। জীবনকে সমগ্র ভাবে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা ও উপভোগ করাই তাঁর ধর্ম্মসাধনা। সুতরাং তাহার মধ্যে জীবনের বিচিত্রসাধনা বিচিত্রভাবে মিলিবেই। হুইটম্যান যেমন বলিয়াছেন :—

The words of the true poems give you more than poems,
They give you to form for yourself,
religions, politics, war, peace, behavior,
histories, daily life and everything else
They balance ranks, colours, races, creeds and the sexes
They do not seek beauty, they are sought.

যথার্থ কাব্যের বাণী তোমাকে কাব্যের চেয়ে বেশি দেয়। ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, শান্তি, লোকব্যবহার, ইতিহাস, দৈনিক জীবন এবং সমস্তই সে দেয়। তাহার কাজ—জাতি বর্ণ ধর্ম্ম এবং যৌনসম্বন্ধ সমস্তকে সুবিহিত সুছন্দিত করা। সৌন্দর্য্যকে সে খোঁজে না, সৌন্দর্য্যই তাহাকে খোঁজে।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অধ্যাত্ম কবিতার বাণী সেই বাণী। তাহা কাব্যের চেয়ে বেশি দেয়। তাহার মধ্যে নানা ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনার রসরূপ আছে। "গীতাঞ্জলি," "গীতিমাল্যে"র যে কোন কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। তাহার মধ্যে উদারতর রাষ্ট্রনীতি আছে—বিশ্বমানবের ইতিহাস কোন্ মহাপথে যাত্রা করিতেছে, সমস্ত মানবজাতির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি ভাবে দাঁড়াইবে তাহার নানা ইঙ্গিত আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের উপরে একটা কবিতার একটুখানি অংশ শুনাই :—

"এসেচে আদেশ—
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,—
উর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী—
সব ঠেলে হ'তে হবে পার
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক দুঃখ-অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

তারপর কবির আধুনিক এই কবিতা ও অন্যান্য রচনার মধ্যে সমাজচৈতন্য, দেশাত্মবোধ প্রবল মাত্রায় আছে, দেশের অতীতের মধ্যে যে প্রাণের বীজ যে সজীব আদর্শের বীজ নিহিত আছে তাহাকে বর্ত্তমান সামাজিক জীবনে অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রাণপণ আকুতি আছে। তাহার মধ্যে দৈনিক জীবন-

যাত্রাকে কি করিয়া ধর্ম্মময় ও ব্রহ্মসুধাময় করা যায় তাহার বিচিত্র উপলব্ধির কথা আছে।

"তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?"

এ যে কত মধুর ভাবে কত বিচিত্র ভাবে বলা হইয়াছে তাহা আর কত উদ্ধার করিয়া শুনাইব?

বাস্তবিকই জাতির সঙ্গে জাতিকে, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মকে, স্ত্রীভাবের সঙ্গে পুরুষভাবকে কি একটি ছন্দোবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়া জীবনকে ও জীবনের গানকে সর্ব্বমানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া কবি দিয়াছেন, তাহা এই আধুনিক কাব্যগুলি পড়িলেই বেশ দেখা যায়।

অথচ এই সমস্তের মূলে একটি অখণ্ড জীবনের সমগ্র রূপ আছে বলিয়া কবির সব বাণী অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছে। সৌন্দর্য্যকে তাঁহার বাণী আবাহন করেন নাই, সৌন্দর্য্য আপনি সেই বাণীকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

এই যে জটিলতার জট তাহা একটি একটি করিয়া খুলিয়া দেখাই ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনা যে জীবনের সাধনারই প্রতিরূপ তাহা উদ্ঘাটিত করি, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ও অল্প সময়ের মধ্যে সে সাধ্য নাই। শুধু এই কথা বলিয়া আজ উপসংহার করি যে, জীবনের বিচিত্র দিক লইয়াই ধর্ম্ম—এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে আমরা যত পাইয়াছি এমন এ যুগে আর কাহারো নিকট হইতে নয়। এবং সেই বিচিত্র জীবন যখন আপনার পূর্ণ চেহারাটি দেখে, তখন দেখে যে সে চিরযৌবন; কারণ তাহার প্রশ্নও ফুরায় না, খোঁজাও ফুরায় না, তাহার উপভোগও ফুরায় না, সমস্তই নিত্য নূতন আকারে তাহার সামনে হাজির হয়। কবি তাঁর শেষ কাব্যে সেই যৌবনতেজোময় জীবনের যে জয়গান করিয়াছেন সেই গান গাহিয়া আমিও শেষ করি:—

"যৌবন রে, রয়েচ কোন্ তানের সাধনে?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে?
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তা'র চিনায়
তোমার বাণী জাগে প্রলয় মেঘে
ঝড়ের ঝঙ্কারে;
ঢেউয়ের পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয় ডঙ্কারে।
যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে!
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক্ জরার কুজ্ঝটিকা
জীর্ণতারি বক্ষ দু ফাঁক করে
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।"

মনে রাখিতে হইবে যে এ জীর্ণতা শুধু বয়সের নয়, এ জীর্ণতা—চিন্তার, ধারণার, নানাবিধ সংস্কারের। যাহা কিছু convention শুধু জমা হইতেছে, শুধু ভার হইয়া আছে, মানুষকে চলিতে দিতেছে না, তাহাই জীর্ণতা, তাহাই জরা। যৌবনকে তাহারি বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য কবির আহ্বান। To the open road—সংস্কারমুক্ত বিশ্ব-রাজপথে আহবান। এই আহ্বান কি আমরা তরুণবয়সীরা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, শুনিব না?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

মোগল আমলের বাগান

সম্রাট বাবর সর্ব্বাগ্রে কাবুলের উদ্যান-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে বহুবার তিনি বাগ্-ই-ওয়াফার (বিশ্বাস-উদ্যান) উল্লেখ করিয়াছেন। "আদিনাপুর দুর্গের দক্ষিণে ঠিক অপর পারে একখণ্ড উঁচু জমির উপর, (১৫০৮ খৃষ্টাব্দে) আমি চর বাগ তৈয়ার করাই। ইহার নাম দিয়াছি, বাগ্-ই-ওয়াফা। দুর্গ ও প্রাসাদের মধ্য দিয়া যে নদী বহিয়া চলিয়াছে, এই বাগান হইতে সেই নদীটিকে বেশ দেখা যায়। যে বৎসর আমি বেহার খাঁকে যুদ্ধে হারাইয়া লাহোর ও দেবলপুর অধিকার করি—সে বৎসর কলাগাছ আনাইয়া এই বাগানে পুঁতিলাম। সেগুলি বেশ বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব বৎসরে যে আকের চারা লাগাইয়াছিলাম, সেগুলিও চমৎকার গজাইয়া উঠিল। কতক আক বাদাক্ষণ এবং কতক বোখারায় পাঠাইলাম। বাগানটি বেশ উঁচু জমির উপর। জলের কষ্ট নাই—শীতের সময় জায়গা যে ঠাণ্ডা বোধ হয়, তাহাও নয়। বাগানের মধ্যে ছোট পাহাড় আছে, সেই পাহাড় হইতে ছোট একটি নদীর ধারা বহিয়া চলিয়াছে—সেই নদী বাগানের গায়ের উপর একেবারে যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বিশ-ফুট চৌবাচ্ছা; তাহার চারিধারে অজস্র কমলালেবুর গাছ—আনারসের কুঞ্জ। জলের চারিধারে শৈবালে আচ্ছন্ন এই জায়গাটি যেন বাগানের চক্ষু! গাছে যখন কমলা-লেবু পাকিয়া উঠে—তখন রঙের সে কি বাহার হয়! অদূরেই বাগানের দক্ষিণে কোহ্-ই-সফেদ (সাদা পাহাড়)—বাঙ্গাস ও নাঙ্গেনারের মধ্যে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে—সেধারে এমন পথ নাই যে কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিতে পারে।"

বাবরের এই আত্মজীবনী তুর্কি ভাষায় লিখিত। কাশ্মীর হইতে কাবুল যাত্রা করিবার সময় পথে সম্রাট আকবরের আদেশে বিখ্যাত সুধী মির্জ্জা আবদুল রহিম তুর্কি হইতে এই গ্রন্থ পারস্য ভাষায় রূপান্তরিত করেন। আকবরের আদেশে এই জীবনী-বর্ণিত উদ্যানাদির চিত্রও সে সময় অঙ্কিত হইয়াছিল এবং সেই সকল চিত্র হইতে আজিকার দিনেও সে-সকল উদ্যানের সৌন্দর্য্যের পরিচয় আমরা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারি। যে শিল্পী বাগ্-ই-ওয়াফার চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহার নাম বিষণ দাস—চিত্রেই তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু ছিলেন।

এই সকল উদ্যান-রচনার মূলে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ে বাহির হইলে পথে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে মোগল বাদশাহদের তাঁবু পড়িত এবং সেই সকল স্থানে বাদশাহদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁহাদেরই আদেশে উদ্যান রচিত হইত। বার্ণিয়ারের বৃত্তান্ত এই ব্যাপারের সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। সম্রাট আরঙ্গীব যখন কাশ্মীর

যাত্রা করেন, তখন ফরাসী চিকিৎসক বার্ণিয়ার তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। তদ্ভিন্ন শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি-নিবারণের জন্য পথের দুইধারে গাছ বসাইবার প্রথাও ভারতবর্ষে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; সাধারণের সুবিধার জন্যও সময়ে সময়ে উদ্যানাদি রচিত হইত। সম্প্রতি সহর-নির্ম্মাণ-রীতির (town-planning) সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপন উপলক্ষে এই রীতির কথা নিতান্ত অবিশেষজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিরও আজ অশ্রুত বা অজ্ঞাত নাই—কিন্তু এই নূতন রাজধানী শোভায় সম্পদে যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, তথাপি প্রাচীন চেনার বাগের তুল্য বাগান সে দিল্লীতে কোথায়! এই চেনার বাগ দৈর্ঘ্যে ১৩৫০ গজ—এবং ইহার মধ্য দিয়া কৃত্রিম রচিত স্রোতস্বিনী বহিয়া চলিয়াছে। তাহার জল মাঝে মাঝে একটা গভীর খাদে আসিয়া জমা হইতেছে; সেই সকল খাদে কৃত্রিম প্রস্রবণ--তাহাতে নানা লীলা দেখাইয়া জল-স্রোত আবার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে ছায়া-শ্যামল তরুশ্রেণী, শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিবার সহায়-স্বরূপ বিরাম-কুঞ্জ, এবং তাহারই পাশ দিয়া গাড়ী-ঘোড়া চলিবার পাকা রাস্তা।

ভারতবর্ষ এবং কাশ্মীরের প্রাচীন উদ্যান সমূহের অবস্থা আজ নিতান্তই জীর্ণ; তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে মনে শুধু দীর্ঘ-নিশ্বাস পুঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু একদিন তাহারা কি অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিল, তাহা আজ তাহাদের কঙ্কালসার শীর্ণ দেহের পানে নিমেষের জন্য চাহিয়া দেখিলেও বেশ বুঝা যায়!

উদ্যান-রচনার দিকে মন দিয়া বাবর একটা প্রধান অসুবিধা লক্ষ্য করিলেন,—ভারতবর্ষে কৃত্রিম জলাধারের বড় অভাব। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের যে সকল উদ্যান ছিল, সেগুলিতে প্রায়ই জলাশয়ের চারিধার বেড়িয়া বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইত। যেখানে জলাশয়ের অভাব, উদ্যান সেখানে টিঁকিতে পারিত না—এবং কাজেই যেখানে-সেখানে কাহারো খেয়াল-মত উদ্যান রচনা করিবার সুবিধা ঘটিত না। সেইজন্য কৃত্রিম জলাধার-রচনার দিকে বাবর বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন, "যেখানে আমি বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই খানেই কৃত্রিম জলাধার ও জল-চক্র ("পানি-চাক্কী") তৈয়ার করাইয়াছি এবং যখনই যেখানে আমার আদেশে বাগান তৈয়ার করা হইয়াছে, সেখানে তখনই তাহার বুকের মধ্যে এই কৃত্রিম জলাশয়ের দ্বারাই বাগানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করাইয়াছি।"

আগ্রার সন্নিকটে কোন প্রস্রবণ বা ছোট নদী না থাকায় বাবরকে বাগানের জন্য কূপ খনন করাইতে হয়।

আগ্রা হইতে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা। এক সুদৃশ্য উদ্যানের মধ্যে এই সমাধি-ভবন স্থাপিত। সেকেন্দ্রা পারস্য ও তুর্কি পদ্ধতি-অনুযায়ী রচিত এবং সে পদ্ধতিতে হিন্দু পুরাণেরও ছায়া আছে। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সরল। সমাধি পবিত্র স্থান—মধ্যস্থলে মরু পর্ব্বত উঠিয়াছে এবং তাহা হইতে গুপ্ত প্রস্রবণ বহিয়া চতুর্দ্দিকে জলস্রোত নামিয়া ঝরিয়া

উদ্যান-প্রসাধন

বহিয়া চলিয়াছে—সে জলধারায় নীচেকার ভূখণ্ড উর্ব্বর শ্যামল হইয়াছে। গিরি-গাত্রে পবিত্র বৃক্ষ—জ্ঞান বৃক্ষ—তাহারই মূল বেড়িয়া আছে প্রস্রবণের প্রাণ-দেবতা, নাগ। এই পর্ব্বত, বৃক্ষ ও নাগের (guardian-snake) প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের প্রথা বহু যুগ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। আদিম যুগের মানবের বিস্তর অভাব-পূরণে আকাশ, পর্ব্বত, জল ও ফলপ্রসূ বৃক্ষ প্রধান সহায় ছিল—তাই কৃতজ্ঞ আদিম নর-নারী তাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাহাদের পূজা করিত। Holy Tree অর্থাৎ পবিত্র দ্রুম—সকল জাতির সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই বিশেষভাবে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে। এই পবিত্র দ্রুমের স্থলে পরে মন্দির রচিত হইত এবং বৌদ্ধ যুগে প্রস্তর-নির্ম্মিত ছত্রাবলী দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়, তাহাও এই পবিত্র দ্রুমেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণে।

এই সমাধি-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় আকবরের কর্তৃত্বাধীনে, অর্থাৎ তাঁহার জীবিত থাকা কালেই। এই সমাধি-গৃহ সম্বন্ধে বিখ্যাত শিল্পী হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, "এটি অন্যান্য মোগল সমাধির অনুরূপ নহে। মুসলমান রীতিও ইহার রচনায় অনুসৃত হয় নাই। সমাধির চূড়া উদীয়মান সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছে—মক্কার দিকে নহে।" মক্কার দিকে তাকাইয়া থাকাই মুসলমান প্রথা।

আগ্রা, দিল্লী ও লাহোরে সমাধি-ভবন-সংলগ্ন উদ্যানের যে এমন প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তাহার কারণ আছে। মোগল রাজবংশীয় ও ওমরাহগণ আরামের জন্য প্রায়ই সহরের বাহিরে প্রমোদ উদ্যান রচনা করাইতেন।
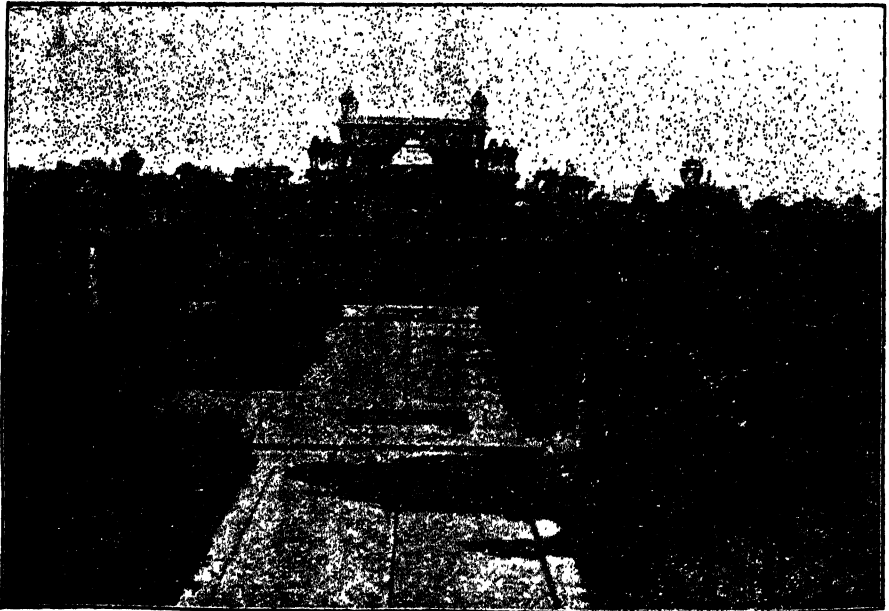
সেকেন্দ্রা

বাগান-বাড়ী না থাকিলে মর্য্যাদারও হানি হইত। প্রকাণ্ড উদ্যান—মধ্যে এক বিচিত্র্য হর্ম্ম্য—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে ছায়া-শ্যামল, জলকণা-শীতল হর্ম্ম্যে বাস বিশেষ আরামের ছিল। যত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিতেন, ততদিন কুঞ্জ-গৃহগুলি আনন্দের লীলাভূমি থাকিত, এবং মৃত্যুর পর সেই সকল বাগান-বাড়ী সমাধি-ভবনে রূপান্তরিত হইত। সংলগ্ন উদ্যান দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হইত এবং বৃক্ষের ফলমূলাদি পথিক বা সাধু-ফকির প্রভৃতির সেবায় নিয়োজিত হইত।

এই সকল উদ্যান বা উদ্যানস্থ ভূমি বাদশাহেরা ফাঁকি দিয়া কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেন না; ন্যায্য মূল্যেই ক্রয় করিতেন। ফাঁকি বা কাহারও মনে কষ্ট দিয়া জমি লইলে তাহা ভোগ হয় না, এমনি একটা কিম্বদন্তীও সেকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। বাবরের জীবন-কাহিনীতেও এ কিম্বদন্তীর কথা লিপিবদ্ধ আছে।

সমাধি-উদ্যানগুলির মধ্যে ইৎমৎ-উদ্দৌলাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি বেগম নূরজাহানের আদেশ ও উপদেশানুসারে রচিত হয়। ইৎমৎ-উদ্দৌলা নূরজাহানের পিতা মির্জ্জা গিয়াসবেগের সমাধি; আকারে সেকেন্দ্রার চেয়ে ছোট হইলেও ইহার শিল্প-নৈপুণ্য চমৎকার।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বাঙ্গলা মাসিকপত্র

আমাদের বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রাণ মাসিক-পত্রের মধ্যে দিয়েই বিকাশ লাভ করছে। এ-যুগের বাঙ্গালী লেখকদের যা-কিছু চিন্তা বা ভাব বা লেখা, তার অধিকাংশই আগে মাসিকের আসরে আত্মপ্রকাশ করে, তবে স্থায়ী-সাহিত্যে স্থান পায়। সুতরাং বাঙ্গলা-সাহিত্যের মতি-গতি ও শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করতে হলে মাসিকপত্রগুলিই সব-চেয়ে বেশী সাহায্য করবে।

কিন্তু, আমাদের মাসিক-সাহিত্য নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করতে বসি, তাহলে আমাদিগকে যে সকল-দিকেই হতাশ হতে হবে, এ সত্য না-মেনে উপায় নেই।

সকলেই জানেন, বাঙ্গলা দেশে যথার্থ মাসিক-সাহিত্যের জন্মদান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে টেকচাঁদ-প্রমুখ লেখকগণ আরো কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে"র মত সে-গুলির সুর ততটা ভরাট ও উঁচুদরের ছিল না। "বঙ্গদর্শনে"র পর আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল অতীত হতে চলল,—এর মধ্যে আমাদের মাসিক-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবারই কথা; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তা হয় নি। আংশিক উন্নতি

কিছু-কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু শুধু সেই-টুকুতেই তুষ্ট থাকলে ত চলবে না! "বঙ্গ দর্শনে"র পর ভাল মাসিক কাগজ আমরা খান-পাঁচ-ছ'য়ের বেশী পাইনি—অর্থাৎ কাল-হিসাবে প্রায় দশবছর অন্তরে এক-একখানি মাত্র! যে সাহিত্যে মধু-বঙ্কিম-রবি প্রভৃতি জন্মেছেন, সে সাহিত্যের পক্ষে এটা কিছুতেই সুখবর হতে পারে না।

*
* *

সেই মান্ধাতার আমলে "বঙ্গদর্শনে" যে সুর বেজেছিল, আজ এতদিন পরেও দেখি, আমাদের মাসিক-সাহিত্যে প্রায় সেই এক সুরই ধ্বনিত হচ্ছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে "সাধনা" ও "সবুজপত্রে"র মত বিচিত্র মৌলিকতা এবং উন্নত সাহিত্যরস পূর্ণ মাসিকপত্র খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। ষোলোর মধ্যে পনেরোখানি মাসিকপত্রেই দেখতে পাই, সেই বস্তাপচা পুরাতনের জাবর-কাটা চলেছে ত চলেইছে! "বঙ্গদর্শনে" যেমন উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ধর্ম্মবিষয়ক, দর্শন-বিজ্ঞানমূলক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং ছোট কবিতা প্রতিবারে নিয়ম-করে বেরুত—এখনো প্রায় প্রত্যেক কাগজ তারই বোঝা ঘাড়ে করে গোরুর গাড়ির মতন ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চলেছে। তখন কাগজ বেশি ছিল না, অল্পের মধ্যে অনেকখানি আশ-মেটাবার দরকার ছিল, কিন্তু এখন মাসিকপত্রের প্রসার এবং পসার যেমন বেড়েছে তাতে এক-একটি বিশেষ উপলক্ষ্য নিয়ে এক-একখানি কাগজ বেরুতে পারে। এ কথা বলতেই হবে যে আমাদের মাসিক-পত্রগুলি পুরাতনের মোহ ছেড়ে নূতন পথে আর বড় বেশীদূর এগোতে পারেনি। আমাদের সাহিত্যের হাটে কি বরাবরই এমনি সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা বিক্রী হবে—এ পল্লবগ্রাহিতা কি কখনোও থামবে না? কেবল 'বঙ্গ-দর্শনে'র আদর্শ নিয়ে চিরকালটা বসে থাকলেই ত চলবে না—যে দেশ থেকে আমরা প্রথম মাসিকপত্রের আমদানি করে-ছিলুম,—এখনো আমাদিগকে আবার সেই দেশের আদর্শ ই নিতে হবে। বিলাতে সুধু ত "ষ্ট্রাণ্ড" বা "পিয়ারসনে"র মত কাগজই চলে না,—মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞান-জগতের যত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, ইংরেজী ভাষাতেও প্রায় ততগুলি বিভিন্নবিষয়মূলক মাসিকপত্র নিয়মিতরূপে চলছে। আমাদিগকেও এখন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে হবে। বাঙ্গলা ভাষায়ও দুচারখানি বিশেষ বিষয় নিয়ে মাসিক পত্র আছে বটে, কিন্তু সেগুলি এতটা নিম্ন-শ্রেণীর ও প্রাথমিক যে, ধর্ত্তব্যের যোগ্যই নয়।

সাহিত্যে আর যে-সব অপূর্ণতা তা বরঞ্চ কতকটা সইতে পারা যায়, কিন্তু যেখানে মৌলিকতা ও গভীরতার অভাব, সাহিত্য যে সেখানে সুধু অসহ হয়ে উঠে তা নয়; সে ভবিষ্যতের আশাভরসাকেও নির্ম্মূল করে।

*
* *

মাসিকপত্র চালানো কাজটা এখন ভারি সুবিধার হয়ে উঠেছে। একটি যে ধারা বেঁধে গেছে, সেই-মত চলতে পারলেই যেন সব কাজ চুকে যায়—লেখা নিয়ে বিচার-বিবেচনা যেন দরকার নেই। সাধারণত আজকাল

যে-সব লেখা ছাপা হচ্ছে, সেগুলি পড়লে প্রায়ই মনে হয় এগুলি ছাপবার দরকার কি ছিল? কোন-একখানা মাসিকপত্র হাতে এলে, পাতার পর পাতা উল্টে হাত এবং মন দুইই ব্যথা করে। দু-একটি ভালো জিনিষ যা থাকে তাও এই রাশিরাশি রদ্দি মালের ভিতর এমন মুখ-শুকিয়ে পড়ে থাকে যে দেখে মায়া করে। সংসর্গ-দোষে বেচারারা মারা যায়। তারপর মাসিক-পত্রের পেটের ক্ষুধা আমরা এমন বাড়িয়ে তুলেছি যে এখন যা-তা দিয়ে তার পেট না ভরিয়ে উপায় নেই। কাজেই যা গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয় তাও গ্রাহ্য করতে হচ্ছে—দায়ে পড়ে আবর্জ্জনাকে আদর করে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। এ দায় মহাদায় হয়ে উঠেছে।

ভারতের অতীতগৌরব যেমন ভারত-বাসীর মাথা খেয়েছে, মাসিকপত্রের প্রবন্ধ-গৌরবও তেমনি তার পক্ষে শনি হয়ে উঠেছে। যদি কোন রাবিশ লেখা আগাগোড়া কোটেশনে কণ্টকিত হয়, যদি তার সিকিভাগ মূল অংশে ও বাকিভাগ পাদটীকায় ভরতি হয়, যদি তার উপরে প্রত্নতত্ত্বের সর্ব্বদোষহারী ছাপ মারা থাকে, তাহলেই গৌরবের জয়টীকা কপালে নিয়ে ভেরী বাজিয়ে সে কান ঝালাপালা করতে থাকে। লেখার মধ্যে রীতি এবং রস বজায় আছে কিনা, সে বিচার যেন এখন অনাবশ্যক হয়ে উঠেছে। মাসিকপত্রগুলি উল্টেপাল্টে দেখলে অনেকসময় মনে হয় পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখালেই গল্প ওঠে গিয়ে প্রথমশ্রেণীতে; সাল-তারিখের ফর্দ্দ দিলেই হোল উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস; গালা-গালি দিলেই সমালোচনা; কারুকে 'হনুমান' বা 'গাধা' বলতে পারলেই চূড়ান্ত রসিকতা; 'হরিনাম-সত্য' বললেই অতুলনীয় নৈতিক প্রবন্ধ; এবং 'চড়ুই'—ও'কড়াই'-এ মিল থাকলেই অশ্রুতপূর্ব্ব কবিতা!

*
* *

বাঙ্গলাদেশে এখন সকলের চেয়ে বেশী অভাব হয়েছে, একখানি আর্ট-সম্পর্কীয় মাসিকপত্রের। বাঙ্গালী জনসাধারণই বোধ হয় পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা আর্ট-সম্বন্ধে অধিক অজ্ঞ। তা-নইলে মাসে মাসে এই ক্রমবর্দ্ধমান বিরাট আবর্জ্জনার স্তূপ নির্ব্বাকভাবে কি-করে তাঁরা সহ্য করছেন? সুধু জনসাধারণ নন, আমাদের অধিকাংশ লেখকেরাও, আর্ট-সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। তা যদি করতেন, তাহলে এমন সব জঘন্য ও নগন্য লেখা লিখতে তাঁরা নিজেরাই লজ্জিত হতেন। মাসিক-পত্রের অধিকাংশ রচনায়—বিষয়ে, লিখন-পদ্ধতিতে ও ষ্টাইলে—আর্টে এই অজ্ঞানতা শোচনীয়ভাবে ফুটে উঠছে। আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই,—যে-সব সামান্য লেখক পাশাপাশি দুটি শব্দ বসাতে গেলেই পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন, সাহিত্যের স্বরবর্ণে হাতমস্ক হতে-না-হতেই যাঁরা ব্যঞ্জনবর্ণ লেখবার আস্পর্ধা করে কেবল হিজিবিজি কাটেন, তাঁরাও দেখি মহা গাম্ভীর্য্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের রচনাতেও লিখন-ভঙ্গীর দোষ দেখাতে যান! সুধু তাই নয়,—এঁরাও আবার আর্ট নিয়ে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা ঝাড়তে পিছপাও নন।

এই-সব অনাচার বন্ধ এবং এই-সব 'বন্ধু'র হাত থেকে সাধারণকে উদ্ধার করতে হলে, আর্ট-সম্বন্ধে একখানি ভাল কাগজের দরকার। কেননা, তথাকথিত 'বন্ধু'গণের কৃপায় সাধারণের উন্নতি ত হচ্ছেই না, উল্টে আর্ট-সম্বন্ধে গোড়া থেকেই তাদের ধারণা ভ্রান্ত হয়ে উঠছে। অজ্ঞ লেখক জনসাধারণের রুচিকে উন্নত করতে পারে না বটে, কিন্তু সে যখন মিথ্যা প্রাজ্ঞতার মুখোসে নিজের অজ্ঞতা ঢেকে অবোধের মাথা বিগ্‌ড়ে দেবার বন্দোবস্ত করে তখন সরল অজ্ঞের চেয়ে এই কপট প্রাজ্ঞ ঢের-বেশী সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যুক্তির শাসনে এই কপটদের চৈতন্যোদয় হয় না। সুতরাং সাহিত্যের যথার্থ হিতকামীদিগের কাজ হচ্ছে এখন সাধারণ রুচিকে উন্নত করা। জনসাধারণ যেদিন আর্টের আদর্শ আর তার গুণাগুণ ঠিকমত জানতে পারবে; এই কপটদের ভড়ং সেদিন আপনি ভেঙ্গে যাবে,—তাদের কথায় কেউ আর কর্ণপাত করবে না।

* *
*

আমাদের মাসিকসাহিত্যের আর-একটি মস্ত খুঁৎ এই যে, দিনে-দিনে তার গতিকটা রামহীন রামায়ণের মত অদ্ভুত হয়ে উঠছে। এখনকার অধিকাংশ মাসিক-পত্রেই বিশ্বের প্রায় সমস্ত ব্যাপার নিয়েই নাড়া-চাড়া হয়—অথচ তার মধ্যে খাঁটি সাহিত্যের নামগন্ধ প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। মাসিক-সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নেই—এর চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার আর কি হতে পারে? সাহিত্যের প্রকৃতি-পদ্ধতি, উন্নতি-অবনতি, মতি-গতি নিয়ে আলোচনা যে হয় না, তার কারণ কি? খাঁটি সাহিত্য সম্বন্ধে কি আমাদের বলবার কোনো কথা নেই? এ থেকে কি এই বোঝায় না যে আমাদের এখনকার সাধারণ লেখকদের পুঁজি অতি অল্প। এ-কথা যে সত্য, তার প্রমাণ মাসিক-সাহিত্যের পাতা ওল্টালেই পাওয়া যায়। আগে ত এমনধারা ছিল না! তখন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রতিভাবান এবং শক্তিশালী লেখক সুরসালো সাহিত্য-প্রবন্ধে মাসিকসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করতেন। সে-সব অমূল্য আলোচনায় সুধুই যে সাহিত্য পরিপুষ্ট হোত, তা নয়;—তার দ্বারা পাঠক ও নবীন লেখকদের চিত্তোৎকর্ষ সাধিত হোত। তাঁদের দেওয়া সেই সাহিত্য-রসধারায় সুধু যে হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হোত তা নয়, সেই রসে সাহিত্যে নব নব বিচিত্র শক্তির বিকাশ হোত। মাসিকপত্রে বিশেষ করে সাহিত্যরসের প্রয়োজন আছে। তবেই সে সাধারণকে প্রাণ দেবে—আনন্দ দেবে। সুধু কতকগুলো খবর দিয়ে সে কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে—কিন্তু প্রাণের স্ফূর্ত্তি উৎসারিত করে দিতে পারে না।

মাসিক-পত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আলগা হয়ে এসেছে বলে আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম্মটি যে কি, এ-যুগের পাঠকরা তা সমঝে উঠতে পারছেন না—ফলে তাঁদের রসগ্রাহিতার দিকটা ক্রমেই যেন ভোঁতা হয়ে পড়ছে। এই জন্যই তাঁরা আর সাঁচ্চা-

ঝুটো চিনতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রথমনাথপ্রমুখ সাহিত্য-রসিকগণ এখনও প্রায় সাহিত্যের কথা বলেন বটে, কিন্তু সাহিত্যহীন মাসিক-সাহিত্য এ-দেশের অধিকাংশ পাঠককেই রাবিশের তলায় এমনি কবর দিয়েছে যে, তাঁদের দিব্যবাণীও সকলকার কর্ণগোচর হচ্ছে বলে বোধ হয় না।

এখন যে-রকম চলছে এই ভাবে চল্লে দুদিন বাদে আমাদের মাসিকপত্রগুলি একেবারে সাহিত্যরসশূন্য সংবাদপত্রে পরিণত হবে এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষে যে সেটা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

*

* *

ভুল স্বীকার

গত সখ্যার মাসকাবারিতে "তাতল সৈকতে" গানটি গোবিন্দদাসের বলা হয়েছে। এটি আমাদের ভুল। তার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁর অভিভাষণে গোবিন্দদাসের নাম একবারও মুখে আনেন-নি বলাতেও আমাদের আর-একটু ত্রুটি হয়ে গেছে। কারণ তিনি দু-এক জায়গায় অন্যান্য কবিদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখ করে গেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বলা যে, তিনি গোবিন্দদাসের কাব্য নিয়ে আলোচনা করেননি; কিন্তু ঠিক সে কথা বলা হয়নি বলে আমরা দুঃখিত।

*

* *

সমালোচনা

নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বরিশাল শাখা-পরিষদের উৎসাহ ও অনুমোদনে প্রকাশিত। বরিশাল, সারদা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, ছাত্রদের জন্য বারো আনা। এই গ্রন্থে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বর্ত্তমান বঙ্গের' জাতিসমূহের আচার-ব্যবহার, ব্যবসায়, ব্যবহৃত ভাষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার বহুজাতি নানা কারণে লোপ পাইতে বসিয়াছে, সে সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তিগণ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন—ইহা সুখের কথা, সন্দেহ নাই! এই গ্রন্থ-পাঠে লুপ্ত কয়েকটি জাতির নাম আমরা জানিতে পারি। আরও জানিতে পারি, কয়েকটি জাতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ব্যবসায়ও লোপ পাইয়াছে। গ্রন্থখানি আগা-গোড়া কৌতূহলোদ্দীপক—রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ সরল, আড়ম্বরহীন। লেখকের সংগ্রহ করিবার এবং সে সংগ্রহকে সরস করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিবার শক্তি আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু এবং মুসলমান জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর আচার, ব্যবহার ও উপজীবিকার বিবরণের উপর সেকালের ভাষা ও মেয়েলি শ্লোকের নমুনাও লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি উপভোগ্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যও ইহার অল্প নহে।

সমরে সেবক। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। দৈনিক চন্দ্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। বাঙ্গালী সৈন্যগণের সমর-যাত্রা

উপলক্ষে রচিত চারিটি কবিতা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে।

চয়ন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক সেন রায় এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এই গ্রন্থে 'কথা-উপনিষৎ' 'বৌদ্ধ-কথা 'জৈন কথা সাহিত্য' 'রামায়ণী কথা', 'প্লেটো ও ডাওজিনিস' প্রভৃতি হইতে কয়েকটি কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। কথা-নির্ব্বাচনে লেখকের শক্তির পরিচয় পাই। রচনা সরল, সহজ; উচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে কথা-গুলির প্রাণ কোথাও বড়-একটা চাপা পড়ে নাই। কয়েকটি 'কথার' শেষে লেখকের দুই-চারি ছত্র টিপ্পনীতে রচনার রসভঙ্গ হইয়াছে—এইটুকু ত্রুটি শুধু চোখে পড়িল। এই গ্রন্থের অনেকগুলি কথা ভারতীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পাঠক-সমাজে সেগুলি সমাদর-লাভেও বঞ্চিত হয় নাই। বইখানির ছাপা কাগজ ভাল।

স্নেহের বাঁধন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ প্রণীত। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী এণ্ড পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস —জর্জ্জ ইলিয়টের 'সাইলাস মার্ণার' নামক ইংরাজী-নভেলের আংশিক ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। 'অবলম্বন' লেখা থাকিলেও লেখক মূল উপন্যাসের ঘটনাবলীই হুবহু বজায় রাখিয়াছেন—শুধু নামগুলা বাঙলায় রূপান্তরিত করিয়াছেন—ইহার ফলে প্লটটি একেবারে আজগুবি ও হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন চরিত্রই এদেশের মাটি বা জল-হাওয়ার স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যে লেখকের কোনরূপ অভিজ্ঞতা আছে, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা মনে হয় না। আবার তাহার উপর লেখকের ভাষা আড়ষ্ট, রচনা-ভঙ্গীও একান্ত নির্জ্জীব।

সুখমণী। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি, এল কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা, মিত্র প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, কাপড়ে বাঁধা, পাচ সিকা মাত্র। এখানি গুরু অর্জ্জুন দাস নামক ভক্ত শিখ সাধক রচিত প্রসিদ্ধ শিখগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থ গুরুমুখী ভাষায় রচিত—এ গ্রন্থের পদাবলী শিখেরা সুরলয়যোগে গাহিয়া থাকেন। গ্রন্থকার এই অমূল্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। মূল শ্লোক অনুবাদ-সহ বাঙ্গালা অক্ষরেই মুদ্রিত। অনুবাদটুকু সহজ ও সরল গদ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। লেখক যে অক্ষম ছন্দ মিলাইবার প্রয়াস পান নাই, ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা পাইয়াছে। লেখক গুরুমুখী ভাষা হইতে অন্যান্য শিখ গ্রন্থও অনুবাদ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন—এ অনুবাদে বঙ্গ সাহিত্য যে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ অনুবাদ-গ্রন্থখানি সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

পার্সিপোলিসে আলেকজান্দার

(প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে

৪০শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৩ [১২শ সংখ্যা

তাঁতাজিলের মৃত্যু*

পাত্র-পাত্রী

তাঁতাজিল

ইগ্রেন } তাঁতাজিলের দুই বোন
বেলান্জিয়ার }

আগ্লোভাল

রাণীর তিনজন ভৃত্য

প্রথম অঙ্ক

স্থান—পর্ব্বত-শিখর, দূরে প্রাসাদ দেখা যাইতেছে।

তাঁতাজিলের হাত ধরিয়া ইগ্রেনের প্রবেশ।

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, তোমার আজকের রাতটা বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না। ঐ সাগরের ডাক শোনা যাচ্ছে—গাছগুলো যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে—অনেক দেরী হয়ে গেছে। প্রাসাদের সামনে ঝাউ গাছগুলোর পিছনে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে,এখানে আমরা দু'জনে শুধু আছি—আর কেউ নেই—ভারী সাবধানে থাকতে হবে...একটু সুখও আয়ত্ত না হয়, এই তাদের লক্ষ্য। একদিন আমি মনে মনে বলেছিলুম,—এত চুপি চুপি সে, যে আমার অন্তর্যামীও তা শুনতে পান্‌নি—বলেছিলুম, এখন সুখে আছি···অমি আর কিছু নয়—দুদিন পরেই বুড়ো বাপ মারা গেলেন, দুটি ভাই কোথায় যেন উবে গেল! তুমি, আমি আর আমার ছোট বোনটি—এ ছাড়া আর আমাদের কেউ নেই ভাই। ভবিষ্যৎ! আর আমার বিশ্বাস নেই··· এস, কাছে এস···আমার কোলে বসে আমায় চুমু দাও···তোমার হাত দুটি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধর...হাঁ···ঠিক···এ বাঁধন আর তারা খুল্‌তে পারবে না···একদিন সন্ধ্যাবেলা তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর সেই ঘুলিপথ দিয়ে যাবার সময় একটা ছায়া দেখে কি

* মেটারলিঙ্ক রচিত The Death of Tintagiles এর অনুবাদ।

রকম তুমি ভয় পেয়েছিলে··· তা কি তোমার মনে আছে, তাঁতাজিল? আজ সকালে হঠাৎ আবার যখন তোমাকে দেখলুম, তখন মনে হল যেন আমার প্রাণটা বেরিয়ে আসছে···ভাবছিলুম, তুমি দূরে আছ, বেশ ভালই আছ...কে তোমাকে এখানে আনলে?

তাঁতাজিল—আমি ত জানিনা।

ইগ্রেন। তারা যা বল্লে, তোমার সব মনে আছে?

তাঁতাজিল—তারা বললে, আমায় আসতে হবে।

ইগ্রেন—আসবার কারণ···

তাঁতাজিল—কারণ আবার কি, রাণীর ইচ্ছে, তাই......

ইগ্রেন—রাণীর এ রকম ইচ্ছে কেন, তা তারা বল্লে না? নিশ্চয়ই বলেছে।

তাঁতাজিল—আমি শুনিনি।

ইগ্রেন—তারা নিজেরা যখন কথা কইছিল, তখন কি বলাবলি করছিল?

তাঁতাজিল—তারা ভারী ফিস্ ফিস্ করে কথা বল্‌ছিল, আমি তার কিছুই শুনতে পাইনি।

ইগ্রেন—সমস্ত ক্ষণই—?

তাঁতাজিল—সমস্তক্ষণই; কেবল আমার দিকে যখন চাইলে, তখন......

ইগ্রেন—রাণীর সম্বন্ধে কিছুই বলেনি? কোন কথা না?

তাঁতাজিল—তারা কেবলই বলছিল, তাঁকে কেউ কখন দেখেনি।

ইগ্রেন—জাহাজে তোমার সঙ্গে যারা ছিল, তারাও কিছু বল্লে না?

তাঁতাজিল—সমস্তক্ষণই তারা বাতাস আর পালের সম্বন্ধে কথা বলছিল!

ইগ্রেন—হুঁ···তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই...

তাঁতাজিল—তারা আমাকে একলা রেখে গেল।

ইগ্রেন—তবে শোন, তাঁতাজিল, যা জানি, সব তোমায় বলছি।

তাঁতাজিল—বল দিদি।

ইগ্রেন—সে বড় বেশী কথা নয়, সামান্যই। ···আমরা দু বোনে আজন্মই এখানে আছি, কিন্তু কখনো, এই যে সব চার দিকে যা ঘটছে, তা বুঝতে সাহস করিনি...এ দ্বীপে অনেক দিন আছি। ভাবি, যদি কখনো অন্ধ হয়ে যাই, তাতে বিশেষ কষ্ট হবে না, কারণ সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ···ব্যাপার ত ভারী...হয় একটা পাখী উড়বে, গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে পড়ে যাবে, আর না হয় কোথাও একটা ফুল ফুটে উঠবে ···এই ত এক একটা ঘটনা! চারদিকে এখানে সব এমন চুপ্‌চাপ্ যে দূরে বাগানে একটা পাকা ফল পড়লে সকলেই জানলার পানে ফিরে তাকায়! কারো মুখে কোন সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্ত নেই—কিন্তু একদিন রাত্রে জানতে পারলুম, ব্যাপার শুধু এই নয় ...এর ভিতরে আরও ঢের-কিছু আছে··· পালিয়ে যাব, ঠিক করলুম, কিন্তু পারলুম না...যা বল্লুম, সব বুঝতে পারছ?

তাঁতাজিল—হ্যাঁ দিদি, সব বুঝতে পেরেছি...

ইগ্রেন—না, আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না···কি যে হবে, বল্‌তে পারি না...ভূতের মত ঐ যে মরা গাছগুলো

দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে সেই দূরে ঐ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা বাড়ী দেখতে পাচ্ছ ?

তাঁতাজিল—খুব কালো একটা কি দেখতে পাচ্ছি, দিদি, ঐটেই কি প্রাসাদ ?

ইগ্রেন—হাঁ, ঐ প্রাসাদ। প্রাসাদটা খুব কালো···খুব ঘন ছাওয়ার ভিতর অনেক নীচে ···ওখানেই আমাদের থাকতে হয়···আশপাশের চারদিকের পাহাড়ের উপর তারা মনে করলেই প্রাসাদটা তৈরি করাতে পারত, কিন্তু করায়নি! দিনের বেলায় পাহাড়ের নীল রং দেখে আর পাহাড়ের চূড়ো থেকে দূরে সাগর আর সমতল ভূমি দেখে সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচত আরামও পেত কিন্তু অত নীচে তারা ইচ্ছে করেই প্রাসাদটা তৈরী করালে; ওটা এত নীচে যে বাতাসও যেন আসতে পারে না! এখন সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে আর কেউ দেখছেও না...দেয়াল-গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খসে যাচ্ছে...অন্ধকারেই সব বোধ হয় লোপ পেয়ে যাবে...কেবল একটা বাড়ী আছে যার আজও কিছু হয় নি। কত কাল হয়ে গেল, তবু ঠিক সেই রকমই রয়েছে...ওটা খুব বড় আর সব সময়েই ওর ছায়া বাড়ীটার উপর গড়িয়ে পড়ে আছে······

তাঁতাজিল—দিদি, ওরা ও কি জ্বালাচ্ছে ···দেখ, দেখ, বড় বড় জানলাগুলো আলোয় ভরা—লাল টকটক্ করছে!

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ওগুলো সেই প্রাসাদের জানলা·· কেবল ঐ জানলা গুলোতেই আলো দেখতে পাবে...ঐ ঘরেই রাণীর সিংহাসন···

তাঁতাজিল—রাণীকে দেখতে পাব না ?

ইগ্রেন—না, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

তাঁতাজিল—দেখতে পায় না! কেন ?

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, কাছে এসো··· একটা পাখী কেন, একটা ঘাসের শিষও যেন আমাদের এসব কথা শুনতে না পায়।

তাঁতাজিল—দিদি, এখানে ত একটিও ঘাস নেই... [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রাণী কি করেন ?

ইগ্রেন—কেউ তা জানে না...তাঁকে কেউ চোখেও দেখেনি কখনো। ওখানে, ঐ প্রাসাদে তিনি একলা আছেন। যারা তাঁর কাজ করে, তারা আবার দিনের বেলা কেউ বাইরে আসে না...তাঁর বয়স অনেক হয়েছে; সম্পর্কে তিনি আমাদের দিদিমা... তাঁর ইচ্ছে তিনি একলা রাজত্ব করেন—অপরের উপর তাঁর ভারী সন্দেহ, পরের সুখ সহ্য করাও তাঁর স্বভাব নয়! তবে লোকে বলে, তাঁর মাথা কিছু খারাপ... তাঁর রাজত্ব যাবার ভয়েই বোধ হয় তোমাকে এখানে আনা হয়েছে...তাঁর হুকুম-মত কাজ হল, কিন্তু কেমন করে, তা কেউ জানতে পারলে না...বাড়ীর বাইরে তিনি কখনো যান না, সদর দরজাগুলো দিন রাতই বন্ধ থাকে···আমি কখনো তাঁকে দেখিনি তবে আমার বোধ হয় তাঁকে অপরে যারা দেখেছে, সে যখন তিনি খুব ছোট ছিলেন, তখন।

তাঁতাজিল—তাঁর চেহারা কি বিশ্রী ?

ইগ্রেন—আমি ত দেখিনি, সকলে বলে, দেখতে সুন্দরী নন, তবে গড়নটা

কেমন এক রকমের! কিন্তু যারা দেখেছে তারা একটি কথাও বলতে সাহস করে না —তারা যে সত্যি সত্যি দেখেছে, তাই বা কে জানে! তাঁর কিন্তু একটা শক্তি আছে, সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, আর এখানে রয়েছি বটে তবে মনের উপর যেন সব সময়ে কি এক পাথর চাপানো রয়েছে··· ভয় পাচ্ছো? না, না, ভয় কি! এ নিয়ে আর ভেবো না...তাঁতাজিল, ভয় নেই! আমরা থাকতে তোমার কিছুই হবে না, আমরা তোমাকে রক্ষা করবো। কিন্তু একটা কথা ভুলো না, সব সময়ে আমাদের কাছে কাছে থাকবে, দূরে কখনো থেকো না...হয় আমাদের কাছে, না হয় আগ্লোভালের কাছে...

তাঁতাজিল—আগ্লোভালও···

ইগ্রেন—হাঁ, সেও এখানে থাকে... আমাদের খুব ভালবাসে...

তাঁতাজিল—তার বয়স অনেক হল, না দিদি?

ইগ্রেন—বুড়ো বটে কিন্তু খুব বুদ্ধি তার ···থাকবার ভিতর সেই-ই কেবল একজন বন্ধু আছে। আর বলবো কি, তার অনেক ব্যাপার জানা আছে···কিছু বুঝতে পারছি না—রাণী তোমাকে এখানে আনালেন, অথচ আগে কেউ শুনলে না, জানলে না... নিজের মনে যে কি আছে, তাই-ই জানি না···আগে দুঃখ করতুম, তবে তুমি সেই দূরে সমুদ্রের ও পারে আছ শুনে ভারী আমোদ হল কিন্তু এখন...আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি...সকালে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্য ওঠা দেখতে বেরিয়েছিলুম··· বাইরে বেরিয়েই তোমাকে দেখলুম···আর দেখেই তোমাকে চিনতে পারলুম—

তাঁতাজিল—না দিদি, তোমার মিছে কথা...আমি ত আগে হাসলুম...

ইগ্রেন—তখন হাসা অসম্ভব...বিশেষ আবার সে সময়ে...তুমি বুঝতে পারছ না ...তাঁতাজিল, চল, সময় হয়েছে; দেখ, সাগরের উপর বাতাস জমে যেন কালো হয়ে যাচ্ছে...আমাকে চুমু দাও, ওঠবার আগে চুমু দাও···আবার···আবার···ওরে ভালবাসার মর্ম্ম তুই কি বুঝবি...! তোর হাত দুখানা দে···আমার হাতের মধ্যে দে···চল, আবার সেই ভীষণ বাড়ীতে ফিরে যাই......

[তাহারা চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রাসাদের একটি ঘর।

ইগ্রেন এবং আগ্লোভাল বসিয়া আছে।

বেলান্‌জিয়ারের প্রবেশ

বেলা—তাঁতাজিল কই? কোথায় গেল সে?

ইগ্রেন—এইখানেই আছে, জোরে কথা কয়ো না। পাশের ঘরে সে ঘুমোচ্ছে। সে যেন একটু শুকিয়ে গেছে—ভাল আছে বলে আমার মনে হয় না। এতটা পথ আসতেই বোধ হয় কষ্ট হয়েছে—আর সমুদ্দুরে ত অনেকক্ষণ ছিল। না, না, তা নয়, বোধ হয় এ বাড়ীর হাওয়া তার মনে কেমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে—সে কাঁদছিল কিন্তু কেন তা সে জানে না...আমি তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলুম! এস, এস, দেখবে

এস...আমাদের বিছানায় শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছে ...কিন্তু মুখখানা যেন ভারি-ভারি দেখাচ্ছে। রাজার মত কপালে ছোট হাতখানি রেখেছে, রাজ্যের সমস্ত চিন্তা যেন ওরই মাথায়......

বেলা—[হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল] দিদি···

ইগ্রেন—তুই কাঁদছিস কেন?

বেলা—যা জানি তা বলতে সাহস হচ্ছে না···না, না, আমি কিছুই জানি না ...কিছু ঠিক বলতে পারছি না...কিন্তু আমি শুনেছি, নিজের কানে শুনেছি... দাঁড়িয়ে সে কথা আর কেউ শুনতে পারত না···

ইগ্রেন—বল্ না, তুই কি শুনেছিস্ বল্। দেরী করিস নে...

বেলা—ঘুলি দিয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময়...

ইগ্রেন—এমন সময় কি?...

বেলা—একটা দরজা একটু ফাঁক ছিল। আস্তে আস্তে তাতে ধাক্কা দিলুম, তারপর ভিতরে গেলুম...

ইগ্রেন—কোথায়? কোথায় গেলি?

বেলা—সে সব কখনো দেখিনি...সে সব কত দালান—আলোয় একেবারে জল্ জল্ করছে—থাকে-থাকে আসন সাজানো আর সে এত যে বলবার নয়...বেশী এগিয়ে যাওয়া বারণ ছিল আমি জানতুম ...ভয় হল কিন্তু যেই ফিরে আসব, অমনি একটা গলার আওয়াজ পেলুম··· আওয়াজটা ভারি অস্পষ্ট...

ইগ্রেন—বোধ হয়, রাণীর চাকরেরা কথা কচ্ছিল; তারা ঐ নীচের তলায় থাকে, তা জানিস না?

বেলা—ব্যাপারটা এখনো ভাল করে বুঝতে পারছি না...মাঝে যে কেবল একটা দরজা তা নয়, অনেকগুলো দরজা...আর গলার আওয়াজ যা শুনলুম, সে কি বিশ্রী, কি ভয়ানক......গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে যেন কথা বলছে...সে কি চাপা স্বর···যতখানি পারলুম কাছ ঘেঁসে গেলুম··· কিন্তু ঠিক বল্‌তে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, বেশ মনে আছে, আজ যে ছেলেটি এসেছে, তারই কথা—না, না, শুধু তাই নয়, একটা সোনার মুকুটের কথাও তারা বলাবলি করছিল—মনে হল, তারা খুব হাসছে......

বেলা—হাঁ, আমার বেশ মনে আছে, তারা হাসছিল···শেষে কিন্তু কাঁদতে আরম্ভ করলে...না, না, ভুল শুনেছি, বোধ হয়...কি করছিল বোধ হয় বুঝতে পারিনি...কারণ সে শোনবার জো ছিল না···আর বলবো কি, সে এত চাপা কিন্তু কি ভয়ানক স্বর...ঘরের মধ্যে অনেক লোক পায়চারি করছে বুঝতে পারলুম— একটা ছেলের কথা তারা বলছিল, রাণী কিন্তু তাকে দেখতে চাইলে...হাঁ, আজই সন্ধ্যাবেলা বোধ হয় তারা এখানে আসবে···

ইগ্রেন—কি? ঠিক বলছিস্···আজই সন্ধ্যাবেলা...

বেলা—হাঁ, আজই সন্ধ্যাবেলা···আমার বেশ মনে আছে···না, না, আমি ভুল করি নি...

ইগ্রেন—কোন নাম করলে না?

বেলা—একটি ছেলের কথা বলছিল··· ছোট একটি ছেলে···

ইগ্রেন—এখানে ত আর কোন ছোট ছেলে নেই…

বেলা—ঠিক সেই সময় জোরে জোরে কথা কইতে লাগলো, যেন তাদের সন্দেহ হচ্ছিল, যে ঠিক দিনটা এসেছে কিনা—

ইগ্রেন—ভিতরকার ব্যাপার এবার বুঝতে পেরেছি… তারা যে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে, ভেবো না, এ এই প্রথমবার… তাকে রাণী কেন যে আনালেন, এবার খুব ভাল করেই তা বুঝতে পেরেছি… কিন্তু…এত তাড়াতাড়ি করবার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না…আচ্ছা, দেখা যাক্…আমরা ত তিনজন আছি আর হাতে সময়ও ঢের আছে…

বেলা—তুমি কি করবে ভাব্‌ছো?

ইগ্রেন—কি যে করবো, তা নিজেই ভাল করে বুঝছি না, কিন্তু তাঁকে একেবারে অবাক্ করে দেব…তুই ত কেবল কাঁপ্‌তেই জানিস্, ভিতরের ব্যাপার বুঝতে পারছিস্…শোন্, বল্‌ছি…

বেলা—কি?

ইগ্রেন—এবার তাঁকে বেগ পেতে হবে, তা বলে রাখছি।

বেলা—দিদি, আমরা যে একলা…

ইগ্রেন—হাঁ, আমরা একলা আছি, সে কথা সত্যি কিন্তু কাজও কেবল একটা করবার আছে, আর তাতেই আমাদের জয় হবে…এসো, আমরা আগেকার মত সে রকম ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে থাকি, হয়তো তা দেখে তাঁর দয়াও হতে পারে…লোকের কান্না দেখলে তাঁর মন গলে যায়…তাঁর সব কামনাই আমরা পূরণ করবো; হয়তো তিনি হেসেই উঠবেন আর এরকম ভাবে লোককে বসে থাকতে দেখলে ক্ষমা না করে থাকতে পারবেন না।…আজ কত বছর ধরে ঐ বাড়ীটার মধ্যে তিনি রয়েছেন আর কেবলি আমাদের ভালবাসার জিনিষগুলিকে নষ্ট করে আসছেন! কিন্তু তাঁকে আঘাত করতে, তা কেন, তাঁর সুমুখে যেতেও কারো সাহসে কখনো কুলিয়ে উঠ্‌ল না…কবরের উপর যেমন পাথর চাপানো থাকে, ঠিক সেই রকম তিনি আমাদের বুকের উপর চেপে রয়েছেন আর নিজেদের হাতগুলো বাড়াতেও কারো সাহস হচ্ছে না…যখন এখানে ছিল, তখন ভয়ে ভয়েই সব থাকত…কিন্তু সে দিন আর নেই…এখন আমাদের দিন এসেছে…এবার আমরা দেখে নেবো…এ সময় একজনকে সাহস করে উঠতেই হবে… তাঁর শক্তিটা কিসের উপর…তা কারো জানা নেই! আর এ বাড়ীতে আমি বাস করছি না…ও কি, কাঁপছ? তবে যাও, চলে যাও; দুজনেই যদি এরকম ভাবে ভয়ে কাঁপবে, তাহলে চলে যাও… আমার দরকার নেই…যাও, দুজনেই যাও… আমাকে একলা রেখে যাও…একলাই আমি তাঁর অপেক্ষায় থাকবো…

বেলা—দিদি, কি করবে, তা জানি না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি যাচ্ছি না…

আগ্লোভাল—মা আমার, আমি থাকবো …আমি যাচ্ছি না…আমার জীবনটাও ভারী অসহ্য হয়ে পড়েছে…এবার তুমি চেষ্টা করো…একবার কেন, আমরা ত অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি…

ইগ্রেন—তোমরা চেষ্টা করেছো··· তুমিও...

আগ্লোভাল—সবাই চেষ্টা করে দেখেছে ...কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাদের জোর কোথায় চলে যায়···তুমি...হাঁ, তুমিও দেখতে পাবে...আজই সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে যাবার জন্য যদি হুকুম আসে, তাহলে হাত জোড় করে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু আমার পাদুটো ঠিক গিয়ে সেখানে হাজির হবে; আর সে কোথাও থামবে না, দেরী করবে না, তাড়াতাড়িও করবে না, কারণ এটুকু আমার জানা আছে যে ধরে নিতে কেউ আসবে না ··অথচ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমাদের নেই! আমাদের হাতগুলো এখন আর কোন কাজের নয়, এমন কি কিছু ছোঁবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই...এখন যাক্ ··তোমাকে দেখে আমার আশা হচ্ছে, তোমাকে আমি সাহায্য করবো...মা আমার, দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও··· তাঁতাজিলকে জাগাও···তাকে বুকের মধ্যে চেপে হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখো···তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

তৃতীয় অঙ্ক

সেই ঘর

ইগ্রেন ও আগ্লোভাল।

ইগ্রেন—দোরগুলো সব দেখছিলুম। তিনটে দরজা, বড়টার উপরই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে...আর দুটো খুব ছোট, চাবিগুলো অনেকদিন হারিয়ে গেছে, লোহার গরাদগুলো দেয়ালের মধ্যে একবারে আঁটা...এ দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে; দরজাটা কি ভারী! সহরের ফটক থাকে, তার চেয়ে এটা ভারী, শুধু তাই নয়...কি প্রকাণ্ড···এ-সব দরজায় বাজ পড়লেও কোন ক্ষতি হয় না...কি যে ঘটবে, তা কে জানে···তুমি ঠিক আছ ত?

আগ্লোভাল—[দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া]—সিঁড়ির ধাপে আমি বসে থাকবো···তলোয়ারখানাও হাঁটুর উপর থাক্। ভেবো না মা, যে এই রকম ভাবে বসে এই প্রথম আমি এ দোরে পাহারা দিচ্ছি, তা নয়...কতবার যে এ কাজ করেছি, তার ঠিকানা নেই···এমন সব পুরানো ব্যাপার লোকের সময়ে সময়ে মনে পড়ে, যে সে নিজেই তার কিছু অর্থ ঠাওরাতে পারে না···এ সবই আমি করেছি, অথচ কখন যে করেছি, তার কিছুই মনে নেই··· তবে কখনো তলোয়ার বার করবার সাহস হয় নি...এই যে আমার সেই তলোয়ার-খানা রয়েছে, কিন্তু আমার হাতের সে ধরবার শক্তি আর নেই; এবার চেষ্টা করে দেখবো···এখন সময় এসেছে, নিজেদের সব করতে হবে···

[তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে লইয়া বেলানজিয়ার পাশের ঘর হইতে আসিল]

বেলা—এ জেগেছিল ···

ইগ্রেন—কেমন শুকিয়ে গেছে···কি যেন ভয় পেয়েছে···

বেলা—আমি ত জানি না...চুপ করে ছিল···তারপর কাঁদতে লাগল...

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ভাই···

বেলা—অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে—

ইগ্রেন—আমাকে বোধ হয় চিনতে

পারে নি...তাঁতাজিল...চেয়ে দেখ...তোমার দিদি তোমার সঙ্গে কথা কইছে...একদৃষ্টে ওধারে ও কি দেখছ...এদিকে দেখ... এস, তোমাতে আমাতে খেলা করি...

তাঁতাজিল—না...

ইগ্রেন—খেলা করতে চাও না? কেন...

তাঁতাজিল—আমি দাঁড়াতে পারছি না...

ইগ্রেন—দাঁড়াতে পারছ না? কেন? কি হল তোমার...কি কষ্ট হচ্ছে?

তাঁতাজিল—কষ্ট হচ্ছে...

ইগ্রেন—কি কষ্ট, বল,...আমি সারিয়ে দেব...

তাঁতাজিল—বলতে পাচ্ছি না...এক জায়গায় নয়...গায়ের চার দিকে...সব জায়গায়...

ইগ্রেন—ভাই আমার, এসো, আমার কোলে এসো...আমার কোলে বসে থাকলেই তোমার সব ব্যথা সেরে যাবে...দাও, ওকে আমার কাছে দাও...বেলা, আমার কাছে দে...আমার কোলে বসে থাকুক্, তাহলে আর কোন ব্যথা থাকবে না...ভাই, আমার হাত দুখানা কেমন নরম, নয় কি? এই হাত তোমার গায়ে বুলিয়ে দেব—সব কষ্ট সেরে যাবে। তোমার বড় বোনেরা তোমার কাছে রয়েছে, তোমার পাশেই রয়েছে, কোন ভয় নেই। আমরা তোমায় রক্ষা করবো...তোমার কোন অনিষ্ট ঘটবে না...বিপদ তোমার কাছে আসতেই পারবে না...

তাঁতাজিল—বিপদ ত এসে গেছে দিদি,; আমার কথা কি বলছ...ওখানে কোন আলো নেই কেন, দিদি..

ইগ্রেন—ওখানে ত আলো রয়েছে ভাই...কড়ি কাঠে ঐ যে একটা আলো ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ না?

তাঁতাজিল—হাঁ, হাঁ, দেখতে পেয়েছি... কিন্তু বড় নয়, ছোট...আর আলো কৈ?...

ইগ্রেন—তার দরকার কি...যা দেখবার সব ত দেখতে পাচ্ছি...

তাঁতাজিল—হাঁ, তা পাচ্ছি বটে...

ইগ্রেন—পাচ্ছ! তোমার চোখের জোর ত খুব...

তাঁতাজিল—দিদি, তোমারও কি কম... তোমার ত ভাই...

ইগ্রেন—না, আজ সকালে আমি ত দেখি নি...এখন তোর চোখে দেখলুম... মন যে কখন কি ভাবে, কি দেখে, তা আমরা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না...

তাঁতাজিল—দিদি, মনকে ত আমি দেখিনি...আগ্লোভাল ওখানে বসে আছে কেন?

ইগ্রেন—ওখানে বসে ও একটু জিরুচ্ছে... শুতে যাবার আগে তোমাকে চুমু খেয়ে যেতে চায়...তোমার কখন ঘুম ভাঙ্গবে, সেইজন্যে বসে আছে..

তাঁতাজিল—ওর হাঁটুর উপর কি ও?

ইগ্রেন—হাঁটুর উপর? কৈ না, আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

আগ্লোভাল—ও কিছু নয়...আমার তলোয়ারখানা দেখছিলুম, কিন্তু একে আর চেনা যায় না...অনেক দিন ধরে এখানা আমার কাজ করে আসছে, কিন্তু আর একে আমার বিশ্বাস নেই...আমার মনে হচ্ছে এবার ভেঙে যাবে...এই যে, বাঁটের কাছে

এখনও একটু রং...মরচে ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে ...তাই দেখে আমি নিজের মনেই কি সব বকছিলুম···কখন যে কি সব করলুম, কিছুই আর মনে নেই...মনটা কেমন ভাল নেই···কি করা যায়?...মানুষকে বাঁচতেই হবে, কারণ অদৃষ্টে তার যা আছে, তা ত হওয়া চাই, আবার তারপরও আশায় বুক বেঁধে কাজ করতে হবে ··এক একটা সময় আসে, যখন জীবনটা নিজেদেরই কাছে ভারী বিশ্রী বিরক্তিকর ঠেকে, তখন আর বাঁচবার ইচ্ছা থাকে না···এখন অনেক দেরী হয়ে গেল, আর পারছি না...বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

তাঁতাজিল—দিদি, ওর গায়ে কাটার দাগ রয়েছে—

ইগ্রেন—কৈ, কোথায়...

তাঁতাজিল—ওই যে, কপালে, হাতে...

আগ্লোভাল—ও গুলো অনেকদিনের কাটার দাগ, ভাই ওতে আর আমার কিছু হয় না, ···আলো আজ পুড়েছে কি না·· ভাই, তুমি এতদিন দেখনি···

তাঁতাজিল—দিদি, দেখ, ওর বোধ হয় খুব দুঃখ হয়েছে—

ইগ্রেন—না, না, দুঃখ হয় নি, ও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে...

তাঁতাজিল—দিদি, তোমাকেও কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে—

ইগ্রেন—কৈ, না...আমাব দিকে চেয়ে দেখ দিকি...আমি যে হাসছি···

তাঁতাজিল—দিদি, মেজদিরও তাই...মুখ দেখ···

ইগ্রেন—না, না, মিছে কথা, ও ত ঐ হাসছে...

তাঁতাজিল—না, ও হাসি নয়...আমি বুঝতে পেরেছি ··

ইগ্রেন—না, ও কিছু নয়—অন্য কিছু ভাবো...এ সব কথা আর ভেবো না...

[ইগ্রেন তাহাকে চুম্বন করিল]

তাঁতাজিল—আর কি ভাববো?...দিদি, চুমু খাবার সময় আমাকে মারলে কেন?

ইগ্রেন—তোমায় মারলুম?

তাঁতাজিল—হ্যাঁ,...দিদি, তোমার বুকের মধ্যে কিসের শব্দ শুনতে পেলুম কেন, বুঝতে পাচ্ছি না···

ইগ্রেন—তুমি বুকের শব্দ শুনতে পেলে?

তাঁতাজিল—হাঁ, হাঁ...কি যেন কি...

ইগ্রেন—কি?

তাঁতাজিল—আমি বুঝতে পারছি না...

ইগ্রেন—মিছিমিছি ভয় পাওয়া ভারী অন্যায়! আর এ রকম ভাবে কথা কওয়া... এ কি, তুমি কাদছ...কেন—কিসের কষ্ট বোধ করছ? আমি তোমার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে...হাঁ, এইবার বেশ শুনতে পাচ্ছি। এত কাছাকাছি থাকলে সকলেই পরস্পরের বুকের শব্দ শুনতে পায়...তখন মনে মনে কথা হয় কি না! সে সব কথা জিভ্ জানেও না, তা বলবে কি···

তাঁতাজিল—আগে ত কিছু শুনি নি...

ইগ্রেন—তার কারণ... হাঁ, কিন্তু তোমার বুকে কি হয়েছে ..কাঁদছ কেন?

তাঁতাজিল—[কাঁদিতে কাঁদিতে]—দিদি

ইগ্রেন—কি হয়েছে...বল ভাই... বল...

তাঁতাজিল—শুনতে পেয়েছি...তারা... তারা আসছে—

ইগ্রেন—কারা? কারা আসছে… কি হয়েছে?

তাঁতাজিল—দরজায়…দরজায়—ঐ দরজার কাছে—

[পিছনদিকে সে পড়িয়া গেল]

ইগ্রেন—কি হল? অজ্ঞান হয়েছে যে!

বেলা—দেখো, দেখো, পড়ে যাবে—

আগ্লোভাল—[হাতে তলোয়ার লইয়া, লাফ দিয়া উঠিল]—আমিও শুনতে পাচ্ছি—ঐ যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—

ইগ্রেন—কৈ?

[ক্ষণেকের জন্য সব চুপ, তারপর সকলেই শুনিতে লাগিল]

আগ্লোভাল—হাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি—শুনতে পাচ্ছি। কারা একদল আসছে—

ইগ্রেন—একদল? কি বলছ—একদল কেমন করে—

আগ্লোভাল—আমি বুঝতে পারছি না—একবার শুনতে পাচ্ছি, আর একবার পাচ্ছি না। চলার ভঙ্গি সব আলাদা তবু তারা আসছে, ঐ যে দরজা ছুঁয়েছে—

ইগ্রেন—[তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া]—ভাই, তাঁতাজিল—

বেলা—[তাহাকে চুম্বন করিয়া]—ভাই তাঁতাজিল,—

আগ্লোভাল—দরজাটা নাড়ছে শোন, শোন, জোরে নিশ্বাস ফেলো না। ফিস্‌ফিস্ করে সব কথা কইছে!

[কুলুপের মধ্যে চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনা গেল]

ইগ্রেন—তাদের চাবি আছে?

আগ্লোভাল—হাঁ, আমি ত জানতুম—সবুর কর—[সিঁড়ির শেষ ধাপে তলোয়ার বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া বোন দুটিকে বলিল]—এসো, দুজনেই এসো—

[কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ—ধীরে ধীরে দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিল—আগ্লোভাল সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া তলোয়ারখানি খুব জোরে নিক্ষেপ করায়, তার ডগাটা কড়ি কাঠের মধ্যে আটকাইয়া গেল এবং অল্প চাপেই তলোয়ার সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল—খণ্ড খণ্ড ইস্পাতগুলি টুং টাং শব্দ করিতে করিতে সিঁড়িতে গড়াইয়া গেল—ইগ্রেন লাফাইয়া উঠিল, তাঁতাজিলকে কোলের মধ্যে রাখিয়া—সে তখনও অচেতন অবস্থায়—তাহারা তিনজনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আটকাইতে পারিল না—দরজা আস্তে আস্তে খুলিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকেও দেখা বা কোন শব্দ শুনা গেল না—অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা আলোক-রশ্মি আসিল; তখন তাঁতাজিল তাহার হাত বাড়াইয়া চেতনা লাভ করিয়া মুক্তির চীৎকার করিয়া উঠিল; তারপর তাহার বোনকে আদর করিল—আর সেই সময় তাহাদের অল্প চেষ্টাতেই দ্বার বন্ধ হইয়া গেল—]

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, ভাই—

[বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিল]

আগ্লোভাল—[দরজায় দাঁড়াইয়া]—এখন আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

ইগ্রেন—[আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া]—তাঁতাজিল, তাঁতাজিল, দেখ বেঁচে গেছে! চোখের দিকে চেয়ে দেখ, তারাটা দেখতে পাবে। এই যে, এবার কথা কইবে। ওরা

দেখলে আমরা পাহারা দিচ্ছি, তাই আর সাহস হল না। "আয় ভাই, চুমু দে, আমাদের চুমু দে, তাঁতাজিল। শুধু আমাকে নয়—সবাইকে, প্রাণের ভিতরটা পর্য্যন্ত জুড়িয়ে যাক্! আঃ—

[চারিজনেরই চোথ জলে ভরিয়া আসিল এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল]

চতুর্থ অঙ্ক

সেই ঘরের সম্মুখে একটি বড় দালান

[রাণীর তিনজন চাকর আসিল—সকলেরই মুখ কাপড়ে ঢাকা; আর পরনের কালো লম্বা পোষাক মাটীতে লুটাইতেছে—]

প্রথম ভৃত্য—[দরজায় কান পাতিয়া শুনিয়া] ওরা পাহারা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ভৃত্য—আমাদের কিছু করবার দরকার নেই—

তৃতীয় ভৃত্য—রাণীর ইচ্ছে কাজটা চুপি চুপি সারা হয় –

প্রথম ভৃত্য—আমি জানতুম ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—শীগ্‌গির, শীগ্‌গির দরজা খোল—

তৃতীয় ভৃত্য—সময় হয়েছে—

প্রথম ভৃত্য—ওখানে থাকো, আমি একলা যাই। তিনজনের যাবার কোন দরকার নেই—

দ্বিতীয় ভৃত্য—ঠিক বলেছ; আর সে হল খুব ছোট—

তৃতীয় ভৃত্য—কিন্তু বড় বোনের সামনে ভারী সাবধান—

দ্বিতীয় ভৃত্য—মনে আছে ত রাণীর ইচ্ছা, তারা যেন কিছু না জানতে পারে—

প্রথম ভৃত্য—কোন ভয় নেই, আমার পায়ের শব্দ কেউ কথনো শুনতে পায় না—

[প্রথম ভৃত্য আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

প্রায় দুপুর রাত হবে, না?

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ, প্রায় ঐ রকম—

[ক্ষণিক স্তব্ধতা—প্রথম ভৃত্য ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

দ্বিতীয় ভৃত্য—কৈ সে?

প্রথম ভৃত্য—বোনেদের মাঝখানে সে ঘুমুচ্ছে। ছেলেটার হাত তাদের গলায় জড়ানো রয়েছে, আর তারা দু'হাতে ওকে জড়িয়ে আছে, আমার একলার কাজ নয়

দ্বিতীয় ভৃত্য—চল, আমি যাচ্ছি।

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ, তোমরা দুজনে যাও—আর বাইরে আমি পাহারা দি।

প্রথম ভৃত্য—খুব সাবধান! ওরা বোধ হয় জানে! একটা-কিছু খারাপ স্বপ্নও নিদেন এ-সময় দেথছে!

[তাহারা দুইজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

তৃতীয় ভৃত্য—লোকে সব সময়ে জানে, তবে কিছু বুঝতে পারে না!

[কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ—তাহারা দুইজনে আবার ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

তৃতীয় ভৃত্য—কি হল?

দ্বিতীয় ভৃত্য—তোমাকেও আসতে হবে, আমরা দুজনে ছাড়াতে পারব না।

প্রথম ভৃত্য—যেই তাদের হাত ছাড়াই, অমি ওরা আবার ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে।

দ্বিতীয় ভৃত্য—আর ছেলেটাও তত ওদের দিকে ঘেঁসে যায়—

প্রথম ভৃত্য—বড় বোনের বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—আর বুকের উপর মাথাটা একবার উঠছে আর পড়ছে!

প্রথম ভৃত্য—হাত খোলা আমাদের দ্বারা হবে না।

দ্বিতীয়—বোনেদের মাথার চুলের ভিতর হাত দুখানা একেবারে ঢোকানো রয়েছে!

প্রথম ভৃত্য—ছোট ছোট দাঁত দিয়ে সোনালি রংয়ের এক গোছা চুল কামড়ে ধরে আছে!

দ্বিতীয় ভৃত্য—বড় বোনের চুলগুলো আগে কেটে দিতে হবে—

প্রথম ভৃত্য—ছোট বোনেরও।

দ্বিতীয় ভৃত্য—তোমার কাছে কাঁচি আছে?

তৃতীয় ভৃত্য—হাঁ।

প্রথম ভৃত্য—শীগ্‌গির এসো।

দ্বিতীয় ভৃত্য—ওদের চোখের পাতা আর বুক একসঙ্গেই কাঁপছে—

প্রথম ভৃত্য—হাঁ, বড় বোনের নীল চোখের একটুখানি দেখতে পাচ্ছি—

দ্বিতীয় ভৃত্য—আমাদের দিকে চেয়ে আছে, তবে দেখতে পাচ্ছে না—

প্রথম ভৃত্য—ভারী মুস্কিল! একজনকে ছুঁলেই দুজনে কেঁপে ওঠে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু নড়তে পারছে না—

প্রথম ভৃত্য—বড় বোন চেঁচাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

দ্বিতীয় ভৃত্য—শীগ্‌গির এসো, ওরা বোধ হয় জানে।

তৃতীয় ভৃত্য—সে বুড়োটা কোথায়?

প্রথম ভৃত্য—সেও ঘুমোচ্ছে…এদের কাছ থেকে একটু সরে—

দ্বিতীয় ভৃত্য—সে ঘুমোচ্ছে, মাথাটা কিন্তু তলোয়ারের বাঁটের উপর রেখে—

প্রথম ভৃত্য—সে কিছুই জানে না।

তৃতীয় ভৃত্য—এসো,এসো,আর দেরী নয়।

প্রথম ভৃত্য—ওদের সব একে একে ছাড়ানো ভারী শক্ত!

দ্বিতীয় ভৃত্য—এসো, এসো।

[তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এবং যন্ত্রণার অস্ফুট কাতর-উক্তি উঠিতেছিল। নিমেষে তাহারা তিনজনেই ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। তাঁতাজিলকে লইয়া আসিল; সে তখনও নিদ্রিত। তাহার বোনেদের মাথা হইতে কাটিয়া-লওয়া সোনালি রংয়ের একগোছা চুল তার ছোট হাতের মুঠিতে ঝুলিতেছিল। মুখ যন্ত্রণায় কাতর দেখাইতেছিল—তাহারা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ; যেমন তাহারা দালানের প্রান্তে গিয়াছে, অমনি তাঁতাজিল জাগিয়া উঠিয়া গভীর দুঃখে চীৎকার করিয়া উঠিল]

তাঁতাজিল—[দালানের প্রান্ত হইতে] —উঃ—

[পুনরায় সব নিস্তব্ধ। তারপর পাশের ঘর হইতে দুই বোনের অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ পদ-চারণের শব্দ শুনা গেল]

ইগ্রেন—(ঘরের ভিতর হইতে)—তাঁতাজিল! কৈ সে—

বেলা—সে ত এখানে নেই!

ইগ্রেন—(বর্দ্ধমান যন্ত্রণায়)--তাঁতাজিল! —আলো—আলো—আলো জ্বালো—

বেলা—হাঁ, জ্বালো, জ্বালো—

(প্রজ্বলিত আলোক হস্তে ইগ্রেন ঘর হইতে বাহিরে আসিল)

ইগ্রেন—এ কি, দোর যে একেবারে খোলা—

তাঁতাজিল—(দূরত্ব-হেতু একেবারে অস্পষ্ট স্বরে)—দিদি—দিদি—

ইগ্রেন—ঐ যে ডাকছে...তাঁতাজিল···তাঁতাজিল—[ইগ্রেন বেগে দালানে প্রবেশ করিল; বেলা তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া চৌকাঠের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল]

পঞ্চম অঙ্ক

স্থান—লৌহ দ্বারযুক্ত একটি অন্ধকার খিলানের সম্মুখ। আলোক-হস্তে আলুলায়িত কেশে ইগ্রেনের প্রবেশ।

ইগ্রেন—[পাগলের মত ইতস্তত ফিরিয়া]—আমার পিছনে তারা ত এল না—বেলা, বেলা—আগ্লোভাল—কৈ, তারা কোথায়? তারা আমাকে ভালবাসত—এই তাদের ভালবাসা! আমাকে ছেড়ে গেল! তাঁতাজিল...তাঁতাজিল···কৈ! আমার মনে পড়েছে—পাষাণ দেয়ালের মাঝে সিঁড়ির কত ধাপ···কত ধাপ যে উঠেছি, তার সংখ্যা নেই···আর আমার বাঁচতে সাধ নেই... এ খিলান, এ সবই যেন ঘুরছে...[থামের গায়ে হেলান দিল]...আমি পড়ে যাচ্ছি... উঃ......আমার যে তুচ্ছ জীবন···বুঝতে পারছি, আমি বেশ বুঝতে পারছি...জীবনটা ঠোঁটের উপর এসে কাঁপছে—প্রাণটা, না, এ আর থাকবে না···এবার বেরিয়ে যাবে! কি যে করেছি, তা জানি না···কিছুই দেখি নি ··কিছুই শুনিনি...হায়···এই স্তব্ধতা... দেয়ালের পাশে ঐ সিঁড়ির ধাপে ধাপে বরাবর এই সোনার রংয়ের চুল দেখে আসছি! আর তাই ধরে এত দূর এলুম...কুড়িয়ে নিলুম ...চুলগুলি কি সুন্দর...কি সুন্দর...ভাই, ভাই তাঁতাজিল···কি বলছিলুম? হাঁ, আমার মনে পড়েছে···আমি বিশ্বাস করি না···যখন একজন ঘুমোচ্ছে···যা দরকার নেই, আর যা সম্ভব নয়, তা...কি ভাবছিলুম?......না, এ সব ভেবে ঠিক করতে হল···একজন এক কথা বলে, আর এক জন আর এক কথা বলে; কিন্তু জীবনের ধারা ত একেবারে অন্য রকম...ছোট্ট আলোটা নিয়ে এলুম—সিঁড়িতে এত হাওয়া, তবু নিবল না ত···[চারিদিকে চাহিয়া]—আগে এ সব দেখিনি—এতদূর আসাও শক্ত, উঃ, কি ঠাণ্ডা...কি অন্ধকার, নিশ্বাস ফেলতেও ভয় হয়—দরজাটা কি ভয়ানক—[দ্বারের নিকট গিয়া হাত দিয়া স্পর্শ করিল]—উঃ, কি ঠাণ্ডা, এ যে লোহার —একেবারে নিরেট লোহার—খোলে কি করে?—কল-কব্জা ত কিছুই দেখছি না —দেয়ালে বোধ হয় আঁটা—এর বেশী আর আসা যায় না, আর ধাপও নেই—[হঠাৎ ভয়ানক চীৎকার করিয়া]—এ কি, এখনও চুল! তাঁতাজিল—তাঁতাজিল—দরজা বন্ধ

হতে শুনেছি—হাঁ—তার কোন ভুল নেই—
[পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল]
—উঃ···রাক্ষসী—রাক্ষসী···

[দরজার অপর দিক হইতে মৃদু আঘাত শুনা যাইতে লাগিল এবং কিছু পরে লোহার খোপের মধ্য হইতে তাঁতাজিলের স্বরও অতি মৃদুভাবে শুনা যাইতে লাগিল]

তাঁতাজিল—দিদি...দিদি

ইগ্রেন—তাঁতাজিল, তাঁতাজিল, কি, —কি বলছ তুমি ?—

তাঁতাজিল—শীগ্‌গির দরজা খোলো। দরজা খোলো—সে এখানেই রয়েছে···

ইগ্রেন—না, না—কে ?—তাঁতাজিল, ভাইটি আমার—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ···কি হয়েছে···কি হয়েছে...তাঁতাজিল··· তোমায় তারা মেরেছে...কোথায় তুমি...

তাঁতাজিল—দিদি, দিদি···শীগগির খোলো, না হলে মলুম···

ইগ্রেন—চেষ্টা করছি—একটু সবুর কর, ভাই। আমি খুলবো...দোর খুলে দেব...

তাঁতাজিল—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—দিদি, আর সময় নেই! আমায় ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি মেরেছি—তাকে মেরেছি—মেরে দৌড়ে চলে এসেছি। শীগগির...শীগগির—দরজা খোল···সে আবার আসছে···

ইগ্রেন—না···না···কোথায় সে ?

তাঁতাজিল—কিছু দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু শুনতে পাচ্ছি···আমার ভয় করছে, দিদি, আমার বড় ভয় করছে—শীগগির দরজা খোল—দিদি, দরজা খোল, বলছি। হা ভগবান!

ইগ্রেন—[অন্ধকারে দরজার সামনে হাতড়াইয়া]—নিশ্চয়ই বার করবো। দেরী, একটু দেরী—এক মিনিট—না, এক সেকেণ্ড—

তাঁতাজিল—দিদি, আর পারবো না—ঐ সে এসে পড়ল!

ইগ্রেন—ও, কিছু নয়, ভয় পেয়ো না—যদি একবার দেখতে পাই...

তাঁতাজিল—না, তুমি দেখতে পাবে না। এখান থেকে তোমার আলো দেখতে পাচ্ছি ...দিদি, তোমার ওখানে আলো আছে, এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

ইগ্রেন—আমায় দেখতে পাচ্ছ...কেমন করে...দরজায় ত কোন ফুটো নেই···

তাঁতাজিল—হাঁ, আছে; কিন্তু ভারী ছোট।

ইগ্রেন—কোন্ দিকে ? এই এখানে—বল, বল···না, ওই ওখানটায় ?

তাঁতাজিল—এই যে এইখানে···শোন, আমি ধাক্কা দিচ্ছি···

ইগ্রেন—এইখানে···

তাঁতাজিল—আর একটু উপরে—কিন্তু খুব ছোট—একটা ছুঁচ্ গল্‌তে পারে না...

ইগ্রেন—ভয় পেয়ো না ..এই যে, আমি এখানে···

তাঁতাজিল—হাঁ, আমি জানি...দিদি, টানো, টানো.. ঐ এসেছে সে···যদি একটু খুল্‌তে পারো···একটুখানি...আমার ছোট্ট শরীর····

ইগ্রেন—আমার নখ সব ভেঙ্গে গেছে···

টেনেছি, ধাক্কা দিয়েছি, বেশ জোরে গায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে—[আবার ধাক্কা দিল এবং সেই প্রকাণ্ড দরজাকে নড়াইবার চেষ্টা করিল]—দুটো আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, কেঁদো না ..এ যে লোহার...

তাঁতাজিল—[হতাশভাবে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে]—তোমার খোলবার কিছু নেই দিদি, কিছু নেই—একেবারে কিছু নেই··· আমি যেতে পারতুম—এই ত ছোট শরীর দিদি, তুমি ত জান···

ইগ্রেন—কেবল আলোটা আছে···হাঁ, ঐ যে, ঐখানে—[মাটির প্রদীপ দিয়া বারবার আঘাত করায় সেটী নিবিয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং খণ্ডগুলি মাটিতে পড়িল] —যাঃ, এবার সব অন্ধকার—তাঁতাজিল! ...কোথায় তুমি? শোন, শোন···তুমি ভিতর থেকে কোন রকমে দোরটা খুলতে পার না?

তাঁতাজিল—না, না, এখানে কিছু নেই —কিছু বুঝতেও পারছি না—আর ত আমি আলো দেখতে পাচ্ছি না···

ইগ্রেন—ব্যাপার কি, তাঁতাজিল? আর ত তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না—

তাঁতাজিল—দিদি, বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

ইগ্রেন—কি হয়েছে, তাঁতাজিল—কোথায় যাচ্ছ?...

তাঁতাজিল—সে এসেছে—দিদি, দিদি— আমার কাছে এসেছে...

ইগ্রেন—কে? কে এসেছে?

তাঁতাজিল—তা জানি না, কে, তাকে দেখতেও পাচ্ছি না...কিন্তু দেরী হয়ে গেছে... সে...আমার গলা টিপে ধরেছে···উঃ, —দিদি, এসো—

ইগ্রেন—যাচ্ছি···যাচ্ছি···

তাঁতাজিল—বড় অন্ধকার...দিদি···

ইগ্রেন—চেষ্টা করো, লড়ো, তাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলো···ভয় পেয়ো না, একটু দেরী করো—এই যে আমি এখানে ···তাঁতাজিল...জবাব দাও—সাড়া দাও... কোথায় তুমি? তোমার কাছে যাচ্ছি,— দোরের ভিতর দিয়ে—এই যে, এখান দিয়ে···

তাঁতাজিল—[অতি ক্ষীণ স্বরে]— এখানে—এইখানে দিদি—

ইগ্রেন—কোন্ খানে? কৈ—এই যে, এই আমি—

তাঁতাজিল—[আরও ক্ষীণ স্বরে] আমিও —এখানে—দিদি, দিদি...উঃ!···

[দ্বারের পশ্চাতে দেহ-পতনের শব্দ হইল]

ইগ্রেন—তাঁতাজিল! তাঁতাজিল—কি করছ? কে আছ? ফিরিয়ে দাও, তাকে ফিরিয়ে দাও...আমার কাছে ফিরিয়ে দাও··· কিছুই শুনতে পাচ্ছি না···তাকে কি করছো? মেরো না, ওগো, মেরো না...ও যে খুব ছোট...তোমায় মারবে না...তোমার কোন অনিষ্ট করবে না...আমি হাঁটু গেড়ে বসে আছি—আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। দোহাই—আমি ভিক্ষা চাইছি যা বলবে, তাই করবো···বুঝতেই পারছো আমার কোন কু-মতলব নেই···হাত জোড় করে আমি বলছি, বিশ্বাস কর...আমি ভুল বলেছিলুম— আর কিছু বলবো না···যা ছিল আমার, সব হারিয়েছি—অন্য কোন সাজা দাও... সাজা যদি দেবেই, অন্য রকমে দাও।

উপায় ত অনেক রয়েছে…এইটুকু ছোট ছেলে,—এ তোমার কিছু করেনি… যা বলেছিলুম, তা সত্যি নয়…আমি জানতুম না……আমি জানি, তুমি খুব ভাল …এখন ক্ষমা করবার সময় এসেছে…ও যে বড় ছোট, বড় সুন্দর! অত ছোট… ওকে মেরো না, মেরো না…তোমার গলা জড়িয়ে যখন চুমু খাবে, তখন তাকে মেরো না…তাড়িয়ে দিও না…দাও, ছেড়ে দাও… কি! দেবে না?…এত করে বলছি… একটিবার দাও…একটুখানির জন্যে…এক মুহূর্ত্তের জন্যে…সে খুব ছোট ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে…খুব ছোট ফাঁক দিয়ে পারে .. বেশ পারবে…কোন কষ্ট হবে না—(অসহ্য নিস্তব্ধতা)—রাক্ষসী…রাক্ষসী শুনলি না? ভগবান তোকে মেরে ফেলুন্! আমি তোকে শাপ দিচ্ছি……তুমি মর, মর……

(দরজার গায়ে দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিল এবং মাথা নত হওয়ায় সমস্ত দেহও সেই সঙ্গে নত হইয়া পড়িল)

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আমার বিরহ

আজো সেই মনে হয় দূর—অতি দূর—
কোথা কোন্ অলকার সুনিভৃত পুর
আমার বিরহ জাগে। বিরহিনী হিয়া
মূর্ত্তি'পরে নিত্য নব লীলাফুল দিয়া
অন্তিম দিবস গণে মিলনের পারে
ধীর নির্ব্বিকার। ভুলিয়া গিয়েছি তারে;
ভুলে গেছি মৃদু ভীরু গূঢ় পরশন;
মুহূর্ত্তের মৌন-ঘন অনন্ত স্বপন
মুছিয়া গিয়েছে এবে; বাহিরের ডাকে
আঁচল বাধিয়া যাওয়া কণ্টকীর শাখে,
মনে হয় কবেকার মনের বিকার!—
কোথা কার কালো ছিল দুটি আঁখি তার!
কবে কার মুখখানি হাসিয়া হাসিয়া
সুধার ছুরিকা হয়ে গিয়েছে বিঁধিয়া
সন্তরাঙা রক্তের পিয়াসে! আমি জানি
আমার বিরহ; তারে সত্য বলে মানি;
মানি তারে মরমের পরতে পরতে
অনাদি অনন্ত স্থির স্বাধীন জগতে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

(La Mazalierreর ফরাসী হইতে)

হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন আইনগত অবস্থার দরুণ, তেমনি আচার-ব্যবহারের ভিন্নতাপ্রযুক্ত হিন্দুপরিবার-সমূহের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও পুরাকালের রীতিনীতি, কোথাও অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তিত সমাজের রীতিনীতি, আবার কোথাওবা য়ুরোপীয়দিগের আচার-ব্যবহার, পোষাকপরিচ্ছদ ও আহারপদ্ধতি।

সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণদিগের গার্হ্যস্থ্যজীবনের একটা চিত্র দিতেছি। কাহারও কাহারও প্রভূত ধনসম্পত্তি, অনেকেরই মধ্য-অবস্থা, বা দৈন্য-অবস্থা। কিন্তু গর্ব্ব সকলেরই সমান, সকলেই কড়াকড়ভাবে ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

সহোদর ভাই, ভাই-পো, ভাগ্নে, খুড়তুতো পিস্তুতো প্রভৃতি জ্ঞাতি-ভাই একগৃহে একত্র বাস করে, এবং কৌলিক সম্পত্তি সম্ভোগ করে। তাহাদের সঙ্গে থাকে,—গরীব আত্মীয়-কুটুম্ব, আশ্রিত বন্ধুবর্গ, বহু ভৃত্য। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন জাতের চাকর নির্দ্দিষ্ট। (১)

পল্লিগ্রামে, একটা বৃহৎ ঘেরা-জায়গা; বাগান-বাগিচার মধ্যস্থলে পুরুষদের জন্য, স্ত্রীলোকদের জন্য, ভৃত্যদের জন্য, বিশেষ বিশেষ মণ্ডপ। নগরে চৌকোণা উঠান ঘিরিয়া বড়বড় কোঠা উঠিয়াছে; তন্মধ্যে প্রধান কোঠাটি রাস্তার উপর: খিলানের আকারে একটা বৃহৎদ্বার, উপরে প্রত্যেক তলায় এক-একটা বড় জান্‌লা: ইহাই লোক অভ্যর্থনার ঘর; ঘরগুলায় আলো আসিবার জন্য খুব ছোট ছোট গবাক্ষ; এই কোঠা-বাড়ীটা পুরুষদের জন্য রক্ষিত। যে ঘরগুলা খুব ছোট, খুব নীচু, খুব আঁধারে—যাহার নীচে একটা উঠান—সেই ঘরগুলাই অন্তঃপুরের ঘর।

প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের এক-একটি ঠাকুর-ঘর আছে। একটা থালের উপর একটা ছোট ঘণ্টা, বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটা শঙ্খ, তর্পণ-জলের জন্য একটা ঘট, এবং পাঁচটি বিগ্রহ প্রস্তর:—সাদা পাথর শিবের বিগ্রহমূর্ত্তি; কালো পাথর বিষ্ণুর, ধাতব প্রস্তর পার্ব্বতীর, স্ফটিক সূর্য্যদেবের, লাল পাথর গণেশের। কোন কোন ব্রাহ্মণ, প্রাচীনকালের প্রথা অনুসারে পুণ্য-অগ্নিও বরাবর জ্বালাইয়া রাখে। (২)

---

(১) ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারে, গৃহ-ভৃত্যের সংখ্যা ১০,০০৮, ৩৮৭; তন্মধ্যে গৃহাভ্যন্তরের কাজ করে ২,৪৯২,৫৪৪ জন; বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে ১,২৪১,৫২১ জন. বাকীর অধিকাংশই ধোপা ও নাপিত।

(২) বিষ্ণুর শিলা—শালগ্রাম, শিবের শিলা বান-লিঙ্গ।

প্রাতঃস্নান: স্নান। ভস্ম ধারণ। ভস্মের দ্বারা ললাট চিহ্নিত করা: পুণ্ড্র বা তিলক। শিখা বন্ধন। প্রাতঃসন্ধ্যা। আচমন। প্রাণায়াম।

ওঁ শব্দ বস্তুত তিন অক্ষরে গঠিত। হিন্দুদের মতে "অ" ও "উ" যোগ করিয়া "ওঁ" নিষ্পন্ন হয়;

*
* *

সনাতনপন্থী হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।—রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই গৃহকর্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া, দাসী চাকরদিগকে জাগাইয়া গৃহের সমস্ত সুব্যবস্থা করেন। একটু ফর্সা হইবামাত্র, গৃহকর্ত্তা শয্যা হইতে উঠিয়া, একটা দাঁতন-কাঠি দিয়া দাঁত মাজেন (এইটি প্রথম "শুদ্ধির" অনুষ্ঠান)। তারপর নদীর ধারে কিংবা সরোবরের ধারে গমন করেন।

অরুণের প্রথম রশ্মিপাতেই, গঙ্গার তট-দেশে শতসহস্র হিন্দুর সমাগম। তখন কোন স্ত্রীলোক যায় না; কেননা তাহাদের অধিষ্ঠানে স্থান অপবিত্র হইবে। এই হিন্দুদের মধ্যে, গর্ব্বিত-ললাট ব্রাহ্মণগণ ও একান্ত-বাসী নিম্নশ্রেণীর লোক।

কেবল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে।

দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ এই কথা বলে:—

"আমার মানসিক, বাচনিক, দৈহিক সমস্ত পাপ ও ত্রুটি ক্ষালন করিবার নিমিত্ত, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সমক্ষে, এই পবিত্র নদীতে আমি অবগাহন করিতেছি।"

তাহার পর উনানের ছাই লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে এবং কপালে শিবের চিহ্ন-রেখা বা বিষ্ণুর চিহ্ন-রেখা ধারণ করিয়া, চুল মাথার উপর তুলিয়া গ্রন্থিবদ্ধ করে।

এখনো দিগ্বলয় হইতে প্রাথমিক সৌর কিরণ উছলিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যদেবের দিকে ফিরিয়া, ব্রাহ্মণ একটু জল লইয়া মুখ শোধন করে, নাসারন্ধ্র ভরিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে; পবিত্র শব্দ ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে, মহাভূতদিগের নাম আবৃত্তি করিতে থাকে এবং এই প্রার্থনা-মন্ত্রটি পাঠ করে—(৩)

"সেই জগৎ প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।"

হঠাৎ সূর্য্যদেবের আবির্ভাব হইল; তাহার

"অ" ব্রহ্মের স্থানীয়. "উ" বিষ্ণুর স্থানীয় এবং আনুনাসিক শিবের স্থানীয়। বেদের এক মন্ত্র—"গায়ত্রী" বা "সাবিত্রী"।

"মাজ্জন" বেদের X সূক্ত, ১৯০: "অঘমর্ষণ"। সূর্য্যকে "অর্ঘ্য দান"। "করন্যাস"। "মিত্রে,"র প্রতি প্রযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ হয়। (এই সন্ধ্যাপূজা দাঁড়াইয়া করিতে হয়, তাই ইহার নাম "উপস্থান")। "গোত্রোচ্চার" এবং ত্রিমূর্ত্তির উদ্দেশে একটি মন্ত্র।

এই প্রাতঃসন্ধ্যার পর, সনাতনপন্থী হিন্দু আর দুইটি ক্রিয়া সাধন করেন—"ব্রহ্মযজ্ঞ" ও "তর্পণ"। তাহার পর নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া "হোম" করেন। শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি পূজাকে "দেবপূজা" বলে। "হোমশালা"। "মন্দির"। একটা থালায় বিগ্রহ শিলাদি, শঙ্খ, ও ঘণ্টা থাকে। ইহাকে "পঞ্চায়তন" বলে। ঘণ্টা। "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ। তর্পণের পাত্র—কলস"। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া-কলাপ:—"বৈশ্বদেব" ও "বলিহরণ"। "ভোজন-বিধি"।

এই সকল অনুষ্ঠান Monier-Williamsএর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে:—Brahmanism and Hinduism, Chap. X. V.

(৩) ঋগ্বেদ।

আলোকে, বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র, নদীতটের উচ্চ সৈকতভূমি পরিপ্লাবিত হইল, নদীর জলে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলে মাথা ডুবাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ—

"পবিত্র গঙ্গোদক, তুমি আমাদিগকে স্বাস্থ্য দেও, বল দেও, আনন্দ দেও। শুভঙ্কর বৃষ্টিরূপে আকাশ হইতে নিপতিত হও। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগকে তোমার দিব্য-স্বরূপের অংশী কর। পাপী হইয়াই তোমার নিকট আমরা আসিয়াছি ঃ আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। দুর্ব্বল হইয়াই আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাদিগকে সুখী কর, সু-মনা কর। (৪)

"সূর্য্যদেব, ও বিজয়ী রুদ্র দেবতারা, বিলাস-সুখ হইতে, গর্ব্ব হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। রাত্রি আমাকে মানসিক বাচনিক কায়িক পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছে। হস্ত দিয়া, পদ দিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আমাকে পাপাচরণ করাইয়াছে। রাত্রির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার পাপরাশি যেন তিরোহিত হয়। তোমার অমৃতময় আলোকের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইবার জন্য, হে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।" (৫)

গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ, বিগ্রহ-শিলাদের নিকট তুলসী ও বিল্বপত্র উৎসর্গ করেন। তাহার পর নিত্য-নিয়মিত বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আরও দুইবার, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দেবপূজা করিতে হয়।

মধ্যাহ্নেই মুখ্য ভোজন। কেবল পুরুষেরাই একত্র ভোজন করে। দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহারা দেবতাদের গুণকীর্ত্তন করে, এবং স্বকীয় খাদ্যের প্রথমাংশ তাঁহাদিগকে অর্পন করে; তাহার পর, একটা লম্বা সারি বাঁধিয়া পা-দুমড়াইয়া কুশাসনে উপবেশন করে; মা, বোন্ ও মেয়েরা পরিবেশন করে। খাদ্যের মধ্যে—মিষ্টান্ন, রুটি, লুচি, ভাত ইত্যাদি কলাপাতা বা শালপাতার উপর সাজাইয়া দেওয়া হয়। না-মাছ, না-মাংস, না-কোন মাদক পানীয়। রাত্রে দ্বিতীয়বার ভোজন, কিন্তু মধ্যাহ্নের ন্যায় ভূরি-ভোজন নহে। তাহার পর, পুরুষেরা হুকার ধূমপান করে, স্ত্রীলোকেরা সুপারী প্রভৃতি নানা মশলা দিয়া প্রস্তুত পাণ চর্ব্বণ করে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এখনো সেকেলে পরিচ্ছদ পরিধান করে ঃ—শেলাই-না-করা দুখানা সাদা কাপড়; কোমরে জড়ানো একখানা ধুতি, কাঁধের-উপর-দিয়া-ফেলা একখানা উড়ানি। (৬)

উহারা নাচের নিন্দা করে; অনেকেই গানবাজনা ভালবাসে; কিন্তু অল্প লোকেই নিজের স্ত্রীকে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেয়। বাড়ীতে ধর্ম্মসংক্রান্ত নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে ("যাত্রা" ও "রাস")।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(৪) ঋগ্বেদ।

(৫) তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

(৬) মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে, সাধারণের মধ্যে শেলাই-করা কাপড়ের ব্যবহার প্রচলিত হয়; অনেকেই চাপকান পরে। খুব সনাতনপন্থী যারা তাদের উপরেও য়ুরোপীয় প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে দেখা যায়;—কেহ কেহ "লিনেনের" (শন) জামা পরে, মোজা পরে, জুতা পরে, কেহ কেহ গলা পর্য্যন্ত বোতাম-আঁটা কালো কোর্ত্তা পরে।

মোহিনী

ফেরি-ষ্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বল্লে—দেখতে পাচ্ছ? তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হতো—তুমি কে হে? বা তোমাকে তো চিন্‌লেম না! কিন্তু অবিন, সে কোনো-দিনই আমাদের মতো সাধারণ-একটা-কিছু ছিল না, সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরী হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়-বড়-করে লেখা ছিল—'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বল্লেম—মোহিনী বুঝি?

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—পেলে না। তবে শোনো!—বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে জল-কেটে চলেছে। অবিন সুরু কল্লে—

কলকাতায় আমাদের বাসা-বাড়িখানা অনেক-দিনের। এখন সেটা আমাদের বসত-বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্ত্তারা সে বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো, ঝাড়-লণ্ঠন কৌচ-কেদারা ওয়াটার-পেন্টিং অয়েল-পেন্টিং বড় বড় আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পর্দ্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বস-বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্ত্তারা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধুলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ্-ধরা, সাবেকী আতরের গন্ধমাখানো এই সব ফার্‌নিচার তখন কতক বিক্রি করে, কতক ঝেড়ে-ঝুড়ে মেরামত করে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মত করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো অন্ধকারের রং লেপা;—কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ—তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস যাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরও বড় একদল কলের কুলী, মিলের চিনে মিস্ত্রী উঠে এল। অবিন ডেকের এধার থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বল্লে—

এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয়ই বৌবাজারে পুরোনো জিনিষের সঙ্গে চালান যে'তো, কিন্তু যে-ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাসটা বেশ-একটু রকমওয়ারী রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিইনি। আমাদের যিনি ছোটকর্ত্তা

তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোটকর্ত্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্য্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়-বড় আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন তারিখ এবং নামের তালিকায় ভবে দিয়ে গেছেন। এই কর্ত্তার বাবুগিরির কীর্ত্তিকলাপের গল্প ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগ্‌তো; এবং বড় হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুল্লুম, তখন গোলাপী আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে সে-ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু সে ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব-চেয়ে আরামের,—একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই; দক্ষিণের হাওয়া এবং পূবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রুমের ধরণে—গড়ে তুল্লেম। আমরা সেই সাবেক-কালের নাচ-ঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স সোসিওলজি থিওলজি এবং জার্ম্মান ওয়ারের চর্চ্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই সেকালের বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের মধ্যে, বিলাতী কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হত—দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হতো না। আমাদের মনে হত এ ঘরের স্বামী যিনি তাঁর অবর্ত্তমানে অনাহুত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড়-ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল —ওহে অবিন্, তোমার ভাই ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভূতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবেনা দেখছি। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না;—মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হতো—একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্ত্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আস্‌ছে। আমার মধ্যে যে সেকালটা ছিল, সে যেন দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে,—বুঝছি আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপী আতর এসে মিশ্‌ছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে! এই সময় আমি এক-এক দিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ঐ ছবির অন্ধকার

ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্য—ঐ কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারি আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থর-থর-করে কাঁপতো! আমার মনের এই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান কল্লেন, উপহাস কল্লেন, নানাপ্রকার উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন কল্লেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জম্‌তে পারে।

আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দ্দার ওপারে 'মোহিনী'! যবনিকা তখনো সরেনি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। এ সেই-সব দিনের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে—"এসো এসো দেখা দাও।" একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলো-আনাই ঝাপ্‌সা—সে যে এমন করে মনকে টান্‌তে পারে এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদের কথাতো দূরে থাক। বল্লে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসতো, আমার মনে হতো ঐ ছবিখানার মধ্যে যে আছে তারি যেন মাথাঘষার সুবাস পাচ্ছি! হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন তার চেয়ে পটের অন্দরে লুকিয়েছিল যে 'মোহিনী' সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী তাতো আমার মনে হতো না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখী!—তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়—কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে—বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়ার বাকি!

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ কল্লে। তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টল্‌টল্ করছে—এরি মাঝে দুই ডিঙায় দুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ-করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব-একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন সুরু কল্লে—

শুনেছিলেম তান্ত্রিক সাধকেরা না-কি মন্ত্রবলে জড়ে জীবনদান, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন; আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে—একেবারে আমার চোখের সম্মুখে—টেনে আনবার জন্য এমন-এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় 'মোহিনী'র ছবিটা যে কেমন-করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বল্লেন—তোমার দশা সেই গ্রীসদেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি! আমি বল্লেম—তার সামনে তো তবু তার 'মোহিনী' প্রাণটুকু ছাড়া আর-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু আমার 'মোহিনী'

যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পার? বন্ধু আমায় উপায় বাৎলে—বাড়ি গিয়ে এক শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদিও আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল তবু মনের এক-কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূর হয় নি। আমি বন্ধুবরের কথা-মতো ঘড়ি-ধরে হিসাব করে সেই আরকটা সমস্ত 'মোহিনী'র ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুল্লে। তারপর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তা মনে এইটুকু মাত্র জানি যে আরক ঢালবার পরে 'মোহিনী'র ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে আর আমি ভাবছি এইবার মেঘ কাটলো।

একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আর-একবার এই ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই চাহনিটা সরে গেছে কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে—সোনালী ফলকে, বড়-বড় অক্ষরে।

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—ওহে আর্টিষ্ট! মোছেনি হে, ভয় নেই; ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশ গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের শরীরের যুদ্ধের কথা

আজ ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার সংবাদ জানিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত; কিন্তু এদিকে আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে যে কত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার খবর আমরা একবারেই রাখি না। আমাদের এই যে শরীর—ইহাকে টিকিয়া থাকিবার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করিতে হয়; কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে, দেহ-সম্বন্ধে দুই-চারিটা কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের দেহ একটা রাজ্যবিশেষ—নিতান্ত ছোটখাট রাজ্য নয়, বিশাল রাজ্য বলিলেই হয়। রাজ্য হইলেই তাহার একটা রাজা ও শাসনকেন্দ্র (Central Government) থাকার দরকার। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা-মজ্জা (brain and spinal cord) আমাদের দেহ-রাজ্যের রাজা ও শাসন-কেন্দ্র। কিন্তু সুধু রাজা থাকিলেই রাজ্য চলেনা; রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, রাজার তাহা জানা আবশ্যক এবং তাঁহার আদেশ রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রেরিত হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা থাকার আবশ্যক। আমাদের দেহরাজ্যে তাহার কোন অভাব নাই। আমাদের

স্নায়ু (nerve) গুলি দ্বারা সে উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়া থাকে। রাজ্যরক্ষার জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা প্রয়োজন; আমাদের দেহরাজ্যেও তাহা হইয়া থাকে। যকৃত (liver), পাকাশয় (stomach), অন্ত্র (intestine), ক্লোমযন্ত্র (pancreas) প্রভৃতির সাহায্যে ইহা হইয়া থাকে। আমরা খাদ্য-হিসাবে যে-সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহারা ঠিক সেই অবস্থায় শরীরের কোন কাজে লাগিতে পারে না। পাকাশয়, যকৃত প্রভৃতির পাচক রসে তাহাদের পরিবর্ত্তন হয়; তখন তাহারা কাজে লাগিবার মত হয়।

খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানেই থাকিয়া গেলে, রাজ্যরক্ষা হয় না। খাদ্য-দ্রব্যের যাহাতে রপ্তানি চলে, তাহারও ব্যবস্থা থাকার আবশ্যক। আমাদের হৃৎপিণ্ড (heart) ও রক্তবহানালী (blood-vessel) গুলির সাহায্যে এই খাদ্য দেহের সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে।

রাজ্যকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে গেলে, রীতিমত পয়ঃপ্রণালী ও ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি দূর করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেহরাজ্যে ত্বক্‌, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি থাকায় সেই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজ্য যাহাতে শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত না হয়, তাহার জন্য রীতিমত ফৌজ থাকার দরকার; আমাদের দেহরাজ্যেও তাহার অভাব নাই; সে কথা পরে হইবে।

দেহ-রাজ্যটা যে কি, তাহা কতকটা বোঝা গেল। এখন ইহার শত্রু কে, সেই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা যাক্‌। দেহের শত্রু আর কেহ নয়,—রোগবীজ (disease germs); সাধারণতঃ ইহারা ব্যাক্‌টেরিয়া (bacteria) বা ব্যাসিলাস্‌ (bacillus) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গত বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গোলা-গুলিতে যতগুলি ইংরাজের প্রাণনাশ হইয়াছে, এক টিউবার্‌কিউলার্‌ ব্যাসিলাস্‌ (tubercular bacillus) কর্ত্তৃক তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; জর্ম্মান্‌ শার্প্নেল ও বুলেট্‌ দ্বারা যতগুলি ফরাসী ও রুশিয়ানের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক বৎসরে টাইফয়েড ব্যাসিলাস্‌ (typhoid bacillus) দ্বারা তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। অতএব রোগবীজের সঙ্গে আমাদের দেহের এই যুদ্ধ-ব্যাপার উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। ইউরোপের এই মহাসমর আজ না হোক্‌ কাল, এক একদিন থামিবেই থামিবে। কিন্তু রোগ-বীজের সঙ্গে আমাদের এই যে যুদ্ধ, ইহার বিরাম নাই। প্রত্যেকবার নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে, প্রত্যেক অন্নগ্রাসটির সঙ্গে, প্রত্যেক ঢোক জলের সঙ্গে, রোগবীজ আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করিতেছে; তবে যে সব সময় আমাদের রোগ হয় না, তাহার কারণ প্রকৃতি আমাদের দিকে আছে বলিয়া। এই কারণে রোগবীজ আমাদের বড়-একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যেই আমরা প্রকৃতির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হই, অমনি রোগবীজের জয় হয়, তখন আমাদের দেহে রোগ দেখা দেয়।

এই রোগবীজকে আমাদের বিশেষ ভয়

করার আবশ্যক। ইহারা বড়ই গোপনচারী —কখন্ কি-ভাবে, কেমন করিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা জানিবার যো নাই। ইহাদের কোনপ্রকার যুদ্ধ-সজ্জা নাই; ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে তখন রণভেরী বাজেনা, কামান দাগার শব্দও হয় না। সুতরাং দেহের রাজা মস্তিষ্ক ইহাদের আক্রমণ ঘূণাক্ষরেও টের পাইতে পারে না। ইহাদের একটা মস্ত বিশেষত্ব এই যে, কাজের হিসাবে, ইহারা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কতকগুলি সুধু ফুস্‌ফুস্‌কেই আক্রমণ করে, কতকগুলি সুধু কণ্ঠনালীকে অক্রমণ করে, কতকগুলি সুধু পেটের মধ্যে অনিষ্ট সাধন করে। যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তখন উভয়-পক্ষকে কত সৈন্যসংগ্রহ করিতে হয়, কত গোলাগুলি বারুদ সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেহের শত্রু এই রোগবীজদের সে-সব কিছুই করিতে হয় না। তাহাদের দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে যাইতে হয় না। কোনরকমে দুই-চারিটা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই হইল। দেখিতে দেখিতে উহাদের ভিতর হইতে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটি মাত্র কলেরা-বীজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৮,১ ৪,৭৪, ৯৭,১ ৭,১০, ৬৫৬টি বীজানু সৃষ্টি করিতে পারে। ইহারা এত সূক্ষ্মদেহ যে, খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ না হইলে, ইহাদের দেখিতেই পাওয়া যায় না। পঁচিশ হাজার রোগবীজকে পাশাপাশি করিয়া সাজাইলে, তবে এক ইঞ্চ মাত্র স্থান অধিকার করিতে পারে। দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদের শক্তি কিন্তু সামান্য নহে। ইহারা একরূপ বিষ উৎপন্ন করে, সেই বিষই হইতেছে রোগের আসল কারণ। মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তবুও কতকগুলা নিয়ম মানিয়া চলার আবশ্যক হয়। কিন্তু দেহের এই শত্রুরা কোন নিয়মেরই ধার ধারে না। ইহাদের দয়ামায়া কিছুই নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা—ইহারা কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না।

আজকালকার যুদ্ধে ড্রেড্‌নট্ এরোপ্লেন (dreadnaught airoplane) প্রভৃতির ব্যবহার হয়। রোগবীজদেরও এ-সকলের অভাব নাই। জলের মধ্যে অন্য কোন পদার্থ থাকিলে, সেগুলি ইহাদের সাব্‌মেরিন্ ও ড্রেড্‌নট্ (submarine and dread-naught)এর কায করে। আর ধূলিকণাদের ইহাদের এরোপ্লেন্ airoplane বলা যাইতে পারে; কেন না ধূলিকণার উপর ভর করিয়া, ইহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারে। ইহাদের মিত্রও যে না আছে এমন নয়। অমিতাচার ও অশুচিতা ইহাদের বিশেষ মিত্র। অমিতাচার ও অশুচিতা যেমন শত্রুপক্ষের মিত্র, মিতাচার ও শুচিতা আবার তেমনি দেহের পক্ষে মিত্র। মিতাচার বলিলে, সুধু পানাহার বিষয়ে মিতাচার বুঝিলে হইবে না। নিদ্রা, শারীরিক ও মানসিক শ্রম এবং শৈত্যাতপ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমশক্তির এবং শৈত্যাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই অমিতাচার হইয়া উঠে। স্বাভাবিক অবস্থায়,

সীমা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলেই, আমাদের কষ্ট হয় এবং আমরা সতর্ক হই। কিন্তু যাহারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, তাহাদের বেলায় তাহা হইতে পারে না। নেশার বশে মানুষ নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না। সে যখন বাস্তবিক দুর্ব্বল, সে সময় হয়ত নিজেকে সবল মনে করে; যখন তাহার ক্ষুধা নাই, তখন হয়ত নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করে; যখন তাহার বিশ্রামের একান্ত দরকার, সে সময় হয়ত নিজেকে একটুকুও পরিশ্রান্ত মনে করে না; সে হয়ত অন্যায়ভাবে শরীরে ঠাণ্ডা বা গরম লাগায়, তাহাতে যে তাহার অনিষ্ট হইতেছে, সেটা মোটেই বুঝিতে পারে না। অতএব যাহারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, তাহাদের পক্ষে, অমিতাচার একান্ত স্বাভাবিক বলিলেই হয়। এই জন্যই নেশাখোর লোকদের যত সহজে সংক্রামক রোগ হয়, এমন অন্য কাহারও নয়।

এইবার আমরা রোগবীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের দেহের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহারই উল্লেখ করিব। দেহরাজ্যের সেনাবিভাগের কাজটিও নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়। সকলেই জানেন রক্তের মধ্যে দু-রকম দানা (corpuscless) থাকে; লোহিত কণিকা (red corpuscles) ও শ্বেতকণিকা (white corpuscles); এই শ্বেতকণিকাগুলিকে লিউকোসাইট্‌স্ (leueocytes) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। লিউকোসাইট্‌স্ বা শ্বেতকণিকাগুলিই হইতেছে দেহরাজ্যের সৈন্যফৌজ। যখনই আমাদের দেহের মধ্যে বাহির হইতে কোন শত্রু প্রবেশ করে, অমনি শ্বেতকণিকা তাহার দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে শ্বেতকণিকার যদি জয় হয়, তাহা হইলে, দেহ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়; আর যদি শ্বেতকণিকার পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে, রোগ দেখা দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে, কথাটা স্পষ্ট হওয়ার সম্ভব। বিষফোড়ার সঙ্গে সকলের পরিচয় আছে। জীবনে কখনও বিষফোড়া হয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই বিষফোড়া কিন্তু একপ্রকার বীজাণুর কাজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শরীরটা চামড়ার দ্বারা উত্তমরূপে সংরক্ষিত। এ অবস্থায় বীজাণু চামড়ার ভিতর দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে যদি চামড়ার কোন স্থান ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে, সেই স্থানটি দিয়া, রোগবীজাণু অনায়াসে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিষফোড়াটি যে স্থানটিতে হয়, সেখানকার চামড়া একটু-না-একটু যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ইহা একবারে ধ্রুব কথা। এই স্থান দিয়া জীবাণুরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানটির অনিষ্ট করিতে থাকে। সংবাদটা দেহের রাজা যে মস্তিষ্ক, তাহার কানে পৌছিল। মস্তিষ্কও অমনি শ্বেতকণিকা সেনাদলকে সেইস্থানে যাইতে আদেশ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্বেতকণিকারা থাকে রক্তের মধ্যে; তাহাদের যুদ্ধ-স্থানটিতে যাইতে হইলে, রক্তের সাহায্যেই যাইতে

হয়। এইজন্য স্থানটিতে অধিক রক্ত যায়। অধিক রক্ত যায় বলিয়াই স্থানটি অমন রাঙা দেখায় এবং গরম ও স্ফীত হয়। কিছু কাল পরে, স্থানটি আর তেমন রাঙা দেখায় না, কেন না পূর্ব্বের মত আর সেখানে বেশি রক্ত যাওয়ার আবশ্যক হয় না। শ্বেতকণিকা-সৈন্যদল বাহির হইয়া, শত্রুকে এমনি করিয়া ঘিরিয়া ফেলে, যে, শত্রুর আর অগ্রসর হইবার যো থাকে না। ইহার পর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শ্বেতকণিকারা যদি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে, তাহারা শত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করে এবং এই পরাজিত শত্রু শেষে পুঁজের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে শ্বেত-কণিকারা এইস্থলে শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল, তখন শত্রুপক্ষের ক্রমিক অগ্রসর নিবারিত করিবার কি কোন উপায় নাই? অবশ্য আছে। আমাদের শরীরে স্থানে স্থানে কতকগুলি করিয়া লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড (lymphatic gland) আছে। এ-গুলিকে একহিসাবে দুর্গ বলিলে, কিছু অন্যায় হয় না। শ্বেতকণিকা ও রোগবীজের যুদ্ধে শ্বেতকণিকার পরাজয় ঘটিলে, রোগবীজ কিছুদূর অগ্রসর হইতে-না-হইতে এই সকল দুর্গে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। এখানকার শ্বেতকণিকাদের সঙ্গে তাহাদের বিষম যুদ্ধ হয়। অমিতাচার বশতঃ কিম্বা অন্য কোন কারণে শ্বেতকণিকারা যদি নিতান্ত অপটু না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, এই যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হয়, অন্যথা শত্রুপক্ষের জয় হয়। তখন রোগের বীজ সমস্ত দেহময় ছড়াইয়া পড়ে এবং রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে। এই অবস্থারই নামান্তর সেপ্‌টিসেমিয়া (septicaemia) নামক ভীষণ রোগ। শত্রুপক্ষ যে সময় লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড (lymphatic gland)-এ পৌঁছায় সে সময় লীম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড স্ফীত হয়, সেখানে বেশি রক্ত যায়, একটু বেদনাও অনুভূত হয়। সকলেই জানেন, হাতের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, অনেক সময় বগলে ব্যথা হয় এবং সেখানে বীচির মত কতকগুলা কি যেন হাতে ঠেকে। এই বীচির মত জিনিসগুলাই হইতেছে স্ফীত লীম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ড্‌স্ (lymphatic glands)।

এইবার আমরা শ্বেতকণিকা সৈন্যশ্রেণীর জন্মস্থান কোথায়, সেই বিষয়ে উল্লেখ করিব। প্রধানতঃ ইহারা প্লীহার মধ্যে জন্মায়; এ-ছাড়া কিয়ৎপরিমাণে অস্থি-মজ্জা (bone-marrow) লীম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের মধ্যেও জন্মাইয়া থাকে।

দেহ যে সুধু শ্বেতকণিকার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা নহে; শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ইহা আরও অনেক কৌশল ও উপায় অবলম্বন করে, সে সকলের উল্লেখ করিবার এখানে আবশ্যক নাই। তবে এই প্রসঙ্গে যদি য়্যাণ্টিটক্‌সিন্ (anti-toxin)-এর কথা না বলি, তাহা হইলে, এই যুদ্ধ-কাহিনীটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রোগবীজ বা ব্যাসিলাসের অস্ত্র হইতেছে টক্‌সিন্ (toxin) নামে এক প্রকার বিষ। এই বিষ রোগবীজের শরীরের মধ্যে জন্মায়। এই বিষই রোগের

লক্ষণ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগবীজ যে সময় টক্‌সিন্ (toxin) উৎপন্ন করে, সেই সময় আমাদের শরীরও তাহার প্রতিষেধক একপ্রকার পদার্থ সৃষ্টি করে; পণ্ডিতেরা তাহাকে য়্যাণ্টিটক্‌সিন্ (anti-toxin) নাম দিয়াছেন। এই য়্যাণ্টিটক্‌সিন (anti-toxin) টক্‌সিন্ (toxin)-কে নষ্ট করিয়া ফেলে; কাজেই দেহ রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

কাশ্মীরী বাগ্

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ছিল মোগল বাদশাহদের ভারী পছন্দ-সই দেশ—গ্রীষ্মকালটা তাঁহারা কাশ্মীরেই কাটাইয়া দিতেন। চারিধারে উঁচু পাহাড়—স্থানও ছিল দুর্গম—কাজেই যে সকল আমীর-ওমরাহ বাদশাহদের বিশেষ প্রীতির পাত্র, তাঁহারাই শুধু কাশ্মীরে পদার্পণ করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আবার কাশ্মীরের নীচে উপত্যকা-প্রদেশে আস্তানা পাতিয়া থাকিতে হইত—বাদশাহ, বেগম ও যে দুই-চারিজন অমাত্য কাশ্মীরে থাকিতেন, তাঁহাদের রসদ জোগানো এবং সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তের ভার থাকিত এই সকল অমাত্যের উপর।

ভারতবর্ষ হইতে তখন কাশ্মীরে যাইবার তিনটি পথ ছিল;—কিষণগঙ্গা ও ঝিলামের ধার দিয়া যে পথ, সেইটুই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুগম। এই পথেরই একপ্রান্তে হাসান আবুলে অর্থাৎ ঠিক উপত্যকা-ভূমির সীমান্ত প্রদেশে—মোগল-আমলের প্রসিদ্ধ উদ্যান 'ওয়া বাগ' এখনও বর্ত্তমান আছে। এই 'ওয়া বাগে' বাদশাহী তাঁবু পড়িত।

এই হাসান আবুল জায়গাটিতে সকল ধর্ম্মের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এটিকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মিলন-তীর্থ বলিলেও চলে। এ স্থানের অসংখ্য ঝরণার সহিত হিন্দু, বৌদ্ধ,মুসলমান ও শিখের বহু পুণ্য-কাহিনীর স্মৃতি জড়িত আছে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং তক্ষশীলা হইতে এখানকার ঝরণা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

'ওয়া-বাগের' নাম-করণের ইতিহাসেও বেশ একটু কৌতুক আছে। এ উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে আকবর না কি বলিয়াছিলেন, "ওয়া বাগ!" (বাঃ, কি সুন্দর বাগান!) তাহা হইতেই উদ্যানের নাম হয়, "ওয়া বাগ!" কিন্তু আকবর নাম দিলেও উদ্যানটিকে শোভায় সৌন্দর্য্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, জাঁহাগীর বাদশাহ।

শ্রীনগরের পথে উলার হ্রদ পার হইলেই কয়টি উদ্যান চোখে পড়ে—মানস হ্রদের পশ্চিমে গিলগিটের পথে মোগল আমলের অসংখ্য উদ্যানের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে। এগুলির মধ্যে দরগা বাগ সমধিক প্রসিদ্ধ। দরগা বাগ

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আদেশে রচিত হয়—এখন লোকে আদর করিয়া এ উত্থানের নাম রাখিয়াছে, "লালা রুকের বাগান" (Lalla Rookh's garden)। মানস হ্রদের তীরে জন-সমাগম এখন বড়-একটা না হইলেও এ স্থানের দৃশ্য অতি রমণীয়; প্রকৃতি যেন অপরূপ বেশভূষায় মোহিনী মূর্ত্তিতে সাজিয়া বসিয়া আছে!

মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবরই প্রথম কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। শ্রীনগরে তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত দুর্গ হরি-পাবাৎ (সবুজ পর্ব্বত) এবং দল হ্রদের তীরে রচিত অপূর্ব্ব উত্থান নিশিম বাগ আজও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাদির সে পূর্ব্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কিন্তু চেনার কুঞ্জের অপূর্ব্ব শোভা আজও তিরোহিত হয় নাই। কাশ্মীরে চেনারের চাষ এই উত্থান-রচনা-কল্পেই প্রথম সুরু হয়। আকার ও সৌন্দর্য্যের জন্যই চেনারের আদর। ঘন ছায়া বিন্যাস করিতে এমন গাছ আর নাই বলিলেও চলে। কাশ্মীরের পথে মাঝে মাঝে চেনার গাছ আজও অজস্র দেখা যায়। পথে এ গাছ লাগাইবার কারণ, পত্রাবলীর দীর্ঘ-ঘন ছায়ায় শ্রান্ত পথিকের জন্য রৌদ্রাতপ-নিবারী চমৎকার বিরাম-কুঞ্জ রচিত হইত; এবং এই ছায়া-দানের জন্যই কাশ্মীরে এ গাছ 'রাজগাছ' নামে অভিহিত হইয়াছে—এবং এ গাছ কাটিতে হইলে এখনও রাজ-দরবার হইতে আদেশ সংগ্রহ করিতে হয়।

নিশিম বাগে জলের মধ্য হইতে সৌধ উঠিয়াছে—দেওয়ালগুলি শ্যাম শৈবাল-দলে আচ্ছন্ন—চারিধারে তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ—ও বুকে অজস্র ফুলে ভরা তরু-কুঞ্জ—সে এক অপূর্ব্ব ছবি!

নিশিম বাগ ও দুর্গের মধ্যে আর একটি রমণীয় উত্থান আছে, নাজিন বাগ—সেটি আকারে ছোট। তাহার পর দল হ্রদের আর এক প্রান্তে সুবিখ্যাত শালিমার বাগ। এই শালিমার বাগ চিরকাল রাজ-আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। এখনও কাশ্মীর-ভূপতি শালিমার বাগকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কাজেই মোগল আমলের এই প্রাচীন উত্থানটির শোভা-সৌন্দর্য্য এখনও অটুট আছে।

কাশ্মীর-নৃপতি দ্বিতীয় প্রবর সেন (৭৯—১৩৯ খৃঃঅব্দ) শ্রীনগর সহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দল হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি বাগান-বাড়ী তৈয়ার করান, তাহার নাম রাখেন, শালিমার (অর্থাৎ প্রেম-কুঞ্জ)। এই উত্থানের কিছু দূরে হারোয়ানে সুকর্ম্মা স্বামী নামে এক সাধু থাকিতেন—রাজা প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। সেই সময় এই শালিমার বাগ ছিল, রাজার বিশ্রাম-স্থল। ক্রমে কালের প্রভাবে সে উত্থানের দশা শোচনীয় হইয়া উঠে—কিন্তু উদ্যানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান শালিমার নামেই অভিহিত হইতে থাকে। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই জীর্ণ কঙ্কালের উপর নূতন বাগানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

সেকালের উত্থান-সজ্জায় জলটুঙ্গিই ছিল, প্রধান আভরণ। মিশরের প্রাচীন উত্থানাদিতে এখনও বিস্তর জলটুঙ্গির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বাগানের বুক চিরিয়া

যে দীর্ঘ পথ থাকিত, তাহার দুই ধারে জাফরির কাজ-করা বেড়া ঘেরিয়া লতায়-পাতায় থোলো থোলো আঙুর ঝুলিত, পথের মাঝে মাঝে বহু-স্তম্ভ-বিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি বিরাম-কুঞ্জ থাকিত—বাগানের শোভা অপরূপ হইত! দিল্লীর রোশিনারা বাগে আজও জলটুঙ্গি এবং এইরূপ বিরাম-কুঞ্জের ধ্বংশ-স্তূপ পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্য রুচির সংস্পর্শে এ-সকল ছায়া-শ্যামল পথ ও জলটুঙ্গি আজ কাশ্মীরী বাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দুই-একটা বিক্ষিপ্ত উদ্যানে দ্রাক্ষা-কুঞ্জ আজও দেখা যায়, কিন্তু বাগানের অনেকখানি সে প্রাচীন সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

দল হ্রদের তীরে আর একটি রমণীয় উদ্যান আছে—নিশৎ বাগ; সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ এ উদ্যান রচনা করান। এই নিশৎ বাগের পাশে অপর মোগল উদ্যানগুলিকে শোভায় সৌন্দর্য্যে নিতান্তই ম্লান দেখায়। এ উদ্যানে বারোটি থাক্ আছে—সবগুলি সমতল, আয়তনে দীর্ঘ অর্থাৎ যেন বারোটি সিঁড়ির ধাপ উঠিয়াছে—শেষ ধাপটি একেবারে পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে,—দেখিলে মনে হয় যেন রঙ্গপীঠ—এই সকল ধাপের বুক চিরিয়া স্রোতস্বিনী তর-তর ধারে বহিয়া চলিয়াছে—তাহার মাঝে মাঝে প্রস্রবণে জলের অবিরাম নৃত্য-লীলা—স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে লতা-পাতার বিচিত্র বাহার, নানা রঙের ফুলের মেলা—সমস্ত উদ্যানটিতে যেন আনন্দের কলহাসি মূর্ত্তি ধরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে!

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান কাশ্মীরে আসিয়া নিশৎ বাগ দেখিয়া এতখানি মুগ্ধ হন যে, তিনি বলেন, একজন প্রজার পক্ষে এমন বাগানের মালিক থাকা ভাল দেখায় না—তা সে প্রজা, হোন্ না কেন, তাঁহার উজীর ও শ্বশুর! আসফ খাঁ ছিলেন সম্রাটের শ্বশুর। আসফ খাঁর কাছে সম্রাট এই বাগানের অজস্র সুখ্যাতি করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাগানটি চাহিতে পারিলেন না। উজীর আসফ খাঁও অল্প চতুর ছিলেন না; সম্রাটের ইচ্ছা বুঝিয়াও তিনি সম্রাট-জামাতাকে তাঁহার সাধের বাগানটি দান করিতে পারিলেন না। উভয় পক্ষের মৌনতার ফলে নিশৎ বাগ আসফ খাঁরই সম্পত্তি রহিয়া গেল—রুষ্ট সম্রাট কিন্তু আর এক দিক দিয়া মনের ঝাল মিটাইলেন। শালিমার বাগ ও শ্রীনগরের মধ্যে একটি নদী ছিল, তাহা হইতে একটি কৃত্রিম ধারা বহিয়া রাজোদ্যানে ও নিশৎবাগে জল আসিত—সম্রাট সাজাহান রাজোদ্যানের সীমানায় সেই ধারা বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন; ফলে নিশৎ বাগে জলস্রোত রুদ্ধ হইল এবং তাহার অনেকখানি সৌন্দর্য্যও সেই সঙ্গে অচিরে ম্লানিমায় ঢাকিয়া গেল।

দীর্ণ শুষ্ক খাতে জল নাই, জলের অভাবে বাগানের দশা শোচনীয়—এ দৃশ্যে আসফ খাঁ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে জল-হীন শুষ্ক খাতের তীরে এক কুঞ্জে আসফ খাঁ কাতর চিত্তে শুইয়া ছিলেন—ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে বুক ভরিয়া গিয়াছিল—তিনি একবার ভাবিতেছিলেন, বাগান ত মজিতে বসিয়াছে, সম্রাটকে দিয়া ফেলি—পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন, না, এ বড়

নদীতীরের বাগান

সাধের বাগান,—এ বাগান কাহাকেও দেওয়া যায় না। এমনই নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন, কি আশ্চর্য্য! এ কি স্বপ্ন! ঐ যে শুষ্ক খাত আবার জলে ভরিয়া গিয়াছে, ফোয়ারায় আবার জলের সেই অপরূপ ফেনিল নৃত্য-লীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে! আসফ খাঁ সবিস্ময়ে কারণ-সন্ধানে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারই প্রিয় ভৃত্য প্রভুর এই কাতরতা দেখিয়া নিজের জানের মায়া ত্যাগ করিয়া শালিমার-প্রান্তে বাদশাহের হুকুমে বাঁধা বাঁধ কাটিয়া দিয়াছে এবং মুক্তি পাইয়া অবাধ জলরাশি আকুল উল্লাসে নিশৎ বাগে ছুটিয়া আসিয়াছে! আসফ খাঁ সভয়ে আবার সে ধারা বন্ধ করাইলেন—কিন্তু সম্রাটের দরবারে এ বেয়াদবির খবর পৌছিতে বিলম্ব ঘটিল না। তখনই দরবারে স-নফর আসফ খাঁর তলব পড়িল। গম্ভীর স্বরে সম্রাট কহিলেন, "এ বাঁধ কাটিল কে?"

শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত স্বরে ভৃত্য কহিল "আমি—"

"এ স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইল? জানের মায়া নাই?"

"জলের অভাবে অমন বাগান মরিয়া যায়—মনিবেরও প্রাণ যায়,—তাই জানের মায়া ত্যাগ করিয়াছি, সম্রাট!"

"বটে—!" সম্রাটের কঠোর স্বরে দরবারে সকলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—না জানি, কি কঠোর শাস্তির আদেশ হইবে! কিন্তু তাহা হইল না—সম্রাট সাজাহান সহাস্যে কহিলেন, "ঠিক করিয়াছ। অমন বাগান নষ্ট করিতে নাই! তোমার দুঃসাহসের পুরস্কার দিব।" সম্রাট সেই ভৃত্যকে তখনই রাজ-উপহারে ভূষিত ও উপাধি-দানে সম্মানিত করিলেন; এবং তাহার মনিবকে শালিমারের স্রোতস্বিনী হইতে নিশতে জল লইবার সনদ দান করিলেন।

* * *

কাশ্মীরীদের বাগানের সখ এখনও পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। কাশ্মীরে বৎসরে তিনবার পুষ্পোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে যখন কুমুদ, গোলাপ অজস্র ফুটিয়া উঠে— সেই সময়ই হইল, পুষ্পোৎসবের প্রশস্ত কাল। পুষ্পিত গুল্মে (narcissus ও tulip) যখন সমগ্র কাশ্মীর রঙিন্ হইয়া উঠে তখনও এই পুষ্পোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে তখন কাশ্মীরী নর-নারী এই সকল উদ্যানে সমবেত হয়—নৃত্য-গীতের বিপুল সমারোহের মধ্যে সকলে বাগানে বসিয়া ফুলের মধু অসীম উল্লাসে পান করিয়া থাকে। এই উৎসব-উপলক্ষে শালিমার বাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন-সমাগম হয়। বিচিত্র সজ্জায় সাজিয়া দেশের যত নরনারী শালিমারে আসিয়া আত্মীয়-পরিজন সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। ছাত্রেরাও পুষ্পোৎসবের সময় ছুটি পায় এবং পর্দ্দানশীন মহিলারাও সে সময় আব্রু কাটাইয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া ফুলের সভায় ফুলের মেলায় ফুলের মত সুন্দর মুখের কোমল হাসি ফুটাইয়া তোলেন।

দল হ্রদের তীরে আর একটি উদ্যান আছে, চশ্‌ম্ শাহী বাগ—আকারে ছোট

নিশৎ বাগ

হইলেও সৌন্দর্য্যে অপরূপ রমণীয়। এ বাগানটিও মোগল আমলের।

এই কাশ্মীরী বাগানগুলির সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে,—"সকালবেলা নিশৎ বাগের শ্যামল সৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া, সন্ধ্যাটুকু নিশিমের স্নিগ্ধ অনিলে ভাসিয়া ও দীর্ঘ দিনটুকু শালিমারে গড়াইয়া কাটিয়া যাক্, ওগো, এমন সুখ কাশ্মীরে আর কোথাও মিলিবে না!" যাঁহারা এ উদ্যানগুলি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এ কথার যাথার্থ্য তাঁহারা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিবেন। *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চোর

সুনীতিকে বাঁচাতেই হবে! আমার এ আলিঙ্গনের ভিতর থেকে, আমাকে কাঙ্গাল করে সে যেতে পারবে না,—পারবে না!

এতদিন আমার সঙ্গে থেকে মুখ-বুঁজে সে যে সংসারের শত জ্বালা পুইয়ে এসেছে! দারিদ্র্যে, হতাশায় আমি যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিছি, দুঃখের সাগরে সুখের দ্বীপের মত সে তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মধুর হাসির আলোয় আমার মনের সকল কালো ঘুচিয়ে দিয়েছে, তার স্নেহে-যত্নে-প্রেমে আমার মৃতদেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করেছে! সে যদি না থাকত, তাহলে এতদিনে আমি যে আশাহত হয়ে আত্মহত্যা করতুম!… …

এতকাল পরে আজ সবে যেই সুখের আভাস পেয়েছি, আর অমনি অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা! আমার দুঃখে যে নিজের বুক পেতে দিয়েছে, বিধাতা কি তাকে আমার সুখে একটু হাসবার অবকাশও দেবেন না? কাঁদতে-কাঁদতেই সে কি চিরবিদায় নিয়ে যাবে? আর, অসহায় আমি—বুকে পাথর বেঁধে হাত-গুটিয়ে বসে বসে অম্লানবদনে তাই দেখব? না, সে হবে না—হোতে পারে না!… …

কিন্তু, কি করব? সুনীতিকে বাঁচাতে হোলে ভাল ডাক্তার চাই—ডাক্তার ডাকতে হোলে টাকা চাই! টাকা কে দেবে? দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে যেতে বসেছে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে কোন-রকমে দিন কাটছে, অর্থাভাবে বেঁচে থেকেও রোজ মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করছি—আমার পানে মুখ তুলে তাকায় এমন দরদী ত কেউ কোথাও নাই! আমাকে বিশ্বাস করে আর কেউ টাকা দিতে চায় না—ভিখারীর মত সারাদিন দোরে-দোরে হাত পেতে ঘুরে মরেছি, কিন্তু আমাকে কেউ ত একটি টাকাও ধার দিলে না!

জ্বরের ঘোরে সুনীতি অজ্ঞান হয়ে গেছে, চিকিৎসার অভাবে তার অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠছে; এই হাড়ভাঙ্গা

* ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

শীতে একখানা শতছিন্ন পাতলা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে, অজ্ঞান অবস্থাতেও তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। স্বামী হয়ে এ নিদারুণ দৃশ্য আর যে প্রাণ ধরে দেখতে পারছি না—এ যে অসহ্য!

পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, গণ্ডাকতক পয়সা আর আমার দরখাস্তের উত্তরের চিঠিখানা রয়েছে। চিঠিখানা বের করে আর-একবার পড়লুম। কত কষ্ট, কত নিরাশার পর বিদেশের এক আফিসে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। সাহেব লিখেছেন, আর সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে কর্ম্মস্থলে গিয়ে আমার হাজির হওয়া চাই।

এ সুখবরে আমার চেয়ে যে বেশী আনন্দিত হোত, সেই সুনীতি আজ যেতে বসেছে! এতদিন যা চাচ্ছিলুম আজ তা পেয়েছি—কিন্তু সুনীতি যদি জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালায়, তবে কার মুখ চেয়ে আমি আর পরের চাকরী স্বীকার করব?

আস্তে-আস্তে সুনীতির শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালুম। তার কোটরগত চোখদুটি মোদা,—ঠোঁটদুখানি ঘন-ঘন কাঁপছে। প্রদীপের ম্লান আলোয় তার রোগশীর্ণ মুখখানি কি ভয়ানক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে! তার কপালে হাত দিয়ে হাত যেন পুড়ে গেল,—মনে হোল জ্বরের তাপে এরি মধ্যে তার প্রাণ যেন দগ্ধে অসাড় হয়ে গেছে! অসহ উদ্বেগে আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

কি করি—কি করি! সুনীতির জীবন যে পলে-পলে ক্ষীণ হয়ে আসছে—কি-করে তাকে রক্ষা করব?... ...

সেইখানে বসে-বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলুম। সে যে কি ভীষণ ভাবনা, আমার অন্তর্যামীই জানেন!...... ভাবনার সে অকূল-পাথারে যখন কোন-দিকেই সুরাহা দেখতে না পেয়ে, আমার মন ক্রমেই নেতিয়ে পড়তে লাগল, তখন কে-যেন হঠাৎ চুপিচুপি আমার কাণে-কাণে বললে, 'তুমি চুরি কর!'... ...

চুরি?......হ্যাঁ, চুরি! তা-ছাড়া আর উপায় কি? পৃথিবীতে কত লোক অর্থ-লোভে কত মহাপাপ কত নরহত্যা করছে, আর আমি একজনের জীবনরক্ষার জন্যে একটি দিনের তরে যদি চুরি করি, তাতে দোষ কি?... ...

দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে মনে-মনে ক্রমাগত এই কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। যতই ভাবি, ততই মনে হয়, এর চেয়ে সহজ উপায় নেই! কেউ জানবে না, দেখবে না, শুনবে না—চুরি করে সুনীতিকে যদি বাঁচাতে পারি, তবে আমি তাই করব, তাই-ই করব।... ...

স্তব্ধ রাত্রি—শীতার্ত্ত বিপুল নগরী এখন ঘুমে-অচেতন। জানলা খুলে দেখলুম, কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা; দীর্ঘ পথে জনমনুষ্য নেই; কেবল গ্যাসের প্রদীপ্ত থামগুলো, চিরজাগন্ত নির্ব্বাক প্রহরীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে, একমনে যেন প্রহরের পর প্রহর গুণে যাচ্ছে!

পাগলের মতন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।......এম্নি করেই কি নিরাশায় পড়ে লোকে চোর হয়?

* *
*

সেই অন্ধকার গলিতে, পরের বাড়ীর প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে আমার বুক ধড়াস্ করে' উঠল!

যদি ধরা পড়ি!......গরীব হলেও আমি ভদ্রলোক! চরিত্রবান বলে আমার খ্যাতি আছে, চোর বলে ধরা পড়লে আমার কি দশা হবে?

দূর থেকে হঠাৎ পাহারাওয়ালার উচ্চ কণ্ঠের চীৎকারধ্বনি অস্পষ্ট শুনতে পেলুম। সেই প্রাচীরের উপরেই এলিয়ে বসে পড়লুম—ভয়ে আমার বুকের কাছটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

কতক্ষণ বসে রইলুম, জানি না! যে ভরসায় বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সে সাহস আর করতে পারলুম না। মনে হোতে লাগল, চারিদিকের আনাচ-কানাচ থেকে কারা যেন শত-শত সতর্ক দৃষ্টি মেলে নীরবে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে! আর একটু পরেই তারা সবাই যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠবে, 'ঐ চোর, চোর, চোর!'

তাড়াতাড়ি প্রাচীরের উপর থেকে নামতে গেলুম। অমনি হঠাৎ বিদ্যুতের মত চোখের সামনে ফুটে উঠল, সুনীতির মুখ!—সেই বিশীর্ণ, পাণ্ডুর, মরন্ত মুখ! আচ্ছন্নের মত দেখলুম, তার মুখের চারিপাশ ঘিরে যেন শ্মশানের চিতা দাউ-দাউ জ্বলছে, সে আগুণে এখনি যেন সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে... ...

সব ভয় ঘুচে গেল,—মরিয়া হয়ে পাঁচিল পেরিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়লুম।

* * * *

সে ঘরের ভিতরে কারুর সাড়াশব্দ পেলুম না। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না—আস্তে-আস্তে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ধরালুম। আধখানা কাঠের দেয়াল দিয়ে একটা বড় ঘরকে দু-ভাগ করা হয়েছে—তারই একটা অংশে আমি দাঁড়িয়ে। দেয়ালের মাঝে একখানা পর্দ্দা ঝুলছে, বোধহয় সেইখান দিয়ে ঘরের অন্য অংশে যাওয়া যায়।

একদিকে দুটো আলমারি আর-একটা দেরাজ। আর-একদিকে একটি আন্‌লা—তাতে স্ত্রীলোকের খানকত কোঁচানো কাপড় ঝুলছে; একটা আয়নাওয়ালা টেবিলও রয়েছে—তার উপরে পমেটম, এসেন্সের শিশি, সাবানের বাক্স, পাউডার ও সিঁদুরের কৌটো, চিরুণী এবং বুরুস্ প্রভৃতি নানারকম জিনিস পাশে-পাশে সাজানো। নক্সাকরা মেদিনীপুরী মাদুরে ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া ঢাকা।—বুঝলুম, এটি কোন রমণীর সাজঘর; সে রমণী যে ধনীর ঘরণী—তাতেও কোন সন্দেহ রইল না।

দেরাজের টানাগুলো একে-একে টেনে দেখলুম, বন্ধ। আলমারি-দুটোতেও চাবি লাগানো। হতাশ হয়ে ভাবতে লাগলুম, এতদূর এগিয়ে শেষটা কি সুধু হাতে ফিরতে হবে?

আর-একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে, আয়নাবসানো টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলুম। তার একটা টানার দিকে চোখ পড়তেই আমার হতাশ প্রাণ আবার আশার আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। দেখলুম একটি টানায় রিংসুদ্ধ একগোছা চাবি লাগানো

রয়েছে! এই জঘন্য অপবিত্র কাজেও আমি না মনে করে থাকতে পারলুম না যে—ভগবান আজ আমার সহায়!

আস্তে-আস্তে টানা খুলতেই, ভিতরে কি-সব চিক্‌চিক্ করে' উঠল! আর-একটি কাঠি জ্বেলে দেখলুম, একগাছা হার, গাছ-কতক চুড়ী আর একজোড়া রতনচূড়,—সবই জড়োয়া গয়না! এত গয়নায় ত আমার দরকার নেই! আমি ত চুরির জন্যেই চুরি করতে আসিনি—আমি যে দায়ে-পড়ে নাচার হয়ে এসেছি!

ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, রতনচূড়-দুখানাই আমি নিয়ে যাব। এ গয়নাও বিক্রী করব না—শ-দুয়েক টাকায় আপাতত কোথাও বাঁধা রাখব। সেই টাকায় স্ত্রীর চিকিৎসা চলবে। তারপর ধার শুধে, গয়না উৎরে, যেমন-করে-পারি যার জিনিস তাকেই ফের ফিরিয়ে দেব!

রতনচূড়-জোড়া কম্পিত হস্তে বার করে' নিলুম। মনে-মনে বললুম—ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর! এই আমার প্রথম ও শেষ পাপ,—জীবনে এ-পথ আর-কখনো মাড়াবো না।

টানাটা বন্ধ করে' যেমন সরে আসতে যাব—আমার হাত-লেগে টেবিলের উপর থেকে কি-একটা জিনিস সশব্দে নীচে পড়ে গেল!

অন্ধকারে জড়সড় হয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলুম—যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে… …

আমার মনে হোল, যেন খস্‌খস্ করে কার কাপড়ের আওয়াজ হচ্ছে—ঘরের মাঝে কে-যেন পা টিপে-টিপে চল্‌ছে! আতঙ্কে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল!

খট্ করে কিসের শব্দ হোল—সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের প্রখর আলোক-তরঙ্গ এসে আমার চোখের উপর যেন হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা মারলে!—মুহূর্ত্তের জন্যে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলুম।

চোখের জড়তা যখন কেটে গেল, তখন ভয়স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম—ঠিক আমার সুমুখেই একজন রমণী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

রমণীও বিস্ময়ে ভয়ে নির্ব্বাক হয়ে আমার পানে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন!

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল—পড়ে যেতে-যেতে তাড়াতাড়ি দেয়ালটা ধরে ফেললুম। মনে হোল, আমাতে যেন আর আমি নেই!

বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কেটে যেতেই রমণী ব্যাকুলভাবে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। তখন আমার হুঁস হোল। বুঝলুম, তিনি লোক ডাকতে যাচ্ছেন! পাগলের মত একলাফে আমিও দরজার কাছে গিয়ে পড়লুম। ভয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করে তিনি দু পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন।

আমি মাটির উপর বসে পড়ে সকাতরে বললুম, "মা, আমাকে ক্ষমা করুন—আমার সর্ব্বনাশ করবেন না—লোক ডাকিবেন না!"

অচল প্রতিমার মত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সন্দেহের সহিত তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি আবার বললুম, "মা, আমি ভদ্র-লোকের ছেলে—দায়ে-পড়ে আজ একদিনের

জন্যে চোর হয়েছি—এ ভিন্ন আমার আর কোন উপায় ছিল না—আমাকে বিশ্বাস করুন—আমাকে বিশ্বাস করুন!"

রমণী কোন কথা কইলেন না—তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালুম। মা-বলে তাঁকে ডেকেছি বলেই হোক্ বা আমার কাতরতা দেখেই হোক্,—তাঁর মুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল। তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, আমার দ্বারা তাঁর কোন অহিত হবে না। নইলে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন।

আমি নিম্নস্বরে, খুব সংক্ষেপে, আমার অবস্থা তাঁর কাছে প্রকাশ করে বললুম। আর, তা-ছাড়া আমার অন্য উপায় ত কিছু ছিল না!

রমণীর দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। আমার কথায় তিনি যেন বিশ্বাস করলেন! কিন্তু তখনো তিনি একটি কথাও বললেন না।

আমি বললুম, "আমি চুরি করেছি—কিন্তু আমি চোর নই! আপনি টানা খুলে দেখুন, আমি আপনার আর কোন গয়নায় হাত দিই-নি। ভেবেছিলুম, এই গয়না বাঁধা দিয়ে আমার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন দেখছি ভগবানের সে ইচ্ছে নয়! নিন্ মা, আপনার গয়না আপনি ফিরিয়ে নিন্,—আমি চোর হলুম বটে, কিন্তু স্ত্রীকে তবু বাঁচাতে পারলুম না!" —এই বলে আমি সাশ্রুনেত্রে রতনচূড়-জোড়া তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিলুম।

রমণী একবার তাঁর গয়নার দিকে, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর ঘাড় হেঁট করে ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে, খুব মৃদুস্বরে বললেন, "ও গয়না আপনি নিয়ে যান!"

আমি অবাক-অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললুম, "মা, আপনি দেবী! আপনার দয়ায় আজ আমার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা হোল! এ উপকার আমি ভুলব না, এ গয়নাও যেমন-করে-পারি আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেব।"

—"আমি ফেরৎ চাই-না, আপনি শীঘ্র এখান থেকে চলে যান"—বলে, রমণী দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন!

ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—আমার মন তখন নানা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে ছাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি—হঠাৎ কে উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!"

আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে গেল! মনে হোল, পায়ের নীচে পৃথিবী ঘুরছে!

নীচের সিঁড়িতে কার দ্রুত পদধ্বনি শুনলুম—আরো নানাদিক থেকে নানা লোকের গলার স্বরও কাণে এল!

জ্ঞানহারার মত ছুটতে-ছুটতে আবার রমণীর ঘরে এসে ঢুক্লুম।

রমণীও সেই 'চোর'-বলে চীৎকার শুনেছিলেন। অত্যন্ত বিবর্ণমুখে উৎকর্ণ হয়ে তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

বালকের মত তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বললুম, "মা, আমাকে বাঁচান!"

চোখের পলক-না-পড়তে রমণী ইলেকট্রিকের আলো নিবিয়ে দিলেন। তারপর একটুও ইতস্তত না করে আমার হাত ধরে সেই অন্ধকারেই পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন।

পিছনে-পিছনে যে লোকটা ছুটে আসছিল, ঘরের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে চেঁচাতে লাগল। বোধ-হয়, অন্ধকারে এ ঘরে ঢুকতে তার সাহসে কুলোল না।

আমার কাণে-কাণে রমণী বল্‌লেন, "বিছানায় উঠে গায়ে লেপ ঢাকা দিন!"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "আপনার বিছানায়!"

—"উঠুন, দেরি করবেন না! আপনি আমাকে মা বলেছেন!"

—"কিন্তু, আমি ধরা পড়লে, আপনার কি হবে?"

—"ওরা এখনি এসে ঘর খুঁজবে, এ-ছাড়া উপায়ও নেই। যদি বাঁচতে চান, আপনার স্ত্রীকে বাঁচাতে চান, তাহলে উঠুন—বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে শুয়ে থাকুন।"

আমি আর কিছু বলতে পারলুম না—সেই অপূর্ব্ব রমণী যা বললেন, তাই করলুম। আমার সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও বিছানায় উঠলেন, তারপর আমার সর্ব্বাঙ্গ লেপ দিয়ে ঢেকে পালঙ্কের একপ্রান্তে সরে গিয়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। বেশ বুঝতে পারলুম,—তাঁর দেহ থেকে-থেকে থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠছে!

দু-এক মুহূর্ত্ত পরেই হুড়্‌মুড়্‌ করে অনেক লোক ঘরে এসে ঢুকল।

কে-একজন ব্যস্তভাবে বললে, "মেজ-বউ-দি, মেজবউ-দি, তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!"

রমণী বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই বললেন, "আমার ঘরে চোর! ঠাকুর-পো, তুমি পাগল হলে নাকি? মিছিমিছি চেঁচিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে!"

—"না, না,—আমি স্বচক্ষে তাকে তোমার ঘরে ঢুকতে দেখেছি! একি, মেজ্‌দাদা আজকেও ঘরে আসেন-নি!......কিন্তু, এ ত ভারি আশ্চর্য্যি, চোর-বেটা গেল কোথা?"

—"ঠাকুর-পো, স্বপ্নের চোরকে জাগলে আর ধরতে পারা যায় না!"

—"না মেজবউ-দি, আমি ঠিক দেখেছি,—তোমার দিব্যি!"

—"দেখেছ ত, সে গেল কোথায়?"

—"তাইত ভাবছি!"

—"কি ঠাকুর-পো, বিছানার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কি ভাবছ, চোর এসে আমার লেপের ভিতর ঢুকে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ভালমানুষটির মত ঘুমিয়ে পড়েছে?" বলে রমণী উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন! কিন্তু সে হাসির ভিতরেও তাঁর গলার স্বর কেমন যেন কাঁপছিল!

"না, না, তা ভাবছি না—তা ভাবছি না! চোরটা তাহলে এ ঘর থেকে কোন-গতিকে সরে পড়েছে দেখছি। কিন্তু, কোন্‌দিক দিয়ে পালাল?"

—"দুঃখের বিষয় ঠাকুর-পো! চোরেরা যে কোন্‌দিক দিয়ে পালায় সেটা চেঁচিয়ে

জাহির করে তারা সৎসাহস দেখিয়ে যেতে পারে না।"

আর-একজন কে বললে, "বাবু, আসুন! চোরটা বোধ হয় অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে!"

—"চল্, চল্, দেখা যাক্! এখানে দাঁড়িয়ে মিছে সময় নষ্ট করলে তাকে আর ধরতে পারব না!"

সকলে দ্রুতপদে ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে রমণীও পালঙ্কের উপর থেকে নেমে পড়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমিও একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শয্যাত্যাগ করে নীচে নেমে দাঁড়ালুম।

উদ্বেগে ভয়ে লজ্জায় মুখ মলিন করে আমার সেই দেবীরূপিণী রক্ষাকর্ত্তী হাঁটু-গেড়ে কক্ষতলে বসে আছেন। অত্যধিক উত্তেজনায় তিনি তখন যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন!

আমি তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললুম, "মা, আমি এখন কি-করে যাব? আর এখানে থেকে আপনাকে ত বিপদে ফেলতে পারব না!"

মাথা না তুলেই চিন্তিত স্বরে তিনি বললেন, "আর-একটু অপেক্ষা করুন—সকলে আবার ঘুমোক।"

—"কিন্তু যদি আপনার স্বামী এসে পড়েন?"

মাটির দিকে মুখ আরো নামিয়ে রমণী করুণস্বরে বললেন, "রাত্রে তিনি ত বাড়ী আসেন না!"

আশ্চর্য্য! এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী যার ঘরে, কী আকর্ষণে সে বাইরে-বাইরে রাত কাটায়!... ...

শোনা যায়-কি-না-যায়, এমনি অস্পষ্ট স্বরে, রমণী যেন আপন মনেই বললেন, "স্ত্রীর জন্যে স্বামী চোর হচ্ছে! আর, আমার স্বামী—আমার স্বামী"... ... ...হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, বলতে-বলতে থেমে পড়ে, তিনি দু-হাতে আপনার মুখ ঢেকে ফেললেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ

(৩) সার্বিয়া

তুরস্ক ব্যতীত বর্ত্তমানে বলকান্ উপদ্বীপে পাঁচটি রাজ্য আছে—যথা সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও গ্রীস। ১৯১২ খৃঃঅব্দের বলকান সমরের পর অষ্ট্রীয়ার চেষ্টায় আলবেনিয়াকে একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হয়; কিন্তু এই নূতন রাজ্যের অস্তিত্ব কয়েক মাসের ভিতরই লুপ্ত হয়। পূর্ব্বে যেমন বেলজিয়াম ইউরোপের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে বলকান উপদ্বীপও ইউরোপের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান

যুগে ইউরোপের প্রায় সকল গোলযোগেরই উৎপত্তি বলকান উপদ্বীপে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেরও সূত্রপাত এইখানে।

বলকান উপদ্বীপে অনেকগুলি জাতি বাস করে,কিন্তু ইহাদের ভিতর স্লাভজাতীয় অধিবাসীদের সংখ্যাই অধিক। এখানকার স্লাভ অধিবাসীগণ দক্ষিণ-স্লাভ বলিয়া পরিচিত; রুশদিগকে উত্তর-স্লাভ বলা হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে স্লাভ জাতির এই উভয় শাখারই অদৃষ্ট সমান ছিল। রুষিয়ার উত্তর-স্লাভগণ তাহাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশের প্রারম্ভেই যেমন দুর্দ্দান্ত তাতার জাতির দ্বারা পদদলিত হইয়াছিল—সেইরূপ বলকানের দক্ষিণ স্লাভরাও তুর্কিদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর সমানে দক্ষিণ স্লাভরা তুর্কীদের নানা অত্যাচার সহ্য করে এবং রুষিয়ানরা যেমন পশ্চিম ইউরোপকে মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল সেইরূপ ইহারাও পশ্চিম ইউরোপকে তুর্কীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু রক্ষাকারীরা যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া সভ্যতায় ইউরোপের অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আজ-পর্য্যন্ত বলকানের স্লাভ অধিবাসীগণ শিক্ষা-বিষয়ে পশ্চিম-ইউরোপের অনেক জাতির পিছনে পড়িয়া আছে। বুলগেরিয়াতেই শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও শতকরা পঞ্চাশ জন নিরক্ষর। পশ্চিম ইউরোপের লোকরা ইহাদের এই দুরবস্থার প্রকৃত কারণ জানিয়াও অনেক সময় ইহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য মনে করিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। জর্ম্মানরা এখনও সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর অধিবাসীদিগকে "ভেড়াচুর" বলিয়া ডাকে। সার্ব্ব এবং বুলগারই বলকানের প্রধান জাতি। এই দুই জাতির ভিতর অতি প্রাচীন কাল হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। এই পুরাতন শত্রুতাই, বর্ত্তমান যুদ্ধে সার্বিয়ায় শত্রুপক্ষের সহিত বুলগেরিয়ায় যোগ দেওয়ার প্রধান কারণ।

সার্বিয়ানরা স্লাভজাতির একটি শাখা। ধর্ম্মমতে ইহারা Orthodox Greek Churchএর অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সার্ব্বরা দানিয়ুব নদী পার হইয়া বলকান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমভাগে উপনিবেশ স্থাপন করে। তখন সমস্ত বলকান উপদ্বীপ গ্রীক সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু কনস্তান্তিনোপলের গ্রীক সম্রাটগণ বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় দরুণ সার্বিয়ানরা অতি সহজেই স্বাধীন হইয়া পড়ে এবং বলকান উপদ্বীপে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা দুশানের সময় সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় শক্তি পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে সমগ্র বলকান উপদ্বীপ সার্বিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল। দুশানের রাজত্বকালে সার্বিয়া সভ্যতায় ইউরোপের কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। তখন কনস্তান্তি-নোপলের গ্রীক সম্রাটদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং তুর্কীরা বাইজানতাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।

ডুশান বুঝিলেন, তুর্কীরা অতি সহজেই দুর্ব্বল গ্রীক সম্রাটকে পরাজিত করিতে পারিবে এবং অবশেষে বলকান উপদ্বীপও আক্রমণ করিবে। তাই তিনি নিজে বাইজানতাইন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আগে থাকিতেই তুর্কীদের আগমনে বাধা দিতে মনস্থ করিলেন। ১৩৪৫ খৃঃঅব্দে ডুশান গ্রীশ এবং বলকানের সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিতে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু কনস্তান্তিনোপলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ডুশানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরই তুর্কীরা বলকান আক্রমণ করে। তখন বলকানের প্রায় সমস্ত খৃষ্টীয়ান জাতিই তুর্কীর আক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত কোস্যোভো'র সমতল ক্ষেত্রে সমবেত হয়; কিন্তু তুর্কী সেনাপতি আমুরথ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কোস্যোভোর যুদ্ধই বলকান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। এই কোস্যোভোর ক্ষেত্রেই সার্বিয়ার এবং সমগ্র বলকানের সৌভাগ্যসূর্য্য পাঁচ শত বৎসরের জন্য অস্তমিত হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের সুলতান মুরাদ এবং সার্বিয়ার সম্রাট লাজার ও তাঁহার দ্বাদশ ভগ্নিপতি হত হয়েন। ইহা ব্যতীত সার্বিয়ার অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ব্যক্তিই প্রাণ হারান। যাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন—তাঁহারাও দেশ ত্যাগ করিয়া মণ্টেনিগ্রোর দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লয়েন। বলকানের দক্ষিণ-স্লাভরা আজপর্য্যন্ত এই যুদ্ধের কথা ভুলিতে পারে নাই। এই যুদ্ধের এবং তাহার আনুসঙ্গিক ঘটনার অবলম্বনে বলকানে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। স্লাভনিক সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবিতা এই যুদ্ধের কথা লইয়া লিখিত, এবং সার্বিয়ার অনেক জাতীয়-সঙ্গীত এই পরাজয়ের জন্য করুণ বিলাপ মাত্র। আজপর্য্যন্ত সার্বিয়ার ভিক্ষুকরা এই সব করুণগীতি গায়িয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে। গ্রীম, গেটে প্রমুখ জর্ম্মান মনিষীগণ এই সব কাব্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। একমাত্র ইংরাজী ছাড়া ইউরোপের আর সমস্ত প্রসিদ্ধ ভাষাতেই এই সকল কাব্য অনুদিত হইয়াছে।

কোস্যোভোর যুদ্ধের ৭০ বৎসর পর সুলতান মহম্মদ সমগ্র সার্বিয়াকে তুরস্কসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে সার্বিয়ানরা অনেকবার খৃষ্টীয়ান ইউরোপের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তুরস্কের ভয়ে ইউরোপের কোন দেশই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। পোপ একবার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সার্বিয়ানরা সে সাহায্য উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা বরং তুরস্কের দাসত্ব স্বীকার করিবে, তবুও রোমান ক্যাথলিক হইবে না। তুরস্কের অধীনে সার্বিয়ার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। সুলতান, সার্বিয়াকে নয় শত জায়গীরে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ নয় শত লোকের নিকট বিলি করিয়া দেন। এই সকল জায়গীরদার প্রজার ধনপ্রাণের মালিক ছিল। খৃষ্টীয়ান প্রজাবর্গের কোন বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না। আদালতে খৃষ্টীয়ানদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত না এবং কোন তুর্কীর বিরুদ্ধে

আদালতে অভিযোগ করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। পুরুষদিগকে সর্ব্বদা দীনহীন বেশে থাকিতে হইত এবং স্ত্রীলোকদেরও ভাল অলঙ্কার কিংবা বস্ত্র পরিধান করিবার অধিকার ছিল না। ভাল কাপড়-চোপড় পরা কিম্বা সুন্দর গৃহে বাস করা দণ্ডনীয় ছিল। সহরের রাস্তায় খৃষ্টীয়ানদের গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার অধিকার ছিল না। সহরের বাহিরেও কেহ ঘোড়ায় চড়িতে চাহিলে তার জন্য অনুমতি-পত্র লইতে হইত। কিন্তু, কোন তুর্কীকে রাস্তায় দেখিলে সব খৃষ্টীয়ানকে তখনই ঘোড়া হইতে নামিতে হইত। তুর্কীর সম্মুখে খৃষ্টীয়ানদের বসিবার অধিকার ছিল না। দেশের সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে তুর্কী রাজকর্ম্মচারীগণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইত এবং প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের পর দেশের শত শত যুবককে কনস্তান্তি-নোপলে লইয়া গিয়া জেনেসেরি সৈন্যদলে ভর্ত্তি করান হইত। ইহাদের সকলকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। খৃষ্টীয়ানদের কোনপ্রকার অস্ত্রধারণ করিবারও অধিকার ছিল না। প্রজাদের নিকট হইতে হরেক-রকম কর আদায় করা হইত। প্রথমত, সুলতানের নিমিত্ত একটা বিশেষ কর গৃহীত হইত। তারপর ৭ বৎসরের অন্যূন এবং ৬০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সকল পুরুষ প্রজার নিকট হইতে একটা প্রাদেশিক কর আদায় করা হইত। ইহা ভিন্ন যাহারা বিবাহিত, তাহাদেরও পৃথক কর দিতে হইত। প্রত্যেক শিশু-সন্তানের জন্য, গরুর জন্য, শূকরের জন্য, রান্নাঘরের উনারের জন্য প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ রাজকোষে দিতে হইত এবং গ্রীষ্মকালে কৃষকদিগকে বিনা মজুরিতে সুলতানের এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের উদ্যানে কাজ করিতে হইত। তুর্কীরা সার্বিয়া হইতে অর্থশোষন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। যে-সমস্ত প্রজা দেশে থাকিত, তাহাদের ধর্ম্ম কিম্বা ভাষার উপর তুর্কীরা কথনো হস্তক্ষেপ করিত না। তাই সার্বিয়ানরা নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে নাই; তাহারা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন অষ্ট্রীয়ানরা তুর্কীদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল তখন সার্বিয়ানরা ভাবিল যে, তাহাদেরও মস্তক উত্তোলন করিবার সময় আসিয়াছে। তখন সার্বিয়ানরা দলে দলে অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। সার্বিয়ানদের ভিতর এক জনশ্রুতি ছিল যে একদিন কোন অজানা দেশ হইতে একজন বীরপুরুষ উষ্ট্রে চড়িয়া খোলা তরবারি হস্তে তাহাদের দেশে উপস্থিত হইবেন এবং তিনি অতি অল্পদিনের ভিতরই মুসলমানদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন। এ প্রবাদ অনেকটা আমাদের কল্কি-অবতারের ন্যায়। অষ্ট্রীয়ার সার্বিয়ান সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত একদিন একজন অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি উষ্ট্রে চড়িয়া তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত সার্বিয়া আশান্বিত

ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। সার্বিয়ানরা ভাবিল, তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু তাহাদের নেতারা একা একা কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলেন। অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিবে এই ভাবিয়া তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার নিকট অনেক কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। সার্বিয়ান কবিগণ অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "একবার আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাও, আমাদের পুরাতন দেশ তুর্কীর হাত হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া দাও"। ইহাদের ক্রন্দন শুনিয়া অষ্ট্রীয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল। অতি অল্পদিনের ভিতরই তুর্কীরা পরাজিত হইয়া সার্বিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন দেশময় আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্বিয়ানদের এই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই অষ্ট্রীয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তুরস্কের সহিত এক সন্ধি করিয়া বসিল এবং এই সন্ধির ফলে তুর্কীরা আবার সমস্ত সার্বিয়া ফেরত পাইল। তুর্কীদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সার্বিয়ান দেশত্যাগী হইল। সার্বিয়ার সব আশা স্বপ্নে পরিণত হইল। কিন্তু সার্বিয়ান নেতারা তবুও অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিশ্বাস হারাইলেন না। কয়েক বৎসর পর তাঁহারা আবার অষ্ট্রীয়ার দ্বারস্থ হইলেন। এবারও অষ্ট্রীয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল এবং রুষিয়ার সহিত একযোগ হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তুর্কীরা আবার বাধ্য হইয়া সার্ভিয়া পরিত্যাগ করিল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হইল। অষ্ট্রীয়া এই বিপ্লবের খবর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিল এবং এই সন্ধির ফলে তুরস্ক আবার সার্বিয়া ফেরত পাইল। সার্বিয়ানরা আবার হতাশ হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একটা সুফল ফলিল। বারম্বার নিরাশ হইয়া সার্বিয়ানরা শেষটা বুঝিতে পারিল যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে পর-মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না—নিজেদেরই যুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং অতঃপর তাহারা সেইজন্যই প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বলকানের প্রায় সকল দেশই অপরের সাহায্যে তুর্কীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। গ্রীশ এবং বুলগেরিয়া ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সার্বিয়া স্বাধীন হইয়াছিল তাহার নিজের এক দরিদ্র এবং নিরক্ষর কৃষক-সন্তানের চেষ্টায়। এই কৃষক-সন্তানের নাম জর্জ। তাঁহার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে কালো জর্জ বলিত এবং তিনি ও তাঁহার পরিবার এই নামেই পরিচিত। ইনি সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজার পিতামহ। সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজার নাম পিটার কারাজর্জোভিচ। কালো জর্জ ১৭৮৭ খৃঃঅব্দের বিদ্রোহে তুরস্কের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তিনি স্বগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য

হয়েন। তাঁহারা সেভ্‌ নদীর তীরে পৌঁছিবার পর কালোজর্জের বৃদ্ধ পিতা আর অগ্রসর হইতে রাজি হইলেন না। তুর্কীরা তাঁহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছিল, তুর্কীর হাতে পড়িলে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে জানিয়া পিতা আপন পুত্রকে আদেশ করিলেন, "আমাকে এখনই হত্যা করিয়া পলায়ন কর; আমার জন্য নিজে বিপন্ন হইও না।" কালোজর্জ পিস্তলের গুলি মারিয়া পিতাকে হত্যা করিলেন এবং তুর্কীরা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেভ্‌ নদী পার হইয়া অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিলেন। সেখানে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কয়েক বৎসর পর তিনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। সার্বিয়ানরা অতিশয় ভাবপ্রবণ এবং বক্তৃতা-প্রিয় জাতি; কিন্তু কালোজর্জ কারো সহিত বেশী মিশামিশি করিতেন না কিম্বা কথা-বার্ত্তা বলিতেন না। তাঁহাকে হাসিতে দেখা যাইত না; তাই সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। সেই সময় হাজি মুস্তফা নামক একজন অতি সদাশয় তুর্কী সার্বিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি সার্বিয়াতে আসিয়াই অত্যাচারী জেনেসেরি-দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। জেনে-সেরি সৈন্যগণ কনস্তান্তিনোপলে গিয়া সুলতানের নিকট অভিযোগ করে এবং বিদ্রোহের ভয় দেখায়। সুলতান ভয় পাইয়া শাসনকর্ত্তার আদেশ রদ করিলেন এবং তাহাদিগকে আবার সার্বিয়ায় প্রেরণ করিলেন। জেনেসেরিগণ সার্বিয়ায় পৌঁছিয়াই সদাশয় হাজি মুস্তফাকে হত্যা করে এবং সমস্ত দেশ নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া লয়। তারপর ইহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া সক্ষম পুরুষদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই অমানুষিক অত্যাচারের ভয়ে সার্বিয়ার অধিকাংশ সক্ষম অধিবাসী দেশত্যাগ করিয়া মোরাভার অগম্য জঙ্গলে পর্ব্বতে পলায়ন করে। এবং এইখানে সকলে একত্র হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ১৮০৪ খৃঃঅব্দে এক জাতীয় সভা আহ্বান করে। এই সভায় কালোজর্জ একবাক্যে সমগ্র সার্বিয়ান জাতির নেতা এবং সার্বিয়ান বাহিনীর সেনাপতিরূপে মনোনীত হয়েন। এই সভায় কালোজর্জ তাঁহার স্বদেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, —"দেখ, আমি নিতান্ত সাদাসিদে মানুষ, আমি তোমাদের মতন বক্তৃতা দিতে পারিব না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি আমার কথার অবাধ্য হও, তাহা হইলে আমি তাহাকে বক্তৃতা দিয়া আমার মতে আনিতে পারিব না; আমি তাহাকে সোজাসুজি গুলি করিয়া মারিব।" সার্বিয়ানরা তবুও তাঁহাকেই একবাক্যে গ্রহণ করিল। এই মহাপুরুষের চেষ্টাতেই সাবিয়া অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। কালোজর্জ অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াও তাঁহার সাদাসিদে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বদা কৃষকের বেশে থাকিতেন এবং কৃষকের কাজ করিতেন। তাঁহার কন্যাকে অন্যান্য কৃষক-কন্যাগণের সহিত কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিতে হইত। কালোজর্জ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন, নিজের নামটি পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিতেন না।

কালোজর্জের নেতৃত্বে সার্বিয়ানরা প্রথমা-বস্থায় তুরস্কের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন

করিতে চাহে নাই। তাহারা তুরস্ক-সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াই স্বায়ত্ত-শাসনের প্রার্থী হইয়াছিল। তাহারা আরও চাহিয়াছিল যে, সার্বিয়ার দুর্গসমূহে সুলতান তুর্কী সৈন্য না রাখিয়া একমাত্র দেশী সৈন্য রাখিবেন। সুলতান সার্বিয়ানদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং তাঁহার শাসনকর্ত্তা সমস্ত সার্বিয়ান জাতিকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অল্পদিনের যুদ্ধের পরই তুর্কীদিগকে তাহারা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হইল। তুর্কীদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইবার পর কালোজর্জ রাজ্যে অনেকগুলি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। সার্বিয়ানরা যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হয় ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই অনুসারে তিনি সর্ব্বপ্রথমেই সার্বিয়ার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং সুশাসনের নিমিত্ত একটি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুলতান কালোজর্জের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ১৮০৭ খৃঃ অব্দে সার্বিয়াকে কালোজর্জের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়েন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাৎসরিক একটা কর ধার্য্য করেন। সার্বিয়ানরা সুলতানের প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে রুষ-জার তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, এই যুদ্ধে সার্বিয়ানরা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তুরস্ক নিশ্চয়ই ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইবে এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে—সুতরাং তাহারা যেন সুলতানের এই স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাবে মত না দেয়। সরল সার্বিয়ানরা রুষ-জারের কথায় বিশ্বাস করিয়া সুলতানের আপোশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং রুষিয়ার সহিত একযোগ হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া তাহাদিগের সহিত যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল এবার রুষিয়াও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে রুষিয়া সার্বিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বুখারেষ্টের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিল। তুরস্ক অবিলম্বে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আবার সার্বিয়া আক্রমণ করিল। বিপন্ন কালোজর্জ নেপোলিয়নের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন কিন্তু তিনিও সাহায্য করিলেন না। কালোজর্জ অবশেষে সার্বিয়া পরিত্যাগ করেন এবং অষ্ট্রীয়ার আশ্রয় লয়েন। সার্বিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও কালোজর্জের সহিত দেশত্যাগী হয়েন। যাঁহারা দেশে থাকিলেন, তাঁহারা মিলস নামক এক ব্যক্তিকে কালোজর্জের স্থানে দেশনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মিলস প্রথমে তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরেই বিদ্রোহী হইয়া তুর্কীদের আক্রমণ করেন। তখন নেপোলিয়নের পতন হইয়াছে; তাই সুলতান ভাবিলেন যে, রুষিয়া হয়ত সার্বিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। এই ভয়ে তিনি বাৎসরিক একটা কর ধার্য্য করিয়া সার্বিয়াকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিলেন। কালোজর্জ তখন বেসারাবিয়াতে নির্ব্বাসনে ছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন

লাভ করিবার পর সার্বিয়ানরা তাঁহাকে দেশে ফিরিতে অনুরোধ করে। কালোজর্জ এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, ১৮১৭ খৃঃঅব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মিলস্ তখনও সার্বিয়ার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু কালোজর্জের আগমনে দেশের উপর তাঁহার আধিপত্য কমিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার হিংসা হইল এবং তিনি সুলতানের প্রতিনিধিকে জানাইলেন যে, কালোজর্জের দরুণ দেশ আবার বিদ্রোহী হইবে এবং সার্বরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিবে। ইহা শুনিয়া পাশা কালোজর্জের ছিন্নমুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। মিলসের গুপ্তচর তখনই কালোজর্জের অন্বেষণে বাহির হইল এবং কিছুদিন পর তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমস্তক পাশাকে উপহার প্রদান করিল। সার্বিয়ার জাতীয় বীর এবং উদ্ধারকর্ত্তার জীবন এইরূপে শেষ হইল। কালোজর্জের মৃত্যুর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৩ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার এবং মিলসের বংশধরগণের মধ্যে সার্বিয়ার সিংহাসন লইয়া সমানে বিবাদ চলিয়াছিল এবং ইহার দরুণ অনেক রক্তপাতও হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সার্বিয়া আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে তুরস্কের জয় হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ই রুষ, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করায়, তুরস্ক সার্বিয়ার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধের পর বার্লিনএর সন্ধি হয় এবং তাহার ফলে সার্বিয়া বলকানের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সার্বিয়া প্রায় পাঁচশত বৎসর তুরস্কের অধীনে ছিল। বার্লিনসন্ধির পর মিলান সার্বিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিলান অতিশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন—তাই রুষ-জার তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। বার্লিন-সন্ধির পর হইতে রুষ-জার সার্বিয়ার রক্ষণশীল-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং মিলানের প্রত্যেক সংস্কারকার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। মিলান নেটালি নাম্নী এক পরম রূপবতী রুষরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। রাণী নেটালি রক্ষণশীল দলের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বিবাহের পর হইতেই রাজার সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে রাজা রাণীকে ত্যাগ করেন। ইহার দরুণ দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় রুষিয়ার নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া রাজার নামে নানারূপ কুৎসা রটনা করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির হানি করিতে পারিয়াছিল। এই সময় তুরস্কের পূর্ব্ব-রুমেলিয়া নামক প্রদেশ-বাসীরা তুরস্কের অধীনতা ত্যাগ করিয়া বুলগেরিয়ার সহিত যুক্ত হয়। সার্বিয়া চিরশত্রু বুলগেরিয়ার আয়তন বৃদ্ধি হইল দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় এবং বিনা কারণে বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে। বুলগেরিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই মিলান ভাবিয়াছিলেন যে তিনি অতি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন এবং নূতন দেশ অধিকার করিয়া নিজের এবং গবর্মেণ্টের প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধে বুলগেরিয়ারই জয় হইল।

তখন বুলগেরিয়ানরা সমস্ত সার্বিয়া অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু অষ্ট্রীয়ার ভয়ে তাহারা ততটা অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই পরাজয়ের দরুণ সার্বিয়াতে রুষের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, কিন্তু তবুও মিলান উন্নতিশীল দলের সাহায্যে ভোটদান অধিকার সম্বন্ধে খুব উদার আইন পাশ এবং সংবাদ-পত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পূর্ব্বে বলকানে কিম্বা তুরস্কে যখনই কোন সংস্কারের প্রস্তাব হইত, তখনই রুষ-জার শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন এবং সংস্কার-কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন। সার্বিয়ার জাতীয় সভাতে যাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতামূলক উক্ত আইন পাশ না হয়—তাহার জন্য রুষিয়ার চরেরা অনেক সদস্যকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল কিন্তু তবু উন্নতিশীল দলেরই জয় হইয়াছিল। ১৮৮৯ খৃঃঅব্দে রাজা মিলান এই সব রাজনৈতিক এবং পারিবারিক গোলযোগের দরুণ ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। মিলানের পর তাঁহার পুত্র আলেকজান্দার সার্বিয়ার রাজা হন। আলেকজান্দারের সময় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতর ঝগড়ার দরুণ গবর্মেণ্টের এবং দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলেকজান্দার নূতন আইন করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। এই আইন-মতে রাজনৈতিক সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীদিগকে গবর্মেণ্টের নিকট তিন হাজার টাকা জামিন স্বরূপ জমা রাখিতে হইতে। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী ভিন্ন আর কাহারও সম্পাদক হইবার অধিকার ছিল না। ১৯০০ খৃঃঅব্দে আলেকজান্দার তাঁহার মাতার দ্রাগা নাম্নী এক পরিচারিকাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহের পরেই তাঁহার পিতা রাজ্যত্যাগী রাজা মিলানকে সার্বিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নিজেই অনুরোধ করিয়া পিতাকে প্যারী হইতে দেশে আনাইয়াছিলেন। এই বিবাহের দরুণ আলেকজান্দার দেশে আরো অপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং দেশের সংবাদ-পত্রসমূহ তাঁহাকে এবং রাজ্ঞী দ্রাগাকে যথেচ্ছ আক্রমণ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে এক জনরব উঠে যে রাজা আলেকজান্দার রাণী দ্রাগার এক ভ্রাতাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী সাব্যস্থ করিয়াছেন। ইহাতে দেশের লোক আরো উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা একদিন রাত্রে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এবং রাজ্ঞী দ্রাগাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কালোজর্জের পৌত্র পিটারকে সিংহাসনে বসায়। ইনিই সার্বিয়ার বর্ত্তমান রাজা। এই হত্যাকাণ্ডের পর রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ হত্যাকারীরা নিজে দখল করে এবং তাহাদেরই একজন নেতা সার্বিয়ার মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন পর সার্বিয়ার পার্লিয়ামেণ্টে একবাক্যে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে রাজা ও রাণীর হত্যার দরুণ ধন্যবাদ দিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংবাদ পাইয়া ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা ঘৃণায় সার্বিয়াকে কিছুদিনের জন্য একঘরে করিয়া রাখেন এবং তাঁহাদের রাজদূত-

দিগকে দেশে ফিরাইয়া নেন। ১৯০৩ খৃঃ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে সার্ব্বিয়ার কোন সংশ্রব ছিল না।

১৯০৮ খৃঃঅব্দে অষ্ট্রীয়া বার্লিনের সন্ধি অমান্য করিয়া তুরস্কের বস্‌নিয়া ও হার্জে-গভিনা প্রদেশ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। এই দুইটি প্রদেশে বিশ লক্ষ সার্ব্বিয়ান বাস করে। এককালে বস্‌নিয়া, হার্জ্জেগভিনা, নবিবাজার এবং মণ্টেনিগ্রো সার্ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার্ব্বিয়ান দেশহিতৈষীদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই সকল দেশ সার্ব্বিয়ার সহিত সংযোজিত করিয়া আবার পুরাতন সার্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাহারা ভাবিয়াছিল, তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তাহাদের এই আশা পূর্ণ হইবে; কিন্তু অষ্ট্রীয়া এই দুইটি প্রদেশ তুরস্কের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ায় তাঁহাদের এই আশা হত হইল। তখন সার্ব্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল—কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ প্রকারান্তরে অষ্ট্রীয়ার কার্য্য অনুমোদন করায় তাহারা আর যুদ্ধঘোষণা করিতে সাহস করিল না। কিছুদিন পর অষ্ট্রীয়া ঘোষণা করিল যে, সার্ব্বিয়ার প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই এবং সে কখনও সার্ব্বিয়ার অখণ্ডতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। সার্ব্বিয়ার রাজকুমারের খুব ইচ্ছা ছিল, অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা। দেশের অনেক লোকও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিল। রাজা পিটার ইহাতে মত না দেওয়ায় রাজ-কুমারের সহিত তাঁহার খুব ঝগড়া বাধিয়া যায়। রাজকুমার পিতাকে দুই-তিনবার প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করেন। অবশেষে তিনি পৈত্রিক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সার্ব্বিয়ার ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েন।

বার্লিন সন্ধির পর ইউরোপের অনেক রাজপুরুষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বলকানে প্রকৃত শান্তিস্থাপন করিতে হইলে, বলকানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া একটা Balkan Confederationএর সৃষ্টি করিতে হইবে। ১৮৯১ খৃঃঅব্দে গ্রীশের রাজমন্ত্রী ট্রিকোপিস ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্ব্বিয়া ও বুলগেরিয়ার একগুঁয়েমির দরুণ তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। বলকান রাজ্যগুলির ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রধানত মেসিডনিয়া লইয়া। মেসিডনিয়া তখন তুরস্কের অধীনে ছিল। তুর্কী ব্যতীত মেসিডনিয়াতে সার্ব, বুলগার, গ্রীক ও রুমেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বাস করে;—তাই বলকান-উপদ্বীপের প্রত্যেকটি রাজ্যই মেসিডনিয়া অধিকার করিতে চায় এবং ইহা লইয়া বলকানের সকল জাতির ভিতর বহুকাল ধরিয়া প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সুলতান আবদুল হামিদের রাজ্যশাসন-প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য ছিল, মেসিডনিয়ার বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া এই শত্রুতা সজীব রাখা;—তাই আবদুল হামিদের সময় মেসিডনিয়াতে সমানে অরাজকতা চলিতেছিল। ১৯০৮ খৃঃঅব্দে যখন নব্য তুর্কীদের অভ্যুদয় হয়—তখন সকলেই আশা করিয়াছিল, মেসিডনিয়ার এই অরাজকতার

অবসান হইবে; কিন্তু ফলে ঠিক তাহার উল্টা হইল। নব্যতুর্কীরা ভাবিলেন যে, তুরস্কের সার্ব, বুলগার, গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদিগের জাতি-ধর্ম্মের ব্যবধান দূর করিয়া সকলকে একবারে তুর্কী বানাইবেন। তাঁহাদের এই অদূরদর্শিতার ফল এই হইল যে, এই সকল বিভিন্ন জাতি তাহাদের পূর্ব্বের শত্রুতা ভুলিয়া গেল এবং তুর্কীকে ইউরোপ হইতে তাড়াইবার নিমিত্ত একদল হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৯১২ খৃঃঅব্দে Balkan League স্থাপিত হইল এবং ঐ বৎসরই ঐ League তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। এই যুদ্ধের ফলে সার্বিয়ার আয়তন প্রায় পনর হাজার বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোসোভোর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল পর আবার সার্বিয়ার সীমানাভুক্ত হইয়াছে।

বলকান-সমরের পর সার্বিয়াতে অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিদ্বেষ আরো বাড়ে। জার্ম্মানির চক্ষু যেমন অনেক দিন যাবৎ কনস্তান্তিনোপলের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ অষ্ট্রীয়ার নজর সালোনিকার উপর। এই উভয় স্থানেই পৌছিতে হইলে সার্বিয়ার মোরাভা উপত্যকার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাই অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে যতদূর সম্ভব গ্রাস করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে বস্নিয়া এবং হার্জেগভিনা অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। বাণিজ্য-হিসাবে সার্বিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানির করতলে ছিল। সার্বিয়ার বাণিজ্যের তিনভাগের দুইভাগই অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানির হাতে ছিল। সার্বিয়ান কৃষকদের অবস্থা খুব সচ্ছল—কিন্তু দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা নিতান্ত খারাপ। শূকর-পালনই সার্বিয়ানদের প্রধান ব্যবসা এবং শূকরই সার্বিয়ার প্রধান সম্পত্তি। দেশের খনিজ সম্পত্তি প্রায় সমস্তই যুদ্ধের পূর্ব্বে বেলজিয়ানদের হাতে ছিল। সার্বিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলে অষ্ট্রীয়ার চির-অসন্তুষ্ট স্লাভ অধিবাসীগণ সহজেই বিদ্রোহী হইতে পারে; তাই সার্বিয়ার আয়তন বৃদ্ধি হয়,—ইহা অষ্ট্রীয়ার ইচ্ছা নহে। সার্বিয়ার সীমানা কোথাও সমুদ্র স্পর্শ করে না। বলকান-সমরের পর সার্বিয়ানরা আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে দুই-একটী বন্দর পাইবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু অষ্ট্রীয়ার চক্রান্তে তাহাদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল না। যাহাতে সার্বিয়া আড্রিয়াতিকের উপকূল পর্য্যন্ত না পৌছিতে পারে, তাহার জন্য অষ্ট্রীয়ার প্রস্তাবে আলবেনিয়াকে একটা পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হইল একজন জার্ম্মান রাজকুমার ঐ দেশের রাজা নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে বলকানে জার্ম্মানীর প্রভাব আরো বাড়িয়া গেল। ১৯১৩ খৃঃঅব্দের বুখারেষ্টের সন্ধিতে এই সব ঠিক করা হইয়াছিল। এই বুখারেষ্টের সন্ধিই বর্ত্তমান যুদ্ধে বলকান রাজ্যগুলির লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ। জর্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়া বলকান উপদ্বীপে প্রধান হইয়া উঠে, ইহা রুষিয়ার অভিপ্রায় নহে। বলকানের—বিশেষতঃ সার্বিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশই জাতিতে স্লাভ এবং ধর্ম্মমতে Orthodox Churchএর অন্তর্ভুত। রুষিয়া স্লাভ জাতিদের

রক্ষক এবং Orthodox Churchএর নেতা;—তাই যখন সারাজেভোর হত্যা-কাণ্ডের পর অষ্ট্রীয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করিল, রুষিয়াও অমনি বিপন্ন সার্বিয়াকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। বর্ত্তমানে এক মনাষ্টির ভিন্ন সমুদয় সার্বিয়া শত্রুর হস্তগত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ছন্নছাড়া

(১৫)

ভোর হবার অনেক আগেই উঠে, আমি রান্নাঘরের বাসি-পাট সারতে লেগে গেলুম। বড়-বড় তামার হাঁড়িগুলো কেমন-করে তুলতে হয় মেলানি আমায় দেখিয়ে দিলে। এগুলো তুলতে শুধু গায়ের জোর নয়, একটু কায়দারও দরকার। একটা হাঁড়ি নিয়েই ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে আমার সপ্তাহ-খানেকের উপর কেটে গেল। ঘুম ভাঙাবার ভারি ঘণ্টাটা কেমন-করে দড়ি-টেনে বাজাতে হয় মেলানি তাও আমায় শিখিয়ে দিলে। [illegible]কাজ খুব শীঘ্রই আমার সড়গড় হয়ে গেল। রোজ সকালে—বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক—আমি মহা ফুর্ত্তি করে ঘণ্টা বাজাতুম। তার আওয়াজ ছিল খুব স্পষ্ট—বাতাসের গতিকে তার জোর বাড়ত, কমত। এই শব্দ শুনে-শুনে আমার কখনো বিরক্তি ধরতনা। একএকদিন আমি এতক্ষণ-ধরে বাজিয়ে যেতুম যে সিষ্টার আঁজ্ তার ঘরের জানলা খুলে কাকুতি-মিনতি করে বলে উঠত—ব্যস্, ব্যস্,—আর নয়।

রান্নাঘরের কাজে আমি এসে অবধি বেহায়া ভেরোনিক্টা আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় মুখ-ফিরিয়ে থাকত। আমি যদি জিজ্ঞাসা করতুম অমুক জিনিষটা কোথায় আছে, সে কথা না বলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। সিষ্টার আঁজ্ তার এই ব্যবহার চুপ-করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করত;—দেখতে-দেখতে তার ঠোঁট কুঁকড়ে আসত। আগেকার মতন এখন তার মেজাজ আর তেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠেনা বটে কিন্তু এখনো তার সেই স্ফূর্ত্তি, সেই রঙ্গ-রস মরেনি। রোজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে যখন ঘরে গিয়ে বসতুম, দিনের বেলায় যে-সব ব্যাপার ঘটেছে তাতে মজার মজার টিপ্পনি কেটে সে আমায় হাসাত। একএকসময় আমার হাসি কান্নায় গিয়ে শেষ হত। তখন সে সাধুপুরুষদের ছবিতে যেমন আছে তেমনিধারা হাত জোড় করে উপর দিকে চেয়ে বলত—"তোমার সকল দুঃখ দূর হোক—তোমার সকল কষ্টের অবসান হোক!" বলে সে মাটিতে হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করতে বসত। তার মাটি-ছেড়ে ওঠবার আগেই আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়তুম।

রান্নাঘরের কাজে ভারি মেহনৎ ছিল। সেই বড়-বড় হাঁড়িগুলো মাজা, টালির

মেঝে ধোয়ামোছা, মেলানির সঙ্গে-থেকে আমি করতুম। প্রায় সবটা সে নিজে একাই করত। পুরুষমানুষের মতন তার সামর্থ্য ছিল। আমাকে সে বেশি খাটতে দিত না। যেমন দেখত আমি একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছি অমনি আমায় জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিত; বলত—"এইবার তোমার জিরেনের সময়!" আমার এখানে আসবার দু-একদিন পরেই সে আমার মনে পড়িয়ে দিলে যে তার সেই স্কুলের পড়ামুখস্থ করতে কী মুস্কিল হত। সে এখনো ভোলেনি যে একটা বছর আগাগোড়া আমি খেলার সময় খেলা না করে তার পড়া মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি। তাই বোধ হয় এখন সে আমায় এই বিশ্রাম দিয়ে খুসি বোধ করছে।

ভেরোনিকের কাজ ছিল কুট্‌নো কোটা। এ-ছাড়া সে কসাইয়ের কাছ-থেকে মাংস দেখে নিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কসাই-ছেলেদের পাল্লায় মাংস তোলা শেষ হত, সে ওজনের সাম্‌নে গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মাংস নিয়ে তার ঝগড়ার অন্ত ছিল না; হয় বলত মাংস-গুলো আজ বেজায় বড়-করে কাটা হয়েছে, নয় বলত বেজায় ছোট হয়েছে। কসাই-ছেলেরা মাঝে-মাঝে রেগে উঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিত। শেষে একদিন সিষ্টার আঁজ্ আমায় বল্লে, এবার থেকে তোমায় মাংস দেখে নিতে হবে। পরের দিন ভেরোনিক যথা-সময়ে ওজনের সামনে এসে হাজির; কিন্তু আমি তার আগেই এসে সিষ্টার আঁজের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েছি;—সে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে কেমন-করে ওজন দেখে নিতে হয়।

(১৬)

একদিন সকালে কসাই-ছেলেদের মধ্যে একজন আমার পানে চেয়ে আমার নাম করলে। সিষ্টার আঁজ্ ও আমি তার দিকে অবাক হয়ে চাইলুম। সে-ছেলেটা নতুন এসেছিল। আমি দেখেই তাকে চিনতে পারলুম। সে জাঁ-ল্যা-রুজের বড়-ছেলে। আমাকে দেখে সে আহ্লাদ করতে লাগল। সে বল্লে তার বাপ দেলোয়াঠাকরুণের বাড়িতে বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে। চাষের কাজ তার মনের মতন হলনা বলে সে নিজে সহরে এসে এক কসাইয়ের দোকানে ঢুকেছে। তার পর সে বল্লে যে দেলোয়া-ঠাকরুণের বাড়ি ভিলেভিয়েইর খুব কাছে। বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে আমি সে বাড়ি চিনি কি-না। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ—চিনি। সে বলে যেতে লাগল যে তার বাপ-মা আজ কয়েক মাস হল সেখানে আছে; গেল-সপ্তাহে সেখানে খুব-একটা বড় ভোজ হয়ে গেছে—আঁরির বিয়ে হয়ে গেল তাই। তারপর আরো-কতকগুলো কি কথা আমার কানে এসে লাগলমাত্র--কিছুই বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ রান্নাঘরের মধ্যেকার দিনের আলো অমাবস্যার রাত্রের মতন অন্ধকার হয়ে এল; বোধ হ'ল পায়ের তলা থেকে মেঝের টালি সরে গিয়ে আমি যেন অতল গহ্বরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। দেখলুম সিষ্টার আঁজ্ আমাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে এল, কিন্তু কি-একটা জানোয়ার আমার বুকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছিল—তার করুণ কাৎরানিতে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। সে যেন ঠিক ফুঁপিয়ে-

ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দের মতন—প্রত্যেকবারই একজায়গায় এসে থামছিল। তার পর হঠাৎ আবার আলো ফিরে এল, সিষ্টার আঁজ ও মেলানির মুখ আমার শিয়রে দেখতে পেলুম। দুজনেরই মুখে উৎকণ্ঠা-জড়ানো মৃদু হাসি। মেলানির সেই পূরোক্ত গোলাপি মুখখানা সিষ্টার আঁজের শীর্ণ ফেকাশে মুখের মতনই দেখাচ্ছিল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে উঠে বসলুম—এই দিনের বেলায় বিছানায় শুয়ে কেন? জাঁ-ল্যা-রুজের ছেলের কথা আমার মনে পড়ে গেল; ঘণ্টার পর ঘণ্টা-ধরে আমার হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে আমার লড়াই চলতে লাগল।

রাত্রে শোবার সময় সিষ্টার আঁজ্ ঘরে এসে আমার বিছানার পাশতলায় বসল। সাধু-মহাত্মাদের মতন হাতদুটি জোড় করলে; বল্লে—"তোমার কি দুঃখ আমায় বল।" আমি তাকে সব বল্লুম। বলতে বলতে মনে হতে লাগল যেন আমার প্রত্যেক কথার সঙ্গে আমার দুঃখের খানিকটা করে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

যখন সব বলা হয়ে গেল সিষ্টার আঁজ "ইমিটেশন অফ্ ক্রাইস্ট" এনে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। সে ধীর, হতাশ সুরে পড়ে যাচ্ছিল; তারমধ্যে এমন-এক-একটা কথা ছিল যা হাহাকারের শেষ-রেশের মতন কানে এসে লাগতে লাগল।

এখন থেকে জাঁ-ল্যা-রুজের ছেলের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। সে দেলোয়াঠাকরুণের বাড়ি "লষ্ট ফোর্ডের" অনেক গল্প আমায় শোনাত। সে যখন বলে যেত তার বাপ-মা সেখানে কেমন সুখে আছে, তাদের মনিব তাদের কত যত্ন করে, তখন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত পাহাড়ের উপর-কার সেই ছোট বাড়িটি—সেই ফুলে ভরা বাগান, সেই ছোট ঝরণা—যা ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে গড়িয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছে। ঐখানকার গল্প আমি আঁজ্‌কে প্রায়ই বলতুম; সে স্তব্ধ হয়ে শুনত। আশ পাশের সব জায়গা—সেখানকার নাড়ি-নক্ষত্র সমস্ত সে জানত। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি ভাবছ? সে বল্লে, আমি ভাবছি, গ্রীষ্ম শীঘ্রই শেষ হয়ে আসবে, কিন্তু ঐ গাছগুলো ফলে-ফলে ভরে রয়েছে।

(১৭)

সমস্ত সেপ্টেম্বর মাসটা ধরে, যাঁরা ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন অনেক মেয়ে গুরুমায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগলেন। তাঁরা যেমন-যেমন আসতেন "গোরুচোখী" ঘণ্টা বাজিয়ে খবর দিত। প্রত্যেক ঘণ্টার শব্দে ভেরোনিক্ বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসত, কে এলেন। যাঁদের সে চিনত তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু নিন্দের কথা সে বলতই। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা বেজে উঠল। ভেরোনিক্ বাইরের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"যাকে কেউ কোনো দিন প্রত্যাশা করেনি—তিনিও যে এলেন দেখছি!" বলে সে রান্নাঘরের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে নিয়ে বল্লে—"আমাদের মারি এমে এলেন!" আমি তখম হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছিলুম, সেখানা হাত-থেকে পিছলে হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গেল। আমি

ঊর্দ্ধশ্বাসে দরজার কাছে ছুটে গেলুম। ভেরোনিক আমাকে ধরতে, তাকে সজোরে এক ঠেলা মারলুম। মেলানি আমার পিছনে ছুটে এসে বলতে লাগল—"যেয়োনা যেয়োনা, গুরুমা এখনি দেখে ফেলবে।" আমি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একেবারে মারি এমের গায়ের উপরে এমন জোরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম যে দুজনেই আর-একটু হলে পড়ে যেতুম। তিনি আমাকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল,—আনন্দে যেন পাগলের মতন হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের মধ্যে আমার মাথাটি রেখে, যেন আমি এখনো কচি-মেয়ে এমনি করে আমার মুখ-ভরে চুমু খেতে লাগলেন। তাঁর মাথার সুতির শক্ত টুপিটা কাগজের মতন খড়খড় শব্দ করতে লাগল, এবং তাঁর জামার আস্তিন উল্টে কাঁধের উপর গিয়ে পড়ল। মেলানি ঠিক বলেছিল;—গুরুমা আমাকে দেখে ফেল্লেন। তিনি উপাসনা মন্দির থেকে বেরুলেন, বেরিয়ে আমাদের দিকে এলেন। মারি এমে তাঁকে দেখতে পেলেন, অমনি আমাকে চুমু খাওয়া তাঁর বন্ধ হয়ে গেল—তিনি আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন। আমি তাঁকে দু-হাত দিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরলুম—পাছে কেউ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে গুরুমাকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। তিনি আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন—চোখ তুল্লেন না; মারি এমে তাঁকে গম্ভীরভাবে একটা নমস্কার করলেন; কিন্তু তিনি দেখলেন বলে মনে হল না।

যেমন গুরুমা চলে গেলেন, আমি টানতে-টানতে মারি এমেকে সেই পুরোনো বেঞ্চিখানার কাছে নিয়ে গেলুম। বেঞ্চির সামনে তিনি চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন; বসবার আগে বল্লেন—"দেখে মনে হচ্ছে যেন এই সব জিনিষগুলো আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল।" বলে তিনি বসে পড়লেন। সেই গাছটার গায়ে হেলান দিলেন। আমি তাঁর পায়ের তলায় ঘাসের উপর হাঁটু-গেড়ে বসলুম। তাঁর চোখে আর সেই জ্যোতি নেই—সেই বিচিত্র রঙের আভা যেন একসঙ্গে ঘুলিয়ে গেছে। তাঁর সেই সুন্দর ছোট্ট মুখখানি আরো ছোটো হয়ে এসেছে, এবং মনে হচ্ছে যেন টুপির ভিতর তা আরো সেঁধিয়ে গেছে। তাঁর সেই সুন্দর গড়ন একেবারে ভেঙে পড়েছে; হাত দুখানি এত রোগা হয়ে গেছে যে নীল-নীল শিরার দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের ঘরের জানলার দিকে তিনি বড় চোখ-দিচ্ছেলেন না; গাছগুলোর উপর দিয়ে এবং উঠানের চারপাশে তাঁর চোখ ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ যেমন গুরুমায়ের বাড়ির দিকে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল তিনি দীর্ঘশ্বাসের মতন করুণ অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—"আমরা নিজেরা যদি ক্ষমা চাই, তবে অপরকেও আমাদের ক্ষমা করতে হবে।" বলে আমার দিকে আবার ফিরে চেয়ে বল্লেন—"তোমার চোখ দেখছি বিষাদে ভরা।" বলে তিনি আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন আমার চোখের উপরকার কি-একটা জিনিষ তাঁর ভালো লাগছে না বলে তিনি মুছে ফেলে দিতে চান। তাঁর হাত আমার দৃষ্টি বন্ধ করে

চোখের উপর পড়ে রইল। তিনি বল্লেন —"আমাদের এ কী দুঃখ ভোগ!" তারপর আমার চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন, আমার মুখের উপর চোখ রেখে এমন সুরে বল্লেন, যেন প্রার্থনা করছেন—তিনি বল্লেন— "লক্ষ্মী-মা আমার, বলি শোনো, কখনো এই যেমন-তেমন-গোছের ধর্ম্মসেবিকা হয়োনা।" তারপর একটা অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতে লাগলেন—"আমাদের এই সাদা-কালো পোষাক দেখে লোকেরা মনে করে আমরা শক্তির আধার, আনন্দের উৎস। আমাদের কথায় সকলের চোখের জল শুকোয়, জগতে যারা দুঃখী, সান্ত্বনা পাবার জন্যে আমাদের কাছে আসে, কিন্তু আমাদেরও যে দুঃখ থাকে একথা কারোর মনেই হয় না।—আমরা যেন কাঠের পুতুল।" এই-সব বলবার পর তিনি ভবিষ্যতে কি করবেন সেই সব কথা বলতে লাগলেন। তিনি বল্লেন—"পাদরিরা যেখানে যায়, আমি এখন সেইখানে যাবো। সেখানে আমায় এমন একটা বাড়িতে থাকতে হবে যেখানে আছে কেবল ভয়। যাকিছু ভয়ানক, যা বীভৎস, যা বিশ্রী, যা মন্দ তাই কেবল আমার চোখের সামনে অনবরত ঘটতে থাকবে।" আমি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল তাঁর এই কথার ভিতরে ভারি-একটি আবেগের সুর রয়েছে—যেন জগতের সমস্ত দুঃখের ভার তিনি নিজের মাথায় তুলে নিতে যাচ্ছেন। আমার হাত থেকে তাঁর হাতের আঙুল আল্‌গা হয়ে এল, আমার গায়ের উপর হাত বুলিয়ে তিনি স্থির স্নিগ্ধ স্বরে আমায় বল্লেন—"তোমার মুখের এই পবিত্রতাটুকু আমার মনে চিরদিন আঁকা থাকবে।" বলতে-বলতে তাঁর দৃষ্টি আমাকে ছাড়িয়ে দূরের দিকে চলে গেল। তিনি বল্লেন— "ভগবান আমাদের স্মৃতি দিয়েছেন, কারো সাধ্য নেই আমাদের সে-সম্পদ কেড়ে নেয়।" বলে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমি তাঁর সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে গেলুম। তারপর "গোরুচোখী" যখন তাঁকে বার করে দিয়ে প্রকাণ্ড ফটকটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে আমি দাঁড়িয়ে শুধু তার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলুম।

সেদিন রাত্রে সিষ্টার আঁজ্‌ অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরী করে ঘরে এল। মারি এমে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে যাচ্ছেন বলে সে দিন যে বিশেষ-উপাসনা হল তাতে সে যোগ দিতে গিয়েছিল।

(১৮)

আবার শীত ঘুরে এল। সিষ্টার আঁজ্‌ জানতে পেরেছিল যে আমি বই পড়তে ভালোবাসি। সে লাইব্রেরী থেকে আমার জন্যে এক-এক-করে সব বই আনতে লাগল। অধিকাংশই ছেলেমানুষী বই। আমি হু-হু-করে পড়ে যেতুম—এক-সঙ্গে খানকতক-করে পাতা উল্টে-উল্টে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বই আমার সব চেয়ে ভালো লাগত— আমি রাত জেগে প্রদীপের আলোয় পড়তুম। সিষ্টার আঁজ্‌ যখন হঠাৎ ঘুম-ভেঙে জেগে উঠত আমাকে তিরস্কার করত, কিন্তু সে যেমনি ঘুমিয়ে পড়ত আমি আবার বই তুলে নিতুম। একটু-একটু-করে আমাদের বন্ধুত্ব

জমে উঠছিল। রাত্রে সেই সাদা পর্দার আড়াল আর ছিল না। আমাদের দুজনের মধ্যে সকল বাধাবন্ধ ঘুচে গিয়েছিল; —আমাদের মনের ভাবনা একই ধারায় চলেছিল। সর্ব্বদাই তার ফুর্ত্তি, তার জ্বল্‌জ্বলে ভাব। কেবল একটি জিনিষ যার জন্যে তার খুঁৎখুঁতুনি ছিল তা হচ্ছে তার সেই ধর্ম্ম-সেবিকার পোষাক। এ পোষাক তার গায়ে বড় ভারী ঠেকত, অসোয়াস্তি হত—মনে হত যেন গায়ে বিঁধচে। সে বলত, আমি যখন এই পোষাক পরি তখন আমার মনে হয় যেন একটা ঘোর অন্ধকার বাড়ির মধ্যে গিয়ে সেঁধলুম। রাত্রিবেলা কাপড় ছাড়বার সময় হলে সে ভারি খুসি হত—রাত্রের কাপড় পরে ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে তার আনন্দ দেখে কে! সে সেই মজার-রকম মুখভঙ্গী করে বলত—"ক্রমেই আমার সয়ে আসছে, কিন্তু প্রথম-প্রথম মনে হত টুপিটা যেন আমার গাল দুটোকে চেপ্‌টে ধরেছে, পোষাকের ভার আমার ঘাড়টাকে নীচের দিকে চেপে দিচ্ছে।

বসন্তকাল আসতেই সে খুক-খুক করে কাশতে আরম্ভ করলে। তার শুকনো কাশি ছিল; মধ্যে মধ্যে তা কঠিন হয়ে উঠে তার সেই দীর্ঘ পাতলা দেহটিকে একেবারে শীর্ণ করে ফেলত। তার সেই ফুর্ত্তি, সেই জ্বল্‌জ্বলে ভাব আগের মতন সমান বজায় ছিল বটে কিন্তু সে বলত তার পোষাকটা যেন ক্রমেই আরো ভারি হয়ে উঠছে।

(১৯)

মে-মাসের এক রাত্রে সে ছট্‌ফট্‌ করে স্বপ্নে বিড়-বিড় করে বকতে লাগল। আমি সমস্ত রাত্রি ধরে বই পড়ে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ চমকে উঠে দেখি ভোরের আভা ফুটে উঠেছে। আমি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। বিছানায় গড়াতে যাচ্ছি এমন সময় সিষ্টার আঁজ্‌ বলে উঠল—"জানলাটা খুলে দাও—আজ তিনি আসবেন।" সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বকছে কি-না দেখবার জন্যে আমি উঁকি মারলুম। কিন্তু দেখি সে বিছানায় উঠে বসেছে, গায়ের কম্বল ঠেলে ফেলে দিয়েছে, রাত-টুপিটার ফিতে বসে-বসে খুলছে। টুপিটা খুলে সে পাশ্‌তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর মাথাটা ঝাড়া দিতেই তার সেই ছোট্ট চুলের গোছা কপালের উপর কুঁকড়ে-কুঁকড়ে ছড়িয়ে পড়ল। এ দেখি আমাদের সেই ছেলেবেলাকার দেজিরে জোলি যেন আবার ফিরে এল! আমার কেমন-একটু ভয় করতে লাগল, আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। সে আবার বল্লে—"জানলা খোলো; তাঁকে আসতে দাও।" আমি জানলাটা একেবারে খুলে দিলুম; ফিরে দেখি সিষ্টার আঁজ্‌ হাত-দুটি জোড় করে সূর্য্যের দিকে তুলে ধরেছে; হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে এমন কণ্ঠস্বরে সে বলে উঠল—"আমার পোষাক খুলে ফেলেছি। আর সহ্য করতে পারলুম না।" বলে সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল;—তার মুখের ভাব একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শোনবার জন্যে খানিকক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমার শ্বাস ঘন ঘন পড়তে লাগল—যেন আমার এই শ্বাস তাকে দিয়ে দিতে চাইছিলুম। তার পর যখন কাছে গিয়ে

ভালো-করে দেখলুম, তখন দেখি তার শেষ-নিশ্বাসটি ফেলা হয়ে গেছে। তার চোখ সম্পূর্ণ খোলা—মনে হচ্ছিল ঐ যে সূর্য্যের রেখাটি তীরের মতন তার কাছে ছুটে আসছে, সে তারই দিকে চেয়ে আছে। গোটাকতক ছোটো পাখী জানলা দিয়ে একবার উড়ে গেল, আবার ফিরে এসে ছোট মেয়েদের মতন কিচ্-কিচ্ কলরব করতে লাগল। আমার কানের কাছে কত-রকম যে অজানা-অশোনা শব্দ হতে লাগল তা বলতে পারি না। আমি স্কুল-বাড়ির শোবার-ঘরের জানলার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলুম—যদি কাউকে দেখতে পাই ত বলি। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না—কেবল দেখলুম সেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা মুখ নীচু করে গাছের উপর দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে চাইছে।

তখন ভোর পাঁচটা। আমি কম্বলখানা সিষ্টার আঁজের গায়ের উপর টেনে দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার জন্যে ঘর-থেকে বেরিয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ ধরে বাজাতে লাগলুম। তার শব্দের রেশ দূর থেকে দূরে যেতে লাগল। সিষ্টার আঁজ যেখানে গেছে সেই শব্দও যেন সেইখানে গেল। আমি ক্রমাগতই বাজিয়ে যাচ্ছিলুম—কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে এই ঘণ্টার শব্দ পৃথিবীময় প্রচার করে বেড়াচ্চে সিষ্টার আঁজ্ আর নেই। আমি আরো বাজাচ্ছিলুম এই আশায় যে সে তার সেই সুন্দর মুখখানি জানলা দিয়ে বাড়িয়ে এখনি বলে উঠবে—"হয়েছে হয়েছে আর নয়—মারি ক্লেয়ার, খুব হয়েছে!"

মেলানি হঠাৎ আমার হাত থেকে ঘণ্টার দড়িটা কেড়ে নিলে। ঘণ্টাটা তখন দুলে উঁচু হয়ে উঠেছে,—বেচাল হয়ে পড়ে কাতর-ধ্বনির মতন একটা শব্দ করে উঠল। মেলানি বল্লে—"তুমি প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছ।" আমি বলে উঠলুম—"সিষ্টার আঁজ্ যে মারা গেছে।" আমাদের পিছনে পিছনে ভেরোনিকও এসে ঘরে ঢুকল। সে লক্ষ্য করে-করে দেখতে লাগল যে আমাদের দুজনের বিছানার মধ্যেকার সেই সাদা পরদাটা খোলা রয়েছে। সে বলতে লাগল—"মাগো, যে ধর্ম্মসেবিকা হয়েছে তার কি এমনি-করে মাথার চুল দেখাতে আছে?—ছি ছি কী ঘেন্নার কথা!" মেলানির দুই-গালে দুই-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল, সে তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে চুপি চুপি বল্লে—"কী সুন্দর দেখাচ্চে ভাই—আগেও এত রূপ ছিল না।" সূর্য্যের কিরণে তখন সমস্ত বিছানা একেবারে ভেসে গেছে,—সিষ্টার আঁজের সর্ব্বাঙ্গ তার সোনালি আভায় ভরে উঠেছে।

সমস্ত দিন আমি তার কাছটিতে রইলুম। সিষ্টারদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে দেখতে এলেন। একজন একটুকরা কাপড় দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিলেন। কিন্তু যেমন তিনি চলে গেলেন আমি তৎক্ষণাৎ তা খুলে দিলুম। মেলানি রাত্রিবেলা এসে সেই বিছানার পাশে আমার সঙ্গে বসে রাত কাটালে। ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে সে বড় আলোটা জ্বাললে, বল্লে—"আমাদের আঁজকে অন্ধকারের মধ্যে থাকতে দেব না।"

(২০)

একসপ্তাহ পরে একদিন গোরুচোখী রান্নাবাড়িতে এল, আমাকে বল্লে, তৈরি

হয়ে নাও, আজই তোমাকে যেতে হবে। তার হাতের মুঠোয় দুটো মোহর ছিল; সেই দুটো মোহর বড় উনুনটার এক-কোণে পাশা-পাশি রেখে একটার পর আর-একটার উপর আঙুল দিয়ে-দিয়ে বল্লে—"আমাদের গুরুমা তোমাকে এই দুই মোহর পাঠিয়ে দিয়েছেন।" কোলেৎ এবং ইসমেরির কাছে একবার বিদায় না নিয়ে আমার যাবার ইচ্ছে হচ্ছিলনা—তাদের দুজনকে উঠোনের ঐ ওপারে প্রায়ই দেখতুম। মেলানি কিন্তু বল্লে, কেন তাদের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ? তারা কেউ তোমায় মনেও করেনা। কোলেতের এই রাগ যে আমি এখনও বিয়ে করিনি কেন? আর ইস্‌মেরি এখনো ভুলতে পারিনি যে আমি মারি এমেকে ভালো বলতুম ও ভালোবাসতুম।

মেলানি আমার সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত এল। সেই পুরোনো বেঞ্চিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম তার একটা পায়া ভেঙে গেছে,—একদিকটা তার ঘাসের উপর কাৎ হয়ে পড়েছে। ফটকের সামনে দেখলুম একজন মেয়েমানুষ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার চাহনি ভারি কর্কশ। সে বল্লে—"আমি তোর দিদি।" আমি তাকে চিন্‌তে পারলুম না। এই বারো বচ্ছর তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। ফটক থেকে বেরতেই সে আমার হাত ধরলে; তার চাহনি যেমন কর্কশ তেমনিধারা কর্কশ কণ্ঠে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তোর কাছে কত টাকা আছে? আমি তাকে সেই সোনার মোহর দুটো দেখালুম। সে বল্লে—"তোর সহরে থাকাই ভালো—কাজকর্ম্মের সুবিধা করে নিতে পারবি।" তারপর আমরা চলতে-চলতে সে বল্লে যে এই কাছাকাছি এক জায়গায় সে থাকে; এক মালির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখন আমার ঝক্কি সে আর পোয়াতে পারবে না। আমরা ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম। আমাকে সে প্ল্যাটফর্ম্ম অবধি নিয়ে গেল—কারণ তার কয়েকটা জিনিষ বহে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। গাড়ি ছেড়ে দিতে সে শুধু বল্লে—"চল্লুম।" গাড়ি চলতে লাগল, আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। তৎক্ষণাৎ আর-একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। রেলের লোকেরা প্ল্যাটফর্ম্মের এধার-ওধার দৌড়াদৌড়ি করে পারি যাবার যাত্রীদের ডাকাডাকি করতে লাগল। সেই মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল পারি সহর—তার সেইসব বড়-বড় বাড়ি যা দেখতে রাজপ্রাসাদের মতন, যার চূড়ো মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। একজন ছোকরা হঠাৎ আমার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি পারি যাবেন?" বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আমি বলে ফেল্লুম—"হাঁ যাবো, কিন্তু আমার টিকিট কেনা হয়নি।" সে বল্লে—"দাম দিন, আমি এখনি কিনে এনে দিচ্চি।" আমি তার হাতে আমার সেই মোহর থেকে একটা দিলুম;—সে ছুটে চলে গেল। তারপর টিকিট আর মোহর-ভাঙানি বাকি পয়সা আমাকে এনে দিলে, আমি সেগুলো পকেটে পুরে তার সঙ্গে রেল-লাইন পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

প্রায় মিনিটখানেক সেই ছোকরা গাড়ির

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, চলে গেল; —যাবার সময় একবার ফিরে দেখলে। তার চোখে ভারি একটি মিষ্টিভাব মাখানো ছিল—ঠিক আঁরির চোখের মতন।

রেলের বাঁশি সজোরে একবার বেজে উঠল—যেন আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে। তারপর গাড়ি ছেড়েই টানাসুরে বাঁশি আবার-একবার ফুকরে উঠল—বুক-ফাটা কান্নার মতন!

সমাপ্ত। *

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবাস-স্মৃতি

আমরা পঞ্জাব মেলে যাত্রা করে, পরদিন রাত্রি দশটায় আগ্রা পৌঁছলাম। গাড়ী ছাড়বামাত্র একজন সহযাত্রীর হাতের উপর জানালা হঠাৎ পড়ে গিয়ে একটি আঙুলে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেলেন, রক্তে চারিদিক ভেসে গেল। যাত্রার মুখেই এ অঘটন দেখে সবারি মন বড় দমে গেল, যাই হোক, নিরাপদে এসে পৌঁছন গিয়েছে। ষ্টেশন ছাড়িয়ে সহরের মধ্যে দিয়ে যখন আস্‌ছি, আমি বুঝতে পারলাম যে, বহুদূরে এসেছি, আর আমাদের বঙ্গ-দেশের রাজধানী হ'তে এই প্রাচীন মোগল রাজধানী খুবই বিভিন্ন। রেলপথে আস্‌তে আস্‌তে দৃশ্য যেমন বিচিত্র নূতন দেখব মনে করেছিলাম, তা দেখ্‌লাম না। বাংলা দেশের মতই চারিদিক সবুজ মনে হ'ল, তবে এটা এবারকার প্রচুর বর্ষার জন্যে হয়েছে কিনা জানিনা। পাটনায় ভোর হ'ল। সূর্য্যোদয়ের আকাশ বড় সুন্দর হয়েছিল। ধোঁয়াটে-নীল; ঘন মেঘের গায়ে, পানের পিকের মত মরা মরা নারাঙ্গী-রাঙা আকাশ বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল। বাড়ী-ঘর আমাদের বাংলা দেশের থেকে তফাৎ। বাঁকীপুরে অনেক নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ হচ্ছে, সবই হাল-ফেশানের। ইউরোপের এই যুদ্ধের দিনে যখন, অদৃষ্ট সবারি তুলাদণ্ডে পরিমাপ হওয়া সমাপন হয়নি, তখন এই নূতনের আয়োজন বড় করুণ মনে হ'ল। ভাগ্যবিধাতা কি বিধান করবেন, তা তো অজ্ঞেয়, কিন্তু মানুষের আশার অন্ত নাই, নূতনকে ভুলে থাকৃতে পারেনা; যে অজানিত, সে যে কি রহস্যের টানে মনকে সম্মুখের দিকে টেনে নিয়ে চলে; তা বোঝা সহজ নয়। মানুষ যদি অতীতে অভিভূত হয়ে, বর্ত্তমানে

---

* Margaurite Audoux প্রণীত Marie Claire নামক গ্রন্থের অনুবাদ। ফরাসী-সাহিত্যে এ একখানি নামজাদা বই। লেখার সহজ সরল আবেশময় ভঙ্গীর বিশেষত্বটুকুর জন্য ইহার বেশি আদর। পাশ্চাত্য সমালোচকের দ্বারা এখানি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত এবং Vie Heureuse Committee কর্ত্তৃক বৎসরের শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে পুরস্কৃত।

স্থবির ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পঙ্গু হয়ে থাকত, তাহলে জগৎ-গতি স্থগিত হয়ে যেত। তাই মানুষের মন অহেতুকী সংস্কার-বশতঃই সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে, কিম্বা বাধ্য হয়েই যেতে হয়। অতীতের দিকে পিছিয়ে যাবার যে যো-ই নেই! যে মানুষের মন ও জীবন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে বিধাতার হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার হয়েছে বল্‌তে হবে।

আমাদের এ বাড়ীটি সহর হতে অনেক দূরে, খুব নির্জ্জন ও শান্তিময়। সারাদিন ধরে কেবলি ঘুঘু ডাকে, বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা এই বাড়ীখানি, যেন একখানি কুলায়, বড় নিভৃত। আকাশে মেঘ নেই, স্বচ্ছ নীল, সূর্য্যালোকে অতি পরিষ্কার, তার কোথাও কোন আবেশ নেই; ঘুমের ছায়া কি স্বপনের আবছায়া কিছুই নেই। এই দীপ্ত আলোকে গাছপালাগুলিকে নিস্পন্দ স্থির হয়ে থাকৃতে দেখে মনে হয় তারা জ্যোতির ধারণা করে প্রাণসঞ্চয় করছে। আমারও মনটাকে অম্নি একান্ত আগ্রহে আলোর দিকে নিচেষ্টভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, আমিও আমার দেহ-মনের প্রত্যেক অণু পরমাণু দিয়ে জ্যোতির সাধনা করছি, আমিও প্রাণ-শক্তি সঞ্চয় করতে পারব।

আজ আমরা সহরের কতক অংশ আর তাজমহল দেখে এলাম। এখানকার পথ-ঘাট খুব প্রশস্ত ও পরিষ্কার, নিজ সহরের ছাড়া, একটু দূরের এই বাড়ীগুলিতে, অনেকখানি করে জমি আর বাগান আছে। তাই সহরের ধুলো আর কলরব দুইই দূরে থাকে। আমরা যখন তাজমহলের দ্বারস্থ হ'লাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্থীর চাঁদের আলো অস্পষ্ট। তাই স্বল্প আলোকে সবই আকারবিশিষ্ট মনে না হয়ে ভাবের আভাসের মত মনে হ'ল। তাজের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দূরে বড় গম্বুজটি আকাশের গায়ে সাদা মেঘস্তূপের মত দেখাচ্ছিল, সে যে ভারী, বড় বড় পাথরে গঠিত, তা মনে হয় নি, সে যেন ধূমবর্জ্জিত শুভ্র বাষ্পের, যার সঙ্গে পৃথিবীর ধূলোর কোন সম্পর্ক নেই। তাজ নিঃস্বার্থ ভালবাসার মত পবিত্র শুভ্র, একাগ্র কামনার মত অটল দৃঢ়, পাষাণ হয়েও ফুলের মত সুকুমার। তারি মত চির-সুন্দর, কত যুগ যুগান্ত গত হয়ে গিয়েছে, তবু তার সৌন্দর্য্য অখণ্ড। এ যেন শিবের জন্যে পাষাণতনয়া গৌরী পার্ব্বতীর সাধনা। প্রার্থিতের অপার্থিব সৌন্দর্য্য একে স্বর্গীয় করেছে। কৌমুদী-কর-স্নাত, পতিতপাবনী গঙ্গাধারায় বিধৌত; মহাদেবের অমল লাবণ্যের মতই সুষমাময়। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তাই অন্তরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ফিরবার পথে গাড়ী বাজারের মধ্যে দিয়ে এল, সেখানে দোকানে স্তূপাকার করে সাজান আঙ্গুর আপেল নাস্‌পাতি দেখতে চোখে বড় ভাল লাগল। তরকারীও রাশীকৃত, কতরকমের সবুজের সমাবেশ। হাল্কা ধানী হ'তে আরম্ভ করে ক্রমে প্রগাঢ় মরকত-শ্যামে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আকবর সাহের সমাধি সিকান্দ্রা আমরা শনিবার বৈকালে দেখে এসেছি। সে

মথুরা যাবার পথে, পথটি বড় সুন্দর। কিছুদূর আগে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। পুকুরটি কম-করে ১০।১৫ বিঘা জমির উপরে, তার চারদিকে মিনারেট দেওয়া ২১টি জল-টুঙী আছে। ঘাটগুলি সুপ্রশস্ত, পুকুরে এখন বিন্দুমাত্র জল নেই, রাখাল গরু চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বর্ষায় কিছু জল জমে বোধ হয়। এরি কিছুদূরে রেল-লাইনের ধারে আকবর সাহের ভালবাসার ঘোড়ার কবর রয়েছে। কবরের উপর ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত; কালের তাড়নায় তার সাজ-সজ্জা আর কিছুই নেই, কাণদুটিও অন্তর্ধান, কেবল একখানি গোটাপাথর হ'তে ঘোড়ার যে মূর্ত্তি ভাস্কর গড়েছিলেন সে তেম্নি জীবিতের মতই আছে। এতদিনেও তার গায়ের বর্ণ ম্লান হয়নি। এরি কাছে একটি ধর্ম্মশালা ও দেববন্দির আছে, মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান। প্রাচীরের উপর কত ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নির্জ্জন শান্তিময় স্থান, বাতাসটি পরিষ্কার, পথখানি দুধারের ছায়ায় সুস্নিগ্ধ।

সিকান্দ্রা আকবর বাদশাহ নির্ম্মাণ করিয়ে ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল রাজ-পরিবারের সকলেরি সেখানে সমাধি হয়, তা হয়নি। চারিদিকে চারটি ফটক—বাগানের পরিমাণ এক্রোশ বিস্তৃত। সমাধি-প্রাসাদ চৌতলা। প্রত্যেক তলার চারিদিকে চারটি গম্বুজ, তারি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে হয়। একতলার চেয়ে দোতলা, তার চেয়ে তেতলা, সবচেয়ে চৌতলা ক্রমে ছোট হয়ে এসেছে। সব-নীচের তলায় একটি স্নিগ্ধ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আকবর বাদশাহের আসল সমাধি—সাদা পাথরের, একেবারে সাদাসিধে, তার গায়ে কোন কারুকাজ নেই। সুড়ঙ্গের মধ্যে কথা কইলে স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে দূরে দূরে মিলিয়ে যায়। দুদিকে দুটি জালি-কাটা ঝরোকা আছে, তাই দিয়ে অবিরাম ঝির-ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ঝাউগাছের সারির মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে, যেমন একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মত শব্দ শোনা যায়, এই বাতাসেরও তেম্নি বিষণ্ন উদাসীন ভাব আছে। এই কবরখানি বাড়ীটির ঠিক মাঝে, আশে-পাশে সম্মুখে রাজপরিবারের অনেকের সমাধি; তারি মধ্যে জাহাঙ্গীর নূরজাহানের দুই বৎসরের মেয়ের ছোট্ট কবরটি দেখে দুঃখ হল।

সেটি এম্নি করে তৈরি করেছে যে তার উপর ছোট চৌবাচ্চার মত জায়গায়, একমণ দুধ ভরে, সেকালে প্রতিদিন কাঙাল ছেলেদের মধ্যে সেটা বিলি করে দেওয়া হ'ত। এখন আর সে অনুষ্ঠান নেই। উপরে উঠ্‌লে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। দূরে যমুনা, তারি কোলের উপর হতে তাজের সাদা মেঘের মত গম্বুজগুলি দেখা যায়। উপরের চাতালটি সাদা পাথরের জালি-কাজ করা, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; বস্‌বার জায়গাগুলি সুন্দর, তাতে সাদা, কাল ও রঙীন পাথর-বসান লতাপাতার কাজ। কাজ সুন্দর, পরিপাটী, আড়ম্বর-হীন। বিচিত্র হয়েও সাম্যরক্ষা করেছে, কোনও আকার কি বর্ণ, নিকটের অপরকে পীড়া দিচ্ছে না। চৌতলার ছাদের উপর

আকবরের নকল গোর, এটি তিনি নিজেই করিয়ে গিয়েছিলেন। সমাধি-শিয়রে একটি স্তম্ভ, তারি উপরে একটি আধারে সোণার নকল গাছে আসল হীরক-কহিনূর ফলের মত সাজান ছিল। এখন সে গাছ কি ফল কিছুই নেই!

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের পর ভরতপুরের রাজা সূরযমল ১২ বৎসরের জন্যে মোগল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, সেই সময় জাঠেরা মুসলমান সম্রাটদের অনেক কীর্ত্তি নষ্ট করে। সিকান্দ্রার প্রবেশদ্বারের খিলানের চারিদিকে সুন্দর মীনার কাজের মত নানা বর্ণের বিচিত্র চিত্র করা ছিল; সেইখানে ঘাস পুরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, তাতেই অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যা নষ্ট হয়নি তারি নমুনা দেখে বাকী অংশটা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা, লর্ড কুর্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ এমন ব্যয়-বহুল যে করিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। আগে বুরুজ গম্বুজের মাথায় খাঁটি সোণার কলস আর অর্দ্ধচন্দ্র ছিল, এখন তার স্থানে গিল্টিকরা পিতল। যে সব মুসলমান প্রহরী মৌলভী আছে, তারা ত বলে, হিন্দুরাই সব নিয়ে গেছে। ঔরঙ্গজেব ধার্ম্মিকতার প্রবল আধিক্যে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রভৃতির অবমাননা করে ছিলেন, হিন্দুরা হাতে পেয়ে তাঁদের মৃতের সমাধিস্থানের অগ্নিসৎকার করেছিল। জাতি যখন জাতির বিরোধী হয়ে ধর্ম্মকে অপদস্থ করে, তখনই মনুষ্যত্বের পদবী হারিয়ে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়।

ফিরবার পথে চন্দ্রোদয় হল, সপ্তমীর আধখানা চাঁদ, কিন্তু কি পরিষ্কার জ্যোৎস্না! নির্জ্জন পথ, তাতে আলো-ছায়ার আলপনা, পত্রবহুল, স্তবকের মত ছত্রাকার নিম-গাছগুলি প্রথম উত্তর-বাতাসে সির সির করে কাঁপছিল। দুপাশে খোলামাঠ যেখানে দিগন্তে মিলিয়ে আসছিল, সেখানে হাওয়া-ধুতির মত হাল্কা কুয়াশার পর্দ্দা খাটান, চাঁদের আলোতে স্বচ্ছ মনে হলেও, সে সীমানার পর আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

কথায় বলে, "সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই"—সে রাম আর না থাক্‌লেও সেই রামের স্মৃতি এদেশের হিন্দুর মনে জীবন্ত জাগ্রতই আছে—বিশেষতঃ এই পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুর মনে, বিজয়ার দিনে প্রতিবৎসর রামলীলার অভিনয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমরা আজ রামলীলা দেখ্‌বার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, যমুনার ধারে একটি প্রকাণ্ড তাঁবু খাটান তারি সম্মুখে এ শোভা-যাত্রা হয়। সহরের মধ্য দিয়ে গাড়ীতে যাবার সময় স্পষ্টই বোঝা গেল, আজ পর্ব্ব দিন, সবারি সাজ-সজ্জায়, হাসিমুখের উজ্জ্বলতায় একটু বিশেষত্ব ছিল। যে কাঙাল, ছোট ছেলেটিকে নতুন পোষাক দিতে পারেনি, সে তাকে একটি লাল টুপি কিনে দিয়েছে, মুখখানি মুছিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে সীঁথে করে, সাজিয়ে কোলে কোরে নিয়ে চলেছে। পথের ধারে হিন্দুর দোকান পাট আজ বন্ধ, সবাই এই শোভা-যাত্রা দেখ্‌তে চলেছে। যমুনার ধারে গিয়ে দেখি অসংখ্য জনতা, কত লোক যে পায়ে হেঁটে চলেছে তার ধারণা হয় না, এক্কা, ঘোড়গাড়ী, হাওয়া-গাড়ী, সবই চলেছে। যেখানে গিয়ে আমাদের দেখবার

কথা, এ ভিড়ে আমাদের গাড়ী সে পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারল না আমরা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ করে গিয়েছিলাম, কাজেই গাড়ী দাঁড়াতে দিল না, প্রহরী বল্লে, "বিলম্বে এসেছ রুদ্ধ এবে দ্বার"—আমরা ফিরে এলাম। রামলীলা ইতিপূর্ব্বে মৃজাপুরে দেখেছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরে আসা গেল, যাবার সময় যে জনতা দেখে ছিলাম ফিরবার পথে তার চিহ্নমাত্র ছিলনা। নাগরিকগণ সব তখন যমুনাতীরে রামলীলার অভিনয় দেখছে দশমীর চন্দ্রালোকে চারিদিক সুন্দর উজ্জ্বল পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা, বিসর্জ্জনের ঔদাস্য বিদায়ের দুঃখে চারিদিক বৈরাগ্যময়। রাস্তা দিয়ে একটি অন্ধ ভিখারী লাঠী ঠক্‌ঠক্ করে চলে গেল, তার সেই অসমান লক্ষ্য-দণ্ডের কম্পমান শব্দ আমার বুকের উপর যেন বারবার আঘাত করতে লাগ্‌ল! হায় দৃষ্টিহীন, এত আলোর মধ্যেও তার সবই অন্ধকার!

নূরজাহানের বাপের সমাধি-মন্দির ও সিকান্দ্রা দেখে মনে হয়, এঁরা মৃত্যুকে স্বীকার করে দুঃখ-নম্র মনে এই স্মৃতি-গৃহগুলি নির্ম্মাণ করেছিলেন, সাদা পাথরের অতি নিড়াম্বর, কারুকার্য্যের বাহুল্য নেই। এই জীবনে মানব-আয়ত্তের অতীত যে শক্তি আছে, তাকে না মানা মনের শক্তির পরিচয় নয় দুর্ব্বলতার প্রমাণ। মৃত্যুর অসীম বৈরাগ্যকে স্মৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার অপরিমেয় চেষ্টার মধ্যে একটা আত্মম্ভরিতার ভাব প্রকাশ পায়, সেটা যেন দর্শকের মনকে পীড়িত করে। নূরজাহানের বাপের সমাধি জাহাঙ্গীর নির্ম্মাণ করিয়ে ছিলেন, এর উপরে তাজের মত গোল গম্বুজ নয় চৌকণা ঢালু ছাদ, ছবিতে দেখেছি, মধ্য এসিয়ার মন্দির ইত্যাদির উপর এই রকম আবরণ। এই সমাধি-গৃহের গঠন-পারিপাট্য ও আকারের সুষমা বড় হৃদয়গ্রাহী, একটি সুন্দর ছোট কবিতার মত, যেমন সংযত, তেমনি ভাবময়, প্রকাশ-ভঙ্গিটি একেবারে আত্মসমাহিত, তার মধ্যে এতটুকুও চাঞ্চল্য কি বাহুল্য নেই। যে সকল পণ্ডিত কারু শিল্পের মর্ম্মগ্রাহী তাঁরা অনেকে শিল্প-সৌন্দর্য্যের হিসাবে একে তাজের চেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে থাকেন। মন্দিরটি যমুনার ধারে, চারিদিকের বাগানটিও সুন্দর। আসল কবরের ঘরে সোণালি গেরুয়া রংএর মর্ম্মর পাথরে নূরজাহানের মা ও বাপের সমাধি ঢাকা, সেখানে প্রতিদিন নতুন করে ফুল সাজিয়ে দেয়; আর এমন চমৎকার ধূপ জালান হয় যে, ঘরে প্রবেশ করবামাত্র পূজার কথা মনে আসে।

প্রথম যেদিন তাজ দেখি, সেদিন আমি হতাশ হয়েছিলাম, হয়ত আশাতীতের আশা করেছিলাম তাই আশানুরূপ সুখ-টুকুও পেলাম না। একদিনে তাজ দেখা হয় না, বার বার দেখ্‌তে হয়; রাত্রিদিনের উদয়াস্ত কালের, চন্দ্রকিরণে আলো-ছায়ার বিচিত্র পর্য্যায়ে নানাভাবে দেখা আবশ্যক, তবে ক্রমে ক্রমে ভাবগ্রহ হয়, মন তার মনের কথাটি ঠিক্ ধরতে পারে। প্রথম যে দিন দেখি সে সময় সূর্য্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণ পক্ষ, চাঁদ তখনো উঠেনি, নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে সবই অস্পষ্ট ছিল,

তাজের অমন শুভ্রতা অনুমানও হয়নি। দ্বিতীয় দিন আবার যখন দেখ্‌লাম তখন সূর্য্য অস্ত যাবার সবে আয়োজন করেছেন, পশ্চিম আকাশ বর্ণ-সমারোহে মহিমান্বিত, পূর্ব্ব দিগন্তে সেই উজ্জ্বল তেজোদীপ্তি নম্র হয়ে, কোমল হয়ে সৌকুমার্য্যের আভাসে আপনাকে প্রতিভাত করছে। ভিতরে গিয়ে আবার আমরা সব দেখ্‌লাম, তাজের বহিরঙ্গণ হতে যমুনার স্রোতরহিত ম্রিয়মান ম্লান বুকের উপর আকাশের আলোর প্রতিচ্ছায়া ক্ষণিকের সৌন্দর্য্য অভিনয় করছিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হল, আমরা বাহিরে বসে একটু একটু করে আলোর প্রভাবে আকাশের স্বচ্ছনীল প্রচ্ছদ-পটের উপর তাজকে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবির মত ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম। আলো যত উজ্জ্বল হতে লাগ্‌ল তাজ যেন তার কঠিন মর্ম্মর মূর্ত্তি পরিহার করে, বাষ্প-সুকুমার হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যতক্ষণে তাজের প্রত্যেক অঙ্গ শোভা আলোর স্পর্শে অশরীরিরূপ ধারণ না করল, ততক্ষণ স্থির হয়ে বসে কেবলি দেখ্‌লাম। তাজ সুন্দর, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, স্থাপত্যের আশ্চর্য্য পরিচয়, তবু আমার মনে কোথায় যেন কি একটা অভাব রয়ে গেল। হয়ত আমার মনের গ্রহণ করবার শক্তি আপাততঃ স্তম্ভিত হয়ে আছে, আবার ভবিষ্যতে যদি আস্‌তে পারি, তবে এ অপূর্ব্ব মর্ম্মর-ছন্দে গ্রথিত কাব্যের ভাষ্য করে নিতে পারব। আজ চোখই দেখ্‌ল, মন কিছু পেলনা, কাব্যের শ্লোক পড়লাম শুধু ভাব হৃদয়ঙ্গম হলনা। তবে আলোক-স্নাত নীল আকাশ-সাগরে ভাসমান শুভ্র পদ্ম-কোরকের মত তাজের যে অনুপম সুন্দর ও সুকুমার শ্রী দেখলাম তার স্মৃতি মন হ'তে কখনো মুছে যাবেনা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিড়ম্বনা

এসে এসে বার বার শুধু ফিরে যাওয়া
পেতে পেতে কেমনে যে হয়নাক পাওয়া
এ কি বিড়ম্বনা!
দুঃখ নিশীথিনী মাঝে পরশ তোমার
এনেছে ফুলের বাস অন্তরে আমার
হ'য়েছে চেতনা
সুখের প্রভাতে কোথা তুমি আর আমি
না পাই খুঁজিয়া তোমা হে জীবনস্বামী,
শুধুই ছলনা?
এর চেয়ে না পাওয়া যে ছিল ওগো ভালো
ক্ষণিকের তরে কেন ও মুখের আলো
বুঝিতে পারি না—
এত পথ এসে এসে শুধু ফিরে যাওয়া
কি গভীর হাহাকারে বহে ক্ষুব্ধ হাওয়া
এ কি বিড়ম্বনা!

শ্রীলীলা দেবী।

গ্রীক আর্টের কথা

হোমারের কাব্য এবং ফিডিয়াসের ভাস্কর্য্য প্রাচীন গ্রীকজাতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ফিডিয়াসের ভাস্কর্য্যে আমরা প্রাচীন গ্রীকদের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখি; হোমার সেই সকল পাষাণ মূর্ত্তির মুখে কাব্যের ভাষা দিয়াছেন। আধুনিক গ্রীশভূমিতে অতীতের সেই প্রাচীন যোদ্ধারা আর বিদ্যমান নাই,—তাহারা এখন জীবন্ত আছে সাহিত্যে এবং শিল্পে—ইলিয়াডে এবং পার্থেননে! সাহিত্য-শিল্পের অমৃত-রসে যাহা নশ্বর ছিল, তাহা অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রীক-আর্টের মত বিচিত্র আর্ট জগতের আর-কোন দেশে দুর্লভ। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যেমন স্থাপত্য-কলায়, ইতালী যেমন চিত্রকলায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছিল, গ্রীশ তেমনি ভাস্কর্য্য-কলায় আপন মৌলিকতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

গ্রীশের পূর্ব্বে মিশর ও চাল্‌ডিয়াতে ভাস্কর্য্য-কলার প্রাথমিক চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ-দুটি দেশে ভাস্কর্য্যের বিশেষ-কিছু উন্নতি হয় নাই; কারণ, সেখানকার ভাস্কররা স্বাভাবিক বা সতেজ মূর্ত্তি গড়িত বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশ দেখাইতে পারিত না। আর্টে অখণ্ড সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, গ্রীশদেশে।

সেই প্রাচীন যুগে গ্রীশদেশে ভাস্কর্য্যকলা সকলদিকেই এতটা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে অদ্যাবধি আর-কোন দেশ তাহার সামনে সমানভাবে মাথা উঁচু করিতে পারে নাই। প্রতীচ্যে আজ-পর্য্যন্ত যত বিখ্যাত ভাস্কর জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই গ্রীক শিল্পীর অল্পবিস্তর প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু সে প্রভাবের ফলেও নকলিয়ারা গ্রাক আর্টের যথার্থ মহিমা বজায় রাখিতে পারেন নাই। গ্রীকদের বিরাট পরিকল্পনা এবং উদার আদর্শ অনুকরণে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে মাত্র। আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পরে ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও গ্রীক শিল্পের পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। তবে, ভারতবর্ষ গ্রীক আর্টের পদ্ধতি লইলেও, তাহার আদর্শ গ্রহণ করে নাই। গান্ধারে গ্রীক-প্রভাব এক সম্পূর্ণ ভিন্ন-আদর্শের নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এমন-যে গ্রীক শিল্প, যাহার বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তি আজও অটুট হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ লাবণ্য দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। গ্রীক ভাস্কর্য্যের যে-সব উদাহরণ কালের ও মানুষের অত্যাচার এড়াইয়া এখনো টিকিয়া আছে, সংখ্যায় তাহারা সামান্য। তাহার উপরে, ধ্বংসাবশিষ্ট যে-কয়টি মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদেরও বেশীর ভাগ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও মাথা নাই, কাহারও দেহ নাই। সুতরাং একালে সমগ্র গ্রীক শিল্পের পূর্ণ ধারণা করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার।

সুধু ভাস্কর্য্য-শিল্পে নহে,—চিত্রকলাতেও

গ্রীক পটুয়ারা সুপটু হস্তের ছাপ্ মারিয়া গিয়াছে। ভগ্নে-চূর্ণে পরিণত হইয়াও গ্রীশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের কিছু-কিছু নমুনা এখনো বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার চিত্রকলার প্রায়-সমস্ত চিহ্নই আজ মুছিয়া গিয়াছে। কেবল দু-তিনখানি পট ও খানকতক ভিত্তি-চিত্র ভাগ্যক্রমে কোনরকমে টিকিয়া যাওয়াতেই আমরা প্রাচীন গ্রীক চিত্রকরের অবাক-করা হাতের কাজ এবং মন-মজানো শ্রী-ছাঁদের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন গ্রীশের এই-সব ছবি যদি টিকিয়া থাকিত, আজ তাহাহইলে পৃথিবীর চিত্রকলা এর চেয়ে ঢের-বেশী শ্রীমৎ হইয়া উঠিত। কিন্তু যাহা যায়, তাহা যায়,—খেদে-পরিতাপে আর ত তা ফেরে-না!

খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে গ্রীক আর্টের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। Dr. Schliemann ঐ সময়টিকে Mycenaean Period বলিয়াছেন। এই যুগে গ্রীশ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে—বিশেষ-করিয়া ক্রীট ও এজিয়ান-দ্বীপপুঞ্জে, আর্টের চর্চ্চা সুরু হয়। তখনকার অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহার্য্য পাত্র প্রভৃতির উপরে সূক্ষ্ম শিল্পের যে পরিপাটি কারিকরি দেখা যায়, নির্দ্দোষ না হইলেও তাহা নয়নকে আহত করে না। Mycenae নামক স্থানে প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে-সমস্ত ভগ্নাবশেষ আছে তাহার মধ্যে আর্টেইয়াসের ধনাগারের প্রবেশ-পথ ও সিংহদ্বার, এই দুটিই বেশী বিখ্যাত।

কিন্তু সে যুগে ললিতকলার প্রথম যে মুকুল অঙ্কুরিত হয়, ভাল-করিয়া ফুটিবার আগেই রাজনৈতিক বিপ্লব তাহার ক্রমবিকাশে বাধা দেয়। এই সময় হইতেই গ্রীশে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ।

আসীরীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় প্রাচীন শিল্পিগণ হরেকরকমের শক্ত পাথরে মূর্ত্তি গড়িতে বাধ্য হইয়াছেন—কেননা, তাঁহারা হাতের কাছে মার্ব্বেল পাথরের যোগান পান নাই। কিন্তু গ্রীশদেশে শিল্পচর্চ্চার গোড়াগুড়ি হইতেই, সেখানকার ভাস্করেরা এই মস্ত সুবিধাটি পাইয়াছিলেন। মর্ম্মরপ্রস্তর স্বভাবতই কোমল ও সুন্দর; সেইজন্য ভাস্করদের কাজও যেমন সহজ হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের গড়া মূর্ত্তিগুলিও তেমনি-শীঘ্র সকলের নয়নরঞ্জন করিতে পারিত।

শিল্পক্ষেত্রে নামিয়াই গ্রীকরা আপনাদের প্রতিভা, কৃতিত্ব ও নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। তাহাদের সমকালিক অন্যান্য জাতিদের মত, গ্রীকরা তখনো স্বেচ্ছাচারী রাজা ও কুসংস্কারের গোলামী স্বীকার করে নাই। গ্রীক শিল্পীরা স্বভাবতই স্বাধীনতা ও নবীনতার ভক্ত এবং উন্নতিপ্রয়াসী ছিল। মানুষকে তাহারা মানুষরূপেই দেখিত—খোসখেয়ালে চলিয়া মানুষকে তাহারা কার্য্য ও কারণের বাহিরে লইয়া গিয়া ফেলিত-না। গ্রীক শিল্পের এই মতি-গতির নাম দেওয়া হইয়াছে Rationalism বা হেতুবাদ। স্বাধীনতার আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই হেতুবাদের মিল হওয়াতে, জগতে গ্রীক আর্ট অতুল্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমযুগের গ্রীকশিল্পে আমরা মিশরীয় ও আসীরীয় আর্টের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই; কিন্তু এ প্রভাব বেশীদিন টেঁকে নাই। মিশরীয়

আর্টে রমণী-মূর্ত্তির পা-দুটি এমন ভাবে থাকিত —যেন তাহা একটি খাপের মধ্যে বদ্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া আছে। আর, আসীরীয় আর্টে রমণীমূর্ত্তিই অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু গ্রীক আর্টের জন্মের পর দেড়-শো বছর যাইতে-না-যাইতেই একটি ধাবমানা রমণী-মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে। সে মূর্ত্তি সুধু যে দৌড়াইতেছে, তাহা নয়; সে হাসিতেছেও বটে! শিল্পজগতে হাস্যের এই

শিল্পে প্রথম হাস্য

প্রথম জন্ম! মিসরীয় ও আসীরীয় শিল্পে যে-সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, মানুষের মত তাহারা হাসিতে পারিত-না। নররূপী হইয়াও তাহারা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছু ধার ধারিত-না। পৃথিবীতে থাকিয়াও তাহারা পৃথিবীর সুখ-দুঃখে বিচল হইত-না।

খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরে গ্রীশদেশে Archermos নামে এক ভাস্কর ছিলেন। তিনি এক নূতন পদ্ধতি-মতে মূর্ত্তি গড়িতেন। পূর্ব্বকথিত ঈষৎস্মিতমধুর মূর্ত্তিটি তাঁহারই পদ্ধতি-অনুসারে গঠিত। এই মূর্ত্তিটি Nike of Delos নামে বিখ্যাত। এতদিন শিল্প ভিতরের শাঁষ-জল ফেলিয়া সুধু বাহিরের ছোব্‌ড়ার নকল করিয়াই আসিতেছিল। Nike of Delosএ দেখি, অন্তরের বিচিত্র ভাবধারাকেও সে পাষাণপটে লীলায়িত করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! এখন সে আর সুধু দেহ লইয়া সুখী নয়, এখন তাহার

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

এই যুগ গ্রাশীয় ললিত-কলার জীবনে প্রথম সূর্য্যোদয়ের যুগ। কেননা, শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে যে সঞ্জীবন-মন্ত্রের আবশ্যক, গ্রীক ভাস্কররা এই প্রথম তাহা অনুভব করিতে পারিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা" না করিলে, শিল্পসৃষ্টি নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এখন হইতে গ্রীক শিল্প ক্রমেই উন্নতির উচ্চপথে উঠিতে লাগিল। Nike of Delosএর অনুকরণে অনেক নূতন মূর্ত্তি গঠিত হইল। নব নব অভিজ্ঞতায় ভাস্কররা প্রথমযুগের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে পারস্য জাতি আসিয়া গ্রীশদেশ আক্রমণ করিল। গ্রীক শিল্পীরা যে-সকল অপূর্ব্বগঠন মন্দির ও পরমসুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়াছিল, শত্রুদের হাতে তাহাদের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল। কিন্তু গ্রীকরা এই বিপ্লবে পড়িয়াও হাল ছাড়িয়া দিলেন না। শত্রুরা প্রস্থান করিলে পর, দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, ধ্বংসাবশেষের উপরে তখন তাঁহারা আবার নূতন-করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। যে-সকল

বিশেষত্বের জন্য গ্রীক আর্ট জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, এই নবপ্রতিষ্ঠার যুগেই তাহার প্রথম বিকাশ।

আফাইয়া ও থিয়াস মন্দির-চূড়ার বিখ্যাত কারুকার্য্য এই যুগের গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই দুটি মন্দিরে যুদ্ধবিগ্রহের, দেব-দেবীর ও মানব-মানবীর যে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য-চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই পরযুগের পরিণত ও নির্দ্দোষ গ্রীক আর্টের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। Paeonios, Alcamenes, Myron ও Polyclitus প্রভৃতি গ্রীক ভাস্করগণ এই সময়ে অত্যন্ত নামজাদা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেবী এথেনী

(ফিডিয়াসের গড়া মূর্ত্তির নকল)

শেষোক্ত দুইজন ভাস্করের সমকালেই গ্রীশদেশে ফিডিয়াস (Pheidias) নামে যে প্রতিভাবান ভাস্কর আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিতেই গ্রীক শিল্প পৃথিবীর শিরোমণি হইয়া উঠে। খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরে ফিডিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীশ-পারস্যের রণকোলাহলের মধ্যে তাঁহার বাল্যকাল কাটিয়া যায়। মারাথনে (খৃঃ পূঃ ৪৯০), স্যালামিসে (খৃঃ পূঃ ৪৮০), ও প্লেটায় (খৃঃ পূঃ ৪৭৯) পারসীরা বারবার হারিয়া গেলে পর, সমস্ত গ্রীশদেশ এথেন্সের অধীনতা স্বীকার করে। তখন এথেন্সনগরীকে শিল্পে-সৌন্দর্য্যে মনোরমা ও নিরুপমা করিয়া তুলিবার কথা হয়।

সেই সময়ে পেরিক্লিশ (Pericles) এথেন্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পেরিক্লিশের হুকুমে এথেন্সে যে-সকল শিল্পবিচিত্র প্রাসাদ ও মন্দির তৈয়ারি হয়,

তাহার ভিতরে সকলের সেরা হইতেছে, এথেনী-দেবীর মন্দির পার্থেনন।

পার্থেননের স্থাপত্যকার্য্যের কর্ত্তা ছিলেন ইক্টিনস (Ictinos)। কিন্তু মন্দিরের পরিকল্পনা ও ভাস্কর্য্য-কার্য্য সম্পন্ন হয় ফিডিয়াসের প্রতিভাবলেই। ফিডিয়াস নিজের হাতে অনেক মূর্ত্তি গড়িলেও, এতবড় মন্দিরের সমস্ত মূর্ত্তি গড়া, একলা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল-না। সুতরাং আরও অনেক ভাল কারিকর তাঁহার সহকারী হইয়া এখানে কাজ করেন। কিন্তু ফিডিয়াসের সহকারীরা তাঁহারই হাতের যন্ত্রের মত ছিলেন;—ধরিতে গেলে, এই ভাস্কর-কার্য্যের জন্য যাহা-কিছু সুখ্যাতি, তাহা ফিডিয়াসেরই প্রাপ্য। খৃঃ পূঃ ৪৪৭ বৎসরে আরম্ভ হইয়া খৃঃ পূঃ ৪৩৩ বৎসরে পার্থেননের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। মন্দিরের প্রধান গৃহে Athene Parthonosএর যে বিরাট প্রতিমা ফিডিয়াসের হাতে তৈয়ারি হইয়াছিল, সেটি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নানা যুদ্ধবিগ্রহে পার্থেননের অধিকাংশই এখন একটা ভাঙ্গা-চোরা ঢিপির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দেওয়ালে-দেওয়ালে যে অতুল ভাস্কর্য্যের মোহন অলঙ্কার ছিল, তাহারও প্রায় কোন জায়গাই অটুট নাই।

এখনকার সকল শিল্পী ও সমালোচকই একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন যে, পার্থেননে যে-সমস্ত মার্ব্বেলের মূর্ত্তি ও হাতের কাজ দেখা যায়, পৃথিবীর আর-কোন দেশে তাহার তুলনা মেলা ভার। মানব-শিল্প যতটা উপরে উঠিতে পারে, পার্থেননের গ্রীক আর্ট ততটাই উঠিয়াছিল। ফিডিয়াসের আর্ট একেবারে সকলদিকেই নিখুঁত—যেমন সুন্দর তেমনি সরল। চিত্র-শিল্পে র‍্যাফেলের যে স্থান, ভাস্কর্য্য-কলায় ফিডিয়াসও তেমনি উচ্চাসন দখল করিয়া আছেন। দেবী এথেনী ও দেবতা যিয়াসের মূর্ত্তি ফিডিয়াসের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলা হয়। এই দুটি মূর্ত্তিই সোনা আর হাতীর দাঁতে গড়া হইয়াছিল। এথেনীর বিনষ্ট মূর্ত্তির একটি ছোট নকল-প্রতিমূর্ত্তি অন্য-কোন শিল্পী গড়িয়াছিলেন—সেটি এখন এথেন্সের যাদুঘরে আছে। কিন্তু যিয়াসের মূর্ত্তি যে কেমন ছিল, এখন আর তাহা জানিবার উপায় নাই। পার্থেননের Theseusএর যে মূর্ত্তিটি ছিল, সেটিও ফিডিয়াসের রচনা-ভঙ্গী অনুসারেই গড়া। Theseusএর মূর্ত্তি যদিও এখন অটুট নাই, তবু, তাহার ভগ্নদশার ভিতর হইতেই ফিডিয়াসের প্রতিভার মহিমা বুঝা যাইবে।

পার্থেনন দেখিলে হোমার-বর্ণিত সেই প্রাচীন গ্রীকজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও মতি-গতি, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—এককথায়, প্রাচীন গ্রীশভূমি তাহার বিচিত্র সভ্যতা এবং অপূর্ব্ব বিশেষত্ব লইয়া এই পার্থেননের ভগ্নস্তূপে আজ-পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমান ও জাগ্রৎ হইয়া আছে।

ফিডিয়াসের পরেও গ্রীশদেশে প্র্যাক্সিটিল্‌স্‌, স্কোপাস ও লিসিপ্পাস প্রভৃতি ওস্তাদ-শিল্পী জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব ধরন ছিল এবং ইঁহাদের এক-একজনের হাতে ভাস্কর্য্যের এক-একটি দিক পুরস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক

ফিডিয়াসের রচনা-ভঙ্গীর নমুনা
(Theseus-এর মূর্ত্তি)

আর্টের এই উন্নতির ধারা দ্বিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের পরেও সমান একটানা বর্ত্তমান থাকে। তাহার পর গ্রীক সভ্যতার অধোগতির সঙ্গে-সঙ্গে গ্রীক আর্টেরও অধঃপতন আরম্ভ হয়।

প্রথম যুগের গ্রীক ভাস্কররা কাপড়-পরা মূর্ত্তিই গড়িতেন। কিন্তু পরযুগের গ্রীক ভাস্কর্য্যে এ রীতি অনেকটা বদলাইয়া যায়। কাপড়ের আড়ালে দেহের আসল রূপটি ঢাকা পড়ে বলিয়া নগ্নমূর্ত্তিই শিল্পীদের অধিক পছন্দসই হইয়া উঠে। কিন্তু এ নগ্নতার ভিতর দিয়া গ্রীক শিল্পীরা কামভাব জাহির করিতেন-না। গ্রীক আর্টের নগ্নতা, শিশুর সরল, নিষ্পাপ নগ্নতা। তখনকার বস্ত্রহীন মূর্ত্তিগুলিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আপনাদের নগ্নতা-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও অচেতন। কোন মানুষের গা হইতে কাপড় খুলিয়া লইলে, দশজনের সামনে সে যেমন লজ্জায় জড়সড় হইয়া যেন-তেন-প্রকারে আপনার নগ্নতা ঢাকিয়া ফেলিতে চায়, এ-সব মূর্ত্তির মুখে বা দেহে সে-রকম লুকাচুরির ভাব আদোপেই নাই। এই লুকাচুরির ইঙ্গিত আছে বলিয়াই একালের অনেক মূর্ত্তি কাপড়-পরা হইলেও, কামের প্রদীপ উস্কাইয়া দেয়। নগ্নতা দেখিলেই যাঁহারা চোখে রুমাল-চাপা দেন, এ কথাগুলি মনে রাখিলে নগ্ন আর্টের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ না করিয়া মুগ্ধই করিবে। বস্ত্র যে কতটা কুৎসিত, কতটা কৃত্রিম দেখাইতে পারে,

গ্রীকশিল্পীর কোন নগ্ন মূর্ত্তিকে বস্ত্রভূষিত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমরা শিল্পাচার্য্য রোদাঁর জীবন-প্রসঙ্গে (১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে:—"গ্রীক আর্টে পুরুষত্বের পূজার পরিচয় Sophocles, Mars, Hermes, Apollo, Antinous, Eros প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীকশিল্পী পৌরুষের এতই ভক্ত যে, তাঁহারা রমণীত্বের মধ্যেও বহুস্থলে পুরুষত্বের বিকাশ না দেখাইয়া পারেন নাই। Dianna, Athena প্রভৃতি অগুন্তি রণরঙ্গিণী রমণী-মূর্ত্তি এবং ভেটিক্যান মিউজিয়মের "Battle of Amazons" নামে শিল্পকার্য্যটি তাহার জলন্ত প্রমাণ।"

প্রাচীন গ্রীশদেশের জীবন-যাত্রার মধ্যে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতা শান্তিপ্রধান; যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলেও এখন গায়ের জোরের ততটা দরকার করে-না। কিন্তু সেকালে, গ্রীশে যুদ্ধবিগ্রহ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল—এবং তালপাতার সেপাইয়ের পক্ষে লড়াই করাও তখন পোষাইত-না। প্রাচীন গ্রীকরা তাই বাধ্য হইয়া শক্তির পূজারী হইয়াছিলেন। বাস্তব জীবনের এই শক্তি-সাধনা গ্রীক আর্টকেও শক্তির ভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন আর্টে পুরুষত্বের পূজা এবং আধুনিক আর্টে রমণীত্বের ভক্তির মূল কারণই হইতেছে, যুগধর্ম্ম।

পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ভাস্কররা সকলের চেয়ে বেশী গড়িতেন, রণরঙ্গিনী রমণী-মূর্ত্তি। গ্রীক অবদানে আছে, এসিয়া হইতে রমণীরা পুরুষের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে গ্রীশ দেশে আসিয়াছিল। এই অবদান অবলম্বন করিয়া শিল্পীরা রূপকের মধ্য দিয়া গ্রীক-পারসীর যুদ্ধ-ব্যাপারেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পেও দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রীর প্রতিমাতে আমরা বীররমণীর মূর্ত্তি দেখি। কিন্তু অস্ত্রধারিণী হইলেও রমণী এখানে রমণীই বটে—ফিডিয়াসের Athenের মত তাঁহারা নারীবেশী পুরুষদেহী নন।

যৌবন, শক্তির নির্ঝর। গ্রীক শিল্পীরা তাই যৌবনের জয়োৎসাহে আপনাদের অধিকাংশ প্রতিমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। Hermesএর প্রতিমূর্ত্তিতে Praxiteles সবল যৌবনের যে নিখুঁত আদর্শ গড়িয়াছেন, শিল্পসমাজে সকলেই তাহার অত্যন্ত আদর করেন। এ মূর্ত্তির মধ্যে একটুও বিলাসিতার আভাস নাই অথচ ইহার বলিষ্ঠ দেহের মোহন-রূপ কী অপরূপ! মূর্ত্তির জীবন্ত মুখখানি "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে" সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত দৈহিক মাংসপেশীগুলি যেন ছন্দের আনন্দে ভরপুর!

ভেটিক্যান মিউজিয়মে "Antinous Belvedere" নামে যে মূর্ত্তিটি আছে, সেটিও সবল যৌবনের আর-একটি বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তি। এই Antinousএর অগুন্তি মূর্ত্তি য়ূরোপের মিউজিয়মগুলিতে দেখা যায়। তাঁহার মাথাটি হতাশভাবে একদিকে হেলিয়া

(১) পৌষের ভারতীতে "রোদাঁর বিশেষত্ব" দেখুন। এ বৎসরে প্রকাশিত রোদাঁ-সংক্রান্ত প্রবন্ধমালায় গ্রীকশিল্পীর গড়া অ্যাপলো. বিজয়লক্ষ্মী, ভাগ্যদেবীত্রয় ও ভেনাস ডি মেডিসি প্রভৃতি বিখ্যাত মূর্ত্তির ছবিও বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আবার সে-সব ছবি আর দেওয়া হইল না।
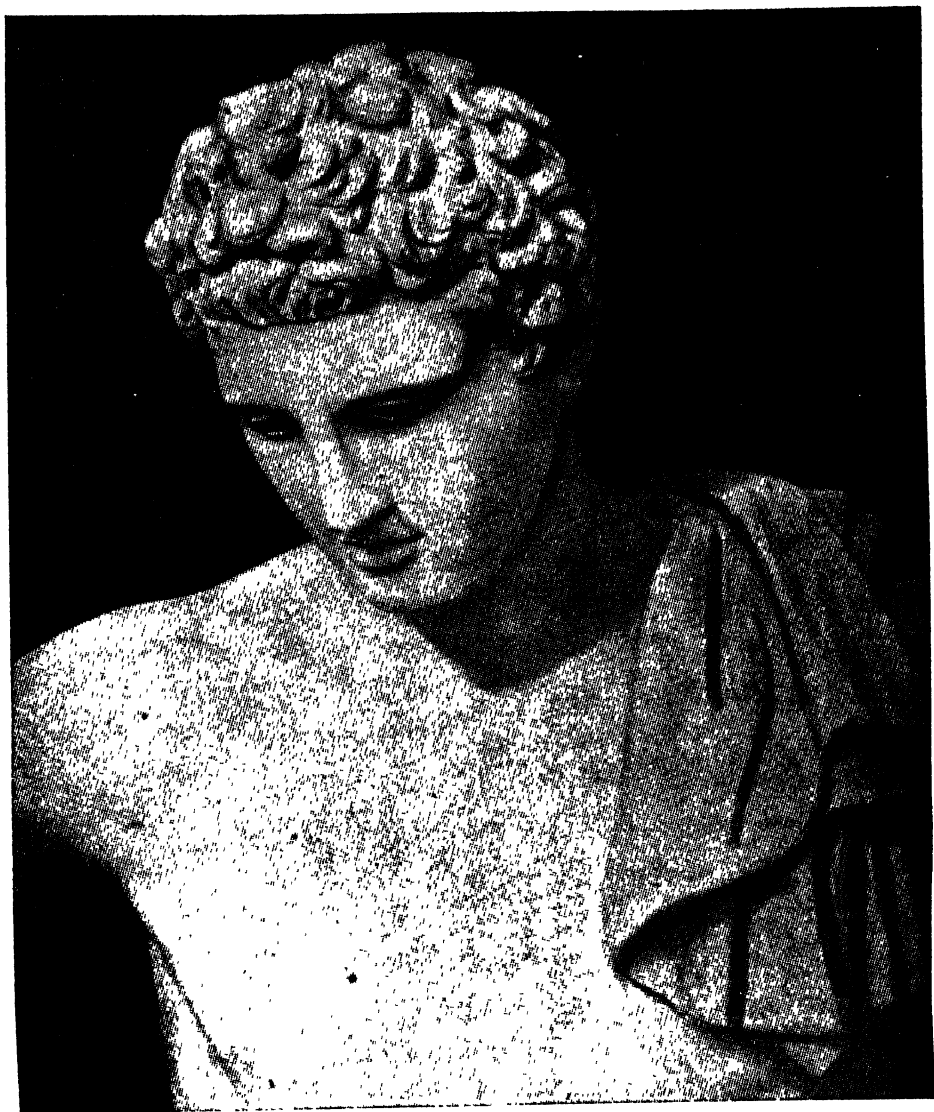
অ্যান্টিনস্

পড়িয়াছে; দৃষ্টি স্বপ্নাতুর। তাঁহার মুখ যেন কি-এক রহস্যের আবরণে আবৃত; তিনি যেন কোন প্রহেলিকার সমস্যায় পড়িয়া আপনাকেও একটি প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তির মুখখানিও চমৎকার। সাধারণত গ্রীক ভাস্কর্য্যে যেমন দেখা যায়, ইঁহারও নাক তেমনি একেবারে কপালের উপর হইতে সোজা নামিয়া আসিয়াছে। মুখের তরঙ্গিত রেখাগুলি ভাবে অভিরাম; মার্ব্বেলের উপরে এমন রেখাপাত করা ভারি কঠিন,—ইহাতে শিল্পীর সচ্ছন্দ শক্তি ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। Antinous, সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একবার দৈববাণীতে সম্রাটের উপরে আদেশ হয়, তিনি যেন তাঁহার কোন প্রিয়তমের প্রাণ, দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। Antinous, স্বেচ্ছায় আত্মদানে অগ্রসর হইলেন। এবং নীলনদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর, তাঁহার স্মৃতিকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করিবার জন্য দেশের চারিদিকে তাঁহার অগণ্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীক ভাস্কর্য্যে ব্যায়াম-ক্রীড়কের সংখ্যা হয় না! গ্রীক শিল্পী যত ক্রীড়কের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তত আর-কিছুর নহে। Myronএর গঠিত Discobolus বা চক্র-নিক্ষেপকারী, Lysippusএর গঠিত Apoxyomenus প্রভৃতি ক্রীড়কের মূর্ত্তির কথা ভুবনবিখ্যাত।

গ্রীশের যুবকদের রীতিমত প্রকাশ্য ব্যায়াম-ক্রীড়া শিল্পীদের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। নগ্নদেহে নির্ব্বিকার মনে ক্রীড়করা
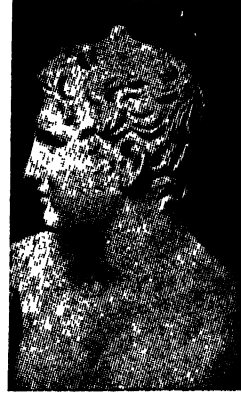
লিসিপ্পাসের গড়া ক্রীড়ক-মূর্ত্তি

কুস্তি লড়িত, লাফাইত, ছুটিত ও চক্র ছুঁড়িত। তাহাদিগকে দেখিয়া শিল্পীরাও সবল পুরুষত্বের উচ্চ আদর্শের পরিকল্পনা করিতে পারিতেন। নগ্নতার যে নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ আকার সে যুগের শিল্পীরা দেখিতে পাইতেন, এ যুগে তাহা দুর্লভ। তেমন পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ জীবন্ত আদর্শই এখন বড়-একটা পাওয়া যায় না, সুতরাং এ অবস্থায় আধুনিক শিল্পজগতে যে প্রাচীন গ্রীক আর্টের সমযোগ্য প্রতিমূর্ত্তির অভাব হইয়াছে, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গ্রীক আর্টিষ্টদের প্রাণ জীবনের বিপুল পুলকে বিভোর হইয়া থাকিত। এই যে মানব-জীবন—ইহার প্রতি মুহূর্ত্তটিকে তাঁহারা প্রাণ-ঢালিয়া ভালবাসিতেন। একালের অনেক আর্টিষ্টের মত জীবনকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন না—করিতে পারিতেন-না। মানবজীবন কিছুই নহে, সেটা সুধু একটা ক্ষণিকের প্রদীপ, একটা চপল ছায়া; তাহাকে লইয়া খেলায় মাতিয়া-উঠা অবোধ শিশুর কাজ;—এমন দার্শনিকতা গ্রীক শিল্পীর ধাতে সহিত-না।

তুমি যদি বল, "জীবন ত তুচ্ছ ক্রীড়নক !" গ্রীকশিল্পী তাহাহইলে জবাব দিবেন, "হ্যাঁ, খেলার জন্যই যখন খেলনা, তখন একে লইয়া আমি খেলিব বৈকি ! তুচ্ছ ভাবিয়া এমন সুন্দর খেলার জিনিসটিকে অসার্থক করিব কেন ?" এইজন্যই গ্রীক ভাস্কর্য্যে সাধারণত আমরা জীবনের অপূর্ব্ব মহোৎসব দেখি। গ্রীক শিল্পী মানুষের জীবন ও দেহ লইয়া সসীমে অসীমের সাধনা করিয়াছেন। একালের কবির ভাষায় তিনি বলিতে পারিতেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় !
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।... ... ...

* * * *

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া !"

এই যে শত শত ক্রীড়কের মূর্ত্তি, ইহাদের প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিতে, প্রতি মাংস-

কুস্তিগীর

পেশীর লীলায়, প্রতি ভাবে-ইঙ্গিতে আমরা যেন জীবন-পাত্রের সুধাপানের বাসনাকে জাগ্রৎ হইয়া উঠিতে দেখি! গ্রীকদের জাতীয় জীবনে ক্রীড়া যে কতখানি-বেশী জায়গা অধিকার করিয়াছিল, গ্রীক কলায় ক্রীড়ক-মূর্ত্তির আধিক্য তাহারই প্রমাণ দিতেছে। মানুষ এখন গোঁফ না-গজাইতেই গম্ভীর বনিয়া যায়; খেলা-করাকে সে এখন বাজে সময়-নষ্ট-করা ভাবে; বড় বড় কথা, দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজ লইয়া সে এখন ব্যতিব্যস্ত; তাই তাহার আর্টও এখন ভারি হইয়া উঠিয়াছে—কারণ, তরলতাকে সে তাচ্ছীল্য করে। সুতরাং সেকালে এই সকল খেলোয়াড়ের মূর্ত্তিকে যে চোখে যে ভাবে দেখা হইত, এ যুগে সে চোখও নাই, সে ভাবও নাই। আধুনিক ললিত কলায় তাই এমন নিছক আনন্দের মূর্ত্তিও আর বড় গড়া হয়-না। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীলতা ও জীবন-সংগ্রামের কাঠিন্য, আনন্দ এবং স্ফুর্ত্তিকে প্রায় নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

গ্রীকরা দেহ ও আত্মাকে একই বস্তুর দুটি দিক বলিয়া ভাবিত। তাহার একটি দিক না থাকিলে অন্য-দিকটিও থাকিবে-না—এই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা জানিত অন্তর্গূঢ় আত্মার রূপ বাহিরের দেহের উপরেই ফুটিয়া উঠে। প্লেটোর উক্তিতে এই ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। (২) এ-যুগের ভাবের ধারা কিন্তু আলাদা। এখন শারীরিক বলের চর্চ্চা হয় যেখানে, মানসিক চর্চ্চা সেখানে হয়-না। এখন যাহারা পালোয়ানী করে, দৈহিক গঠন-সৌন্দর্য্যে তাহাদের কেহ-কেহ প্রাচীন গ্রীক প্রতি-মূর্ত্তির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্যে গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির কাছে তাহারা দাঁড়াইতেই পারিবে-না। আবার, এখন যাঁহারা মনের চর্চ্চা করেন, দেহের চর্চ্চা তাঁহাদের দ্বারা হয় না;—সুতরাং বাহিরের আকারে তাঁহারাও গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির সমকক্ষ হইতে পারিবেন-না। চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিতে আমাদের মনে সাধারণত একটি অপুষ্টদেহ মানুষের ছবি জাগিয়া উঠে। কিন্তু গ্রীক আর্টিষ্ট যে-সকল চিন্তাশীল পণ্ডিতের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহ—অনেকেই একালের যে-কোন কুস্তি-গীরের বিপুলবপুর পাশে গিয়া অনায়াসে দাঁড়াইতে পারেন। এইজন্যই সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, "ভাস্কর সুধু আত্মাই দেখাইবেন না—সেইসঙ্গে দেহকেও সমান ভাবে দেখাইবেন।" ("A sculptor must render the action of a soul equally with bodily form.")

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে এই বিচিত্র শক্তির সাধনা প্রাচীন গ্রীকজাতির জীবনে, কাব্যে, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে একেবারে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বলতা তখন ছিল কদর্য্যতার নামান্তর।

(২) "Surely then, to him who has an eye to see, there can be no fairer spectacle than that of a man who combines the possession of moral beauty in his soul with outward beauty of form, corresponding and harmonising, with the former, because the same great pattern enters into both."

পুরুষ বা রমণী, ধনী বা নির্ধন, উচ্চ বা নীচ,—কাহাকেও, তাহারা কুৎসিত ও দুর্ব্বল রূপে দেখিতে পারিত-না। গ্রীক আর্টের মূলমন্ত্র এই সৌন্দর্য্য এবং শক্তি।

আদর্শ পুরুষ-রূপের পাশেই গ্রীকশিল্পী আদর্শ রমণী-রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রীক আর্টে আদর্শ পুরুষ যেমন দেবতা

অ্যাপলোর মুখ

(ফিডিয়াসের শিষ্যের গড়া)

অ্যাপলো, আদর্শ রমণীও তেমনি দেবী ভেনাস। জগতের কলারাজ্যে নির্দ্দোষ দৈহিক গঠনে এই অ্যাপলো ও ভেনাসমূর্ত্তি আজ-পর্য্যন্ত আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। গ্রীকশিল্পীরা অনেকগুলি ভেনাসের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মিলোস নামক দ্বীপে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী ভেনাসের যে মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়, সেইটিই সকলের-চেয়ে বিখ্যাত। এই প্রতিমার দুটি হাতই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সম্পূর্ণ অবস্থায় ইহার হাতের ভঙ্গী কিরূপ ছিল, আধুনিক কলাবিদরা অনেক কথা-কাটাকাটি ও কল্পনা-জল্পনার পরেও তাহা ঠিক-করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনুমান খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী ইহার নির্ম্মাণকাল,—কিন্তু কারিকরের নাম অজ্ঞাত। তবে, পার্থেননের মতই ইহার মহিমময়, বলব্যঞ্জক ও অচঞ্চল ভাব দেখিয়া কেহ-কেহ বলেন, এই সরল-সৌন্দর্য্যে রমণীয় মূর্ত্তিটি ফিডিয়াসের কোন শিষ্যের দ্বারাই গঠিত। এই রহস্যময়ী প্রতিমায় সুধু দেহের কান্তিই নাই; ইহার মুখে মনের কান্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খৃঃ পূঃ ৩০৬ বৎসরে গ্রীকরা সাইপ্রাস দ্বীপের কাছে মিশরীয়দিগকে জলযুদ্ধে হারাইয়া দেয়। এই উপলক্ষে বিজয়লক্ষ্মীর যে পরমরমণীয় মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহার নাম Victory of Samothrace। দুঃখের বিষয়, এটিরও হাত আর মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রীশীয় ভাস্কর্য্যে তখন Lysippus ও Scopasএর অত্যন্ত প্রভাব। এই মূর্ত্তিতে শেষোক্ত ভাস্করের গঠন-ভঙ্গী ও বিশেষত্বের ছাপ পড়িয়াছে। ভাঙ্গা হইলেও বিজয়লক্ষ্মীর দেহের মধ্য হইতে একটি জীবন্ত ভাব ও অদম্য উৎসাহ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুন্দর তনুর সঙ্গে একেবারে মিশিয়া-মিশিয়া গায়ের কাপড়খানি ভাঁজে-ভাঁজে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়া সাগর-সমীরে কী মোহন লীলায় উড়িতেছে! একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, প্রাচীন গ্রীক শিল্পের এই অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তিটিতেও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শক্তির সমাহার হইয়াছে। (ভারতীতে রোদাঁর প্রসঙ্গে বিজয়লক্ষ্মীর ছবি দেখুন)

গ্রীক আর্টে পুরুষ ও রমণীর আরও অনেক আশ্চর্য্য ও সুন্দর মূর্ত্তি আছে; এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে-সমস্তের পরিচয় দেওয়া

রূপরাণী ভেনাস

অসম্ভব—আমরা কেবল দু-চারিটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। এ-বৎসরের ভারতীতে ওগস্ত্‌ রোদাঁর যে অমূল্য উপদেশগুলি বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যেও গ্রীক শিল্প-সম্বন্ধে অনেক দরকারি কথা আছে। গ্রীক আর্টের বিশেষত্ব মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

গ্রীক ভাস্কররা জীবনকে যতটা বুঝিতেন, মরণকে ততটা নয়। "বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে?"—এ মহা প্রশ্নের উত্তর গ্রীক ভাস্কর্য্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রীক কলাবিদরা জীবনকে উপভোগ করিতে যেমন ভালবাসিতেন, মৃত্যুকে তেমনি ভয় করিতেন।

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!"—

হিন্দুকবির মত গ্রীকশিল্পী সাহসে ভর্ করিয়া এমন কথা বলিতে পারিতেন-না। প্রতীচ্যেরও অন্যান্য দেশের শিল্পে মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহার অনেক কাল্পনিক চিত্র আছে। কিন্তু গ্রীকশিল্পীরা এ সমস্যা-পূরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তবে, নরকের একটি অসম্পূর্ণ ছবি গ্রীক শিল্পে একটিমাত্র স্থানে আছে বটে। আর, প্রাচীন গ্রীশের সমাধি-শিল্পেও ভবিষ্য জীবনের সামান্য-সামান্য আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। কারণ, ফিডিয়াস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্করের কার্য্যে আমরা মৃত্যুর পরের জীবনের কোন চিত্র দেখিতে পাই-না। বিশেষ, অনেক স্থলে সমাধি-ভবনের ভাস্কর্য্যে দেখি, মৃত্যুর মধ্য দিয়াও গ্রীকশিল্পী মৃতের অতীত জীবনকেই ফুটাইয়া তুলিতেছেন, মৃত ব্যক্তি যেন মরিয়াও জীবনকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে! এই সমাধি-শিল্পের কারিকর

যে কাহারা, তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে স্থানে-স্থানে যে-সকল শোক-বিহ্বল মূর্ত্তি চোখে পড়িয়া যায়, তাহাদের গভীর ভাব সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

আধুনিক ললিত কলায় সরলতার যে অভাব হইয়াছে, প্রাচীন গ্রীক আর্টে তাহা ছিল-না। সকল ভাবের তন্ত্রীতেই সে গভীর সুর তুলিয়াছে, অথচ কোনস্থানেই সে দুর্ব্বোধ নহে। একালের আর্টিষ্টরা আমাদের জটিল সভ্যতা এবং সামাজিক জীবনের সমস্যা-পূরণের জন্য অনেকসময়ে আর্টের আশ্রয়গ্রহণ করেন, অনেকসময়ে কুৎসিতকেও তাঁহারা তাই আর্টের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হন; কিন্তু গ্রীক-শিল্পী কখনই এদিক ঘেঁষিয়া যাইতেন-না। সৌন্দর্য্য ছিল তাঁহাদের ভাব-পুরীর সিংহদ্বার; সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাঁহাদের ভাবের ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিত, অসুন্দরকে তাঁহারা সাধ্যমত বর্জ্জন করিয়া চলিতেন এবং প্রাণের আনন্দকেই তাঁহারা ললিত কলায় নানা ভাবে, রূপে ও আকারে জাগাইয়া তুলিতেন;—তাঁহাদের আর্ট ছিল সুধু আর্টের জন্যই। আর্ট আপনিই তাঁহাদের জীবনকে শোভন ও হৃদয়কে উদার করিয়া তুলিত, উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ললিত-কলাকে তাঁহারা জোর-করিয়া দাসী-বাঁদীর মত কাজে খাটাইতেন-না। এইটুকু বুঝিতে পারিলেই, গ্রীক আর্টের ভিতরের কথা ঠিকমত বুঝা যাইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী ও মন্তব্য

বাংলার উপন্যাস

বাংলা মাসিক-পত্র এখনো আদিম প্রাণ-পঙ্কের মত অবয়ববৈশিষ্ট্যবিহীন হইয়া আছে। বিলাতি ম্যাগাজিন, জর্ণাল ও রিভিয়ু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মাসিক-পত্রের খিচুড়ি বানাইয়া বাংলা মাসিকপত্র তৈরি। বাংলা মাসিকে পিয়ার্সন্, ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনের মত ঝুড়িঝুড়ি বাজে গল্প ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসও আছে; ফর্টনাইট্‌লি, কন্টেম্‌-পোরারির মত নানা সাময়িক ও অসাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা ও নিবন্ধও আছে; 'মাইণ্ড', 'হিবার্টজর্ণাল' প্রভৃতি দার্শনিক কাগজে কেবলমাত্র দার্শনিকদের প্রবন্ধাদি যেমন বাহির হয়, এখানেও তাহার অভাব নাই; প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাও বাংলা মাসিকে যথেষ্ট জায়গা জোড়ে। তবে উপন্যাস ও গল্পের পরিমাণের কাছে আর-সকলেরি হীনমান। উপন্যাসের বহর যে-পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাতে সাহিত্যের অন্যান্য অংশ পরিমাণে হারিতেছে কিনা তাহা ঠাহর করা কঠিন।

উপন্যাস বাড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিতেছি মনে করিলে উপন্যাসের সপক্ষে যে-সব উপপত্তি জাগিবে তাহা আমি জানি। গজকাঠির মাপ ঠিক সাহিত্যের

বেলায় খাপ খায়না; তবু যদি মাপা সম্ভব হইত তবে উপন্যাস জিতিত সন্দেহ নাই। কারণ অনুপাত কসিলে উপন্যাস ও গল্প বোধ হয় শতকরা ৬০, নাট্য ২০, কবিতা ৮, প্রবন্ধাদি ৮, আর খুচরা ৪ এই দাঁড়ায়।

উপন্যাসে আমি আপত্তি করিনা, যদি সে উপন্যাস সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার মত হয়। কুঁড়েমির কেল্লায় রসদ জোগাইবার মত বাজে উপন্যাসের চাষ বিলাতে যথেষ্ট হইয়া থাকে, এদেশে তাহার আমদানি করিবার এখনো প্রয়োজন হয় নাই। কারণ ভাল উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া অরুচি ধরিবার মত অবস্থায় আমরা এখনো পৌছি নাই। তারপর আমার আপত্তি যাকে আমরা গার্হস্থ্য উপন্যাস বলি সেই ধরণের উপন্যাস সম্বন্ধে

মাসিকপত্রে কোনো নূতন উপন্যাস দেখিলেই মনে হয়, তবে সেটা কোন্ শ্রেণীর! কারণ একটু ভালগোচের উপন্যাস হইলেই সেটা গার্হস্থ্য উপন্যাস না হইয়া যায়না। 'স্বর্ণলতা'র পর হইতে এই ধরণের উপন্যাস ক্রমাগতই চলিয়া আসিতেছে। শক্তিমান লেখকের হাতে পড়িলে হয়ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাসেই আর-একটু ঘটনার ও চরিত্রের জটিল সমাবেশ, চরিত্র-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, বা মানবপ্রকৃতির গভীরতম বৃত্তিগুলির উদ্ঘাটন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু লৌকিক গার্হস্থ্য ঔৎসুক্য (local interest) ছাড়াইয়া পাঠকের মন একটা বিশ্ব-ঔৎসুক্যে (universal interest) উত্তীর্ণ হয়না। বাঙালী যে গার্হস্থ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া বড়-অর্থে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপকতর পরিধির মধ্যে গিয়া পড়ে নাই, বাঙালীর গার্হস্থ্য উপন্যাসই তার একটা প্রমাণ।

বাল্জাক্ তাঁহার Le Comedie Humaine উপন্যাসাবলীতে তাঁহার কালের ফ্রান্সের বাস্তব মানবজীবন ও চরিত্রের সকল বৈচিত্র্য অসাধারণ ক্ষমতার সহিত আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সমাজের কোনো শ্রেণীর মানুষই তাঁর আয়ত্তের বাহিরে পড়ে নাই। একজন লেখক তাঁর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "The whole of France is crammed into his pages,and electrified there into intense vitality." —গোটা ফ্রান্সটাকে তাঁর উপন্যাসের পাতাগুলার মধ্যে ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে, গভীর প্রাণশক্তিতে তাহা বিদ্যুন্ময় হইয়াছে।

বাল্জাকের পর উপন্যাসের আরও যে কি পূর্ণতরতা হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত ছিল। রুশ-উপন্যাস আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে বাল্জাক্ যেমন ভিক্তর হুগোকে ছাড়াইয়া গেছেন, রুশ ঔপন্যাসিক ডষ্টয়ভ্স্কি বা গোগোল তেম্‌নি বাল্জাক্‌কে ছাড়াইয়া গেছেন। তাঁহারা বাল্জাকের মত কেবল type বা শ্রেণী-হিসাবে মানুষকে আঁকেন নাই। একটা ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ওলটপালটের মত সমাজের গভীরতম, প্রচ্ছন্নতম, অন্ধকারতম স্তরগুলি পর্য্যন্ত নাড়া দিয়া সেই সমাজস্তরগুলির অবিরত উত্থানপতন অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতরে মানব-প্রকৃতিকে স্থাপিত করিয়া তাঁহারা তাহার অশেষ বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। বাস্তববোধ তাঁহাদের মধ্যে আরও বেশি, আরও গভীর।

বাংলা উপন্যাসে সেই আরও বেশি বাস্তবতা কবে দেখা দিবে?

নারীর সামাজিক অধিকার

পৌষের প্রবাসীতে "বঙ্গে অন্যান্য প্রদেশে নারীজীবন" প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছিল যে, এ-দেশে আত্মঘাতিনী মেয়েদের সংখ্যা আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। প্রবাসী লিখিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী মেয়েরা উপন্যাস বেশি পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে না, কারণ ইউরোপের মেয়েরা শতগুণ বেশি উপন্যাস পড়ে অথচ তাহাদের মধ্যে আত্মঘাতিনী নারীর সংখ্যা আত্মঘাতী পুরুষের তুলনায় ঢের কম।

ইউরোপে মেয়েদের প্রশস্ত সামাজিক অধিকার আছে, আমাদের দেশে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে, এদেশে যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার চল ছিল, তখন মেয়েদের পাঁচজন আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে সর্ব্বদা মেলা-মেশা ও হৃদয়ের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রও বিস্তৃততর ছিল, সুতরাং কাজের ও সেবার ক্ষেত্রও বিস্তৃততর ছিল। নানা কারণে এখন যখন পরিবার জিনিসটাই সংকীর্ণতর হইয়া আসিতেছে, তখন মেয়েদের শরীর ও মন দুইই গৃহকোটরবদ্ধ করিলে তাঁহাদের শরীর জীর্ণ এবং মন অসুস্থ ও অবসাদগ্রস্ত হইবারই কথা। তারপর সেই গৃহকোটর-টুকুর ভিতরে যদি স্বামী-স্ত্রীর বনিবনাও থাকে তবেই ভাল, আর যদি না থাকে? তখন সেই হতভাগ্য মেয়েদের মন ভুলাইবার মত বা তাহাদের পীড়িত মনকে ছাড়া দিবার মত আর কি ব্যবস্থা থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। এমন অবস্থায় অনেক মেয়েই যে আত্মঘাতিনী হয়, তাহা স্বাভাবিক।

'প্রবাসী'র এই প্রসঙ্গের উপর 'উপাসনা'র এক লেখক টিপ্পনি করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "বাংলাদেশে নারীজীবন পুরুষের তুলনায় অধিকতর দুঃখপূর্ণ।" এবং "সে দুঃখের প্রতিকার করা উচিত।" আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বিলাতের আদর্শে বাংলার সমাজ গঠিত হইলে বাঙালী সমাজে আত্মঘাতিনী নারীর সংখ্যা কমিতে পারে।" কিন্তু দুটি কারণে মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিতে তাঁর আপত্তি। প্রথম কারণ, তাঁর বিশ্বাস সে ব্যবস্থায় আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যা বাড়িবে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর মনে হয় যে মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিলে 'চিরস্থায়ী শান্তি ও সন্তোষ' আসিবে না। সুতরাং পুরুষজাতির জীবন রক্ষার জন্য, এবং মৃত্যুর স্থায়ী ও ধ্রুব 'শান্তি'কে নারী-সমাজে অচলপ্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্য, লেখক মেয়েদের সামাজিক অধিকার দিতে নারাজ। তাঁর কথায় মোটমাট্ দাঁড়ায় এই যে, মেয়েরা যেমন মরিতেছে তেমনি মরিতে থাক্।

বিলাতী সমাজের হুবহু নকল না করিয়াও মেয়েদের সামাজিক অধিকারকে প্রশস্ততর করা যায় কি না, এ বিষয়ে লেখক ভাবিবার লেশমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। মাহরাট্টাদেশে মেয়েদের সমাজে প্রশস্ততর অধিকার আছে! সে দেশে তো ইউরোপের নকল করা হয় নাই। মেয়েরা পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, অথচ পৃথিবীর আলোবাতাস হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগগ্রস্ত জীবন যাপন

করিতেছে—তাহাদিগকে একটু হাঁটিতে চলিতে দিলেই কি বিলাতী সমাজের নকল করা হয়? তাহারা তাহাদের বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বান্ধববর্গের সঙ্গে শোভনতা ও লজ্জা রক্ষা করিয়া দুটো কথা বলিলে কি বিলাতী সমাজের নকল করা হয়? এমনি করিয়া তাহাদের চিত্তকে নানা দিকে ছাড়া দিবার ও আনন্দ দিবার কত সহজ ব্যবস্থাই উদ্ভাবিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে; কেবল হয় না এইজন্য যে মেয়েদের দুঃখ সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষেরা মোটেই সচেতন নয়। তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ত হাতে-হাতেই দেখিতেছি—'উপাসনা'র এই টিপ্পনি। লেখক মেয়েদের উপন্যাস পড়াও বন্ধ করিতে চান্, কারণ আধুনিক উপন্যাসে বিলিতি গন্ধ বড্ড বেশি। মেয়েদের উপন্যাস পড়া বন্ধ-করার একমাত্র উপায় উপন্যাস-রচনাকেই বন্ধ করা। তাহা যখন বন্ধ হইবার নয় তখন কড়া শাসনের দ্বারা মেয়েদের পড়িবার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিলে আত্মঘাতিনী মেয়ের সংখ্যা বাড়িবে না কমিবে? এইসব কথা যে-সব লেখক নিশ্চিন্তে লিখিয়া যান্, আত্মঘাতিনী মেয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিবার অনেকটা দায় কি তাঁহাদের উপর পড়ে না?

ভাবের ছাপ

ফাল্গুনের "মানসী"তে 'ভাব-শক্তি' প্রবন্ধের লেখক ভাব যে একটা সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তাহার ছাপ যে তাহা শরীরের মধ্যেও রাখিয়া যায় তাহা প্লেটের উপর মুদ্রা রাখিয়া ছাই তুলিয়া নানারকমে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবের ছাপ সূক্ষ্ম শরীরে লাগিয়া থাকে, বলিয়া মৃত্যুর পর আমাদের দেহ ভাবময় হয়, তাহাও তিনি এই অভাবময় চর্ম্মচক্ষেই দেখিয়া ফেলিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের Subliminal consciousness বা মগ্নচৈতন্যের দ্বারা যে-সকল বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাকে ভূততত্ত্ব বা Spiritualismএর দিক্ হইতে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখক অনেকগুলি ছাইয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমাণ ভিন্ন এসব পরলোকতত্ত্ব বা ভূততত্ত্ব যে দাঁড়ায় না, ইহা Psychical Reseaıch Societyর লোকেরা বুঝে—বুঝেনা শুধু আমাদের আধুনিক যোগীর দল, যাহারা পরীক্ষা না করিয়াই অস্বীকায় উপনীত হয়।

আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

ঐ সংখ্যার 'মানসীতে' 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথাচ্ছলে যে-সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর সমালোচনা সংক্ষেপে এই:—

(১) "বঙ্কিমবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।...আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ' গুলিই যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaর

যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি-গত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই! কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না?"

(২) "জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ীর সংযোগ দেখিতে পাই না।...কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিস্ফলপ্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না!"

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই শেষ অংশ-টুকুর উদাহরণ Turgenevএর Fathers and Children বা On the eve প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসে পাওয়া যায়। উহাদের সঙ্গে আনন্দমঠের যদি তুলনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ, উপন্যাসে ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যগত চেহারা ফুটাইয়া তোলাই দরকার।

কিন্তু উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠতা নয়, তাহার শ্রেষ্ঠতার অন্য কারণ। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর এই সমালোচনা বহুকাল পূর্ব্বেকার—আনন্দমঠ যখন প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রনাথবাবুর সহিত পত্র-ব্যবহারে এই সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরেও তাঁহার এই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কিনা, বিপিনবাবুর লেখা হইতে তাহা ঠিক জানা যাইতেছেনা। কারণ, স্বদেশী-আন্দোলনে আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' বাঙালীর প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়াছে। এ তো উপন্যাস নয়, এযে স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব্ব ভাগবত! বিপ্লবচেষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভূমিকায় নিন্দা করিয়াছেন; সুতরাং আনন্দমঠ পড়িয়া বাঙালীর মধ্যে যদি বিপ্লবচেষ্টা দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা স্বয়ং লেখক কর্ত্তৃক নিন্দিত। আনন্দমঠের মধ্যে যে intensity, যে আবেগতন্ময়তা আছে, তাহা লিরিকের উপযুক্ত। নাটক যদি লিরিক্যাল হয়, তবে এ উপন্যাসকে লিরিক্যাল উপন্যাস বলায় কোনো হানি নাই।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী

ফাল্গুনের "মানসী"তে "ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করা গেল। ইতিহাস রচনা করিতে গেলে কি কি প্রমাণ আবশ্যক তাহা লেখক অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে তো গেল, তথ্য যাচাই করিবার বেলায় যে-সব প্রমাণের প্রয়োজন, তাহার কথা। ইতিহাসের কঙ্কালটা তৈরি হইলে তাহাতে রক্তমাংস কি করিয়া দেওয়া যায় তাহাই তো ভাবিবার বিষয়।

গ্রীকদের মধ্যে থুকিদীদিস্, বা হেরোডোটাস্, কিম্বা গিবন, গ্রোট, কার্লাইল প্রভৃতির ইতিহাস কঙ্কাল-হিসাবে অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাদের মধ্যে রক্তমাংস আছে। এখনকার প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের কঙ্কালসার ইতিহাসে সেটি নাই। লেখক যে ইতিহাসকে রসপূর্ণ করিবার বিপদ দেখাইয়াছেন, তাহা ঐ কঙ্কালটা গড়িবার বেলায় খাটে বটে, কিন্তু

উহাতেই কি ইতিহাস-সৃজন সম্পূর্ণ হইল তিনি মনে করেন? Epigraphy, Numismatics প্রভৃতির কাজ হইলে cultural history—জাতীয় সভ্যতা গঠনের ইতিহাস—লেখা দরকার। তখন তথ্যে কুলায় না, তত্ত্ব চাই। কঙ্কালে কুলায় না, রক্তমাংস চাই। সে ইতিহাস এ যুগে লিখিবার অপেক্ষা আছে। তার আগে মাটী খোঁড়ার কাজ (Spade work) যেমন চলিতেছে চলুক্।

রক্ষণশীল—উন্নতিশীল

মাঘের সবুজপত্রে 'নূতন কিছু' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বলেন, 'নূতন কিছু'কেই আমাদের সমাজ গ্রহণ করিতে ডরায়। সমাজ পুরাতনের জের টানিতে চায়। অথচ রক্ষণশীলতার প্রয়োজন লেখক খুবই মানিয়াছেন। তিনি বলেন "মানব-মনের রক্ষণশীলতার আগুনে পুড়ে ছাই না হ'য়ে বরং খাঁটি হয়ে যা বেরিয়ে আসে তাই হবে গ্রহণযোগ্য।" এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন —"এ যুগেও দেখুন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পত্তনের মূলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা।"

লেখকের মনের ধারণা এই যে আমাদের সমাজে এই রক্ষণশীলতা জিনিষটাই নাই। তিনি বলেন "আমাদের রক্ষণশীলতা ......অনেক স্থলেই আমাদের কর্ম্মবিমুখ মনের সুনিপুণ ছদ্মবেশ।" রক্ষণশীলতার প্রধান কাজ—জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষা করা। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "জাতীয় বিশিষ্টতা বলে যদি সত্যিই কিছু আমাদের থাকে, তবে তা নিজের গুণেই রয়েছে। আমাদের তরফ থেকে তাকে রাখবার জন্য জাতিগত ভাবে খুব বেশী চেষ্টা করতে হয়নি।"

রক্ষণশীলতার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া আমাদের সমাজে তাহার অস্তিত্ব কেন যে লেখক অস্বীকার করেন, তাহার কারণ আমি পাই না। আমার মনে হয় negative criticism বা অভাব-জ্ঞাপক সমালোচনা-রীতির একটা মহৎ দোষ এই যে তাহাতে অভ্যস্ত হইলে মানুষ সবই 'না' 'না' বলিতে বলিতে, যেখানে হাঁ বলা উচিত সেখানেও অভ্যাসের দোষে মাথা নাড়িয়া ফেলে।

যেমন ধরুন—জাতীয় বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে কোনো চেষ্টা করিতে হয় নাই, লেখকের এ কথা কি প্রমাণসাপেক্ষ? প্রাচীনকালে, বৌদ্ধযুগের পর পৌরাণিক যুগের ইতিহাসকে ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব, রীতিনীতি, শিল্প, প্রভৃতি সকল-দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল দিকের বিচিত্র চেষ্টার মূলে জাতীয় বিশিষ্টতাকেই রক্ষা করিবার প্রয়াস বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনের তরফে শঙ্করাচার্য্য ও গীতাকার এই একই চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধযুগে আমরা হইয়াছিলাম বিশ্বপ্রেমিক; পৌরাণিক যুগে হইয়াছিলাম রক্ষণশীল।

আধুনিক যুগেও জাতীয় বিশিষ্টতাকে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত জীবন তো এই কাজেই নিয়োজিত

হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র হইতে প্রাণের উপকরণ রামমোহন রায়ের মত এত বিচিত্র ভাবে আর কেহই আহরণ করেন নাই, কিন্তু সে-সমস্তই তিনি জাতীয় বিশিষ্টতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার 'রক্ষণ-শীলতা' আরও বেশি। বিদেশ হইতে তিনি নানা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'রক্ষণ-শীলতার আগুনে' পুড়াইয়া খাঁটি করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা স্বাজাত্য-বোধের জনকস্বরূপ হইয়া আছেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহারা কি রক্ষা করিয়াছেন এবং কি 'নূতন কিছু' আনিয়াছেন তাহা আমাদের জানা দরকার। অথচ আমরা সে সম্বন্ধে কত অল্পই জানি।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার কাজ এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। সাহিত্যে, শিল্পেও সেই কাজ চলিতেছে। জাতীয়-বিশিষ্টতার পথেই বিকশিত হইয়া তাহারা ক্রমশ সার্ব্ব-জাতিক সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে গণ্য হইতেছে। এ সম্বন্ধেও বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

সুতরাং লেখকের এ মন্তব্য কি সত্য যে "যখন রক্ষা করবার জিনিস আমাদের প্রচুর ছিল, তখন আমরা হয়ে পড়েছিলাম বিশ্বপ্রেমিক; আর এখন, যখন আমাদের সবই চাই—আমরা হয়েছি রক্ষণশীল।"?

বরং মনে হয় যে, লেখক যে-হিসাবে বলিয়াছেন সে-হিসাবে আমাদের বেশি করিয়া রক্ষণশীল হওয়ার দরকার। ব্যাপ্ত হইবার আগে সংহত হইবার প্রয়োজন আছে। আমাদের জাতীয়তা জিনিষটা নিবিড় হইলে পর, বিশ্বভৌমিকতার দিকে যাত্রাটা স্বচ্ছন্দগতি হইতে পারে।

সামাজিক সমালোচন-রীতি

সাহিত্যে একদল সমালোচক আছেন, তাঁহাদের সমালোচনার মোটামুটি দুইটি সূত্র দেখিতে পাই—(১) আমাদের ভাল লাগিল; (২) আমাদের ভাল লাগিলনা। কেন ভাল লাগিল এবং কেন ভাল লাগিলনা—কি মানদণ্ডে তাঁহারা সাহিত্যের ভাল ও মন্দের বিচার করিতে চান, তাহা তাঁহাদের নিকটে পাইবার প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। সমাজ সম্বন্ধেও এই সমালোচন-পদ্ধতিই দেখা যায়।

সামাজিক-সমালোচনরীতিতে, এক-রকম দেখা যায়—জোর করিয়া ভাল-লাগা। অর্থাৎ সেটা স্বাভাবিক ও সহজ ভাল-লাগা নয়। তাহার মধ্যে একটা কৃত্রিম উত্তেজনা আছে। তাহা প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা মন্দ লাগিবার কারণগুলিকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করে। ইংরাজীতে এই চেষ্টাকে special pleading বলা হয়। ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

আর-একরকম দেখা যায়—কিছুই ভাল নয় বলিবার চেষ্টা। তাহাকেই বলি অভাবজ্ঞাপক সমালোচনা বা negative criticism। দর্শনে যেমন একরকমের নেতি নেতি বাদ আছে, ইতিত্ব কোথায় তাহা বুঝাই যায় না—এখানেও ইতিত্ব অংশ নেতিত্বের চোটে একেবারেই লোপ পাইয়া বসে। এই নেতিত্বের মূলে একটা নৈরাশ্য আছে, কিম্বা ইহা নৈরাশ্যেরই জন্মদাতা।

Special pleading বরং ভাল; negative criticism মারাত্মক। অর্থাৎ 'না' কে 'হাঁ' করা ঢের ভাল, নিছক বিশুদ্ধ 'না'য়ের চেয়ে।

এই দুই সমালোচন-রীতিতে বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয়। একপক্ষে বাড়িতেছে—জাতীয় অহমিকা; অন্যপক্ষে বাড়িতেছে জাতীয় অবজ্ঞা।

তবে কোন্ সমালোচন-রীতির দরকার?

যুগযুগান্তর ধরিয়া নানা ভাঙাগড়া, নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া সমাজ যে ক্রমশ আপনাকে-আপনি অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছে, সেই অভিব্যক্তির ইতিহাসে সমাজের গঠন, প্রকৃতি, রীতি-নীতি, সমস্তই কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে—গোড়ায় তাহা জানাটাই সবচেয়ে বড় দরকার। কারণ ঐসব না জানিয়া সমাজ-সম্বন্ধে মনগড়া থিওরি খাড়া করায় কোনো লাভ নাই। সুতরাং সেই জানার পূর্ণতা-সাধনের জন্য গোড়ায় বিস্তর মালমসলা সংগ্রহ, বিস্তর মাটি-খোঁড়ার কাজ (spade work) পড়িয়া রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান (biology), মনোবিজ্ঞান (psychology), নৃ-বিজ্ঞানাদির (anthropology) সাহায্যে যাহাতে সমাজবিজ্ঞানের উপকরণ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেইদিকে শ্রম চাই। যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান ধরি—যেমন বিবাহ—সে সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানানুমোদিত কোনো সত্য ধারণা আমাদের নাই। সর্ব্বত্রই আগে সংগ্রহ, পরে থিওরি। কিছুই জানা নাই, শুধু জল্পনা-কল্পনার উপর থিওরি খাড়া করা হইতেছে, ইহার চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

সমাজ সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিলেই, সমাজ-চৈতন্য (social consciousness) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূত-কালকে বর্ত্তমানে সজীব করিবে এবং বর্ত্তমানকে ভূতকালের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। সেই সমাজ-চৈতন্যময় বৃহৎ সামাজিক ব্যক্তিত্ব (social personality) আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্বে সমাজসম্বন্ধে আমরা যাহাই বলিব তাহা হয় 'না'-কে 'হাঁ' করিতে থাকিবে, নয় সমস্তই 'না' বলিয়া নৈরাশ্যের কুলার বাতাস গায়ে লাগাইতে থাকিবে।

চল্‌তিভাষা ও সাধুভাষা

সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে যে বাংলা ভাষা গড়িবে না, বাংলা ভাষার যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এ-সব কথা এতই পুরানো যে পুনরুক্ত হইলে বিরক্তিকর হয়। প্রত্যেক ভাষার genius স্বতন্ত্র; বাংলা ভাষারও একটা genius বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ-কথা মানুন আর নাই মানুন, সংস্কৃতের সংস্কারবর্জ্জিত প্রাকৃত আপামরসাধারণ একথা প্রতিদিনই তাহাদের ব্যবহৃত ভাষায় স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সংস্কৃতভাষা যখন আমাদের পৈতামহী ভাষা, তখন তাহা হইতে নানা শব্দ ও পদ বাংলাভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। বাংলায় সেগুলি চলিয়া গিয়াছে, বাংলার নিজস্ব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বোধ করি সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার

সাহিত্য নয়, তাহার দর্শন। এই সংস্কৃত দর্শন মানুষের সর্ব্বোচ্চ চিন্তাকে যেমন সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছে, তেমনি নানা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ তত্ত্বকে ও আইডিয়াকে সূক্ষ্ম অর্থদ্যোতক ও ভাবব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছে। এইজন্য সংস্কৃত দর্শনের সেই সকল শব্দ বা terms ইংরাজী বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা দুঃসাধ্য হয়। অনেক জর্ম্মাণ বলেন যে জর্ম্মাণ-দর্শনেরও বিস্তর terms ইংরাজীতে অনুবাদের বেলায় ভারি ঝাপসা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সেইজন্য ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ বা terms বাংলায় ব্যবহার না করিলে উপায় নেই।

প্রাচীন বাংলাভাষার আর যাই সম্পদ থাকুক, তত্ত্বসম্পদ্‌ ছিল না। বাংলা ছিল সত্যিকারের প্রাকৃতজনের ভাষা। তাহাদের হাসিকান্না, ঠাট্টাতামাসা,—তাহাদের সাদাসিধা জীবনযাত্রার যাহা ব্যক্ত করা দরকার হয়—তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল বাংলা ভাষা।

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বিদূষকের অতি স্থূল রসিকতা ভিন্ন কৌতুকহাস্যের আর বড় একটা নমুনা ঐ সাহিত্যে পাওয়া যায়না। humour সংস্কৃত সাহিত্যে নাই; উদ্ভট শ্লোকে কিছু কিছু satire আছে বটে কিন্তু তাহারও ধার যথেষ্ট নাই, ভার আছে কেবল। এইজন্য গল্পসাহিত্য সংস্কৃতে তেমন করিয়া জমে নাই। যে ভাষায় গতি জিনিষটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, সে ভাষায় উঁচুদরের সাহিত্য সম্ভবে না।

বাংলাভাষায় যে হাসিকান্নার জীবনলীলা বেশ প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তখনই বাংলার বিশিষ্টতাটা ধরা পড়ে। তবে তখনও সংস্কৃত রীতিতে বাংলা লেখা চলিত বলিয়া সে বৈশিষ্ট্যটার দৌড় কতদূর তাহা পরীক্ষিত হয় নাই।

তবু প্রাচীন বাংলায় তত্ত্বকথা মোটেই প্রকাশ পায় নাই বলা অন্যায় হইবে। মহাভারত রামায়ণ এই বাংলা ভাষায় লেখা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন যখন বাংলায় আসিল, তখন তত্ত্বকথাও নানা বৈষ্ণব গ্রন্থের ভিতর দিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তখনও সংস্কৃতের পুরাপুরি চল ছিল সুতরাং এসব ব্যাপারে বাংলা অচল ছিল।

এ যুগে রামমোহন রায়ই প্রথমে সাহস করিয়া বেদান্তকেই বাংলায় প্রকাশ করিতে বসিলেন। তাঁর পরে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভা, সংস্কৃতের সকল সম্পদ বাংলার ভাণ্ডারে জমাইয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। সুতরাং সাধুভাষা বলিয়া একটা জিনিস আপনিই তৈরি হইয়া উঠিল। তাহা সংস্কৃতেরই ছাঁচে তৈরি হইল বটে, কারণ তাহার মুখ্য কাজ ছিল সংস্কৃতেরি অনুবাদ।

ক্রমে যখন সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হইল, তখন সাধুভাষায় কুলাইল না। কারণ অন্যভাষার শুধু শব্দসম্পদ পাইলেই তো হয় না; কোনো ভাষা সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী হইতে গেলে তাহার মধ্যে জীবন-গতি (life-movement) যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। তাহার মধ্যে বেগও চাই, আবেগও চাই। সুতরাং আসল জীবনের ধারার

সঙ্গে সে ভাষার যোগ চাই। জীবনের ধারা কি আর প্রাচীন মৃত ভাষায় আছে, না থাকিতে পারে? কাজেই চল্‌তি বাংলা ভাষার তলব পড়িল। লোকের জীবনের মধ্যে চলিতেছে বলিয়াই ইহার নাম চল্‌তি।

বঙ্কিম এই সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষার মিলনসাধন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ সাধুভাষা ক্রমশ চল্‌তি ভাষার চলমান জীবনস্রোতের বেগে তাহার স্থবির স্থানুরূপ বদল করিতে লাগিল।

কিন্তু চল্‌তি ভাষা বলিতে কি কোনো প্রাদেশিক ভাষা (provincial dialect) বুঝিব? প্রাদেশিক ভাষা প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত হইয়া সাহিত্যিক ভাষা কেমন করিয়া হইবে? তবে কি চল্‌তি ভাষা কলিকাতার ভাষা? সে ভাষা অবশ্য ঠিক্ প্রাদেশিক না হইলেও প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত ত নয়।

চল্‌তি ভাষা বলিতে কোন প্রাদেশিক ভাষা বা কলিকাতার ভাষাও বুঝায় না। তাহার জন্ম কলিকাতায় হইলেও কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা হইতে তাহার উদ্ভব হয় নাই। কলিকাতা সহরের নূতন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মানসলোকে ইহার আসল উৎপত্তি। এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা ও চিন্তার অনুরূপ হইতে স্বভাবতই বাধ্য। তাঁহারা তাই কলিকাতার চল্‌তি ভাষার উপর বনিয়াদ্ করিয়া আর একটা নূতন চল্‌তি ভাষা—সাধু-চল্‌তি ভাষার পত্তন করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহারা সেই কাজ করিতেছেন। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, আমাদের এই সাধু-চল্‌তি ভাষা, কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনার ভাষা ততই উন্নতিলাভ করিতেছে। এই দশের মুখের ভাষা হইতেই সাহিত্য তাহার সৃজনক্ষম ভাষাকে আহরণ করে। বাংলাদেশেও এমনি করিয়াই সাধু ও চল্‌তি ভাষার ব্যবধান ক্রমশঃ ঘুচিয়াছে ও ঘুচিতেছে।

অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ থাকিলে চল্‌তি ভাষা ক্রমশ সংস্কৃত ভাষার মত একটা অচল স্থাণুত্বে গিয়া ঠেকে। তখন তাহার মধ্যে জীবন-গতি, জীবন-বেগ কমিয়া আসে। যখন শিক্ষা সর্ব্বসাধারণে গ্রাম্যলোকমধ্যেও ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন আমাদের এই সাহিত্যিক ভাষার আরও নব নব উন্মেষ, নব নব বিকাশ, নব নব গতি দেখা যাইবে। তখন যাহাকে বলে ভাষায় virility বা তেজ তাহা আরও ফুটিবে। তাহার ভার আরও কমিবে, তাহার ধার আরও বাড়িবে।

কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা চাই। 'করিতেছে' না লিখিয়া 'করচে' লিখিলেই চল্‌তি ভাষার জীবনধারার মধ্যে সাহিত্যের ভাষাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল, মনে করা ভুল। don't এর জায়গায় do not লিখিলে ইংরাজী লিখিত ভাষার সচলতা একটুও নষ্ট হয় না। তা ছাড়া প্রধান বিপদ এই যে, চল্‌তি ভাষা চালাইতেই হইবে মনে করিলে, চিন্তাকে খুব সংহত রূপ দেওয়াই যে শ্রেষ্ঠ ভাষার কাজ সে কথা ভুলিয়া হয়ত সোজা সংস্কৃত একটি শব্দ বা পদ যেখানে ব্যবহার করিলে চুকিয়া যায় সেখানে বাধ্য হইয়া ভাষা অযথা

ফেনাইতে সুরু করা যাইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত যে মিলে না তাহা বলিতে পারি না।

চল্‌তি ভাষা ও সাধুভাষা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গেছে। মাঘ মাসের 'উপাসনা'য় সম্পাদক এ সম্বন্ধে ছাইচাপা তর্ক-বিতর্কের আগুনে পুনরায় খোঁচা দিয়াছেন; তাই আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য বেশ খোলসা করিয়া বলা প্রয়োজন বোধ করিলাম।

'উপাসনা'র সম্পাদক মহাশয়ের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সার কথা এই যে abstract ভাব বা অনুভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা সাধুভাষা, আর concrete ভাব বা অনুভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা চল্‌তি ভাষা যাহাকে বলা হয়।

তিনি বলেন "সাধু ভাষা ও চল্‌তি ভাষার আলাদা আলাদা অধিকার।" এ জায়গাতেও, ভাষার মধ্যেও, তিনি 'বর্ণধর্ম্ম' রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। তাঁহার ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই জাতিভেদ তুলিয়া দিতেছেন বলিয়াই "অনেক স্থলে তাঁহার ভাবের গৌরব হানি ও ভাষার পঙ্গুত্ব ঘটিয়াছে।" ইহার উদাহরণ তিনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতের পোষকতার জন্য যে সব উদাহরণ উদ্ধার করিয়াছেন, ভিন্ন মতের সমর্থনের জন্য সেই একই উদাহরণ উদ্ধার করা যাইতে পারিত। "ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগুন যখন লাগে" এই পংক্তিতে লেখকের মতে "বাস্তব ছবির পশ্চাতে প্রকৃতির সৃষ্টির যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু প্রকাশিত হয় নাই।" এটা একেবারেই থিওরি সমর্থনের জন্য গায়ের জোরের কথা। কেননা উল্লিখিত বাক্যে, 'ভীষণ' 'রক্তরাগ' ও 'ভয়'—এ তিনটি শব্দই সংস্কৃত শব্দ। শুধু 'খেলা' 'আগুন' 'যখন' 'লাগে' এই চারিটি শব্দ বাংলা। ক্রিয়াপদ বাদ দিলে দুটি মাত্র শব্দ বাংলা দাঁড়ায়। অতএব 'খেলার আগুন' কথাটাতেই তাঁর যত গোল বাধিয়াছে বুঝা গেল। খেলার symbolএ সৃষ্টির ভিতরকার আগুনকে প্রকাশ করিতে গিয়া 'চল্‌তি ভাষার অযোগ্যতা হেতু', প্রকাশ যে কোথায় বাধাগ্রস্ত হইল তাহা তো দেখিতে পাই না। প্রকৃতির খেলার মধ্যে মাধুর্য্যও যেমন আছে, শক্তিও তেমনি আছে; সৌন্দর্য্যও যেমন আছে, রুদ্রতাও তেম্‌নি আছে—এই ভাবটি প্রকাশের জন্য কবি খেলার symbol এবং আগুনের symbol দুটি উপযুক্ত বাস্তব symbolকেই ধরিয়াছেন। সাধু ও চল্‌তি ভাষার সাঙ্কর্য্য তো অনিবার্য্য দেখা গেল; এখানে symbolএরও সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণধর্ম্মরক্ষার পক্ষপাতী সম্পাদকের বোধ হয় আপত্তির কারণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জাপান

"ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অণ্ডর জাপান" এই সম্বন্ধে "ভারতবর্ষে"র কোনো লেখক লিখিতে গিয়া গোটাকতক জাপানী কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ যে জাপান গ্রাহ্য করে নাই তাহাই উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। যে সকল কাগজে কবির প্রশংসা বাহির হইয়াছে তাহাও উদ্ধার করিয়া দেখাইলে লেখক ভাল করিতেন।

জাপানে দুইটি-দল আছে। একদল অতি নব্য দল, তাহারা ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্ব্বাংশে নকল করিতে ব্যস্ত। আর-একদল প্রাচীননিষ্ঠ ও ভাবুক। শ্রীমৎ ওকাকুরা এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার Ideals of the East যাঁহারা পড়িয়াছেন ও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু খবরও যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা জানেন যে এই জাপানীটি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের উৎসকে উৎসারিত করিতে কম সাহায্য করেন নাই।

অতি-নব্য দলের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী যে রুচিরোচন হইতে পারে না, তাহা তো জানা কথা। তিনি তাহাদের আদর্শ ও পদ্ধতিকে কঠিন ভাবে বিচার করিয়াছেন—ব্যক্তিই হউক, জাতিই হউক, কোনো বিদেশীর এতটা কঠোর অভিবাদ সহ্য করিতে কেহ পারে না। অতি-নব্য জাপান যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মৌখিক প্রশংসা না করিয়া সমালোচনা করিয়াছে, ইহাতেই কবির বাণীর যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ বড় জিনিষকে গ্রহণ করিবার দুটি মাত্র প্রশস্ত প্রণালী আছে:—অর্দ্ধচেতনভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বিনিময়ের ভিতর দিয়া এক-রকমের গ্রহণ করা আছে, ভক্তরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সংগ্রামের ভিতর দিয়া গ্রহণ; তাহাতেও খুব বড় ভাবেই গ্রহণ করা হয়। প্রতিবাদীরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জাপানের ভাবুক ও রসিকসম্প্রদায় কবিকে প্রথম ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতরে-ভিতরে অজ্ঞাতসারে প্রীতি ও শ্রদ্ধার যোগে কবির প্রভাব কাজ করিতে থাকিবে। তারপর যে অতি-নব্য দল তাঁহার এই প্রভাব ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টাই প্রমাণ যে, তাঁহারা কবির বাণীকে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার ভাবে দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে একটা লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

'ভারতবর্ষে'র লেখককে আমাদের প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাদের খোঁজ না লইয়া বিরুদ্ধবাদের খোঁজটাই তাঁহারা লইলেন কেন? ভূদেববাবুর 'স্বজাতি-বিদ্বেষ' কথাটাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য লেখকের এত ব্যস্ততা দেখিয়া নিজের দেশসম্বন্ধে লজ্জা বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের গৌরবে কি আমাদের দেশের গৌরব নয়?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পোড়ারমুখী

এইখানেই আমার জন্ম। শুনেছি, আমার মা কুলত্যাগ করে এসেছিলেন। লোকে বলে, সেটা পাপ। পাপ কি পুণ্য জানিনা; কারণ সে-শিক্ষা আমার কখনো হয়-নি। যদি পাপ হয়, তবে বলতে হবে যে, মার সে পাপের শাস্তি ভোগ করছি, আমি।

রূপকথায় এক কুৎসিত রাজকন্যার কথা শুনেছি, আরসিতে নিজের মুখ দেখে

তিনি আরসিখানাকেই ভেঙ্গে খান্‌-খান্‌ করে ফেলেছিলেন।' জানিনা, তিনি আমার চেয়েও কুৎসিত ছিলেন কিনা! ... ... আরসিতে আমিও মুখ দেখি; দেখি, আর আমার বুকটা কেমন করে ওঠে। মনে হয় আমিও আরসিখানাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি। কিন্তু তাতে হবে কি? আমার এ কুরূপের ছায়া শুধু ঐ এক আয়নাতেই ত ধরা পড়েনা—এ যে মানুষের চোখে-চোখে ছড়িয়ে বেড়ায়!

নিজের চেহারার খুঁৎ, নিজের চোখে একরকম মানান-সই হয়ে যায়; কিন্তু হায়, আমার মুখে এমন কিছুই নেই, যা আমার নিজের চোখেও ভাল লাগতে পারে—এ-যেন মানুষের মুখই নয়! তাই কিছুতেই আমি মনকে চোখ-ঠেরে বোঝ-মানাতে পারি না! মানুষকে গড়বার সময়ে ভগবান এতটাও নিষ্ঠুর হতে পারেন!

বুঝতে পারিনা, আমার মুখে কী এমন আছে, যাতে-করে লোকে আমার দিকে তাকালে হাসি চাপতে পারে না! সাহেবদের দোকানের জানলায় যে-সব বেয়াড়ারকমের অস্বাভাবিক মুখোস দেখা যায়, আমার মুখটাও যেন অনেকটা সেই ধরণের। তাই কি লোকে অমন-করে হাসে? ওঃ, এ কী হাসি! মানুষের অবজ্ঞার চেয়ে মানুষের এই হাসি আমার প্রাণে যেন আরো নিদারুণ হয়ে বাজে!

বিকালে পাউডারে, রঙে, গয়নায় আর রঙ্গিন জামা-কাপড়ে আমার এই কুরূপ যতটা-পারি ঢেকে-ঢুকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। যতক্ষণ দিন থাকে, ততক্ষণ কেউ আমার কাছে ঘেঁসে না। সন্ধ্যে হলে যখন আর চোখ চলে না, তখন রাস্তা থেকে ঠাহর না-পেয়ে কেউ-কেউ আমার কাছে উপরে উঠে আসে। তারপর, আমার চেহারা দেখবার জন্যে সিগারেট ধরাবার অছিলায় ফস্‌ করে একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে আমার মুখের কাছে ধরে; আর আমাকে দেখেই হেসে ওঠে!

ওগো, দুনিয়ায় যার ভালবাসবার কেউ নেই, যার প্রেমের ফুল আপনি ফুটে আপনি ঝরে যায়, যার বাসনা কখনো তৃপ্তির স্বাদ পায়-নি, সে অভাগিনীর মনের ব্যথা প্রাণের কথা তোমরা কেউ বুঝতে পারবে না! আমার রূপ নেই, কিন্তু যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ত আছে!

কুরূপা কুব্জা এই জ্বালা বুকে পুরে না-জানি কত কান্নাই কেঁদেছিল! কিন্তু তার নিন্দিত জীবনও নন্দিত করে একদিন ত শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন! আমারও এই অনাদৃত জীবন-যৌবন কি একদিন কোন অজানা অতিথির পদস্পর্শে সফল হয়ে উঠবে না?

অন্ধকারে, বিছানার উপরে শুয়ে-শুয়ে আমি সেই অজানা অনাগত অতিথির কথা ভাবি! আর সবাই আমাকে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি যেদিন আসবেন সেইদিনই বুঝতে পারবেন, ছাই-ঢাকা আগুনের মত আমার এই কুদর্শন কুগঠন দেহের তলে-তলে প্রাণ-যৌবনের শতমুখী সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা নৃত্য-করে উঠছে!

আমি সেই অজানা অতিথির পথ চেয়ে আছি। সেই আশাই যে আমার এই আঁধার প্রাণের ধ্রুবতারা! আমার এই

তৃষাতাপিত জীবনের পথে আজ কোন পথিক নেই বটে, কিন্তু আমি জানি, একদিন তিনি আসবেন, তিনি আসবেনই!

* * * *

রূপের বিকিকিনি যার ব্যবসা, রূপ না থাকলে তার ত চলে না। আমারও দিন চলত-না—ভাগ্যে মা একখানা বাড়ী রেখে গেছেন, তাই কোনগতিকে আমার দিন গুজ্‌রান হচ্ছে!

বাড়ীতে আমার জনকত ভাড়াটিয়া আছে—তারা সবাই স্ত্রীলোক, কারুরই সমাজে ঠাঁই নেই। রোজ তাদের ঘরে লোক আসে, গান-বাজনা হয়, হাসির হল্লা ওঠে! তাদের সেই আমোদ-প্রমোদের ধ্বনি যখন আমার ঘরে এসে ঢোকে, তখন ইচ্ছা হয়, দি সব ভাড়াটেকে দূর-করে তাড়িয়ে! কিন্তু তাহলে যে আমার দিন চলবে না—পেটের অন্ন জুটবে না! মনের হিংসা মনেই চেপে আমি যেন গুম্‌রে মর্‌তে থাকি!

বাড়ীর দোতলায় একটি মেয়ে দুখানা ঘর নিয়ে আছে, তার সঙ্গে আমি 'মকর' পাতিয়েছি। মকর দেখতে যেমন পরীর মত, তার গানের গলাও তেমনি চমৎকার। সহরের বড়-বড় বাবু তার ঘরে আসবার জন্যে লালায়িত—'মুজ্‌রো'য় গিয়ে প্রায়ই সে মোটা টাকা ঘরে আনে।

সেদিন শুনলুম, কোন বাবুর বাগানে সে গান গাইতে যাবে। আমার কেমন সখ হোল, আমি তাকে বললুম, "মকর, ভাই, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি?"

মকর বল্‌লে, "বেশ ত, চল না!"

বাগানে যাবার সুবিধা আমার ত কখনো ঘটেনি—ঘটবে না; যার মুখ দেখলে লোকে নাক-বেঁকিয়ে মুখ-ফিরিয়ে নেয়, পয়সা খরচ করে তাকে বাগানে নিয়ে যাবে এমন বাবু কে আছে? অথচ শুনতে পাই, বাগানে নাকি ভারি ঘটা হয়! তাই দেখতে বড় সাধ ছিল; দেখি, মকরের দৌলতে সে সাধটা যদি মিটিয়ে নিতে পারি!

হা আমার ছার কপাল, এমন জানলে কে বাগানে আসতে চাইত! সেই জমকালো সাজানো ঘরে গিয়ে যখন ঢুক্‌লুম্ তখন চারদিক থেকে অনেকগুলো চোখ বিস্ময়ে-কৌতুকে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে আমার পানে স্থির হয়ে রইল। সে কী নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি! আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

মকর চালাক মেয়ে, সে তখনি এই চাহনির অর্থ ধরে ফেললে। আমার এক-হাত নিজের হাতে নিয়ে সে সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, "ইনি আমার মকর, এঁকে আমিই সঙ্গে করে এনেছি!" রূপসী মকর জানত, আমি তার সঙ্গে এসেছি শুনলে সকলের কাছে এখনি আমার কদর বেড়ে যাবে! কেননা, আমাকে তাচ্ছল্য করে তার নেক্‌-নজর থেকে বঞ্চিত হতে কেউ ত চাইবে না!

বাগানের যিনি মালিক, সেই বাবুটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "আরে এস—এস, তুমি ডালিম-বিবির মকর—আমাদের মাথার মণি!"

অমনি আরো-অনেকে বলে উঠল, "বসুন, বসুন!"

বুঝলুম, এ আমাকে আদর নয়—আমার ভিতর দিয়ে এ আদর গিয়ে পড়তে চাইছে, সুন্দরী মকরের রাঙা পায়ের তলায়! যাক্—এও তবু মন্দের ভাল!

সভার মাঝখানে গিয়ে, চোখে-মুখে রূপের দেমাক নিয়ে মকর দিব্যি জাঁকিয়ে বস্‌ল। চারিদিকে সবাই তাকে খাতির জানাবার জন্যে একেবারে তটস্থ! কেউ পাণের ডিবেটা তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিজের হাতেই তাকে বাতাস করছে, তার মন-রাখা কথা কইছে, আর কেউ-বা কিছুই করতে না পেয়ে দীন চোখে নীরবে তার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে! মাগো মা, রূপ দেখলে পুরুষগুলো কি এম্‌নি হয়ে যায়! রূপ, রূপ, রূপ! দুনিয়ায় প্রাণ কেউ খোঁজে না, চায় সুধু ছাই রূপ!

বাগানের কর্ত্তাটি, একেবারে বিনয়ের অবতার! দুটিহাত যোড় করে মকরের সামনে এসে তিনি নিবেদন জানালেন, "ডালিম-বিবি, অধীনের একটি আরজি আছে!"

মকর সিল্কের রঙ্‌চঙে রুমালখানা মুখের কাছে ঘোরাতে-ঘোরাতে, ভঙ্গিভরে যেন ভেঙে পড়ে বল্‌লে, "হুকুম!"

—"সে কি ভাই, আমরা হুকুম করবার কে, হুকুম-দেনেওয়ালা ত তুমি! বল্‌ছি কি—এতগুলো ভদ্রলোক তীর্থের কাকের মত হাঁ-করে বসে আছে, একটা গান গাইতে আজ্ঞা হোক্!"

মকর সদর্পে অবহেলাভরে সেলাম করে অনুগ্রহ জানিয়ে বললে, "যো হুকুম!"—বলে একটু নড়েচড়ে বসে সে হারমোনিয়মে সুর ধরলে।

ঘরসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'এই, গোল কোরো না—গোল কোরো না!' গোল থামাতে গিয়ে গোলমাল এমনি বেড়ে উঠল যে, কাণ পাতে কার সাধ্যি!

হঠাৎ আমার চোখ একটি লোকের উপরে পড়্‌ল। তাঁকে দেখতে বেশ হোম্‌রা-চোম্‌রা,—বুকের পকেটে সোনার ঘড়ি-ঘড়ির চেন, হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি, বোধ হয় তিনি খুব বড়মানুষ। লোকটি একদৃষ্টিতে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিলেন। তিনি কি দেখছেন? আমার এই অপরূপ রূপ?

মকরের গান সুরু হোল। গানের সুর বেমালুম ডুবিয়ে 'বাহবা'র উচ্চস্বরে সারা ঘরখানা ভরে উঠল!

আর-একবার সেই লোকটির দিকে তাকালুম। গান বা বাহবা—কিছুই তিনি শুনছিলেন না—মৃদুমৃদু হাসতে-হাসতে তেমনি-করে তখনো আমার দিকে চেয়েছিলেন। সে দৃষ্টিতে আমার কুরূপের প্রতি যে কিছু-মাত্র কটাক্ষ বা ঘৃণার ভাব ছিল না, তাও আমি বুঝতে পারলুম। তবে?... তবে কি ... ... না, না, সে যে অসম্ভব! আমাকে দেখে তিনি... ...না, তা হোতেই পারে না!

হঠাৎ তিনি উঠে-পড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর—আমি যেন নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—তারপর, তিনি সত্যি-সত্যিই আমাকে ইসারা করে ডাকলেন।

প্রথমটা আমি যেন কেমন মূর্চ্ছাহতের মত হয়ে গেলুম! এমন-করে কোন অজানা পুরুষ ত আজ-পর্য্যন্ত আমাকে কাছে ডাকেন-নি! এই এক আহ্বানের মধুর রসেই আমার সকল প্রাণমন যে পুলকে পূরে উঠল! অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে আবার তাঁর দিকে তাকালুম—আবার তিনি আমাকে হাত-নেড়ে ডাকলেন।

ঘরের ভিতরে তখনও সবাই বাহবা দিতে ব্যস্ত; সেই অবকাশে আস্তে-আস্তে উঠে, আমি বাইরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার দিকে হাসিমাখা চোখে চেয়ে তিনি বললেন, "তোমার নাম কি ?"

—"কামিনী।"

—"কোথায় থাক ?"

আমি ঠিকানা বললুম।

"তোমার বাড়ীতে কাল সন্ধ্যের সময়ে আমি যাব। এই নাও, আগাম কিছু বায়না দিচ্ছি।"—এই বলে আমার হাতে তিনি চারটে টাকা গুঁজে দিলেন।

আমি আর কি বলব—কি বলতে পারি ?.........আমার বুকের মাঝে আনন্দের স্রোত যেন উথলে উঠে আছড়ে-আছড়ে পড়তে লাগল—আমি যেন কেমন বিহ্বলের মত হয়ে গেলুম!

তিনি আর-কিছু না বলে সুধু একটু মুচকে হেসে ফের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন।

মকয় তখন মাথার উপর মদ-ভরা গেলাস বসিয়ে, দু-হাত দু-দিকে লীলায়িত করে নাচতে-নাচতে গান ধরেছিল—

"চলো গুঁইয়া, আজু খেলে হোরি !"

এতদিন কাল-গুণে বসে থাকবার পর, আজ কি সত্যই আমার ঘরে অতিথি আসবেন ? আমার সকল কুরূপ আজ কি তাঁর স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠবে ? হায়, জীবনে এই আমার প্রথম অতিথি—কি দিয়ে তাঁকে তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা করব, কেমন করে তাঁর সঙ্গে কথা কইব ?

ফুলের মালায় ঘর সাজিয়ে, আলো জ্বেলে, সেজেগুজে আমি বসে আছি, আকুলপ্রাণে নববধূটির মত! দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে প্রথম-বসন্তের মৃদু-মৃদু মন-ভোলান হাওয়া আমার বুকের পরে এসে আবেগ-ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হোল—দুরু-দুরু প্রাণে আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, তিনিই বটে!

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, "আসুন, আসুন!"

তিনি সেদিনকার মত তেমনি চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

আমি তাঁকে খাটের উপরে বসিয়ে পানের ডিবেটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলুম। কেমন এক যন্ত্রণাভরা সুখে আমার প্রাণ-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে নেতিয়ে এল। মনে হোতে লাগল, আজ যেন এ জগতে আর কেউ কোথাও নেই—সুধু তিনি আর আমি, তিনি আর আমি!... ... ...

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আমার মুখখানা তিনি তুলে ধরলেন—সে স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে-শিউরে উঠল, আমার দু-চোখ ধীরে-ধীরে আপনি মুদে গেল!

কিন্তু এ কি! আমি চোখ মুদতে-না-মুদতে, তিনি যে একেবারে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন!

সে হাসির পরিচয় আমি জানি, আমি জানি!····· আমার দিকে তাকালে আর সবাই যে হাসি হাসে, আজ এঁর গলাতেও আমি যে ঠিক সেই হাসিই শুন্‌ছি! চমকে চোখ চেয়ে আমি দু পা পিছিয়ে এলুম। থেমে-থেমে বললুম, "আপনি হাসচেন যে!"

অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, "উঃ, এ যে হেসে মরে যাবার গতিক! তুমি যখন চোখ বুঁজে কেমন একরকম মুখ করেছিলে, বাপ্, তখন তোমাকে দেখলে মড়াও যে হেসে উঠত!"

আমি কর্কশস্বরে বললুম, "কি বলচেন?"

—"কামিনী, সত্যি বলচি, তোমার মুখের যোড়া মেলা ভার! তোমাকে যদি দুদিন শিখিয়ে-টিখিয়ে থিয়েটারে নামাই, তাহলে তোমার চেয়ে ভাল হাসির অভিনয় আর কেউ করতে পারবে না। লোকে চেষ্টা করে, বিতিকিচ্ছি মুখভঙ্গী করে লোক হাসায়; তোমাকে কিন্তু সে-সব কিছু করতে হবে না! ভগবান তোমাকে এমনি আশ্চর্য্য মুখ দিয়েছেন যে, আমার মত গম্ভীর লোকও তোমাকে দেখে না হেসে থাকতে পারলে না।"

আমি ঠোঁট কামড়ে অধীর স্বরে বললুম, "কে আপনি?"

—"আমি 'ভেনাস'-থিয়েটারের ম্যানেজার।"

—"কি চান এখানে?"

—"তুমি আমার থিয়েটারে অভিনয় করবে? দু-চারিদিন শিখলেই তুমি হাস্যরসের খুব ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে। তোমার ঐ মজার মুখ দেখেই আমি সেটা বুঝে নিয়েছি! তাতে তোমার-আমার দুজনেরই লাভ।"

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "না না! চলে যান আপনি! যান,—যান বলছি!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও হতভম্ব হয়ে লোকটা ঘর-থেকে সুড়্‌সুড়্ করে বেরিয়ে গেল।··· ··· ···

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের মত দক্ষিণ বাতাস আমার ঘরে ঢুকে ফুলের মালাগুলোকে দোলা দিয়ে গেল।

মালাগুলো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, জানলা বন্ধ করে আমি আলো নিবিয়ে দিলুম।··· ··· ওরে আমার পোড়ার মুখ, এ অন্ধকারে তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না রে, কেউ দেখতে পাবে না!

শ্রী:—

সমালোচনা

কবিকথা। প্রথম খণ্ড, কালিদাস ও ভবভূতি। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে কালিদাস-রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল", "বিক্রমোর্ব্বশী" ও "মালবিকাগ্নিমিত্র", এবং ভবভূতি-রচিত "মহাবীর-চরিত", "উত্তর-রামচরিত" ও "মালতী-মাধব" নাটকের গল্পাংশ ইংরাজী Lamb's Tales from Shakespeare গ্রন্থের ধরণে—আখ্যায়িকার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পগুলি খুব বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ নাটকের কথাবার্ত্তা ইহাতে হুবহু বজায় আছে। যদি অনুবাদের ভাষা বেশ সরল ও সহজ হইত, তাহা হইলে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থপাঠে মূলের রস উপভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকিত। দুর্ভাগ্যক্রমে অনুবাদের আমরা সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না; অধিকাংশ স্থলেই লেখক সংস্কৃতের অনুস্বার-বিসর্গটুকু মাত্র বাদ দিয়া মূলের ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন; ফলে সরল বাঙলায় ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—মূল "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এক জায়গায় আছে, শার্ঙ্গরব বলিতেছেন, "ইত্থমপ্রতিহতং চাপলং দহতি। অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ। অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্॥" কবি-কথার লেখক তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, "শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমার আত্মকৃত চপলতা এখন তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। সকল কার্য্যই, বিশেষতঃ যাহা গোপনে সাধিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া করাই উচিত। অজ্ঞাত-হৃদয়ের মিত্রতা শেষে শত্রুতায় পরিণত হইয়া থাকে।" (৫৬ পৃষ্ঠা) অথচ বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথাই এইভাবে লিখিয়াছিলেন, "শার্ঙ্গরব কহিলেন, না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা বিধেয় নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়।" (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস সংস্করণ; ১৯০৯।৮৮ পৃষ্ঠা) কবিকথার লেখক লিখিয়াছেন, "তোমার আত্মকৃত চপলতা তোমাকে দগ্ধ করিতেছে" যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, প্রধানতঃ যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থের সৃষ্টি—তাঁহারা ইহার কি অর্থ করিবেন! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেকালের পণ্ডিতীযুগে ঐ ভাবই কিরূপ সহজ ভাষায় ফুটাইয়া ছিলেন, লেখক সেইটুকু লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, অনুবাদে লেখক শুধু নাটকের দৃশ্য-যোজনা ভাঙ্গিয়া উপাখ্যানের পরিচ্ছেদ আঁটিয়াছেন, এবং অনুস্বার-বিসর্গ ছাঁটিয়া ও সংস্কৃত অক্ষর ছাড়িয়া বাঙ্‌লা ঢপে বাঙ্‌লা অক্ষর সাজাইয়া গিয়াছেন; কাজেই অনুবাদে কোন কৃতিত্ব নাই। ভাষা অত্যন্ত কটমট—যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের কাছে সংস্কৃতের ন্যায়ই দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-কালে লেখক মহাশয় আমাদের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন।

বিকাশ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন প্রণীত। কলিকাতা, কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—সুতরাং ইহারও ললাট-পটে যে 'ভূমিকা'-বালাইটুকু আঁটা আছে, সে কথা বলা বাহুল্য এবং অধিকাংশ 'ভূমিকা'-আঁটা 'কবিতা'-গ্রন্থের মতই 'বিকাশের' কবিতাগুলিও মিলে-ছন্দে অপাঠ্য।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।